সুবোধ ঘোষ
রচনা সমগ্র



সম্পাদনা

উত্তম ঘোষ

সমীরকুমার নাথ



নাথ পাবলিশিং

৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড □ কলকাতা - ৭০০ ০০৯

SUBODH GHOSH
RACHANA SAMAGRA
PART VI

Published by
Samir Kumar Nath
Nath Publishing
73, Mahatma Gandhi Road
Kolkata - 700 009

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ১৯৯৯

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদপট
চারু খান

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স
৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

ভূমিকা

সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র আরো আগে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। আজ থেকে প্রায় ১৮ বছর আগে সুবোধবাবু (মার্চ, ১৯৮০) আমাদের ছেড়ে হঠাৎ চলে গেলেন। যাবার আগের দিনও আনন্দবাজার পত্রিকায় তিনি তাঁর শেষ সম্পাদকীয় লেখা লিখে রেখে গেলেন ঃ 'ওমর খৈয়াম স্মরণে'

সুবোধবাবু সম্পর্কে আমি আমার বই 'সম্পাদকের বৈঠকে'—বেশ অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার কথা লিখেছি, যা শুধু লেখক সুবোধ ঘোষকে নয়, ব্যক্তি সুবোধবাবুকেও হয়তো অনেকটা তুলে ধরতে পারে। তাঁর মৃত্যুর পর আমি আনন্দবাজারে লিখেছিলাম ঃ 'একসঙ্গে যোগ দিই, সেই যোগ'।

এ রচনাবলীতে প্রথম খণ্ডে সুবোধবাবুর 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসটি স্থান পেয়েছে। এটা কেন জানি না বহুদিন অমুদ্রিত অবস্থায় ছিল। আমার স্পষ্ট মনে আছে—এর কভার এঁকেছিলেন, প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়। সুবোধবাবু যে সময় 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এই উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেন তখনই পাঠকেরা বুঝে গিয়েছিল, শুধু 'ফসিল' বা 'অযান্ত্রিকে'র মতো অসাধারণ ছোট গল্প নয়, একটি নতুন স্বাদের উপন্যাস রচয়িতা এক বলিষ্ঠ লেখকের আবির্ভাব ঘটলো। সেই সময়কার রাজনৈতিক ডামাডোলের চিত্র—যা তিনি এই উপন্যাসে প্রকাশ করেছিলেন—তা পরবর্তীকালের পুস্তকাকারে বের হবার সময় একটা সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রকাশককে কেউ কেউ ভয় দেখিয়েছিলেন—এই বই প্রকাশ করলে তাকে জেলে যেতে হবে।

সুবোধবাবু তখন অসুস্থ, হাসপাতালে। তিনি প্রকাশককে আমার কাছে পাঠালেন। আমি বললাম—আপনি অনায়াসে প্রকাশক হিসেবে আমার নাম দিতে পারেন। আমি জেলখাটা লোক, জেলে যেতে আপত্তি নেই।

তাই হয়েছিল। প্রথম সংস্করণে প্রকাশক হিসেবে আমার নামই ছেপে বের হয়েছিল। অবশ্য আমাকে শেষ পর্যন্ত তার জন্য জেল খাটতে হয়নি।

১৯৪০ সালের পয়লা জানুয়ারী আমি আর সুবোধবাবু একই সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দিই।...তার আগে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে প্রুফরিডারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, আর আমি ছিলাম যুগান্তর পত্রিকার একজন জুনিয়র সাব-এডিটর। আনন্দবাজার রবিবাসরীয় বিভাগে মন্মথনাথ সান্যালের তিনি ছিলেন সহকারী আর আমাকে যোগ দিতে হল দেশ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে। সেই সময় বর্মন স্ট্রীটের পূর্ব দিকে দোতলায় একটি ঘরেই ছিল দেশ ও আনন্দবাজারের রবিবাসরীয় দফতর।

আমরা একই ঘরে বসে এই দুই পত্রিকার সাহিত্য সম্পর্কিত কাজে নিযুক্ত ছিলাম। সুবোধবাবুকে সে সময় যেভাবে দেখেছিলাম, সেই স্মৃতি আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিরিশের কাছাকাছি বয়স, কিন্তু দেখে মনে হয় এখনও যেন যৌবনে পা দেননি। অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন তিনি, যাকে বলা যায় রোমান্টিক পুরুষ। কথা তিনি খুবই কম বলতেন। সব সময় দেখতাম, ডাকে আসা পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে পড়ায় মগ্ন হয়ে আছেন। কখনও বিভাগীয় সম্পাদকের নির্দেশে তিনি সেই পাণ্ডুলিপি সংশোধনে নিমগ্ন থাকতেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হত, এ মানুষটি বোধহয় খুবই অভিমানী ও গম্ভীর। কিন্তু দিনের পর দিন একঘরে বসে কাজ করতে করতে যখন মধুরভাষী মানুষটির হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়ার সুযোগ ঘটল, তখন দেখলাম যে, মানুষটি আসলে নীরব, নিরহঙ্কার,

মধুরভাষী। যাকে বলা যায় অত্যন্ত বন্ধুবৎসল এক আড্ডাবাজ মানুষ। আমাদের চাকুরী জীবন শুরু একই সঙ্গে। মারকাস স্কোয়ারের সংলগ্ন মারকাস বোর্ডিং-এ একই সঙ্গে পাশাপাশি দুটি ঘরে আমাদের প্রাকবিবাহ যুগের বেশ কয়েকটি বছর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সন্নিবেশে কেটেছে। সেই সময় সুবোধবাবুকে নানা দিক দিয়ে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে জানবার নানা সুযোগ আমার ঘটেছিল।

ওঁর চরিত্রের একটি গুণ যা আমাকে বরাবরই আকর্ষণ করেছে, তা হলো বাঙালী হয়েও 'বাঙালীয়ানা'র কোন ছাপ তাঁর মধ্যে সচরাচর দেখা যেত না। তার একটা কারণ তিনি বাংলাদেশের বাইরে মানুষ হয়েছিলেন। হাজারিবাগ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃঢ়তার প্রভাব তাঁর চরিত্রেও ছিল।...

সুবোধবাবু বাংলা সাহিত্যকে যে একটি উজ্জ্বলরত্ন দিয়েছেন, সেই 'ভারত প্রেমকথা' দেশ-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর 'শতকিয়া।' অন্য স্বাদের উপন্যাস। তাছাড়া ওঁর বহু গল্প—যা এই রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে—তার মধ্যে অনেকগুলোই দেশ পত্রিকায় বেরিয়েছে। তাঁর অন্যত্র প্রকাশিত রচনাগুলিও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকালীন মর্যাদা পাবে।

সুবোধবাবুর একটি গল্প সংকলন 'গল্প মণিঘর' শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল ও আমাকে উৎসর্গ করেছিলেন। লিখেছিলেন ঃ 'ভ্রাতৃপ্রতিম দুই বন্ধু—করকমলেষু....।'

প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আমরা একই প্রতিষ্ঠানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে এসেছি। আমাদের দুজনের সম্পর্ক ছিল অটুট বন্ধুত্বের, প্রগাঢ় সহমর্মিতার। আমাদের দুজনের ভাগ্য ছিল এক সুতোতেই গাঁথা। তাঁর মৃত্যুতে সেই সুতো ছিঁড়ে গেল। গেল কি? সত্যি?

সম্পাদকের কথা

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শংকর লিখেছেন ঃ

'পঞ্চাশ দশকে যখন আমার সাহিত্য ক্ষেত্রে কুণ্ঠিত প্রবেশ তখন সুবোধ ঘোষ খ্যাতির মধ্যগগনে। চল্লিশ দশকের যে বিস্ময় সৃষ্টির মধ্যে সাহিত্য গগনে তার উদয় তার রেশ কিছুটা কেটেছে, কিন্তু বিপুল পাঠক সমাজের কৌতূহলের অভাব নেই। সকলের মুখে তখন এক প্রশ্ন, তিনি আরও বেশি লেখেন না কেন? সুবোধ ঘোষ তার উত্তর দিতেন না, কিন্তু সাহিত্য কর্মের সঙ্গে যাঁরা কিছুটা যুক্ত তাঁরা সহজেই বুঝতে পারতেন, সুবোধ ঘোষ যে ধরনের গল্প লেখেন, তা বেশি লেখা যায় না, প্রতিটা গল্পের পেছনে থাকে গভীর চিন্তার অদৃশ্য ভিত্তিভূমি।'

সুবোধ ঘোষের রচনা সমগ্র সম্পাদনার সময় আমরা এটা মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। সত্যি, বেশি লেখেন নি তিনি। তিরিশ-বত্রিশটি উপন্যাস, তার মধ্যে আয়তনে বৃহৎ মাত্র তিন-চারটি (ত্রিযামা, শতকিয়া ও জিয়াভরলি), আর বাকীগুলি মাঝারি, কতগুলি তো ছোট উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে—যেমন সুজাতা, বর্ণালী, মুক্তিপ্রিয়া, কান্তিধারা, ছায়াবৃতা প্রভৃতি।

গল্পের সংখ্যাকে চার ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(ক) সেই অযান্ত্রিক, ফসিল থেকে শুরু করে সিরিয়াস আলোড়নকারী গল্প থেকে জীবন বিচিত্রার বহু দিক, ব্যক্তি ও মানসিকতা নিয়ে কাহিনীর মধ্য দিয়ে হাল্কা মিষ্টি প্রেমের গল্প যার সংখ্যা প্রায় ১৬০।

(খ) ভারত প্রেমকথা—২০

(গ) কিংবদন্তীর দেশে—৩১

(ঘ) পুতুলের চিঠি—৮

(ঙ) ক্যাকটাস (জীবজগৎ পশু-পাখি-অরণ্য)—১৪

তাই যার মাত্র তিরিশটি উপন্যাস ও আড়াইশোর কম গল্প (পেশাগত সাহিত্যিক জীবন মধ্য চল্লিশ দশক থেকে সত্তর দশকে শেষ, অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ বছর। তাও একটানা নয়—হঠাৎ হঠাৎ কলম থেমে গেছে—বিশেষ করে জীবনের শেষ অধ্যায়ে) তিনি অবশ্যই পরিমাণের দিক দিয়ে বেশি লেখেননি (তাঁকে ঠিক prolific writer বলা যায় না সেই অর্থে)—যার জন্য গণিতের দিক থেকে বিচার করে তাঁর সমগ্র রচনা বর্তমান বিজ্ঞানের মুদ্রণ যন্ত্রে ৬০০০ পাতার মধ্যে হয়তো সীমাবদ্ধ করা সম্ভব। এবং এর মধ্যে অবশ্যই তাঁর বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ, রম্যরচনা এবং একটি গীতিনাট্যকেও ধরা হয়েছে।

তাই আমরা হয়তো দশটি খণ্ডের মধ্যে তাঁর সমগ্র সাহিত্যিক ফসলকে গোলায় ভরে ফেলতে পারব, যা অন্যান্য সাহিত্যিকদের তুলনায় অনেক কম—পূর্বসূরী তারাশংকর, বিভূতিভূষণ—সমসাময়িক বিমল মিত্র বা উত্তরসূরী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—যেই হোক না কেন। শংকর সুবোধ ঘোষকে মহৎ স্রষ্টাদের পূর্ণকুম্ভ মেলায় 'নিজস্ব মহিমা' নিয়ে বিরাজ করার কথা বলেছেন। তাঁর জীবনসংগ্রামও বড় বিস্ময় জাগানো জীবন কথা, কিছু লিখিত, কিছু লোকমুখে শোনা যায়। গল্প-উপন্যাস ছাড়াও নানা বিষয়ে গবেষণামূলক রচনা লিখেছেন তিনি, তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে। প্রধানত

ছোটগল্প লেখক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও তাঁর কলম দিয়েই বেরিয়েছে বিভিন্ন বই যার বিষয় মনস্তত্ত্ব (ফ্রয়েড), কারুশিল্প (শিল্পভাবনা/রঙ্গবল্লী), আদিবাসী সমাজ, সামরিক বিজ্ঞান, গান্ধীজীবনী, নৃতত্ত্ব ও সমাজ বিজ্ঞানের কথা। বিচিত্রপথে যাওয়া তাঁর রচনার এই 'সর্বত্রগামী' দিকটা বহুলাংশে অজানা বলে আমাদের মনে হয়েছে। তাই বোধ হয় চিন্তামণি কর মন্তব্য করেছেনঃ 'গল্প উপন্যাস পুরাকাহিনী প্রভৃতি লেখার জন্য এই লেখকের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সুবিদিত থাকলেও নাট্য, সংগীত, পুরাতত্ত্ব, রূপকথা সম্বন্ধে তাঁর আন্তরিক ও গভীর পরিজ্ঞানসম্ভূত প্রবন্ধগুলি বহুজনের প্রায় অজানা ছিল।'

ষষ্ঠ খণ্ডে তিনটি উপন্যাস স্থান পেয়েছে—নাগলতা, কালকেতু ও এসো পথিক। 'কালকেতু' সুবোধ ঘোষের শেষ উপন্যাস। পূজা সংখ্যা আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়েছিল। 'নাগলতা' অবলম্বনে যে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল, তার নাম 'শিউলিবাড়ি।' মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন উত্তমকুমার ও অরুন্ধতী দেবী। বলে রাখা ভাল, নানা কারণেই আমরা প্রথাগত সন-তারিখ বা কালক্রম অনুযায়ী খণ্ডগুলোকে সাজাইনি। আমাদের উদ্দেশ্য প্রতিটি খণ্ড যেন একেকটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে বর্ণবিচিত্র হয়ে ওঠে। তাই ষষ্ঠ খণ্ডে আছে তিনটি উপন্যাস, ষোলোটি সামাজিক গল্প এবং 'ভারত প্রেমকথা' থেকে দুটি, 'কিংবদন্তীর দেশ' থেকে পাঁচটি গল্প। এ ছাড়া যুক্ত হয়েছে 'ক্যাক্টাস' থেকে নেওয়া তিনটি গল্প যার বিষয়বস্তু প্রকৃতি-জীবজগৎ ও মানুষের পারস্পরিক বৈচিত্র্য। এই গল্পগুলি লেখকের জীবনের শেষ দিকের লেখা।

অল্পকথায়, এই রচনা সমগ্র সম্পাদনায় আমরা চেয়েছি প্রতিটি খণ্ডে সুবোধ-প্রতিভার 'কামিনী-কাঞ্চন যোগ হোক (বলা বাহুল্য—বিশেষণটি এখানে রচনাগুলোর বৈশিষ্ট্যের ঐশ্বর্যের কথা ভেবে বলা হয়েছে)। কালপঞ্জি বা অ্যাকাডেমিক পাঠক্রম হিসাবে সাজালে পরিবেশন রসলাভের দিক থেকে ততটা সার্থক হতো না বলে আমাদের মনে হয়েছে। পাঠকরা এটাই বিচার করবেন।

সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের মূল্যায়নটা আমাদের কাছে সম্পাদনার মানদণ্ড স্থির করতে সাহায্য করেছে ঃ 'তিনি (সুবোধ ঘোষ) সাহিত্য করেছেন। শতকরা একশোভাগ সাহিত্য। ...আছে সচেতন বিদ্রোহ, সেই কারণে তিনি এক ভিন্ন নামের নদী। স্রোত কম, অবগাহনে তৃপ্তি। ....সব্যসাচী, অজাতশত্রু।'

মহাশ্বেতা দেবী বলেন, 'যে লেখক পরুষ, রুক্ষ ঋজুতা থেকে সহজ সাবলীল মিষ্টিলেখা—তা থেকে সংস্কৃত কাব্যের মতো অলংকার ঝংকৃত বাংলায় এমন অনায়াসে যাতায়াত করতে পারেন, তিনিই সুবোধ ঘোষ।' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন—'ছাত্র বয়সে 'দেশ' পত্রিকা পেলেই দুজনের গল্প আগে পড়ে ফেলতাম—পরশুরাম ও সুবোধ ঘোষ। বাংলার ছোট গল্পের সেই স্বর্ণযুগে কারুর সঙ্গে কারুর তুলনা চলে না। তবু এক একজন লেখক সম্পর্কে কিছু কিছু পাঠকের পক্ষপাতিত্ব থাকেই। আমার পক্ষপাতিত্ব ছিল সুবোধ ঘোষ সম্পর্কে—যাকে ব্যক্তিজীবনে তাঁর 'দূর থেকে দেখা।'

সন্তোষকুমার ঘোষ একটি রচনার শীর্ষনাম দিয়েছিলেন —'যে বনস্পতির নাম সুবোধ ঘোষ।'

সমরেশ মজুমদার প্রশ্ন করেছেন নিজেকেই—'এখনও নিজের লেখার পাশে ওঁর লেখা রেখে দেখতে পেলেই লজ্জা পাই....ইনি অবশ্যই আমার পূর্বসূরী, কিন্তু আমি, আমরা কতটা উত্তরসূরী?'

আশাপূর্ণা দেবী মুগ্ধ হয়ে লিখেছেন ঃ তিনি এলেন, দিলেন, জয় করলেন, 'এই 'দিলেন' শব্দটা লেখিকার তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন—শেক্সপীয়ারের নাটকের বিখ্যাত উক্তি 'vidi'-র (দেখলাম-এর) পরিবর্তে।

সম্পাদনা করতে করতে সম্পাদক হিসেবেই কিছু স্বাভাবিক প্রশ্ন মনে জাগে। বোধ হয় এই ধরনের প্রশ্ন পাঠকদের হয়েই আমরা উপস্থাপনা করতে পারি। সবচেয়ে ভাল, একটি জিজ্ঞাসা আমাদের ভাষায় না বলে, এক প্রসিদ্ধ প্রকাশনা সংস্থার জ্যাকেটে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচিতির উল্লেখ করলেই পরিষ্কার হতে পারে। তাঁরা লিখেছেন ঃ

'...প্রথম গল্প অযান্ত্রিক। বন্ধুদের অনুরোধে লেখা, এরপর ফসিল। বাংলা সাহিত্যে বিস্ফোরণ জাগিয়ে আবির্ভাব। বহু গল্প-উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত। আনন্দ পুরস্কার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদক। এছাড়া অন্য পুরস্কার পাননি। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবের মতোই বিস্ময়কর এই ঘটনা।'....

সম্পাদনার কাজ করতে করতে যখন মহাশ্বেতা দেবীর কথা স্মরণ বিশেষ ভাবে করছি (আবার হব মুগ্ধ'), তখন এই 'বিস্ময়কর ঘটনাটা' পাঠকের দৃষ্টিতে একটা বিরাট প্রশ্ন চিহ্ন থেকে গেছে বলে মনে হয়েছে। রচনা সমগ্রের 'সম্পাদকের কথা'য় তাই তার উল্লেখ বা পুনঃ-উল্লেখ। উত্তরের জন্য নয়, আক্ষেপ হিসেবে নয়, —শুধু সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রশ্নটিকে স্থায়ী স্থানদানের জন্য, পরবর্তী প্রজন্মকে এই বিষয়ে সতর্ক করার দায় অনুভব করেছি আমরা।

তাই বোধ হয় শংকরের দুঃসাহসী মন্তব্য ঃ 'অনেকের কীর্তন গাইবার দল থাকে, সুবোধ ঘোষের (সেসব) কিছু নেই।'

উত্তম ঘোষ
সমীরকুমার নাথ

সূচীপত্র

উপন্যাস

গল্প

ভারতপ্রেমকথা

কিম্বদন্তির দেশে

ক্যাকটাস

নাগলতা

একবার দেখলে অনেকবার মনে পড়বে; আর, একদিন দেখলে অনেকদিন মনে থাকবে—এ রকম একটি চেহারা। চোখ দুটি বেশ টানা-টানা; কিন্তু দুই চোখেরই কোল দুটো বেশ কুঁচকে গিয়েছে, এবং বোধহয় সেই জন্যেই মনে হয়, সব সময় হাসছে চোখ দুটো। তাছাড়া, কাঁচাপাকা একজোড়া গোঁফও একটু শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে। তাই বোধহয় মনে হয়, যেন ঠোঁটের উপর একটা হাসির ছায়া লুটিয়ে পড়েছে।

বারো মাস ওই একই সাজ: খাকি কামিজ, খাকি হাফ-প্যান্ট আর খাকি মোজা; দু'পায়ে কালো চামড়ার একজোড়া ভারি বুট। আর মাথায় একটা হ্যাট।

হ্যাটটা শোলার, কিন্তু মাঝে মাঝে খেজুর পাতার হ্যাটও তাঁকে পরতে দেখা যায়। এ জিনিসটা তাঁর নিজেরই হাতের কারুকলার একটি কীর্তি। কেউ শিখিয়ে দেয়নি, কারও কাছ থেকে দেখা-শেখা ব্যাপারও নয়। নিজেই ভেবে-চিন্তে, বার-বার পরীক্ষা করে, শুধু একটা পেন্সিল-কাটা ছুরির সাহায্যে তিনি খেজুর-পাতার হ্যাট তৈরি করে থাকেন।

একটা একনলা বন্দুক, সেটা কখনও পিঠের সঙ্গে আবার কখনও বা তাঁর সাইকেলের রডের সঙ্গে বাঁধা থাকে। ষাট বছর বয়স, তবু এই সেদিনও তিনি ষাট মাইল পথ সাইকেল চালিয়ে সেই কুলডিহা থেকে এই শিউলিবাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। মাসটা ছিল আষাঢ়, সারা দিনে তিন পশলা জোর বৃষ্টিও হয়েছিল। কিন্তু ঠিক সময়মত, অর্থাৎ সন্ধ্যার জোনাকি জ্বলে উঠতেই বাড়ির দরজার কাছে এসে সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়ে ডাক দিয়েছেন—আমি এসেছি নিরু।

লোকে জানে, প্রতিবেশীরাও শুনে আসছে, রোজই ঠিক সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে ঠিক এইরকম একটি স্বস্তিময় স্বরে, ঠিক এইভাবেই ঘণ্টি বাজিয়ে ডাক দিয়ে থাকেন এই ভদ্রলোক : আমি এসেছি নিরু।

ঘরের ভিতর থেকে লণ্ঠন হাতে দরজার কাছে এগিয়ে আসেন নিরুপমা। মাঝে মাঝে নিরুপমাকেও কথা বলতে শোনা যায়। যেন একটু বেশি খুশি হয়ে আর হেসে কথা বলছেন নিরুপমা—এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে, এখনও তো জোনাকি জ্বলেনি।

ভদ্রলোক হাসেন—আমি ঠিক সময়েই ফিরেছি। সন্ধ্যাটাই আসতে একটু দেরি করেছে।

সেই ভোজপুরী হালুয়াই রামসিংহাসন আজও বেঁচে আছে; রামসিংহাসন জানে, বাঙালীবাবু আজ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ঠিক সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে এসে আর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়েছেন, আর, বউকে নাম ধরে ডেকেছেন।

আজকাল অর্থাৎ এই পাঁচ বছর ধরে বাঙালীবাবু কিন্তু মাঝে মাঝে অন্য একটা নাম ধরেও ডাকেন—আমি এসেছি নন্দু।

ঘরের ভিতর থেকে লণ্ঠন হাতে নিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে আসে সুনন্দা। সুনন্দাকেও মাঝে মাঝে বলতে শোনা যায়—আজ কিন্তু একটু দেরি করেছ বাবা।

রামসিংহাসন শুনতে পায়, বাঙালীবাবু তাঁর মেয়ের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছেন—আমার দেরি হয়নি নন্দ, সন্ধ্যাটাই একটু তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে গেছে।

রামসিংহাসনের বাড়িটা এমন কিছু দূরে নয়। বাঙালীবাবুর বাড়ি আর রামসিংহাসনের বাড়ি, মাঝখানে শুধু একটা পেঁপে বাগানের ব্যবধান।

এই শিউলিবাড়ির কে না চেনে বিজনবাবুকে? কিন্তু বিজনবাবু নামটাকে কেউ জানে বলে মনে হয় না। জানে শুধু তারা, যারা আজকাল মাঝে মাঝে এখানে কলকাতা থেকে হাওয়া বদলাতে আসে আর বিজনবাবুর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়ে নাম জিজ্ঞাসা করে।

বিজনবিহারী রায়, আজ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে এখানে আছেন। এই রেললাইন আর এই শিউলিবাড়ি স্টেশনও যখন হয়নি, তখন থেকে তিনি এখানে আছেন। আর্থ-কাটিং অর্থাৎ মাটি-কাটার ঠিকেদারী করেন ভদ্রলোক। পাব্লিক ওয়ার্কসের, রেলের আর জেলা বোর্ডের যত কন্ট্রাক্টর, আর মাটিকাটা যত মজুর, সকলেই বিজনবাবুকে যে-নামে চেনে আর ডাকে, সেটা একটা অন্য নাম—মাটিসাহেব। পাঞ্জাবী কন্ট্রাক্টরেরা বলে—মিট্টিসাব।

মাটিসাহেব বিজনবাবুর খাকি-সাজের রঙ; তাছাড়া মুখটার, হাঁটু দুটোর আর কনুই থেকে আঙুল পর্যন্ত হাত দুটোরও রঙ, যদিও দেখতে মেটে-মেটে বলে মনে হবে, কিন্তু তাঁর কামিজের কলারটা একটু এলিয়ে পড়লেই দেখা যাবে, কী চমৎকার ফরসা একটা গায়ের রঙ খাকি কামিজের আড়ালে ধবধব করছে। কোন সন্দেহ নেই, পঁয়ত্রিশ বছর ধরে একটানা মাটি-কাটা ঠিকেদারীর জীবন, যত পাহাড়ী ডাঙার ধুলো, শাল-জঙ্গলের হাওয়া, আর বারো মাসের রোদ-জল-হিম বিজনবাবুর পরিশ্রমের শরীরটার যেটুকু ছুঁতে পেরেছে, সেটুকু মাটি-রঙ করে ছেড়েছে।

তিনি যখন এখানে এসেছিলেন, তখন এ-জায়গাটার কোন নামই ছিল না। পালামৌ জেলা বোর্ডের রাস্তাটা এখানে এসে রাঁচি যাবার সড়কটার সঙ্গে মিশেছে; তাই এখানে সড়কের পাশে শুধু একটা সরাই ছিল, একটা হালুয়াইয়ের দোকান ছিল, আর মহুয়া চোলাই করবার একটা ভাঁটি ছিল। পঁয়ত্রিশ বছর আগে রেললাইনের জন্য মাটি কাটবার ঠিকেদারী নিয়ে বিজনবাবু এখানে এসে সেই সরাইয়ের একটা ঘরে ঠাঁই নিয়েছিলেন। সরাইয়ের পিছনে একটা মহুয়ার নিচে সারা রাত ধরে দুই নেকড়ের মারামারি আর ঝগড়ার শব্দও শুনেছিল সেদিনের যুবক বিজনবিহারী।

কিন্তু, সেজন্য জায়গাটার উপর একটুও রাগ করেনি বিজনবিহারী; কোনও ভয় নয়, একটু বিরক্তিও নয়। বরং, ঠিক একটি বছর পরে, সড়ক থেকে একটু দূরে মাঠের উপর কাঁচা ইঁটের দেওয়াল-দেওয়া একটি বাড়ি তৈরি করেছিল বিজনবিহারী। তারপর একদিন সেই বাড়িতে ঢুকে আর হেসে হেসে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বেলেছিল নিরুপমা।

চারদিকে জঙ্গল, কাছে ও দূরে ছোট বড় পাহাড়, সড়ক দিয়ে সারাদিনে একবার মাত্র জোড়া উটের ডাকগাড়ি যায় আর আসে; তাও সপ্তাহে তিন-চার দিন বাদ যায়। এহেন এক জগতে বাঙালী বিজনবিহারীর ওই কাঁচা-ইঁটের বাড়িটাই হল প্রথম গৃহস্থের বাড়ি; যে বাড়ির চারদিকে চারটে শিউলির চারাকে বিজনবিহারী নিজের হাতে রোপণ করেছিল; আর বাঁচিয়ে রাখার জন্য অনেক যত্নও করেছিল।

নিরুপমা হেসে হেসে বলেছিল—বাংলাদেশের শিউলি, এই পাথুরে মাটিতে বেঁচে থাকতে পারবে কি?

খুব পারবে। আমি পারিয়ে ছাড়ব। বাংলাদেশের শিউলি বলে নয়, সেদিনের পঁচিশ বছর বয়সের বিজনবিহারীর কাছে সে শিউলির আরও একটা মায়া ছিল। সে-বড় অদ্ভুত মায়া।

কিছুদিন আগে সড়কের মোড়ে উটগাড়িটার চাকা ভেঙে আর বিকল হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল; আর, একজন যাত্রী গাড়ি থেকে নেমে বিজনবিহারীর সঙ্গে আলাপ করেছিল:—আমার নাম পীতাম্বর। বাড়ি কটক। সাসারামে সিংহবাবুদের বাড়িতে মালীর কাজ করি।

এই পীতাম্বরের সঙ্গের একটা ঝুড়িতে একগাদা চারা গাছ দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল বিজনবিহারী—ওগুলি কি?

পীতাম্বর—শিউলির চারা। বাংলাদেশের শিউলি। নেবেন কয়েকটা?

বিজনবিহারী—না।...আচ্ছা দাও।

নিরুপমাকেও বলতে ভুলে যায়নি বিজনবিহারী—হঠাৎ মনে হল, বাংলাদেশের শিউলি মানে তুমি। তাই নিলাম! তা না হলে বাংলাদেশী জিনিস আমি ছুঁতামও না।

বিজনবিহারীর নিজের হাতে রোপা সেই শিউলিতে যেদিন ফুল ধরেছিল, সেদিন ভোজপুরী হালুয়াই রামসিংহাসন একটু আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেছিল—কওন ফুল বা?

শিউলি।

শিহুলি?

নেহি নেহি, শিউলি বোলিয়ে।

শিউলি! শিউলি! রামসিংহাসন বেশ খুশি হয়ে হেসেছিল।

কাঁচা ইঁটের সেই বাড়ির সামনে একটা কুয়ো কাটিয়েছিল বিজনবিহারী। ডিনামাইট দিয়ে পাথর ফাটিয়ে কুয়ো কাটা। বিজনবিহারী সেদিন সেই জংলী নিভৃতের শান্ত বুকটার উপর যেন প্রচণ্ড এক বিস্ময়ের বিস্ফোরণ ঘটেয়েছিল। আট ক্রোষ দূর থেকে মুণ্ডা নরনারী আর ছেলে-মেয়ের দল সে দৃশ্যও দেখতে এসেছিল; যদিও রামসিংহাসন ভয় পেয়ে আর ঝাঁপ নামিয়ে দোকান বন্ধ করে দিয়ে তিন ক্রোশ দূরের একটা বুড়ো বটের কাছে গিয়ে বসেছিল।

বিজনবিহারীর কুয়োর জলের সুনাম চারদিকে রটে যেতে বোধহয় এক মাসেরও বেশি সময় লাগেনি। যেমন মিঠা তেমনই ঠাণ্ডা চমৎকার জল। প্রথম সার্ভিস বাসের ড্রাইভার সড়কের মোড়ে বাস থামিয়েই খালাসীকে ডাক দিত—চল জী, শিউলি-বাড়ির কুয়োর জল খেয়ে আসি।

কেউ চেষ্টা করে নামটাকে তৈরি করেনি; যেন মানুষের ভাষা নিজেরই খুশিতে মুখর হয়ে বাঙালি বিজনবিহারীর কাঁচা-ইঁটের বাড়িটাকে শিউলিবাড়ি নাম দিয়ে ফেলেছিল!

দুটো বছর যেতে না যেতেই বিজনবিহারী দেখেছিল, বাস সার্ভিসের টিকিটে একটা নতুন জায়গার নাম ছাপা হয়েছে—শিউলিবাড়ি।

আরও তিনটে বছর পরে যখন রেললাইন হল, আর স্টেশনটা তৈরি হল, তখন দেখা গেল, প্ল্যাটফর্মের উপর মস্তবড় কাঠের বোর্ডের উপর ইংরাজীতে স্টেশনের নামটা নতুন রঙে লেখা হয়ে ঝলমল করছে—শিউলিবাড়ি।

এই ইতিহাসটা জেলা গেজেটিয়ারে লেখা নেই, কিন্তু এটা একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্য একটা ইতিহাস। শিউলিবাড়ি নামটা এক মাটি-কাটা ঠিকেদারের, বাঙালী বিজনবিহারীর, আজকের এই মাটি-সাহেবেরই জীবনের একটা ঘটনার দান। তা না হলে, চারিদিকের যত ডিহা-ডিহির মধ্যে একটা জায়গার নাম শিউলিবাড়ি হয়ে যেতে পারত না।

রাতের অন্ধকারে সড়কের মোড়ে দাঁড়িয়ে যখন কোন আদিবাসী ওঝা কিংবা মুখিয়ার সঙ্গে

মুণ্ডারী ভাষায় গল্প করেন মাটিসাহেব, তখন কারও সন্দেহ করবারও সাধ্যি হয় না যে, বাঙালী বিজনবিহারী রায় কথা বলছেন। শুধু কথা নয়, মুণ্ডারী ভাষায় গানও গাইতে পারেন মাটিসাহেব! এই সেদিনও তাঁকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে, জেলা বোর্ডের কাঁচা সড়কের উপর গাছতলায় দাঁড়িয়ে মুণ্ডারী ভাষায় ছড়া কাটছেন, আর মাটি-কাটা মেয়ে মজুরের দল হেসে লুটিয়ে পড়ছে।

আজকের শিউলিবাড়ির চেহারা দেখে কারও কল্পনা করবার সাধ্যি নেই যে, পঁয়ত্রিশ বছর আগে এখানে শুধু শাল-জঙ্গলের ছায়ায় ঘেরা নিতান্ত দীনহীন একটা সড়কের মোড়ে ততোধিক দীনহীন তিনটে মাটির ঘর শুধু পড়েছিল। নেকড়ের উপদ্রবের জন্য দিনের বেলাতেও কোন গরুর গাড়ি এই পথে একলা যেতে সাহস পেত না। আজকের শিউলিবাড়িতে, স্টেশনের দিক থেকে এগিয়ে এসে সর্দার সুচেত সিং-এর সেগুনের আসবাবের প্রকাণ্ড দোকানটা পার হলেই অন্তত চারটে বেশ ভাল চেহারার স্টেশনারি দোকান দেখতে পাওয়া যাবে। আর, তার পাশেই আছে পর পর তিনটে ফলের দোকান। চারদিকের যত কোলিয়ারির মালিক আর ম্যানেজারের গাড়ি, প্রতিদিন অন্তত আট-দশটা গাড়ি এখানেই আসে আর সওদা করে চলে যায়।

তাছাড়া, শিউলিবাড়ির দক্ষিণের গা ঘেঁষে চমৎকার চেহারার যত বাংলো গড়নের বাড়ি দেখা যায়, সেগুলির বেশির ভাগই বাঙালীর বাড়ি। অনেকদিন আগেই শিউলিবাড়ির জল-হাওয়ার সুনাম কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এমনিতেই নয়, এই মাটিসাহেবই রেল-বিভাগের অনেক বড়-বড় বাঙালী অফিসারকে বুঝিয়েছিলেন, আর তাঁদেরই দিয়ে শিউলিবাড়ির স্বাস্থ্যের গৌরব প্রচার করেছিলেন। শীতের সময় এইসব বাড়ির কোনটাই খালি থাকে না। বাড়ির মালিকেরা নিজেরাও সপরিবারে আসেন; আবার চার-পাঁচ মাসের ভাড়াটে হয়েও অনেকে আসেন। সে-সময়ে এক-একদিন শিউলিবাড়ির শান্ত কুয়াশাভরা সন্ধ্যার বুকে যেন নতুন দীপালীর আনন্দ মুখর হয়ে হেসে ওঠে। ছোট ছোট ছেলেরা একলব্য অভিনয় করে। আর, ত্রৈলোক্য অপেরা এসে সুভদ্রাহরণ গেয়ে চলে যায়।

হাওয়া বদলাতে কলকাতা থেকে বাঙালীরা যাঁরা আসেন, শুধু তাঁরা নন, বদলি হয়ে স্টেশনের নতুন স্টাফ হয়ে বাঙালী কর্মচারী যাঁরা আসেন, তাঁরাও দেখে আশ্চর্য হয়ে থাকেন, শিউলিবাড়ির বাজারে কইমাছ কিনতে পাওয়া যায়। সে কইয়ের স্বাস্থ্যের তুলনায় যশোরের কইও রোগাটে। দামও অন্তত কলকাতার বাজারের চেয়ে কম গলা-কাটা। শিউলিবাড়ির চারদিকে ঝুমরা রাজ এস্টেটের যত ঝিল আছে, তার প্রায় সবগুলিই কইমাছে ভরে গিয়েছে।

আরও নানা বিস্ময়ের চেহারা শিউলিবাড়ির এই ছোট্ট বাজারেই দেখতে পাওয়া যাবে। হালুয়াই রামসিংহাসনের দোকানে সরপুরিয়া আর ক্ষীরমোহন পাওয়া যাবে। আদিবাসী মেয়েরাও ঝুড়ি-ভর্তি মুড়ির মোয়া নিয়ে বাজারের ভিতরে এক সারিতে বসে আছে। রাঁচির পাইকারের লোকজন চাঁপা কলার কাঁদি কেনবার জন্য এই শিউলিবাড়ির বাজারে এসে ভিড় করেছে; দশ বছর আগে ওরা শেওড়াফুলিতে যেত।

তিন দিকে পাহাড় আর প্রায় চারদিকেই জঙ্গল—বাংলাদেশ থেকে এত দূরের একটা নিরালার বুকের যত কাঁকড় আর পাথরের উপর কে যেন আলাদীনের প্রদীপের সেই অদ্ভুতকর্মা দাস-দানবটির মত শক্তিধর হয়ে বাংলাদেশের মাটির যত সাধ তুলে নিয়ে এসে ছড়িয়ে দিয়েছে।

অনেকেই জানেন, এই সবই মাটিসাহেব বিজনবাবুর পঁয়ত্রিশ বছরের একটা একরোখা চেষ্টার

কীর্তি। অনেকে শুনেছেন, ভদ্রলোক এই পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে একদিনের জন্যও এই শিউলিবাড়ি ছেড়ে থাকেননি। হালুয়াই রামসিংহাসনও ভেবে পায় না, মাটিসাহেব কেন এই পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে একদিনের জন্যও নিজের দেশে গেল না?

ফিকে সবুজ রঙের চেহারার যে শৌখিন বাড়িটার দরজায় বাঘছালের পর্দা ঝুলছে, সেই বাড়ির মালিক মিস্টার দস্তিদার একদিন মাটিসাহেব বিজনবিহারী রায়কে বাড়িতে ডেকে নিয়ে আর বেশ খুশি হয়ে গল্প করেছিলেন।—আপনাকে দেখলেই আমার স্যার সেসিল রোডসের জীবনের যত ঘটনার গল্প মনে পড়ে যায়। জঙ্গলের যত জংলীপনাকে মেরে-কেটে সরিয়ে আপনিও যে একটা উপনিবেশ তৈরি করে ফেলেছেন মশাই। শিউলিবাড়ি যে সত্যিই আপনার রোডেসিয়া। আপনি সত্যিই একজন ফার্স্টক্লাস অ্যাডভেঞ্চারার।

মাটিসাহেব যেন লজ্জিত হয়ে আর মাথা হেঁট করে হেসেছিলেন। কোন কথা বলতে পারেননি।

মিস্টার দস্তিদার—শুনেছি, জুপলা পাহাড়ের উত্তরের ওই জঙ্গলের ভেতরে বলবলা নদীর প্রপাতটা আপনিই আবিষ্কার করেছিলেন।

মাটিসাহেব তাঁর পিঠের বন্দুকটাকে একবার কাঁধ দুলিয়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বিনীতভাবে হেসেছিলেন—আমিই ওই সাংঘাতিক ঝর্ণাটাকে একদিন খুঁজে বের করেছিলাম। তাছাড়া, আপনাদের ওই দামোদরের উৎসটাকেও...

মিস্টার দস্তিদারের চোখ দুটো আরও খুশি হয়ে চমকে ওঠে—সেটাও কি আপনি খুঁজে বের করেছেন?

মাটিসাহেবের চোখ দুটো ঝিকঝিক করে।—আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনদিন ধরে একাই হেঁটে, হেঁটে, আর শুধু পাকা বটফল খেয়ে...। বলতে বলতে যেন আরও লজ্জিত হয়ে, শেষে নীরব হয়ে যান মাটিসাহেব।

মিস্টার দস্তিদার কিন্তু ছাড়েন না।—বলুন বলুন, থামলেন কেন?

মাটিসাহেব—সে জায়গাটার নাম হল চুল্‌হাপানি। পাহাড়ের গায়ে এক জায়গায় ছোট্ট চুলের মত একটা গর্তের উপর টুপ্ টুপ্ করে একটা চোরা ঝর্ণার জল ফাটা পাথরের ভেতর থেকে ঝরে পড়ছে। এই তো...আপনার ওই মহাদেব ঢোড়া, বোদা পাহাড় আর ধওরা পাহাড় পার হয়ে, ল্যাটারাইটের খাদান ছাড়িয়ে যে পাহাড়টা, সেটারই প্রায় মাথার কাছে একটা বুড়ো পাকুড়ের পায়ের তলায় উৎসটা গুব্‌গুব্ করছে। ওদিকের দামোদরটার আমি একটা নামও দিয়েছিলাম স্যার।

কি বললেন?

হ্যাঁ স্যার, আমি নাম দিয়েছিলাম দেবনদ। ওদিকের গাঁয়ের লোক আজও কিন্তু ওই নাম বলে থাকে স্যার; দামোদর বললে ওরা বুঝতে পারে না।

খুব করেছেন! অদ্ভুত কাণ্ড করেছেন! হেসে হেসে চেঁচিয়ে ওঠেন মিস্টার দস্তিদার।

মাটিসাহেব—ডেপুটি কমিশনার হার্বার্ট সাহেব কিন্তু শুনে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

কি বললেন?

দামোদরের উৎসের খবরটা আর জায়গাটার একটা ম্যাপ এঁকে আমি জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু চেয়ারম্যানের ভাইপো রঘুবাবু আমাকে এসে বললেন, সাবধান,

দামোদরের উৎস ওই চুল্‌হাপানি চুল্‌হামে যায়; আপনি এসব ব্যাপার নিয়ে কখ্‌খনো লেখালেখি করবেন না।

মিস্টার দস্তিদার আশ্চর্য হন—কেন? এরকম ভয় দেখাবার মানে কি?

মাটিসাহেব হাসেন—হার্বার্ট সাহেব চেয়ারম্যানকে জানিয়েছিলেন, আমার ঠিক পনের দিন আগে তিনিই দামোদরের উৎসটা আবিষ্কার করেছিলেন।

মিস্টার দস্তিদারও হেসে ফেলেন।

আর-একবার, সে বছর এখানে হাওয়া বদলাতে কলকাতা থেকে এসেছিলেন প্রফেসর বিনোদ দত্ত। তিনিও একদিন আশ্চর্য হয়ে মাটিসাহেব বিজনবাবুকে চা খেতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

প্রফেসর বিনোদ দত্ত বললেন—আপনাকে দেখলে আমার সত্যিই সেই পিলগ্রিম ফাদারদের কথা মনে পড়ে। দুঃসাহসে আপনিও কম যান না মশাই। তাছাড়া, এ-তো আর অ্যাডভেঞ্চারারদের মত শুধু কথা কাটাকাটি করবার দুঃসাহস নয়। আপনি সেই পিলগ্রিম ফাদারদেরই মত জঙ্গল সরিয়ে সেখানে দেশের যত ফুল ফুটিয়েছেন, ফল ফলিয়েছেন। আপনাকে হাজার ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করে মশাই।

মাটিসাহেব তাঁর সেই অদ্ভুত নম্রতার ভঙ্গিতে, লজ্জিত হয়ে আর মৃদুভাবে হেসে, মাথা হেঁট করে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেন।

প্রফেসর বিনোদ দত্ত যেন মুগ্ধ হয়ে বলেন, আপনি নাকি জঙ্গলের গাঁয়ে বাংলা ভাষা-টাষাও চালাতে চেষ্টা করেছেন।

ভাষা নয় স্যার, একটা গান চালিয়েছিলাম।

কিসের গান?

বাংলা গান।

কি গান?

হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল।

বলেন কি? এ-গান এখানে চলেছে?

হ্যাঁ স্যার। রাতু চিলোয়া আর মুরি পাহাড়ের মুণ্ডাদের আর ওরা ওঁদের ছেলেমেয়েরাও এ-গান গাইতে পারে।

প্রফেসর বিনোদ দত্ত যেন মুগ্ধ হয়ে মাটিসাহেব বিজনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।—আপনি একটা অলৌকিক কাণ্ড সম্ভব করেছেন। ধন্যবাদ আপনাকে, হাজার ধন্যবাদ।

কিন্তু আজ এই সাত দিন হল কলকাতা থেকে হাওয়া বদলাতে এসেছেন যিনি, রিটায়ার্ড হেডমাস্টার করালীবাবু, তিনি আজ মাটিসাহেব বিজনবাবুর সঙ্গে দেখা হতেই নাক কাঁপিয়ে একটা অদ্ভুত হাসি হেসেছেন।

মাটিসাহেব বিজনবাবু কিন্তু তাঁর স্বভাবসুলভ সেই লজ্জিত হাসিটাকেই আরও নরম করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—আপনি নতুন এসেছেন বলে মনে হচ্ছে স্যার?

করালীবাবু—হ্যাঁ, আমি নতুন এসেছি, আর আপনার নামও শুনেছি। কিন্তু চিনতেও পেরেছি।

মাটিসাহেব—আজ্ঞে?

করালীবাবু হাসেন—আপনি তো একজন মিউটিনিয়ার।

মাটিসাহেব—আজ্ঞে?

করালীবাবু—বুঝলেন না?

মাটিসাহেব—আজ্ঞে না।

করালীবাবু—মিউটিনি...অর্থাৎ মস্ত একটা বিদ্রোহের কাণ্ড করেছেন. আর সেই জন্যে ইচ্ছে করে এখানে এসে একটা বনবাস খুঁজে নিয়েছেন। নয় কি?

মাটিসাহেবের লাজুকহাসির মুখটা সেই মুহূর্তে শোকার্তের মুখের মত করুণ বিষাদে ভরে যায়।

পঁয়ত্রিশ বছর ধরে রোজ সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়েছেন যিনি, সেই মাটিসাহেব বিজনবিহারী রায় আজ সন্ধ্যা হতে ঘরে ফিরেও দরজার সামনে যেন হতভম্বের হত থমকে দাঁড়িয়েছেন, ঘণ্টি বাজাতেই ভুলে গিয়েছেন। ঘণ্টি বাজাবার শক্তিটাও যেন হঠাৎ অলস হয়ে হাতটাকে অলস করে দিয়েছে।

আস্তে আস্তে ডাকেন মাটিসাহেব—আমি এসেছি নিরু।

পেঁপেবাগানের ওদিকে নিজের ঘরের দাওয়ার উপর বসে বুড়ো রামসিংহাসনও শুনে আশ্চর্য হয়; এ কী রকমের উদাসীর মত ভাঙা গলায় আস্তে আস্তে, যেন ক্লান্ত শ্রান্ত হতাশ মানুষের মত কুণ্ঠিতভাবে ডাক দিচ্ছেন মাটিসাহেব? মাটিসাহেব আজ কি একটা জ্বর-জ্বালা নিয়ে ঘরে ফিরেছেন? এই পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে মাটিসাহেবকে একদিনের জন্যেও তো কোন অসুখে ভুগতে দেখেনি রামসিংহাসন।

লণ্ঠন হাতে দরজার কাছে এগিয়ে এসেই চমকে ওঠেন নিরুপমা। এ কি? চিরকেলে দুঃসাহসের মানুষটার মুখের উপর আজ এ কোন হতাশ সন্ধ্যার অন্ধকার থমথম করছে? সেই যে পঁচিশ বছর আগে এক মাঝরাতে থানার লোক বাঁশের ডুলিতে বয়ে নিয়ে বিজনবিহারীকে যখন বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল, তখনও তো বিজনবিহারীর মুখে একফোঁটা আতঙ্কের চিহ্ন দেখতে পাননি নিরুপমা। ভালুকটার ভয়ানক থাবার নখ বিজনবিহারীর পিঠটাকে তিন জায়গায় আঁচড়ে দিয়ে মাংস উপড়ে নিয়েছিল। সেই রক্তাক্ত যন্ত্রণার মধ্যেও নিরুপমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে পেরেছিল যে বিজনবিহারী, সে আজ এত বিষণ্ণ আর এত গম্ভীর কেন?

চেঁচিয়ে ওঠেন নিরুপমা—কি হল? ওরকম করে তাকিয়ে আছ কেন?

ছুটে আসে সুনন্দা—একি বাবা? কি হয়েছে? অসুখ করল নাকি?

বিজনবিহারী হাসতে চেষ্টা করেন—না, কিছু না।

ঘরে ঢুকেই কিন্তু ক্লান্তভাবে বিড় বিড় করেন বিজনবিহারী—একটু একলা হয়ে কিছুক্ষণ বারান্দার উপর বসি। খাবার-টাবার একটু পরে দিস নন্দু, লণ্ঠনটাকে সরিয়ে নিয়ে যা।

দুই

একলা হয়ে বসে থাকলেই তো সব কথা মনে পড়ে যায়। আজ যেন ইচ্ছে করেই সেসব কথা মনে করবার জন্যে একটু একলা হয়ে বসে থাকতে চেয়েছেন বিজনবিহারী।

মাকে একটুও মনে পড়ে না। কিন্তু বাবাকে খুবই ভাল করে মনে পড়ে। পনের বছর বয়সের ধাড়ি ছেলে হয়েও যে-ছেলে বাবাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে লৌহভীমচূর্ণ খেলেছে, সে কি করে

বাবার মুখের সেই আহ্লাদের হাসির ছবিটা ভুলে যেতে পারবে, সে-স্থলে যদিও আজ ষাট বছর বয়সের এক মাটিসাহেব!

বাবা শুধু যে নায়েবী করেই জীবন কাটিয়েছিলেন তা নয়; এককালে খুব ভাল কুস্তি লড়তেন। বাবার মাথাটা তাই সাদা হয়ে গেলেও বুকটা টান ছিল, আর হাত দুটোর মাস্‌লও কত মজবুত ছিল। প্রাণপণ জোরে বাবার হাতের গুলি টিপেও সেই শক্ত মাংস-পেশীর গর্ব একটু খর্ব করা যেত না, বিজন নিজেই হাঁপিয়ে পড়ত। বাবা হাসতেন—বৃথা চেষ্টা বিজু, তোর সাধ্যি নেই। জিমন্যাস্টিকের মাস্টার তোর ওই মেজমামাও যে হার মেনে যায়।

মামাদের বাড়িটাও কেষ্টনগর থেকে বেশি দূরে নয়। দিগ্‌নগর যেতে পথের উপরেই নোনা আতার আর কামরাঙার বাগান দিয়ে ঘেরা সেই মামাবাড়িতে যখন-তখন চলে যেতে আর থেকে আসতে কোন বাধা নেই। বাবাই বলেন—যা বিজু, লক্ষ্মীপুজোর দিনটা মামাবড়িতে গিয়ে পেট ভরে নারকেল নাড়ু খেয়ে চলে আয়।

বিজুরও আপত্তি নেই। মামাবাড়িটা এত কাছে যে, এক দৌড়ে পৌঁছে গিয়েও হাঁপাতে হয় না। দেরিও করে না বিজু, লক্ষ্মীপুজোর আগের দিনেই বিকালে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এসে, আর ব্যস্তভাবে দুটো মুড়ি চিবিয়ে নিয়েই মামাবাড়ির দিকে দৌড় দেয়। আর, শুধু নারকেলের নাড়ু নয়, কাঁচা-পাকা কামরাঙাও পেট ভরে খেয়ে নিয়ে লক্ষ্মীপুজোর পরের দিনে বাড়ি ফিরে আসে।

বাবা বলেন—দৌড়ে গিয়েছিলি, না হেঁটে হেঁটে?

বিজু—একদমে দৌড়ে গিয়েছিলাম।

বাবা—বহুৎ আচ্ছা। পেট ভরে কামরাঙা খেয়েছিস তো?

বিজু—খেয়েছি বাবা।

বাবা—বহুৎ আচ্ছা। হ্যাঁ...পরীক্ষাটা পার হয়ে যাক, তারপর দেখব, সাঁতার দিয়ে জলঙ্গী পার হতে তোর কমিনিট লাগে?

মেজমামা বড় কড়া মেজাজের মানুষ। কিন্তু কি আশ্চর্য, বিজুকে গাছ উজার করে কামরাঙা খেতে দেখেও কিছু বলেননি, যদিও চোখ পাকিয়ে অনেকক্ষণ বিজুর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। সন্দেহ হয় বিজুর মেজমামা বোধহয় বাবার দু'হাতের মাস্‌ল্‌-এর চেহারাটা স্মরণ করে বিজুকে কোন কড়া কথা বলেন না। সন্দেহ কেন, মাঝে মাঝে বেশ বুঝতেও পারে বিজু, বাবাকে বেশ ভয় করেন মামারা। বিজুকে আদর করে দুটো কথা বলতে যেন বুক ফেটে যায় মামাদের; কিন্তু অনাদর করবারও সাহস পান না। মেজমামা একদিন অবশ্য বেশ সাহস করে আর রাগ করে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—এটাকে বারান্দায় আসন পেতে খাবার জায়গা করে দাও ছোট বউমা।

বিজুও চেঁচিয়ে ওঠে।—বারান্দায় কেন?

মেজমামা—হ্যাঁ।

বিজু—না, আমি রান্নাঘরের ভেতরেই বসে খাব।

তখুনি রান্নাঘরের ভেতরে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠেছিল বিজু—আমাকে শিগগির ভাত দাও ছোটমামী।

এত কড়া রকমের রাগ করেও মেজমামার চড়া মেজাজ যেন ফস্‌ করে দমে গেল। বোধহয় বুঝতে পেরেছেন, পনের বছরের ঢেঁকি হয়েও যে আদুরে ছেলে এখনও বাপের সঙ্গে এক থালায় ভাত খায়, সে ছেলেকে একেবারে ঘরের বাইরে একটা বারান্দায় পাত পেড়ে ভাত খাওয়াবার দুঃসাহসটা ভাল সাহস নয়।

বড়দা আর মেজদার মেজাজ অনেকটা মামাদেরই মেজাজের মত। বড়দা থাকেন জলপাইগুড়িতে, আর মেজদা ডিব্রুগড়ে। দুজনেই সরকারী চাকরি করেন। বড়দা ডাক্তার, মেজদা অ্যাকাউন্টেন্ট। পুজোর ছুটিতে বড়দা আর মেজদা বাড়িতে এসে যে-কটা দিন থাকেন, সে-কটা দিন বিজুর মুখের দিকে দুজনেই যেন যখন তখন গম্ভীরভাবে তাকান। দশমীর সন্ধ্যাতে বিজু যখন হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে বড়দা আর মেজদাকে প্রণাম করে, তখনও কেমন যেন কাঠ-কাঠ একটা চেহারা ধরে আর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন দুই দাদা, একটা কথাও বলেন না। বিজুর মাথায় একবার হাতটাও রাখেন না।

ছোড়দা কিন্তু একেবারে উল্টো মেজাজের মানুষ। ছোড়দা অনেকবার ফেল করে এখনও বি-এ পড়ছেন. দিন-রাত পড়তে আর লিখতেই ভালবাসেন ছোড়দা। আর ভালবাসেন বিজুর সঙ্গে গল্প করতে। বিজুর জামা কবে ছিঁড়ে গেল, আর, দুটো নতুন প্যান্ট না হলে যে চলে না—এসব খবর ছোড়দাই রাখেন। ছোড়দা নিজেই বিজুকে সঙ্গে নিয়ে কাপড় কিনতে যান, দরজির দোকানে গিয়ে জামার ছাঁটের রকম-সকম দরজিকে ভাল করে বুঝিয়ে দেন।

প্রতি রবিবার ছোড়দা নিজের হাতে বিজুর গায়ে সাবান ঘষে ঘষে যেন বিজুর সাত দিনের মাটিমাখা দুরন্তপনার সব ময়লা ধুয়ে পরিষ্কার করে দেন। বাড়ির ঠাকুরও হাসতে থাকে। এরকম একটা ধাড়ি বয়সের ভাইকে এত যত্ন করতে কোনও বাড়ির কোন দাদাকে দেখেনি ঠাকুর।

ছোড়দার সঙ্গে এক বিছানায় না শুতে পেলে বিজুরও ঘুম হয় না। যদি কোনদিন বাবার সঙ্গে এক বিছানায় শুতে হয়েছে, বিজুর আত্মাটাই যেন হাই তুলে আর এপাশ-ওপাশ করে বিনা ঘুমে ছটফট করেছে। বাবা বলেন—যা, কমলের কাছে গিয়ে শুয়ে থাক্। কমলের গায়ের গন্ধ ছাড়া তোর ঘুম হবে না।

এক লাফে বাবার বিছানা ছেড়ে দিয়ে ছোড়দার বিছানায় উঠে, আর ছোড়দার পিঠের কাছে মুখটা গুঁজে দিয়ে শুয়ে পড়ে বিজু। আঃ, সত্যিই কি চমৎকার আরামের ঘুম। চোখের পাতা জড়িয়ে ধরছে। ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে, থেকে থেকে বিদ্যুতের ঝিলিকও ফুটে উঠছে, আর ঝড়ো বাতাসের শব্দটাও বেশ শনশনে। একটু শীত-শীতও করছে।

ছোড়দার প্রাণটাও যেন থার্মোমিটারের মত একটা যন্ত্র। চট্ করে বুঝে নিতে পারে, বিজুর গায়ের তাপ বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। তা না হলে, তখন ধড়ফড় করে জেগে উঠে আর পায়ের কাছে রাখা চাদরটাকে টেনে বিজুর গায়ে জড়িয়ে দেবেন কেন?

বড়দি আছেন এলাহাবাদে। বড় জামাইবাবু নাকি মস্ত নামজাদা উকিল। কিন্তু বড়দিকে আজও চোখে দেখেনি বিজু। ছোড়দা বলেন, অনেকদিন আগে, তুই যখন খুব ছোট্ট তখন বড়দি একদিনের জন্য এসেছিলেন। কিন্তু এক রাত্রিও থাকেননি।

কেন ছোড়দা?

বড় জামাইবাবু বড়দিকে থাকতে দেননি। বড়দি খুব কেঁদেছিলেন।

কেন ছোড়দা?

বাবার উপর বড় জামাইবাবুর খুব রাগ ছিল।

বিজু বলে—আমি তখন যদি একটু বড় থাকতাম, তবে বড় জামাইবাবুকে বুঝিয়ে দিতাম।

ছোড়দা বলেন—চুপ কর।

বিজু বলে—বড়দা আর মেজদাও নাকি বাবার উপর রাগ করে বিয়ে করলেন না।

ছোড়দা—জানি না।

বিজু—তুমি নিশ্চয় বিয়ে করবে, ছোড়দা?

ছোড়দা—নিশ্চয়।

মেজদির শ্বশুরবাড়িটা কিন্তু মন্দ নয়। কথা ছিল, এনট্রান্স পরীক্ষা দেবার পর বিজু গিয়ে মেজদির বাড়িতে তিনটে মাস থেকে আসবে। কিন্তু ওপরের ক্লাসেই উঠতে পারা গেল না। এনট্রান্স পরীক্ষাটা কপালে আছে কিনা, তাও ভগবান জানেন। এত অপেক্ষা সহ্য হয় না। বিজু তাই এই এক বছরের মধ্যে তিন তিন-বার মেজদির শ্বশুরবাড়িতে বেড়িয়ে এসেছে।

মামাবাড়ির মত মেজদির শ্বশুরবাড়িটা অবশ্য কেষ্টনগরের এত কাছে নয়, আবার বড়দির শ্বশুরবাড়ির মত অত দূরেও নয়। মানকর ছাড়িয়ে মাইল দুই হাঁটা দিলেই মানিকপুরের বাবুদের একটা কাছারিবাড়িতে পৌছনো যায়। জায়গাটার নাম শিবপুকুর। সরকারমশাই বটুকবাবুও বেশ ভাল লোক। কিছুই বলতে কইতে হয় না, বটুকবাবু নিজেই একটা গো-গাড়ি ডেকে আনেন আর, বিজু সেই গো-গাড়ির ভিতরে চুপ করে বসে, ঝিমোতে ঝিমোতে আর ঘুমোতে ঘুমোতে আট ক্রোশ দূরের মানিকপুরে পৌঁছে যায়।

মেজ জামাইবাবু খুব বড় জমিদার। মেজদিদের বাড়িটাও বিরাট। ছাদটা এত বড় যে, ফুটবল খেলতে পারা যায়। কিন্তু খেলবার উপায় নেই। হাজার হাজার কবুতরের ভিড়ে ছাদটা সবসময় ছেয়ে আছে, আর তাদের কী অদ্ভুত বকম্-বকম্ আওয়াজের ঝড়!

মেজদি সাবধান করে দেন—ছাদে যাসনি বিজু। মানিকপুরের পায়রা ভয়ানক হিংসুটে, নাক-চোখ ঠুকরে দেবে।

ইস্, সাধ্যি কী? ছোলাখেকো কবুতর আমাকে ঠুকরোবে?

সিঁড়ি ধরে এক দৌড়ে ছাদে উঠে আর একটা বাখারি দুলিয়ে সারাটা বেলা কবুতরগুলিকে উত্যক্ত করে, ভয় দেখিয়ে, অতিষ্ঠ করে আর উড়িয়ে উড়িয়ে ক্লান্ত করে তোলে বিজু, তবু নিজে একটুও ক্লান্ত হয় না।

মেজদি বিজুর চেয়ে দশ বছরের আর ছোড়দার চেয়ে দু'বছরের বড়। প্রায় দশ বছর হল, মেজদির বিয়ে হয়েছে; কিন্তু এখনও চেষ্টা করলে মনে মনে দেখতে পায় বিজু, ঘুমভরা চোখে চাঁদের দিকে তাকালে যে-রকমের ছবি চোখের উপর ভেসে ওঠে, যেন সেই রকমের একটা ছবি। মেজদির যেদিন বিয়ে হয়ে গেল, তার পরের দিন ঝকঝকে বেনারসী শাড়িতে সেজে, টায়রাপরা কপালের উপর ঘোমটাটি টেনে দিয়ে আর হেসে হেসে শ্বশুরবাড়ি রওনা হবার জন্য মেজদি গাড়িটার দিকে এক পা এগিয়ে গিয়েই কি-ভয়ানক ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন। বিজুর গলা জড়িয়ে ধরে পুরো পাঁচটা মিনিট এক ঠায় দাঁড়িয়েছিলেন মেজদি। বিজুও মেজদির শাড়ির আঁচলটা শক্ত করে ধরে রেখেছিল।

কে জানে কেন, মেজদির সেই কান্না, আর বিজুর গলা জড়িয়ে ধরা মায়ার কাণ্ডটা দেখেও মেজ জামাইবাবু যেন ঠোঁট চেপে একটা অদ্ভুত হাসি হেসেছিলেন। মেজমামা তো চোখ পাকিয়েই রেখেছিলেন। শুধু বাবা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে মেজদির মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, আর বিজুর একটা হাত ধরে বললেন—মেজদিকে যেতে দাও বিজু; তুমি আমার কাছে এস।

মানিকপুরে মেজদির বাড়িতে যতবার এসেছে বিজু, ততবার বিজুকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে ডাক দিয়েছেন মেজ জামাইবাবু—দেখে যাও রমা, তোমার অদ্ভুত ভাইটি এসেছে।

মেজ জামাইবাবুর এই চেঁচানো খুশির ভাষাটা শুনতে একটুও ভাল লাগে না বিজুর। একদিন মেজদিকেই আচমকা জিজ্ঞাসা করে বসে—মেজ জামাইবাবু আমাকে তোমার অদ্ভুত ভাই বলেন কেন? কথাটার মানে কি?

মেজদির মুখটা হঠাৎ যেন করুণ হয়ে যায়—ওটা একটা কথার কথা।

বাংলাতে ফেল করলেও আমি বাংলা ভাষা একটু বুঝি মেজদি। অদ্ভুত মানে তো কুৎসিত।

মেজদি হেসে ফেলেন—তোমাকে কুৎসিত বলে মনে করবে, কার মনের এত সাধ্যি আছে; খুঁজে বের করুক দেখি তোমার জামাইবাবু, সারা মানিকপুরে এরকম ফরসা রঙটি, এরকম টানা টানা চোখ দুটি, এরকম ঢলঢলে সুন্দর মুখটি কোন্ ছেলের আছে?

বিজুও হেসে ফেলে—তবে ওকথা বলেন কেন জামাইবাবু?

সেই জন্যেই বলেন। অদ্ভুত ভাইটি মানে সুন্দর ভাইটি!

তিন

মাণিকপুরে মেজদির বাড়িতে এই এক বছরের মধ্যে তিনবার বেড়াতে গিয়ে মাঝপথের আর-একটা বাড়িকেও খুব ভাল লেগে গিয়েছে। শিবপুকুরের সেই কাছারিবাড়ির সরকারমশাই বটুকবাবুর বাড়িটা।

সত্যিই একটা পুরনো শিবমন্দির আছে, আর সেই শিবমন্দিরের সামনে একটা পুকুরও আছে। পুরনো মন্দিরটার একদিকে কাছারিবাড়ি, আর অন্যদিকে সরকারমশাই বটুকবাবুর বাড়ি।

নিতান্ত একটা মাটির বাড়ি। চালাটা টিনের। প্রথম যেবার মানিকপুর যাবার সময় মানকর স্টেশন থেকে হাঁটা দিয়ে এই কাছারিবাড়িতে এসে উঠেছিল বিজু, সেবারই বটুকবাবুর বাড়ি থেকে এসে বিজুকে প্রথম অভ্যর্থনা করে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল যে, সে হল বটুকবাবুর মেয়ে, নাম কাজলী, বয়সটা দশ বছরের বেশি হবে না।

কাজলীর মা বেশ যত্ন করে বিজুকে কদমা ক্ষীর আর মুড়ি খাইয়েছিলেন। জলের গেলাসটা কাজলীই নিয়ে এসে বিজুর হাতে তুলে দিয়েছিল।

যতক্ষণ গো-গাড়ি আসেনি ততক্ষণ কাজলীর সঙ্গেই গল্প করেছিল বিজু।

বিজু বলে—কাজলী আবার কেমন নাম? কাজলী তো এক রকমের ধানের নাম। শুনতে একটুও ভাল লাগে না।

কাজলী বলে—ভাল না লাগে তো বলো না। আমার নাম ডাকতে তোমাকে বলছে কে?

এর পরেও তো আরও পাঁচবার শিবপুকুরের কাছারিবাড়িতে আসতে হয়েছে বিজুকে। মানিকপুরে যাবার সময় দুবার, আর ফেরার সময় তিনবার। দ্বিতীয়বার, তার মানে সেই প্রথমবারই মানিকপুর থেকে ফেরবার পথে গো-গাড়িটা কাছারিবাড়ির কাছে এসে পৌঁছতেই কাজলী ছুটে এসে বলে—আজ কিন্তু ভাত খেতে হবে।

নিশ্চয় খাব। বিজুও গো-গাড়ি থেকে একটা লাফ দিয়ে নেমে পড়েই হেসে ওঠে।

কাজলী বলে—কিন্তু রান্না শেষ হতে একটু দেরি হবে।

হোক না। ভালই তো।

কাজলীদের বাড়ির সবই ভাল, বিজুর প্রাণটা যেন এরই মধ্যে টের পেয়ে গিয়েছে। কাজলীর বাবা আর মা, কাজলীদের বাড়ির কলমা ক্ষীর আর মুড়ি, সবই ভাল।

উঠোনের বেলগাছটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে বিজু—এ বেলগুলো পাকে না?

কাজলী হাসে—পাকে বইকি! বোশেখ মাস পড়লেই পাকবে।

এটা কি মাস?

এটা তো ফাগুন।

চুপ করে কি-যেন ভাবে বিজু। কিন্তু কাজলীই যেন বিজুর সেই ভাবনাটাকে চমকে দেয়।—বোশেখ মাসে আসবে তো আবার?

কি বললে?

বোশেখ মাসে এলে কিন্তু পাকা বেল খেতে পাবে।

আসব।

বোশেখ মাস আসতে দেরি করেনি। বিজুও মানিকপুরে মেজদির বাড়িতে আর-একবার বেড়িয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেরি করেনি।

কাজলীও দেখা হওয়ামাত্র বিজুকে বলে দিতে দেরি করেনি—অনেক বেল পেকেছে।

ছিঃ, সত্যিই কি পাকা বেল খাবার লোভে আমি এসেছি?

তবে কেন এসেছ?

এসেছি তোমার বাবা আর মার সঙ্গে একবার দেখা করতে।

দেখা কর তাহলে।

করবই তো। কিন্তু সেজন্য তুমি ছটফট করছ কেন? আমার যখন ইচ্ছে হবে, তখন দেখা করব।

তবে এখন কি করবে?

চল, তোমাদের হাঁসের ঘর আগে দেখে আসি।

শুধু হাঁসের ঘর দেখে নয়, কাজলীর সঙ্গে গল্প করে করে আর বেড়িয়ে আরও অনেক বিস্ময়ের জিনিস দেখে নেয় বিজু! মন্দিরের পিছনে একটা পুরনো চাঁপা গাছ আছে, একশো বছর বয়স। ওটার নাম গৌরীচাঁপা।

বিজু বলে—আশ্চর্য! মহাদেবের বউ গৌরী এই গাছটাকে পুঁতেছিল নাকি?

কে জানে?

কুমোরের চাক ঘুরছে, আর নরম মাটির তাল চেপে ধরে দু'হাতের কায়দায় হাঁড়ি সরা আর কুঁজো গড়ছে কুমোরেরা, কাজলীর সঙ্গে কুমোর-পাড়াতে গিয়ে এই দৃশ্যও দেখে আসে বিজু।

কাজলী বলে—দেখলে তো: আর কখনও দেখেছ?

বিজু হাসে—কেষ্টনগরের ছেলেকে মাটির কারিগরীর গর্ব দেখাচ্ছ তুমি? মনে করছ, আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি? আমাদের কেষ্টনগরের কুমোরদের কাছে তোমাদের এই শিবপুকুরের কুমোরেরা যে আঁতুড়ে-শিশু।

মেজদি বলেছেন—অ্যানুয়াল পরীক্ষাটা এগিয়ে এসেছে, কাজেই এখন আর এত ঘন ঘন

এখানে বেড়াতে আসিস না বিজু। মন দিয়ে পড়াশোনা কর, পরীক্ষাটা দিয়ে নে, তারপর আবার আসিস।

ছোড়দাও বাবার সঙ্গে তর্ক করেছে—বিজুকে আপনি যখন তখন মানিকপুরে যেতে দিচ্ছেন কেন? তিন মাসের মধ্যে দুবার তো গেল। আবার যাব-যাব করছে।

বাবা বলেন—যাক না।

ছোড়দা—তাছাড়া, এভাবে একা-একা ট্রেনে চেপে ছুটোছুটি করাও এই বয়সের ছেলের পক্ষে একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। পথে বিপদ-আপদ তো লেগেই আছে।

বাবা বলেন—এখন থেকেই ট্রেনিং নিক। একটু বিপদে-আপদে পড়তে অভ্যেস করুক।

ছোড়দা জানেন, বাবাকে আর বেশি বুঝিয়ে বললেও কোনও লাভ হবে না। তিনি বুঝবেনই না। বাবা এই সেদিনও, বর্ষার জলঙ্গী সাঁতরে পার হবার জন্য বিজুকে যেভাবে উৎসাহিত করেছিলেন, দেখে খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন ছোড়দা। ভাগ্যি ভাল, বাবা আর জেদ করেননি। বিজুও বোধহয় মানিকপুরে যাবার ব্যাকুলতায় বর্ষার জলঙ্গী সাঁতরাবার লোভটাকেও আপাতত ভুলে বসে আছে।

কিন্তু উপায় নেই, বিজুকে বলেও কোন লাভ হল না। আবার মাণিকপুরে চলে গেল বিজু। এবার ঘুড়ি-নাটাইও সঙ্গে নিয়ে গেল। বাবা নিজেই হেসে চেঁচিয়ে বিজুকে উপদেশ দিলেন—মানিকপুরের সব ঘুড়ি এক এক গোঁত্তায় বোকাট্টা করে ফিরে আসা চাই।

আবার শিবপুকুর। আবার কাজলী।

ঘুড়ি-নাটাই দেখে খিল খিল করে হেসে ওঠে কাজলী—ছিঃ, একেবারে ছেলেমানুষের মত কাণ্ড!

কি বললে?

আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে মাঠে মাঠে ঘুরতে পারব না।

ঘুরতে হবে।

না। তুমি ঘুড়ি উড়োবে, তোমার সঙ্গে থেকে আমার লাভ কি?

আমার তো লাভ আছে।

ছাই লাভ।

সত্যি বলছি, তুমি সঙ্গে থাকলে খুব ভাল লাগে।

কেন?

তুমি তো তোমার মার চেয়েও সুন্দর।

কাজলী ভ্রূকুটি করে তাকায়।—মাকে বলে দেব?

যাও, এখনি গিয়ে বলে দাও। আচ্ছা, আমিই গিয়ে বলে দিচ্ছি। কেষ্টনগরের ছেলেকে তুমি ভয় দেখাতে এসেছ?

আচ্ছা, আর বলব না।

কি বলবে না?

কারও কাছে কোন কথা বলব না।

ব্যাস, তবে চুপটি করে এস আমার সঙ্গে।

না।

কেন?

ভাল লাগছে না।

তবে আমারও তোমাকে ভাল লাগছে না। ঘরে যাও তুমি।

বিজু একাই ঘুড়ি-নাটাই নিয়ে চলে যেতে থাকে। কাজলী বলে—রাগ করে চলে যাচ্ছ, কিন্তু মনে থাকে যেন...।

কি মনে থাকবে?

আমি ছাড়া তোমার গতি নেই।

বিজুর হুঙ্কার শোনার অপেক্ষায় আর দাঁড়িয়ে থাকে না কাজলী। দৌড় দিয়ে বাড়ির দিকে চলে যায়।

আর, বিজু চলে যায় ধানক্ষেতের দিকে। আলের উপর দাঁড়িয়ে ফুরফুরে হাওয়াতে ঘুড়ি ভাসিয়ে দিয়ে আর নাটাই দুলিয়ে সুতো ছাড়তে থাকে।

কিন্তু, বোধহয় আধঘণ্টাও পার হয়নি, নাটাই গুটিয়ে নিয়ে, আর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে, কাজলীদের বাড়ির কাছে এসে, কাটা তালগাছটার ধড়ের উপর চুপ করে বসে থাকে বিজু।

ছুটে আসে কাজলী—কি হল?

একটা গর্তের মধ্যে পা পড়ে গিয়েছিল। পা'টা বেশ মচকে গিয়েছে।

খুব ব্যথা করছে?

সে আর বলতে?

তাহলে? কি করব বল?

একটু বাটা হলুদ গরম করে আর একটু চুন নিয়ে চলে এস। কিন্তু খুব সাবধান, মাসীমা যেন টের না পান।

মা টের পেলেই তো ভাল। তাড়াতাড়ি চুন হলুদ গরম করে...।

না, কখখনো না। মাসীমা তাহলে আমাকে খুব অপছন্দ করে ফেলবেন।

কাজলীও সত্যিই চুপি চুপি একটা সরাতে গরম চুন-হলুদ নিয়ে ফিরে আসে! পায়ের পাতার উপর আর গিঁটের চারদিকে চুন-হলুদ লাগিয়ে নিয়ে আর হেসে হেসে কাজলীর মুখের দিকে তাকাতে গিয়েই বিজুর পনের বছর বয়সের দুরন্ত চোখ দুটো যেন চমকে ওঠে। জীবনে এই যেন প্রথম একটা বিস্ময়কে দু'চোখ দিয়ে দেখতে পেয়েছে বিজু। কাজলীর চোখ দুটো ছলছল করছে।

কি হল?

বলেছিলাম না, আমি ছাড়া তোমার কোন গতি নেই। কে চুন-হলুদ এনে দিল?

গল্পটা মেজদিকে না শুনিয়ে থাকতে পারে না বিজু। কদমা আর ক্ষীর থেকে শুরু করে হাঁসের ঘর, বোশেখী বেল আর গৌরীচাঁপা পর্যন্ত গল্পের সব কথা শুনে নিয়ে মেজদি বেশ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেন—কি বলেছে কাজলী?

কাজলী বলেছে, আমি ছাড়া তোমার গতি নেই।

বেশ করেছে। কিন্তু তুমি, লক্ষ্মী ভাইটি, তুমি কাজলীর সঙ্গে আর কথা-টথা বলো না।

বিজু আশ্চর্য হয়—কেন মেজদি?

কাজলী আজ ভাল কথা বলছে, কিন্তু একদিন হয়তো খুব শক্ত একটা কথা শুনিয়ে দেবে।

মেজদিও এবার নতুন রকমের একটা ব্যবস্থা করে দিলেন। মানিকপুর থেকে যে গো-গাড়িটা বিজুকে নিয়ে যাবে, সেটা আর শিবপুকুর কাছারিবাড়িতে থামবে না। সোজা চলে যাবে মানকর।

গো-গাড়িটা ঠিক যখন শিবপুকুরের কাছারিবাড়িটা পার হয়ে চলে গেল, তখন সন্ধ্যার জোনাকি জ্বলতে শুরু করেছে। কাজলীদের বাড়িটাকে আর চোখে দেখতেও পায় না বিজু। কে জানে কেন, গাড়ি থেকে নামবার জন্য বিজুর মনটা একবার ছটফট করে উঠেই শান্ত হয়ে গেল।

চার

বাইরের ঘরে বসে বাবা ডাকছেন—বিজু। বিজু কি মানিকপুর থেকে ফিরেছে?

ছোড়দা ভেতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে উত্তর দেন—হ্যাঁ।

বিজুকে এখানে একবার পাঠিয়ে দে।

কেন?

কেন আবার কি? আসুক না একবার।

বিজুকে পড়তে বসিয়েছি।

এখন আবার কি পড়ছে বিজু?

বাংলা ব্যাকরণ।

বাংলা ব্যাকরণ থাকুক এখন।

বেশ তো, এখন তাহলে ভূগোল পড়ুক।

আরে না না। বিজু এখানে একবার আসুক, আমার সঙ্গে একটু পাঞ্জা-টাঞ্জা লড়ুক। তারপর না হয়...।

আর বেশি বলতে হয় না; বিজু নিজেই একটা লাফ দিয়ে, যেন এতক্ষণের ব্যাকরণ-ভীরু প্রাণটাকে নাচিয়ে দিয়ে বাইরের ঘরের দিকে ছুটে চলে যায়।

বাবার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বিজু। বাবা বলেন—মন্দ নয়। এই এক বছরে তোর কব্জির জোর বেশ বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে।

বিজু বলে—কিন্তু তোমার হাতটা গরম কেন বাবা?

বাবা হাসেন—জ্বর হলে গা তো গরম হবেই।

জ্বর? তোমার জ্বর?

বিজুর পাঞ্জার উপর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে বাবা আবার হাসেন।—হ্যাঁ রে বিজু।

তারপরেই কেমন যেন হাঁপিয়ে-হাঁপিয়ে কথা বলেন বাবা—আচ্ছা, তুই এখন যা। কমলকে একবার পাঠিয়ে দে।

বাবারও জ্বর হয়, বাবাও হাঁপায়? বিজুর বিশ্বাসের জগৎটা যেন ভয়ানক একটা বিস্ময়ের প্রশ্নে আহত হয়ে মনমরা হয়ে যায়। কিন্তু উপায় নেই। চোখের উপরে দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে, রোজই বাবাকে দেখবার জন্য ডাক্তার আসছেন আর ছোড়দা ওষুধ আনবার জন্য ছুটোছুটি করছেন।

বাবাও এমন নিশ্চল হয়ে খাটের উপর শুয়ে পড়ে থাকতে পারেন? এমন অসম্ভবও সম্ভব হয়? কেষ্টনগরের কে না জানে, রাজনগরের নায়েব রুদ্রবাবু একবার নবদ্বীপঘাটের ফেরি লঞ্চের

উপর রাগ করে গঙ্গা সাঁতরে ওপারে গিয়ে উঠেছিলেন, আর সময়মত আদালতে হাজির হয়েছিলেন। কারণ, যে লঞ্চের সকাল আটটায় ছাড়বার কথা, আটটা বিশ মিনিট হয়ে গেলেও সে-লঞ্চ তখনও কুমড়ো-বোঝাই হবার জন্য পাইকারের নৌকোর অপেক্ষায় অলস হয়ে ভাসছিল।

কিন্তু বাবা যে মরতেও পারেন! সেদিন ডাক্তার চলে যাবার পরেই ছোড়দা যখন চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন, তখন হতভম্ব বিজুর বুকটা যেন পৃথিবীর সবচেয়ে নিষ্ঠুর বিস্ময়ের আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে কেঁদে ওঠে। বিজুও এত চেঁচিয়ে কাঁদতে পারে? বাবা দেখতে পেলে যে লজ্জা পেয়ে আর চেঁচিয়ে হেসে ফেলতেন...ছিঃ বিজু, তুইও যে চেঁচিয়ে কাঁদছিস!

রাত্রিবেলা যখন ছোড়দার গা ঘেঁষে শুয়ে থাকতে হয়, শুধু তখন বিজুর বুকের ভিতরের ছটফটে কান্নাটা যেন শান্ত হয়ে যায়।

বিজুর দু'চোখের ছলছলে ভাবটাও শান্ত হয়ে শুকিয়ে আসতে থাকে। বড়দা এসেছেন, মেজদা এসেছেন, আর মেজমামা তো সকাল-সন্ধ্যা ব্যস্ত হয়েই আছেন। বাবার শ্রাদ্ধের জন্য বেশ জাঁকাল-রকমের একটা আয়োজনের পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু, ঠিক শ্রাদ্ধের দিনেই, ষোল বছর বয়সের দুরন্ত যে বিজুর চোখ দুটো কান্না ভুলে গিয়ে শান্ত হয়ে গিয়েছে, সেই শান্ত চোখ দুটো যেন ভয়ানক একটা সন্দেহের আঘাত পেয়ে চমকে ওঠে।

বড়দা মেজদা আর মেজমামা এত আপত্তি করছেন কেন? বিজুর মাথা কামাবার দরকার নেই কেন? বড়দা মেজদা আর ছোড়দা, তিনজনই যদি মাথা কামাবে, তবে বিজুই বা বাদ যাবে কেন?

ছোড়দা জেদ ধরলেন—না, সেটা হবে না। হতে পারে না। বিজুও মাথা কামাবে।

বড়দা মেজদা আর মেজমামা নিতান্ত একটা অনিচ্ছার সঙ্গে কোনমতে আপস করে শেষে রাজি হলেন। বিজুও মাথা কামালো। কিন্তু, বিজুর প্রাণটা যে কোনমতেই মনের সেই ভয়ানক সন্দেহটার সঙ্গে আপস করতে পারে না। কেন? কিসের জন্য? বড়দা মেজদা আর মেজমামা কোন্ সাহসে এমন কথা বলে?

ছোড়দাকে জিজ্ঞেস করলে ছোড়দা বারে বারে ওই একই জবাব দিয়ে সরে পড়েন—ওদের কথা ছেড়ে দে। ওদের মাথা খারাপ।

শ্রাদ্ধ তো মিটে গেল। বড়দা আর মেজদাও চলে গেলেন। কিন্তু মেজমামা তবু ব্যস্ত। নিজের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এখন যেন এ-বাড়ির অদৃষ্টের গার্জেন সেজে বসেছেন। রোজই একগাদা কাগজপত্র নিয়ে উকিলবাড়িতে যান আর আসেন। মেজমামা কি সাপুড়ে জাদুকরের মত সংসারের আরও বড় কোন রহস্যের ডালা তুলে ফেলবেন, আর, আরও ভয়ানক কোন বিস্ময়ের সাপ হিস্ হিস্ করে ফণা তুলে বের হয়ে আসবে?

ঠিকই, তাই হল। সন্ধ্যেবেলা আদালত থেকে ফিরে এসে চেঁচিয়ে উঠলেন মেজমামা।—সব ব্যবস্থা হয়ে গেল রে কমল।

কি হল?

মেজমামা—সম্পত্তির পার্টিশান হয়ে গেল। তোর ভাগে পড়ল এই বাড়িটা। রাজনগরের বাড়িটা ধীরেন আর নরেনের সমান দুই ভাগে, আর পলাশীর জমিদারীটা তোদের তিন ভাইয়ের সমান তিন ভাগে।

বিজু বলে ওঠে —তবে আমার ভাগে কি পড়ল?

মেজমামা বলেন—কিছু নয়। তুমি চুপ কর।

বিজু চেঁচিয়ে ওঠে—কেন চুপ করব? বাবার সম্পত্তি শুধু তিন ভাই পাবে কেন? আমি কি মরে গেছি?

মেজমামা বিরক্ত হয়ে বলেন—তুমি মরেই ছিলে। তোমার থাকা আর না-থাকা দুই-ই সমান। দেখছিস কমল, এইটুকু ছেলের কিরকম টনটনে সম্পত্তিজ্ঞান?

বিজু বলে—আমি এখনই উকিলবাড়ি যাব। দেখি, কে আমাকে কোন্ সাহসে ঠকাতে পারে?

ছোড়দা বিজুর হাত ধরে বলেন—আয়, আমার সঙ্গে আয়, একটা কথা বলব, শুনে যা। আয় বিজু।

বিজুকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে আর গাছপাকা পেয়ারার গন্ধে ভরা উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে, যেন নিবিড় একটা প্রতিজ্ঞার আশ্বাস ঢেলে দিয়ে কথা বলেন ছোড়দা—আমি থাকতে তোর আবার সম্পত্তির চিন্তা কেন বিজু? আমার ভাগের সম্পত্তি তোরও সম্পত্তি।

কিন্তু মেজমামা তো সে-কথা বলছেন না। উকিলবাবুও সে-রকম ব্যবস্থা করেননি।

ও ছাই দলিলে যা-ই লেখা থাকুক না কেন, আর আইনে যা খুশি বলুক না কেন, তুই তো আমাদেরই ভাই।

চমকে ওঠে বিজু—আইনে আমি বুঝি তোমাদের ভাই নই?

বিজুর মাথাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ছোড়দা হাসেন না রে ভাই, কিন্তু তাতে কি আসে যায়?

না, আমি তোমার বাজে কথার মানে বুঝতে পারছি না। আমাকে ছেড়ে দাও ছোড়দা। আমি আজই জানব—উকিলবাবুকে, বিধুবাবুকে, সাবিত্রীমাসিকে সবাইকে জিজ্ঞেস করব। আমি এখনই বের হয়ে গিয়ে জেনে আসব, আমি তবে কে?

ছোড়দা—ছিঃ, কোন দরকার নেই। আমি আমার সম্পত্তির একটা ভাগ তোর নামে দলিল করে দেব বিজু। তুই কিচ্ছু ভাবিস না।

ছোড়দার সেই ব্যাকুল আদরের হাত দুটো যেন দমবন্ধ করবার দুটো ফাঁসির দড়ি। কিংবা, একটা মিথ্যে মায়ার মিথ্যে তোষামোদ। সহ্য করতে পারা যায় না। ছোড়দার হাত দুটোকে দুরন্ত একটা ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিয়েই ছুটে চলে যায় বিজু।

অনেক রাত, মাঝরাতও বোধহয় তখন পার হয়ে গিয়েছে, বাড়িতে ফিরে এসেই দেখতে পায় বিজু, একটা নেবানো লণ্ঠন আঁকড়ে ধরে আর জুতো পায়েই বিছানার উপর যেন দুর্ঘটনায় মরা একটা মানুষের মত এলোমেলো হয়ে শুয়ে পড়ে আছেন ছোড়দা। বুঝতে পারা যায়, বিজুকে খুঁজতে বের হয়ে আর অনেক হয়রান হয়ে ফিরে এসেছেন ছোড়দা। এখন বোধহয় স্বপ্ন দেখছেন, বিজু ফিরে এসেছে, কিংবা খোঁজ করলেই বিজুকে পাওয়া যাবে।

না, অসম্ভব। বৃথা স্বপ্ন দেখছেন ছোড়দা। বিজু এ-জীবনে আর এ-বাড়িতে আসবে না।

ছোড়দার মাথার বালিশের কাছে চিঠিটা রেখে দেয় বিজু—সবই জেনেছি ছোড়দা। আমি বাবার ছেলে বটে, কিন্তু তোমাদের ভাই নই। আমি বাবার রাজনগরের বাড়ির এক ঝিয়ের ছেলে। আমার সে ঝি-মা মরে যাবার পর বাবা আমাকে এ-বাড়িতে এনে আর আদর করে পুষেছিলেন। ব্যাস, আমার আর কিছু বলবার নেই। যাই ছোড়দা।

কেষ্টনগরের আকাশের তারা ঝিকঝিক করে। জলঙ্গীর জল ছলছল করে। একটা নিশাচর

একলা নৌকোর বৈঠা ঝুপঝাপ করে। মুচিপাড়ার কুকুর কিন্তু ঘেউ ঘেউ করে না, শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে।

তারপরেই খোলামেলা ধানক্ষেতের বাতাস ফুরফুর করে। বুঝতে পারে বিজু, কেষ্টনগর নামে একটা শ্মশানের সীমা ছাড়িয়ে প্রাণটা অনেক দূরে চলে এসেছে। এ রাত্রি ভোর হবার আগে আরও অনেক দূরে চলে যেতে পারা যাবে।

পাঁচ

যে নদী মরুপথে হারালো ধারা, সে নদীর আক্ষেপ হল হারিয়ে যাওয়ার আক্ষেপ। হারিয়ে যেতে চায়নি সে নদী। কিন্তু ষোল বছর বয়সের বিজনবিহারীর জীবনের নদীটা যেন ইচ্ছে করেই ধারা হারাতে চায়। বাংলাদেশের মাটির ছোঁয়া থেকে পলাতক একটা প্রাণ সত্যিই সুদূরের এক মরুপথে এসে তার ধারা হারিয়ে দিতে চেষ্টা করছে।

একেবারে রাজস্থান, যার সঙ্গে বাংলাদেশের মাটি নদী আর গাছপালার কোন মিল দেখা যায় না। চিতোরের এক উটওয়ালার কাছে চাকর হয়ে খেটে খেটে বিজনবিহারীর জীবনের পুরো একটা বছর কেটে গিয়েছে।

কিন্তু একটুও কি ভয় পেয়েছে বিজনবিহারী? একটুও না। প্রথম দিনটা উটের গায়ের সেই বীভৎস গন্ধে গলা থেকে এক ঝলক বমি উথলে পড়েছিল। কিন্তু তারপর আর নয়। তারপর নিজের হাতেই উটের পুরীষের ঘুঁটে পুড়িয়ে, জওয়ারের চাপাটি সেঁকে, আর সেই চাপাটি কাঁচা গাজরের সঙ্গে চিবিয়ে খেতে একটুও খারাপ লাগেনি। দড়ির মত করে পাকানো লাল শালুর মস্ত বড় একটা মুড়েঠা মাথায় বেঁধে, তুলোর মেরজাই গায়ে চড়িয়ে, আর কাঁচা চামড়ার নাগরা পায়ে দিয়ে চিতোরগড়ের ডাঙার কাঁটাজঙ্গল থেকে মাদারপাতার বোঝা মাথায় বয়ে নিয়ে বাজারের উটের আস্তানায় ফিরে আসবার সময় পশ্চিমের আকাশে যে সূর্যাস্ত দেখতে পায় বিজনবিহারী, সে সূর্যাস্তের চেহারার সঙ্গে কেষ্টনগরের সূর্যাস্তের মিল নেই; মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। কিন্তু দেখতে ভাল লাগে। এ আকাশে সূর্যাস্তের রঙ ছলছল করে না, যেন দাউ দাউ করে জ্বলে।

মিল নেই বলেই ভাল লাগে। চিতোরগড়ের রাতের নীরবতার মধ্যেও মাঝে মাঝে, বিশেষ করে যে রাতে জ্যোৎস্না থাকে, ময়ূরের ঝাঁক ডেকে ডেকে উড়ে বেড়ায়। বিজনবিহারীর প্রাণটা যেন নিশ্চিন্ত হয়ে ময়ূরের ডাকের মত প্রতিধ্বনির উৎসবের মধ্যে ডুবে যায়। শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। যদি এখানেও বাংলাদেশের মত বউ-কথা-কও কখনও ডেকে ওঠে, তবে বোধহয় সেই মুহূর্তে চিতোর ছেড়ে দিয়ে একেবারে জয়সলমীরের দিকে চলে যাবে বিজন।

চিতোরের উটওয়ালা মালিক মাইনে বাবদ একটা পয়সাও দেয় না বলেই কাজটা ছেড়ে দিতে হল। তারপর ঝান্‌সি। মেওয়া-ওয়ালা মদনলালের দোকানে পুরো দু'টি বছর চাকরি করতে হয়েছে। মাইনে দিতে কিপটেমি করেনি মদনলাল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাইনের লোভ ছেড়ে দিতেই হল।

দোকানঘরের পিছনের একটা অন্ধ কুঠুরি, সেই কুঠুরির ভিতরে একটা তয়খানা, যেন রসাতলে যাবার একটু সুড়ঙ্গঘর। এই তয়খানার ভিতরে পচা মেওয়া চোলাই করে মিঠা মদ আর খুশবুদার মদ তৈরি করে মদনলাল, রহিমেসোকে দিল বহ্‌লানেকে লিয়ে।

দোকানঘরের কাজ তেমন কিছু নয়। আসল কাজটা, এই তয়খানার ভিতরে মাঝরাত পর্যন্ত

ভোর ভোর কাঠের গামলায় পচা মেওয়া চটকাতে হয়। বিজনবিহারীর হাতের মাংসের পেশীগুলি এরই মধ্যে পচা মেওয়া চটকাতে গিয়ে কত মজবুত হয়ে ফুলে উঠেছে।

কিন্তু কাজটা কপালে সইলো না। পালিয়ে যেতে হল। যে রাতে মেওয়াওয়ালা মদনলালের দোকানের উপর হানা দিল আবগারী পুলিস, সেই রাতেই, সেই মুহূর্তে, তয়খানা থেকে বের হয়ে, পিছনের আঙিনার একটা গাছ বেয়ে পাঁচিলের উপর উঠে, আর ওপাশের শেখ সাহেবের আস্তাবলের চালার উপর লাফিয়ে পড়ে, তারপর যেন একেবারে অশরীরী হয়ে উধাও হয়ে যায় বিজন।

ঢোলপুরে রেলের এক সাহেবের বাড়িতে বেয়ারা হয়ে আরও একটা বছর। শেষরাতের আবছায়ার মধ্যে চম্বলের বালিয়ারির উপর দাঁড়িয়ে হরিণ শিকার করতে ভালবাসেন ডিটিএস মিস্টার ব্রাইট। দোনলা হল্যাণ্ড অ্যাণ্ড হল্যাণ্ডটা মিস্টার ব্রাইটের হাতে থাকে, আর বেয়ারা বিজনবিহারীর হাতে থাকে একটা একনলা মার্টিন হেনরি। ভীরু চিতল হরিণ নয়, একদিন সাংঘাতিক গাঁট্টাগোট্টা একটা লেপার্ড পিছনের একটা ফণিমনসার ঝোপের আড়াল থেকে বের হয়ে এসে মিস্টার ব্রাইটের ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু সাহেবের গায়ে একটা আঁচড়ও দেগে দিতে পারেনি লেপার্ডটা, চামড়ার জার্কিনের কলারটাকে শুধু এক কামড়ে ছিঁড়ে দিতে পেরেছিল। আর, বেয়ারা বিজনবিহারীর হাতের বন্দুকের এক গুলিতে সে লেপার্ডের বুকও সেই মুহূর্তে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল।

তারপর জব্বলপুর। লাইনম্যান বিজনবিহারী। দেশে চলে যাবার আগে মিস্টার ব্রাইটই সুপারিশ করে বিজনবিহারীকে এই কাজে বহাল করিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

লোকে বলে, স্টেশনের ইয়ার্ড। বিজনবিহারী জানে, লোহার পাঁজরা দিয়ে ছাওয়া এই ইয়ার্ডই তার জীবনের জগৎ। বাইরের সংসারের যত ভিড় এসে এখানে উপচে পড়ে আর মিলিয়ে যায়। কখনও লাল আর কখনও সবুজ, আলো আর নিশানের অফুরান সঙ্কেত যেন এখানে নীড় বেঁধে বসে আছে। ট্রেন-বোঝাই হয়ে বাইরের পৃথিবীর যত হর্ষ আর কলরবের ভার এখানে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বিজনবিহারীও যেন তাদের সবারই যাওয়ার পথের কাঁটা সরিয়ে দেয়। শাবল দিয়ে ছোট্ট একটি আদুরে আঘাত, ঠুং করে একটি শব্দ শিউরে ওঠে, আর লাইনের লোহার ফাঁক গায়ে গায়ে জোড়া লেগে যায়। মনে হয়, লোহার শিব যেন বুক পেতে দিল। তার পরেই হু হু করে ছুটে আসে থ্রি আপ কিংবা ফোর ডাউন। সত্যিই মনে হয়, যেন একটা শব্দের এলোকেশীর নাচন সেই লোহার বুক মাড়িয়ে ছুটে চলে গেল।

ট্রেনবোঝাই এই সব হর্ষ আর কলরব নিশ্চয় নিজের দেশে যায়। ওদের দেশ আছে, ঘরও আছে। সবাই হয়তো নিজের দেশের দিকে যাচ্ছে না; কেউ কেউ দেশের দিক থেকে এসে কোন আদেশের দিকে চলে যাচ্ছে। যেখানেই যাক, শেষ পর্যন্ত একটা আশার ঘরে গিয়েই তো ওরা জিরোবে আর ঘুমোবে।

কিন্তু ডিউটি শেষ হলে যে-ঘরে গিয়ে জিরোতে আর ঘুমোতে পারে বিজন, সেটা আশার ঘর নয়, জি ব্লকের একটা কুঠুরী। একটা বেঁটে দরজা, আর ঘুলঘুলির মত ছোট্ট একটা জানলা। জানলার কাছেই দেওয়াল-ঘেঁষা ড্রেনের মধ্যে কাদামাখা শূয়োর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। পাশেই এইচ ব্লকের যত কুঠুরির সারি, সবচেয়ে নিচের ক্লাসের যত মিনিয়াল আর ধাঙড়দের ঘর। জানলাটা একবেলা খোলা থাকলে কয়লার ধোঁয়া ঘরে ঢুকে দড়িতে টাঙানো জামা-কাপড়ের গায়ে লম্বা

লম্বা ঝুল ধরিয়ে দেয়, কালো-কালো সাপের খোলসের মত ঝুলছে।

যেন জীবনের যত আশার একটা কয়েদঘর। এ চাকরির মেয়াদ ফুরোলে তবেই বোধহয় এই জি কুঠুরির আশ্রয় থেকে সরে গিয়ে আবার ভাবতে হবে, আবার কোথায় যাওয়া যায়। কোন না কোন দিকে চলে যাওয়া যাবে নিশ্চয়; কিন্তু বাংলাদেশের দিকে নিশ্চয় নয়, ভুলেও নয়।

নীলরঙা কামিজ আর নীলরঙা বেঁটে প্যান্টালুনে জড়ানো একটা চেহারা হয়ে, লণ্ঠনটা হাতে ঝুলিয়ে রাতের ইয়ার্ডের এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেও মন্দ লাগে না। বেশ ভাল লাগে, যখন শান্টিং-এর ইঞ্জিনগুলি এক-একটা চিৎকারের রাক্ষসের মত ডাইনে-বাঁয়ে ছুটোছুটি করে।

এ বিজ্জাওন! লোকো শেডের গেটম্যান টহলদার সিং যখন চেঁচিয়ে ডাক দেয়, তখন বিজনও খুশির স্বরে চেঁচিয়ে উঠতে পারে—রাম রাম চাচা! বোলিয়ে কেয়া খবর!

খবর কুছ নেহি, এক বাত পুছনা হ্যায়!

বোলিয়ে।

সাদি-উদি করোগে কি নেহি?

সাদি কি অ্যায়সি-ত্যায়সি! চেঁচিয়ে হেসে ওঠে বিজন।

টহলদার সিং চোখ পাকিয়ে ধমক দেয়—জওয়ানি বরবাদ করোগে, কেয়া?

জওয়ানি নর্মদামে বহা দেঙ্গে। হেসে হেসে জবাব দেয় বিজন।

চাচাজী টহলদার সিং-এর চোখ দুটো যেন হঠাৎ একটু মুচকে হেসেই কুঁচকে যায়।—তব্‌দের কেঁও? বঙ্গাল মুলকসে এক ছোটি-মোটি নাজুকবদন নর্মদাকো উঠা লে কর্ চলে আও।

চাচাজী টহলদার সিং আর একবার মুচকে হেসে নিয়ে চলে যায়। শুধু আজ নয়, আরও কতবার এই ধরনের হাসির কথা শুনিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে চাচাজী। চাচাজীর এইসব মুচকি হাসির ভাষা যেন বিজনবিহারীকে বার বার এই সত্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, জীবনের আরও দুটো বছর এই জব্বলপুরে পার হয়ে গিয়েছে। বয়সটা বাইশের কোঠাও পার হয়েছে। ইস, কত তাড়াতাড়ি বয়সটার হাত থেকে খেলার ঘুড়ি-নাটাই খসে পড়ে গেল, আর হাতে উঠে এল একটা কাজের লোহার শাবল।

কি আশ্চর্য, স্বপ্নের মধ্যে এখনও যে মাঝে মাঝে বাংলাদেশের একটা ধানক্ষেতের হাওয়া ফুরফুর করে, আর সেই ফুরফুরে হাওয়াতে বিজনবিহারীর প্রাণের একটা রঙিন খুশির ঘুড়ি আকাশে ভেসে ভেসে দুলতে থাকে। দুলতে থাকে শিবপুকুর, গৌরীচাঁপা, বোশেখী বেল আর...আর কাজলী।

ছিঃ, স্লেটের সব অঙ্কের দাগ এত ভাল করে মুছে দেবার পরেও একটা দাগ কেন আবার ফুটে ওঠে? ফুটে ওঠেই বা কেমন করে? কাজলীও তো আর সেই কাজলী নেই। ছোট নয়, বোকাও নয়। বড় হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে, আর ঘেন্না করতেও শিখেছে।

কাজলীরও কি আর কিছু বুঝতে বাকি আছে? মানিকপুরের বউঠাকরুণের অদ্ভুত ভাইটা যে একটা বে-আইনী প্রাণ, একথা কি আজ কাজলীরও অজানা আছে? কাজলী বোধহয় এখন স্বপ্ন দেখে ভয় পায়, বিজনবিহারী নামে একটা অস্পৃশ্য ছায়া ওর কাছে জল খেতে চাইছে। বোধহয় ঘুমের মধ্যেই ঘেন্না করে চেঁচিয়ে ওঠে কাজলী--সাবধান, তুমি আর এখানে এস না।

সত্যিই কি তাই? নাইট ডিউটি শেষ হবার পর হাতের লণ্ঠন আর শাবল নামিয়ে রেখে ইয়ার্ড

মাস্টারের অফিসঘরের কাছে পাথরের বেঞ্চিটার উপর চুপ করে বসে যখন হাঁপ ছাড়ে বিজন, তখন শিশির-ভেজা চাঁদটা ঘোলাটে হয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে ঘুরছে। রাতের আকাশটাকে ছেড়ে যাবার দুঃখে চাঁদটা যেন নিজের চোখের জলে মুখটাকে ভিজিয়ে দিয়ে ঘোলা হয়ে গিয়েছে। মনে হয়, জি কুঠুরির কালিঝুলিময় বুকটা সত্যিই একটা শাস্তির কয়েদঘর।

নিজেরই নিঃশ্বাসের শব্দগুলিকে শুনতে পায় বিজন, আর লজ্জাও পায়। নিঃশ্বাসের শব্দের মধ্যে যেন একটা ব্যাকুল লোভের শব্দও বেজে চলেছে। মানকর স্টেশনের সেই বুড়ো নিমকিওয়ালাকে আর একবার দেখবার জন্য মনটা ছটফট করে উঠছে। লোকটা কি এখনও বেঁচে আছে? তখনই তো তার বয়স ছিল আশীর কাছাকাছি।

লোকটা বোধহয় খুব লাজুক, নয়তো চালাক, নয়তো ভণ্ড, নয়তো ভীরু; বুড়ো নিমকিওয়ালার জন্য দরদ দেখাবার ছুতো করে মানকর স্টেশনে দাঁড়িয়ে শিবপুকুরের দিকে তাকিয়ে আছে।

যে প্রতিজ্ঞাটা কেষ্টনগরকে এক কথায় ঘেন্না করে আর তুচ্ছ করে চলে আসতে পেরেছে, সে প্রতিজ্ঞার সব জোর শিবপুকুরের কাছে হার মানতে চায় কেন? মনটা সত্যিই যে চোরের মত উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে যখন-তখন কাজলীর মুখটা দেখতে চায়।

চাচাজী টহলদার সিং আবার যেদিন দেখা হতেই চোখ টিপে টিপে হাসে, সেদিন সকালবেলায় ফোর ডাউন যেন বাংলা ভাষার একটা ঝংকার তুলে প্ল্যাটফর্মের গায়ে এসে লাগলো। ট্রেনের অন্তত দশটা কামরা বাঙালিতে ভর্তি। বুড়ো-বুড়ি, তরুণ-তরুণী, ছেলে-মেয়ে, সব বয়সের মানুষ কলকল করে হাসছে আর কথা বলছে। তার মধ্যে কাজলীর বয়সের মেয়েও আছে। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই, একজনও কাজলীর মত সুন্দর নয়।

আকাশের দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারে বিজন, শরৎকালের ডাক এসেছে। বাংলাদেশের আকাশের রঙ এখন নীলমণি গলানো রঙ। হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন—সেকেণ্ড পণ্ডিত গুরুদয়ালবাবুর হুংকার শুনেও আর অনেক চেষ্টা করেও এর পরের লাইনটা মুখস্থ করতে পারেনি বিজনবিহারী। তবু বুঝতে অসুবিধে নেই, শরৎকাল এসেছে, তাই বাঙালীর দল বঙ্গদেশে চলেছেন, কে জানে কোন্ ছাই বিবিধ রতন দেখবার জন্য।

ওরা ছুটি পেয়েছে, পুজোর ছুটি। ফোর ডাউন আবার বাংলা ভাষার ঝংকার তুলে চলে গেল।

চাচাজী ডাকে—এ বিজাওন।

বলুন।

তোমারও তো ছুটি পাওনা আছে।

আছে।

ছুটি নাও তবে।

কি দরকার?

আরে বুদ্ধু, ছুট্টিই যে একটা দরকার।

জবাব না দিয়ে নীরব হয়ে কি-যেন ভাবে বিজনবিহারী।

চাচাজী বলে—ছুট্টি পাওনা হলেও যে ছুট্টি নেয় না, সে বুদ্ধু আওরভি কিছু আছে; সে বুদ্ধু পাগল আছে।

বিজনবিহারীর মুখটা হঠাৎ করুণ হয়ে যায়। চাচাজীর মুখের দিকে তাকিয়ে আনমনার মত

বিড়বিড় করে বিজন—ছুটি নেব তবে?

চাচাজীও স্নেহকোমল স্বরে উপদেশ দেয়—লেও বেটা। ছুটি নিলে মেজাজ ভাল হয়, আর কাজেও আবার নতুন ফূর্তি পাওয়া যায়। —ইয়সানকা জান ধোবিকা কুত্তা নেহি হ্যায়, বিজাওন।

চমকে ওঠে বিজনবিহারী বাইশ বছর বয়সের বুকটা। না ঘটকা না ঘরকা, সত্যিই কি ধোবিকা কুত্তা হয়ে গেল বিজনবিহারীর জীবন?

ছয়

ভোরের চা-ওয়ালা হাঁক দেয়—মানকর।

ট্রেনটা থেমেছে। আর ট্রেনের একটা কামরার ভিতরে ঘুমন্ত বিজনবিহারীর স্বপ্নটাও যেন ডাক দিয়ে ফেলেছে—মানকর। আর দুচোখে যেন সেই স্বপ্নেরই আবেশ নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়ে বিজনবিহারী।

বুড়ো নিমকিওয়ালাকে দেখতে পাওয়া গেল না; কিন্তু কি আশ্চর্য, প্ল্যাটফর্মের সেই কাঞ্চন গাছটা আছে, যেটাতে টুকটুকে লাল ফুলের হাসি আলো হয়ে ফুটে থাকত। মানকর স্টেশনের চেহারা এই ছয় বছরের মধ্যে একটুও বদলে যায়নি।

কিন্তু একটানা হেঁটে শিবপুকুর পৌঁছে গিয়ে একটা মাটির বাড়ির আঙিনার উপর এসে যখন দাঁড়ায় বিজন, তখন বুঝতে আর বাকি থাকে না, শিবপুকুরের সব আলোছায়া বদলে গিয়েছে।

বটুকবাবু আশ্চর্য হয়ে বলেন—তুমি?

কাজলীর মা চমকে ওঠেন—তুমি?

সত্যিই কি বিজনকে দেখে ভয় পেলেন কাজলীর বাবা আর মা? বিজনকে কদমা ক্ষীর আর মুড়ি খেতে দিতে কোন ইচ্ছে নেই?

তাইতো মনে হয়। তা নাহলে আর একটাও কথা না বলে দুজনেই ঘরের ভিতরে চলে যাবেন কেন? দাওয়ার উপর রাখা ওই মোড়াটার উপর বিজনকে বসতে বলতেও দুজনেই ভুলে যাবেন কেন?

আঙিনার উপর মস্ত একটা আলপনার দাগ একটু ময়লা হয়ে গিয়েও এখনও হাসছে। ওটা কি তবে কাজলীর জীবনের একটা উৎসবের স্মৃতির দাগ? কাজলী আর এ-বাড়িতে নেই? কোন আশার ঘরে চলে গিয়েছে কাজলী?

তাইতো সন্দেহ করতে হচ্ছে। এ-শিবপুকুরে বোধহয় আজকাল আর গৌরীচাঁপা ফোটে না। পুরনো মন্দিরের পাঁচিলের গায়ের কাছে সে গাছটাকেও যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

শুনতে পায় বিজন, ঘরের ভিতরে বটুকবাবু যেন চেঁচিয়ে উঠলেন—যাস নি, সাবধান!

কাজলীর মা ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—যাস নি, যাস নি কাজলী!

কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে যেন চাঁপাফুলের একটা স্তবক ছুটে বের হয়ে এসে আর বিজনবিহারীর চোখের কাছে দাঁড়িয়ে হেসে ওঠে—চিনতে পার?

সত্যিই কাজলী। গৌরীচাঁপাও দেখতে বোধহয় এই রকমের। কাজলীর সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে টিপ, গলায় সোনার হার, পায়ে আলতা, আর খোঁপাতে রুপোর প্রজাপতি।

কাজলী বলে—আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। আর পনের দিন আগে এলে বিয়েটা দেখতে

পেতে, আর পেট ভরে লুচি-সন্দেশও খেতে পেতে।

বিজন হাসে—বড় ভুল হয়েছে।

কিসের ভুল?

সময়মত এলে বিয়ের নেমন্তন্নটা খেতে পেতাম।

সময়মত আসতে পারনি কেন? মনেই পড়েনি নিশ্চয়?

মনে পড়েছিল।

ছাই মনে পড়েছিল।

বিজন আবার হাসতে চেষ্টা করে—বিশ্বাস কর।

একটুও বিশ্বাস করি না। মনে পড়লে ছ'টা বছর এভাবে পালিয়ে থাকতে পারতে না। আগেই আসতে। তাহলে আজ আর...।

কি বলছ?

আজ আর বলে কোন লাভ নেই।

কি আশ্চর্য, কাজলীর চোখের পাতাগুলি যে ভিজে গিয়েছে। ঠোঁট দুটোও যেন ফুঁপিয়ে উঠতে চাইছে।

আমি কেন চলে গেছি, সেটা তুমি বোধহয় জান না।

খুব জানি। সবই জানি। সব শুনেছি।

তবে আর একথা বলছ কেন? আমি আগে এলেই বা কি হত?

সব হত।

চমকে ওঠে বিজন—কি বললে?

কাজলী—খুব স্পষ্ট করেই তো বলছি। তুমি হ্যাঁ বললে আমি না বলতাম না। কখ্খনো না। আমি যে সত্যিই ভেবেছিলাম, তুমি ঠিক সময়মত এসে পড়বে। না এসে পারবে না।

বটুকবাবু চেঁচিয়ে ডাক দেন—গো-গাড়ি তৈরি হয়েই আছে বিজন। বেলাবেলি মানিকপুরে পৌঁছে যাওয়াই ভাল।

বিজন বলে—গো-গাড়ির দরকার নেই মেসোমশাই, আমি মানিকপুর যাব না।

তবে কোথায় যাবে?

কোথাও না। বলতে বলতে পিছু ফিরে দাঁড়ায় বিজন, তারপরেই যেন একটা একরোখা ঝড়ের বাতাসের মত ছুটে চলে যায়।

মানকর স্টেশনের কাঞ্চন গাছটা তবু হাসছে। একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। সে ট্রেন কোথায় যাবে, কোন্ দিকে যাবে খোঁজ নিতেও ভুলে যায় বিজন। যেন ফেরারী আসামীর মত একটা উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি; ছুটে গিয়ে একটা কামরার ভিতরে ঢুকে পড়ে।

হাত তুলে কপালের ঘাম মুছতে গিয়ে মনে হয়, কপালটা বুঝি রক্তে ভিজে গিয়েছে। ভয়ানক একটা ঠাট্টার ভূত হেসে হেসে কপালের উপর কাঁটাভরা হাতের একটা চাপড় ঠুকে দিয়ে সরে পড়েছে। বাংলাদেশের আকাশ দেখবার লোভটা হোঁচট খেয়ে কাদার উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছে। খুব হয়েছে। শিবপুকুর কোন গাঁয়ের নাম নয়। শিবপুকুর একটা গলাধাক্কা শাস্তির নাম। বিজনবিহারীর দুরাশার প্রায়শ্চিত্তের নাম। চোর ফিরে এসে দেখেছে, তার চুরি-করা সোনার ঘড়া

চুরি হয়ে গিয়েছে।

ভালই হয়েছে। জব্বলপুরের ইয়ার্ড-মাস্টারের অফিস-ঘরের কাছে বেঞ্চির উপর বসে নাইট ডিউটির লাইনম্যানকে আর মাঝরাতের চাঁদের চেহারা দেখবার জন্য চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকতে হবে না। কালিঝুলি মাখা জি কুঠুরীর ঘুমটাও আর স্বপ্ন দেখবার সাহস করবে না। একটা বদ্ধ পাগল না হয়ে গেলে এরপর আর কাজলীর মুখটা মনে করবার দরকার হবে না।

এটা কোন স্টেশন? রাতই বা কত হল? যাত্রীতে ঠাসা এই কামরাটার এই বেঞ্চির এই কোণে একটা বাসি লাশের মত অসাড় হয়ে পড়ে থেকে কতক্ষণ ঘুমিয়েছে বিজন?

কিন্তু সত্যিই যে একটা স্বপ্নের কথা শুনতে পেয়ে ধড়ফড় করে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছে। কি আশ্চর্য, দুহাতে চোখ দুটো ঘষলেও যেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের এক কোণে কাঞ্চন গাছটা হাসছে; অথচ স্টেশনটা মানকর নয়, মানকর হতেই পারে না।

গোমো জংশন। এবং এই গোমোর এই প্ল্যাটফর্মের কোনদিকে কোন কাঞ্চন গাছ নেই। হেসে ফেলে বিজন। আর বুঝতেও পারে, বুকের ভিতরে সব নিঃশ্বাস যেন হাসছে। ভাবতে খুবই ভুল করেছিল বিজন। শাস্তি পেয়ে নয়, হেরে গিয়ে নয়, বিজনের প্রাণটা যে জয়ীর মত একটা তৃপ্তির উপহার নিয়ে, গৌরীচাঁপার মত মায়াফুলের মস্ত বড় একটা মালা গলায় দুলিয়ে চলে যাচ্ছে। কাজলী যে স্বপ্নের মধ্যেও এসে কথাগুলি শুনিয়ে দিয়ে গেল—আসতে দেরি করলে কেন?

কোন্ সাহসে এমন কথা বলতে পারে কাজলী? অথচ কাকে বলছে, তাও সে জানে। যার প্রাণটা পৃথিবীর কোন দাদা-দিদির ভাই নয়, [illegible] মায়ের ছেলে নয়। যার ছায়ার কাছেও কোন ভালমানুষের মেয়ে আসতে চাইবে না, আইন যাকে একটা মিথ্যেমানুষ বলে মনে করে, তাকেই আশা করেছিল কাজলী? কাজলী যেন সংসারের যত নিয়মের শাসন তুচ্ছ করে, একটুও ভয় না পেয়ে জানিয়ে দিয়েছে, বিজনবিহারীর প্রাণের জন্ম একটা অনিয়মের রহস্য হলেও তাকে ঘেন্না করতে, ঠাট্টা করতে আর দয়া করতে চায়নি কাজলী, ভালবাসতে চেয়েছিল।

ভালবেসেছিল বোধহয়। তা না হলে ওকথা অত স্পষ্ট করে বলবে কেন কাজলী?

তবে আর কিসের আক্ষেপ? কিছুই না। চাচাজীকে বরং হেসে হেসে শুনিয়ে দিতে পারা যাবে, তুমি যা বলেছিলে তার চেয়েও অনেক সুন্দর একটি নর্মদাকে আমি পেয়ে গেছি চাচাজী, যদিও তাকে তুমি কোনদিন আমার ঘরে দেখতে পাবে না। তাছাড়া, আমার যে কোনদিনই ঘর হবে না। ঘর করবার অধিকারও যে আমার নেই, কোথাও ঘর যদি বাঁধি, তবে লোকে সেই ঘরের দিকেও তাকিয়ে ঠাট্টার হাসি হাসবে, বেনো নদীর চরের গর্তে ক্ষেপা শেয়ালের ঘর দেখে মাচানের চাষী যেমন হাসে। ঠাট্টাটা যদি খুব ভদ্র হয়, তবে হয়তো দয়া করে বলবে, অদ্ভুত ঘর। মেজ জামাইবাবু যেমন মেজদিকে বলেন, তোমার সেই অদ্ভুত ভাই। মেজ জামাইবাবু মানুষটা তো অভদ্র নয়।

সুতরাং বিজনবিহারী পরোয়া করে না, চাচাজী। সে ঘর চায় না। ঘরকে সে ঘেন্না করে। তোমাদের নিয়মের দুনিয়াতে যত ঘর আছে, সব, সব ঘরকেই যত প্রেতের ঘর বলে মনে করে বিজনবিহারী।

সাত

আর জব্বলপুরে নয়।

নতুন রেললাইন পাতবার জন্যে যে সার্ভে পার্টি উড়িষ্যার জঙ্গল পার হয়ে আর তাঁবু ফেলে ফেলে পালামৌয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে, সেই পার্টির সঙ্গে চেনম্যান হয়ে কাজ করে দুটি বছর ফুরিয়ে যায়, তবু বিজনবিহারীর মনে এতটুকু আক্ষেপ নেই যে, জীবনটা যাযাবর হয়ে গেল। তাঁবুই ভাল। কোন জায়গায় এক মাসের বেশি ঠাঁই নিতে হয় না। জংলী হাতী তাড়াবার ডিউটিটা আরও ভাল লাগে। সারা রাত মশাল জ্বেলে জেগে থাকা, আর টিন পেটানো। যে সাহস কেউ করতে পারে না, সে সাহস করবার জন্য বিজনবিহারী যেন খুশি হয়ে এগিয়ে যায়। বাঁশের জঙ্গলের ভিতরে মট্‌মট্ হুটোপুটির শব্দ শোনা মাত্র ক্যাম্প থেকে বেরে হয়ে একশো গজ দূরের খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেবার ডিউটিটা বিজনবিহারী ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছে। চীফ সার্ভেয়ার সাহেব খুশি হয়ে বিজনবিহারীকে প্রত্যেকটি হাতী তাড়ানো সাহসের জন্য পাঁচ টাকা বকশিশ দিয়ে থাকেন।

আরও একটি বছর। সার্ভে পার্টির তাঁবু যেদিন কোয়েল নদীর এপারে এসে পৌঁছল, সেদিন চীফ সাহেব বললেন—হাম অব হোম চলেগা, মেম সাহেব বহুৎ কড়া চিঠি ছোড়া হ্যায়।

অদ্ভুত ব্যাপার। হোমপ্রিয় চীফ সাহেব এত লোকের মধ্যে বেছে বেছে চেনম্যান বিজনবিহারীকেই বললেন—ব্রেভ চেনম্যান, তুম্ ভি অব ঘর যাও।

ঘর নেহি হ্যায় সাহেব।

ঘর বানাও।

চমকে উঠেন বিজনবিহারী।

চীফ সাহেব—তুম আর্থ-কাটিংকা কন্ট্রাক্টর বন্ যাও। হাম বন্দোবস্ত কর দেগা।

হোম যাবার আগে চীফ সাহেব তাঁর প্রতিশ্রুতির কথাটা ভুলে যাননি। চীফ সাহেব হোম চলে যাবার পরে দুটো মাসও পার হয়নি, গোমোর রেল অফিস থেকে একটি চিঠি পেয়ে বুঝতে পারে বিজনবিহারী, নতুন লাইনের জন্য মাটি কাটবার ঠিকাদারী যদি করতে হয়, তবে ওই সিংহানী পাহাড়ের দক্ষিণে এক অজানা-অচেনা-জঙ্গলের বুকের ভিতর ঢুকে কোন মুণ্ডা কিংবা ওরাওঁ গাঁয়ের গাছতলায় খেজুর পাতার ছাউনি দেওয়া একটা ঠাঁই তৈরি করে নিতে হবে।

দেখে খুশি হয় বিজনবিহারী, না, খেজুর পাতার ছাউনি তৈরি করতে হবে না। উটগাড়ি থেকে নেমে, আর সড়কের মোড়ে দাঁড়িয়ে চারিদিকের জঙ্গলটার দিকে তাকিয়েও খুশি হয়। যেন বাইরের হৈ-হৈ সভ্য-ভব্যতার থেকে ফেরার হয়ে একটা শান্ত নিরালা এখানে এসে শালের হাওয়াতে খুশি হয়ে পড়ে আছে। একটা হালুয়াইয়ের দোকান, একটা সরাই-ঘর আর একটা মহুয়া-চোলাই ভাঁটি। মাটির দেওয়াল আর খাপরার চালা দিয়ে তৈরি তিনটে ক্ষুদে চেহারার বাড়িতে শুধু তিনটে মানুষ বাস করে,—হালুয়াই রামসিংহাসন, সরাইওয়ালা হীরারাম আর ভাঁটিদার গুলুমিঁয়া।

এই সরাই-ঘরে আর কতদিন থাকা যাবে? মাঝে মাঝে গরুর পিঠে শুকনো লঙ্কার বস্তা চাপিয়ে করনপুরার বেনিয়ারা যখন হাজির হয়, তখন সরাই-ঘরে আর লোক ধরে না। নেকড়ের ভয়ে গরু আর লঙ্কার বস্তা নিয়ে বেনিয়ারা সারা রাত ঘরের ভিতরেই গাদাগাদি করে পড়ে থাকে আর ঘুমোয়। লঙ্কার ঝাঁঝে ঘরের বদ্ধ বাতাস ঝাল হয়ে যায়। বিজনবিহারীর নাক জ্বলে। হেঁচে

হেঁচে সেই নাক-জ্বালাও শান্ত করে দিয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়তে পারে বিজনবিহারী।

রামসিংহাসন বলে—যতদিন না একটা ডেরা বানিয়ে নিতে পারেন, ততদিন আমার দোকানের পিছনের ঘরটায় থাকতে পারেন।

বিজনবিহারী বলে—বহুৎ আচ্ছা।

রোগা শালের খুঁটি, এবড়ো-খেবড়ো মাটির দেওয়াল আর খাপরার চালা, দরজায় কাঠের কপাট নয়—খেজুর পাতার একটা ঝাঁপ। ঘরটাকে দেখিয়ে দিয়ে রামসিংহাসন বলে—এর মধ্যে থাকতে যদিও আপনার বেশ কষ্ট হবে...।

বিজন বলে—বলেন কি? আমার পক্ষে এটা যে একটা কেল্লাঘর, রামসিংহাসনদাদা!

কিন্তু একবার যে কলকাতা যেতে হবে। কোদাল গাঁইতি আর শাবলের জন্য রেল কোম্পানীর সাপ্লাই এজেন্ট ভুরামল ব্রাদার্সকে ধরতে হবে, যেন অন্তত এক বছরের মেয়াদে মালটা ধারে দিতে রাজী হন।

কলকাতা যাবার পথে, রাতের মানকর স্টেশনটার দিকে ইচ্ছে করেই তাকায়নি বিজনবিহারী। সে কাঞ্চন গাছটা ফুলে ফুলে লাল হয়ে আছে কিনা কে জানে? না থাকতেও পারে। তিনটে বছরও তো কম দিনের ব্যাপার নয়।

কিন্তু ফেরবার পথে ভোরের মানকর স্টেশনকে দেখতে সত্যই যে ভোরের স্বপ্নের মত মায়াময় বলে মনে হল। পঁচিশ বছর বয়সের বিজনবিহারীর চোখের আশাও যে আবার উতলা হয়ে উঠতে চাইল। কাজলীকে দেখতে ইচ্ছে করে। শুধু একবার দেখা দিয়েই চলে আসা।

কাজলী কি এখন শিবপুকুরে আছে? থাকতেও পারে। কিন্তু থাকলেই বা কি?

কিছু নয়। কাজলী যদি সেদিনের মত কালো চোখের তারাদুটোকে আবার হাসিয়ে-কাঁদিয়ে বিজনবিহারীর মুখের দিকে তাকায়, তবে একথা বলে দিতে পারবে বিজন, না কাজলী, আমার মনে একটুও দুঃখ নেই। এই তিন বছর ধরে, একটি দিনও বাদ যায়নি, যেদিন তোমার কথা না ভেবে থাকতে পেরেছি। শুধু দুঃখ এই যে, জংলী হাতী তাড়াবার সময় ক্যাম্পের কশন বেড়া পার হয়ে খড়ের গাদায় আগুন ধরাতে গিয়ে জংলা হাতীর কাছে যদি প্রাণটা হারাতে হয়, তবু কাজলী কোনদিন জানতে পারবে না যে, মানুষটা মরবার আগে কাজলীরই কথা ভেবেছিল।

ট্রেন থেকে নেমে পড়ে বিজন। আর, ট্রেন ছেড়ে যাবার পর বুঝতে পারে, চোখের আশা আবার পাগল হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন চোখের সামনে একটা অলুক্ষুণে শূন্যতাও চমকে উঠছে। সেই কাঞ্চন গাছটা নেই।

শিবপুকুরের কাছারিবাড়ির নতুন সরকারমশাই ত্রিলোচনবাবুও একটু চমকে উঠেই বললেন—না, বটুক আর নেই। বটুকের স্ত্রীও নেই। দু'জনেই মারা গিয়েছে।

বটুকবাবুর মেয়ে?

সে অবিশ্যি আছে। কিন্তু থেকেও নেই।

কোথায় আছে?

তার শ্বশুরবাড়িতে আছে। মেয়েটি এই একবছর হল বিধবা হয়েছে।

কেন?

এতো বড় আশ্চর্য প্রশ্ন। কেন মানে কি? একটা ক্ষয়রোগী মানুষের সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে হয়,

সে মেয়ে কতদিন সধবা থাকতে পারে?

বটুকবাবুর মেয়ের শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

গাঁয়ের নাম বেনুগ্রাম, দুবরাজপুর স্টেশনে নামতে হয়।

শ্বশুরের নাম?

তা জানি না। তবে শুনেছি, বটুকের বেয়াই হলেন নামকরা দৈবজ্ঞী। বলেছিলেন বেয়াই, তুমি নাতির বিয়ে দেখে যাবে বটুকবাবু, হুঃ!

আচ্ছা, আমি যাই, নমস্কার।

তুমি কে বট?

আমি কেউ না।

কাজলীকে দেখবার জন্য চোখের আশা পাগল হয়েছিল, এইবার যেন চোখের জ্বালাটা পাগল হয়ে ওঠে। তুমি এ কেমন ঘর পেলে কাজলী? এমন ঘরের জীবন যে আমার ঘরছাড়া জীবনের চেয়েও শূন্য জীবন। ভাগ্য আর আইন না হয় আমার জন্মের ভুল ধরে আমাকে অমানুষ বলে দাগী করে দিয়েছে, কিন্তু আইনের আর ভাগ্যের ভগবানেরা তোমাকে অমানুষ করে দিল কেন?

দুবরাজপুরের কাছেই বেনুগ্রাম, মাঝে শুধু তাঁতীদের একটা গাঁ পার হতে হয়। দৈবজ্ঞীবাড়িটা খুঁজে নিতে দেরি হয় না। বাড়ির কর্তা হাতের হুঁকো নামিয়ে রেখে আর চোখ বড় করে তাকান—কাজলী আবার কে?

বিজন বলে—শিবপুকুরের বটুকবাবুর মেয়ে।

কাশির বেগ চেপে কথা বলেন কর্তা—বল না কেন, নিরুপমা! যাই হোক... তুমি কে?

আমি শিবপুকুর থেকে আসছি।

বউমার দেশের লোক? বেশ কথা। কিন্তু তুমি এখানে এই দোর-গোড়াতেই দাঁড়াও বাপু। আমি বউমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কাজলী এসেই হাসতে থাকে।—কাজলী কাজলী করছিলে কেন? ও নামটা কি এখন আর আমাকে সাজে? না, তোমারও এই বয়সের মুখে সাজে? আমার নামটা যে নিরুপমা, সেটুকুও কোনদিন বোধহয় জানতে চেষ্টা করনি?

বিজন হাসে—না, করিনি।

ভালই করেছিলে, জেনেই বা লাভ কি?

কেমন আছ?

ভালই আছি। বিশজন মানুষের জন্য দুবেলা ভাত রাঁধি আর বাসন মাজি।

আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে একটিও বাজে কথা বলতে পারব না। শুধু জানতে চাই...।

চুপ কর। এটা আমার শ্বশুরবাড়ি।

তোমার অভিশাপের বাড়ি।

ছিঃ, ওকথা বলতে নেই।

না বলে উপায় নেই। তুমিই না একদিন বলেছিলে...।

কি বলেছিলাম?

বলেছিলে, তুমি ছাড়া আমার নাকি গতি নেই।

একটা একরত্তি মেয়ের মুখের সেই কথাটা এখনও মনে করে রেখেছ?

মনে করে রেখেছি, আর সেইজন্যেই বলতে এসেছি।

বল।

আমি ছাড়াও তোমার গতি নেই!

তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে এত ভয় দেখিয়ো না।

ভয়?

এত লোভ দেখিয়ো না, তোমার পায়ে পড়ি।

আমি তোমার কোন আপত্তি শুনব না।

সাদা থানে জড়ানো নিরুপমার রিক্ত মূর্তিটা থরথর করে কাঁপে।

কি বলতে চাইছ, বল।

আমার সঙ্গে চল।

মাপ কর।

না।

তবে ভাবতে দাও।

না। তোমাকে আমি চুরি করতেই এসেছি।

ভাবতেও যে বুক কাঁপছে।

কেন?

ভয়ে।

কার ভয়ে? কিসের ভয়ে! ওই কেষ্টনগর আর বেনুগ্রামের ভয়ে। আমি যাদের চোখে একটা অমানুষ, আর তুমি যাদের চোখে একটা দাসী, তাদের ভয়ে? না, এখনই চল।

চোরের মত নয়, ডাকাতের মত কথা বলছে বিজনবিহারী। নিরুপমার সেই ভীরু চোখ দুটো দেখে আশ্চর্য হয়, ডাকাতের চোখের জ্বালা জলে ভরে গিয়ে ছলছল করছে।

কিন্তু তখনই নয়। মাঝরাতের অন্ধকারের সঙ্গে মিশে একটা ছায়া দস্যু যেন বেনুগ্রামের দেউলের কাছে অজগরের মাথার মানিক লুট করবার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। নিরুপমা আসে। নিরুপমার মাথাটা দুহাতে জড়িয়ে, নিরুপমার জলভরা ভীরু চোখ দুটোকে বুকের কাছে একবার চেপে ধরে শান্ত করে দিয়েই বিজনবিহারী বলে—চল, কোন ভয় নেই নিরু।

আট

শুধু বাঙালিবাবুর যত দুঃসাহসের কাণ্ড দেখে নয়, বাঙালীবাবুর এই জেনানারও সাহসের রকম-সকম দেখে আশ্চর্য হয় রামসিংহাসন। নতুন রেললাইনের জন্য মাটি কাটবার ঠিকে পেয়েছে নিতান্ত ছোকরা বয়সের এই বাঙালীবাবু, কিছু টাকা লাভ রাখে ঠিকই, আর কাজের দায়ে দশ বিশ ত্রিশ মাইল দূরেও চলে যেতে হয়। কিন্তু সেজন্য কি ভুলে গেলে চলে যে, সন্ধ্যার আগেই ঘরে ফিরে আসা উচিত? এই জঙ্গলের রাজ্যে সন্ধ্যাটাই যে সবচেয়ে ভয়ানক একটা লগ্নকাল; ভুখা জানোয়ার যখন শিকার ধরবার জন্য মরিয়া হয়ে ছুটোছুটি করে।

কিন্তু বাঙালিবাবু সন্ধ্যা না হবার আগে ঘরে ফেরে না। বাঙালীবাবুর জেনানা, অল্পবয়সের

ওই মেয়েটা. সারাটা দিন একা-একা ঘরের ভিতর থেকে শুধু খুট-খাট ঠুং-ঠাং ধুপ-ধাপ কাজ করে। কাদা মাটি দিয়ে দেওয়ালের ফাটল জোড়া দেয়, গোবর দিয়ে আঙিনা নিকোয়, কাঠের মুগুর দিয়ে ধানের তুষ ভাঙে আর কাটারি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে কাঠ চেলা করে। আর, ঘর তো ওই নড়বড়ে ঘর, যার দরজায় কাঠের কপাটও নেই, শুধু খেজুরপাতার একটা ঝাঁপ।

সন্ধ্যা হতেই দোকানঘরের টিনের ঝাঁপ নামিয়ে দিয়ে, আর কেরোসিনের কুপির কাছে বসে, জীর্ণ তুলসী রামায়ণটা হাতে তুলে নিয়ে এক-একদিন চমকে ওঠে রামসিংহাসন। একটা নেকড়ে ঘরের চারিদিকে খ্যাঁক-খ্যাঁক করে ছুটছে। অথচ বাঙালীবাবু এখনও ঘরে ফেরেনি। বউটা একা-একা ঘরের ভিতরে বসে রান্না করছে!

রাম রাম! ডরো মত্ দিদি। হাঁক দেয় রামসিংহাসন। কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝতে পারে, বাঙালীবাবুর বউ একটুও ভয় না পেয়ে, উনুন থেকে জ্বলন্ত চেলাকাঠ তুলে নিয়ে অন্ধকারের ভিতরে লুকানো ওই খ্যাঁক খ্যাঁক শব্দটার গায়ে ছুঁড়ে মেরেছে।

যেমন এই বাঙালীবাবু তেমনই তাঁর বউ, দুজনেই কি ভয়ানক বেপরোয়া হয়ে খাটতেও পারে! সড়কের ওপারে, একটু দূরে, কাঁচা-ইঁটের দেওয়াল তুলে বাড়িটা তৈরি করবার সময় বাঙালীবাবু তাঁর মুণ্ডা মজুরদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সমানে কাজ করেছে। নিজেই ইঁটের ছাঁচ তৈরি করে নিয়েছে। নিজেও দুহাতে কাদা ঘেঁটে ইঁট গড়েছে। টাঙি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে শালের রোলা কেটেছে। সাত দিনের মধ্যে খুঁটো পুঁতে আর বাঁশ পেতে ঘরের ছাউনির ঠাট তৈরি করে ফেলেছে। ছাউনির উপর বসে খাপরা চেলেছে বাঙালীবাবু; বউটাও শক্ত করে কোমরে আঁচল জড়িয়ে, আর একটা চঙের উপর দাঁড়িয়ে বাঙালীবাবুর হাতের কাছে খাপরা যোগান দিয়েছে।

নতুন ঘরে ঢুকে যেদিন সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালে নিরুপমা, সেদিন নিরুপমার আলোমাখানো মুখের হাসিটার দিকে তাকিয়ে বিজনবিহারীর হৃৎপিণ্ডেরই একটা তৃপ্তি যেন হেসে ওঠে।

সন্ধ্যাটাকে সন্ধ্যা বলে মনে হয় না বিজনবিহারীর নতুন অদৃষ্টের ঘরে যেন ভোরের আলো উঁকি দিয়েছে। এই তো সবে মাত্র শুরু হল। যা চাই, যা না হলে চলে না, তার সবই পেতে হবে। কারও কাছে ভিক্ষে করে নয়, বিজনবিহারী তার এই গায়ের আর এই প্রাণের জোরে সব আদায় করে ছাড়বে।

নিরুপমার হাত ধরে নতুন ঘরের দাওয়ার উপর বসে যখন গল্প করে হাসতে থাকে বিজনবিহারী, তখন সেই জংলী নিরালার বুকটাও যেন সঙ্গে সঙ্গে হাসতে থাকে। চৈত্র মাসের শালের কচি পাতাও নতুন বাতাসের ছোঁয়ায় ঝিরঝির করে নতুন হাসির শব্দ ছড়াতে থাকে।

ফেরারী আসামীর ভীরু হাসি নয়, ফেরারী অভিমানীর করুণ হাসিও নয়, যেন এক ফেরারী বিদ্রোহীর অনাহত প্রতিজ্ঞার হাসি। পুরনো ভাগ্যটা যা-কিছু কেড়ে নিয়েছে, নতুন ভাগ্যটা তার সবই কেড়ে আদায় করে ছাড়বে। দেখি কার সাধ্যি আছে, বিজনবিহারীর এই ঘরের দিকে তাকিয়ে আর ঠাট্টার হাসি হেসে বলতে পারে, এটা একটা অদ্ভুত ঘর?

রামসিংহাসন তো এরই মধ্যে আশ্চর্য হয়ে গিয়ে তিনবার বলেছে, বাঙালীবাবুর ঘরনার মত ঘরনী তো কাঁর্হভি না দেখি। বনবাসিন সীতাজি যৈসন পতিপূজন লাগু...।

নিরুপমার সন্ধ্যাপ্রদীপের আলোটা এই জংলী নিরালার বুকে সত্যিই একটা নির্ভয়ের আলোর সঞ্চার। তা না হলে হালুয়াই রামসিংহাসন. সরাইওয়ালা হীরারাম আর ভাঁটিদার গুলু নিঁয়া.

তিনজনেই তিনটে মাস যেতে না যেতে দেশের বাড়ি থেকে বউ আনিয়ে ফেলতে সাহস পেত না। এখানে ঘর-সংসার করা যায়, এই বিশ্বাস যে এই বাঙালীবাবুর ঘরের আলোটাই ফুটিয়ে তুলেছে।

ক'বছরের মধ্যে যে অনেক কিছু পেয়ে গেল বিজনবিহারী। ঘরের গা ঘেঁষে চারটে শিউলি ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল। ঘরটাও যে একটা নাম পেয়ে গেল—শিউলিবাড়ি। স্টেশনটারও নাম শিউলিবাড়ি। পাঁচ মাইল দূরে যে কোলিয়ারিটা প্রথম দেখা দিল, সেটারও নাম শিউলিবাড়ি কোলিয়ারী। মুণ্ডারা বলে, সিলুয়াডি কলিয়ারি। বিজনবিহারীর পুরনো নামটাকেও মাটি করে দিল একটা নতুন নাম—মাটিসাহেব। বেশ নাম। বিজনবিহারীর প্রাণের সেই প্রতিজ্ঞার স্বপ্নটা যে পাহাড়ে আর শালবনে ঘেরা এই চমৎকার এক টুকরো জগৎটার মাটি দিয়ে সুখের ঘর তৈরি করে নিতে পেরেছে। এই মাটি বিজনবিহারীর স্বপ্নের বন্ধু; বিজনবিহারীও এই মাটির স্বপ্নের বন্ধু।

যেমন শিউলিবাড়ির সড়কের দুপাশে, তেমনই স্টেশনের আশেপাশে কত নতুন ঘর উঠছে, নতুন দোকান বসছে। ঝুমরা রাজ এস্টেটের তশীলদার ফুলনবাবুও এসে একটি কাছারি বসিয়েছেন। মাটিসাহেব সবারই দরকারের বন্ধু। সরাই মাটিসাহেবের ইচ্ছা উপদেশ আর পরামর্শের বন্ধু।

ধর্মশালা কমিটির প্রথম প্রেসিডেন্ট বিজনবিহারী। সরাইওয়ালা হীরারাম স্টেশনে পানিপাঁড়ের কাজ নেবার পর সরাইটা বিনা যত্নের দুঃখে একেবারে ভেঙে গলে একটা ঢিবি হয়ে পড়েছিল। নতুন দোকানীদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে ইঁট কেনা হল, আর কাঠ কেনবার সব খরচ দিল বিজনবিহারী। পুরনো সরাইয়ের যত ধ্বংসের জঞ্জাল সরিয়ে নতুন ধর্মশালা তৈরি হতে শুরু হল যেদিন, সেদিনও রামসিংহাসন দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়, বাঙালীবাবু গাছতলায় দাঁড়িয়ে আর একটা করাত হাতে নিয়ে শাল কাঠের পাটা চিরছে। কারণ, দেওয়াল গাঁথবার জন্য ভারা বাঁধতে হবে, অথচ তক্তা নেই, আর কাঠুরে মিস্ত্রিটাও আসেনি।

শিউলিবাড়ি রাস্তা কমিটিরও প্রথম প্রেসিডেন্ট বিজনবিহারী। স্টেশন থেকে শুরু করে সড়কের মোড় পর্যন্ত প্রায় আধ মাইল লম্বা যে রাস্তাটার দুপাশে নতুন নতুন বস্তি, গোলা, দোকান আর আড়ত গড়ে উঠেছে, সে রাস্তাটা রাস্তাই নয়। বড় বড় গর্তে ভরা সে রাস্তায় চলতে গিয়ে গরুরগাড়ির ধড় মচকে যায়, চাকা ছিটকে পড়ে। শিউলিবাড়ির সব মানুষের কাছ থেকে মাসিক এক আনা চাঁদা নিয়ে রাস্তাটার উপর খোয়া বিছাই করতে হবে। তা ছাড়া অন্তত চারটে ল্যাম্প পোস্টও বসাতে হবে।

শিউলিবাড়ি রক্ষা সমিতির প্রথম সেক্রেটারি মাটিসাহেব, সভাপতি তশীলদার ফুলনবাবু। কাগজ-কলম হাতে নিয়ে নয়, পুরো তিনটে মাস রোজ রাতে লম্বা একটা বল্লম হাতে নিয়ে সেক্রেটারির কাজ করেছে বিজনবিহারী। খবর পাওয়া গিয়েছে, বিরসা মুণ্ডার দল আবার ক্ষেপেছে। একটা দল নাকি এদিকে এসে তশীলকাছারি লুট করবে আর পোড়াবে। দোকানীরাও ভয় পেয়েছে, হামলা যদি হয়, তবে ওরাও কি রেহাই পাবে? স্টেশনটার উপরেও হামলা হতে পারে। ক্যাশব্যাগ বগলদাবা করে স্টেশনমাস্টার চৌধুরীবাবু রোজ রাতে এক ভিখিরী বুড়োর কুঁড়ে ঘরের ভিতরে বসে-শুয়ে আর জেগে-ঘুমিয়ে রাত পার করে দেন। তশীলদার ফুলনবাবুও আতঙ্কিত হয়ে আবেদন করেন—একটা কিছু করুন মাটিসাহেব। আপনি না করলে করবে কে?

পঁচিশ জন লোক, পঁচিশটা লাঠি আর পাঁচটা মশাল—আগে আগে মাটিসাহেব বিজনবিহারীর বল্লমের ফলক মশালের আগুনের আভা লেগে চিকচিক করে। সারারাত টহল দিয়ে বেড়ায় রক্ষা

সমিতির পাহারা-পার্টি। অমাবস্যার মাঝরাতে তশীলকাছারির উপর এক ঝাঁক তীরও ছুটে এসে পড়েছিল। কিন্তু বিজনবিহারীর দলের হাল্লা অমাবস্যার অন্ধকার কাঁপিয়ে দিতেই তীরছোঁড়া আক্রোশটা যেন আড়াল দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

একমাস পরে, দশ মাইল দূরের থানাতে গিয়ে ডি এস পি'র হাত থেকে একটি উপহার নিয়ে যেদিন শিউলিবাড়ি ফিরে এল বিজনবিহারী, সেদিনটা শিউলিবাড়ির জীবনে যেন একটা মহোৎসবের দিন। পঞ্চাশ জন খুশি মানুষের একটা মিছিল, তার মধ্যে রামসিংহাসন আছে, মিয়াঁ আর হীরারামও আছে, দশ মাইল পথ বিজনবিহারীর পালকির সঙ্গে হেঁটে হেঁটে থানাতে গেল আর ফিরে এল। তশীলদার ফুলনবাবু নিজের হাতে পালকিটাকে ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। রামসিংহাসন নিজের হাতে একটা মালা বিজনবিহারীর গলায় পরিয়ে দিয়েছিল।

শিউলিবাড়ি রক্ষা-সমিতির সেক্রেটারি বিজনবিহারীকে একটা একনলা বন্দুক উপহার দিয়েছেন সরকার। সেইজন্যেই সারা শিউলিবাড়ির বুকে এই আহ্লাদের উৎসব।

মিছিলটা যখন ফিরে এসে বিজনবিহারীর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে জয়ধ্বনি হাঁকে—মাটিসাহেব কি জয়, তখন শিউলিবাড়ির রাতের আকাশে মস্ত বড় চাঁদ উঠেছে। যেন জ্যোৎস্নামাখা শিউলিবাড়ির অন্তরাত্মা জয়ধ্বনি হাঁকছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নিরুপমার চোখদুটোও যেন জ্যোৎস্না ছড়িয়ে হাসতে থাকে। ওই মানুষটা, নিরুপমার হাতে নিজের হাতে শাঁখা পরিয়ে দিয়েছে যে, তাকে যে সত্যিই মানুষের রাজা বলে মনে হয়। এই তো, মাত্র পাঁচটা বছর পার হয়েছে, কিন্তু এরই মধ্যে কেষ্টনগরের ভাগ্য হারানো ছেলে সত্যিই যে নিজের হাতে একটা সম্মানের রাজ্য তৈরি করে নিল।

মাটিসাহেব সেলাম! মাটিসাহেব আদাব! বন্দেগী মাটিসাহেব! সাইকেল চেপে আর বন্দুকটা পিঠে বেঁধে যখন সড়ক ধরে এগিয়ে যায় ত্রিশ বছর বয়সের বিজনবিহারী, তখন বুড়ো বুড়ো দোকানীও হাত তুলে অভিবাদন জানায়। স্টেশনমাস্টার চৌধুরীবাবুও বলেন—আপনি না থাকলে আমি এখান থেকে কবেই ট্রান্সফার নিতাম মাটিসাহেব। ক্ষেপা জংলীর তীরের ভয় মাথায় করে এখানে চাকরি করা আমার বুড়ো হাড়ে পোষাতো না।

না, আর ভয়টয় নেই। আপনি এখানে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন।

কিন্তু ইয়েতেও যে পোষাচ্ছে না মাটিসাহেব। এই একরত্তি একটা ফ্ল্যাগ স্টেশন, শুধু কয়লাগাড়ি যায় আর আসে। কি ইনকাম হবে বলুন?

হবে হবে। শিউলিবাড়ির এ অবস্থা চিরকাল থাকবে না। হেসে হেসে চৌধুরীবাবুকে যেন একটা আশ্বাস দিয়ে চলে যায় বিজনবিহারী।

চৌধুরীবাবু যদিও বাংলা কথা বলেন, কিন্তু বাঙালী নন, তিনি হলেন মুঙ্গেরী চৌধুরী। তা না হলে বিজনবিহারী এই চৌধুরীবাবুর সঙ্গে এরকম হেসে হেসে কথা বলতেন না। কথা বলতেনই কিনা সন্দেহ। অনেকদিন রাণীগঞ্জে ছিলেন চৌধুরীবাবু বেচারা টাকা-পয়সার হিসাবে কি-যেন একটা গোলমেলে কাণ্ড করে আর ধরা পড়ে এই জঙ্গলের ফ্ল্যাগ স্টেশনে শাস্তির বদলি নিয়ে এসেছেন। কে জানে কেন, বিজনবিহারীও বুঝতে পারে না এই দুর্নামের চৌধুরীবাবুর সঙ্গে যেন একটু মায়া করে কথা বলতে ভাল লাগে।

নিরুপমা বলে—সকলকেই তো ভরসার কথা শুনিয়ে বেড়াচ্ছ, শুধু আমার বেলায় ফাঁকি।

বিজনবিহারীর হাতটা নিরুপমার কাঁধের উপরে পড়ে আছে, চোখের সামনে শিউলিগাছটা দুলছে, আকাশ ভরে তারা গিজগিজ করছে। কথাটা বলে ফেলেই আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকে নিরুপমা।

তারার আলোতে জোর না থাকুক, কিন্তু বিজনবিহারীর এই চোখের আলোতে বেশ জোর আছে। দেখতেও পায় বিজনবিহারী, নিরুপমা যেন আঁচল চাপা দিয়ে একটা অদ্ভুত বিহ্বলতার হাসি লুকিয়ে ফেলতে চাইছে।

ফাঁকি? তোমাকে? বিজনবিহারীর গলার স্বরে যেন একটা নিরীহ বিস্ময় চমকে ওঠে।

হ্যাঁ।

বলেই ফেল, কিসের ফাঁকি?

উত্তর দেয় না নিরুপমা। শুধু চোখ তুলে বিজনবিহারীর মুখটাকে ভাল করে দেখতে চেষ্টা করে।

বল। আবার জানতে চায় বিজনবিহারী।

নিরুপমা হেসে ওঠে—যাঁতা যাঁতা। কতবার বললাম, ছোট্ট একটা পাথরের চাক্কি যোগাড় করে দাও, নইলে ডাল ভাঙতে আর পারছি না। বড় যাঁতাটায় ডাল গুঁড়ো হয়ে যায়।

বিজনবিহারী—তাই বল। আমি মনে করলাম আজ সকালে রামসিংহাসনের বউ এসে যে ফাঁকির কথাটা বলে গেল...।

চমকে ওঠে নিরুপমা। এই অন্ধকারের মধ্যেই বিজনবিহারীর চোখের ধূর্ত হাসিটাকে দেখতে পায় নিরুপমা। সঙ্গে সঙ্গে নিরুপমার মাথাটা যেন অলস হয়ে আর হেঁট হয়ে বিজনবিহারীর বুকের কাছে ঝুঁকে পড়ে।

ঠিক কথা, আজই সকালে এসেছিল রামসিংহাসনের বউ বিন্ধ্যাচলী। বোধহয় মনে করেছিল, বাঙালীবাবু বাড়িতে নেই, তাই রান্নাঘরের দরজার কাছে বসে একেবারে মুখ খুলে আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলেছিল বিন্ধ্যাচলী।—পাঁচ বছর ধরে তুমি কি শুধু ভাত খাচ্ছ দিদি? আর কিছু খাও না?

কি বললে?

বিন্ধ্যাচলী—আমার তো এই পাঁচ বছরে তিনটে হয়ে গেল। তুমি করছ কি?

চুপ কর।

বিন্ধ্যাচলী—না দিদি, একটুও ভাল লাগে না। বাঙালীবাবুকে তুমি বড় ফাঁকি দিচ্ছ দিদি।

নিরুপমা—চুপ কর। জান না, বোঝ না, শুধু যত বাজে কথা...।

বিন্ধ্যাচলী একটুও অপ্রতিভ না হয়ে আরও জোরে চেঁচিয়ে কথা বলে—তুমি কাজে দেখাবে, তবে তো আমি বাজে কথা বলব না। আহা, কেমন সুন্দর হত, যদি তোমার কোলে একটি ফুলফুলুয়া ভুলভুলুয়া টুপুল-টুপুল গোলগাল...।

ছিঃ, চেঁচিয়ো না বিন্ধ্যাচলী।

সবই শুনেছিল বিজনবিহারী। নিরুপমার হেঁটমাথাটা তুলে ধরে আবার একটা ধূর্ত হাসি হাসে বিজনবিহারী—কিন্তু রামসিংহাসনের বউ তো বলে গেল, তুমি আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ।

সেই মুহূর্তে বিজনবিহারীর চোখের ধূর্ত হাসিটা যেন অপ্রস্তুত হয়ে চমকে ওঠে, করুণ হয়ে যায়। কেঁদে ফেলেছে নিরুপমা। দুচোখ থেকে ঝরঝর করে জল পড়ে বিজনবিহারীর গেঞ্জির বুক ভিজিয়ে দিয়েছে।

কি হল, নিরু? এর মানে কি?

সত্যিই তোমাকে ফাঁকি দিলাম মনে হচ্ছে।

তার মানে?

তোমার ঘরে শুধু আমিই পড়ে থাকব, আর কেউ আসবে না।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে বিজনবিহারী—পাগল কোথাকার? এমন বাজে কথা ভেবেও মানুষ মাথা খারাপ করে?

না, একটুও বাজে কথা নয়। তুমি আমাকে ঘর দিলে, আর আমি তোমাকে ঘরের আনন্দ এনে দিতে পারলাম না; আমার যে একটুও ভাল লাগছে না।

ছিঃ, এসব কি বলছ? তুমি কি মরে গেছ, না মরে যেতে বসেছ যে, এত হতাশ হয়ে কথা বলছ?

সেই তো ভয়। যদি হঠাৎ মরে যাই, আর তোমার ঘরে কাউকে রেখে না যেতে পারি, তবে তুমি থাকবে কি নিয়ে? আমি যে হেসে হেসে মরতেও পারব না।

বিজনবিহারী—আমি বলছি নিরু, এসব নিতান্ত মিথ্যে ভয়।

নিরুপমা—আমার মাথা ছুঁয়ে বল, তুমি বললেই আমার সব ভয় মিথ্যে হয়ে যাবে।

সত্যিই নিরুপমার মাথাটা ছুঁতে হয়, তা না হলে বোধহয় আশ্বস্ত হবে না নিরুপমা—আমি বলছি নিরু, কোন ভয় নেই।

যাই হোক...। বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়ে, গা-মোড়া দিয়ে আর হাই তুলে, বুক টান করে আর হাত দুটোকে ঝাঁকুনি দিয়ে এপাশে-ওপাশে ছুঁড়ে, তখনি যেন একেবারে অন্যরকমের একটা মানুষ হয়ে গিয়ে হেসে ফেলে বিজনবিহারী।

নিরুপমাও জানে, এটা বিজনবিহারীর একটা কাজমাতাল চেহারা। সময় অসময়ের ধার ধারে না। ঘুম বিরাম ক্লান্তি, কিছুই মানে না। কাজ করবার জন্য প্রাণটা যখন ছটফটিয়ে ওঠে, তখন ঠিক এই রকমের মূর্তি ধরে বিজনবিহারী।

যাই হোক, তার আগে তোমার যাঁতাটা তো চাই। লণ্ঠনটা একবার নিয়ে এস নিরু।

নিরুপমা—না কখ্খনো না। এখন কোন কাজ নয়। তুমি এখন ঘুমোও গে।

দাওয়া থেকে নেমে, শিউলিতলায় জড়ো করা একগাদা ছোট বড় পাথরের চাঙড় থেকে ছোট্ট একটা চাঙর তুলে নিয়ে এসে ব্যস্তভাবে বলে বিজনবিহারী—ছেনিটা আর হাতুড়িটা দাও।

না, আর বাধা দেবার কোন মানে হয় না। বাধা দিয়ে কোন লাভ হবে না। বিজনবিহারীর দু'হাতের পেশী ও শিরা এখন রাত জেগে শুধু কাজ করবে, কোন বাধা মানবে না।

ঠুক-ঠাক ঠুন-ঠান, ছেনি চালিয়ে আর হাতুড়ি ঠুকে এবড়ো-খেবড়ো পাথরটার চাকলা তুলতে থাকে বিজনবিহারী। আহত পাথরের কুচি জ্বলন্ত ফুলকি হয়ে ছিটকে পড়তে থাকে। বিজনবিহারীর পশে বসে হাতপাখা দোলায় নিরুপমা।

আকাশে আধখানা চাঁদ যখন দেখা দিয়েছে, শিউলির মাথা থেকে রাতের শিশির টুপ টাপ করে ঝরতে শুরু করেছে, তখন কথা বলে বিজনবিহারী—এই নাও তোমার যাঁতা। কাল সকালে শুধু ফিনিস দিয়ে ছেড়ে দেব। তারপর যত ইচ্ছে ডাল ভেঙো।

শুধু এই পাথুরে যাঁতাটা কেন, ঘরের ভিতরে কাঁঠালকাঠের ওই খাট দুটোও যে বিজনবিহারীর

নিজের হাতের কারিগরীর সৃষ্টি। করাত কাটারি ছেনি হাতুড়ি রেতি র‍্যাঁদা তুরপুন প্যাঁচ-কস—রাংতা-ঝাল, শিরীষ আঠা, সোহাগা—একটা প্রকাণ্ড কাঠের সিন্দুক যে বিজনবিহারীর কারিগরী কাজের যত সরঞ্জামে আর হাতিয়ারে ভরে আছে। আলনাটাকেও একদিনের মেহনতে তৈরি করেছিল বিজনবিহারী। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে এতগুলি মোড়া আর এই ডিজাইনের মোড়াও বিজনবিহারী নিজেই তৈরি করে নিয়েছে। তালের পাতা কেটে হাতপাখা তৈরি করতে নিরুপমাও জানে। কিন্তু খেজুর পাতার হ্যাট? এটা বিজনবিহারীর একটা শখের সাধনার সৃষ্টি। একগাদা খেজুর পাতা আর ছোট একটা ছুরি হাতে নিয়ে, আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা যেন ধ্যানীর মত মন নিয়ে ভেবেছে বিজনবিহারী? একমাসের চেষ্টার পর স্বপ্ন সফল হয়েছে। বাঁধন-ছাদন নেই, একটা গিঁটও দিতে হয় না. শুধু গুনে গুনে পাতা সাজাবার আর ভাঁজ করবার কায়দার জোরে চমৎকার হালকা একটা হ্যাট তৈরি হয়ে যায়।

এ হ্যাট তোমাকেও চমৎকার মানাবে নিরু। কৃতার্থতার খুশিতে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠেছিল বিজনবিহারীর চিৎকারটা। নিরুপমা বলেছিল—তুমি পরিয়ে দিলে মানাবে বইকি।

নিরুপমার মাথায় হ্যাট পরিয়ে দেবার সুযোগ অবশ্য পায়নি বিজনবিহারী। ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল নিরুপমা।

নয়

দামোদরের উৎসটা খুঁজে বের করতেই হবে, আবার এক অদ্ভুত শখের প্রতিজ্ঞার কথা নিরুপমাকে শুনিয়ে দিয়ে যেদিন শিউলিবাড়ির এই ঘরের দরজা পার হয়ে চলে গেল বিজনবিহারী, খাকি কামিজ আর প্যান্ট, পিঠের উপর বাঁধা বন্দুকটা, মাথায় খেজুর পাতার হ্যাট—একটা কর্মঠ সুন্দরতা, একটা সুপুরুষ দুঃসাহস হেসে-হেসে সাইকেল চালিয়ে যখন সড়কের দু-পাশের যত গাছের ছায়ার ভিড়ের ভিতরে উধাও হয়ে গেল, তখন নিরুপমার বুকের ভিতরে একটা আক্ষেপ যেন ছটফটিয়ে মাথা কুটতে থাকে। ভুল হল, ভুল হল। বলে দেওয়াই ভাল ছিল। যেতে না দিলেই ভাল হত।

দামোদরের উৎসটা দূরের ওই মেঘ-মেঘ রঙের পাহাড়গুলোর কাছে কোথায় যেন লুকিয়ে আছে, কে জানে কোন্ পাহাড়ের গায়ে? পায়ের কাছে, না বুকের কাছে, না মাথার কাছে, তাই বা কে জানে? ফুলনবাবু বলেছেন, ডেপুটি কমিশনার হার্বার্ট সাহেব একবার ক্যামেরা হাতে নিয়ে আর ঝুমরা রাজের হাতীর পিঠের উপরে বসে ত্রিশ মাইল দূরের ওই পাহাড়গুলোর একটা ফটো তুলেই খুশি হয়ে গিয়েছিল—ব্যাস্, হো গিয়া! দামোদরকা পোছিকা পাত্তা মিল গিয়া।

এই গল্প শোনবার পর থেকে বিজনবিহারীর মাথায় যেন একটা দুরন্ত শখের জেদ ভর করেছে, উৎসটাকে খুঁজে বের করতেই হবে। বয়সটা তিরিশ পার হয়ে গেলই বা, বিজনবিহারীর এই জেদ যেন ছেলেমানুষের ঘুড়ি ওড়াবার জেদের চেয়েও দুরন্ত। বাধা দিলে কোন ফল হবে না।

বাধা দেওয়া উচিত নয়। কথাটা না বলে ভালই করেছে নিরুপমা। মানুষটা সংসারের কারও স্বার্থের গায়ে একটা আঁচড়ও না দিয়ে, কাঙালের মত কারও দয়ামায়াকে বিরক্ত না করে, শুধু নিজে শূন্য হয়ে আর রিক্ত ভাগ্যটাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসে নিজের তৈরি একটা আনন্দের জগতে ইচ্ছামত খেলছে আর ছুটোছুটি করছে। তাকে বাধা দেওয়া নিরুপমার জীবনের কাজ নয়, তাকে বরং একটু যত্ন করে সাজিয়ে দেওয়াই যে নিরুপমার জীবনের সাধ।

নিরুপমার গায়ে হঠাৎ জ্বর এসেছে, মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে, নিঃশ্বাসটা যেন পুড়ছে, কিন্তু নিরুপমার চোখে-মুখে সেই জ্বর-জ্বালার এক ছিটে ছায়াও ফুটে উঠতে দেয়নি নিরুপমা। জ্বরের জ্বালাটাকে জোর করে মনের মধ্যেই চেপে দিয়ে সারা সকালটা হেসে হেসে আর ছুটোছুটি করে কাজ করেছে, উনুন ধরিয়েছে, রুটি তৈরি করেছে, আলু ভেজেছে। বিজনবিহারীর দু-বেলার ক্ষিদের খোরাক শালপাতায় মুড়ে নিয়ে নিজেরই হাতে সাইকেলের কেরিয়ারে বেঁধে দিয়েছে নিরুপমা।

সে সন্ধ্যায় নয়, মাঝ রাতেও নয়, দরজার কাছে শেষ রাতেও কোন সাইকেলের ঘণ্টি আর বেজে উঠল না। 'আমি এসেছি নিরু' বলে কেউ ডাকও দিল না।

জ্বরের জ্বালার চেয়েও দুঃস্বপ্নের জ্বালায় ছটফট করে নিরুপমা। অভিশাপের সাপটা বুঝি লখিন্দরের মাথায় এইবার ছোবল দিয়ে ফেলেছে।

না না না। কখখনো না। কোন অভিশাপের সাধ্যি নেই, কাজলীর ভালবাসার বিজুকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে।—ও বিন্ধ্যাচলী। এ রামসিংহাসনজী! ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয়ে যখন উতলা আর্তনাদের মত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে নিরুপমা, তখন রাত ভোর হয়ে গিয়েছে।

দুটো দিন পার হয়ে যায়।

ফুলনবাবু চারজন লোক আর একটা টাট্টু ঘোড়া দিলেন, রামসিংহাসন আর গুলু মিয়াঁ এই দলবল সঙ্গে নিয়ে ঝুমরা পর্যন্ত গিয়ে আর বিজনবিহারীর কোন খোঁজ না পেয়ে যে সন্ধ্যায় শিউলিবাড়ি ফিরে আসে, ঠিক সেই সন্ধ্যাতেই থানার চৌকিদারের সঙ্গে আর চারজন জংলীর কাঁধে কাঁচা বাঁশের ডুলিতে বসে দুলতে দুলতে বাড়ি ফিরে এল বিজনবিহারী।

বিজনবিহারীর খাকি কামিজটার গায়ে ছোপ ছোপ রক্ত শুকিয়ে আছে, কিন্তু, মুখটা হাসছে। —এ দুটো দিন শুধু পাকা বটফল আর জল খেয়েছি, কিন্তু দামোদরের উৎসটাকে খুঁজে বের করে ছেড়েছি নিরু।

বিজনবিহারীর গায়ের কামিজ দুহাতে খিমচে ধরে ফুঁপিয়ে ওঠে নিরুপমা—এ কি দশা করে ফিরে এসেছ?

বিজনবিহারী—ভালুকটা হঠাৎ পেছন থেকে এসে...কিছুই করতে পারেনি, পিঠটাকে একটু জখম করে দিয়েছে। ভালুকটাকে অবিশ্যি এক গুলিতে সাবড়ে দিয়েছি।...কিন্তু এ কি?

নিরুপমার কপালে গালে আর গলায় হাত রেখে আর চমকে চমকে প্রশ্ন করতে থাকে বিজনবিহারী—জ্বর? সত্যিই কি জ্বর? তোমার আবার জ্বর কেন হবে নিরু?

—তুমি আগে কামিজ খোল। চেঁচিয়ে ওঠে নিরুপমা।

বিজনবিহারী যেন বিরক্ত হয়ে কামিজের পকেট থেকে, কে জানে কোন্ গাছের শিকড়ের একগাদা শুকনো ঝুরি বের করে নিয়ে বলে—আমার চিকিৎসা আমি জানি। কিন্তু তোমার...তোমার কি হল, কিছুই যে বুঝতে পারছি না।

সত্যিই বুঝতে পারেনি, কল্পনাও করতে পারেনি বিজনবিহারী। একদিন দু'দিন, এক মাস দু'মাস, এক বছর দু'বছর—পুরো দুটো বছরও পার হয়ে যাবে, তবু বুঝতে পারা যাবে না, নিরুপমার কেন জ্বর হল? কোন্ অদৃষ্টের জ্বর? কোন্ অভিশাপের জ্বর?

জ্বরে ভুগতে ভুগতে তিনটে মাসের মধ্যে নিরুপমার শরীরটা শুকিয়ে পাকিয়ে কতটুকু হয়ে গেল।

কিন্তু বিজনবিহারীর চোখে যেন কোন আতঙ্ক নেই, উদ্বেগ নেই, এক ছিটে ভয়ের ছায়াও নেই। দু'চোখে যেন একটা জেদের আগুন শুধু দপ্ দপ্ করে জ্বলে আর কাঁপে। বিজনবিহারীর আত্মাটা যেন অসুর হয়ে খাটছে আর ছুটছে। জল গরম করে নিরুপমার জ্বরের শরীরটাকে ভাপস্নান করিয়ে আর ঠাণ্ডা জলে মাথাটাকে ধুয়ে দিয়েই বের হয়ে যায় বিজনবিহারী। ষোল মাইল দুরের মুণ্ডা গাঁয়ের ওঝার কাছ থেকে শিকড়-বাকড় নিয়ে আসে। আসবার পথে মাইল তিনেক ওদিকে জঙ্গলের ভিতরে এগিয়ে মাটি কাটার কাজটাও দেখে আসে।

রামসিংহাসনের বউ বিন্ধ্যাচলী যখন এক থালা ভাত আর এক বাটি কচুর তরকারি নিয়ে এসে নিরুপমার নীরব রান্নাঘরের দরজার কাছে রাখে, তখন দেখতেও পায় বিন্ধ্যাচলী, বাঙালীবাবু এরই মধ্যে সাগু জ্বাল দিয়ে ফেলেছে, সাগুর বাটি দু'হাতে তুলে নিয়ে নিরুপমার মুখের কাছে ধরে রেখেছে।

কি আশ্চর্য, বাঙালীবাবুর বউয়ের প্রাণটা যেন রান্নাঘরের এই দরজারই কাছে পড়ে আছে। শুনতে পায় বিন্ধ্যাচলী, দুর্বল পাখির বাচ্চার ডাকের মত চিঁ-চিঁ করে বিন্ধ্যাচলীকে একটা অনুরোধের কথা বলছে নিরুপমা।—বাবুর তরকারিতে হিং-টিং দিয়ো না বিন্ধ্যাচলী। কেমন?

দিব না।

চলে যায় বিন্ধ্যাচলী।

বিজনবিহারী বলে—ঝুমরা রাজ আমার একটা কথা রেখেছেন।

কি?

শিউলিবাড়িকে একটু বাড়িয়ে তুলতে হবে।

কি বললে?

স্টেশনের পুব দিকের শালজঙ্গল সরিয়ে যদি বাড়ি তৈরির মত ছোট বড় দু'চারশো প্লট করা যায়, তবে বাইরে থেকে অনেক ভাল লোক এখানে এসে বাড়ি করবে বলে মনে হয়। এরকম ভাল জলহাওয়া তো যেখানে-সেখানে আর সহজে মেলে না।

কি বললেন ঝুমরা রাজ?

রাজি হয়েছেন। শিউলিবাড়ি কোলিয়ারির বাবুরা এখনই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বাড়ি তৈরির জমি চাইছেন।

ভাল কথা।

আমিও ঠিক করেছি নিরু, তুমি সেরে উঠলেই, এ-ঘরের লাগাও দক্ষিণে পাকা ইটের দুটো নতুন ঘর তৈরি করব।

নিরুপমার শুকনো সাদা ঠোঁটে একটা করুণ হাসির শীর্ণ ছায়া সিরসির করে।—এখনই শুরু করে দাও, আমার অসুখ কবে সারবে কে জানে? সারবে কি সারবে না, তাই বা কে জানে?

বিজন বলে—সারবে না মানে? তুমি বাজে কথা বলবে না নিরু।

নিরুপমা তবু হাসে—তার মানে, তুমি আমাকে সারিয়ে ছাড়বে?

নিশ্চয়।

এক পাঁজা ইঁট পুড়িয়ে ফেলেছে বিজনবিহারী। দক্ষিণের ঘর দুটোর নকশাও এঁকে ফেলেছে। ওদিকে, স্টেশনের পুব দিকের শালজঙ্গলও অনেকখানি সাফ হয়ে এসেছে। একশো ছত্তিশগড়ি কুলি আনিয়ে জঙ্গল কাটতে শুরু করে দিয়েছেন ঝুমরা রাজের তশীলদার ফুলনবাবু। মাটি ফেলে রাস্তা তৈরি করছে মাটিসাহেবের মুণ্ডা মজুরের দল।

এরই মধ্যে আরও কত কাজ সেরে ফেলতে পেরেছে বিজনবিহারী। ঝুমরা রাজের সঙ্গে গাঁয়ের মুণ্ডাদের ঝগড়াটা ভয়ংকর হয়ে উঠতে চলেছিল। মুণ্ডা চাষীরা জমিতে পাকা রায়তী স্বত্ব চায়। খাজনার রেট কমাতে চায়। সালিয়ানা দিতে না পারলেও এক কথায় মুণ্ডা চাষীর হালিয়তী কেড়ে নেওয়া চলবে না।

দুই পক্ষই শেষে মাটিসাহেবকে সালিশ মেনেছে। মাঝামাঝি একটা রফা করে দিয়েছে বিজনবিহারী। না, হালিয়তী জমিকেও রায়তী জমি বলে মেনে নেবেন ঝুমরা রাজ। নগদ টাকার সালিয়ানা দিতে পারবে না যে, সে শুধু জঙ্গল কাটবার কাজে কিছুদিন খেটে দিলেই সালিয়ানা শোধ হয়ে যাবে। ঝুমরা রাজ চেয়েছিলেন, জঙ্গল কাটবার মজুরী হবে এক আনা, মুণ্ডারা চেয়েছিল চার আনা। বিজনবিহারী রফা করে দিয়েছে—দুই আনা।

রাঁচির দুজন বিদ্বান ভদ্রলোক জানতে পেরেছেন, শিউলিবাড়িতে মাটিসাহেব নামে সাহসী এক ভদ্রলোক থাকেন। একগাদা নানা-রকমের পাথরের নমুনা নিয়ে আর একটা চিঠি নিয়ে রাঁচি থেকে পি এন বসুর লোক বিজনবিহারীর কাছে এসেছিল। শিউলিবাড়ির উত্তরের জঙ্গলটার আট মাইল ভিতরে ঢুকে আর দুধিয়া নামে নদীটার দু'পাশে যত অদ্ভুত-অদ্ভুত পাথরের টুকরো একটা গরুর গাড়িতে বোঝাই করে রাঁচি পাঠিয়ে দিয়েছে বিজনবিহারী। ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন পি এন বসু; লিখেছেন, এরকম পাথরের আরও কিছু নমুনা পাঠাবেন।

রায়বাহাদুর শরৎ রায়ের চিঠি নিয়েও লোক এসেছিল।—মুণ্ডাদের গাঁয়ে একটু খোঁজ করে দেখবেন, আর মাটি কাটাবার সময়েও একটু লক্ষ্য রাখবেন, পাথরের তৈরি কোন কুড়ুল বা টাঙি বা যে-কোন রকমের হাতিয়ার পাওয়া যায় কিনা।

ঠিকই, সিলুয়াড়ির মুণ্ডা গাঁয়ের কাছে, আদ্যিকেলে একটা মশান পাথরের কাছে তেঁতুলগাছের নিচে তিনটে পাথুরে কুড়ুল দেখতে পেয়েছিল বিজনবিহারী। লক্ষ বছর আগের পাথুরে কুড়ুল বোধহয়। সেই পাথুরে কুড়ুল পেয়ে রায়বাহাদুর শরৎ রায় ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন— অনুগ্রহ করে আরও খোঁজ করবেন।

ঘরের বাইরে এত ধন্যবাদ; কিন্তু ঘরের ভিতর নিরুপমার চোখদুটো যেন নিবু নিবু দুটো দীপশিখা; বিছানার উপর পড়ে আছে শোলার পুতুলের মত হালকা একটা করুণ শরীর। এক বছরের জ্বরটা এখনও যেন নিরুপমার পাঁজরের আড়ালে ধুকপুক করছে। তাছাড়া, আর-একটা শত্রু, আমাশা। নিরুপমাকে রক্তহীন করে যেন হাড়মাংসের এক মুঠো সাদা ছোবড়া করে বিছানার উপর ফেলে রেখে দিয়েছে।

বিজনবিহারী যখন থানকুনি পাতার ঝোলের বাটিটা নিরুপমার মুখের কাছে তুলে ধরে, তখন নয়, যখন নিরুপামাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে চুপ করে বসে থাকে বিজনবিহারী, তখন নিরুপমার সেই নিবু নিবু চোখদুটো যেন বড় হয়ে হেসে ওঠে।

বিন্ধ্যাচলীও কতবার বাড়ির ভিতরের বাবান্দায় এসেই থম্‌কে দাঁড়িয়েছে। আর, কোন শব্দ না করে শুধু চোখ মুছতে মুছতে বারান্দা থেকেই ফিরে চলে গিয়েছে। দেখেছে বিন্ধ্যাচলী, নিরুদিদিকে কোলে করে তুলে নিয়ে ওদিকের ছোট ঘরের ভিতরে চলে গেল বাঙালীবাবু। উপায় তো নেই, নিরুদিদির যে আর নড়ে বসবারও সাধ্যি নেই।

বিকেল হলে, বাঙালীবাবু যখন বাড়িতে থাকে না, তখনও এসে দেখতে পায় বিন্ধ্যাচলী, চোখ বন্ধ করে অসাড় হয়ে পড়ে আছে নিরুপমা। বাঙালীবাবু কিন্তু এত কাজের মধ্যেও একটা কাজ ভুলে যায়নি, নিরুপমার মাথার রুক্ষ চুলের বোঝাটাকে চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে আর ঢিলে করে একটা খোঁপা বেঁধে দিয়ে, সিঁথিতে টাটকা সিঁদুর বুলিয়ে দিয়ে, তবে বাইরের কাজে বের হয়ে গিয়েছে বাঙালীবাবু।

তশীলদার ফুলনবাবু একবার বলেছিলেন, মাটিসাহেবের স্ত্রীকে রাঁচিতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে ভাল হত। কিন্তু আক্ষেপও করেছিলেন, এখন আর সেটা সম্ভব নয়। রামসিংহাসন যা বলছে, তাতে তো মনে হয় যে মোটরবাসের একটি ঝাঁকুনিতেই মহিলার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। আর মোটরবাসেরও যা চেহারা আর যা মতিগতি! আধমাইল যেয়েই হয়তো চাকা-ভাঙা হয়ে তিন ঠ্যাং-এর উপর দাঁড়িয়ে থাকবে; পাঁচ-সাত-দশ ঘণ্টার মধ্যেও আর নড়বে না। তাছাড়া, ষাট মাইলের পর দারুচটিতে বাস বদলও আছে। সারা রাতটা সেখানে পার করে দিয়ে পরের দিন সকাল আটটায় রাঁচির বাস ধরতে হয়। সে বাসও রোজ সকাল আটটায় ছাড়ে না। মুচি আসে, ফাটা টায়ার তালি দিয়ে সেলাই করে হাওয়া ভরতে হয়তো আরও দুটো ঘণ্টা। তারপর রওনা হয় বাস, যদি স্টার্ট নিতে ইঞ্জিন আর দেরি না করে! এই অবস্থায়....না, মাটিসাহেবের স্ত্রীকে এখন রাঁচি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াও নিরাপদ নয়।

বিজনবিহারী জানে, শুধু এখন কেন, তখনও নিরাপদ ছিল না, যখন নিরুপমার জ্বরের শরীরটা কাহিল হয়েও উঠতে বসতে আর একটু হাঁটাহাঁটিও করতে পারত। শিউলিবাড়ির বাইরের পৃথিবীটা যে বড়দা আর মেজদার সম্পত্তি; বেনুগ্রামের দৈবজ্ঞীর শাস্ত্র; মেজমামা আর উকিলবাবুর আদালত। ঠাট্টা ঘেন্না আর অপমানের জগৎ। নিরুপমাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না বিজনবিহারী, এক মুহূর্তের জন্যেও না। হাসপাতালের খাতা প্রশ্ন করবে, কে আপনি? পিতার নাম কি? উনি কি আপনার স্ত্রী? কতদিন বিবাহিত? কতগুলো গিধ আর শকুন যেন বিজনবিহারীর প্রাণটাকে ঠুকরে ঠুকরে প্রশ্ন করবে। হয়তো ডাক্তারটা চোখ বড় করে জিজ্ঞেস করে বসবে, আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে? কিংবা, নিরুপমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা নার্স বলে বসবে, বেনুগ্রামে আমার এক মাসী ছিলেন, ঠিক আপনার মত দেখতে! না, ও জগতের ধারে-কাছেও আর নয়।

শিউলিবাড়ির আলো-বাতাসেরও প্রাণের সব জোর কি ফুরিয়ে গেছে, নিরুপমার কাহিল প্রাণটাকে টেনে তুলতে পারবে না? গরীব ওঝার বিশ্বাসের ঝুলির যত শিকড়বাকড় সবই মিথ্যা, সত্য শুধু ওই ওদের হাসপাতালের ওষুধ?

না, বিশ্বাস করে না বিজনবিহারী। নিরুপমা আজ এখনই যদি...না, তবুও বিশ্বাস করবে না বিজনবিহারী।

সেদিন অনেক রাতে শালের জঙ্গলের ঝড়টা শান্ত হয়ে যেতেই শিউলিবাড়ির অন্ধকার যেন

সব ঝিঁঝির ডাক চুপ করিয়ে দিয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। শিউলিতলায় একটা শুকনো পাতাও উসখুস করে না।

নিরুপমার শিয়রের কাছে বাতিটাকে একটু উস্‌কে দিয়ে আর দুই চোখ অপলক করে নিরুপমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বিজনবিহারী। হিক্কাটা আস্তে আস্তে যেন মৃদু হয়ে আসছে।

সন্ধ্যার একটু পর থেকে শুরু হয়েছে নিরুপমার ওই হিক্কার শব্দটা। কী হিংস্র একটা ঠাট্টার শব্দ! একটা জ্বলন্ত ডাকাতের হাতের মশালের মত শাস্তির গর্ব যেন বিজনবিহারীর বুকে ছ্যাঁকা দিয়ে দিয়ে হাসছে আর কথা বলছে; শিউলিচোর! শিউলিচোর! একটা অমানুষ হয়েও বাংলাদেশের শিউলি চুরি করে নিয়ে এসে এই জঙ্গলের ভেতরে সুখের ঘর করবে? খুব যে আশা করেছিলে আর সাহস দেখিয়েছিলে বিজনবিহারী?

বিজনবিহারীর দুঃসাহসের বুকটাকে ঘিরে আর চোখ পাকিয়ে কথা বলছে কেষ্টনগর আর বেনুগ্রামের অভিশাপ। এ-ঘর আর ও-ঘর, কখনও বা একেবারে ঘরের বাইরে বারান্দায়, ছুটাছুটি করে ঘুরতে থাকে বিজনবিহারী। চোখ দুটো যেন মাথার ভিতরের একগাদা পাগল রক্তের চাপ সহ্য করতে না পেরে লাল হয়ে ফুটতে থাকে।

ওই তো বন্দুকটা পড়ে আছে। টোটার মালাটাও কাছেই আছে। নিরুপমার কানের কাছে ফিসফিস করে এখনি বলে দিতে পারা যায়, কোন ভয় নেই নিরু, তুমি হেসে হেসে আমার হাতেই মরে যাও; অভিশাপটার হাতে মরো না। ও অভিশাপের হাতে তোমাকে মরতে দেব না। আমি এখুনি...।

হঠাৎ চোখ মেলে আর কি-অদ্ভুত জ্বলজ্বলে অথচ ছটফটে একটা দৃষ্টি তুলে বিজনবিহারীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নিরুপমা। নিরুপমার একটা হাতের উপর হাত রেখে আস্তে আস্তে ডাকে বিজনবিহারী—কি নিরু?

না, তোমাকে একা রেখে, তোমার ঘর খালি রেখে আমি মরতে পারব না। চেঁচিয়ে ওঠে নিরুপমা। নিরুপমার ধুকপুকে বুকের ভিতর থেকে যেন সমস্ত শক্তি নিয়ে একটা দুর্বার পিপাসা চেচিয়ে উঠেছে।

বিজনবিহারীর প্রাণটা যেন চিৎকার করে ওঠে।—না, কখ্‌খনো না, তুমি মরতে পারবে না, নিরু।

নিরুপমা বলে—ভগবান আমাকে বাঁচাতে চায় না। ভগবান আমাকে বাঁচাতে পারবে না। কিন্তু তুমি পারবে—তুমি আমাকে বাঁচাও, লক্ষ্মীটি!

নিশ্চয় বাঁচাবো।

একটু কাছে এস।

নিরুপমার কপালের উপর মুখটাকে উপুড় করে পেতে দিয়ে, যেন একটা ধীর স্থির ও শান্ত স্বপ্নের স্নেহ হয়ে থাকে বিজনবিহারী।—ঘুমোও নিরু! নিরুপমার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বোলায় বিজনবিহারী। ওঝা বলেছে, ডান হাতের চার আঙুল দিয়ে মাথাটাকে ডান থেকে বাঁয়ে শুধু একটু ছুঁয়ে ছুঁয়ে বুলিয়ে দিলে জাদু তাড়াতাড়ি জাগে।

খুব ঘুমিয়েছে নিরুপমা। তিন ঘণ্টার মধ্যে একবারও জাগেনি। কপালটাও ঘামে ভিজে গিয়েছে। ভোরের পাখিও ডেকে উঠেছে। নিরুপমার কপালের ঘাম মুছে দিয়ে পাখার বাতাস দিতে থাকে বিজনবিহারী।

চোখ মেলে তাকায় নিরুপমা, আর, শালের কচিপাতার উপর ভোরের আভার মত একটা লালচে হাসির আভা যেন নিরুপমার সাদা ঠোঁটের উপর ফুটে ওঠে। —শুনছ?

কি নিরু?

মাথার জ্বালাটা সত্যিই যে নেই বলে মনে হচ্ছে।

পূজা পূজা পূজা! সকালবেলাতেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে রামসিংহাসনকে তাগিদ দিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে বিন্ধ্যাচলী। বাঙালীবাবুর বউয়ের উপর পিশাচের যে নজর পড়েছিল, সে নজর ছুট গইল বা। মিছরি বেল আর জবা ফুল নিয়ে রামসিংহাসনকে এখনই রওনা হতে হবে, দশ মাইল দূরে দামোদরের জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসতে হবে।

এগার

একটা সিমেন্টের কারখানা নাকি শিগগিরই চালু হবে। সিংভূমের রাখা মাইনস্ থেকে দুজন সাহেব এসেছিলেন। মাটিসাহেবের ডাক পড়েছিল। দুধিয়া নদীর দু'পাশের পাথুরে ডাঙায় এদিকে-ওদিকে সাহেবদের সঙ্গে তিনটে দিন সারাবেলা ঘুরে বেড়িয়েছে বিজনবিহারী। কৃতজ্ঞ সাহেবরা যাবার সময় বিজনবিহারীকে একটা জিনিস উপহারও দিয়ে গেলেন—একটা গ্রামোফোন, আর এক ডজন রেকর্ড— এক ডজন বিলিতী গান। বাংলা গানের রেকর্ড হলে বোধহয় এই উপহার ছুঁতেও চাইত না—ছুঁতে পারতোও না বিজনবিহারী।

শিউলিবাড়ির ইতিহাসেও এটা একটা রেকর্ড, প্রথম কলের গান বাজল। এই বিস্ময়ের গান শোনবার জন্য বিজনবিহারীর বাড়ির বারান্দার কাছে একটা ভিড়ও জমে উঠেছিল। এমন কি, গুলু মিয়াঁর বউ, যে মানুষটা ঘরের বাইরে একটা গাছের দিকেও উঁকি দিতে চায় না, সে-মানুষও ছেলে কোলে নিয়ে আর নিরুপমার কাছে বসে কলের গান শুনে চলে গিয়েছে।

তশীলদার ফুলনবাবুও একদিন জানিয়েছেন, দেড়শো প্লট বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

কিনলে কারা?

কিছু প্লট রাঁচির মাড়োয়ারীরা কিনেছে। কিছু কিনেছে গোমোর ফিরিঙ্গী সাহেবরা। ঝুমরা রাজের রাজপুত কুটুমেরাও কিছু কিছু কিনেছে।

খুব ভাল হয়েছে। যেন একটা স্বস্তির হাঁপ ছাড়ে বিজনবিহারী। কোন বাঙালী যে একটাও প্লট কেনেনি, এটা যেন বিজনবিহারীর জীবনের কাছে একটা আশ্বাসের সংবাদ।

তিনটে বছরের মধ্যে শিউলিবাড়ির বাজারটাও বেড়েছে। কোথা থেকে অচেনা-অজানা এক শিখ সর্দার একদিন শিউলিবাড়িতে এসে মাটিসাহেবেরই সঙ্গে রোজগারের উপায় আলোচনা করেছিল, পরামর্শও চেয়েছিল। সর্দার সুচেত সিং। ঝুমরা রাজের একটা জঙ্গলকে লীজ পাইয়ে দেবার জন্য সুচেত সিংকে সঙ্গে নিয়ে বিজনবিহারী তিনদিন ঝুমরা রাজের বড় কুমারের সঙ্গে দেখা করেছিল। লীজ পেয়েছিল সুচেত সিং। সুচেত সিং-এর কাঠের গোলাটা এখন প্রায় লম্বায় আধ মাইল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নানা নতুনের আবির্ভাবে ভরে উঠেছে ছোট্ট শিউলিবাড়ি। স্টেশনমাস্টার চৌধুরীবাবুর মুখেও একটা নতুন হাসির আবির্ভাব দেখা যায়—একটা সুখবর আছে মাটিসাহেব। এ লাইনে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন নাকি চালু হবে।

তাহলে আপনার একজন অ্যাসিস্টেন্টও হবে নিশ্চয়।

ওটাই তো ভাবনার কথা মাটিসাহেব। যদি ভাল লোক হয়, তবে ইনকামের শেয়ার নিয়ে হয়তো তেমন কিছু খিটিমিটি বাধাবে না। কিন্তু যদি না হয়, তবে?

আর, নিরুপমার মুখের দিকে তাকালে যে সবচেয়ে সুন্দর নতুনের আবির্ভাবের হাসিটাকে দেখতে পাওয়া যায়! নিরুপমার মুখের উপর যেন রাঙা জবার আলো ফুটে উঠেছে। শরীরটাও কি সুন্দর স্বাস্থ্যে ভরে গিয়েছে। রামসিংহাসনের বউ হিসেব করে দিন গুনছে।

ছি ছি, এ কি করছ? এখনই এসব কেন? বিন্ধ্যাচলী দেখতে পেলে যে তোমার নামেও যা-তা বলে ঠাট্টা করবে। নিরুপমা দু'বার এসে বাধা দিয়েছে আর হেসেও ফেলেছে।

সেগুনের একটা পাটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে, আর করাত হাতুড়ি র‍্যাঁদা নিয়ে দুদিন ধরে যে কাণ্ডটা করে চলেছে বিজনবিহারী, সেটা বিন্ধ্যাচলী এখনও দেখতে পারেনি। একটা দোলনা তৈরি করছে বিজনবিহারী।

বিজনবিহারী বলে—যা-তা আর কি বলবে রামসিংহাসনের বউ? বড় জোর বলবে, ভুখা বাঙালী।

কথাটা তাহলে সত্যি?

নিশ্চয়।

ভুখ, ঠিক কথা, একটা স্বপ্নের ভুখ যেন এতদিনে একটা আশার আশ্বাসে বিভোর হয়ে বিজনবিহারীর চোখদুটোকেও নিবিড় করে তুলেছে।

সেই সন্ধ্যাতেই, যখন বারান্দায় কেরোসিনের আলোর কাছে বসে বুরুশ চালিয়ে দোলনার ফ্রেমে গালা বার্নিশ লেপতে শুরু করেছে বিজনবিহারী, তখন ঘরের ভিতরে থেকে উতলা হয়ে ছুটে এসে হাঁপাতে থাকে নিরুপমা—বিন্ধ্যাচলীকে এখনই ডেকে দাও।

বিন্ধ্যাচলীকে কেন?

একলা হয়ে পড়ে থাকতে যে বড় ভয় করছে। শিগগির ডেকে দাও।

কোন ভয় নেই। আমি আছি। রামসিংহাসনের বউকে ডাকবার কোন দরকার নেই।

তিন ক্রোশ দূরে কাট্‌কি জঙ্গলের বস্তিতে যে চামারিন বুড়িটা থাকে, সিধো চামারের মা, তাকে খবর দেওয়া হয়েছিল। বুড়িটা রামসিংহাসনের বাড়িতেও দুবার ধাইয়ের কাজ করেছে। কিন্তু একমাস ধরে কাট্‌কিতে বাঘের হামলা চলছে। তাই বোধহয় আসতে পারেনি বুড়িটা।

কিন্তু বিজনবিহারীর মনটা সেজন্য একটুও দুশ্চিন্তিত নয়। বিজনবিহারীর হাত দুটো আজ যেন ইচ্ছে করে এক পরম কারিগরীর কাজ করে ধন্য হতে চায়। একটা শিউলি-কুঁড়িকে শুধু দু'হাত পেতে তুলে নেওয়া, আর নাড়ি কেটে ধোওয়া-মোছা করে নিরুপমার বুকের কাছে শুইয়ে দেওয়া।

বড় শান্ত আর বড় স্নিগ্ধ রাত্রি। এক ঘণ্টাও সময় লাগেনি, নিরুপমার শরীরটা যখন সব যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্ত হয়ে একটা স্নিগ্ধ তন্দ্রার ঘোরে শান্ত হয়ে পড়ে থাকে, তখন নিরুপমার কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে ডাক দেয় বিজনবিহারী, যেন একটা স্নিগ্ধ জয়রব—এই দেখ নিরু, তোমার মেয়ে। আর নিরুপমার চোখদুটোও তাকাতে গিয়ে যেন এই নতুন বিস্ময়েরই সুখে হাসতে থাকে।

যখন দূরের খেজুর গাছের কাছে একটা ল্যাম্পের আলো দপ্‌দপ্ করে জ্বলে, আর শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়তে থাকে বিজনবিহারী, তখন বাঙালীবাবুর বাড়িতে নতুন আবির্ভাবের কান্নার স্বর শুনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে বিন্ধ্যাচলী।

বেটি ভইল বা। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে খুশির হাসি ছড়িয়ে চলে যায় বিন্ধ্যাচলী। আর বিজনবিহারীও ফিরে এসে হাত ধুয়ে নিয়ে শিউলিতলার পাথরটার উপর শান্ত হয়ে বসে। রামসিংহাসনের বাড়িতে তখন ঢোলক বাজতে শুরু করেছে।

কে বাজাচ্ছে? রামসিংহাসন? না রামসিংহাসনের বড় ছেলেটা?

কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে কান পেতে থাকলে ঢোলকের শব্দটাকে বড় অদ্ভুত শোনায়। যেন আকাশে ঢোলক বাজছে। প্রয়াগের ধর্মশালার সেই সাধুটা ধুনীর আগুনের কাছে বসে গল্প করতে করতে বলেছিল, যখন পৃথিবীতে কোন পুনীত প্রাণ জন্ম নেয়, তখন আকাশমে দুন্দুভিনাদ হোতা হ্যায়।

ঢোলকটা বাজছে বিজনবিহারীর বুকের আকাশে। সত্যিই যে মনে হচ্ছে, মস্ত একটা পুণ্যির প্রাণ জন্ম নিয়েছে। এই তো ওখানে, ওই ঘরে, নিরুপমার বুকের কাছে ঘুমিয়ে আছে। এতক্ষণে কান্না থামিয়েছে।

চোখ মেলে আর বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে চারদিকে তাকায় বিজনবিহারী। কপালের উপর আস্তে আস্তে হাত বোলাতে থাকে। যেন হাত বুলিয়ে ভাগ্যেরই একটা বিস্ময়কে ছুঁয়ে ছুঁয়ে অনুভব করছে বিজনবিহারী।

মনটাই বা হঠাৎ এত শান্ত হয়ে গেল কেন? এ-মনে এক ছিটেও রাগ নেই, আর প্রাণটাও যেন কারও উপর রাগ পুষে রাখতে চাইছে না, পারছেও না।

জেদটার সব ঝাল মিটে গিয়েছে। আর জেদটাও যেন একটু লজ্জা পেয়েছে। তাই বোধহয় বুকের ভিতরে একটা গর্বের সুখ লাজুক তারার মত মিটিমিটি হাসছে।

কিন্তু সেজন্যে এত শান্ত হয়ে যাবে কেন মনটা? না, সেজন্যে নয়। মনে হয়, অভিশাপ নয়, মস্ত বড় একটা আশীর্বাদ যেন হাত তুলে একটা লগ্নের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। বিজনবিহারীর কপালটাকে ছুঁয়ে ফেলেছে সেই আশীর্বাদের হাত। তা না হলে, বাংলাদেশের শিউলিতে এরকম একটি কুঁড়ি ফুটবে কেন? বিজনবিহারীর আশার ঘর এমন একটা উপহার পেয়ে যাবে কেন?

নিরুপমা যে বাংলাদেশেরই একটা গোপন দান। শিউলিবাড়ির মাটিসাহেবকে একটা ফেরারী আসামীর গা-ঢাকা জীবন বলে মনে করবার কোন মানে হয় না। বিজনবিহারী যেন মিথ্যে রাগ করে নিজেরই বিরুদ্ধে একটা মিথ্যে অভিযোগের মামলা দায়ের করেছিল। বাংলাদেশের শিউলি চুরি করেনি বিজনবিহারী। কেষ্টনগর শিবপুকুর আর বেনুগ্রাম, যেন-তিনটি ভীরু-মায়ার প্রাণ, শুধু একটা চক্ষুলজ্জার ভয় ছিল বলেই খিড়কির দরজার ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে বিজনবিহারীর হাতে একটা মায়ার দান ঢেলে দিয়েছিল। ছিঃ, এতদিন ধরে ভুল করে কার উপর রাগ পুষে এসেছে বিজনবিহারী?

বার

কি ব্যাপার? মাটিসাহেব যে একেবারে মাটির মানুষ হয়ে গেল দেখছি। কথাটা বলেই মুখ টিপে হাসতে থাকে নিরুপমা।

নিরুপমার এই মুখ-টেপা হাসিটা একটা মিষ্টি বিস্ময়ের হাসি নিশ্চয়, কিন্তু একটা মিষ্টি চিমটির হাসিও বটে।

সূর্য উঠতে না উঠতে যে মানুষটা তড়বড় করে দুটো রুটি চিবিয়ে আর জল খেয়ে সাইকেলটাকে আঁকড়ে ধরে, আর হন্তদন্ত হয়ে বের হয়ে যায়, সে মানুষটা এখনও যায়নি, যদিও সূর্য ওঠবার পর তিনটি ঘন্টা পার হয়ে গিয়েছে।

মাটিসাহেবের কাজের জীবনের সেই তাড়াহুড়োর নিয়মটা যেন একটু বিপদে পড়েছে। শেষ রাতে উঠে উনুন জ্বেলে রুটি তরকারি তৈরি করে দিতে নিরুপমার যেটুকু সময় লাগে, সেটুকু সময়ের অপেক্ষা সহ্য করবার মত ধৈর্যও বিজনবিহারীর ছিল না। আধঘণ্টার মধ্যে কাজের ধড়াচূড়া গায়ে চড়িয়ে—শোলার হ্যাট, খাকি কামিজ, খাকি হাফ-প্যাণ্ট আর বুট পরে, বন্দুকটাও পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে ফিল্ডে যাবার জন্য তৈরি হয়ে যেত বিজনবিহারী। মাটি-কাটার জায়গাটা, দশ মাইল বা বিশ মাইল দূরের ফিল্ডটা বিজনবিহারীর কাছে সত্যিই যেন যুদ্ধের ফিল্ড। তা না হলে সাজটাও এরকম জঙ্গী হয়ে যাবে কেন? দুপুরের খাওয়ার রসদ হিসাবে এক দিস্তা রুটি, দু'মুঠো আলুর তরকারি আর গুড়ের একটা ডেলা শালপাতায় মুড়ে নিয়ে এত ব্যস্তভাবে ছুটে যাবার অভ্যাসই বা হবে কেন? ঝড়-বাদলের দিনেও বিজনবিহারীর অভ্যাসের এই রীতিটার নড়-চড় হতে দেখা যায়নি। কিন্তু আজকাল, বিশেষ করে আজ, এ কি কাণ্ড করে বসে আছে বিজনবিহারী? সকালের রোদ ঝলমল করছে, তবু বিজনবিহারী এখনও কাজে বের হয়ে যেতে পারেনি। মুখ টিপে না হেসে থাকতে পারবেই না কেন নিরুপমা?

মেয়েকে বুকের উপর বসিয়ে শিউলিতলার ঘাসের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে আছে বিজনবিহারী। সাইকেলটাও একপাশে ঘাসের উপর লুটিয়ে পড়ে আছে। শোলার হ্যাটটা আর বন্দুকটাও। বিজনবিহারীর খাকি কামিজের বুকের উপর একগাদা টাটকা শিউলি। মেয়েটা সেই শিউলির গাদা দু'হাতে ঘেঁটে ঘেঁটে খেলা করছে। আর দু'চোখ বন্ধ করে যেন একটা তৃপ্তির ভারে অলস হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে বিজনবিহারী।

শুনছ? আবার ডাক দেয় নিরুপমা।

কি হল? চমকে উঠে প্রশ্ন করে বিজনবিহারী।

ফিল্ডে যাবে না? আবার মুখ টিপে হাসে নিরুপমা।

তুমি মেয়েটাকে ধরবে তবে তো যাব।

মেয়ে তো ঘুমিয়েছিল। তুমি ওকে তুলে নিয়ে এলে কেন?

এ সব কথার কোন মানে হয় না, নিরু। আমার কাজে বের হবার সময় খিটিমিটি করে দেরি করিয়ে দিয়ো না।

বিজনবিহারীর মেয়ে, বয়স দু'বছর, নাম সুনন্দা। নিরুপমা আর বিজনবিহারী ডাকে নন্দু। বিন্ধ্যাচলী বলে—নন্দুয়া। মাটিসাহেবের বেটি নন্দুয়ার মুখটা কী সুন্দর! যৈসন ফুটলকা কমল বা!

রামসিংহাসনের বড় মেয়েটা, রাজমোহিনী, ছ'বছর বয়স, দৌড়ে এসে নন্দুকে কোলে তুলে

নেয়। নিরুপমা জানে, এখন অন্তত একটি ঘণ্টা নন্দুকে কোলে নিয়ে আর কাঁকাল বেঁকিয়ে ট্যাং-ট্যাং করে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াবে রামসিংহাসনের এই মেয়েটা ছ'বছর বয়সের এই রাজমোহিনী।

সাইকেল চালিয়ে বেশী দুর যায়নি বিজনবিহারী। কিন্তু যেন একটা বাধা পেয়ে আচমকা ব্রেক কষে থেমে পড়েছে বিজনবিহারী। অথচ পথের উপর কোন বড় পাথর-টাথরও নেই, কোন নালা খানা গর্ত-টর্তও নেই।

আকাশের দিকে অমন করে তাকিয়ে আর একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছে বিজনবিহারী? আশ্বিনের সকালের আকাশ, ঝলমলে রোদ, কালো মেঘের ছিটে-ফোঁটা'ও তো কোথাও নেই।

সাইকেলটাকে হাতে ঠেলে আস্তে আস্তে হেঁটে ফিরে আসে বিজনবিহারী।

কি হল? বিজনবিহারীর গম্ভীর মুখটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করতে গিয়ে নিরুপমার গলার স্বর যেন একটা চাপা ভয়ের গুঞ্জনের মত বেজে ওঠে।

হ্যাট আর বন্দুক নামিয়ে রেখে, পা থেকে বুট-জোড়াও খুলে সরিয়ে দিয়ে, যেন আরও হাল্কা হবার জন্য জোরে একটা হাঁপ ছাড়ে বিজনবিহারী।

মুখটা গম্ভীর, কিন্তু চোখ দুটো চিক-চিক করছে। মাঝে মাঝে মাথা হেঁট করেও কি যেন ভাবছে। বিজনবিহারীরও যে এরকম একটা করুণ রকমের অশান্ত চেহারা থাকতে পারে, চোখে না দেখলে ধারণা করতে পারত না নিরুপমা। তাছাড়া, কোনদিনও বিজনবিহারীর চোখ দুটোকে এভাবে চিকচিক করে কাঁপতে দেখেনি নিরুপমা। যেন একটা ভক্ত মানুষের চোখ, কাউকে পূজো করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে আছে।

ফিরে এলে কেন? নিরুপমার গলার স্বর আবার ভীরু হয়ে কেঁপে ওঠে।

ছিঃ, আজকেও সাত-সকালে জানোয়ারের মত রুটি চিবোতে হল। জঙ্গলে এসে অভ্যেসটাই জংলী হয়ে গিয়েছে।

কাকে ধিক্কার দিয়ে আক্ষেপ করছে বিজনবিহারী? নিজেকে? কেন?

এতদিন ধরে রাগের মাথায় কি-ভয়ানক একটা বিশ্রী ভুল করে এসেছি, নিরু! রাগই হল ভূত, একবার ঘাড়ে ভর করলে সব ভুল করিয়ে দেয়।

ভুল? আশ্চর্য হয়ে তাকায় নিরুপমা।

হ্যাঁ। আজ হল ছাব্বিশে আশ্বিন। বাবার মৃত্যুদিন। আজ আমার উপোস করা উচিত ছিল, বাবার বাৎসরিক কাজটাও করা উচিত।

নিরুপমার চোখ ফেটে বোধহয় একটা করুণ বিস্ময়ের ফোয়ারা উথলে উঠবে, বুকটাও ফুঁপিয়ে উঠবে। সরে গিয়ে বিজনবিহারীর পিছনে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে নিরুপমা।

যাই হোক, আজ আর আমি কিছু খাব না নিরু। হ্যাঁ, এখনই তাহলে বেরিয়ে যাই, ছোট নদীটায় স্নান করে আসি। এক মুঠো তিল দাও তো নিরু।

শিউলিবাড়ির ছোট নদী, ওই ডাঙার উপর দিয়ে আধ মাইল এগিয়ে গেলে বালু ছড়ানো নদীটার বুকের মাঝখানে ঝিরিঝিরি বয়ে যাওয়া স্রোতটা দেখা যায়। নদীর ধারে একটা বট আছে, বটের পায়ের কাছে সিঁদুরমাখা একটা পাথর আছে, আর সাতটা পাথরের ধাপ নিয়ে একটা ঘাটও আছে।

স্নান সেরে, এক মুঠো তিল স্রোতের জলে ভাসিয়ে দিয়ে, আর ভিজে ধুতির খুঁটে গা জড়িয়ে যখন বাড়ি ফিরে আসে বিজনবিহারী, তখন বিজনবিহারীর তৃপ্তিভরা স্নিগ্ধ মুখটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই সরে যায় নিরুপমা। ভিতরের ঘরের এককোণে চুপ করে বসে কান্না চাপে আর চোখ মোছে।

বিজনবিহারী ডাক দিয়ে বলে—কোথায় গেলে? শুনছ? এ বছর ভুল-টুল যা হল তা তো হল, কিন্তু আসছে বছর কাজটা এভাবে সারলে চলবে না। শাস্তরে যা বলে, যেটা নিয়ম, সেভাবে করতে হবে।

নিরুপমা সাড়া দেয়—হ্যাঁ, করবে বইকি।

কিন্তু সেজন্যে যে পুরুত চাই।

চাই বইকি।

ঝুমরা রাজের পুরুত শর্মাজীকে দিয়ে কাজ চলতে পারে, কিন্তু...কিন্তু বাঙালী পুরুত হলেই ভাল হয়। কি বল?

নিরুপমা বলে—হ্যাঁ।

হ্যাঁ হ্যাঁ তো করছ, কিন্তু কোথায় তুমি?

এবার আর নিরুপমার সাড়া পায় না বিজনবিহারী। কিন্তু চমকে উঠতে হয়। যেন ওঘরের ভিতর থেকে একটা ডুকরে ওঠা নিঃশ্বাসের শব্দ সাড়া দিয়েছে।

একি হচ্ছে নিরু? দেখে আশ্চর্য হয় বিজনবিহারী, আঁচল দিয়ে চোখ মুখ ঢেকে মেঝের উপর নিথর হয়ে বসে আছে নিরুপমা। কেন? আজ আবার কোন্ ভয়ের ছায়া দেখতে পেল নিরুপমার উজ্জ্বল হাসির চোখদুটো?

বিজনবিহারী ডাকে—কি হল?

কিছু না। তুমি কিছু ভেব না।

ভাবিয়ে দিয়ে ভেব-না বললে চলে না। আজ তুমি হঠাৎ কি ভেবে...।

জানতে চেয়ো না। বলতে পারব না।

হঠাৎ চোখ ঘষে আর মুখের উপর থেকে আঁচল সরিয়ে দিয়ে শান্ত ও সুস্থির হয়ে বসে জানলাটার দিকে তাকিয়ে থাকে নিরুপমা। চোখদুটোও শান্ত শুকনো খটখটে। নিরুপমার এরকমের মূর্তি একটি অদ্ভুত বটে। তাই বোধহয় একটা শালিক বার বার জানলার কাছে এসে বসেছে, আর ঘরের ভিতরের দিকে একবার তাকিয়েই উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

বিজনবিহারীর কানেও বোধহয় নিরুপমার কথার শব্দটা নতুন বিস্ময়ের আঘাতের মত বেজেছে। জানতে চেয়ো না! কি অদ্ভুত শুকনো স্বরে কথাটা বলেছে নিরুপমা। কথাগুলি যেন এক মুঠো ঠাণ্ডা আর বাসি ছাই, হঠাৎ জ্বালার ছোঁয়া পেয়ে তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিজনবিহারীর জীবনের কোন আগ্রহের জিজ্ঞাসাকে এভাবে চুপ করিয়ে দিতে চাইবে নিরুপমা, এটা যে চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না বিজনবিহারী।

কি-এমন নতুন আর অদ্ভুত কিছু দেখতে পেল নিরুপমা, যেজন্য নিরুপমার ভিজে চোখদুটো এত শুকনো হয়ে যেতে পারে, আর গলার স্বরে এত শুকনো ছাই ঝরাতে পারে নিরুপমা? আজ ছাব্বিশে আশ্বিন, বাবার বাৎসরিক স্মৃতির তর্পণের জন্য স্রোতের জলে শুধু একমুঠো তিল ভাসিয়েছে

বিজনবিহারী. কিন্তু সেজন্য নিরুপমার প্রাণটা ভীরু হয়ে গিয়ে কেঁদে ফেলবে কেন? আবার কান্নার চোখদুটোকে এত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে ফেলবেই বা কেন? দেখতে পেয়েছে বিজনবিহারী. নিরুপমার হাতটা যেন হঠাৎ কঠোর হয়ে চোখদুটোকে একটা হতাশ অভিমানের আঘাত দিয়ে জোরে জোরে ঘষছে।

বিজনবিহারী বলে—জানতে চাইব না কেন?

না; জেনে তোমার কোন লাভ হবে না।

আমাকে না জানিয়ে কি তোমার কোন লাভ হবে?

তুমি সুখী হবে।

তার মানে?

তুমি শাস্তর আনবে, নিয়ম আনবে, বাঙালী পুরুত ঠাকুর আনবে; তবে আর আমাকে কেন?

তার মানে?

আমাকে বাদ দাও।

এর মানেই বা কি?

আমাকে চলে যেতে দাও।

কোথায় যাবে?

শিউলিবাড়িতে কি শ্মশান নেই?

আছে বইকি। কিন্তু যাবে কেন?

যেখানে শাস্তর আসবে, নিয়ম আসবে, মন্তর আসবে, সেখানে আমি থাকব কি করে? বাঁচব কি করে? নিরুপমার শুকনো চোখের তারা দুটো যেন ছটফটিয়ে পুড়তে থাকে।

কি বললে? চেঁচিয়ে ওঠে বিজনবিহারী।

বলছি তো! শাস্তর নিয়ম আর মন্তর এসে তো একদিন আমাকে তাড়িয়েই ছাড়বে। তার চেয়ে ভাল. তার আগে তুমিই তাড়িয়ে দাও। তোমার হাতের আগুন মুখে নিয়ে ছাই হয়ে যাই। শাস্তর এসে পড়লে তো আর তোমার হাতে এ সাহসটুকুও থাকবে না।

নিরুপমার প্রাণও এমন বিদ্রোহ করতে জানে? আর বিদ্রোহটাও এমন ভাষায় কথা বলতে পারে? আর, ভাষাটাও বিজনবিহারীকে এত ভীরু বলে গাল দিতে পারে?

কি-যেন বলতে চায় বিজনবিহারী। কিন্তু নিরুপমার মাথাটা বিজনবিহারীর পায়ের কাছে আছড়ে পড়েছে। আর, যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলেছে সেই বিদ্রোহেরই একটা ভীরু অন্তরাত্মা।—শেষে তুমিও ভয় পেলে। আমি তবে আর কোন্ সাহসে...।

বর্ষার জলঙ্গী সাঁতার দিয়ে পার হতে ভয় পায়নি যে ষোল বছর বয়সের বিজু, চম্বলের বালিয়াড়িতে আগুন-চোখো লেপার্ডের মুখের কাছে দাঁড়িয়ে রাইফেল তুলতে হাত কাঁপেনি যে কুড়ি বছর বয়সের বিজনবিহারীর, আজ আটত্রিশ বছর বয়সের সে বিজনবিহারী ভয় পেয়েছে? নিরুপমাকে বুক থেকে নামিয়ে দিয়ে শাস্তর বুকে তুলে নিতে চাইছে?

শাস্তর আসছে; যেন হুটোপুটি করে জংলী হাতী আসছে. নিরুপমার জীবনের সুখ আশা আর তৃপ্তির ছোট্ট তাঁবুটাকে উপড়ে ফেলে দেবার জন্য। এই ভেবে ভয় পেয়েছে নিরুপমা। কিন্তু ভুল করছে নিরুপমার দুর্বল বিশ্বাসের বুকটা। বোধহয় ভুলেই গিয়েছে নিরুপমা, এই বিজনবিহারী

জংলী হাতীর চোখের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দিতে জানে, পারে, তার বুক একটুও কাঁপে না।

মেঝের উপর থেকে নিরুপমার লুটিয়ে পড়া শরীরটাকে দু'হাতে তুলে নিয়ে আর দাঁড় করিয়ে বুকের কাছে শক্ত করে ধরে রাখে বিজনবিহারী। —তুমি আগে, না শাস্তর আগে?

নিরুপমা আবার ফুঁপিয়ে ওঠে। —বুঝতে পারছি না।

তোমাকে আগে নিয়ে এসেছি, না শাস্তর আগে নিয়ে আসতে চেয়েছি?

সবই তো জানি। কিন্তু...।

কিন্তু আবার কিসের?

শুনে যে বড় ভয় করছে।

কোন ভয় নেই। কোন ভয় আর থাকতেই পারে না।

চিরকাল যে ভাষায় নিরুপমাকে আশ্বাস দিয়ে এসেছে এই নির্ভয়ের মানুষটা, আজও সেই ভাষায় নিরুপমাকে আশ্বাস দিয়ে কথা বলছে। এই আশ্বাসের কাছে লুটিয়ে পড়ে শান্ত না হয়ে পারবে কেন নিরুপমা?

দু'চোখ বন্ধ করে, শান্ত আর স্নিগ্ধ একটা মুখ নিয়ে, আর মাথার ভারটাকে একেবারে অলস করে বিজনবিহারীর বুকের উপর রেখে দিয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়তে চায় নিরুপমা।

বিজনবিহারী বলে—আজ আর আমরা কাকে ভয় করব বল? কার সাধ্যি আছে যে, আমার ঘরের দিকে তাকিয়ে সন্দেহ করবে? কার সাহস আছে যে ঠাট্টা করবে? কার এমন মাথা খারাপ হবে যে, ঘেন্না করবে? ফুলনবাবু সেদিন কি বলেছিলেন, জান?

হেসে ওঠে বিজনবিহারী। যেন উৎফুল্ল এক পৌরুষের শান্ত গর্বের কণ্ঠস্বর হেসে উঠেছে—ফুলনবাবু বলছিলেন, মাটিসাহেবের বাড়িটা যেন হিমালয়জীকা সংসার।

তার মানে?

তার মানে আমি হিমালয়, তুমি মেনকা আর নন্দু হল উমা।

নিরুপমার চোখদুটো অদ্ভুত একটা অনুভবের আবেশে নিবিড় হয়ে বিজনবিহারীর মুখের দিকে তাকিয়ে থম্‌থম্ করে, যেন একটা স্বপ্নের কোলে বসে আছে নিরুপমার প্রাণটা। ফুলনবাবুর কথা নয়, যেন একগাদা ফুলচন্দনের কথা দু'কান দিয়ে স্পষ্ট করে শুনতে পাচ্ছে নিরুপমা।—হিমালয়জীকা সংসার।

সব ভয় পার করে দিয়েছি, নিরু। তবু তুমি ভুল করে একটা পূর্বজন্মের যত বাজে ছায়া-টায়া দেখে...।

হেসে ফেলে নিরুপমা।—না, আর ভয় করি না।

তুমি না সেদিন ঠাট্টা করে বলেছিলে...।

কি?

শিউলিবাড়ির রাজার নাম মাটিসাহেব।

বলেছিলুম, কিন্তু ঠাট্টা করিনি।

তবে?

বিজনবিহারীর শেষ কথাটা যেন এতক্ষণের একটা মিথ্যে আতঙ্কের লজ্জাকে প্রশ্ন করে হাসিয়ে

দেয়। নিরুপমা বলে—বাঙালী পুরুত ঠাকুর কি শুধু বাবার বাৎসরিক কাজের জন্যই আসবেন?

না, তা কেন হবে? এখানকার সব কাজই করবেন। পুজো-পার্বণ, সত্যনারায়ণের ব্রতট্রত, কিংবা তোমার কোন মানতটানতের পুজো থাকলেও কাজ করবেন। মোট কথা...।

নিরুপমার দুই চোখ হেসে হেসে ঝিকঝিক করে!—কি?

মোট কথা, আর জংলী হয়ে থাকা চলবে না। চেঁচিয়ে হেসে ওঠে বিজনবিহারী।

শালিকটা আবার এসে জানলার কাছে বসেছে, ঘরের ভিতরের দিকে তাকিয়েছে। কিন্তু তখুনি আবার ফুড়ুৎ করে উড়ে পালিয়ে গেল না শালিকটা। এবার আর ভয় পেয়ে নয়, শালিকটা বোধহয় বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আবার থাকতে চাইছে।

বিজনবিহারী বলে—তাছাড়া, মিছিমিছি কারও ওপর আর রাগ পুষে রাখার কোন মানে হয় না। তাছাড়া...।

হঠাৎ নীরব হয়ে গিয়ে, আর জানলার বাইরে আশ্বিনের আকাশটারই দিকে পিপাসিতের মত তাকিয়ে থাকে বিজনবিহারী! তার পরেই, গলার স্বর একেবারে মৃদু করে দিয়ে বলতে থাকে—হবে, একে একে সবই হবে, সবই করে নিতে হবে, ছেড়ে দেবই বা কেন?

ভাষাটা হেঁয়ালী, কিন্তু গলার স্বরটা যেন একটা নতুন মানতের প্রতিধ্বনি। কিংবা আশ্বিনের আকাশের বুকে একটা ক্ষমার দিকে তাকিয়ে কথা বলছে একটা খুশি অভিমান। নয় তো একটা পুরনো মায়ার হাতছানির দিকে তাকিয়ে কথা বলছে ব্যাকুল একটা পিপাসা। যেন দেউলবাড়িতে ভোগের ঘণ্টা বাজছে, খালের এ পারে দাঁড়িয়ে শুনতে পাচ্ছে আর ছটফট করছে ছোট্ট বিজুর দুরন্ত লোভ।

তের

মাটিসাহেবের মতলবটা এবার বুঝতে পারা গেল। মুখ টিপে হাসতে থাকে নিরুপমা।

তিন বছর আগেও একবার ঠিক এইভাবে মুখ টিপে হেসে বুকভরা খুশির ভার সামলাতে চেষ্টা করেছিল নিরুপমা। কিন্তু সামলাতে পারেনি। আজও নিরুপমার সারা মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। শিউলিবাড়ির ভাগ্যটা যে সত্যিই ভোরের আলোর মত রাঙা হয়ে হাসছে।

সাইকেলের চাকার ধুলো মুছতে ব্যস্ত বিজনবিহারী নিতান্ত অব্যস্ত স্বরে কথা বলতে গিয়েও নিরুপমার মুখের দিকে তাকায়।—মাটিসাহেবের মতলব?

হ্যাঁ।

কি মতলব?

শিউলিবাড়িকে একেবারে কেষ্টনগর করে তুলতে চাইছেন মাটিসাহেব।

বিজনবিহারী হাসে—বাঃ, খুব চমৎকার সন্দেহ করতে শিখেছ দেখছি।

মাটিসাহেবের কাঁচা ইঁটের সেই বাড়ির ঘরগুলি এখন ধান অড়হর আর মকাইয়ের ভাণ্ডার। সেই শিউলি যেখানে-যেখানে ছিল, সেখানে-সেখানে এখন নতুন শিউলির ভিড়। নতুন বাগানের মাদারের বেড়ার সঙ্গে কৃষ্ণকলির ঝাড় এলিয়ে এলিয়ে ছড়িয়ে আছে। বছরে দু'বার ফুল ফোটায় কৃষ্ণকলির ঝাড়—লাল হলদে বেগুনী আর হলদে লাল। পুরনো বাড়ির সামনে দুটো পাকা ইঁটের ঘর, বারান্দাটা বেশ চওড়া। বারান্দায় চার-পাঁচটা চেয়ার আর একটা টেবিল।

দিল্লীতে করোনেশন দরবার। শিউলিবাড়ি স্টেশনের মাথার উপরে উঁচু বাঁশের ডগায় পুরো একটি মাস ধরে ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছে। সেই চৌধুরীবাবু বদলি হয়ে চলে গিয়েছেন। বদলি হয়ে এসেছেন গাঙ্গুলীবাবু আর বোসবাবু—এস-এম আর এ-এস-এম। দেখে আরও খুশি হয়েছে বিজনবিহারী, দুই ভদ্রলোকই সপরিবারে এসেছেন।

গাঙ্গুলীবাবুর অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। কোলেরটার বয়স চার মাস। অথচ গরুর দুধ পাওয়া যাচ্ছে না। রামসিংহাসন শুধু মোষের দুধ বিক্রি করে। খুবই চিন্তায় পড়েছেন গাঙ্গুলীবাবু।

কিন্তু গাঙ্গুলীবাবুকে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছে বিজনবিহারী। বিজনবিহারী তার বাড়ির গরুর দুধের আধসের মাত্র সুনন্দার জন্য রেখে দিয়ে বাকী সবটাই গাঙ্গুলীবাবুর বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। —আমি থাকতে শিউলিবাড়িতে এসে কোন বাঙালী কষ্ট পাবে, এটা তো ভাল দেখায় না, নিরু।

ছোট নদীর ধারে এক বিঘে জমি করেছিল বিজনবিহারী। সে জমিতে পুরনো বটগাছের কাছে নতুন কালীবাড়ি হয়েছে। কালীবাড়ি তৈরির সব ইঁট বিজনবিহারীই দিয়েছে। পুরোহিত চক্রবর্তী মশাইও সপরিবারে—স্ত্রী আর দুটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসে দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন। কি করে দিন চলবে? যজমান কোথায়? আর পুজোর ভিড়ও কতটুকু?

কালীপূজা কমিটি তৈরি করে চক্রবর্তীকে অনেকখানি নিশ্চিন্ত করে দিয়েছে বিজনবিহারী। বছরে চার আনা চাঁদা আর একটা সিধা—ধান চাল চিঁড়ে কিংবা কলাই। এরই মধ্যে শিউলিবাড়ির ষাট-সত্তরজনকে কমিটির সদস্য করে ফেলেছে বিজনবিহারী। কিন্তু তবু চিন্তা করতে হচ্ছে, চক্রবর্তীর জন্য আর কি ব্যবস্থা করা যায়। তা না হলে সত্যিই যে ছেলেপুলে নিয়ে কষ্টে পড়বে চক্রবর্তী।

কবিরাজ সেনবাবুর জন্যে এতটা চিন্তা করতে হয়নি। তাঁর জন্য শুধু এক বিঘা বসত জমির ব্যবস্থা করে দিতে হয়েছে। ঝুমরা রাজ আর তাঁর রাজপুত কুটুমদের বাড়ি থেকে সেনবাবুর ঘন ঘন ডাক আসে। তাছাড়া শিউলিবাড়ির এতগুলি ঘর তো আছেই। এরই মধ্যে মন্দ রোজগার করছেন না সেনবাবু। সেনবাবুর স্ত্রী একদিন এসে নিরুপমাকে নতুন সোনার বালা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। সেনবাবুর মেয়েদুটি বড় শান্ত। সুনন্দার সঙ্গে খেলা করতে এসে এ-বাড়িতেই ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

দেখতে পায় বিজনবিহারী, লুকোচুরি খেলার জন্য তৈরি হয়েছে সুনন্দা, রামসিংহাসনের তিন ছেলেমেয়ে, সেনবাবুর দুই মেয়ে আর নতুন বস্তির লালাদের যত ছেলেমেয়ে।

সাইকেল নিয়ে ঘরের বাইরে এসে একবার থমকে দাঁড়ায় বিজনবিহারী। গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে বাচ্চাদের দল, মাঝখানে সুনন্দা। বাচ্চাদের বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে আর ছড়া কেটে ছুট আর ফুট গুনছে সুনন্দা—আডাং বাডাং তিতা তোর, বীর বার শং।

সাইকেলটা ঝপাং করে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে ব্যস্তভরে এগিয়ে আসে বিজনবিহারী।—আর একটা ছড়া আছে নন্দু, খুব ভাল ছড়া।

শিখিয়ে দাও।

শেখ, সবাই শেখ। ...উচ্ছে পটল চচ্চড়ি, তাতে দিলাম ফুলবড়ি—ফুলবড়িটা গলে গেল, সবাই মিলে এক পা তোল।

বিজনবিহারী এক পা তুলে দাঁড়ায়, বাচ্চার দলও এক পা তুলে দাঁড়ায়। সব শেষে যার পা পড়ে, সে ছুট হয়ে সরে দাঁড়ায়।

বিজনবিহারী বলে—বল আবার বল; উচ্ছে পটল চচ্চড়ি...।

হল্লা শুনে নিরুপমা বের হয়ে আসে—এটা আবার কী শুরু করলে?

সাইকেলটাকে তুলে নিয়ে বিজনবিহারী বলে—একটা বাংলা স্কুল চালু না করে উপায় নেই নিরু। তোমার নন্দুর ভাষা আডাং বাডাং করতে শুরু করে দিয়েছে।

হ্যাঁ, বাংলা স্কুলটা চালু করতে একটা বছরের বেশি সময় লাগেনি। একটা প্রাইমারি স্কুল। স্কুল কমিটির প্রথম প্রেসিডেন্ট বিজনবিহারী। সেনবাবুর দুই মেয়ে, চক্রবর্তী মশাইয়ের তিন ছেলে আর স্টেশনের দুই বাঙালী পরিবারের চারটি ছেলেমেয়ে। তাছাড়া বাঙালী নয় যারা, তাদেরও বাড়ির পঁচিশটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে শিউলিবাড়ির প্রথম স্কুলের প্রতিষ্ঠার উৎসব যেদিন হয়ে গেল, সেদিন আবার রাতের আকাশটার দিকে তাকিয়ে চিকচিক করেছিল বিজনবিহারীর চোখ।

নিরুপমা বলে—স্কুলের কি নাম হল?

রমাসুন্দরী বেঙ্গলী প্রাইমারি স্কুল।

চমকে ওঠে নিরুপমা। এখন আর বুঝতে অসুবিধে নেই, কেন চিকচিক করছে বিজনবিহারীর চোখদুটো।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে হেসে ওঠে বিজনবিহারী। —কেন যেন মেজদির নামটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তাই স্কুলটাকে ওই নামটা দিয়ে দিলাম। মেজদির বাড়ির দানাদার সন্দেশের স্বাদ আজও তো ভুলতে পারিনি, নিরু।

নিরুপমার চোখদুটো যেন আবার ছলছল না করে ওঠে, তাই বোধহয় আরও জোরে চেঁচিয়ে কথা বলতে থাকে বিজনবিহারী।—চক্রবর্তী মশাইয়েরও একটা সুবিধে হয়ে গেল। বাঙালী বাচ্চাদের বাংলা পড়াবেন, হিন্দী বাচ্চাদের অঙ্ক। বুড়ো লালাবাবু হিন্দী পড়াবেন। দুই মাস্টারের মাইনের জন্য স্কুল কমিটি দেবে দশ টাকা, আর জেলা বোর্ড দেবে দশ টাকা।

কবিরাজ সেনবাবুকে আর কালীবাড়ির পুরোহিত চক্রবর্তীকে শিউলিবাড়িতে আনতে গিয়ে পুরো একটা বছর কী চেষ্টা আর কত চিন্তাই না করতে হয়েছে। বিজনবিহারীর কাছ থেকে নানা অনুরোধের আর অঙ্গীকারের চিঠি নিয়ে রামসিংহাসন বার বার ছুটেছে বর্ধমানে আর রাণীগঞ্জে? মাটিসাহেব নামে শিউলিবাড়ির সবচেয়ে সম্মানের আর দাপটের এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে অনেক ভরসার পাকা কথা পেয়ে আর রেল-খরচ পেয়ে তবে তাঁরা এসেছেন। নিরুপমার কাছে আগেই বলে রেখেছিল বিজনবিহারী—আমি ওদের আনিয়ে ছাড়ব, নিরু।

নিরুপমাও দেখে আশ্চর্য হয়েছে, বয়সটা চল্লিশ বছর পার হয়ে গেলেও মাটিসাহেবের সেই জেদের মাটি একটুও নরম হয়ে যায়নি।

কার্তিক মাসের হিমেল কুয়াশায় ভরা শিউলিবাড়ির অমাবস্যায় শীতাতুর মাঝরাত যখন একেবারে নিস্তব্ধ, কালীবাড়িতে শ্যামাপূজার ঘণ্টাধ্বনি যখন বাজতে শুরু করে, সিধো চামার যখন ঢাক বাজায়, তখন কমিটির প্রেসিডেন্ট এই মাটিসাহেব যেন রাতজাগা দুরন্ত ছেলের উৎসাহ নিয়ে আর চঞ্চল হয়ে কালীবাড়ির আঙিনায় ছুটোছুটি করে। লোক পাঠিয়ে ফুলনবাবুকে খবর দেয়, নতুন বস্তির লালাদেরও ডেকে পাঠায়, শিগগির চলে এস সবাই, ভোগ হয়ে যেতে আর দেরি নেই। সবাইকে প্রসাদ নিয়ে যেতে হবে।

রেলওয়ের এক বাঙালী অফিসার এসেছিলেন। স্টেশনে রেস্টরুমে একটা দিন ছিলেন। পদস্থ

অফিসার, তাঁর খাওয়া-দাওয়ার অভিরুচিও বেশ পদস্থ। গাঙ্গুলীবাবু একটু চিন্তায় পড়েছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত গাঙ্গুলীবাবুকে একটুও ব্যস্ত হতে হয়নি। শিউলিবাড়ির মাটিসাহেবই অফিসারকে খাওয়াবার সব দায় খুশি হয়ে নিজের উপর টেনে নিয়েছেন। নিজের হাতে পোলাও আর মাংস রান্না করেছে বিজনবিহারী নিরুপমা রেঁধেছে বড়ি দিয়ে আড় মাছের ঝোল, কাঁচা পেঁপের সুক্ত, লাউয়ের ঘণ্ট আর পায়েস। অফিসার ভদ্রলোক বিজনবিহারীকে বলেছেন, আপনি মশাই এখানে না থাকলে ছাতুটাতু খেয়ে আমার বোধহয় একদিনেই পাঁচ পাউণ্ড ওজন হারাতে হত।

অফিসারকে নিজের বাগানের এক ঝুড়ি পেঁপে উপহার দিয়ে বিজনবিহারী দুটো কাজের কথাও বলে নিয়েছে। স্টেশনের নামটা শুধু ইংরেজী হরফে লেখা আছে স্যার, আপনি কাইগুলি একটা ব্যবস্থা করুন, যাতে বাংলা হরফেও নামটা লেখা হয়।

তা হয়ে যাবে। একটা অর্ডার করিয়ে দিতে পারব।

তাছাড়া, এই ম্যাপটা একবার দেখুন স্যার, কত সস্তায় কত ভাল ভাল প্লট বিক্রি হচ্ছে। শিউলিবাড়ির চমৎকার জল-হাওয়ার কথাটা আপনারও জানা আছে নিশ্চয়। সুতরাং যদি একটু প্রচার করে দেন যে....।

কিসের প্রচার?

আমার ইচ্ছে, বাঙালীরা এখানে এসে যেন জমি কেনেন আর বাড়ি করেন।

ভাল কথা বলেছেন। আমার মনে হয়...হ্যাঁ...রামরাজাতলার যশোদাবাবুকে জানালে কাজ হতে পারে। ভদ্রলোক রটনা করতে খুব পোক্ত। ...দিন আপনার ম্যাপটা।

মাটিসাহেবের মাটি-কাটা ঠিকেদারীর কাজও বেড়েছে। কারণ সিলুয়াডিতে আরও দুটো নতুন কোলিয়ারি চালু হয়েছে। নতুন নতুন আরও রাস্তা খুলতে হবে। সিলুয়াডি রোডের আট মাইলের পোস্ট থেকে এদিকে উনিশ মাইলের পোস্ট পর্যন্ত নতুন কাঁকর আর মাটি ফেলতে হবে। রাস্তাটা চওড়া না করলে কয়লা-বোঝাই মোটর ট্রাক চলতে পারবে না।

দুধিয়া সিমেন্ট কারখানার জন্যও জঙ্গলের ভিতরে তিনটে ছোট-বড় সড়ক খুলতে হচ্ছে। মাটি কাটাবার ঠিকে পেয়েছেন মাটিসাহেব। একটা সড়ক চালু হয়ে গিয়েছে। দিন-রাত চুনাপাথরে বোঝাই হয়ে মোটর-ট্রাক নতুন সড়কে ছুটতে শুরু করেছে।

মাটিকাটার কাজটাকে হাসিতে খুশিতে, গানেতে আর ছড়াতে ভরে দিয়েছেন মাটিসাহেব। আগে শুধু নিজেই মুণ্ডারি ভাষায় গান গেয়ে মাটি-কাটা কুলির দলের ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়িকে হাসাতেন। আজকাল একটা নতুন কাণ্ড করেছেন। বাংলা গান গেয়ে মুণ্ডা আর ওরাওঁ কুলির দলকে খুশি করছেন। হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল—মাটিসাহেবের গানটা বারবার শুনে শুনে কুলির দলও গানটাকে যেন গলায় বেঁধে নিয়েছে। এক একদিন, শালবনের মাথায় যখন বিকেলের রোদ একটু ম্লান হয়ে আসে, তখন মাটিসাহেবের গান শুনতে পেয়ে যত হোরো টিগ্‌গা আর কুজ্‌জুর হাতের কোদাল নামিয়ে রেখে ব্যস্তভাবে ছুটে আসে। মাটিসাহেবের সেই 'হরি দিন তো গেল'র সঙ্গে গলা মিলিয়ে একজন হোরো আর দু'জন টিগ্‌গা গান গায়, আর একজন কুজ্‌জুর হয়তো মাদল বাজাতে শুরু করে।

মাটিসাহেবের বাগানটা যেন চাঁপাকলার জঙ্গল। চুঁচড়োর সরকারী কৃষির অফিসে পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়ে দিয়ে পাঁচশো চাঁপাকলার চারা আনিয়েছিলেন মাটিসাহেব। কিছু বিলিয়েছেন মুণ্ডাদের

গাঁয়ে গাঁয়ে, কিছু শিউলিবাড়িতে, আর বাকিটা নিজের বাগানে পুঁতেছেন। মাটিসাহেবের বাগানের প্রথম পাকা কলার কাঁদি কালীবাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মাটিসাহেব, তার পরের মাসেই প্রায় পঞ্চাশ কাঁদি কলা বেচে আর দশ কাঁদি কলা শিউলিবাড়ির ঘরে ঘরে বিলিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন মাটিসাহেব—আসছে বছরেই দেখতে পাবে নিরু, রাঁচির পাইকারেরা আর শেওড়াফুলি যাবে না, ওরা এই শিউলিবাড়ির বাজারে চাঁপাকলা কিনতে ছুটে আসবে।

নিরুপমা হাসে—তোমার কইমাছের অবস্থা কি দাঁড়াল?

খুব ভাল অবস্থা। শিগগির দেখতে পাবে, শিউলিবাড়ির বাজারে কইমাছ উঠেছে।

বছর দুই আগে লালগোলা থেকে একদল জেলে আর দশ হাজার কইমাছের চারা আনিয়ে ঝুমরা রাজের চারটে ঝিলের জলে ছেড়েছিল বিজনবিহারী, সে কই এখন বেশ বড় হয়েছে, শালুকের ডাঁটা ছিঁড়ে তছনচ কাণ্ড করছে কইয়ের ঝাঁক। ঘাই মারছে ডাগর কালবোশ।

প্রায় তিনটে মাস ধরে সন্ধ্যা থেকে শুরু করে সারারাত পর্যন্ত হাত চালিয়ে একটা জাল বুনেছে বিজনবিহারী, কইধরা জাল। সকালবেলায় জালটাকে হরিতকীর কষে চুবিয়ে চুবিয়ে আর ব্যস্তস্বরে ডাক দেয় বিজনবিহারী—নিরু তুমি কোথায়?

এই তো।

তুমিও তো এসব কাজ কিছু-কিছু করতে পার, নিরু।

আমি?

হ্যাঁ।

আমি কইমাছ ধরব?

আরে না; এসব কাজ মানে একটু-আধটু শখের কাজ। তার মানে শিউলিবাড়ির মেয়েগুলোকে অন্তত আলপনা আঁকবার কায়দাটা শিখিয়ে দিতে পার তো।

নিরুপমার ঠাট্টার চোখদুটো করুণ হয়ে যায়। মানুষটা যে-কাজের কথা বলছে, সে কাজ যে মানুষটার আত্মার একটা ব্রত হয়ে উঠেছে। এই মাটি-কাটা খাটুনির মধ্যেও সর্বক্ষণ যেন স্বপ্ন দেখছে, একটা হারানো জগতের যত ফুল ফল কইমাছকে ডেকে ডেকে হয়রান হচ্ছে আর খাটছে। এই তো, সেদিন বিন্ধ্যাচলী এসে বলে গেল বলেই জানতে পেরেছে নিরুপমা, বাঙালীবাবু আজকাল রোজ একবার গিয়ে রাজমোহিনীর বাপকে ক্ষীরমোহন আর সরপুরিয়া তৈরি করা শেখাচ্ছে! হাঁ দিদি, বাঙালী মিঠাইভি তোহর ঐসন মিঠি বা!

বলতে ইচ্ছে করেছিল, কিন্তু বলতে পারেনি নিরুপমা, আমি একটুও মিষ্টি নই বিন্ধ্যাচলী, মিষ্টি তোমাদের ওই বাঙালীবাবু, ওর স্বপ্নটাও মিষ্টি। শিউলিবাড়ির পাথুরে মাটিকে মিষ্টি করে দেবার জন্য ও শুধু একাই খাটছে। আমি একটা অপদার্থ। আমার কোন গুণ নেই যে ওকে সাহায্য করতে পারি।

বিজনবিহারীর হাতের জালটার দিকে তাকিয়ে নিরুপমা বলে—তুমি এখন ওটা রেখে দাও লক্ষ্মী, একটু জিরোও।

জিরোলে চলবে কেন?

আমাকে বলে দাও কি করতে হবে, সব করে দিচ্ছি।

কিন্তু আমি যে কথাটা বললাম...?

শুনেছি। রাজমোহিনীর বিয়েতে আমি নিজেই গিয়ে আলপনা এঁকে দিয়ে আসব।

অ্যাঁ? রাজমোহিনীর বিয়ে? কত বয়স হল রাজমোহিনীর?

তা মন্দ কি? ষোল-সতর হবে। ওদের মতে একটু বেশি বয়স হয়ে গেছে।

তাহলে আমাদের নন্দুর কত বয়স হল?

তের পার করেছে নন্দু।

তা হলে তো নন্দুর বিয়ের কথাটা এখন থেকেই ভাবতে হয়।

ভাবা তো উচিত। বলতে গিয়ে নিরুপমার চোখের পাতা যেন চমকে কেঁপে ওঠে, আর মুখটাও গম্ভীর হয়ে যায়।

নিশ্চয় উচিত। বলতে বলতে হাত ধুয়ে নিয়ে আর হেসে হেসে বাগান দেখতে চলে যায় বিজনবিহারী।

বোধহয় বলতে চেয়েছে বিজনবিহারী, ভাবা উচিত নিশ্চয়, কিন্তু ভাবনা করা নিশ্চয় উচিত নয়। সুনন্দার বিয়ে দিতে হবে—কল্পনাটা যেন নিজেরই খুশিতে হেসে উঠেছে। বিজনবিহারীর চোখের দৃষ্টি আর গলার স্বরে অদ্ভুত এক স্নেহাক্ত আনন্দ উথলে উঠেছে। তাই স্বচ্ছন্দে হেসে হেসে বাগানের কাজে ব্যস্ত হবার জন্য চলে গেল বিজনবিহারী।

না, নিরুপমাও আর ভাবনা করে মনের ভার বাড়াতে চায় না। ভাবনা করবার কোন দরকার হয় না। ওই মানুষটা যে ভাবনা জয় করবার যোদ্ধা, আর ভরসা তৈরি করবার কারিগর। অনেকবার এমন হয়েছে, সুনন্দার মুখটাকে নিজের হাতে সাবান দিয়ে ধুয়ে, চোখে কাজল বুলিয়ে, কপালের উপর ছোট্ট একটা কুমকুমের তারা এঁকে দিতে গিয়ে হঠাৎ নিরুপমার চোখের হাসি গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। যেন আচমকা একটা কালো-ছায়াকে দেখতে পেয়েছে নিরুপমা। কিন্তু...না, ভুল দেখেছে নিরুপমা। বিজনবিহারীর মুখের অবাধ হাসিটা যেন ফটিকজলের হাসি, নিরুপমার চোখের সব গম্ভীরতা ধুয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে।

না, ওই কালো ছায়াটা কালো বটে, ছায়াও বটে। কিন্তু অন্ধকারের কালো নয়। ওটা শিবপুকুরের ডাঙার বুকের সেই তালবনের ছায়ার মত একটা কাজলমায়ার কালো। চড়কের মেলা দেখতে যারা দূর গাঁয়ে যায়, তাদের মাঝপথের আর মাঝবেলার শান্তি হল ওই তালবনের কালোছায়া।

চোদ্দ

রাজমোহিনীর বিয়েতে আলপনা এঁকেছে নিরুপমা। কিন্তু এই একটি আলপনা দেখে শিউলিবাড়ির যেন চোখ ভরেনি। লালাদের বাড়ির বউ আর মেয়েরা বার বার এসেছে, নিরুপমার কাছে আলপনা আঁকা শিখেছে।

ওরা মোচা রাঁধতে জানে না নিরু, মোচাগুলোকে জঞ্জাল মনে করে ফেলে দেয়। তুমি যদি ওদের একটু শিখিয়ে দাও, তবে ভাল হয়। বিজনবিহারীর ইচ্ছের কথাটা যেদিন শুনতে পেল নিরুপমা, তারপর বোধহয় তিনটে মাসও পার হয়নি, ভাত খেতে বসে এক বাটি মোচার ঘণ্টের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে বিজনবিহারী—ঘণ্টর চেহারা খুব খুলেছে দেখছি।

নিরুপমা হাসে—মুখে দিয়ে নিয়ে বল, কেমন হয়েছে?

মোচার ঘণ্ট মুখে দিয়ে বিজনবিহারী আরও খুশি হয়।—চমৎকার।

কিন্তু আমি রাঁধিনি।

অ্যাঁ? কে রেঁধেছে?

ফুলনবাবুর ছেলের বউ রেঁধে পাঠিয়েছে।

কি আশ্চর্য! কিন্তু...মনে হচ্ছে, কেউ যেন পার্বতীকে শিখিয়ে দিয়েছে।

তা তো বটেই।

কে শেখাল?

তুমি যাকে বলেছিলে, সেই শিখিয়েছে।

নিরুপমার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন একটা পরম কৃতার্থতার আনন্দে চোখ বড় করে হাসতে থাকে বিজনবিহারী—তাই বল।

শত্রুঘন্ বাবুর মেয়েও এসেছিল।

কেন?

বাঙালী রান্না শিখতে চায়।

শিখিয়েছ?

হ্যাঁ।

কি শেখালে?

ফোড়ন দিয়ে চালতের অম্বল।

খুব ভাল করেছ। ফোড়নের রান্না ওরা একেবারেই জানে না। তাছাড়া চালতে যে খাওয়া যায়, তাও জানতো না।

নন্দুও একটা কাণ্ড করেছে।

কি করল নন্দু?

লালাদের বাড়ির বুড়িদের অবশ্য রাজি করাতে পারেনি নন্দু, কিন্তু বউগুলোকে আর মেয়েগুলোকে বাঙালী ধরনে শাড়িপরা ধরিয়েছে।

বল কি? চেঁচিয়ে ওঠে বিজনবিহারী।

এমন কি বিন্ধ্যাচলীকেও একদিন...। হেসে ফেলে নিরুপমা।

ওকি? বিন্ধ্যাচলীই যে কথা বলছে। যেন একটা হাসির ঝংকার লুটোপুটি করে এগিয়ে আসছে—অব তো আমি নন্দুয়ার শাশুড়িকে সাথ বাংলা বোলি বলতে পারবে।

একেবারে রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় বিন্ধ্যাচলী। দু'ফেরতা দিয়ে শাড়ি পরা আর আঁচল দোলানো একটা মূর্তি। কিন্তু বিজনবিহারীকে দেখতে পেয়েই জিভ কেটে লজ্জিত আতঙ্কের মত ছুটে পালিয়ে যায়।

কাঁথা সেলাই করছিল নিরুপমা। পালতোলা নৌকো নদীর জলে ভাসছে। নক্‌শাটার নদীর জলের ঢেউগুলো নীল সুতোর, নৌকোটা লাল সুতোর। বাকি সবটা সাদা সুতো দিয়ে পিঁপড়ে সারি ফোঁড়ের সেলাই। মাটিসাহেবের বাড়ির কাঁথা দেখে হরি রাজপুতের মা আশ্চর্য হয়—আহা! কী সুন্দর জিনিস! কেমন করে বানালে, এ নন্দুকে মাঈ?

নিরুপমা—শিখবেন?

শিখিয়ে দেবে তবে তো শিখব।

একটা বছর ধরে নিরুপমার ঘরে সারাটা দুপুর বসে বসে, একা হরি রাজপুতের মা নয়, ফুলনবাবুর ছেলের বউ আর লালাদের মেয়েরাও কাঁথা সেলাই করেছে। নিরুপমা, বলতে গেলে, একরকম হাতে ধরে সবাইকে কাঁথা সেলাইয়ের কাজ শিখিয়েছে।

আর একটা বছর পার হতেই শিউলিবাড়ির জীবনে আরও একটা উৎসবের মত কাণ্ড করে ফেলল যে, সে হল খেজুর রসের পায়েস। বিজনবিহারীর বাড়িতে নিমন্ত্রণ পেয়ে স্কুল কমিটির সবাই যেদিন খেজুর রসের পায়েস খেল, বলতে গেলে সেদিন থেকেই উৎসবটা শুরু হয়েছিল। শীতের পুরো তিনটে মাস ধরে, যেমন রামসিংহাসনের বাড়িতে তেমনই ফুলনবাবুর আর লালাদের বাড়িতে খেজুর রসের পায়েস রাঁধবার ধূম পড়ে গেল। বুঝিয়ে দিয়েছিল বিজনবিহারী—আগে বেশ ঘন করে রস জ্বাল দিয়ে নেবেন, তারপর ভিন্ন করে দুধে চাল ছেড়ে দিয়ে জ্বাল দেবেন। বেশ একটু ক্ষীর-ক্ষীর হলে তাতে রস ঢেলে দিয়ে, শেষে এলাচ গুঁড়ো ফেলে দিয়ে...।

রমাসুন্দরী বেঙ্গলী প্রাইমারি স্কুলের নামটারও উন্নতি হয়েছে। ওটা এখন রমাসুন্দরী বেঙ্গলী মাইনর স্কুল। মাইনর স্কুলে শুধু ছেলেরা পড়ে, কাজেই নতুন করে একটা প্রাইমারি স্কুল করতে হয়েছে—শিউলিবাড়ি প্রাইমারি স্কুল, প্রেসিডেন্ট হয়েছেন ফুলনবাবু।

মাইনর স্কুলের ছাত্রের সংখ্যা দু'শোরও বেশি। তার মানে এই সাত বছর ধরে প্রায় পঁচিশ জন করে ছাত্র বেড়েছে। দু'জন নতুন টিচার এসেছে। শুধু এক হিন্দী টিচার ছাড়া আর সবাই বাঙালী। প্রেসিডেন্ট বিজনবিহারী বাঙালী টিচারদের সবাইকে অনুরোধ করেছিলেন, আপনারা ফ্যামিলি নিয়ে আসুন। বাসা ভাড়ার জন্য মাসে তিন টাকার বেশী লাগবে না। লালাদের পাড়াতে পাঁচ-ছ'টা বাড়ি খালি পড়ে আছে। আমি বলে দিলে সস্তায় ভাড়া দিতে রাজি হয়ে যাবে লালারা।

ফ্যামিলি নিয়ে এসেছেন টিচারেরা। থার্ড টিচার পুষ্কর দত্তের কাণ্ড দেখে খুব খুশি হয়েছেন প্রেসিডেন্ট। মাইনে পঁচিশ টাকা, বয়সেও ছেলেমানুষ বললেই চলে, সংসারের দায় বলতে কি বোঝায় আর ঝুঁকি কত, তা'ও বোধহয় জানে না; তবু অন্ধ বিধবা মা, একটা বোন আর তিনটে ভাইকে দেশ থেকে আনিয়েছে পুষ্কর! হেডমাস্টার দীনবন্ধুবাবু কিন্তু এরই মধ্যে তিন কাঠা জমি কিনে দুটো ঘর তুলে ফেলেছেন।

কিন্তু ওদিকে, স্টেশনের পুব দিকের সৌখিন জমির প্লট ছাপিয়ে পঞ্চাশটারও বেশি বাড়ি উঠেছে, আরও উঠছে। কলকাতার তিন ব্যারিস্টারের বাড়ি, বর্ধমানের এক জমিদারের বাড়ি, হুগলির দুই ডাক্তারের বাড়ি। কোলিয়ারির বাঙালী স্টাফেরাও অনেকে বাড়ি করে ফেলেছেন। রাঁচির মাড়োয়ারীরা যে-সব বাড়ি তৈরি করেছেন, সেগুলির বেশির ভাগই ভাড়া খাটে। আর ভাড়াটেদের বেশির ভাগই বাঙালী। পুজোর সময় আর শীতের সময় হাওয়া-বদলের জন্য বাঙালীরা সবচেয়ে বেশি ভিড় করে। কোন বাড়ি আর খালি থাকে না।

শিউলিবাড়ির এই সৌখিন উপনিবেশ, যার নাম ঝুমরা কলোনি, তার কলরবের মধ্যেও মাটিসাহেবের নামটা প্রায় সব সময় বেজেই চলেছে। মাটিসাহেব কি বললেন? মাটিসাহেব কি ধোপা যোগাড় করে দিতে পারলেন? মাটিসাহেবকে বললেই তো হয়, বাসক পাতা আনিয়ে দিতে পারবেন। ঝুনুর জন্যে একজন টিউটর দরকার ছিল, কই, মাটিসাহেব কি ব্যবস্থা করলেন বুঝতে পারছি না। এবার কিন্তু মাটিসাহেব সত্যিই খুব বিশ্বাসী একটা চাকর যোগাড় করে দিয়েছেন। শুনলাম, আজ বিধুবাবুর বাড়িতে ধুনুরী পাঠিয়েছিলেন মাটিসাহেব। আমি অপেক্ষায় আছি,

মাটিসাহেবের বাড়িতে হরিণের মাংসের ফীস্ট খেয়ে তারপর কলকাতা রওনা হব। পিসিমার দাঁতের ব্যথার একটা চমৎকার জংলী ওষুধ এনে দিয়েছেন মাটিসাহেব। মিনতির হারের লকেটটার একটা পাথর খুলে গেছে, কে জানে মশাই কে সেট করবে? মাটিসাহেব তো বললেন ভাল স্যাকরা আছে। যাই হোক, শুনতে পেলাম, মাটিসাহেব এবার উঠে-পড়ে লেগেছেন, ক্লাবটা যাতে তাড়াতাড়ি হয়।

শিউলিবাড়ি ক্লাব। একটা ঘরে দুটো আলমারিতে বাংলা বই ঠাসা, আর একটা ঘরে তাস দাবা আর ক্যারম। বারান্দার সামনে ছোট এক টুকরো মাঠের উপর ব্যাডমিন্টন। শুধু এক শিউলিবাড়ি ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মাটিসাহেবের জীবনের যে পুরো পাঁচটা বছর পার হয়ে গিয়েছে, আর বয়সটা পঞ্চাশ পার হয়ে আরও পাঁচ বছর এগিয়ে গিয়েছে, এই হুঁসও বোধহয় মাটিসাহেবের নেই।

ক্লাবের সেক্রেটারি হয়েছে যে সে হল ব্যাডমিন্টনে কলেজ চ্যাম্পিয়ন মোহিত ঘোষ। মাটিসাহেবের প্রায় অর্ধেক বয়সের এমন একটি কাজের মানুষ থাকতেও ক্লাবের বাড়ি তৈরি থেকে শুরু করে সতরঞ্চি কেনা পর্যন্ত সব দরকারের খোরাক যোগাড় করতে গিয়ে ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মাটিসাহেবকেই একটা রসিদ বই পকেটে নিয়ে ছুটতে হয়েছে, কখনও সিলুয়াডি কোলিয়ারীর সাহেবের কাছে, কখনও বা দুধিয়া সিমেন্ট কারখানার আগরওয়ালার কাছে। সিলুয়াডির সাহেব আর দুধিয়ার আগরওয়ালা যদিও তিন টাকা আর তিন টাকা মোট ছ'টাকা দান করেছিলেন, আর নতুন বাঙালী আগন্তুকেরা দান করেছিলেন মোট ছাপ্পান্ন টাকা চার আনা, কিন্তু মাটিসাহেবকে সেজন্য একটুও বিচলিত বা চিন্তিত হতে দেখা যায়নি। রসিদ বইটা পকেটেই থাকে। পথে যেতে যার সঙ্গে দেখা হয়, তার কাছেই চেয়ে বসেন, দু-আনা চার-আনা যা-ই হোক, শিউলিবাড়ির ক্লাব ফাণ্ড প্লীজ ডোনেট স্যার, কিছু দান করুন মশাই, কুছ দিজিয়ে লালাজী, দেহা হো মাহাতো, এয়াম কে তিয়াঁ মে!

এস্টিমেট বলছে আটশো টাকা চাই, কিন্তু এত চেষ্টা করেও যোগাড় হয়েছে শুধু দুশো ষোল টাকা এগার আনা। বিজনবিহারী হেসেছিলেন—ক্লাবটা বেশ ভোগাবে বলে মনে হচ্ছে।

নিরুপমা আশ্চর্য হয়েছিলেন—কোথায় ক্লাব?

বিজনবিহারী—কোথাও নেই। সেইজন্যেই তো বলছি, ক্লাবের বাড়ি তৈরির জন্য মাত্র দুশো ষোল টাকা এগার আনা চাঁদা উঠেই, বাস্, একেবারে থেমে গিয়েছে। অথচ আরও প্রায় ছ'শো টাকা চাই।

নিরুপমা—ভাল হয়েছে।

কি বললে?

ওসব এখন থেমে যেতে দাও।

তুমি তো এক কথায় নিষ্পত্তি করে দিলে। কিন্তু এতদূর এগিয়ে গিয়ে কি থেমে গেলে চলে?

না থেমে উপায় কি? এত টাকা তুমি পাবে কোথায়?

বিজনবিহারী হাসেন—পাওয়ার সুবিধে আছে বলেই ভাবছি। ফুলনবাবু হ্যাণ্ডনোটে তিনশো টাকা দিতে রাজি আছেন। আর...আর ধর এ-বছরের সব অড়হর আর মকাই বেচে আরও দেড়শো টাকা হবে। বাকি রইল দেড়শো টাকা। সে টাকা তো তোমার কাছ থেকেই ধার পেতে পারি।

নিরুপমার মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে হাসছেন বিজনবিহারী, শিউলিবাড়ির মাটিসাহেব, যে মানুষটার বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গিয়েছে। মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, মেয়ের বিয়ের কথাও ভাবতে হচ্ছে। আর, গত বছরের ধানবেচা টাকা থেকে মাত্র ওই দেড়শো টাকা বাঁচিয়ে স্ত্রীর কাছে জমা রেখেছেন, মেয়ের গলার একটা সোনার হারের জন্য।

একটি কথাও না বলে ঘরের ভিতরে গিয়ে আর বাক্স খুলে দেড়শো টাকার ছোট্ট পুঁটলিটাকে বিজনবিহারীর হাতের কাছে ফেলে দিয়ে চলে যান নিরুপমা।

পনের

এ তো প্রায় পাঁচ বছর আগের ঘটনা। কিন্তু পাঁচ বছরেও নিরুপমার কাছে সেই দেড়শো টাকা দেনার একটা টাকাও শোধ করতে পারেননি বিজনবিহারী। এই পাঁচ বছরের মধ্যে সেই টাকার কথা নিয়ে একটিও কথা বলেননি নিরুপমা। বিজনবিহারী অবশ্য প্রতি মাসে অন্তত দুবার করে বলেছেন—মনে আছে, মনে আছে নিরু। তোমার টাকা আমি পাই-পাই শোধ করে দেব।

শোধ করতে পারতেন বোধহয় বিজনবিহারী, যদি একটু জিরোতে জানতেন কিংবা থামতে পারতেন। শেষ জানা নেই, যেন এইরকম একটি পথে মাটিসাহেবের যত ইচ্ছার চেষ্টার আর কল্পনার প্রাণটা এগিয়ে চলেছে। মাথার অনেকখানি সাদা হয়ে গিয়েছে, বড়-বড় একজোড়া গোঁফ যেন ঠোঁটের ফাঁকে শান্ত হাসিটাকে অদ্ভুত একটা ছায়া দিয়ে ঢেকে ফেলেছে। মাথায় শোলার হ্যাট, পিঠে বন্দুক, পায়ে বুট, গায়ে খাকি কামিজ আর প্যান্ট, মাটিসাহেব তাঁর ছুটোছুটির জীবনের চিরকেলে সহচর সেই সাইকেলের সঙ্গে আজও যেন ছুটেই চলেছেন। এ সড়কের শেষ মাইলপোস্ট আর কতদূর? কিংবা সত্যিই কোন শেষ আছে কিনা, প্রশ্নটা যেন মাটিসাহেবের জীবনের কোন প্রশ্নই নয়।

মাটি-কাটা ঠিকেদারীর বিলের টাকা, ধানবেচা টাকা, কলাবেচা পেঁপেবেচা টাকা—এই পাঁচ বছরে টাকা তো বার বার এসেছে। কিন্তু নিরুপমার টাকা মিটিয়ে দেবার সুযোগ পেলেন কোথায় বিজনবিহারী?

ক্লাবের বাড়ি তৈরি হয়ে যাবার পর, ক্লাব চালু হবার পর, আর সন্ধ্যায় ক্লাবঘরে দাবার হল্লা হে-হে করে ওঠবারও পর, পাঁচটা বছর ধরে যেন আর-একটা মানত পালন করবার জন্যে ছুটোছুটি করেছেন আর টাকা খরচ করেছেন বিজনবিহারী।

রুদ্রকিশোর হকি শীল্ড। টুর্নামেন্ট খেলতে টিম পাঠাবে সিলুয়াডি কোলিয়ারি, দুধিয়া সিমেন্ট ওয়ার্কস, হুট্‌পা লুথেরিয়ান মিশন। তাছাড়া আছে শিউলিবাড়ি ইলেভেন। আছে গ্র্যাণ্ড হিরোজ, অর্থাৎ মাটিসাহেবের মুণ্ডা কুলিদের দল থেকে বাছাই করা ছোকরাদের একটা টিম। শীল্ড কিনতে হয়েছে, মস্ত বড় একটা সামিয়ানা কিনতে হয়েছে, পঞ্চাশটা চেয়ার তৈরি করাতে হয়েছে, দুটো টিমের ইউনিফর্ম কিনতে হয়েছে। সব খরচ মাটিসাহেবের।

ফুলনবাবুর কাছে গল্প করেছে রামসিংহাসন—মাটিসাহেবের হির্‌দয়! কেয়া কহে তসীলদারজী। যেন বাপের কোলঘেঁষা একটা বাচ্চার হৃদয়।

ফুলনবাবু—রুদ্রকিশোর কি মাটিসাহেবের পিতাজীর নাম?

রামসিংহাসন—হ্যাঁ হাঁ, সেই কথাই তো বলছি। কবে সেই ছেলেবেলায় বাপ মরে গেছেন,

আজ ছেলের মাথার চুলও সাদা হয়ে গিয়েছে, তবু দেখুন, কী হির্‌দয়, বাপের নামটিকেই যেন পুজো করছেন মাটিসাহেব।

ফাইনাল খেলার দিন এস-ডি-ও এসেছিলেন। সিলুয়াডি কোলিয়ারীকে হারিয়ে দিয়ে শীল্ড পেল শিউলিবাড়ি ইলেভেন। এস-ডি-ও'র হাত থেকে শীল্ড উপহার নিয়ে শিউলিবাড়ি ইলেভেনের ক্যাপ্টেন সেই থার্ড টিচার পুষ্কর দত্ত যখন মাথা তুলে আর জয়ীর হাসি হেসে চারদিকের ভিড়ের দিকে তাকায়, তখন দেখতে পায় রামসিংহাসন, মাটিসাহেব যেন ছটফট করছেন, আর চোখদুটো হেসে-হেসে চিকচিক করছে।

সেদিন রামসিংহাসনের বউ বিন্ধ্যাচলীও আর-একজনের চোখদুটোকে হাসতে দেখে চমকে ওঠে। অদ্ভুত হাসি। সন্ধ্যাতারার মত মিটিমিটি হাসি নয়, রাতের তারার মত ঝিকঝিক করে হাসছে। রামসিংহাসনের বাড়ির সামনের সড়কের উপর শিউলিবাড়ি রাস্তা কমিটির সবচেয়ে পুরনো ল্যাম্পপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে আছে সুনন্দা। পাশের শিমুলের একটা শাখা একগাদা লালফুলের ভারে নুয়ে গিয়ে সুনন্দার মাথার উপরে আস্তে আস্তে দুলছে। বিন্ধ্যাচলী তার ঘরের দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে দেখতে পায়, বাঙালীবাবুর মেয়ে নন্দুয়ার মুখটাও যেন শিমূলের ফুলের মত লালচে হয়ে ফুটে রয়েছে।

কি ব্যাপার? এই তো কিছুক্ষণ আগে বিন্ধ্যাচলীর কাছে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল সুনন্দা। হঠাৎ সড়কের দিক থেকে একটা জয়ধ্বনির হর্ষ উথলে উঠে বাতাস শিউরে দিতেই সুনন্দা যেন ব্যস্তভাবে এগিয়ে গিয়ে সড়কের একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। শিউলিবাড়ি ইলেভেনের জয় হেঁকে চলে যাচ্ছে একটা ভিড়ের মিছিল। আর, রুদ্রকিশোর শীল্ড দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে সবার আগে আগে চলেছে পুষ্কর।

তখনি একবার বাঙালীবাবুর বাড়িতে গিয়ে নন্দুয়ার মা'কে একটা কথা বলবার জন্য যেন ছটফটিয়ে উঠেছিল বিন্ধ্যাচলী। কিন্তু যেতে পারেনি। বিন্ধ্যাচলীর ছটফটিয়ে ওঠা সেই ব্যাকুলতা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল।

বুঝতে ভুল হয়েছে বিন্ধ্যাচলীর। দেখতে পায় বিন্ধ্যাচলী, পুষ্করের সঙ্গে নয়, অন্য একজনের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে সুনন্দা।

রামসিংহাসন বলে—ঝুমরা কলোনিতে থাকে এই ছোকরা বাঙালী, বেশ ভাল একটা চাকরি করে, আর মাঝে মাঝে বাঙালীবাবুর বাড়িতে যায়। ওরই নাম মোহিত, ক্লাবের হিসাব-টিসাব রাখে, আর খুব বই পড়ে।

বিন্ধ্যাচলী—আমিও দেখেছি, কিন্তু বাঙালীবাবুর বাড়িতে ওর এত আসা-যাওয়া কেন?

রামসিংহাসন—নন্দুয়াকে পড়াতে আসে।

রামসিংহাসনের ধারণাটা খুব ভুল ধারণা নয়। বিজনবিহারীর বাড়িতে প্রায়ই আসে মোহিত। আসবার সময় একগাদা বই হাতে নিয়ে আসে, যাবার সময় একগাদা বই হাতে নিয়ে চলে যায়। সুতরাং সম্পর্কটা পড়া-শোনার সম্পর্ক বলেই তো মনে হয়।

বিন্ধ্যাচলী অপ্রসন্নভাবে বলে আমার কিন্তু দেখতে কেমন যেন লাগে।

রামসিংহাসন ধমক দেয়—চুপ রহো। যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা বলো না! সাবধান।

বিন্ধ্যাচলীর অপ্রসন্নতা ধমক খেয়েও দমে যায় না। রামসিংহাসন তখন শান্ত ভাষায় বুঝিয়ে

দেয়—নন্দুয়া তো তোমার রাজমোহিনীর মত একটা হালুয়াইয়ের মেয়ে নয়, বাঙালীবাবুর মেয়ে। ওদের একটু বেশি বয়সে বিয়ে হয়, আর অনেক লেখা-পড়াও শিখতে হয়।

বিন্ধ্যাচলী—কত বেশি বয়স হবে? নন্দুয়ার বয়স কত হল জান?

কত?

হিসেব করে দেখ, আমার রাজমোহিনীর চেয়ে চার বছরের ছোট হল নন্দুয়া।

চমকে ওঠে রামসিংহাসন—তবে তো প্রায় পঁচিশ হতে চলল নন্দুয়া। হায় রাম!

ঠিক কথা। রামসিংহাসনের মনের একটা বিস্ময় যেন আক্ষেপ করে উঠেছে, এত বয়স হয়ে গেল মেয়েটার, তবু বাঙালীবাবুর যেন কোন হুঁস নেই। অন্তত এক মাসের জন্য একবার দেশে গিয়ে মেয়ের বিয়েটা চুকিয়ে দিয়ে আসতে পারে। কিন্তু দেশে যাবার নামও করে না বাঙালীবাবু।

বিন্ধ্যাচলীর মনেরও এটা একটা বিস্ময়। নন্দুয়ার মা আরও অদ্ভুত মানুষ। নন্দুয়ার বিয়ের জন্য একটা সামান্য চিন্তার কথাও নন্দুয়ার মা'র মুখে কোনদিন শোনা গেল না। এত বয়স হয়েছে মেয়ের, তবুও মেয়ে যেন কোলের মেয়েটি। একদিন দেখেছে বিন্ধ্যাচলী, নন্দুয়া একটা আসনের উপর বসে বই হাতে নিয়ে পড়ছে, আর নন্দুয়ার মা নিজের হাতে মেয়েকে ভাত খাইয়ে দিচ্ছেন। বাঙালীবাবুও সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে কি কাণ্ড করেন, সেটাও অনেকবার নিজের চোখে দেখেছে আর নিজের কানে শুনেছে বিন্ধ্যাচলী। ঘরের ভিতরে এদিকে ওদিকে ঘুরঘুর করেন বাঙালীবাবু আর বাঙালীবাবুর মুখ থেকে যেন একটা আদুরে উৎসবের যত আবোল-তাবোল ভাষা ঝরে পড়তে থাকে—নন্দু, নন্দু, এ বেটি নন্দুয়া, ও লক্ষ্মী মেয়ে, ও শ্রীমতী সুনন্দা, এক গেলাস জল খাওয়াও তো মা।

দেখতে কী সুন্দরই না হয়েছে নন্দুয়া! বিন্ধ্যাচলী বলে।—চোখে পড়লে যে রাজামানুষও নন্দুয়াকে বিয়ে করতে চাইবে।

রামসিংহাসন বলে—এরকম একটা ব্যাপারও হয়ে গেছে।

কি, কি? কবে হল? বিন্ধ্যাচলীর চোখদুটো উৎসুক হয়ে জ্বলজ্বল করে।

কুবেরকে চেন? হরচন্দ রায়ের ভাগিনা কুবের?

হ্যাঁ।

জানে বিন্ধ্যাচলী, শিউলিবাড়ির কে-ই বা না জানে, সিংহানী পাহাড়ের কাছে নতুন কোলিয়ারী খুলেছেন যে পাঞ্জাবী বড়লোক হরচন্দ রায়, যার একটা বাংলো স্টেশনের কাছে দেওদার বাগিচার ভিতরে নানা রঙে রঙিন হয়ে ঝলমল করে, তাঁরই ভগ্নীপতি হলেন এক রাজামানুষ। জলন্ধরে জায়গীরদারী আছে আর গয়াতে আছে জমিদারী। হরচন্দ রায়ের ভাগিনা কুবের পাটনাতে থেকে মস্ত বড় একটা কারবার চালায়। সেই কুবের শিউলিবাড়িতে এসেছিল। আর বাঙালীবাবুর মেয়ে সুনন্দাকে বিয়ে করবার জন্যে ফুলনবাবুর কাছে কথা পেড়েছিল।

তারপর? তারপর কি হল? প্রশ্ন করতে গিয়ে বিন্ধ্যাচলীর খুশির কৌতূহল যেন চেঁচিয়ে ওঠে।

তারপর আর কিছু হল না। ফুলনবাবুর বউ নন্দুয়ার কাছে কথাটা বলেছিলেন। কিন্তু।

নন্দুয়া কি বললে?

নন্দুয়া বলেছে,—না।

বিন্ধ্যাচলী মাথা নাড়ে—তবে তো মনে হয়, ওহি, ওহি বা!

কওন? কওন?

মোহিত।

রামসিংহাসন একটা হাঁফ ছেড়ে নিয়ে বলে—হ্যাঁ।

ষোল

যে সত্য শুধু রামসিংহাসনের চোখে নয়, শিউলিবাড়ির আরও অনেকের চোখে ধরা পড়েছে, সেটা কি মাটিসাহেবের চোখে ধরা পড়েনি? যদিও মাটিসাহেবের বয়সটা ষাট বছর হতে চলেছে, মাথাটা সাদা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তাঁর চোখ দুটো তো এখনও আলোমাখানো নীল আকাশের মত হাসে। সন্ধ্যার জঙ্গলের পথে সাইকেল চালিয়ে ছুটে যেতে এখনও যার চোখে কোন অন্ধকার ঠেকে না, এমনই যাঁর চোখের তেজ, সে মানুষ কি এখনও দেখতে পায়নি যে, মোহিতের হাত থেকে বই নেবার জন্য একটা আশার প্রতীক্ষায় কেমন ব্যাকুল হয়ে শিউলির আশে-পাশে ঘুরে বেড়ায় সুনন্দা? আর সে-সময় সুনন্দার চোখের চাউনিটাও কেমন স্বপ্নায়ু হয়ে ওঠে?

নিরুপমার মনেও একটা দুঃসহ বিস্ময়ের জিজ্ঞাসা ছটফট করে। এখনও কি চোখে পড়ল না মানুষটার, মেয়ের গলাটা যে শূন্য? মেয়ের বিয়ের জন্য ভাবনা করবার সময় কি এখনও আসেনি? যেন শিউলিবাড়ির আকাশটার ইচ্ছার কাছে সব আশা সঁপে দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছেন মেয়ের বাপ। মেয়ের অদৃষ্টের কি হবে, কি হতে পারে, আর কি হতে চলেছে, এসব যেন মানুষটার কাছে কোন প্রশ্নই নয়।

মেয়ের গলার জন্যে সোনার হার গড়াবার জন্য জমিয়ে রাখা সেই দেড়শো টাকার পুঁটুলিটাকে যে এখনও নিরুপমার হাতে ফিরিয়ে দিতে পারেননি, সেজন্যেও কি বিজনবিহারীর মনে কোন আক্ষেপ আছে? একটুও না। তাই আজও হেসে হেসে অনায়াসে বলে দিতে পারলেন, মনে আছে নিরু। সামনে একটা খরচের ধাক্কা আছে, সেটা সামলে নিতে পারলেই তোমার দেনা শোধ করে দেব।

বলতে ইচ্ছা করে নিরুপমার—ওটা আমার কাছে তোমার দেনা নয়, ওটা তোমার অদৃষ্টের কাছে তোমার দেনা। কিন্তু বুকের ভিতরে মুখর হয়ে ওঠা এই দুরন্ত প্রতিবাদের শব্দটাকে যেন মুখ চেপে নীরব করে রেখে দেন নিরুপমা।

বিজনবিহারী তো আকাশের ইচ্ছার কাছে সব ছেড়ে দিয়ে আর নিশ্চিন্ত হয়ে ছুটোছুটি করেন, কিন্তু নিরুপমার চোখদুটো যে মাঝে মাঝে চমকে ওঠে, আর, একটা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে নিথর হয়ে যায়। সন্দেহ না করে পারেন না নিরুপমা, আর সন্দেহ করতেও বুক কাঁপে, বিজনবিহারীর এই নিশ্চিন্ততা যেন একটা অসহায়তার অলস ঘুম। একটা অক্ষমতার দুঃখ জোর করে ফাঁকির হাসি হাসছে। মেয়ের বিয়ে দিতে কোন চেষ্টাই করতে পারছেন না এই দুঃসাহসিক মাটিসাহেব, তাই মিথ্যে নির্ভাবনার কথা দিয়ে ভয় চাপা দিতে চেষ্টা করছেন।

নিরুপমার অভিযোগ যতই বোবা হয়ে থাকুক না কেন, সে অভিযোগের রূপটাকে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিতে পেরেছেন নিরুপমা। তবু বিজনবিহারী দেখতে পেয়েছেন কি না সন্দেহ। নিরুপমার হাতে শুধু একজোড়া শাঁখা ছাড়া আর কিছুই নেই। দুলজোড়া খুলে নিয়ে মেয়ের কানে পরিয়ে দিয়েছেন। নিরুপমার ছ'গাছি সোনার চুড়ি, সেগুলোও সুনন্দারই হাতে উঠেছে।

হেসে ফেলেছিল সুনন্দা।—তুমি নিশ্চয় বাবার ওপর রাগ করে এসব কাণ্ড করছ মা।

নিরুপমা হাসতে চেষ্টা করেন। — ছিঃ, রাগ করব কেন? আমার আর এসব জঞ্জাল গায়ে রাখতে ভাল লাগে না, লজ্জাও করে।

সুনন্দা আবার হাসে—বেশ কথা বললে! যদি জঞ্জালই মনে কর, তবে আমার গায়ে চাপাও কেন? আমিও কি একটা জঞ্জাল?

কেঁদে ফেলেন নিরুপমা। দু'হাতে মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরেন—ছি ছি, এমন সর্বনেশে শক্ত কথা বলিসনি নন্দু, বলতে নেই।

সুনন্দা বলে—কিন্তু তুমি আমার বিয়ের কথা নিয়ে বাবাকে ব্যস্ত করে তুলবে না মা।

কেন?

কি দরকার!

তার মানে কি? তোর বিয়ে হবে না?

হবে বইকি।

এর মানেই বা কি?

এর মানে, ভাবনা করবার কোন দরকার নেই।

সুনন্দার মুখের দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকেন নিরুপমা। কি আশ্চর্য, মেয়েও যে ঠিক বাপের মত মনের জোরের গর্ব দেখিয়ে আর একেবারে ভাবনাহীন হয়ে কথা বলছে! কিন্তু কেন?

সন্ধ্যাবেলা যখন বাড়িতে ফিরে আসেন বিজনবিহারী, আর, সুনন্দার গাল টিপে যত আবোল-তাবোল আদরের বোল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকেন, তখন ডাক দেন নিরুপমা,—শুনছ?

হ্যাঁ।

শুনে যাও।

কি ব্যাপার?

নন্দু এসব কি কথা বলছে?

কি কথা?

বলছে, বিয়ে হবে, ভাবনা করবার কোন দরকার নেই।

বলেছে নাকি?

হ্যাঁ।

তবে ঠিকই বলছে।

তার মানে?

তার মানে, মোহিত নন্দুকে বিয়ে করতে চায়।

বিজনবিহারীর স্নিগ্ধ চোখে নতুন এক সূর্যোদয়ের আভা হাসছে। আর, মুখের উপর জয়গর্বের প্রসন্নতা। যেন জানাই ছিল বিজনবিহারীর, অলক্ষ্য একটা আশীর্বাদের হাত নন্দুর মাথায় ধানদূর্বা ছড়িয়ে দেবার জন্য তৈরি হয়েই আছে। ভাবনা করবার কিছু নেই। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে মনপ্রাণ আর শরীরটাকে একমুহূর্তের জন্যও জিরোতে না দিয়ে, যত সাধ স্বপ্ন আর আশার মাটি ফেলে ফেলে শিউলিবাড়ি নামে যে মায়ার দেশ নিজের হাতে গড়ে তুলেছেন মাটিসাহেব, সে দেশের সব

আলোছায়ার কাছে মাটিসাহেব যে সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধার মেয়েকে বরণ করে ঘরে তুলে নেবার মত মানুষ আছে। এখানেই আছে। এখানে শাস্তর আর মন্তরকেও যে ডেকে এনে বিজনবিহারী তাঁর গায়ের জোরে জায়গা করে দিয়েছেন। সুনন্দার বিয়ে ঠিক হয়েছে জানতে পেলে চক্রবর্তী যে এখনই পাঁজি হাতে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসবে। সেনবাবুর মেয়েরা বোধহয় এখনই শাঁখ বাজাতে শুরু করে দেবে। সুচেত সিং এখনি একঝুড়ি ফল পাঠিয়ে দেবে। হেডমাস্টার দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী উলু দিয়ে ফেলবে, আর রামসিংহাসনের বউ গলা খুলে গান গেয়ে উঠবে—কেকর ঘর চলি সীরা, কেকর ঘর চলি! আর, থার্ড টিচার পুষ্করও বোধহয় ছুটে এসে খোঁজ নেবে, বিয়ের কাজে খাটতে চাইবে। ব্যাণ্ডপার্টি যদি আনবার দরকার হয়, তবে বলামাত্র রাঁচি চলে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে ফিরে আসবে পুষ্কর।

নিরুপমা হাসেন—বিন্ধ্যাচলী সেদিন একটা অদ্ভুত কথা বলছিল।

বিজনবিহারী—কি?

হরচন্দ রায়ের ভাগ্নে কুবের নাকি নন্দুকে বিয়ে করবার জন্য....।

না না, কখ্খনো না। কি ভেবেছে হরচন্দ রায়, বাংলাদেশে কি মানুষ নেই?

সে কথা চুকে গিয়েছে। ফুলনবাবুর বউ একদিন নন্দুকে কথাটা বলেছিল।

তারপর?

নন্দু জবাব দিয়েছে, না।

বিজনবিহারীর মুখের হাসিতে সেই জয়গর্বের প্রসন্নতা যেন আরও নিবিড় হয়ে টলমল করে। —ওরা বুঝতে খুব ভুল করেছে। আমি যে একটা খাঁটি বাঙালী, আর নন্দু যে মনেপ্রাণে একটা বাঙালীর মেয়ে, এটা বোধহয় ওরা ঠিক ধরতে পারেনি। যাই হোক...।

কি-যেন ভাবতে থাকেন বিজনবিহারী, আর চোখমুখের প্রসন্নতা আরও স্নিগ্ধ হয়ে উঠতে থাকে—আজকাল আমার কি মনে হয় জান নিরু?

কি?

আমাকে আর তোমাকে কেউ যেন ক্ষমা করে আর খুশি হয়ে নতুন একটা আশীর্বাদ পাঠিয়েছে।

কি বললে? কে পাঠিয়েছে? নিরুপমার চোখ দুটো থরথর করে কেঁপে ওঠে।

ছোড়দা পাঠিয়েছে।

নিরুপমার চোখে যেন একটা অবুঝ শূন্যতা শুধু ফ্যালফ্যাল করে। কিছুই বুঝতে পারছেন না নিরুপমা, কি বলতে চাইছেন বিজনবিহারী। শিউলিবাড়ির এই জীবনে, এই পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম ছোড়দার কথাটা বিজনবিহারীর মুখে হঠাৎ ডুকরে উঠেছে।

নিরুপমা বলে—আজ হঠাৎ ছোড়দা কেন...।

এক হাতে সাদা মাথাটা, আর এক হাতে ধবধবে ফর্সা বুকটাকে চেপে ধরে ষাট বছর বয়সের মাটিসাহেব হঠাৎ ছোট ছেলের মত চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন।—ছোড়দা আর নেই, নিরু। খবর পেলাম, কেষ্টনগরের কমলকিশোরবাবু আজ পাঁচ বছর হল মারা গেছেন।

নিরুপমা দুহাত দিয়ে চোখ মুখের উপর আঁচলটাকে শক্ত করে চেপে ধরে করুণ গুঞ্জনের মত মৃদু একটা কান্নার স্বর চেপে রাখতে চেষ্টা করেন।

আতঙ্কিত হয়ে ছুটে আসে সুনন্দা। বিজনবিহারীর গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে— কি হল

বাবা? শিগ্‌গির বল, কি হল?

বিজনবিহারী তখনই শান্ত হয়ে, আর ফুঁপিয়ে ওঠা বুকের কষ্টটাকে নিজেই হাত বুলিয়ে যেন ভুলিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকেন—কে চলে গেছে, কিছুই বুঝতে পারলি না নন্দু।

কে বাবা?

তোর জেঠু রে নন্দু।

এ কেমন জেঠু? এত বড় মায়ার এক জেঠু পৃথিবীতে কোথাও ছিল, এ সত্য তো কোনদিন শুনতে পায়নি সুনন্দা।

শুনতে পায়নি, জানতে পায়নি, কেউ বলেনি ভালই ছিল। আজও না শুনতে পেলে ভালই হত। সুনন্দাকে তা হলে আজ দু'চোখ ভরে এত করুণ একটা বিস্ময়ের বেদনা নিয়ে বিজনবিহারীর মুখের দিকে তাকাতে হত না। বিজনবিহারীকেও একটা করুণ বিস্ময় বলে মনে হত না। আজ নয়, সেই আট বছর বয়সের একটি দিনে, যেদিন চক্রবর্তী ঠাকুরের মেয়ে অঞ্জলির জন্য দেশের বাড়ি থেকে আমসত্ত্বের ছোট্ট একটা পার্সেল এসেছিল, সেদিন নিরুপমাকে প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে যে সত্য জেনেছিল সুনন্দা, সেটা হল একটা অদ্ভুত দুঃখের সত্য। দেশ থাকতেও দেশ নেই, আপনজন বলতে কেউ নেই।—না রে নন্দু, তোর বাবার বাড়িতেও কেউ নেই, মামাবাড়িতেও কেউ নেই যে তোকে আদর করে আমসত্ত্ব পাঠাবে।

সুনন্দা যেন ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করে।—আমার কেমন জেঠু, বাবা?

নিরুপমাও যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে ব্যস্তভাবে বলে ওঠেন—তোর আপন জেঠু।

কিন্তু...।

কিন্তু একটা খুব দুঃখের ঝগড়ার জন্য ভাইয়ে-ভাইয়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, তাই তোর বাবার মুখে কোনদিন জেঠুর কথা শুনতে পাসনি।

সুনন্দা চলে যায়। খাটের উপর উঠে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়েন বিজনবিহারী। হাত-পা গুটিয়ে, মাথাটাকে কেমন-যেন অলসভাবে একপাশে এলিয়ে দিয়ে পড়ে থাকেন। মাটিসাহেবের এই শক্তপোক্ত চেহারাটা কি-অদ্ভুত একটা ছেলেমানুষী চেহারা!

নিরুপমা বলেন—আঃ, এ কি রকমের শোওয়া? হাত-পা মেলে একটু টান হয়ে শোও, আমি বাতাস দিই।

চোখদুটোকে যেন ছলছলিয়ে হাসতে থাকেন বিজনবিহারী। ষাট বছর বয়সের সারা মাথাটাও অদ্ভুতভাবে দুলতে থাকে।—ইচ্ছে করছে, ছোড়দার পিঠের কাছে মুখ গুঁজে দিয়ে শুয়ে থাকি।

পাখাটা হাতে তুলে নিয়ে জোরে-জোরে বিজনবিহারীর সেই চোখের উপর বাতাস দিতে থাকেন নিরুপমা। চোখ বন্ধ করে আর নিঝুম হয়ে পড়ে থাকেন বিজনবিহারী।

কিন্তু কতক্ষণ? বড়জোর এক মিনিট। নিরুপমা জানেন, বিজনবিহারীর এই এক মিনিটের নিঝুম হয়ে পড়ে থাকা স্তব্ধতা যে ধড়ফড়িয়ে জেগে ওঠারই লক্ষণ। বিজনবিহারীর দুরন্ত আত্মাটা যেন স্বপ্নের একটা ছবিকে চকিত চোখে একবার দেখে নেবার জন্য এক মিনিটের জন্য শান্ত হয়, তারপরেই ব্যস্তভাবে কাজ খোঁজে।

কাজ হল সেই সব কাজ। শিউলিবাড়ি ক্লাবের লাইব্রেরি ঘরে বিবেকানন্দের একটা ছবি দরকার। একবার দেখে আসা দরকার, মিসরাতু আর কুলডিহার মেয়েগুলো মুড়ি ভাজতে পারল

কি না? ভুলাই ঝিলের কালবোশ কত বড় হল? স্টেশনের গাঙ্গুলীবাবু খবর দিয়েছেন, কাটোয়া থেকে একজন বাউল এসেছে, চমৎকার গান গায় আর নাচে। বললে কি রাজি হবে না কাটোয়ার বাউল, শিউলিবাড়িতেই একটা আখড়া করে থেকে যেতে?

তাছাড়া আরও একটা কাজ আছে। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসেন বিজনবিহারী। নিরুপমা বলেন—কি হল? উঠে পড়লে কেন?

এখনি একবার ঘুরে আসি।

কোথায়?

ওই ওখানে। জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান কৈলাসবাবু আজ ফুলনবাবুর বাড়িতে এসেছেন।

নিরুপমা আর কোন প্রশ্ন করে না। প্রশ্ন করে লাভ নেই। জিরোতে জানে না, থামতে জানে না, ঝিমোতে পারে না, এইরকম একটি স্বভাবের মানুষকে আর বেশি প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই।

প্রশ্ন না করলেও জানতে বেশি দেরি হয়নি নিরুপমার। মাত্র আর সাতটা দিন পরে, বাড়ি ফিরেই যেন একটা কৃতার্থ খুশির উল্লাসের মত হেসে-চেঁচিয়ে হাঁক-ডাক করতে থাকেন বিজনবিহারী। —শুনছ? তুমি কোথায় নিরু? নন্দু আছিস নাকি?

কি হল?

পুকুরটার নাম কমলসাগর হয়ে গেল।

কি বললে?

হেসে হেসে চিকচিক করে বিজনবিহারীর চোখ।—পানীয় জলের জন্য যে পুকুরটা কাটিয়েছে জেলা বোর্ড, তার ঘাট তৈরির সব খরচ আমি দিয়েছি। কাজেই কৈলাসবাবু আমার কথা রেখেছেন। আমার পছন্দমত নামটাকেই মেনে নিয়েছেন। তুই বুঝলি কিছু নন্দু?

বুঝেছি।

কি বুঝেছিস? কমলসাগরের কমল মানে কি? পদ্মফুল?

সুনন্দা হাসে—না, মানে হল জেঠুর নাম।

সতর

কমলসাগরের নতুন ঘাটের কাছে ছোট্ট একটি ল্যাম্পপোস্টের মাথায় টিমটিম করে কেরোসিনের বাতি জ্বলে। তার পাশেই দুটো কল্‌কে ফুলের গাছ। গাছের ছায়ার উপর লুটিয়ে পড়ে আছে বাসী ফুল। আর গাছের সেই ছায়ার কাছে আরও দুটো ছায়া। যাদের ছায়া, তাদের চোখে আকাশ ছাপিয়ে উথলে পড়া পূর্ণচাঁদের আলোর মত খুশির আলো ঝলমল করে। মোহিত আর সুনন্দা।

একটা বাসী কল্‌কে ফুলকে জুতো দিয়ে চেপে আর চটকে দিয়ে মোহিত বলে—এগুলোই বোধহয় হলদে করবী।

সুনন্দা বলে—হবে। আমি তো এগুলোকে কাণ্ডিল ফুল বলে জানতাম।

মোহিত হাসে—এখন নতুন করে জানলে তো?

হ্যাঁ।

কি?

তুমি যা জানিয়ে দিলে।

কি জানালাম?

হেসে ওঠে সুনন্দা—হলদে করবী।

মোহিতও খুশি হয়ে বলে—সত্যিই শিউলিবাড়ির অশিক্ষার মধ্যে থেকে তোমার ভাষাও যেন কেমনতর হয়ে গিয়েছিল।

সুনন্দার চোখে যেন বিচিত্র এক কৃতজ্ঞতার হর্ষ চমকে ওঠে। —তুমিই তো শুধরে দিয়েছ।

মোহিতের অভিযোগের কথা আর সুনন্দার কৃতজ্ঞতার কথা, দুইই বর্ণে বর্ণে সত্য। মোহিত যদি শিউলিবাড়িতে না আসত, আর মাটিসাহেবের এই মেয়েকে এত ভালবেসে না ফেলত, তবে সুনন্দা আজ এই কমলসাগরের ঘাটের এই হলদে করবীর কাছে দাঁড়িয়ে মোহিতের কানের কাছে এমন ভাষায় কখনই কথা বলে দিতে পারত না,—আমি তো একটা মরচে-পড়া লোহা হয়ে এখানে পড়েছিলাম, মোহিত; তুমি পরশমণির মত ছুঁয়ে দিয়ে আমাকে সোনা করে দিয়েছ। আমার প্রাণটা যে তোমার কাছে চিরকালের ঋণী হয়ে গেছে।

শিউলিবাড়িতে এসেছে মোহিত, যদিও চিরকাল শিউলিবাড়িতে থাকবার জন্যে আসেনি। তবু এই সত্য আবিষ্কার করেছে মোহিত, চিরকালের আপন করে নেবার মত একটা রূপের ছবি যেন এই শিউলিবাড়িতে আছে। বছরের পর বছর তো শুধু অদ্ভুত একটা ব্যাকুলতার নিঃশ্বাস চেপে আর দূর থেকে সুনন্দার মুখের দিকে তাকিয়েছে মোহিত। তারপর একটা বছর ধরে শুধু চিঠি লিখে যেন একটা স্বপ্নের কাছে আবেদন করেছে।—আমার ভালবাসাকে অপমান কর না সুনন্দা; যা হোক কিছু একটা উত্তর দিও।

শেষে উত্তর দিয়েছিল সুনন্দা—আপনি দয়া করে আমাকে আর চিঠি লিখবেন না। আমার বড় ভয় করে।

সুনন্দার সেই ভয়ের চিঠিই যেন ভালবাসার পথের ভয়টাকে দূরে সরিয়ে দিল। ক্লাবের সেক্রেটারি মোহিত ঘোষ প্রেসিডেন্টের বাড়িতে এসে, প্রেসিডেন্টের মেয়ের হাতে একগাদা বই তুলে দিয়ে চলে গেল। সেদিন বুকের সব নিঃশ্বাসের ভার মৃদু করে দিয়ে সুনন্দার মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে একটা কথাও বলে দিতে পেরেছিল মোহিত—আমাকে ভয় করবার কোন মানে হয় না সুনন্দা।

ঝুমরা কলোনিতে একটি বাংলো বাড়ি ভাড়া নিয়ে একাই থাকে মোহিত ঘোষ। ক্লাবটার উন্নতির জন্য অনেক চিন্তা করেছে এবং আজও করে। মোহিতের মন যেমন রুচিও তেমন, আর জীবনের ভঙ্গিটাও তেমনই পরিচ্ছন্ন। ক্লাবের জন্য যেটুকু কাজ করে, সেটাও একটা পরিচ্ছন্ন কাজ। মাঝে মাঝে সভা-সম্মেলন ডাকে মোহিত। সভায় একমাত্র বক্তাও মোহিত। সেনবাবু আর গাঙ্গুলীবাবু আসেন। চক্রবর্তী আসেন। হেডমাস্টার দীনবন্ধু আর অন্য সব টিচারেরাও আসেন। আসে থার্ড টিচার পুষ্কর দত্ত। ফুলনবাবুও মাঝে মাঝে আসেন। এমনকি রামসিংহাসনও কয়েকবার এসেছে।

আমাদের এই শিউলিবাড়ির সবই ভাল। সবই আছে এখানে। অভাব শুধু একটি; —শিক্ষার অভাব!

মোহিতের বক্তৃতা শুনে ফুলনবাবু মাথা নেড়ে সায় দেন।—ঠিক কথা।

গাঙ্গুলীবাবু বলেন—খুব ঠিক কথা।

সমস্যা এই যে, শিউলিবাড়ির মন এখনও এক যুগ পিছনে পড়ে আছে। আজকের দিনের চিন্তা ইচ্ছা রুচির কোন খবর রাখে না শিউলিবাড়ি।

একথাটাও বর্ণে বর্ণে সত্য। সভা শেষ হলে দীনবন্ধুবাবু আর সেনবাবু আলোচনা করেন, শিউলিবাড়ি যদি পিছিয়েই না থাকবে, তবে এখানে ওই এক মোহিতের মত একটি ছেলে ছাড়া দ্বিতীয় এমন একটি ছেলেকে দেখতে পাওয়া যাবে না কেন, যে-ছেলের বিদ্যাবুদ্ধি আর চরিত্র দেখে গর্ব করতে পারে আর অনেক কিছু শিখতে পারে শিউলিবাড়ি?

চক্রবর্তী একটু চাপা-গলায় ফিসফিস করে গাঙ্গুলীবাবুর কাছে কি-যেন বললেন। গাঙ্গুলীবাবু হেসে ফেলেন—সেটা আমারও মনে হয়েছিল। কিন্তু একটা সমস্যা কি জানেন, পুষ্কর তো ঠিক এরকম শিক্ষিত ছেলে নয়; অন্য যতই গুণ থাকুক না কেন, শিউলিবাড়ির বাঙালীদের মান বাড়াবে, এমন যোগ্যতা পুষ্করের কাছ থেকে আশা করা যায় না।

গাঙ্গুলীবাবু নিজের চোখে দেখেছেন, মোহিতের ঘরে একটি আলমারি ভর্তি কিরকমের আর কত রকমের বই আছে। —দেখে আশ্চর্য হয়েছি দীনবন্ধুবাবু, এই বয়সের ছেলে যে এত বিদ্যে ভালবাসে এমনটি আমি আর কোথাও দেখিনি মশাই। হ্যাঁ, দেখেছিলাম বটে, আমাদের রামপুরহাটের চাটুজ্জেমশাইকে। ঘরভর্তি বইয়ের মধ্যে ডুবে রয়েছেন। কিন্তু তিনিছিলেন পেনসনী প্রফেসর, মোহিতের মত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের একটা মানুষ তো নয়।

মোহিত বোধহয় এম-এ।

হ্যাঁ।

চাকরিটাও তো বেশ ভাল মাইনের চাকরি।

না, ঠিক চাকরি নয়। হিসেব অডিট করার কন্ট্রাক্ট নিয়ে কাজ করে মোহিত। ধরুন, শুধু এক সিলুয়াডি কোলিয়ারীর হিসেব অডিট করে বছরে দেড় হাজার টাকা পায়। তাছাড়া দুধিয়া সিমেন্ট আছে, সিংহানী কোলিয়ারি আছে। সবারই কিছু না কিছু কাজ করে দেয় মোহিত। সব নিয়ে বেশ ভাল আয় হয়।

বাঃ, চমৎকার ভাগ্যবান ছেলে।

কৃতী ছেলে।

কিন্তু...।

কি?

একা-একা ওভাবে পড়ে আছ কেন? বাপ-মা নেই?

তা জানি না।

কথা হল, মাটিসাহেবের মেয়ে সুনন্দার সঙ্গে সত্যিই কি...।

তাও জানি না মশাই।

কিন্তু না জানবার আর কি যুক্তি আছে? কে না দেখেছে, সুনন্দা আর মোহিত কমলসাগরের আশে পাশে ঘুরে বেড়ায় আর গল্প করে? কে না দেখেছে, মাটিসাহেবের বাড়ির বারান্দায় চেয়ারের উপর বসে আছে মোহিত, আর সুনন্দা ভিতর থেকে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বের হয়ে এসে মোহিতের কাছে দাঁড়িয়েছে?

শ্রাবণ শেষ হয়ে ভাদ্রের রোদ আর গুমোট যখন দেখা দিল, আর সারা শিউলিবাড়ির ঘরে

ঘরে একটা জ্বরের উৎপাতও দুরন্ত হয়ে উঠল, তখন ঝুমরা কলোনির প্রণববাবুর স্ত্রীও একদিন নিজের চোখে দেখতে পেলেন, মাটিসাহেবের মেয়ে একাই হেঁটে হেঁটে সেই বাংলোর ভিতরে গিয়ে ঢুকল, যেটা হল মোহিত অডিটারের বাংলো, যেটার বাইরের ঘরটা হল অফিসঘর, আর ভেতরের ঘরটা...কে জানে কি দেখেছেন বিরাজ মাসিমা...যে জন্যে ঘরটাকে একেবারে বাসরঘরের মত একটা সাজানো ঘর বলে তাঁর চোখে ঠেকেছে।

বিরাজ মাসিমার কাছ থেকেই জানতে পেলেন প্রণববাবুর স্ত্রী, মোহিতের জ্বর হয়েছে তাই মাটিসাহেবের মেয়ে সুনন্দা বারবার মোহিতকে দেখতে আসছে।

কেন?

কি করে বলব বল? সুনন্দার হাতে অবশ্য মস্ত বড় একটা কাচের বাটি দেখলাম। বোধহয় সাগু, কিংবা পথ্যি-টথ্যি পৌঁছে দিল।

কিন্তু এরকম সেবা-টেবার একটা মানে আছে তো?

আছে বইকি। থাকলেই ভাল। বিরাজ মাসিমা তাঁর নাতিকে কোলে তুলে নিয়ে আবার ব্যস্তভাবে চলে যান।

কিন্তু ভাদ্রের গুমোট ভেঙে দিয়ে আশ্বিনের আকাশ যখন হেসে উঠেছে, শিউলিবাড়ির কোন ঘরে যখন জ্বর-জ্বালা নেই, আর মোহিত অডিটারকেও যখন দেখা যায় ব্যাডমিন্টনের ব্যাট হাতে নিয়ে ক্লাবের দিক থেকে ব্যস্তভাবে হেঁটে নিজের বাংলোতে চলে যাচ্ছে, তখন তো কারও বাড়িতে সাগু বা পথ্যি-টথ্যি পৌঁছে দেবার দরকার নেই। তবে কেন মাটিসাহেবের মেয়ে সুনন্দাকে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক মোহিতের বাংলোর দিকে যাবার রাস্তাটি ধরে একমনে হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে।

বিরাজ মাসিমা বলেন—সবই বুঝতে পারা যাচ্ছে।

প্রণববাবুর স্ত্রী বলেন—আমি তো সব বুঝেছি, কিন্তু বিয়েটা কবে?

বিরাজ মাসিমা—সে-সব কথা তো এখনও কিছুই শুনতে পাইনি।

মাটিসাহেবের মেয়ের সঙ্গে অনেকবার কথা বলেছেন প্রণবাবুর স্ত্রী, কথা বলেছেন বিরাজ মাসিমা, কিন্তু দুজনেই দেখে একটু আশ্চর্য হয়েছেন, কি-ভয়ানক ভীরু আর লাজুক এই মেয়ে, যার বয়স তো অন্তত কুড়ি-পঁচিশ হবে। যে কাণ্ডটাকে চোখের উপর দেখছেন, সে কাণ্ডটাকে দেখতে একটুও ভাল লাগে না, পছন্দ করেন না, কিন্তু মেয়েটাকে ভাল লাগে। বিরাজ মাসিমা নিজেও বলেছেন, কি আশ্চর্য, মেয়েটার ওপর আমার কিন্তু একটুও রাগ হয় না।

আজও আবার দুজনেই দেখতে পেয়েছেন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে কখন, তবু মাটিসাহেবের মেয়ে এতক্ষণ ওখানেই ছিল নিশ্চয়, তা না হলে ওদিক থেকে আসবে কেন?

প্রণববাবুর স্ত্রী হেসে-হেসে জিজ্ঞেস করেন—লাহাবাবুদের বাড়িতে ঠাকুরের আরতি দেখতে গিয়েছিল নিশ্চয়। দেখে কেমন লাগল সুনন্দা?

চমকে ওঠে সুনন্দা—আজ্ঞে না, আমি তো ঠাকুরের আরতি দেখতে যাইনি।

বিরাজ মাসিমা বলেন—না না, সুনন্দা গিয়েছিল নিশিবাবুর ছেলের বউ মালতীর সঙ্গে গল্প করতে।

না, মালতীকে আমি তো চিনি না।

প্রণববাবুর স্ত্রী—তবে কোথায় গিয়েছিলে?

মোহিতবাবুর বাড়িতে।

বিরাজ মাসিমা—মোহিতের মা এসেছেন বুঝি?

না। বলতে গিয়ে সুনন্দার মাথাটা যেন হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়তে চায়। দু'চোখে একটা ভীরু লজ্জার ভার টলমল করে, আর সারা মুখ লালচে হয়ে ওঠে।

প্রণববাবুর স্ত্রী যেন খুশি হয়ে হাসেন—তা বেশ। কিন্তু তুমি এত লজ্জা পাচ্ছ কেন?

বিরাজ মাসিমা—ভালই তো।

প্রণববাবুর স্ত্রী আবার হাসেন—বিয়েটা কবে হবে, তাই বল! ওঁর ছুটি ফুরিয়ে যাবার আগেই যদি বিয়েটা হয়, তবে তোমার বিয়েতে উলু দিয়ে তারপর কলকাতা ফিরব।

উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সুনন্দা।

বিরাজ মাসিমা বলেন—আঃ, মেয়েটাকে আর লজ্জা দিও না হারুর মা, দিন ঠিক হলে জানাতেই পারা যাবে। মাটিসাহেবের মেয়ের বিয়েতে কি শিউলিবাড়ির কারও নেমন্তন্ন বাদ যাবে?

আঠার

ঝুমরা কলোনির প্রণববাবুর স্ত্রী আর বিরাজ মাসিমার জিজ্ঞাসার কাছে আজ আর নিজেকে সামলে রাখতে পারেনি সুনন্দা। লাজুক মুখটাকে লুকোতে গিয়ে মাথাটা ঝুঁকে গিয়েছিল। মাথা পেতে যে ভাগ্যটাকে বরণ করে নিতে হবে, যেন তারই একটা শুভ সঙ্কেত জানিয়ে দিতে পেরেছে সুনন্দা, যদিও একটিও কথা বলতে হয়নি। লোকের চোখের কাছে সুনন্দার এই প্রথম স্বীকৃতি। প্রণবাবুর স্ত্রী আর বিরাজ মাসিমার ধারণার উল্লাসটাকেও মাথা পেতে বরণ করে নিয়েছে সুনন্দা।

আশ্বিনের আকাশে অনেক তারা হাসছে। ঝুমরা কলোনির বাতাসে হাসনুহানার গন্ধ মাঝে মাঝে উতলা হয়ে উঠছে। দস্তিদার সাহেবের বাড়ির ফটকের আলোর কাছে মাধবীলতার ফুলগুলি যেন ফুটন্ত লালমাণিকের থোকা হয়ে দুলছে। কাঁকরের রাস্তাটা ফুরিয়ে যায়, তবু মনে হয় সুনন্দার, ঝুমরা কলোনির হাসনুহানার গন্ধ যেন এখনও নিঃশ্বাসের বাতাসে ছুটোছুটি করছে।

মোহিতের ভালবাসার কাছে মাথা পেতে দিতে হয়েছে। যেমন আজ, তেমনি সেদিনও, সেই প্রথম, সাগুর বাটি হাতে নিয়ে মোহিতের বিছানার কাছে যেদিন দাঁড়িয়েছিল সুনন্দা। তিন দিনের জ্বরে কি ভয়ানক ঘোলা হয়ে গিয়েছিল মোহিতের সেই কালো-কালো বড়-বড় চোখ। কিন্তু মোহিতের সেই জ্বরের চোখে কি অদ্ভুত পিপাসা ছটফট করে উঠেছিল। কত শক্ত করে হাতটা চেপে ধরল মোহিত, আর অবুঝের মত কত কথাই না বলল। সত্যি, ভালবাসা একটা অবুঝ পিপাসাই বটে, হাসনুহানার পাগল গন্ধের চেয়েও উতলা। তা না হলে সাগুর বাটির দিকে না তাকিয়ে সুনন্দার সেই ভীরু মুখের উপর সব পিপাসা ঢেলে দেবে কেন মোহিত? আর সুনন্দাই বা কেন হাত ছাড়িয়ে নিতে পারবে না?

সুনন্দাকে সরে যেতে দেয়নি মোহিত, সুনন্দাও সরে যায়নি। ভয়ে বুক কেঁপে উঠেছিল সুনন্দার। মনে হয়েছিল একটা সর্বনাশের উৎসব যেন সুনন্দার প্রাণটাকে মোহিতের বিছানার উপর লুটিয়ে দিয়ে স্তব্ধ করে রেখেছে।

কিন্তু মোহিত যখন হেসে-হেসে নিজেরই হাতে সুনন্দার চোখের জল মুছে দিল, তখন সুনন্দার

ভিজে চোখও হেসে উঠেছিল। মোহিতের মুখটা যে সান্ত্বনাময় একটা অঙ্গীকারের ফুল; মাধবীলতার ফুলের চেয়েও রঙিন হয়ে আর লালমানিকের আভা ছড়িয়ে হাসছে। —আমাকে ভয় করলে কিংবা লজ্জা করলে যে আমার ভালবাসাকে অপমান করা হয়, সুনন্দা।

ঠিকই, সুনন্দার মনের অবুঝ ভয় আর শরীরের অবুঝ লজ্জাটা বুঝতে পেরেছে, নিশ্চিন্ত হয়েছে। যার ঘরে চিরকালের ঠাঁই নিতে হবে, তার ঘরে এসে প্রাণটা যদি একটু অসাবধান হয়ে যায়, তবে যাক না; ক্ষতি কি?

স্টেশন রোডের আলোগুলিও যেন আজ বড় বেশি ঝলমল করছে। এগিয়ে যেতে থাকে সুনন্দা। কিন্তু এ কি? কি সুন্দর সুরের একটা বাংলা গানের ভাষা বাতাসে ভেসে আসছে। আশ্বিনের আকাশটাও কি আজ গান গাইতে শুরু করেছে? কে গাইছে? কলের গান বোধহয়।

মোড় ঘুরে স্টেশন রোড ছেড়ে দিয়ে ধর্মশালা যাবার ছোট রাস্তাটার দিকে এগিয়ে যেত সুনন্দা, কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হল। মোড়ের উপরে সড়কের পাশের একটি ঘরে ফুল আলো আমপাতা আর চাঁদমালায় সাজানো একটা উৎসব যেন গান গাইছে। ছোট্ট একটা দোকানঘর। কিসের দোকান?

গ্রামোফোন আর রেকর্ডের একটি দোকান। দুটো আলমারি আর একটি টেবিল। চারটি চেয়ার, এক গুচ্ছ ধূপকাঠিও পুড়ে পুড়ে সুগন্ধের ধোঁয়া ছড়াচ্ছে। টেবিলের উপর একটা ঝকঝকে গ্রামোফোন গলা খুলে গান গাইছে।

আসুন না।

অদ্ভুত স্বরের একটা আহ্বানের ভাষা যেন হঠাৎ বেজে উঠছে। চমকে ওঠে সুনন্দা।

সুনন্দার একেবারে চোখের কাছে দাঁড়িয়ে হেসে-হেসে কথা বলছে রমাসুন্দরী বেঙ্গলী মাইনর স্কুলের থার্ড টিচার পুষ্কর দত্ত। —আজ দোকান প্রতিষ্ঠা হল। এই তো কিছুক্ষণ আগে পুজো শেষ করে চক্রবর্তী ঠাকুর চলে গেলেন।

সুনন্দাও হাসতে চেষ্টা করে—গানের রেকর্ডের দোকান বোধহয়।

পুষ্কর—হ্যাঁ। বাংলা, হিন্দী, এমন কি ইংরেজি রেকর্ডও আছে। তিনটে রেকর্ড কোম্পানীর এজেন্সি পেয়েছি। সিলুয়াডির সাহেবরা আজই প্রায় তিনশো টাকার রেকর্ডের অর্ডার দিয়েছেন।

আপনি কি তবে স্কুলের কাজ ছেড়ে দিয়ে....।

না না, স্কুলের কাজ তো আছেই। আমার দুটি ভাই আছে, ওরা সকাল-বিকেল দোকান দেখবে, আমি শুধু সন্ধ্যেবেলা এসে ওদের ছুটি দেব। দেখা যাক্, কি হয়?

আচ্ছা, আমি চলি।

দোকানটা একটু দেখবেন না?

না।

ব্যস্তভাবে চলে যায় সুনন্দা। কিন্তু রাস্তাটা কি বিশ্রী অন্ধকারে ভরে রয়েছে! পুষ্করের দোকানের আলোর দিকে এতক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকাই ভুল হয়েছে। তা না হলে চোখ দুটো এত ধাঁধিয়ে যেত না, আর চোখের সামনে এই রাস্তাটাকে এত অন্ধকারে ঢাকা একটা শূন্যতা বলেও মনে হত না।

বাড়ি ফিরে গিয়ে অনেকক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে থেকে, তারপর আনমনার মত ঘরের ভিতরে অনেকক্ষণ ঘুরে ফিরে, যখন জানলাটার কাছে এগিয়ে এসে, আর অদ্ভুত একটা ক্লান্তির আবেশে অলস হয়ে যাওয়া হাতদুটোকে কোনমতে তুলে নিয়ে খোঁপা খুলতে থাকে সুনন্দা, তখন বাইরের

বারান্দাতে একটা চকিত উল্লাসের শব্দ হো-হো করে হেসে ওঠে। যেন একটা খুশির আবেশে গলে গিয়ে হাসছেন আর কথা বলছেন বিজনবিহারী। সুনন্দার আনমনা চোখের দৃষ্টিতে দুঃসহ আর বিশ্রী একটা সন্দেহও চমকে ওঠে। পুষ্কর দত্ত এসেছে বোধহয়।

যে এসেছিল সে এইবার চলে গেল বোধহয়। তাই ঘরের ভিতরে ঢুকলেন বিজনবিহারী, আর সুনন্দার দিকে তাকিয়ে যেন বুকভরা একটা খুশির হাসি উথলে দিলেন—পুষ্কর আমাকে উপহার দিয়ে গেল নন্দ। রামপ্রসাদী গানের পাঁচটা রেকর্ড।

রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে থাকেন বিজনবিহারী—ওঃ, পুষ্কর আমার খুব উপকার করল। এতদিন ধরে রাগ করে শুধু ইংরেজী গানের যত হালালালা শুনেছি, কান পচে গিয়েছে।

তখনি গ্রামোফোনটার কাছে বসে রামপ্রসাদী গানের রেকর্ড বাজাতে শুরু করেন বিজনবিহারী। —আঃ, বলিহারী, কী মিষ্টি গান! এইবার পেট ভরে বাংলা গান শোনা যাবে।

রামপ্রসাদী গান কখন থেমেছে, বোধহয় বুঝতে পারেনি সুনন্দা। কতক্ষণ ধরে চুপ করে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আশ্বিনের আকাশের তারা দেখেছে, তাও জানে না। একগাদা জোনাকি যখন সুনন্দার গায়ের উপর পড়ে হুটোপুটি শুরু করে, তখন সেই আনমনা আবেশ হঠাৎ চমকে উঠে ভেঙে যায়। বুঝতে পারে সুনন্দা, বাবা খেতে বসেছেন, আর মার সঙ্গে গল্প করছেন।

শুনতে একটুও ভাল লাগে না যে গল্প, সেই গল্পই শুরু করেছেন বাবা। পুষ্কর দত্তের যত কীর্তির আর বাহাদুরীর গল্প।—বেশ জেদ আছে ছেলেটার, চেষ্টাও আছে, তেমনি খাটতেও পারে। এ ছেলে একদিন উন্নতি করবে।

জোরে একটা ঢেঁকুর তুলেছেন বিজনবিহারী। বুঝতে পারে সুনন্দা, বাবার খাওয়া শেষ হল। কিন্তু, কি আশ্চর্য, গল্প শেষ করছেন না বাবা।

বিজনবিহারী বলেন—গত বছর কালীপুজোর সময় চমৎকার একটা কাণ্ড করে বসেছিল পুষ্কর। কোন মুণ্ডা গাঁয়ের একটাও মানুষ যেন কালীপুজো দেখতে না আসে, সে জন্যে মিশনের ছোট ফাদার ভয়ানক জবর একটা চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পুষ্কর নিজে গিয়ে গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে পাঁচশ মুণ্ডা ছেলে-মেয়ের একটা মিছিল নিয়ে এসে কালীবাড়ির আঙিনায় হাজির করেছিল। পুষ্করের উপর মারধোরেরও একটা চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ঘাবড়ায়নি পুষ্কর।

এই পুষ্করী রামায়ণে এখন থামলে হয়। সুনন্দার চোখে একটা অস্বস্তির ভ্রূকুটি ছটফটিয়ে ওঠে। বারান্দায় গিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করে, তাহলে এই গল্পের কোন শব্দ আর কানের কাছে পৌঁছতে পারবে না।

কি আশ্চর্য, মা'ও যে হেসে হেসে একটা অদ্ভুত কথা বলছেন—পুষ্করের স্বভাবটা দেখছি প্রায় তোমারই মত।

আর শুনতে ইচ্ছে করে না। নিরুপমার মৃদু হাসির শব্দটাও যেন মাইনর স্কুলের থার্ড টিচারের প্রশস্তির গুঞ্জন। বাবা আর মা দুজনের কেউই একটু বুঝে দেখছেন না যে, আজ এভাবে পুষ্কর দত্তের নামে এত গৌরবের কথা বললে যে ওদিকের একটা মানুষকে অপমান করা হয়। ভয় করে সুনন্দার, বারান্দায় গিয়ে বসে থাকলেও কোন লাভ হবে না। হয়ত শিউলিগুলোও পুষ্করের নামে জয়ধ্বনি করে সুনন্দার অস্বস্তির জ্বালাটাকে আরও দুঃসহ করে দেবে।

উনিশ

কমলসাগরের নতুন ঘাটের কাছে হলদে করবীর ছায়ার পাশে দাঁড়িয়ে মোহিতের সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে যেন একটা অস্বস্তির হাত এসে সুনন্দার মুখ চেপে ধরে আর ভাষা ভুল করিয়ে দেয়। না, এখানে আর নয়। জল নেবার জন্য যেখানে মানুষের ভিড়ের আনাগোনা লেগেই আছে, সেখানে ভালবাসার মন মুখ খুলে কথা বলতে বাধা পায়, বলতে পারে না।

কিন্তু আশ্চর্য, এই দু'মাসের মধ্যে কতবার কমলসাগরের ঘাটের এই হলদে করবীর কাছে দাঁড়িয়ে মোহিতের সঙ্গে গল্প করেছে সুনন্দা, কিন্তু কই, এরকম একটা অস্বস্তির কাঁটা তো সুনন্দার মনে বেঁধেনি? ভাবতে একটা রহস্য বলেই মনে হয়। কিসের অস্বস্তি কোথা থেকে আসছে?

ঘাটের পথে যারা আনাগোনা করে, তারাও কি কিছু জানে না? আর দেখেও কি কিছু বুঝতে পারে না? হতেই পারে না। আজ শিউলিবাড়ির কে না জানে, যে, মাটিসাহেবের মেয়ের সঙ্গে মোহিত অডিটারের ভাব হয়েছে? খবরটা যে শিউলিবাড়ির সব আলোছায়াকে খুশির হাসিতে মুখর করে দেবার মত খবর। কিন্তু শিউলিবাড়ি যেন প্রচণ্ড একটা ধৈর্য ধরে খুশির হাসি চেপে রেখেছে। ঘাটের পথের লোকজন শুধু একবার তাকিয়ে দেখে আর চলে যায়। হলদে করবীর ছায়ার কাছে যেন কোন ঘটনাই নেই। খবরটা শুনে যার আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাবার কথা, সেই চাচিজী বিন্ধ্যাচলীও তো খবরটা জেনেছে। কিন্তু কই, চাচিজী তো একদিনও হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল না। নন্দুয়া বেটির গলা জড়িয়ে ধরে গান গেয়ে উঠল না। সন্দেহ হয়, মাটিসাহেবের মেয়ের সৌভাগ্যের খবর শুনে খুশি না হয়ে, বরং যেন একটা হিংসের জ্বালা চাপা দেবার জন্য গম্ভীর হয়ে রয়েছে শিউলিবাড়ি।

সুনন্দা হাসে—চল, এখানে আর ভালো লাগে না।

কেন?

মনে হচ্ছে আমাদের দু'জনকে দেখতে ওদেরও ভাল লাগছে না।

মোহিতও হাসে—তাতে আমাদের কোন্ স্বর্গের বাতি নিবে যাবে?

তা তো বটে, কিন্তু বুঝতে পারছি না।

কি?

আমাকে কেউ হিংসে করছে, না তোমার ওপর কেউ রাগ করছে?

তোমাকে হিংসে করবার একটা মানে হয়, কিন্তু আমার ওপর রাগ করবার তো কোন মানে হয় না।

কেন?

আমি কি তোমাদের শিউলিবাড়ির কারও চেয়ে ছোট?

ছিঃ, তুমি আবার কেন রাগ করে কথা বলছ? কে না জানে যে, বাবা তো নিজের মুখে তিনবার বলেছেন, তুমি হলে শিউলিবাড়ির গর্ব।

আমার কি মনে হয় জান? সবাই একটু বেশি আশ্চর্য হয়েছে; যাকে বলে, একটু হতভম্ব হয়ে গেছে।

তাই তো মনে হয়।

মোহিতের চোখ জ্বলজ্বল করে হাসে-- কিন্তু তুমি কি বল, সেটা তো জানতে পেলাম না।

সুনন্দার চোখদুটো যেন একটা কৃতজ্ঞ মায়ার ভার সামলাতে না পেরে ছলছল করে।—আমাকে আর কেন মিছে জিজ্ঞাসা করছ? কলকাতার মেয়ের মত লেখাপড়া জানলে হয়ত বলে দিতে পারতাম; কিন্তু বলতে জানি না বলেই পারছি না। তুমিও জান না, আমাকে ভালবেসে তুমি আমাকে কত বড় মান দিয়েছো!

হেঁটে হেঁটে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে সুনন্দা আর মোহিত। এখান থেকে কমলসাগরের ঘাটের কাছের হলদে করবীটা দেখা যায় না, স্টেশন রোডের কোন দোকানের কলরবও শোনা যায় না দু'পাশে শাল সেগুন আর দেওদারের বীথিকা, মাঝখানে ছায়াভরা রাঁচি রোড এঁকেবেঁকে পাহাড়ের গায়ে-গায়ে ঘুরে ফিরে উধাও হয়ে গিয়েছে। যেন নিরিবিলি জগতের একটা ছায়াপথ পড়ে আছে এখানে। ভালবাসার দুটো হাত যদি এখানে, এই বিকেলের আলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে কাউকে বুকে জড়িয়ে ধরে, তবু উঁকি দিয়ে দেখবার মতও কোন বাধা এখানে নেই। সুনন্দাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মোহিত।

সুনন্দা হাসে—তবু কিন্তু বুঝতে পারছি না, তুমি কেমন করে আমাকে এত ভালবাসতে পারলে?

এক কথায় বলে দিতে পারি।

বল!

তুমি শিউলিবাড়ির সেরা মেয়ে।

শিউলিবাড়ির সেরা মেয়ে আমি নই, কিন্তু তোমার তাই মনে হয়েছে।

হ্যাঁ। একই কথা হল। এবার তুমি বল তো, শুনি।

কি?

আমাকে তুমি ভালবাসলে কেন?

এক কথায় বলে দিতে পারি।

বল!

আমারও মনে হয়েছে।

কি মনে হয়েছে?

সুনন্দার চোখ-মুখ ছাপিয়ে যেন একটা সুস্মিত অনুভবের আনন্দ উতলা হয়ে ঝরে পড়তে থাকে।—তুমি বাংলাদেশের সেরা ছেলে।

কুড়ি

ভাবতে পারেনি সুনন্দা, সেই অস্বস্তিটা শুধু একবার এসে আর রামপ্রসাদী গানের পাঁচটা রেকর্ড বাবাকে উপহার দিয়েই ক্ষান্ত হয়ে যাবে, আর কখনও আসবে না। বরং দুটো দিন ধরে সন্দেহময় একটা আতঙ্কে ভুগতে হয়েছিল। রামপ্রসাদী গানের রেকর্ড একটা চমৎকার ছুতো। সেই ছুতো ধরে এবার থেকে হয়ত রোজই আসবে পুষ্কর দত্ত। হয়তো শিউলির ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে। হয়তো মাটিসাহেবের মেয়ের মুখ দেখবার জন্য পিপাসিতের মত জানালাটার দিকে তাকিয়ে থাকবে।

কিন্তু আসেনি পুষ্কর। সুনন্দার উদ্বিগ্ন মনটা যেন একটা হাঁপ ছেড়ে হাল্কা হয়ে গিয়েছে। আতঙ্কের

কথাটা মনে পড়তেই মনটা যেন একটা লজ্জাও পেয়েছে। আকাশে মেঘ নেই, তবু বজ্রপাতের ভয়ে ভীরু হয়ে গিয়েছিল সুনন্দার প্রাণ। এতবড় অস্বস্তিটা যে একটা চমৎকার ঠাট্টা।

কিন্তু, কি আশ্চর্য, স্বস্তিটাও যেন একটা চমৎকার শূন্যতা। চমকে ওঠে সুনন্দা। ভাবনাটার বেহায়াপনা দেখে নিজেরই উপর রাগ করে ছটফটিয়ে ওঠে সুনন্দার একটা নিঃশ্বাসের বাতাস। কুৎসিত ভাবনাটা যেন মোহিতের ভালবাসাকে লুকিয়ে লুকিয়ে ঠকাচ্ছে। চোর যেমন লুকিয়ে লুকিয়ে হাত বাড়িয়ে ঘুমন্ত মানুষের মাথার কাছ থেকে সিন্দুকের চাবি নিয়ে সরে যায়।

মা শুনছ? হঠাৎ চেঁচিয়ে ডাক দিতে গিয়েই গলার স্বরের আক্রোশটাকে সামলে নিয়ে, একটা লজ্জাতুর ব্যাকুলতার গুঞ্জনের মত মৃদুস্বরে ডাক দেয় সুনন্দা।

নিরুপমা সাড়া দেন—কি হল?

কই, তোমরা যে কিছু বলছ না।

কি?

মোহিতবাবুকে কি তোমরা কেউ কিছু বলবে না?

নিরুপমা হাসেন; সুনন্দার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন—নিশ্চয় বলা হবে। তোর বাবারও ইচ্ছে, বিয়েটা এই অঘ্রাণে চুকে যাক।

বাইরের বারান্দাতে একটা চেয়ার যেন ব্যস্তভাবে শব্দ করে ছটফটিয়ে উঠল।

তারপরেই চেঁচিয়ে ওঠে একটা উচ্ছল খুশির কণ্ঠস্বর।—হ্যাঁ, অঘ্রাণ মাসই সবচেয়ে ভাল মাস, নিরু। নলেন গুড় না পাওয়া যাক, খেজুরের নতুন রস তো পাওয়া যাবে। কোন অসুবিধে হবে না।

হেসে হেসে চলে যাচ্ছিলেন নিরুপমা। সুনন্দা বাধা দেয়—তুমি আজ আবার রান্না ঘরে ঢুকছ কেন? তোমার না কাশি বেড়েছে?

তাতে কি হয়েছে?

না, তুমি চুপটি করে বসে থাক।

তুই রাঁধবি?

হ্যাঁ।

না। আজ বাদে কাল মেয়ের বিয়ে, মেয়ে আমার হাঁড়ি ঠেলতে চাইছেন। তা হবে না।

চেঁচিয়ে উঠলেন বিজনবিহারী—কখ্খনো না, নিরু। নন্দুকে এখন আর ওসব পাগলামি করতে দিয়ো না। উনুনের আঁচ ভয়ানক বিশ্রী জিনিস, মুখের রঙ একেবারে কালচে করে দেয়।

বাইরের বারান্দাতে যেন একটা কলরবের ঝড় উঠে এসে দাঁড়িয়েছে। একগাদা ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ের কলরব। কলরবের ভাষাটা যেন একটা অভিযোগের ভাষা। কিংবা একগাদা অভিমানের কাকলী।

চমকে ওঠে সুনন্দা। কলরবের মধ্যে সেই দুঃসহ অস্বস্তির নামটাই বার বার বেজে উঠছে—পুষ্করদা। পুষ্করদা।

কি হয়েছে? কারা এসেছে? ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় সুনন্দা। দেখতে পায়, যারা এসেছে তারা বয়সে ও চেহারায় শিউলিবাড়ির ভোরের পাখির মত একগাদা কলরবের প্রাণ। সাত-আট-নয় দশ বছরের বেশি বয়স কারও নয়; নতুন বস্তির, স্টেশন রোডের, আর কালীতলার

যত ছেলে আর মেয়ে। চক্রবর্তী ঠাকুরের ছোটমেয়ে জয়ন্তী আছে, হেডমাস্টার দীনবন্ধুবাবুর মেয়ে মনোরমাও আছে। এমন কি লালাদের বাড়ির তিনচারটে মেয়েও আছে।

শিউলিবাড়ি ক্লাবের প্রেসিডেন্টের কাছে একটা অভিযোগ নিয়ে এসেছে ওরা।

জয়ন্তী বলে—মোহিতবাবু বললেন, ক্লাবে আমাদের থিয়েটার করা চলবে না।

বিজনবিহারী—কিসের থিয়েটার?

মনোরমা বলে—পুষ্করদা আমাদের জন্যে একটা নাটক লিখে দিয়েছেন।

অ্যাঁ? চমকে উঠেই হেসে ফেলেন বিজনবিহারী। —ভালই তো।

কিচ্ছু ভাল হল না। মোহিতবাবু বারণ করে দিয়েছেন।

বুঝলাম না।

এবার পুজোতে আমরা ক্লাব-বাড়িতে থিয়েটার করব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু মোহিতবাবু বললেন, না, হবে না।

বিজনবিহারী—হবে হবে। কেন হবে না? নিশ্চয় হবে। তোমরা এখন বাড়ি যাও, জয়ন্তী, আমি সব ঠিক করে দেব।

বিষণ্ণ অভিযোগের কলরব সেই মুহূর্তে খুশির কলরব হয়ে ছুটে চলে গেল। আর, ঘরের ভিতরে ঢুকে, জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে এইবার সুনন্দাও বুঝতে পারে, সুনন্দার সৌভাগ্যের সব কলরব স্তব্ধ করে দেবার জন্য একটা চক্রান্ত জেগে উঠেছে, তার নাম পুষ্কর দত্ত। রমাসুন্দরী মাইনর স্কুলের থার্ড টিচারের ফুসফুসে বেশ তো সাহস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মোহিতের বিদ্যাবুদ্ধির উপর হিংসে করে একটা নাটকই লিখে ফেলেছে। ভুল করেছে, ভয়ানক ভুল করেছে পুষ্কর দত্ত। আঁকশি দিয়ে খুঁচিয়ে আকাশের চাঁদকে মাটির ধূলোতে নামিয়ে দেবে, এটা পাগলের কল্পনার আশা।

চক্রান্তের চেষ্টাটার রকম দেখে হেসে ফেলতেও ইচ্ছে করে। বোকা ছেলের লোভ যেমন নাগালের বাইরে একটা গাছের ফল ধরবার জন্য ভাঙা নড়বড়ে পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে আর হাত বাড়িয়ে আঁকুপাঁকু করে, এ-যেন তেমনই একটা করুণ লোভের চেষ্টা। এ চেষ্টাকে হেসে তুচ্ছ করাই উচিত।

সত্যিই, মুখটাকে হঠাৎ হাসিয়ে দিয়ে ঘরের ভিতরে এই বদ্ধতার ভেতর থেকে হঠাৎ ব্যস্তভাবে বের হয়ে যায় সুনন্দা। কালীতলা পার হয়ে ছোট নদীর কিনারায় এসে বটের ছায়ার কাছে একলা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগে। নুড়ি আর বালুর উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা রোগাটে স্রোত। স্রোতের জলের সঙ্গে একটা একলা জবাফুল তরতর করে ভেসে চলে যাচ্ছে। সুনন্দার ও প্রাণটা যেন একটা একলা স্বপ্নের মত কোন নিরিবিলি ঘুমের জগতে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে চাইছে। আর ভাবতে ভাল লাগে না। সব ভাবনার উৎপাত থেকে ছাড়া পেতে চায় সুনন্দার ক্লান্ত প্রাণ। সুনন্দার মুখের এই হাসিটাও যেন হাঁপিয়ে পড়া একটা ক্লান্তির করুণ হাসি।

বাড়িতে ফিরে এসেই কিন্তু চমকে উঠতে হয়। সুনন্দার এই ক্লান্ত হাসির মুখটাও বিরক্ত হয়ে কেঁপে ওঠে। বুকের ভিতরে সেই অস্বস্তিটা আবার চিৎকার করে উঠতে চায়। কারণ, বিজনবিহারীর একটা উৎফুল্ল হাসির শব্দ যেন চিৎকার করে উঠেছে—পুষ্কর এসেছিল।

সুনন্দা—কেন?

পুষ্কর খুব লজ্জিত।

কেন?

ক্লাব বাড়িতে থিয়েটার করার জন্য পুষ্কর কাউকে পরামর্শ দেয়নি। জয়ন্তী আর মনোরমা, দুষ্টু দুটো নিজেরাই মতলব করে মোহিতকে গিয়ে ধরেছিল।

কিন্তু নাটকটা তো পুষ্করবাবু লিখে দিয়েছেন।

হ্যাঁ, সেজন্যে পুষ্কর বেচারা আরও লজ্জিত!

কেন?

পুষ্করের লেখা নাটক পড়ে মোহিত হেসেছে।

তা, হাসবার মত ব্যাপার হলে মানুষ না হেসে পারবে কেন?

হ্যাঁ, পুষ্করও সেটা বোঝে, সেজন্যেই জয়ন্তীকে বার বার বলে দিয়েছিল পুষ্কর, ওরা যেন পুষ্করের লেখা নাটক-ফাটক নিয়ে গিয়ে মোহিতকে বিরক্ত না করে।....এ কি? তোর চোখমুখ এ রকম ছলছল করছে কেন? খুব ঠাণ্ডা লাগিয়েছিস বুঝি?

হ্যাঁ।

গরম জলে চান করবি।

নিরুপমা তাঁর রান্নার ব্যস্ততা ছেড়ে দিয়ে ব্যস্তভাবে ছুটে আসেন। সুনন্দার কপালে হাত রাখেন—ঠিকই তো, মেয়ের কপাল যে ছমছম করছে। জ্বর বলেই তো মনে হচ্ছে।

বিজনবিহারী বলেন—ঠিক আছে, আমি তো এখনই বের হব, যাবার পথে সেনবাবুকে একটা খবর দিয়ে যাব, যেন এখনই এসে একবার দেখে যান।

ঠাণ্ডা লেগেছে ঠিকই, আর জ্বরও হয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু শুধু সেইজন্যেই কি সুনন্দার চোখ-মুখ ছলছল করছে? গায়ে চাদর জড়িয়ে বিছানার উপর নিঝুম হয়ে পড়ে থাকলেও, প্রশ্নটা যেন ধূর্ত একটা ঠাট্টার মত সুনন্দার কানের কাছে ফিসফিস করছে। ছি ছি, পুষ্কর দত্তের চক্রান্তটা যে সুনন্দার একটা মিথ্যে রাগের মিথ্যে কল্পনা। পুষ্কর দত্ত যে নিছক একটা চেষ্টাহীন নিরীহতা। একটা অলস অসার ছায়া মাত্র। মাটিসাহেবের মেয়ের সৌভাগ্যের পথে কাঁটা পেতে রাখবার কোন গরজ ওর নেই।

মাটিসাহেবের মেয়ের মুখের দিকে তাকাবার কোন গরজও কি কোনদিন ওর চোখে দেখা দিয়েছিল? কোনওদিনও না। বছরের বারো মাসের মধ্যে অন্তত একশো বার মাটিসাহেবের মেয়ের সঙ্গে থার্ড টিচার পুষ্কর দত্তের মুখোমুখি দেখা হয়েছে। কিন্তু সুনন্দার সঙ্গে কথা বলা দূরে থাকুক, সুনন্দার মুখটাকে একটু ভাল করে দেখবার জন্যও তার চোখে কোন লোভের চেষ্টা ব্যস্ত হয়ে ওঠেনি। সেদিনও রুদ্রকিশোর শীল্ড বুকে জড়িয়ে ধরে মিছিলের আগে আগে হেঁটে চলে গিয়েছে ক্যাপ্টেন পুষ্কর দত্ত, তখনও তো দেখতে পায়নি সুনন্দা, সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সুনন্দার মুখের দিকে তাকাতে চেষ্টা করেছে পুষ্কর দত্ত। এমন মানুষকে সন্দেহ করাও যে চোরের রাগের মত একটা বেহায়াপনা। রাগ করে নিজের মনটাকেই ঘেন্না করতে ইচ্ছে করে। আর জোর করে এই ঘেন্নাটাকেও ঠেলে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। বিছানা ছেড়ে ছটফটিয়ে উঠে দাঁড়ায় সুনন্দা। গরম জল হয়ে গিয়ে থাকলে এখনই স্নান করে নিতে হবে।

সেনবাবু এসে বললেন—না না, কিচ্ছু ভাববার নেই, সামান্য সর্দি-জ্বর।

দশটা বড়ি দিয়ে চলে গেলেন সেনবাবু। কিন্তু দশটা দিন পার হয়ে গেলেও, আর সুনন্দার চোখ-মুখের ছলছলে ভাব কেটে গিয়ে বেশ খোলামেলা একটা খুশির ভাব হেসে উঠলেও, সর্দি-জ্বরের ভাবটা যেন সুনন্দার গা থেকে ছেড়ে যেতে চায় না।

এই দশদিনের মধ্যে তিনবার এসেছে মোহিত। চাদর গায়ে জড়িয়ে আর বাইরের বারান্দাতে দাঁড়িয়ে মোহিতের সঙ্গে কথা বলেছে সুনন্দা। মোহিতকে চা এনে দিতেও ভুলে যায়নি সুনন্দা।

এসেছে মোহিত। সুনন্দাও আশা করেছিল, আজও নিশ্চয় আসবে মোহিত।

মোহিতের দু'চোখের ব্যাকুলতা যেন বিস্মিত হয়ে বার বার সুনন্দার মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকায় আর হাসতে থাকে।....কি আশ্চর্য সুনন্দা? জ্বরটা যে তোমাকে আরও সুন্দর করে তুলেছে।

সুনন্দা হাসে—তাহলে জ্বরটা আরও দশটা দিন থাকুক, আরও সুন্দর হয়ে উঠি।

মোহিত বলে—না না, তা নয়। তোমাকে দেখতে সত্যিই অদ্ভুত লাগছে, একেবারে নতুন মানুষ বলে মনে হচ্ছে, তাই মনের কথাটা বলেই দিলাম।

সুনন্দার মুখটা হঠাৎ বড় বেশি গম্ভীর হয়ে যায়। যেন একটা দুরন্ত নিঃশ্বাসের আবেগ চেপে চেপে কথা বলে সুনন্দা—বাবার কাছে তুমি এখনও কথাটা বলছ না কেন?

সুনন্দার কথাটার মধ্যে যেন একটা অধীরতার ঝাঁজ লুকিয়ে আছে। বোধহয় সেটা মোহিতের কানেও ঠেকেছে। আর, তাই বোধহয় মোহিতের মুখটা একটু করুণ হয়ে যায়।—তুমি যেদিন বলতে বলবে, সেদিনই বলে দেব।

তাহলে আজই বল।

বেশ।

চুলগুলি রুক্ষ হয়ে ফেঁপে উঠেছে। চোখদুটো বেশ চকচকে হয়েছে। কাজল পরেনি, তবু চোখের কোল জুড়ে একটা কাজলা ছায়ার কালিমা, মুখটা একটু বেশি ভরাট, চোখের চাহনিটা ভার ভার, আর ঠোঁটদুটো বড় বেশি লালচে। আজ আয়নার দিকে তাকাতে গিয়ে সুনন্দার নিজেরই চোখে মুখটাকে খুবই নতুন-নতুন ঠেকেছে। আর, ছোট্ট একটা বিস্ময়ের নিঃশ্বাসও বুকের ভিতরে ঠেকেছে। না, জ্বরের জন্য নয়। কোন সন্দেহ নেই, শরীরটারই একটা রহস্যের ভয়ে সুনন্দার মুখটা ভীরু হয়েছে বলেই মুখটাকে এরকম সুন্দর দেখাচ্ছে।

মোহিত যখন চলে যায় তখন দূরের সিংহানী পাহাড়ের গায়ে ক্লান্ত বিকালের রোদ লালচে হয়ে গলে পড়েছে। জ্বরের শরীর চাদরে জড়িয়ে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছে সুনন্দা, সেটা সুনন্দার চোখও যেন বুঝতে পারছে না।

কি ভাবছ নন্দু বহিন? যেন কলকলিয়ে হেসে কথা বলছে একটা খুশির ঝর্ণা।

চমকে ওঠে সুনন্দা—তুমি কবে এলে রাজুদি?

রাজমোহিনী হাসে—আজ এসেছি। কিন্তু এ কি শুনছি নন্দু? ঠিক তো?

ঠিক।

রাজমোহিনী আরও খুশি হয়ে হাসে।—কিন্তু এরই মধ্যে মুখটা এত সুন্দর করে ফেললে কেমন করে? দেখলে যে মহাদেবও পাগল হয়ে যাবে।

কি বললে?

রাজমোহিনী ফিসফিস করে হাসে—বলছি, বিয়ের আগে তো মুখ এমন সুন্দর হয় না, বিয়ের পরে হয়।

চমকে ওঠে সুনন্দা—কি বললে?

বলছি, বরের কথা ভেবেই যদি এত রূপ খুলে যায়, তবে বরের গা ছোঁয়ার পর কী রূপই না খুলবে।

সুনন্দার চোখদুটো যেন স্তব্ধ হয়ে রাজমোহিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু রাজমোহিনীর খুশির মুখরতা থামতে চায় না—রাগ করিস না নন্দু বহিন। সত্যি তোকে কোনদিন দেখতে এত সুন্দর লাগেনি।

চলে যায় রাজমোহিনী। বিকালের আলো সরে গিয়ে চোখের সামনে যে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে উঠছে, সেটাও বোধহয় সুনন্দার চোখে পড়ছে না।

নিরুপমা ডাকলেন—ভেতরে আয় নন্দু।

একুশ

ঘরের ভিতরে গিয়ে আলোর সামনে একটা মোড়ার উপর বসে থেকেও যেন আলোটাকে দেখতে পাচ্ছে না সুনন্দার উদাস দুটো কালো চোখ। নিরুপমা তিনবার এসে তিনবার কপালে হাত বুলিয়ে চলে গেলেন। সেই তিনটে স্নিগ্ধ ছোঁয়ার স্বাদও বোধহয় অনুভব করতে পারেনি সুনন্দার তপ্ত কপালটা। কিন্তু কানদুটো হঠাৎ চমকে উঠেছে। বাইরের বারান্দায় কার সঙ্গে যেন কথা বলছে বিজনবিহারী, আর মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে হেসে উঠছেন।

বুঝতে আর ভুল হবে কেন? পুষ্কর দত্ত এসেছে। পুষ্কর দত্ত তার একলা জীবনের যত শখ সাহস আর চেষ্টার গল্প বলছে। এসব গল্পের সঙ্গে সুনন্দার কোন সম্পর্ক নেই। এসব গল্প শোনবার জন্য সুনন্দার মনে এক ছিটে কৌতূহলও নেই। সেদিন রামপ্রসাদী গানের রেকর্ড এনেছিল, আজ হয়তো মীরাবাঈয়ের গানে রেকর্ড নিয়ে এসেছে। স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্টকে খুশি করছে স্কুলের থার্ড টিচার। মুরুব্বীকে ভক্তি-শ্রদ্ধা ঘুস দিয়ে খুশি করছে একটা উন্নতির মতলব। মাটিসাহেবের মেয়ের জীবনের আনন্দকে বিরক্ত করবার কোন মতলব নয়।

বাইরের বারান্দাটা যখন নীরব হয়ে যায়, তারপর বোধহয় একটা মিনিটও পার হয় না, ঘরের ভিতরে ঢুকে খুশির স্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন বিজনবিহারী—একটা সুখবর আছে, নিরু।

বল।

পুষ্কর ঠিক আমার মতই একটা কাণ্ড করেছে।

কিসের কাণ্ড?

বর্ধমান থেকে এক বন্ধু ডাক্তারকে আনিয়ে শিউলিবাড়িতে বসিয়েছে পুষ্কর।

ডাক্তার?

হ্যাঁ, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। নতুন বস্তিতে ঘরভাড়া নিয়ে ওষুধের একটা দোকানও করে ফেলেছে রাজীব ডাক্তার। পুষ্কর খুব সাহায্য করেছে। আজ, এই সন্ধ্যাতে রাজীব ডাক্তারের ওষুধের দোকান-প্রতিষ্ঠার পুজো হয়ে গেল।

ভাল হল। রাজীব ডাক্তারের উন্নতি হোক।

আরও ভাল কথা, পুষ্কর দুটো ওষুধ দিয়ে গেল। একটা ওষুধ সকালবেলার জন্যে, একটা সন্ধ্যাবেলার জন্যে।

কিসের জন্যে?

সুনন্দার জন্যে। রাজীব ডাক্তার বলেছে, দুদিনের মধ্যে সর্দি-জ্বর ভাল করে দেবে এই ওষুধ।

বিজনবিহারীর হাতে সত্যিই দুটো শিশি। আলো পড়ে ছোট্ট কাচের শিশি দুটোও যেন ঝিকঝিকিয়ে হাসছে। কিন্তু সুনন্দার আতঙ্কিত চোখদুটো শুধু কেঁপে কেঁপে দুটো নির্মম বিদ্রূপের দিকে তাকিয়ে থাকে। বুকের ভিতরে অস্বস্তির জ্বালাটা বোধহয় আগুনের শিখা হয়ে জ্বলতে শুরু করেছে। না, অসম্ভব। পুষ্কর দত্তের চোরা উপকারের ওই ওষুধ মুখে দিতে পারবে না সুনন্দা। ওষুধের শিশিদুটোকে এই মুহূর্তে জানলার বাইরে ওই শক্ত অন্ধকারের গায়ে আছাড় দিয়ে ছুঁড়ে দিতে আর গুঁড়ো করে দিতে হবে।

সুনন্দার মুখের প্রশ্নটাও যন্ত্রণাক্তের মত ছটফটিয়ে ওঠে।—তুমি কি পুষ্করবাবুকে ওষুধ দিয়ে যাবার জন্য বলেছিলে?

বিজনবিহারী—না, আমি তো কিছু বলিনি। আমি বলবই বা কেন?

দেয়ালের তাকের উপরে ওষুধের শিশিদুটোকে রেখে দিয়ে চলে যান বিজনবিহারী। সঙ্গে সঙ্গে নিরুপমাও চলে যান। আর, সুনন্দার হঠাৎ-ক্ষুব্ধ আত্মাটা যেন হঠাৎ লজ্জা পেয়ে শান্ত হয়ে যায়। একটা মিথ্যে ভয়ের সঙ্গে কোন্দল করবার লজ্জা। মাথাটা যেন নিজের ইচ্ছায় হেঁট হয়ে যেতে চাইছে। দু'হাত তুলে কপালটাকে ঠেকিয়ে রেখে এই অলস মাথাটার সব ভার ধরে রাখতে চেষ্টা করে সুনন্দা।

কোন সন্দেহ নেই, আবার ভাবতে ভুল করেছে সুনন্দার মন। পুষ্কর দত্তের প্রাণ আড়াল থেকে কারও মুখের ছবিকে ধ্যান করছে না। চেষ্টা করে নয়, খোঁজ করে নয়, উঁকি-ঝুঁকি দিয়েও নয়, ভদ্রলোক বোধহয় হঠাৎ জয়ন্তী কিংবা মনোরমার মুখের কথা থেকে জানতে পেরে গিয়েছে, সুনন্দাদির জ্বর হয়েছে। তাই ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছে।

ফুলনবাবুর ছেলের বউ পার্বতীর মুখ থেকেই একদিন গল্পটা শুনেছিল সুনন্দা। যেদিন সিলুয়াড়ি কোলিয়ারী টিমকে হারিয়ে দিয়ে রুদ্রকিশোর হকিশীল্ড পেল শিউলিবাড়ি ইলেভেন, সেদিন পার্বতীর শ্বশুর ফুলনবাবু আহ্লাদে আটখানা হয়ে শিউলিবাড়ি ইলেভেনের ক্যাপ্টেন পুষ্করবাবুকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—জওয়ান-ই-বঙ্গাল। জিতা রহো পুষ্কর!

সর্দার সুচেত সিং পুষ্করের হাত ধরে আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—কৈসর-ই-শিউলিবাড়ি। খুশ রহো পুষ্কর।

আজ আবার এ ছাই গল্পটাকে বার বার মনে পড়ে কেন? মনে পড়িয়ে লাভই বা কি? গল্পটা যে আসতে অনেক দেরি করেছে। যদি আর একটা বছর আগে গল্পটা আসতে পারত, তবে বোধহয়...।

আবার ভাবতে ভুল করছে সুনন্দা। একটা বছর আগে পুষ্করের মুখের দিকে তাকালেই বা কি লাভ হত? কিছু না। সুনন্দার কপালের উপর কোন ফুলের পরাগ ঝরে পড়ত না। পুষ্কর দত্ত তো কোন আশা নিয়ে মাটিসাহেবের মেয়ের মুখের দিকে তাকাত না।

বুঝতে আর কোন অসুবিধাও নেই। বাংলাদেশের জোয়ান হয়ে আর শিউলিবাড়ির কৈসর হয়ে মানুষের উপকারের কাজে খেটে বেড়ায় যে মানুষটা, সেই মানুষটা মাটিসাহেবের মেয়ের সর্দিজ্বরের ওষুধ এনে দিয়েছে। এই মাত্র। এ ওষুধের মধ্যে অদৃশ্য কোন শর্ত নেই, গোপন কোন দাবিও নেই। এর মধ্যে রাগ করবারই বা কি আছে? আশ্চর্য হবারই বা কি আছে? পুষ্কর দত্ত যদি

আবার আসে, তবে বরং খুশি হয়ে আর হেসে হেসে বলে দেওয়াই উচিত, খুব ধন্যবাদ পুষ্করবাবু, খুব উপকার করলেন, আপনার ওষুধ খেয়েছি, জ্বরও সেরে গেছে।

জোরে একটা হাঁপ ছাড়ে সুনন্দা, মুখটাও হাসতে শুরু করে দেয়। আর চোখদুটোও যেন নিরাতঙ্ক স্বস্তির সুখে সিক্ত হয়ে হাসতে থাকে।

বাঃ, এ তো বেশ মজার চোখ! সুনন্দার ঠোঁটের ফাঁকে স্বস্তির হাসিটাও হঠাৎ বিড়বিড় করে ওঠে। হাত তুলে চোখদুটোকে ব্যস্তভাবে মুছে দিয়েই দেওয়ালের তাকের কাছে এগিয়ে যায় সুনন্দা। সন্ধ্যাবেলায় খেতে হবে কোন্ ওষুধটা?

ওষুধের শিশির গায়ে কথাটা লেখাই আছে। ওষুধ খায় সুনন্দা।

চমকে ওঠে সুনন্দা। কি-যেন ভাবতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছে, আজকের মনটা কি-ভয়ানক ভুল করে এই কিছুক্ষণ আগে কত রূঢ় ভাষায় মোহিতের সঙ্গে কথা বলেছে। বুঝতেও পারে, মনের ভিতরে একটা লজ্জার বেদনা করুণ হয়ে হাসছে। ছি ছি, ভাগ্যের সবচেয়ে সুন্দর ইচ্ছার ভাষাটা কি অদ্ভুত গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। কোথা থেকে একটা মূর্খ সন্দেহ এসে মোহিতের নিশ্চিন্ত ভালবাসার মনটাকে যেন ধমক দিয়ে কথা বলতে চেয়েছিল।

জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে সুনন্দা। এ সন্ধ্যা তো কোন অমাতিথির সন্ধ্যা নয়। চাঁদ ওঠবার কথা। কিন্তু আর কত দেরি? কুয়াশার উপর চাঁদের হাসি লুটিয়ে পড়বে কখন? মোহিত আসবে কখন? বাবার কাছে কথাটা বলবেই বা কখন?

সুনন্দার ভাগ্যের এই উৎফুল্ল কৌতূহলের সব ব্যস্ততাকে হঠাৎ শান্ত করে দেবার জন্য ভিতরের আঙিনায় একটা শাঁখ বেজে উঠল। সেই সঙ্গে একটা কলরবের উৎসব। এগিয়ে গিয়ে দেখতে পায় সুনন্দা, মনোরমা আর জয়ন্তী কাড়াকাড়ি করে শাঁখ বাজাচ্ছে! দেখতে পায়, বাইরের বারান্দায় চক্রবর্তী ঠাকুর পাঁজি হাতে নিয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলছেন।

এগিয়ে আসেন নিরুপমা। দু'হাতে মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরেন—মোহিত নিজেই বিয়ের কথা বলেছে। তাই দিন ঠিক করছেন চক্রবর্তী ঠাকুর।

ওঘরের ভিতর থেকে বিজনবিহারীর গলার একটা গর্বময় উল্লাসের স্বর শোনা যায়।—তুমি কি এখানে একবার আসতে পারবে, নিরু?

নিরুপমা—কেন?

বিজনবিহারী—তোমার ধার শোধ করবো। তোমার সেই দেড়শো টাকা নিয়ে যাও।

নিরুপমা হেসে ওঠেন—অ্যাঁ?

বিজনবিহারী—হ্যাঁ। ঝুমরারাজের স্যাকরা আসবে; এইবার হারটা গড়িয়ে নাও।

বাইশ

কিন্তু আজ হঠাৎ এমন একটা বিষণ্ণ আর চিন্তিত চেহারা নিয়ে কেন বাড়ি ফিরলেন বিজনবিহারী, শিউলিবাড়ির এই মাটিসাহেব, যাঁর দুই চোখে এই পঁয়ত্রিশ বছর ধরে একটা প্রসন্ন দুঃসাহসের সূর্য শুধু জ্বলজ্বল করে হেসেছে? আজকের অঘ্রাণের সন্ধ্যার কুয়াশার মধ্যেই বা কোন্ বিভীষিকার ছায়া দেখলেন, যে-জন্যে মাটিসাহেবের মত শক্ত-পোক্ত মানুষের হাত-পায়ের জোর শিথিল হয়ে যেতে পারে? বাড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েও সাইকেলের ঘণ্টি বাজাতে পারলেন না কেন?

গলার জোরই বা কেন এত অলস হয়ে গেল, যে-জন্যে একটা ডাকও দিতে পারলেন না—আমি এসেছি নিরু! কিংবা আমি এসেছি নন্দু!

বেশ তো হেসে-হেসে, আর যেন একটা বিপুল আহ্লাদের ঝড়ের মত শিউলিবাড়ির চারদিকে সাইকেল ছুটিয়ে ঘুরছিলেন বিজনবিহারী। খোঁজ করে জেনেছেন, ঝুমরাগড়ের শুক্রবারের হাটে সরু চাল ওঠে। কুমারসাহেব বলেছেন, হাতিটাকে দু'দিনের জন্য দিতে পারবেন। সিলুয়াডি কোলিয়ারীর ওভারম্যান মজুমদার বলেছেন, আদ্রা থেকে চারজন ভাল জেলে আনিয়ে দিতে পারবেন; বড় ঝিলের সব কালবোশ ছেঁকে তুলতে পারা যাবে। পুষ্কর তো রাজি হয়েই আছে, বিয়ের দু'দিন আগে রাঁচিতে গিয়ে ব্যাণ্ডপার্টি সঙ্গে নিয়ে চলে আসবে। সুনন্দার বিয়ের উৎসবটাকে হর্ষে উল্লাসে ভরে দেবার কল্পনা নিয়ে বেশ তো ছুটোছুটি করছিল একটা বিপুল স্নেহের হৃৎপিণ্ড। কিন্তু আজ এমন কি ব্যাপার হল, যে-জন্যে বাড়ি ফিরে এসেই একটা অসাড় ক্লান্তির মত খাটের উপর লুটিয়ে শুয়ে রইলেন বিজনবিহারী?

নিরুপমা বার বার জিজ্ঞেস করেন—কি হল?

কিছু না।

সুনন্দা বলে—কি হল বাবা?

বিজনবিহারী হাসেন—কিছু না। শুধু একটু একলা হয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে।

অনেক রাতে সুনন্দা যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন মোহিতের উপহার সেই বইটাও সুনন্দার বুকের ওপর পড়ে থাকে, যে বইটার পাতায় পাতায় ভালবাসার গান ঘুমিয়ে আছে। তখন ও-ঘরের ভিতরে নিরুপমা তাঁর ঘুমহারা দুটো চোখের উদ্বেগ শান্ত করে নিয়ে প্রশ্ন করেন—কি হয়েছে এবার বল।

বিজনবিহারীও খাটের উপর উঠে বসেন। জোরে জোরে হাই তোলেন, আর গা-মোড়া দিয়ে ষাট বছর বয়সের শক্ত-পোক্ত আত্মাটার সব অবসাদ যেন ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হেসে ওঠেন—কিছুই নয়; করালীবাবু নামে যে ভদ্রলোক হাওয়া বদলের জন্য এখানে এসেছেন, সেই ভদ্রলোক আজ হঠাৎ কয়েকটা বাজে কথা বলে ফেললেন।

কি কথা?

ভদ্রলোক বললেন, উনি আমাকে চেনেন। কথা শুনে মনে হল, সত্যিই চেনেন।

তুমি ভদ্রলোককে চেন না?

তখন দেখে ঠিক চিনতে পারিনি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমার সঙ্গে একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ত একটি ছেলে, নাম করালীকান্ত, হয়তো সে-ই হবে। যাই হোক...আর রাত করব না, দাও কিছু খেয়ে নিই।

কিন্তু কি বললেন করালীবাবু?

বললেন, আমি নাকি একজন বিদ্রোহী, গা ঢাকা দেবার জন্য এখানে এসে একটা চমৎকার বনবাস বেছে নিয়েছি। শুনে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল, এই যা। তাছাড়া আর কিছু নয়।

নিরুপমার চোখের তারা থরথর করে কাঁপতে থাকে। সেই কালোছায়াটা যেন নিরুপমার চোখদুটোকে উপড়ে দেবার জন্য হিংস্র-নখরে-ভরা একটা থাবা তুলেছে।

হেসে ফেলেন বিজনবিহারী—করালীবাবুর কথা বাদ দাও। আজ আর ওসব কথার কোন

মানে হয় না।

বিজনবিহারীর আজকের এই হাসির শব্দটাও যে সেই নির্ভয় জীবনের প্রতিধ্বনি। যখনই সেই কালো-ছায়াটা কাছে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করেছে, তখনই বিজনবিহারীর বুকের ভিতরে যেন একটা সিংহের সাহস গরগর করে উঠেছে।

নিরুপমার কাছে বিজনবিহারীর এই হাসির শব্দটা যে একটা পরম সান্ত্বনার গান, শান্তি আর সম্মানের একটা নির্ভীক অঙ্গীকার। শোনামাত্র শান্ত হয়ে গিয়েছে নিরুপমার কালোছায়া ভীরু প্রাণটা।

আজও, নিরুপমার চোখের তারা আর কাঁপে না। আতঙ্কিত মনটা হঠাৎ শান্ত হয়ে যায়। ঠিকই, আজ আর ওসব কথার কোন মানে হয় না। করালীবাবুর কথাগুলি শিউলিবাড়ির মাটিসাহেবের মান-সম্মান আর আনন্দের গায়ে একটা আঁচড়ও কাটতে পারবে না। সাধ্যি নেই।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে যখন শুনতে পায় সুনন্দা, কাল রাতে বাবা ভাত খেয়েছিলেন, তখন সুনন্দারও চোখের তারাদুটো হেসে ওঠে।

চলি বেটি নন্দুয়া! সুনন্দার পিঠে হাত বুলিয়ে আর হেসে হেসে বিজনবিহারী যখন তাঁর মাটি-সাহেবী মূর্তিটি নিয়ে আর সাইকেল ছুটিয়ে চলে যান, তখন অঘ্রাণের সকালের সব কুয়াশা গলে গিয়েছে। রোদ মেখে শিউলিবাড়ির ঘাসের সব শিশির হাসছে।

সারা দুপুর ধরে রামসিংহাসনের চন্দনা শিস দেয়। কাটোয়ার সেই বাউল একবার এসে গান গেয়ে আর সিধে নিয়ে চলে যায়।

সোনার হারটা তৈরি হয়েছে। ঝুমরা রাজবাড়ির স্যাকরা এসে হারটা দিয়ে চলে গেল। মেয়ের গলায় হারটা একবার পরিয়ে দিয়ে দেখতে গিয়েই নিরুপমার চোখ ছলছল করে ওঠে।

সুনন্দা হাসে—তুমি এরকম কেন করছ মা? আমি তো বেশ হাসছি।

বিকেলটা কিন্তু কাটতে চায় না। সুনন্দার চোখের দৃষ্টিটা উতলা হয়ে ওঠে, যেন বুকের ভিতরে হাসনুহানার গন্ধ উতলা হয়ে উঠেছে। সেদিন যদি জয়ন্তী আর মনোরমা ওভাবে শাঁখ বাজিয়ে না ফেলত, তবে আজও বোধহয় একবার ঝুমরা কলোনি বেড়িয়ে আসতে পারত সুনন্দা। এরকম অদ্ভুত একটা চক্ষুলজ্জার বাধা সুনন্দাকে এখানে অলস করে বসিয়ে রাখতে পারত না। জানতে ইচ্ছে করে, আজ এখন এই বিকেলের রোদের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছে মোহিত?

বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই চমকে ওঠে সুনন্দা। যেন বিকেলের রোদটাই হেসে উঠে সুনন্দার এই জিজ্ঞাসার উত্তরটা দিয়ে দিয়েছে! মোহিতের চাকর রঘুনাথ একটা চিঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চিঠি দিয়ে চলে যায় রঘুনাথ, আর চিঠি পড়েই সুনন্দার চোখের হাসি আরও উচ্ছল হয়ে ওঠে। মোহিতের চিঠিটা যেন একটা দুরন্ত আকুলতার আহ্বান!—এখনি একবার এস সুনন্দা, একটুও দেরি কর না।

আমি একটু ঘুরে আসছি মা।

ঘরের ভিতর থেকে নিরুপমা বলেন—এস।

তেইশ

মোহিতের এই ঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়েও দস্তিদার সাহেবের ফটকের মাধবীলতার বিতান দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু মাধবীলতার গায়ে সতিাই থোকা-থোকা ফুলের ঝালর দুলছে, না থোকা-থোকা ঠাট্টার ঝালর দুলছে? ও ফুলের আভা কি লাল মানিকের আভা, না লালচে আগুনের আভা? সুনন্দার চোখদুটো যেন সব জ্ঞান আর সব বোধ হারিয়ে ফেলেছে। তাই ওভাবে এতক্ষণ ধরে আর অপলক চোখে ওই মাধবীলতার বিতানটার দিকে তাকিয়ে থেকেও কিছু বুঝতে পারছে না সুনন্দা। মোহিত বলেছে, বিয়ে হবে না; বিয়ে হতে পারে না।

কেন?

না; করালীকাকা যে-কথা বললেন, তাতে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া উচিত নয় সুনন্দা।

কে তোমার করালীকাকা?

আমার বাবার খুড়তুতো ভাই, আমাদের কেষ্টনগরের কাকা।

কী বলেছেন করালীকাকা?

শুনে তোমার লাভ নেই। আমি বলব না।

লাভ আছে। কোথায় উনি?

কেন?

আমি তাঁরই কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব।

উনি নেই। কাল এসেছিলেন, আজ সকালেই চলে গিয়েছেন।

কেন?

তোমার বাবার ভয়ে।

তার মানে?

তার মানে উনি শিউলিবাড়ির মাটিসাহেবের দাপটের কথা জানতে পেরেছেন।

এ-কথারই বা কি মানে হয়?

এখানে তোমার বাবা অনায়াসে করালীকাকাকে দু-টুকরো করে কেটে ফেলতে পারেন। মাটিসাহেবকে কেউ বাধা দেবে না, কেউ কিছু বলবে না।

আমার বাবাকে এমন ভয়ানক বলে ধারণা হল কেন তোমার করালীকাকার?

তিনি তোমার বাবাকে চেনেন।

চিনলে কি বাবাকে কেউ ভয়ানক বলে মনে করতে পারে?

যাঁরা ভাল করে তোমার বাবাকে চেনেন, তাঁরা তোমার বাবাকে ভয়ানক বলেই মনে করবেন।

মিথ্যে কথা। তোমার করালীকাকা ভয়ানক মিথ্যেবাদী।

মাটিসাহেবই একটি ভয়ানক মিথ্যে।

কি বললে?

ঠিক কথা বলেছি, সুনন্দা। তুমি কিছু জান না বলেই রাগ করে আমার সঙ্গে এত তর্ক করছ।

তুমি জানিয়ে দিতে ভয় পাচ্ছ কেন?

ভয় নয়, মায়ার জন্যে জানাতে পারছি না।

একটুও মায়ার দরকার নেই, তুমি এখনি জানিয়ে দাও। আমি দু'কান দিয়ে শুনব।

তবে শোন।

বল।

তোমার বাবা এক ভদ্রলোকের এক মিথ্যে ছেলে।

কি?

সে ভদ্রলোকের বিবাহিতা স্ত্রীর ছেলে নয়, একটা স্ত্রীলোকের ছেলে। আর তুমিও...।

বল, চুপ করলে কেন?

তুমিও তোমার বাবার একটি স্ত্রীলোকের মেয়ে, বিবাহিতা স্ত্রীর মেয়ে নও।

বল, আর যা কিছু জান, সব বল। শুনতে বেশ লাগছে।

যে বিধবাকে ঘরছাড়া করে নিয়ে এসে শিউলিবাড়িতে ঘর বেঁধেছেন তোমার বাবা, সেই বিধবা হলেন তোমার ওই মা।

সারা শিউলিবাড়ি দাউ দাউ করে পুড়ছে—সেই সঙ্গে পুড়ছে আর ছাই হয়ে যাচ্ছে সুনন্দার চোখ মুখ আর ফুসফুস। জানলার গরাদটাকে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করে সুনন্দা। টিপ করে একটা শব্দ গুমরে ওঠে। মেঝের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়ে সুনন্দার মাথাটা গুমরে ওঠে। চেঁচিয়ে ওঠে মোহিত—সুনন্দা!

অঘ্রাণের সন্ধ্যার বাতাসটা বেশ ঠাণ্ডা। তাই সুনন্দার মূর্ছাটাও যেন একটা হিমাক্ত ভয়ের ছোঁয়া লেগে শিউরে ওঠে। চোখ মেলে তাকায় সুনন্দা। কথাও বলে সুনন্দা।—কিন্তু আমাকে বিয়ে করতে তোমার বাধা কোথায়? এখানে তো কেউ বাধা দেবে না। এখানেও তো চক্রবর্তী ঠাকুর আছেন, আশীর্বাদ করবার মানুষও আছে।

ঠিক কথা। এখানে তোমার বাবার দাপটের ভয়ে যত শাস্তর মন্তর আর আশীর্বাদ সবাই বিয়ে দেবার জন্য এগিয়ে আসবে। কিন্তু তাতে তো আমার মন ভরবে না। ওটা একটা ঠাট্টার ব্যাপার হবে, কলকাতার ছাতুবাবু যেমন ঘটা করে বেড়ালের বিয়ে দিয়েছিলেন।

একেবারে সুস্থির হয়ে বসে, আর দুই চোখ অপলক করে মোহিতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সুনন্দা। মোহিত নয়, যেন সুনন্দার ভাগ্যের ঈশ্বর কথা বলছে। ঠিকই তো, মানুষের ছেলে এমন একটা মেয়েজন্তুকে বিয়ে করবে কেন? মানুষের ছেলে যে দেশ বাড়ি গাঁই গোত্র আছে। নিয়মের সন্তান হয়ে এমন একটা অনিয়মের প্রাণীকে বিয়ে করতে ভয় না করে পারবে কেন মোহিত?

মোহিত বলে—তুমি বোধহয় আমার কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে আমাকেই ভুল বুঝেছ? কথা হল, তোমাকেই যদি ঘরে নিয়ে আসি, তবে বিয়ে করবার দরকার কি?

চমকে ওঠে সুনন্দা। মোহিতের কথার অর্থটা যেন বুঝতে পারা যাচ্ছে। সুনন্দার অপলক চোখের উপর থেকে এতক্ষণের উত্তপ্ত বাষ্পের আবরণও যেন হঠাৎ একটা চমক লেগে ছিঁড়ে যায়। চোখের শুকনো খটখটে তারা দুটো প্রখর হয়ে জ্বলতে থাকে। কি বললে?

বলছি, আমি আমার ভালবাসার অপমান করতে পারব না, তোমারও অপমান হতে দেব না। তুমি আমারই ঘরে আসবে, আমার কাছে থাকবে।

মাটিসাহেবের আদুরে মেয়ের হৃৎপিণ্ডটাকে কেউ যেন নর্দমার পাঁকের মধ্যে চেপে ধরে গলা টিপে ধরেছে। বোবার আর্তনাদের মত একটা যন্ত্রণার শব্দ যেন সুনন্দার গলা ছিঁড়ে দিয়ে ঠিকরে

ওঠে—কি বললে মোহিত?

আমি আর এখানে থাকব না সুনন্দা। আজই চলে যাব। আর তোমাকেও আমার সঙ্গে নিয়ে যাব।

কোথায় যাবে?

ধরে নাও, অনেক দূরে কোথাও। রায়পুর কিংবা নাগপুর।

কিন্তু আমি সেখানে কেন যাব?

যদি আমাকে ভালবেসে থাক, তবে নিশ্চয় যাবে, যেতে হবে।

আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে কি করব?

আমার কাছে আমার ঘরে থাকবে!

কেমন করে থাকব? চেঁচিয়ে ওঠে সুনন্দা।

তোমার মা যেমন করে তোমার বাবার সঙ্গে রয়েছেন। মোহিতের শান্ত শিক্ষিত সবল ও অবিচলিত দুটো কৌতূহলের চোখ সুনন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মাথা হেঁট করে ফুঁপিয়ে ওঠে সুনন্দা—মাগো!

সুনন্দা! সুনন্দার একটা হাত ধরে ডাক দেয় মোহিত। চমকে ওঠে সুনন্দা। সত্যিই যে একটা সান্ত্বনার হাত বলে মনে হয়। মুখ তুলে তাকিয়ে আরও আশ্চর্য হয়, মোহিতের দুই চোখ ছলছল করছে। যেন একটা ভয়-পাওয়া ভালবাসা করুণ হয়ে তাকিয়ে আছে।

চুপ করে কি যেন ভাবে সুনন্দা। বোধহয় ভাগ্যের একটা ভ্রূকুটিকে চূর্ণ করে দেবার জন্য সুনন্দার বুকের সব নিঃশ্বাস দুরন্ত একটা সাহস পেতে চাইছে। কিন্তু সুনন্দার সব নিঃশ্বাসের ভার হঠাৎ যেন শ্রান্ত হয়ে যায়। ভ্রূকুটিটাই বলছে, যেতেই যে হবে, উপায় নেই।

সুনন্দা বলে—বেশ। কখন যাবে?

শেষ রাত্রের ট্রেনে।

আমাকে কি করতে হবে?

তুমি স্টেশনে চলে আসবে।

চব্বিশ

সিংহানী কোলিয়ারীর বাঁশির শব্দটা শালবনের উপর দিয়ে ভেসে এসে ঘুমন্ত শিউলিবাড়ির বাতাসকেও একটু সজাগ করে দিয়ে মিলিয়ে গেল। কয়লার ট্রেনটারও চাকা-গড়ানির শব্দটা দূরে চলে গেল। কাজেই ধরে নিতে পারা যায়, রাতের প্রহর ফুরিয়ে আসছে, দুটো বেজে গিয়েছে।

নিরুপমার ঘুম হঠাৎ ভেঙে গিয়েছিল। তাই দেখতে পেলেন, ওঘরে একটা আলো জ্বলছে, আর সুনন্দাও পাশে নেই।

এত রাতে কি করছে মেয়েটা? ভাত খাওয়ার পর যে মেয়ে নিজেই গরজ করে বলল, আজ আমি তোমার কাছে শোব না, সে-মেয়ের মনে আবার এ কেমন খেয়াল দেখা দিল? মায়ের পাশে শোবার লোভটা এরই মধ্যে মরে গেল? আর বই পড়বার লোভ হল?

ও-ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে আর উঁকি দিয়েই চমকে ওঠেন নিরুপমা। ফিরে এসে বিজনবিহারীর ঘুমন্ত বুকটাকে ঠেলাঠেলি করে, আর যেন একটা করুণ আতঙ্কের স্বর চেপে চেপে

ডাক দিতে থাকেন—শুনছ? শিগগির ওঠ। নন্দু কি কাণ্ড করছে দেখ!

বিজনবিহারীও চমকে জেগে ওঠেন—কি হল?

নন্দু কি-যেন লিখছে আর কি-ভয়ানক কাঁদছে।

কেন?

সত্যিই তো কেন? যে মেয়ে আজ রাত্রে ইচ্ছে করে বাবার পাতে ভাত খেয়েছে, ইচ্ছে করে মার গা ঘেঁষে ঘুমিয়েছে, সে মেয়ে ঘুম ছেড়ে দিয়ে এই নিশুত রাতে একলা ঘরে বসে কাঁদবে কেন?

সুনন্দার কাছে গিয়ে দাঁড়ান বিজনবিহারী আর নিরুপমা। —কি লিখছিস নন্দু? বিজনবিহারী ডাকেন।

কাঁদছিস কেন নন্দু? নিরুপমা ডাকেন।

লেখাটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আর চোখ মুছে নিয়ে সুনন্দা বলে—আমাকে এখনই চলে যেতে হবে, মা।

চমকে ওঠেন নিরুপমা—কোথায় যাবি?

মোহিত যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে।

বিজনবিহারী—কি বললি নন্দু?

আর জিজ্ঞেস করো না, বাবা।

নিরুপমা—পাগলের মত কথা বলছিস কেন? এখন আবার মোহিত তোকে কোথায় নিয়ে যাবে? বিয়ের পর যাবে।

বিয়ে হবে না, মা।

নিরুপমা যেন সুনন্দার গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সুনন্দাকে দুহাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে থাকেন—কি হল নন্দু? একথা কেন বলছিস নন্দু?

বিয়ে হতে পারে না।

কেন?

মোহিতের কাকা করালীবাবু যে-কথা বলে দিয়ে গেছেন, তারপর আর বিয়ে হতে পারে না।

করালীবাবু যা ইচ্ছে হয় তাই বলুক, কিন্তু মোহিত তো অবুঝ ছেলে নয়।

মোহিত খুব সবুঝ ছেলে। মোহিতই তোমাদের মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী নয়।

কিছুই বুঝতে পারছি না নন্দু। মোহিত তোকে বিয়ে করবে না, তবু তোকে নিয়ে যাবে; এ কি বিশ্রী কথা, কুৎসিত কথা, ভয়ংকর কথা বলছিস নন্দু?

তুমি বুঝতে পারবে না, কেন?

অ্যাঁ? কি বললি?

বুঝে দেখ। তুমি যা করেছ, তোমার মেয়েও তাই করবে।

সুনন্দার মাথাটাকে দু'হাত দিয়ে টেনে বুকের উপর চেপে ধরে হাঁপাতে থাকেন নিরুপমা—আমাকে ক্ষমা করে দে, নন্দু। আমার কথা ছেড়ে দে নন্দু। তুই যেতে পারবি না।

যেতেই হবে মা।

না না কেন যাবি? কখ্খনো না।

অনেক সাহস করেছ, অনিয়মের মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করেছ আর পুষেছ। কিন্তু আর বোধহয় সাহস করতে পারবে না।

খুব সাহস আছে। চিরকাল পুষব।

না, পারবে না। মেয়ের কোলে একটা অনিয়মের ছেলেকে দেখতে পেলে, তাকে আদর করবার সাহস হবে না।

এ কি সর্বনেশে কথা বলছিস?

ভাগ্যের কথা বলছি। মরতে সাহস হচ্ছে না বলেই চলে যেতে হচ্ছে।

বিজনবিহারী বলেন—নন্দুকে ছেড়ে দাও নিরু। ওকে যেতে দাও!

বিজনবিহারীর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে সুনন্দা।—আমি মরতেই যাচ্ছি বাবা, তুমি বাধা দিয়ো না।

না বাধা দেব না। কেন দেব? দু-হাত দিয়ে সুনন্দার হাতদুটোকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে বিজনবিহারী, আর টেনে তুলে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেন।

নিরুপমার দিকে তাকিয়ে কথা বলেন বিজনবিহারী; গলার স্বর যেন শান্ত বজ্ররব।—তুমি ওঘরে চলে যাও নিরু।

মুখটাকে দু'হাতে শক্ত করে চেপে আর টলতে টলতে ও-ঘরের ভিতরে গিয়ে মেঝের উপর আছড়ে পড়েন নিরুপমা।

তারপর বিজনবিহারী, এদিকে-ওদিকে বা পিছনে, কোন দিকে না তাকিয়ে, আস্তে আস্তে পা ফেলে, শুধু পায়ের তলার মেঝেটার দিকে তাকিয়ে ও-ঘরের ভিতরে গিয়ে খাটের উপর বসে পড়েন।

শিউলিবাড়ির রাতটাও যেন মরণ ঘুম ঘুমিয়ে নিতে থাকে। নীরব নিরেট একটা স্তব্ধতা। ওই ঘরে আর সেই বাতিটা জ্বলছে না। খোলা দরজা দিয়ে হিমেল কুয়াশা হু হু করে ঘরের ভিতরে ঢুকছে। কে জানে কখন চলে গিয়েছে সুনন্দা।

নিরুপমার তন্দ্রাটাও যেন একটা মূর্ছা। কাঁদবার শক্তিটাও অসাড় হয়ে গিয়েছে। যেন একটা অভিশাপের পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন নিরুপমা।

কিন্তু মূর্ছাটাও যেন আর নীরব হয়ে এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছে না। তাই হঠাৎ একবার ধড়মড় করে উঠে বসেন আর চোখ মেলে তাকান নিরুপমা। না, ওঘরে আর আলো নেই। কিন্তু এঘরে কেন আলো জ্বলছে? ঘরটা শূন্য কেন?

নিরুপমার নিথর চোখদুটো অবুঝের মত তাকিয়ে সারা ঘরের শূন্যতার অর্থটাকে যেন বুঝতে চেষ্টা করে। সে গেল কোথায়? খাটের উপর চুপ করে বসেছিল যে পাথর মানুষটা?

চমকে ওঠে নিরুপমার অবুঝ চোখ। মানুষটা যে ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে হাসছে। বন্দুকটা হাতে তুলে নিয়েছে। এইবার টোটার মালাটার দিকে হাত বাড়িয়েছে।

ছুটে এসে দেয়ালের গায়ে ঝোলানো টোটার মালাটা তুলে নিয়ে সরে যান নিরুপমা। টোটার মালাটাকে আঁচল দিয়ে ঢেকে আর দু-হাত দিয়ে বুকের কাছে চেপে রেখে চেঁচিয়ে ওঠেন—তোমার পায়ে পড়ি। তুমি বন্দুক রেখে দাও।

বিজনবিহারী—একটা টোটা দাও নিরু। আমি চলে যাই।

না।

আমি রাগ করে বলছি না, নিরু। বিশ্বাস কর, কারও ওপর আজ আমার একটুও রাগ নেই।

কী শান্ত আর কত স্নিগ্ধ ও মৃদু একটি চেহারা! গায়ে গেঞ্জি, পায়ে চটি, ধুতির কোঁচাটাকে তুলে নিয়ে কোমরে গুঁজে দিয়েছেন। কাঁধ আর বুকের ফর্সা রঙটা ধবধব করছে। মাথার চুলের সব সাদাও আলো লেগে চিকচিক করচে। বিজনবিহারী যেন হেসে হেসে এই ঘরের একটা চমৎকার সাধের কাজ সেরে ফেলবার জন্য বন্দুকটাকে আদর করে হাতে তুলে নিয়েছেন।

বিজনবিহারী হাসেন—ভাবতে বেশ লাগছে, নিরু। কি আশ্চর্য, ঠিক সময় বুঝে চলে এল সেই অভিশাপের রাগ। ধন্যি অভিশাপ রে বাবা!

হাসতে থাকেন বিজনবিহারী। যেন মনখোলা প্রাণখোলা একটা ঠাট্টার হাসি. সে হাসির আড়ালে একফোঁটা ঝাঁজ নেই, জ্বালা নেই, ধিক্কার নেই।

নিরুপমা বলেন—আমার একটা কথা শুনবে?

বল।

তুমি শুয়ে পড়।

বিজনবিহারী নিরুপমার মুখের দিকে তাকিয়ে তেমনই হাসিমুখে আর শান্তস্বরে বলেন—তুমি আমার একটা কথা শুনবে?

বল।

আমার কাছে এসে বস।

নিরুপমার উদ্বিগ্ন চোখদুটো এইবার বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকে।

বিজনবিহারী ডাকেন—এস নিরু।

ঘর-সংসারের গম্ভীর ডাক নয়। চিন্তার ডাক নয়, কাজের ডাক নয়। যেন খেলার সাথীর ডাক। বিজনবিহারী তাঁর পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনসঙ্গিনীর একটা অভিমানিত অনিচ্ছা আর কৃপণতাকে ভুলিয়ে যেন বাজে খরচের জন্য একটা টাকা আদায় করে নেবার মতলবে আদরের সুরে কথা বলছেন।

নিরুপমা উঠে এসে খাটের কাছে দাঁড়ান। বিজনবিহারী তাঁর পাশের জায়গাটাকে দেখিয়ে দিয়ে নিরুপমাকে আরও স্নিগ্ধস্বরে অনুরোধ করেন—এখানে বস. আমার কাছে বস নিরু।

নিরুপমা বসেন। বিজনবিহারী হাত পাতেন। যেন একটা মিষ্টি মায়ার কাছে, যে মায়া একটুতেই গলে যায়, তারই কাছে আবেদন করেছেন বিজনবিহারী—দাও নিরু।

কিন্তু নিরুপমার মায়ার প্রাণ তবু গলতে চায় না। আঁচল দিয়ে জড়ানো টোটার মালাটাকে আরও সাবধানে আর শক্ত করে দুহাতে জড়িয়ে ধরে রাখেন নিরুপমা।

বিজনবিহারী হাসেন—তুমি মিছে কেন কিপ্‌টেমি করছ, নিরু? বুঝতে পারছ না কেন, আমি যে শাস্তিটাকে জব্দ করে দিতে চাই। শিউলিবাড়ির মাটিসাহেব মাথা হেঁট করেছে, একটা ভীতু কুষ্ঠরোগীর মত স্টেশন রোডের এক কিনারা ধরে চুপি-চুপি চলে যাচ্ছে, এমন মজার ব্যাপার তো সম্ভব নয়।

নিরুপমা তবু অবিচল।—না, তুমি আর যা-ই বল, ও কথা বল না।

না, না। তুমি আমাকে বাধা দিয়ে বিরক্ত করো না। আমি কারও কাছে হার মানতে পারব না

নিরু। ভাল ছেলেটি হয়ে যার-তার হাতে মার খাওয়ার জন্যে বেঁচে থাকা আমার পোষাবে না।

ষাট বছর বয়সের গলার স্বরের সঙ্গে যেন ষোল বছর বয়সের দুরন্ত বিজুর সেই বিদ্রোহের গর্জন আজও কথা বলছে। বিজনবিহারীর শান্ত গলার স্বর সত্যিই এবার দুরন্ত হয়ে উঠেছে। বুঝতে আর অসুবিধা নেই, বিজনবিহারীর এই দুরন্তপনা আজ আর কোন সান্ত্বনায় শান্ত হবার নয়।

নিরুপমা বলেন—তবে শুধু একটা টোটা চাইছ কেন? দুটো নাও।

বিজনবিহারী যেন একটু চমকে ওঠেন—কি বললে?

নিরুপমার চোখদুটোও হঠাৎ যেন একটা আশার ছবি দেখতে পেয়েছে, তাই চোখের তারা-দুটোতে অদ্ভুত এক ইচ্ছার বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠেছে।—আমিও যাব।

কেন?

কেন আবার কি? তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলে, তুমি এবার সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

অ্যাঁ?

হ্যাঁ।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। ব্যস্ত লোভীর মত আবার হাত পাতেন বিজনবিহারী—দাও, তাহলে দুটো টোটাই দাও।

বন্দুকের নলটাকে এক হাত দিয়ে টেনে নিয়ে আর নিজেরই বুকের কাছে ঠেকিয়ে রেখে, আর এক হাতে টোটার মালাটাকে বিজনবিহারীর কোলের উপর ফেলে দেন নিরুপমা।

বিজনবিহারী বলেন, ছিঃ, এরকম হুটোপুটি কোর না নিরু। এতদিন যেমন আমাকে বিশ্বাস করেছ, তেমনই আজও বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে একলা ফেলে রেখে যাব না।

নিরুপমা যেন লজ্জিত হয়ে হাসেন। সত্যিই হাতটা হঠাৎ অবিশ্বাসী হয়ে বন্দুকের নলটাকে আঁকড়ে ধরেছে, যেন নিরুপমাকে একলা ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে না পারেন বিজনবিহারী। ছি ছি, কি বিশ্রী অবিশ্বাস। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে নিরুপমাকে বুকের কোটরে পুরে বেঁচে আছে যে-মানুষটা, সে কি নিরুপমাকে আজ ধুলোর উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যেতে পারে?

না না, অবিশ্বাস করছি না। বন্দুকটা, ছেড়ে দিয়ে যেন একটা স্বস্তিময় নির্ভাবনায় হাঁপ ছাড়েন নিরুপমা।

বিনর্জবিহারী বলেন—তোমাকে কেন মিছিমিছি যত অপমান আর লজ্জার মধ্যে ফেলে রেখে যাব—কখ্খনো না। কিন্তু...।

দুটো টোটা আর বন্দুকটাকে দুজনের মাঝখানের ছোট ব্যবধানটুকুর উপর শুইয়ে রেখে দিয়ে বিজনবিহারী এদিক-ওদিক তাকিয়ে কি যেন ভাবেন।

নিরুপমা বলেন—কি খুঁজছ?

খুঁজছি না, ভাবছি, বিছানাটা রক্তে ভেসে গেলে কি ভাল দেখাবে? কাজটা ও ঘরের মেঝের উপর হলেই ভাল হত না কি?

না, ও-ঘরে নন্দুর ফটোটা রয়েছে।

ওঃ, না, তাহলে ও-ঘরে নয়।

আমি তো বলি, এই খাটের উপরেই ভাল। কিন্তু...।
কি?
আমাকে এখানে একা শুইয়ে রেখে তুমি আবার এদিক-ওদিকে সরে গিয়ে পড়ে থেকো না।
না না, তা কি হয়! আমি ঠিক তোমার পাশেই শুয়ে পড়ব।
আমি তো দেখতে পাব না, কিন্তু আমার হাতটা তবু ধরে রেখ লক্ষ্মীটি, কেমন?
নিশ্চয়। সে কথা কি আর বলতে হবে? নিরুপমার একটা হাত ধরেন বিজনবিহারী।
এখনই?
সেটা জেনে তোমার লাভ কি হবে বল? যখনই হোক, ভোর হবার আগেই হয়ে যাবে।
বিজনবিহারীর কাঁধের উপর মাথাটাকে এলিয়ে দেন নিরুপমা। বিজনবিহারী খুশি হয়ে বলেন—হ্যাঁ, এই ভাল। তুমি এবার চোখ বন্ধ করে একটু ঘুমিয়ে নাও।
তুমি কিন্তু আমাকে ঘুমের মধ্যেই....।
না না! ঘুম ভাঙবার পর।
হ্যাঁ, আমি চোখ মেলে তোমাকে একবার দেখব, তারপর। মনে থাকে যেন।
নিশ্চয়।

বিজনবিহারীর কাঁধের উপর নিরুপমার মাথাটা, যেন একটা নিশ্চিন্ত ঘুমের স্বপ্নভরে ঢলে পড়ে থাকে। বিজনবিহারীও তাঁর একটা হাত নিরুপমার কাঁধে তুলে দিয়েছেন। দু'জনের মাঝখানে একটা বন্দুক আর দুটো টোটা, যেন একটা ফুলমালা আর দুটো ফুল। আর ঘরটা যেন বাসরঘর; শিউলিবাড়ির ষাট বছর বয়সের মাটিসাহেব আর তাঁর পঞ্চান্ন বছর বয়সের জীবনসহচরী যেন এক পরম মিলনের বর আর বধূ। খোলা দরজা দিয়ে অঘ্রাণের কুয়াশা হু হু করে ঘরের ভিতরে ঢুকছে, কিন্তু বাতিটা নিবছে না।

পঁচিশ

অঘ্রাণের কুয়াশা কিন্তু এরই মধ্যে সুনন্দার খোঁপার উপর কুচি-কুচি শিশির ছড়িয়ে দিয়েছে। সুনন্দার গায়ে শাড়িটাও স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছে।

শিউলিবাড়ির স্টেশন নয়, দূরের সিগন্যালের লাল চোখটা যেখানে ঘোলা রক্তের আভার মত কুয়াশার বুকের একটা ক্ষত হয়ে জ্বলছে, সেখানে রেললাইনের পাশে একটা মাথাভাঙা মরা শিমূলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিউলিবাড়ির মাটিসাহেবের মেয়ে সুনন্দা।

ঠিকই, স্টেশনেরই দিকে এগিয়ে গিয়েছিল সুনন্দা। কিন্তু স্টেশনের মাথার উপরের বড় আলোটার দিকে চোখ পড়তেই সুনন্দার চোখ দুটো যেন ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। থমকে দাঁড়িয়েছিল সুনন্দা। সেই ধাঁধিয়ে যাওয়া চোখদুটোও কিছুক্ষণ ধরে দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলেছিল।

না, ওই আলোর দিকে এগিয়ে যাওয়াও যেমন, আর দূরের ওই অন্ধকারের লাইনের উপর মাথা পেতে পড়ে থাকাও তেমনি, দুইই মরণ। শিউলিবাড়ির মাটিসাহেবের মানসম্মানের প্রাণটা তাঁর মেয়ের এই দুই মরণের কোন একটি মরণ দেখতে পেলে একই যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে মরে যাবে। এভাবে মানুষের ছেলের সঙ্গে চলে গেলে অমানুষের মেয়ের প্রাণটাও কি সম্মানের বাঁচা বাঁচতে পারবে? না, অসম্ভব! দুরাশার চেয়েও মিথ্যে আশা! তুমি বিজনবিহারী নও মোহিত, আর আমিও

নিরুপমা নই। মাটিসাহেবের পায়ের ধুলোতে যে সাহস আছে, তোমার বুকেও সে সাহস নেই। নিরুপমার ছায়ার বুকটাতে যে ভালবাসা আছে, আমার এই রক্তমাংসের বুকের ভিতরে সে ভালবাসা নেই।

না, শুধু এই শরীরটার একটা গোপন লজ্জার ভয়ে তোমার মত মানুষের ঘরে গিয়ে পড়ে থাকবার কোন মানে হয় না। একটা অনিয়মের মেয়ের প্রাণের সঙ্গে আর একটা যে অনিয়মের প্রাণ লুকিয়ে আছে, সেটাও চলে যাক। কাঁটা আর কাঁটার ফুল একসঙ্গেই মরে যাক। কিন্তু তোমার সঙ্গে যাব না। কখ্‌খনো না। তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। তোমাকে ভয় করে—তোমাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। তোমার কাছে থাকা মানে একটা চমৎকার রঙচঙে ভীরুতার দাসী হয়ে পড়ে থাকা।

না, দুইই সমান অসম্মানের মরণ কেন হবে? তোমার সঙ্গে চলে যাওয়া মরণের চেয়ে ওই অন্ধকারের এককোণে রেললাইনের উপর মাথা পেতে দিয়ে মরে পড়ে থাকা বরং সম্মানের মরণ। তোমার মত আলোর জ্বালার কাছে মরে যাওয়ার চেয়ে ঢের ভাল।

স্টেশনের আলোটাকে যেন একটা ঘেন্নার ভ্রূকুটি দিয়ে তুচ্ছ করে দপ্ দপ্ করেছে সুনন্দার দুই চোখ। তারপরেই এই অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছে; যেখানে একটা মাথাভাঙা মরা শিমূল একলা দাঁড়িয়ে আছে, আর শিশিরে ভিজে গিয়ে পিছল হয়ে গিয়েছে রেললাইন।

শেষ রাতের ট্রেনটা আসছে বোধহয়। অনেক দূরে, ঘুমন্ত শালবনের বুকে গভীরে যেন একটা গম্ভীর শব্দের মিহি বোল গুরগুর করে বাজছে। আঁচল দিয়ে কোমরটাকে শক্ত করে জড়িয়ে বাঁধে সুনন্দা। দু'পা এগিয়ে গিয়ে, শান্ত প্রতীক্ষার একটা আবছায়া হয়ে আর কান পেতে যেন অঘ্রাণের কুয়াশার একটা গান শুনতে থাকে।

কিন্তু সেই মুহূর্তে সুনন্দার একেবারে চোখের কাছে এসে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় একটা ছায়া।—বাড়ি ফিরে চলুন।

এ আবার কোন্ রহস্যের দাবি এসে কথা বলছে? এ সময়ে এখানে, অঘ্রাণের শেষরাতের এই হিমেল কুয়াশার ভিতরে এ কোন্ শাসনের ধমক কেমন করে কখন এসে আর কতক্ষণ ধরে লুকিয়েছিল? পুষ্কর দত্ত যে সত্যিই শিউলিবাড়ির একটা রাতজাগা চক্রান্ত। সুনন্দার দুঃসাহসের চোখদুটো আশ্চর্য হয়ে আর ভয় পেয়ে চমকে উঠে কাঁপতে থাকে।

ঠিকই, বেশ মৃদুস্বরে কথা বলছে একটা চক্রান্তের মন। —আমি হঠাৎ এখানে এসে পড়িনি। ইচ্ছে করেই এসেছি। আমি আজ এইজন্যে তৈরি হয়েই ছিলাম।

সুনন্দার হঠাৎ-ভীরু মূর্তিটা এবার পাথরের মূর্তির মত কঠোর হয়ে ওঠে। কথা বলে না সুনন্দা। পুষ্করের শক্ত ছায়াটাকে যেন একটা নীরব তুচ্ছতার আঘাত দিয়ে সরিয়ে দিতে চায়।

কিন্তু কুয়াশার মধ্যে যেন বিনীত একটা অনুরোধ কথা বলতে থাকে।—আপনি আশ্চর্য হবেন না, ভয় পাবেন না।

তবু কথা বলে না সুনন্দা। কথা বলতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু শুনতে পায়, এবার যেন একটা দুশ্চিন্তার প্রাণ কথা বলছে।—আমার আজ সন্দেহ হয়েছিল, আপনি এরকম একটা কাণ্ড করতে চাইবেন।

সুনন্দার নিরুত্তর মূর্তিটা একটুও বিচলিত হয় না।

এবার যেন ভয়ানক একটা সবজান্তা আত্মা মায়া করে কথা বলতে শুরু করেছে।—আপনি মোহিতবাবুর ব্যবহারে দুঃখ পেয়ে যা করতে চাইছেন, সেটা আপনার বাবার আর মা'র অপমান। আপনারও অপমান।

সুনন্দার মাথায় যেন হঠাৎ একটা ঝিম ধরে যায়। চোখদুটোও চমকে ওঠে। কী সাংঘাতিক এই পুষ্কর দত্তের চোখ আর কান! যেন আড়ালে আড়ি পেতে সুনন্দার ভালবাসার বিপদের সব ভাষা শুনেছে, সব ঘটনা দেখেছে।

যেন কথা বলছে একটা ভুল বুঝিয়ে দেওয়া সান্ত্বনা।—মোহিতবাবু তাঁর করালীকাকার কাছ থেকে একটা গল্প শুনে খুব অন্যায় আর খুব ভুল করলেন। কিন্তু সেজন্যে আপনিও ভুল করবেন কেন?

সুনন্দার বুকের ভিতরে একটা আর্তনাদ গুমরে উঠতে চায়। কিন্তু জোর করে ঠোঁট চেপে রেখে আর নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুনন্দা।

কি আশ্চর্য, এইবার যেন সতর্কচক্ষু একটা পাহারার প্রাণ কথা বলছে।—আপনার ঘরে রাত দুটোর সময় আলো জ্বলতে দেখেই মনে হল, আপনি একটা গণ্ডগোল বাধিয়েছেন।

যন্ত্রণাভরা একটা নিঃশ্বাসকে ঢোঁক গিলে শান্ত করতে চেষ্টা করে সুনন্দা।

অঘ্রাণের কুয়াশাটা এবার যেন বেশ ব্যথিত স্বরে আক্ষেপ করছে—আপনি আজ আপনার বাবা আর মা'কে যে-সব কথা বললেন, সেগুলো খুব অন্যায় কথা, খুব বাজে কথা।

সুনন্দার চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। সবই কুয়াশা বলে মনে হয়। কিন্তু শুনতে কোন অসুবিধে নেই—বেশ স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, যেন দুরন্ত একটা সন্ধানের প্রাণ কথা বলছে।—আপনি সত্যি ঘর ছেড়ে চলে এলেন দেখে আমাকে অগত্যা আপনার পিছু পিছু আসতে হল। যাই হোক, দেখে খুশি হলাম যে, স্টেশনে গেলেন না।

সুনন্দার হৃৎপিণ্ডটাই শিউরে ওঠে, তবু কথা বলতে পারে না। দুর্বহ একটা বিস্ময়ের ভার সহ্য করতে গিয়ে চোখ বন্ধ করে সুনন্দা।

কিন্তু কথা বলছে একটা স্নিগ্ধ আবেদন—আপনি এখানে এসেও খুব ভুল করেছেন। বাড়ি চলুন।

সুনন্দার নিঃশ্বাসের বাতাসটা যেন ফুঁপিয়ে হেসে উঠতে চায়। কিন্তু সে নিঃশ্বাসকেও সামলে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সুনন্দা।

এবার যেন একটা লজ্জিত কৈফিয়তের প্রাণ এলোমেলো ভাষায় কথা বলতে থাকে।—অবশ্য আপনাকে এখানে আসতে না দিয়ে ওখানে বাড়ির কাছেই বাধা দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু ভয়ও ছিল, আপনি আমার কথা শুনবেন না। উল্টে হয়তো আমাকেও সন্দেহ করবেন। তাছাড়া, তখন বোধহয় আপনাকে এত কথা বলতেও পারতাম না।

কথা বলে সুনন্দা; একটা শুকনো পাথরের গলার শান্ত আর ঠাণ্ডা স্বর।—আপনি চলে যান।

না।

আমি একজনের সঙ্গে চলে যাব, তাতে আপনি বাধা দেবেন কেন?

চলে তো যাননি।

যদি যেতাম, তবে?

তবে বাধা দিতাম।

কেমন করে? মোহিতবাবুকে ছুরি মারতেন?

দরকার বুঝলে মারতাম!

দরকার বুঝলে আমাকেও বোধহয়....।

কথা বাড়াবেন না। বাড়ি চলুন।

না। আপনি যান।

আমি যাব না।

কেন যাবেন না? তুচ্ছ মানুষের একটা তুচ্ছ মেয়েকে তুচ্ছ করে চলে যেতে আপনারই বা বাধছে কেন?

আমি কাউকে তুচ্ছ করি না।

শিউলিবাড়ির মাটিসাহেবকে আপনি তুচ্ছ করেন না?

সে খোঁজে আপনার দরকার কি?

মাটিসাহেবের পা ছুঁয়ে প্রণাম করবার সাহস আপনার আছে? তিনি তো আপনার চেয়ে বয়সে অনেক বড়।

সাহস নেই, অভ্যেস আছে।

কিন্তু আর কি সে অভ্যেস থাকবে?

তার মানে?

করালীবাবুর কাছ থেকে খবর শুনে মাটিসাহেবকে চিনতে পারবার পরেও কি সে অভ্যেস থাকবে?

ও-খবর আমি পাঁচ বছর আগেই জেনেছি।

চমকে ওঠে সুনন্দা। বুকটাকে খুব জোরে ব্যথা দিয়ে ছোট্ট একটা আনন্দ যেন চমকে উঠেছে। আস্তে একটা হাঁপ ছাড়ে সুনন্দা—কিন্তু আমাকে তো তুচ্ছ করতে পারেন।

না। কোনদিন তুচ্ছ করিনি, আজও করি না।

কবে থেকে তুচ্ছ করেননি?

জানি না। বোধহয় যেদিন প্রথম দেখেছি, সেদিন থেকে।

একথা এতদিন বলেননি কেন?

বলতে ইচ্ছে করেনি।

আজ বললেন কেন?

তুমি জিজ্ঞেস করলে বলে।

দু'হাত তুলে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে সুনন্দা। মাটিসাহেবের মেয়ের বুকটার এতক্ষণের সব পাথুরেপনা যেন দুঃসহ একটা বিস্ময়ের কান্না চাপতে গিয়ে গলে গিয়েছে। পুষ্কর দত্ত নয়, সত্যিই যে ঘুমহারা এক যখের ভালবাসা কথা বলছে। দিন মাস বছর পার হয়েছে, যখের সজাগ চোখ যেন একটা গুপ্তধনের উপর পাহারা রেখেছে। সে গুপ্তধন আজ ধুলো হয়ে যাবে বুঝতে পেরে বিচলিত হয়েছে যখের প্রাণ। বাঃ, মাটিসাহেবের মেয়ের ভাগ্যের উপর আর এক অদ্ভুত ঠাট্টার আঘাত। গল্পের সেই কাঠুরিয়া মেয়েটার ভাগ্যের মত। নদীর জলে যখন ডুবে যাচ্ছে মেয়েটা,

তখন কোথা থেকে এক রাজপুত্তুর ছুটে এসে চেঁচিয়ে উঠলেন—আমি যে এতদিন তোমারই কথা ভেবেছি।

সুনন্দা বলে, কিন্তু আজ আমাকে তুচ্ছ করুন, আপনি যান। আমি যাব না। আমি ফিরে গেলে কারও কোনও ভাল হবে না।

সবারই ভাল হবে। তোমারও ভাল হবে।

কেমন করে?

যেমন করে সব মেয়ের ভাল হয়। বাপ-মার কাছে থাকবে। তারপর....একদিন স্বামীর ঘরে চলে যাবে।

যেন তীব্র একটা ধিক্কার চাপতে গিয়ে শিউরে ওঠে সুনন্দার গলার স্বর—চুপ! চুপ করুন পুষ্করবাবু। আমাকে কেউ মানুষের মেয়ে বলে মনে করবে না, মন্তর পড়ে হাত ধরবে না, স্ত্রী বলে মেনেও নিতে পারবে না।

খুব পারবে।

কেউ পারবে না। আপনিও পারবেন না।

তুমি বললেই পারব।

পারবেন না।

হেসে ফেলে পুষ্কর—সত্যি কথাটা বলতে পারছ না সুনন্দা।

কি কথা?

তুমিই পারবে না।

কেন?

তোমার ইচ্ছে নেই। কোনদিন যাকে ভাল লাগেনি, তাকে বিয়ে করতে তোমার ইচ্ছে না হওয়াই তো উচিত।

সুনন্দার গলার কাছে যেন করুণ একটা দীর্ঘশ্বাস আটকে গিয়ে হাঁসফাঁস করে।

কোনদিন ভাল লেগেছিল কিনা জানি না, কিন্তু আজ তোমার পা ছুঁয়ে বলতে পারি বেঁচে থাকতে পারলে তোমার কাছেই যেতে চাইতাম।

পুষ্কর দত্তের বুকটাও বোধহয় চমকে উঠে অদ্ভুত এক বিস্ময়ের আবেশে টলমল করে উঠেছে। তার গলার স্বরও নিবিড় হয়ে যায়।—তবে তো তোমাকে বেঁচে থাকতেই হবে। চল সুনন্দা।

না।

আমিই তো ডাকছি, চল।

তোমার ডাক শুনেও আমি যেতে পারব না পুষ্কর। আমাকে ক্ষমা কর।

কেন?

বলতে পারব না। তুমি বুঝে নাও, আর একটি কথাও না বলে চলে যাও।

আমি সত্যিই কিছু বুঝতে পারছি না।

সুনন্দা যেন নিঃশ্বাসের সব শব্দ থামিয়ে দিয়ে, বুকের ভিতরে ধুকপুক করছে যে কুণ্ঠার জ্বালাটা, দম বন্ধ করে সেটাকে নিবিয়ে দিয়ে, আর দু'হাত দিয়ে যেন দুমুঠো কুয়াশাকে খিমচে ধরে নিয়ে, নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে - সব বুঝেও এটুকু বুঝতে পারছ না কেন? আমার মরা শরীরটাও

যে লুকোতে পারবে না, ময়নাঘরের ডাক্তার যে দেখেই বুঝে ফেলবে, মাটিসাহেবের মেয়ে পেটে একটা কলঙ্ক নিয়ে আত্মহত্যা করেছে?

কি বললে? পুষ্করের গলাটা কেঁপে ওঠে! পুষ্কর দত্তের প্রশ্নটা যেন ধক্ করে জ্বলে ওঠা একটা ব্যথিত বিস্ময়ের প্রশ্ন।

সুনন্দার চোখদুটো এইবার অপলক হয়ে, যেন একটা চমৎকার কৌতুকের অন্তিম দেখার জন্য জ্বলজ্বল করতে থাকে। এখনি দেখতে পাবে সুনন্দা, মাটিসাহেবের মেয়েকে একটা ভয়াল মেয়ে-জন্তু বলে মনে করে জওয়ান-ই-বঙ্গালের ভালবাসার মুখরতা কত ভয় পেয়ে কেমনতর বোবা হয়ে যায়। শিউলিবাড়ির কেসর কেমন করে দু'পা পিছিয়ে গিয়েই ছুটে পালিয়ে যায়।

কিন্তু কেঁপে ওঠে সুনন্দার অপলক দুটি চোখ। দু'পা এগিয়ে এসে সুনন্দার একেবারে চোখের কাছে দাঁড়িয়েছে পুষ্কর। —বুঝেছি। সব বুঝেও কিন্তু তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছে। বিশ্বাস কর সুনন্দা।

কি বললে?

তোমাকে হাত ধরে এখনই টেনে নিয়ে গিয়ে চক্রবর্তীঠাকুরকে এখনই বলে দিতে ইচ্ছে করছে, দিন ঠিক করুন।

শেষ রাতের কুয়াশাময় আকাশ যেন হঠাৎ জ্যোৎস্নায় ভরে গিয়েছে। শান্ত ঘুমন্ত শালবন যেন স্বপ্নলোকের মায়াবন। পুষ্করের দিকে একটা হাত এগিয়ে দিয়ে সুনন্দার করুণ মূর্তিটা হঠাৎ বিহ্বল হয়ে টলতে থাকে—তবু ঘেন্না করতে পারলে না?

না। সুনন্দার হাত ধরে পুষ্কর। কাছে টেনে নেয়। বুকে চেপে ধরে। সুনন্দার শিশিরভেজা মাথাটার উপর হাত বোলাতে থাকে পুষ্কর। একটা আদুরে আকুলতার হাত একটা ফুলের গায়ের ধুলো মুছে দিচ্ছে।

শালবনের মায়া-কুয়াশার গায়ে দুটো আলোর চোখ ভেসে উঠেছে, সিগন্যালের হাতছানিও ঝুপ করে একটা শব্দ করে সবুজ আলো ভাসিয়েছে। এসে পড়েছে ট্রেন, এসে পড়েছে একটা কাপুরুষ ইচ্ছার হর্ষ, একটা অপমানের ব্যস্ততা।

সুনন্দা বলে—চল।

পুষ্কর বলে—চল।

কিন্তু না, ওদিকে নয়, স্টেশন হয়ে যেতে পারব না।

কেন?

ওখানে যে একজন মানুষের ছেলে বসে আছেন, মাটিসাহেবের মেয়ের লাশ নিয়ে যাবার জন্য।

হেসে ওঠে পুষ্কর—মোহিতবাবু রাত আটটার মোটরবাসে চলে গিয়েছেন।

চমৎকার! হেসে ফেলে সুনন্দা। হেসে ফেলেছে একটা দুঃসহ কৌতুকের সমাপ্তি। হেসে ফেলেছে শিউলিবাড়ির হিমেল নীরবতা।

কিন্তু সেই মুহূর্তে মাটিসাহেবের মেয়ের আত্মাটা যেন ছটফটিয়ে ওঠে আর কেঁদে ফেলে! নিশির ডাকে ঘরছাড়া একটা পাগল ভুলের প্রাণ শিউলিবাড়ির একটা ক্ষমার হাত পা বুক আর কোলের কাছে ছুটে গিয়ে লুটিয়ে-পুটিয়ে আদর নেবার জন্য ছটফটিয়ে উঠেছে। চোখ মুছে নিয়েই পুষ্করের একটা হাত ধরে টান দেয় সুনন্দা—শিগগির চল।

ছাব্বিশ

খোলা দরজার বাইরে এখনও কুয়াশামাখা অন্ধকার থমকে আছে। শিউলিবাড়ির কোন ঘুম-ভাঙা পাখিও ডেকে ওঠেনি। কিন্তু চোখ মেলে তাকিয়েছে নিরুপমা।

ভোর হয়নি, তবু নিরুপমার চোখদুটো যেন ভোরের আলোর দুটি চোখ হয়ে বিজনবিহারীর পাশে শান্ত হয়ে বসে আছেন নিরুপমা।

টোটাভরা বন্দুকটাকে এক হাতে আঁকড়ে ধরেছেন বিজনবিহারী। যেন একটু শান্ত হয়ে, একটু যত্ন নিয়ে, আর অনেক মায়া নিয়ে একটা সুন্দর সাধের কাজ করবার জন্য তৈরি হয়েছে স্বপ্নচারী এক কারিগরের হাত।

কিন্তু বাধা দিল খোলা দরজাটা। পুষ্কর আর সুনন্দা, যেন দুটো ব্যস্ত উদ্বেগ একসঙ্গে ঘরের ভিতর ঢুকে, আর কালিমাখা জ্বলন্ত বাতিটার দিকে তাকিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। থমকে দাঁড়ায় দুটো নিদারুণ বিস্ময়।

ছুটে গিয়ে নিরুপমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে সুনন্দা—আমি কোথাও যাইনি মা। তোমার পায়ে পড়ি মা, ভাল করে তাকিয়ে দেখ, আমি এসেছি। এই তো আমি।

পুষ্কর এগিয়ে এসে বিজনবিহারীর হাত ধরে। বন্দুকটাকে কেড়ে নিয়ে খাটের তলায় ফেলে দেয়।—আপনি এখন ঘরের বাইরে গিয়ে বসুন। আলোয়ানটা আগে জড়িয়ে নিন।

সুনন্দা এগিয়ে এসে আলোয়ানটাকে বিজনবিহারীর গায়ে জড়িয়ে দেয়।

বিজনবিহারী আর নিরুপমা, দুজনে দু'জোড়া শান্ত আর অচঞ্চল চোখ যেন ভিন জগতের দুটি মানুষের চোখ। সে চোখে কোন প্রতিচ্ছায়া পড়ছে না। কিংবা বাইরে থেকে হঠাৎ যেন দুজন নতুন আগন্তুক এসে বিজনবিহারী আর নিরুপমার স্বপ্নের ঘরে ঢুকেছে। বিজনবিহারী আর নিরুপমার ঘুমের চোখ তাই তাদের চিনতে পারছে না।

পুষ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন নিরুপমা। সুনন্দা বলে—তুমি শুয়ে পড় মা, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

বিজনবিহারীও পুষ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। পুষ্কর বলে—ভোর হয়ে গিয়েছে। চলুন, বাইরে যাই।

খোলা দরজার দিকে চোখ তুলে বাইরের আকাশটার দিকে একবার তাকালেন বিজনবিহারী। তারপর পুষ্করের সঙ্গেই আস্তে আস্তে হেঁটে বাইরের বারান্দায় এসে একটা চেয়ারের উপর বসে পড়েন।

পুষ্কর বলে—আমি তবে এখন যাই।

বিজনবিহারী বলেন—এস।

ভোরের পাখি ডাকছে। ঘরের ভিতরে খাটের উপর ক্লান্ত শিশুর মত নিবিড় ঘুমের কোলে যেন ঢলে পড়ে থাকেন নিরুপমা। রান্নাঘরের ভিতরে ঠুং-ঠাং করে চা তৈরি করে সুনন্দা। আর, বাইরের বারান্দায় বসে বিজনবিহারীর চোখদুটো ভোরের আলোর সঙ্গে যেন আস্তে আস্তে জেগে উঠতে আর হেসে উঠতে থাকে।

সকালবেলায় রোদ ঝলমল করে। অনেক দূরে, সিংহানী পাহাড়ের গায়ে যে এক টুকরো সাদা

কুয়াশা মাকড়সার জালের মত লেপটে ছিল, সেটাও গলে গেল। রামসিংহাসনের বউ বিন্ধ্যাচলীর হন্তদন্ত উল্লাসের মূর্তিটা হঠাৎ এসে থমকে দাঁড়ায়, বিজনবিহারীকে দেখতে পেয়ে মাথার কাপড় টানে, তারপরেই তিন লাফে ঘরের ভিতরে ঢুকে চেঁচিয়ে ওঠে—পূজারীবাবুর মেয়ে জয়ন্তী এ কি কথা বলছে দিদি?

ধড়ফড় করে জেগে ওঠেন নিরুপমা—কি?

পুষ্করের সঙ্গে নন্দুয়া বেটির বিয়ে?

কে বলেছে?

পুষ্কর বলেছে।

সুনন্দা এসে বলে—হ্যাঁ, চাচিজী।

ঘরের ভিতরে যেমন বিন্ধ্যাচলীর খুশির হাসি ছড়িয়ে গড়িয়ে ছুটোছুটি করে, তেমনই ঘরের বাইরেও এক একটা খুশির হাসি হঠাৎ এসে এসে বিজনবিহারীর বারান্দাটাকে হাসিয়ে দিয়ে চলে যায়। খবরটাকে যেন সারা শিউলিবাড়ির প্রাণ খুশি হয়ে অভ্যর্থনা করছে।

সর্দার সুচেত সিং আসেন আর হাসেন।—বড় ভাল খবর মাটিসাহেব। শুনে খুব খুশি হয়েছি।

ফুলনবাবু আসেন—খুব ভাল হয়েছে মাটিসাহেব। পুষ্কর বড় ভাল ছেলে।

দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী আর সেনবাবুর স্ত্রী ব্যস্তভাবে এসে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন। মিষ্টি কই নিরুদি? আজ কিন্তু শুধু আপনার মেয়ের মিষ্টি মুখটি দেখেই ফিরে যাব না।

জয়ন্তী আর মনোরমা, সেই সঙ্গে একদল ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে এসে বারান্দার উপর বিজনবিহারীকে ঘিরে ধরে। জয়ন্তী বলে—আমরা কিন্তু সুনন্দাদির বিয়েতে থিয়েটার করব! ... বল না মনু।

মনোরমা বলে—জয়ন্তী হল নাগলতা, আর আমি হলাম কাশ্মীরের রাজা চক্রবর্মা।.... তুই বল না জয়ন্তী।

জয়ন্তী—সত্যিই বলতে কান্না পায়। নাগলতা বলছেঃ দাও দুঃখ, দাও ক্লেশ, দাও চিতাবহ্নিজ্বালা, সকলি সহিব হাসিমুখে—কিন্তু ঘৃণা নাহি সহিবে পরাণে কভু।

নিরুপমা এসে বিজনবিহারীর কাছে দাঁড়ান—শুনেছ?

বিজনবিহারী হাসেন—শুনেছি।

এত শান্ত হয়ে হাসতে গিয়েও ষাট বছর বয়সের চোখদুটো ছটফট করে ওঠে। চোখের পাতা ভিজে যায়। যেন গলে গিয়েছে একটা দুরন্ত অভিমান।

মুখটাও যে নিতান্ত একটা ছেলেমানুষের মুখ। শিউলিবাড়ির অঘ্রাণের আকাশের দিকে পিপাসিতের মত তাকিয়ে আছেন বিজনবিহারী। দেখে সন্দেহ হয় নিরুপমার, আর সন্দেহ করতে গিয়ে চোখদুটোও ঝাপসা হয়ে যায়, যেন ষোল বছর বয়সের বিজুর প্রাণ একটা স্বপ্নের পথে হাঁটা দিয়ে ফিরে চলেছে।

যেন দিগনগরের রাস্তা শেষ হয়ে গেল, ধানক্ষেতের ফুরফুরে হাওয়া পিছনে পড়ে রইল। জলঙ্গীর জল ছলছল করে, একটা একলা নৌকোর বৈঠা ঝুপঝুপ করে, মুচিপাড়ার কুকুর জেগে উঠে ঘুরঘুর করে। কেষ্টনগরের আকাশের ঝিকিমিকি তারা নিবেছে। পথের আলো নিবছে। ভোর হয়েছে, ওই তো বাড়িটা। চেঁচিয়ে ডাকছে বিজু—আমি এসেছি ছোড়দা।

কালকেতু

প্রায় রোজ সন্ধ্যায় যে মোটর গাড়িটা দমদমের এই বাড়ির ফটকের কাছে এসে একেবারে থেমে যায়, সেটা খুবই চমৎকার ও চকচকে একটা ক্যাডিলাক। ফটকের আলোর আভা লেগে ক্যাডিলাকের বডির পালিশ আরও চকচক করে।

বাড়ির নাম 'নিরঞ্জন', যদিও বাড়ির চেহারাটি অনেক রঙে রঞ্জিত। যাঁরা ভাষার অর্থ টেনে মহিম বসুর এই বাড়ির নামের ভুল ধরেন আর একটু হাসাহাসিও করেন, তাঁরা জানেন না যে, বাড়ির নামটি মহিম বসুর বাবার নাম। নিরঞ্জন বসু আজ আর বেঁচে নেই। চল্লিশ বছরেরও বেশি হবে, তিনি নানারকমের জ্বরজ্বালায় ভুগে ভুগে, বলতে গেলে একরকমের বিনা চিকিৎসাতেই মারা গিয়েছেন। যাবার আগে একমাত্র ছেলে মহিমের জীবনটার জন্য একমাত্র যে বিষয়-সম্বল রেখে গিয়েছিলেন, সেটা হল জ্ঞাতি ভাইয়ের কাছে বন্ধকে বাঁধা একটি গ্রাম্য বাড়ি। বিশ বছর বয়সে নৈহাটির এক জুট মিলের সাতাশ টাকা মাইনের কেরানী হয়েছিলেন নিরঞ্জন বসু। চল্লিশ বছর বয়সে নানা রোগের কারণে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে যখন কেরানিগিরির কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন, তখন মাইনে ছিল তেত্রিশ টাকা। তারপর পাঁচ বছর ধরে শূন্য রোজগারের জীবন। স্ত্রী ও তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আবার গ্রামের বাড়ির আশ্রয়ে ফিরে এলেও দুশ্চিন্তার কঠোর প্রশ্নটা একটুও নরম হয়নি। পাঁচটি জীবনের বেঁচে থাকবার আশা কোথায়, আর উপায়ই বা কী? কাজেই অসহায় আর নিরন্ন ভাগ্যটার পেটের খোরাক যোগাবার জন্য বাড়িটাকে বন্ধক দিতে হয়েছিল।

বাড়ি বন্ধক দিয়ে কত টাকা পেয়েছিলেন নিরঞ্জন বসু? আড়াই হাজার টাকা। এই আড়াই হাজার টাকার একটি পয়সাও তিনি ওষুধ কিনতে খরচ করেননি। ওষুধ কেনবার জন্য বার বার অনেক পীড়াপীড়ি করতে গিয়ে অনেক কান্নাকাটি করেছেন মহিমের মা। বড় ছেলে মহিমও রাগ করে অনেক চেঁচামেচি ও ঝগড়া করেছে। তবু নিরঞ্জন বসুর ওষুধ-বিরোধী প্রতিজ্ঞাটাকে একটুও টলাতে পারেনি। মাত্র দেড় টাকা খরচ করলে শম্ভু কবিরাজের পাচন কিনে আনতে পারা যায়। যে পাচন দিনে দু'বার করে খেলেও সাতটা দিন চলে যায়। কিন্তু না, কিছুতেই না। নিরঞ্জন বসু কোনও ওষুধের ছিটেফোঁটাও মুখে দেবেন না।

এইভাবে পাঁচটি বছর চলবার পর, বড় ছেলে মহিমের বয়স তখন সাড়ে উনিশ বছর, তখন একদিন হঠাৎ দাওয়ার উপর বসে আর আকাশের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন নিরঞ্জন বসু। সেই অদ্ভুত হাসির অদ্ভুত শব্দ শুনে চমকে উঠলেন মহিমের মা। — কী হল?

নিরঞ্জন বসু সেইভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিলেন—সবই ফুরিয়েছে, মাত্র দশ টাকা দশ আনা আছে। দাহ করবার খরচ ওতেই হয়ে যাবে মনে হয়।

কী আশ্চর্য, সেই রাত্রিতে সারা আকাশ ভরে কোটি কোটি তারা যখন হীরের কুচির মত ঝিকঝিক করছে, তখন খুবই শান্ত ও মৃদুস্বরে মহিমকে নাম ধরে ডাক দিয়েই মরে গেলেন নিরঞ্জন বসু।

সেই নিরঞ্জন বসুর বড় ছেলে মহিমই হলেন আজকের এই মহিম বসু, রেলওয়ে কন্ট্রাক্টর, যাঁর বাড়ির গ্যারেজের দুটি গাড়ির চেহারা কোনও ক্যাডিলাকের চেহারার চেয়ে কম চকচক করে না। মহিম বসুর ছোট ভাই ধীরেন বসু এখন লণ্ডনের ডাক্তার; বোন দীপালি এখন মিরাটের ইরিগেশন

ইঞ্জিনীয়ার মিস্টার গুহ রায়ের গৃহিণী। দীপালির বিয়ের দু'বছর পর, মহিমের বিয়ের তিন বছর আগেই মা মরে গেলেন। মহিমের বিয়ের শুভদিনের উৎসবটাকে কল্পনা করে ছেলের বউয়ের সুন্দর একটি মুখও কল্পনা করেছিলেন মহিমের মা। সেই মুখের শোভার সঙ্গে চমৎকার মানাবে, এরকম লতাফুল ডিজাইন নিজেই ভেবে নিয়ে মুক্তোর একজোড়া দুল গড়িয়ে রেখেছিলেন। ব্যস্, ওই পর্যন্ত, ধীরেনের বউয়ের জন্যও একজোড়া মুক্তোর দুল এখনই গড়িয়ে রাখলে ভাল হয় বলে মনে করে যখন তিনি ডিজাইন ভাবতে শুরু করেছিলেন, তখন বুকের ভিতরের ব্যথাটা বেশ জোরে জোরে টোকা দিয়ে তাঁর নিঃশ্বাসের স্বস্তি ও শান্তি ধড়ফড়িয়ে দিতে শুরু করেছে। তাই আর সময় পাননি মা। দেয়ালের গায়ে নিরঞ্জন বসুর ছোট্ট পুরনো ফটোর সামনে যে আসনটি সব সময় পাতা থাকে, একদিন তারই উপর বসে অনেকক্ষণ জপ করবার পর শুয়ে পড়লেন মা। ঘুমিয়েও পড়লেন, কিন্তু আর জাগলেন না।

দমদমের এই বাড়ির শুধু চেহারাটা দেখে প্রতিবেশীদের মধ্যে যাঁরা মহিম বসুকে বুঝতে চেষ্টা করেন, তাঁরা খুবই ভুল করেন। তাঁরা জানেন না, তাঁদের জানবার কথাও নয়, যে ষাট বছর বয়েসের এই মানুষটি, যিনি গতবছর গ্রীষ্মের সময় সিমলাতে চলে যান, আর বাড়িতেও ধুতি-জামার বদলে সাহেবি কেতায় গাউন প্যান্টালুন পরে বসে থাকতে ভালবাসেন, তিনি পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের একটি রোগা মানুষের গেঞ্জি পরা চেহারার ফটোর কাছে দাঁড়িয়ে এখনও মাঝে মাঝে অভিমানী ছেলেমানুষের মত ফুঁপিয়ে ওঠেন আর চোখের জল মোছেন। আর একটা যে অভিমানের ব্রত মহিম বসুর জীবনে আজও আছে ও চলছে, তার খবর মহিমবাবুর স্ত্রী হেমলতা ছাড়া আর কেউ জানে না। এটা হল সাড়ে উনিশ বছর বয়সের মহিম বসুর একটি অভিমানের জের। বাবা যেদিন মারা গেলেন, সেদিন সকালবেলাতে এক বাটি দুধ দিয়ে বাবাকে অনেক সাধাসাধি করেছিলেন মহিম—কবরেজমশাই বলেছেন, তোমাকে দুধ খেতেই হবে। নিরঞ্জন বলেছিলেন—না রে বাবা, কবরেজ বললেও আমি একটা রাক্ষস হয়ে যেতে পারি না।

—কী বললে?

—বলছি, সামান্য এই দুধটুকু যদি আমিই খেয়ে ফেলি তো ভগবান আমাকে ক্ষমা করবেন না।

চেঁচিয়ে ওঠে মহিম।—বাজে কথা বলবে না। ভগবান তোমার মত বোকা নয় যে, ক্ষমা করবেন না।

খুব রাগ করে জবাব দিয়েছিলেন নিরঞ্জন বসু।—না। ভগবান বলবেন, তুই বেটা তোর রোগা-রোগা ছেলেমেয়েদের রক্ত খেয়েছিস।

তারপরেই বেশ শান্ত হয়ে আর মহিমের পিঠে হাত বুলিয়ে কথা বলেছিলেন সেই রুগ্ন আর জীর্ণ-শীর্ণ মূর্তির মানুষটি—আরে বোকা ছেলে, বুঝিস না কেন? আমিই যদি এই দুধটুকু খেয়ে ফেলি তো দীপ আর ধীরু কী খাবে? দুধটা ওদের দরকার, আমার নয়।

আশে-পাশে যত বাড়ি আছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে মাথাউঁচু বাড়ি হল মহিম বসুর এই রঙিন 'নিরঞ্জন'। বুঝতে কোনও অসুবিধা নেই যে, এটা বেশ বড় রকমের এক বড়লোকের বাড়ি। প্রতিবেশীদের অনেকের ধারণাতে একটা সন্দেহের প্রশ্নও আছে : এত টাকা কি এমনিতেই কখনও হতে পারে রে, বাবা? বেশ একটু এথি-ওথি না করে, বেপরোয়া হয়ে দু'চারটে দাঁও না মেরে,

রাতারাতি পাগড়ি বদল না করে. পাঁচরকমের কারসাজির করিৎকর্মা না হয়ে কেউ কি কখনও টাকার মালিক হতে পেরেছে?

হেমন্তবাবু কিন্তু কিছু খবর রাখেন। তাই শুধু তিনিই পাড়ার পরিচিত ছেলেদের চাকরিহীন জীবনের বিষাদ ও বিমর্ষতার নিন্দা করে মাঝে মাঝে অনেক উৎসাহের কথাও বলেন : এই যে মহিম বসু, তিনি যে একদিন কানপুরের এক পাঞ্জাবি ঠিকেদারের কাঠের গোলাতে বিশ টাকা মাইনের মুনশির কাজ করেছিলেন, সেকথা কি তোমরা জান? জান না। তাই তোমরা হা-হুতাশ করে ঘুরে বেড়াও। শুধু চেষ্টা খাটুনি আর প্রতিজ্ঞার জোরে, বাধাবিপত্তি আর পরীক্ষার অনেক আঘাত সহ্য করে, লাইন মেরামতের কুলিসর্দারির অবস্থা থেকে উঠতে উঠতে শেষে একদিন রায়না নদীর ব্রিজের মত অত বড় একটা ব্রিজ তৈরির কন্ট্রাক্টর হয়েছিলেন মহিমবাবু। আজ দেখো, যে মহিমবাবু একদিন মহাজনের কাছ থেকে ধার-করা সামান্য টাকার পুঁজি নিয়ে রেলওয়ের ঠিকেদারি কারবার শুরু করেছিলেন, তিনি এখন কী বিরাট একজন ধনী মানুষ। কী সুখের সংসার! রূপে-গুণে শিক্ষায় যেমন তাঁর ছেলেটি, তেমনই তাঁর মেয়েটি, দু'জনেই কত সুন্দর, কত চমৎকার। তোমরা মনে কর : মহিমবাবুর ছেলে ওই বিকাশ শুধু চকচকে মোটরগাড়ি হাঁকিয়ে ছুটোছুটি করে। তোমরা জান না যে ওই বিকাশ মাসের মধ্যে সাতদিন মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলের ভিতরে নতুন লাইন তৈরির কাজে যখন তাঁবুর ভিতরে থাকে, তখন শুধু শুকনো চিঁড়ে চিবিয়ে একটানা সাতটা দিন পার করে দেয়। রান্নাকরা একথালা ডাল-ভাতও কপালে জোটে না। আর, ওই যে মেয়ে, মহিমবাবুর একমাত্র মেয়ে সুপ্রভা, যার পিয়ানোর শব্দ তোমরাও শুনেছ, তার সম্বন্ধে তোমরা বোধ হয় শুধু এইটুকু জান যে, সে মেয়ে ফিলসফিতে এম-এ পাস করে এখন শুধু পিয়ানো বাজায়। একবার তোমাদের মাসিমাকে জিজ্ঞাসা করবে, তাবেই জানতে পারবেস, সুপ্রভা তোমাদের পাড়ার এইসব গীতা আর মিতাদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি কাজের মেয়ে। রান্নার লোক থাকলেও বাড়ির দু'বেলার জলখাবার নিজের হাতে তৈরি করে সুপ্রভা। উচ্ছের সুক্তো থেকে শুরু করে দোগোস্তো কারি আর বিরিয়ানি-পোলাও পর্যন্ত সবই রান্না করতে জানে, পারে, আর করেও থাকে ওই পিয়ানো-বাজানো মেয়ে। তোমাদের মাসিমা নিজের চোখে দেখেছেন, প্রায় বিশরকমের আচার ও মোরব্বা তৈরি করে আর বয়ম-ভর্তি করে আলমারিতে সাজিয়ে রেখেছে সুপ্রভা। মহিমবাবুকে যে শাল গায়ে জড়িয়ে বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে তোমরা দেখতে পাও, সেই শালের ওপর রেশমিসুতোর নকশাগুলি সুপ্রভারই হাতের কাজ। আর দু'মাস ধরে প্রায় রোজই যে চমৎকার একটি ক্যাডিলাক মহিমবাবুর বাড়ির ফটকে এসে থামে, সেটা যে....।

এই পর্যন্ত বলেই থেমে গেলেন হেমন্তবাবু। ছেলেদের সঙ্গে ওই চমৎকার ক্যাডিলাকের কথা আলোচনা না করলেও চলে, না করাই উচিত।

ওই ক্যাডিলাক রোজই সন্ধ্যায় কোথা থেকে আর কতদূর থেকে এখানে আসে আর চলে যায়, সেটা অবশ্য প্রতিবেশীদের কেউই জানেন না। শুধু হেমন্তবাবু জানেন যে, বালিগঞ্জ থেকে আসে। কোন বাড়ির গাড়ি, কাদের গাড়ি, তাও তিনি জানেন। কিন্তু কারও কি বুঝতে কিছু বাকি আছে? সকলেই বুঝেছে, মহিম বসুর মেয়ে সুপ্রভার ভালোবাসার টানে গাড়িটা আসে। গাড়িটাকে চালিয়ে নিয়ে আসে যে, যার বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বলে মনে হয়, তার নাম কেউই জানে না, হেমন্তবাবু অবশ্য জানেন। তাকে যেদিন প্রথম দেখতে পেয়েছিলেন হেমন্তবাবুর স্ত্রী শৈলবালা, সেদিন তিনি

বেশ বিগলিতস্বরে তাঁর বিস্ময়ের কথাটা বলেই ফেলেছিলেন। —এ যে সত্যিই একটি রূপকুমার।

নিজেরই বাড়ির ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে প্রথম দিনের সেই দৃশ্যটি দেখতে পেয়েছিলেন শৈলবালা। বিকালবেলা চকচকে একটা গাড়ি এসে মহিমবাবুর 'নিরঞ্জনের' ফটকের কাছে থেমেছে, একজন বিধবা মহিলা গাড়ি থেকে নামছেন। খুব হাসি-খুসি দুটি চোখ, বেশ সুদর্শন একটি ছেলেও গাড়ি থেকে নামল। মহিমবাবুর স্ত্রী হেমলতা এগিয়ে এসে মহিলাকে প্রণাম করতেই হেমলতাকে জড়িয়ে ধরলেন সেই বিধবা মহিলা।

এরা কি মহিমবাবুর কুটুম্ব? কিংবা নিতান্ত নিমন্ত্রিত দুটি মানুষ? সেই প্রথম দিনে এরকমের দুটি একটি প্রশ্ন হেমন্তবাবুর স্ত্রী শৈলবালার মনে দেখা দিয়েছিল বটে, কিন্তু আজ আর ওরকমের কোনও প্রশ্ন নেই। আজ শুধু প্রশ্ন, বিয়েটা কবে হবে?

বিয়ে এখনও হয়নি, শুধু মেলামেশা চলছে, এরকমের একেলে অভিরুচির কাণ্ড-কারখানা তাঁর চোখে ঘোর অনাচার বলে বোধ হয়ে থাকে, তিনিও অর্থাৎ চারু ডাক্তারের মা'ও চকচকে ক্যাডিলাকের দিকে রাগের চোখ নিয়ে তাকাতে পারেন না। তিনি বলেন, সুপ্রভার মত মেয়ের সঙ্গে এরকমের সুন্দর ছেলেকে যে খুবই ভাল মানায়, সেটা তো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না? তুমি না, আমিও না।

দমদমের মহিম বসুর মেয়ে সুপ্রভার সঙ্গে বালিগঞ্জের চমৎকার ছেলে সন্দীপ রায়ের মেলামেশা আর কথাবার্তার যে আনন্দ এই 'নিরঞ্জন'-এর ড্রইংরুমের ভিতরে রোজ সন্ধ্যায় উচ্ছলিত হয়ে ওঠে, সে আনন্দ সৌভাগ্যের আকস্মিক দান বলে মনে করেন মহিমবাবু, মনে করেন হেমলতা। সুপ্রভার দাদা বিকাশও তাই মনে করে। সন্দীপের বাবা মাধব রাও আজ আর বেঁচে নেই। তিনি বিগত হয়েছেন আজ থেকে প্রায় ন'বছর আগে। মাধব রায়ের মৃত্যুর ঘটনাটা করুণ ছবির মত এখনও মাঝে মাঝে মহিমবাবুর মনের ভিতরে ভেসে ওঠে।

মাধব রায় নিজের গুণে ও কৃতিত্বে একটা দুঃস্থ লোন অফিসকে বিশ বৎসরের মধ্যে সুস্থ ও সম্পন্ন করে বিপুল আমানতের যে ব্যাঙ্কটি গড়ে তুলেছিলেন, সেই ব্যাঙ্কেরই অফিস থেকে একদিন টেলিফোনে মহিমবাবুকে তিনি ডেকেছিলেন—'আপনি আজ বিকেলের মধ্যে একটু সময় করে নিয়ে আমার অফিসে একবার আসুন! সামান্য পরিচয়ের জোরেই এত বড় একটা অনুরোধ করে ফেললাম। কিছু মনে করবেন না। আপনার কাছে আমি কাজ-কারবারের কথা বলব না, টাকা-পয়সার কথাও বলব না। আমি আপনার কাছে শুধু আমার একটা আশার কথা বলব।' ব্যাঙ্কের অফিসে মাধব রায়ের চেম্বারে ঢুকেই দেখতে পেয়েছিলেন মহিমবাবু, টেবিলের উপর নীরব ও নিস্পন্দ মাধব রায়কে শুইয়ে রাখা হয়েছে। সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ মাথা ঝুঁকিয়ে তিনি চেয়ার থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তার এসে দুঃখিতস্বরে বললেন, প্রাণ নেই।

মহিমবাবু সেদিনও হেমলতার কাছে পূর্বস্মৃতির নানা কথা বলতে গিয়ে মাধব রায়ের কথাও বলেছেন—আমার ষাট বছরের জীবনে আমি সন্দীপের বাবা মাধব রায়ের মত সৎ ও সজ্জন মানুষ খুব কমই দেখেছি। আমি এখনও মাঝে মাঝে ভাবি, মাধব রায় তাঁর কোন আশার কী কথা আমাকে বলতে চেয়েছিলেন?

সন্দীপের মা চারুশীলাও হেমলতার কাছে নিতান্ত অজানা কোনও নতুন মানুষ নন। হেমলতা যখন বেথুনে আই-এ পড়তেন, চারুদি তখন বি-এ পড়তেন। কী সুন্দর গান গাইতেন চারুদি।

কিন্তু সেজন্য চারুদির মেজাজে সামান্য একটুও অহংকার ছিল না। বললেই গান শুনিয়ে দিতেন।

এই তো সেদিন, বেলুড়ের উৎসব দেখতে গিয়ে চারুদির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

সৌভাগের কোনও ইঙ্গিত না থাকলে এক যুগ আগের দেখা ও চেনা চারুদিকে আবার হঠাৎ দেখতে পাওয়া যাবে কেন? শুনে আশ্চর্য হলেন আর খুশি হয়ে বললেন চারুদি—তুমিই মহিমবাবুর গৃহলক্ষ্মী?

হেমলতা বলেন—আমার এক ছেলে আর এক মেয়ে। ছেলের বিয়ে হয়নি, মেয়েরও বিয়ে হয়নি।

চারুশীলার দুই চোখ যেন হঠাৎ-আলোর আভা লেগে হেসে ওঠে।—মেয়ে নিশ্চয় তোমার মত সুন্দর?

হেমলতা—আপনার মত সুন্দর নয়।

চারুদির হাত ধরে অনুরোধ করেছিলেন হেমলতা—কথা দিন, আমাদের বাড়িতে একদিন আসবেন। তবে বিশ্বাস করব যে, আপনি সত্যিই আমাদের সেই চারুদি।

কথা দিয়েছিলেন চারুশীলা। আর বোধ হয় সেই কথারই মান রাখবার জন্য দু'দিন পরে এ বাড়িতে এসে হেমলতাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। কিন্তু সুপ্রভার মুখের দিকে তাকাতেই তাঁর খুশি-চোখের দৃষ্টিটা বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল। তিনি যেন তাঁর মনের ভিতরে একটা প্রশ্নের গুঞ্জন শুনছিলেন—এ কী সত্যিই একটা সৌভাগ্যের ইঙ্গিত?

চারুশীলা বলেছিলেন—আমি তো আর গাইতে পারি না, হেম। আমি বরং তোমার মেয়ের গান শুনব।

'তোমারই রাগিনী জীবনকুঞ্জে', সুপ্রভার গান শুনে খুব খুশি হলেন চারুশীলা—তোমার কি মনে পড়ে হেম, শকুন্তলাদির ফেয়ারওয়েল সভাতে আমি এই গানটি গেয়েছিলাম।

হেমলতা—খুব মনে পড়ে।

সন্দীপকে দেখে হেমলতার চোখের বিস্ময়টাও কিছু কম নিবিড় হয়ে ওঠেনি। সুপ্রভার জন্য এইরকম একটি পাত্রই তো আশা করেন হেমলতা। মহিমবাবুর মনেও নিশ্চয় এইরকম আশার গুঞ্জন জেগেছিল, নইলে তিনি কেন সন্দীপের হাত ধরে বাগানের কাছে ঘুরে বেড়িয়ে এত গল্প করলেন?

সন্দীপের মুখের দিকে না তাকিয়ে, সন্দীপের দু'চারটে কথার জবাব দিতে গিয়ে সুপ্রভাব মুখটা বার বার লালচে হয়ে উঠেছিল। সেদিন স্পষ্ট করে বুঝে উঠতে না পারলেও, আজ খুবই স্পষ্ট করে বুঝতে পারে সুপ্রভা, তার আশার লজ্জাটাই সেদিন ধরা পড়ে যাবার ভয়ে শিউরে উঠেছিল।

পরের দিন সন্ধ্যা হতেই সন্দীপের ক্যাডিলাখ যখন এসে বাড়ির গেটের কাছে থেমেছিল, তখন সুপ্রভার ভীরু আশার বুকটা আর-একবার শিউরে উঠেছিল। কী আশ্চর্য! সত্যিই তো, সন্দীপবাবু এসেছেন। কেন এসেছেন? বাবার সঙ্গে ব্যাঙ্কের অবস্থার কথা নিয়ে আলোচনা করবার জন্য? চারু-মাসিমার কাছ থেকে নেমন্তন্নের চিঠি নিয়ে এসেছেন ভদ্রলোক? বাবা আর মা, দু'জনের কেউই তো এখন বাড়িতে নেই। কী বিপদ, কে এখন সন্দীপবাবুর সঙ্গে কথা বলবে?

কিন্তু বিপদ কাটাবার তো কোনও উপায় নেই। লজ্জা ভীরু প্রাণটাকে একটু সাহসী করে নিয়ে

আর হেসে হেসে এগিয়ে এসে বারান্দার উপর দাঁড়ায় সুপ্রভা। —আসুন, কিন্তু মাসিমা এলেন না কেন?

সন্দীপ হেসে ফেলে—আপনার মাসিমার তো আসবার কথা ছিল না।

সুপ্রভাও হেসে ফেলে—আপনারও আসবার কোনও কথা ছিল না।

—না, কিন্তু না এসে পারলাম না। আসতে বাধ্য হলাম।

—কেন?

—তোমাকে আর একবার দেখবার জন্য।

চমকে ওঠে সুপ্রভা। মাথাটা ঝুঁকে পড়ে। কোনও কথা আর বলতে পারে না সুপ্রভা। একটা বোবা মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সন্দীপ হাসে।—ড্রইংরুমের ভিতরে কি আমার প্রবেশ নিষেধ?

—না না, সে কী কথা? আপনি ভুল বুঝবেন না। বদ্ধ নিঃশ্বাসটাকে মুক্ত করে দিয়ে কথা বলে সুপ্রভা।

ড্রইংরুমের ভিতরে ঢুকেও দাঁড়িয়ে থাকে সন্দীপ। কোচের উপর বসে না। সুপ্রভা বলে—বসুন।

সন্দীপকে তবু দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুপ্রভা হাসতে চেষ্টা করে।—অন্তত ততক্ষণ বসুন, যতক্ষণ না আমি চা নিয়ে আসি।

সন্দীপ—ভাল কথা, বসছি।

চা নিয়ে আসে সুপ্রভা। চা খেয়ে উঠে দাঁড়ায় সন্দীপ—তোমার যদি ইচ্ছে না থাকে, যদি ভাল না লাগে, তবে এখনই বলে দাও সুপ্রভা।

সুপ্রভা—কী বললেন?

সন্দীপ—তুমি যদি মনে কর যে, আমার আর আসা উচিত নয়, তবে আমি কোনওদিনও আসব না।

সুপ্রভা—সে কথা আমি বলতে পারি না। আমি বরং বলব যে...।

সন্দীপ—বলো।

সুপ্রভা—আপনি যদি মনে করেন যে, এখানে আপনার আসা উচিত, তবে আসবেন।

সন্দীপ—আমি তো মনে করি আসা উচিত।

সুপ্রভা আবার মাথা হেঁট করে, কার্পেটের নকশার ফুলগুলির দিকে তাকিয়ে কথা বলে—তবে আসবেন।

—তোমার আপত্তি নেই?

—না।

সেদিন সন্দীপ চলে যাবার পর ড্রইংরুমের দরজার পর্দাটাকে এক হাতে আঁকড়ে ধরে, অনেকক্ষণ এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে যেন মনের ভিতরের একটা উতলা আবেগের ভার সহ্য করবার চেষ্টা করেছিল সুপ্রভা। বুঝতে তো কিছু আর বাকি নেই, কেন এখানে আসতে চায় সন্দীপ; আর সুপ্রভাকে দেখবার জন্য সন্দীপের ইচ্ছেটাই বা এত আকুল হয়ে উঠেছে কেন? আর বেশি প্রশ্ন না করে ভালই করেছে সুপ্রভা। কুয়াশা সরে গিয়েছে, ভোরের আকাশের আলো বেশ স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তবে আর কিসের প্রশ্ন?

ভদ্রলোক বোধহয় কিছু রেখে ঢেকে কথা বলতে পারেন না। ভদ্রলোকের ইচ্ছার ভাষাটা বড় বেশি স্পষ্ট। হলই বা, সেজন্য এত চমকে ওঠবার কোনও মানে হয় না। ভালবাসার প্রাণ অনেক হিসেব করে, অনেক দেরি করে আর রেখে-ঢেকে কথা বলবে, এরকম কোনও নিয়ম আছে কি? সবারই জীবনেরই সাধ-অসাধ কি একই নিয়মে চলে?

গল্প শুনেছে সুপ্রভা, ব্যাধের বাঁশির শব্দ শুনে বনের হরিণ মুগ্ধ হয় আর ছুটে আসে। কিন্তু সন্দীপের কথাগুলিকে ব্যাধের বাঁশির শব্দ বলে সন্দেহ করবার তো কোনও মানে হয় না। সন্দীপ যে ঘরের ছেলে, সে ঘর মাধব রায়ের মত সৎ ও সজ্জন মানুষের স্মৃতি দিয়ে আর চারু-মাসিমার মত মানুষের সরল মনের মায়া দিয়ে তৈরি করা ঘর। বাবা আর মা যে তাঁদের মেয়ের জীবনের জন্য এইরকম একটি ঘর পছন্দ করেন, সেটা বাবা আর মার কথাবার্তার ভাষাতে বার বার অনেকবার শুনতে পেয়েছে সুপ্রভা। সন্দীপকে দেখতে পেয়ে বাবা আর মার চোখে খুশির উচ্ছ্বাস দেখে বুঝতে পেরেছে সুপ্রভা, সন্দীপকে তাঁরা পছন্দ করেই ফেলেছেন।

নিজের ইচ্ছেটাকেও কি চিনতে আর বুঝতে কিছু বাকি আছে? না, একটুও না। সেদিনই, প্রথম দেখার দিনেই মনে হয়েছিল সুপ্রভার : এইরকম একটি মানুষ যদি অন্তত মুখের দুটো কথা দিয়ে সুপ্রভাকে ভালোবাসে, তবে সুপ্রভা তাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসার সাহস পেয়ে যাবে। তাই তো হল। সন্দীপ যে ভাষায় যতটুকু কথা বলেছে, তাই যথেষ্ট। সুপ্রভার প্রাণটা এখন নির্ভয়ে, নির্ভয়ে কেন, অনেক সাহস নিয়ে সন্দীপকে যদি ভালবাসতে পারে, তবে ভালই হবে।

পিছনে পায়ের শব্দ শুনে চমকে ওঠে, তারপর হেসে ফেলে সুপ্রভা। বাবা আর মা ফিরেছেন। ভেলভেটের পর্দাটাকে হাতের দোলায় দুলিয়ে দিয়ে কথা বলে সুপ্রভা। —সন্দীপবাবু এসেছিলেন, এই কিছুক্ষণ আগে চলে গেলেন।

হেমলতা—কী আশ্চর্য, সন্দীপ সত্যিই তবে এসেছিল!

মহিমবাবু—সন্দীপ একাই এসেছিল?

সুপ্রভা—হ্যাঁ।

হেমলতা—চারুদি ভাল আছেন?

সুপ্রভা—সে কথা তো জিজ্ঞাসা করিনি।

মহিমবাবু হাসেন—জিজ্ঞাসা করতে হয়।

সুপ্রভা—বলে গেলেন, আবার আসবেন।

হেমলতা—আসুক না। ভালই তো। শুধু আমরা কেন, সবাই বলবে ভাল হল। কিন্তু তোর কি কোনও আপত্তি আছে?

সুপ্রভা—না।

সুপ্রভার পিঠে হাত বুলিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন হেমলকতা। তারপর সুপ্রভার কপালে একটা চুমো দিলেন।

দুই

ছোট্ট স্প্যানিয়েলের বকলসের ঘুঙুর টুং-টুং করে বাজে। কাডিলাকের হর্নের শব্দ শুনেই ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয়ে আসে। গেট পর্যন্ত এগিয়ে যায়। তারপর সন্দীপের আগে আগে গুট গুট করে হেঁটে আবার ফিরে আসে, ড্রইংরুমের ভিতরে ঢোকে। তারপর সুপ্রভার মুখের দিকে

একবার তাকিয়ে নিয়েই চলে যায়।

সন্ধ্যা হতেই, আর সন্দীপের এসে পৌঁছবার সময় হবার আগেই, ড্রইংরুমের ভিতরে এসে কোচের উপর চুপ করে বসে থাকতে গিয়ে সুপ্রভার মুখে যে হাসি আর যে লজ্জার আবেগ ফুটে ওঠে, ছোট্ট স্প্যানিয়েল যেন তারই ছবির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আর খুশি হয়ে চলে যায়।

একদিন, দু'দিন, পরপর চারদিন স্প্যানিয়েলের উৎসাহের রকম দেখে আরও লজ্জা পেয়েছিল সুপ্রভা। মুখের ওপর রুমাল চেপে ধরেও সেই লজ্জার হাসিটাকে লুকোতে পারেনি। দেখে ফেলেছিল সন্দীপ। খুব খুশি হয়ে সন্দীপও হেসেছিল। —বাঃ, তোমাদের স্প্যানিয়েলকে বেশ জ্ঞানী ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু শুধু চারটে দিন, তারপর আর নয়। এই দু'মাসের মধ্যে আর কোনও একটি সন্ধ্যাতেও না। ক্যাডিলাকের হর্ণ বেজে উঠলেও ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয়নি এই স্প্যানিয়েল। একবারও, একটু উঁকি দিয়ে তাকিয়েছে কিনা সন্দেহ।

সন্দীপ জিজ্ঞাসা করেছে—কই, জ্ঞানী ব্যক্তিটি কোথায় গেল? আর দেখতে পাই না কেন?

সুপ্রভা—বোধ হয় বাবার ঘরের ভিতরে বসে আছে।

সন্দীপের কথার জবাব দিতে গিয়ে আজ বেশ জোর করে একটু হাসতে চেষ্টা করে সুপ্রভা। সেই প্রথম দিনে কিন্তু কোনও চেষ্টাই করতে হয়নি। স্প্যানিয়েলের কাণ্ড দেখে সেদিন যেন সুপ্রভার জীবনের রঙিন আশার হাসিটা মুক্ত ফোয়ারার মত স্বচ্ছন্দে উথলে উঠেছিল। কিন্তু আজ....।

সন্দীপ নিশ্চয় ভুলে গিয়েছে, ঠিক কবে আর কখন ড্রইংরুমের ভিতরে হঠাৎ ঢুকে, আর সুপ্রভার কোলের উপর দুই পা তুলে দিয়ে সুপ্রভার গম্ভীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল ছোট্ট স্প্যানিয়েল। তারপর সেই যে তিনটে লাফ দিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল তো চলেই গেল, আর ফিরে এল না। সন্দীপ থাকতে আর কোনওদিন ফুর্তির টুং-টুং শব্দ বাজিয়ে ড্রইংরুমের ভিতরে ঢোকেনি ওই স্প্যানিয়েল।

এই বাড়ির উদার অভ্যর্থনার অতিথি সন্দীপ রায় যে তিন সন্ধ্যে না ফুরোতেই এরকম একটা অদ্ভুত কথা এত স্পষ্ট করে এই বাড়ির মেয়েকে শুনিয়ে দিতে পারে, এ সন্দেহ সুপ্রভার ধারণা-কল্পনার একটা অন্ধকার কোণের মধ্যেও ছিল না।

হঠাৎ বলে উঠেছে সন্দীপ—যাই মনে কর সুপ্রভা, একটা সত্য কথা আমি বেশ স্পষ্ট করে বলে দেব তোমরা মনে প্রাণে কিন্তু খুবই সেকেলে মানুষ।

চমকে ওঠে সুপ্রভা, মুখের হাসিটা ফিকে হতে হতে শেষে একেবারেই মিলিয়ে যায়।

কোনও কথা বলে না সুপ্রভা। সন্দীপ কিন্তু কথা বলতেই থাকে—ভাল বল আর মন্দ বল, আমি কিন্তু দেহে-মনে-প্রাণে এক আস্ত একেলে।

সুপ্রভার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে সন্দীপের সুন্দর মুখের উজ্জ্বল দুটি চোখ আরও উজ্জ্বল হয়ে হাসতে থাকে। —তাই বলে আমাকে একটা রহস্য-মানুষ বলে মনে করো না। আমিও মানুষকে ভালবাসতে পারি। শ্রদ্ধা মায়া মমতা আর কৃতজ্ঞতা, আমারও প্রাণে আছে। কিন্তু সেগুলি আমার নিজের যুক্তি বুদ্ধি বিশ্বাস আর অভিরুচির জিনিস। তোমরা যাকে মায়া বল, আমার মায়া ঠিক সেরকমটি না হতেও পারে।

মনে আছে সুপ্রভার, তখনই কোথা থেকে ছুটে এসে ছোট্ট স্প্যানিয়েল ঘরের ভিতরে ঢুকেছিল।

বেশ কিছুক্ষণ সুপ্রভার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর চলে গেল। তখনও কথা বলেই চলেছে সন্দীপ। হঠাৎ, কী আশ্চর্য, কথা বলতে গিয়ে সন্দীপের গলার স্বর বেশ তীব্র উঠেছে। —এত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন সুপ্রভা? কোনও কথা বলছ না কেন? আমার কথাগুলি শুনতে তোমার বোধ হয় খারাপ লাগছে।

সুপ্রভা—বুঝতে পারছি না, আপনি কী বোঝাতে চাইছেন।

—সন্দীপ হাসে। —শুধু এইটুকু বোঝাতে চাইছি যে তুমি ভুল করে আমাকে যেন ভুল বুঝে না ফেল।

—একথা আপনার মনে হল কেন?

—এটা আমার ঠিক মনের কথা নয়, সুপ্রভা, এটা আমার মনের একটা ভয়ের কথা। আমার ভয়, তুমি হয়ত আমাকে ভুল বুঝবে, বুঝতে ভুল করবে, আর সন্দেহ করবে যে, সন্দীপ রায় বোধ হয় একটা খুব অদ্ভুত মানুষ, কিংবা একটা হামবাগ।

সুপ্রভা—না, আমি ওরকম সন্দেহ করি না।

সন্দীপ—ব্যস, তোমার এই সামান্য একটু অঙ্গীকারই আমার কাছে যথেষ্ট। আমার আশা ছিল, তোমাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল, আমার জীবনটা তোমার কাছে থকে সেই সান্ত্বনা পেয়ে যাবে, নিশ্চয় পাবে; যে সান্ত্বনা পাওয়ার জন্য ঘুমের মধ্যে আমার স্বপ্নও ছটফট করে।

কথা থামিয়ে হাতঘাড়ির দিকে তাকায় সন্দীপ। সুপ্রভা বলে—একটু বসুন। এখনই যাবেন না। আমি চা নিয়ে আসি।

—না। চায়ের জন্য আমি এখন তেমন কিছু তৃষ্ণার্ত নই। আমাকে এখনই যেতে হবে চক্রবর্তীর আর্ট এগজিবিশন দেখতে। আমি এখন একটু মিষ্টি চিত্ররসের জন্য তৃষ্ণার্ত।

সুপ্রভা—আসুন তবে।

সন্দীপ—আসুন বলো না। বলো, চলুন।

সুপ্রভা—ঠিক বুঝতে পারছি না, কী বলছেন।

সন্দীপ—তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।

সুপ্রভা—না।

সন্দীপ—কেন?

—না, তা হয় না।

—ছবি দেখতে কি তোমার ভাল লাগে না?

—ভাল লাগে বইকি।

—তবে আপত্তি করছ কেন।

সন্দীপের প্রশ্নের উত্তর দেয় না সুপ্রভা। হেসে ফেলে সন্দীপ। —এইবার বুঝতে পারছ, কেন আমি বলেছি যে, তোমরা মনে-প্রাণে সেকেলে, যদিও তোমাদের বাড়ির দোতলার ঘরে একটা পিয়ানো আছে?

সুপ্রভা—শুধু আছে বলছেন কেন? পিয়ানোটা বাজেও তো।

—হ্যাঁ জানি, সে পিয়ানো তুমিই বাজাও। কিন্তু কী সুর বাজাও? নারদ মুনির তৈরি যত বিটকেলেমির রামকেলি আর টোড়ি কিংবা নোটন-নোটন-পায়রাগুলি। এই তো।

—আপনি পিয়ানো বাজালে কী সুর বাজাবেন?

—পিয়ানো বাজাতে আমি জানি না। জানলে হয় একটা মুনলাইট-সোনাটা, নয়ত স্ট্রাউসের ব্লু-ডানিউব বাজাতাম।

হেসে ফেলে সুপ্রভা—জানলে খুব ভাল করতেন।

—কিন্তু, তুমি কি সত্যিই আমার সঙ্গে যাবে না?

—না।

—সেটা তো আপনি জেনেছেন।

—অ্যাঁ? কী জেনেছি?

—আমরা মনে-প্রাণে সেকেলে।

—হ্যাঁ, কিছু মনে করো না, আমার মনে এরকম একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। এখন বুঝতে পারছি...

কথা থামিয়ে আর গলার রঙিন টাইয়ের নিখুঁত গেরোটার উপর হাত বুলিয়ে হাসতে থাকে সন্দীপ। ঠিকই, সন্দীপের মুখের হাসিটা যেন হঠাৎ -জোৎস্নার ঝলকের মত উথলে উঠেছে, আর চোখদুটোতে নিবিড় এক মায়ার আবেশ ছড়িয়ে দিয়েছে। নারী হোক বা পুরুষ হোক, যে কেউ মানুষ এখন সন্দীপের এই সুহাসিত মুখের ছবিটাকে দেখলে মনে করতে পারে, এই চমৎকার সুন্দর চেহারার মানুষটি তার বুকের ভিতরে বুঝি একটা চাঁদ পুষে রেখেছে। এই মানুষ যদি বনের একটা হরিণ হত, তবে তার দুই চোখের এই জ্যোৎস্নাময় আবেশের কাছে কোনও হরিণী বোধ হয় আত্মহারা না হয়ে পারত না।

সন্দীপ বলে—আমি তোমাকে ভালবাসি বলেই ডাকছি, চলো। একবার মাত্র পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে চক্রবর্তীর আঁকা ছবির এগজিবিশন্ দেখে নিয়ে, তারপর সোজা খিদিরপুর ডক। আমার পাশে দাঁড়িয়ে তুমি দেখবে, জলের উপর জাহাজের ছায়া পড়ে কী অদ্ভুত ইলিউশন সৃষ্টি করেছে। মনে হবে, ওই জাহাজটা যেন একটা মিথ্যে মায়া, আর ছায়াটাই সত্যিকারের একটা জাহাজ।

দেখতে পায় সন্দীপ, দুই চোখ অপলক করে তারই মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সুপ্রভা। আবার হাতঘড়ির দিকে তাকায় আর তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট ধরায় সন্দীপ, যেন একটা পুলকিত ব্যস্ততার আবেগে ছটফট করে।—চলো, আর দেরি করা উচিত নয়। যদি ইচ্ছে কর, তবে তোমার বাবা আর মাকে একটু বলে এসো। আমি বলি, এত বলাবলিরই বা কী দরকার? তুমি তো একটা বাজে অন্ধকারের হাত ধরে আরও বাজে অন্ধকারের মধ্যে ছুটোছুটি করবার জন্য যাচ্ছ না। যাচ্ছ, আমার সঙ্গে, আমার হাত ধরে, জীবনের একটা আনন্দ আর আলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে।

সুপ্রভা বলে—না।

সন্দীপ—তুমি তো ফিলসফি নিয়ে এম-এ পাস করেছ!

—হ্যাঁ।

—তবে তোমাদের ইণ্ডিয়ান ফিলসফির কিছু থিওরির কথা নিশ্চয় পড়েছ?

—কিছু কিছু।

—তোমাদের উপনিষদ কি একথা বলে যে, আকাশে যদি আনন্দ না থাকত, তবে কে আকাশকে চাইত?

—হ্যাঁ, বলেছে।

—তবে?

—তবে কী?

—তবে, একথাও কি বলা যায় না যে, যদি আকাশের চারিদিকে পাঁচিল থাকত, তবে আকাশকে কে চাইত?

—বলা যেতে পারে।

—তবেই বোঝো। জীবনের চারিদিকে যদি পাঁচিল থাকত, তবে জীবনকে কেউ চাইত না। ঠিক কথা কি না?

—ঠিক কথা বলেই তো মনে হয়।

—তাই বলছি, ঘরের মধ্যে বন্ধ হয়ে পড়ে থাকতে নেই। চলো, বাইরে একটু বেড়িয়ে আসি।

—না, তা হয় না।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে সন্দীপ। —আচ্ছা। তোমার যখন এতই আপত্তি, তখন আমার আর কিছু বলার নেই। আমি এখন চলি।

চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েও আবার দাঁড়িয়ে পড়ে সন্দীপ। সিগারেটের ধোঁয়ার একটা ফুরফুরে কুণ্ডলি হেলেদুলে বাতাসে ভাসছে; তারই দিকে তাকিয়ে আর খুব মৃদুস্বরে, যেন নিজেরই মনের কাছে একটা ব্যথার বিস্ময় নিবেদন করে। —আমার নিজের জন্যে নয়, তোমারই জন্যে আমি তোমাকে একটা আনন্দের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম।

সুপ্রভা কিন্তু একেবারে নীরব আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সন্দীপও বোধ হয় বুঝতে যে, না, ওই স্তব্ধতা কোনও আবেদনের কোনও করুণতায় বিচলিত নয়। পিয়ানো-বাজানো এই মেয়েকে সেকেলে ভীরুতার একটি নিরেট মূর্তি বলে মনে হয়। সন্দীপের মত একেলে অভিরুচির মানুষ, তার সেকেলে ভীরুতার একটি নিরেট মূর্তি বলে মনে হয়। সন্দীপের মত একেলে অভিরুচির মানুষ, তার ভালবাসার আশার পথে এরকম একটি মূর্তিকে দেখতে পাবে বলে বোধ হয় কোনওদিনও কল্পনা করেনি। সন্দীপের এতগুলি কথার কোনও একটির কথার আবেদনেও কি সাড়া দিল সুপ্রভা? সন্দীপের ইচ্ছা ও চেষ্টার সব ভাষা, সব চমক আর সব কৌতুক ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। তবু, সন্দীপ যেন আজই এই মুহূর্তে সব শূন্য করে দিতে চায় না। তার আশার স্বপ্নটাকে এখনও ধরে রাখতে চায়। সহজে শিথিল ও অলস হয়ে যাবে, এমন ধাতু দিয়ে তৈরি হয়নি সন্দীপের প্রাণ।

সন্দীপ বলে—গ্রিক গল্পের সেই গালাশিয়া জীবন্ত নারী নয়, আইভরির তৈরি একটি নারীমূর্তি, নিতান্ত একটি জড়বস্তু ; সেও পিগম্যালিয়নের ব্যাকুল আবেদনের কথায় সাড়া দিয়ে কথা বলেছিল। তুমি কিন্তু আর একটিও কথা বলছ না সুপ্রভা। আমি চলে যাচ্ছি দেখেও কি আমাকে একটি কথা বলবার দরকার তোমার নেই?

সুপ্রভা—কিছু মনে করবেন না। বুঝতে পারছি না, আমি আপনাকে কী কথা বলতে পারি।

সন্দীপ—বেশ তো, আজ এখনই না বলতে পার, কাল বাদে পরশু তো বলতে পারবে? আচ্ছা, আসি এখন।

তিন

দেখে আশ্চর্য হয়েছে সুপ্রভা, নিয়মিতভাবে একটি সন্ধ্যা বাদ দিয়ে পরের সন্ধ্যায় বালিগঞ্জের ক্যাডিলাক ঠিক সময়ে এসে ফটকের আলোর কাছে দাঁড়িয়েছে। সুপ্রভার ধারণাটা মিথ্যে হয়ে গিয়েছে, সত্য হয়েছে সন্দীপের কথা। সন্দীপ এসেছে।

এই দু'মাসের মধ্যে এইভাবে কতবারই তো এসেছে আর চলে গিয়েছে সন্দীপ। কিন্তু ড্রইংরুমের ভিতরে দু'জনের মেলামেশার যে-কে-সেই অবস্থার কিছু নড়চড় হয়নি। দৃশ্যের মধ্যে নতুন কোনও আলো বা ছায়ার সম্পাত ঘটেনি। সন্দীপ অবশ্য অনেক নতুন কথা বলেছে, তার প্রায় সবই একটা স্বপ্নময় আকুলতার কথা। বলতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করেনি সন্দীপ : তুমি দূরে সরে যেতে চাইলেও আমি দূরে সরে যেতে পারব না। আমি আসবই, না এসে পারব না।

শুনে চমকে উঠছে সুপ্রভা। নীরব আর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে পারলেও, সুপ্রভার বুকের ভিতরে যেন একটা ভয়ের ছায়া চমকে ওঠে। মা আর বাবা, দু'জনের কেউই এখনও জানে না যে, সন্দীপ রায়ের জন্য তাঁদের মেয়ের এখন কোনও অভ্যর্থনার ছিটেফোঁটাও আর নেই। তাঁরা এখনও নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁদের প্রাণের বাতাসের মধ্যে উৎসবের শঙ্খধ্বনি শুনছেন।

বিশ্বাস ছিল সুপ্রভার, সন্দীপ আর আসবে না। একটা স্তব্ধ ও নিরেট লোহার কপাটের উপর শতবার মাথা ঠুকলেও সেই কপাট যে কখনও খুলবে না, এই সত্যটুকু কি জানেন না, কিংবা বুঝতে পারেন না এমন একজন মর্ডানিস্ট জ্ঞানী, যাঁর নাম সন্দীপ রায়? ধারণা হয়েছিল সুপ্রভা তার আপত্তি আর অনিচ্ছার 'না' কথাটা খুবই স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে। তবে আর কেন? প্রত্যাখ্যানের পর আবার এসে অনুরোধ করলে যে মাথা নিচু করা হয়, নিজেকেই অপমান করা হয়, এই বোধটুকুও কি ভদ্রলোকের চিন্তায় আর চরিত্রে নেই?

ভয় হয়, এরকম অদ্ভুত মানুষ, এই সন্দীপ রায় চিরকাল এখানে আসতেই থাকবে। ক্লান্ত হবার কিংবা ক্ষান্ত হবার মত মানুষ হলে এই ক'দিনের মধ্যে সুপ্রভার গম্ভীর মুখের আর উদাস চোখ দুটোর নীরব তাড়নায় ভদ্রলোকের মনে এ বাড়িতে আসবার দুরন্ত উৎসাহ ক্লান্ত কিংবা ক্ষান্ত হয়ে যেত। সন্দীপ রায় যেন তাঁর মনগড়া আমিত্বের একটা ভাষ্য শোনাবার জন্য একজন সহিষ্ণু শ্রোতা খুঁজছিলেন। মহিম বসুর মেয়েকে সেইরকম শ্রোতা বলে মনে করে সন্দীপ রায়। সব কথার মধ্যে শুধু আমি আর আমি। একদিনও আর ভুলেও জিজ্ঞাসা করেনি, তোমার বাবা আর মা কেমন আছেন? এ বাড়ির মহিম বসু আর হেমলতা বসু যেন সত্তাহীন দুটো ছায়া, দুটো নাম মাত্র। সন্দীপ কোনওদিনও বলল না, চলো সুপ্রভা উপরতলার ঘরে একবার যাই, তোমার বাবা আর মার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। তা হলে বলতে পারত সুপ্রভা, আপনি বসুন, আমি বাবা আর মাকে ডেকে নিয়ে আসছি। সন্দীপের একেলে সৌজন্যের শাস্ত্রটা বোধ হয় মনে করে যে, সুপ্রভা যেন জগৎছাড়া একটা একলা-জীবনের মেয়ে, এই ড্রইংরুমের ভিতরে বসে শুধু সন্দীপের জন্য অপেক্ষার তপস্যা করছে।

যেমন রোজ, তেমনই আজও জিজ্ঞেস করে সুপ্রভা—চারুমাসিমা কেমন আছেন?

সন্দীপ হাসে—তোমার অনর্থক জিজ্ঞাসার বাঁধা গৎ রোজই কেন শোনাও?

এরকম অদ্ভুত পাল্টা প্রশ্ন শুনতে হবে, এরকম ভয় সুপ্রভার কল্পনাতেও ছিল না। প্রশ্ন শুনে সুপ্রভার মনের গম্ভীরতা হঠাৎ ধৈর্য হারিয়ে মুখর হয়ে ওঠে। —বাঁধা গৎ হতে পারে, তবু তো

এটা একটা ভদ্র জিজ্ঞাসা।

—হ্যাঁ, তা বটে। কিন্তু আমি আজ আর আমার জবাবের বাঁধা গৎ তোমাকে শোনাব না। বলতে পারতাম, যেমন এতদিন বলে এসেছি, তিনি ভাল আছেন; কিন্তু সেকথা না বলে শুধু একটা অনুরোধের কথা বলব, তুমি আর ওকথা জিজ্ঞাসা করবে না।

—কেন?

—তোমার চারু মাসিমা যেমন থাকেন, তেমনই আছেন। এর মধ্যে জিজ্ঞাসা করার কী আছে?

সুপ্রভা—এরকম কথা আপনার কাছ থেকে শুনতে পাব কল্পনাও করতে পারিনি। পারলে, জিজ্ঞাসা করতাম না।

সন্দীপ—হ্যাঁ, আমার মা কিংবা বাবার সম্পর্কে তোমার মনে জিজ্ঞাসার কথা থাকলেও আমাকে বলো না।

সুপ্রভা—কেন?

সন্দীপ—ওঁরা আমার পিতামাতা আর আমি ওঁদের ছেলে, ব্যস, এছাড়া আমার জীবনের মধ্যে কোনও মাধব রায় কিংবা চারুশীলা রায় নেই।

চমকে ওঠে সুপ্রভা। চোখের তারা দুটো ছটফট করে—কিন্তু আপনার বাবার সম্পত্তিটাও কি আপনার জীবনের মধ্যে নেই?

—আছে। সেজন্য আমি আমার বাবার সম্পত্তির কাছে কৃতজ্ঞ। বাবার কাছে নয়।

—একথার মানে?

—বাবার কাছ থেকে আমি শুধু টাকাই পেয়েছি, আর কিছু পাইনি।

—আর মার কাছ থেকে?

—বড়মাসি বলেন, আমি মার চোখ দুটো পেয়েছি।

—আর কিছু পাননি?

—না, কিছু না। বাবার কাণ্ডজ্ঞান আমি পাইনি, মার ধর্মজ্ঞানও পাইনি। ওঁদের জীবন থেকে আমি কোনও শিক্ষাই পাইনি।

—আপনার দুর্ভাগ্য।

—আমার সৌভাগ্য।

—কেন?

—মাধব রায়ের কাণ্ডজ্ঞান এমনই অদ্ভুত ছিল যে, তিনি তাঁর টাকার বারো আনা ভাগ হাসপাতালে দান করে দিলেন, আর খুব পুণ্যি লাভ করলেন। কিন্তু হা অদৃষ্ট, সে পুণ্যি এমনই পুণ্যি যে, হার্ট-স্ট্রোক হয়ে ব্যাঙ্কের অফিস ঘরেই মরে যেতে হল।

সুপ্রভার চোখের চেহারা কত কঠোর হয়ে উঠেছে, সেটা দেখতে পেয়ে আর বুঝতে পেরেও সন্দীপের মুখরতা একটুও মৃদু হয়ে যায় না। বরং আরও উদ্দীপ্ত স্বরে কথা বলে সন্দীপ। —আর, চারুশীলা রায়ের ধর্মজ্ঞান এমনই অদ্ভুত যে তাঁর ঠাকুরঘরের ফুল-বাতাসাকে আমি একটা আবর্জনা বলে মনে করি বলে তিনিও আমার টাকাকে আবর্জনা বলে মনে করেন। প্রতিজ্ঞা করেছেন, আমার টাকায় কেনা চাল-ডালের একটা দানাও ছোঁবেন না। কোন্নগরে থাকেন তাঁর এক উকিল ভাই, কীর্তন শুনে ভাবাবেশে যিনি চেতনা হারিয়ে ফেলেন, তাঁরই কাছ থেকে প্রতি মাসে পঞ্চাশটি

টাকা নিয়ে তোমার চারুমাসিমা তাঁর আতপচাল-মার্কা জীবনযাপন করেন। ....কী? কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাও?

—হ্যাঁ।

—বলো।

—চারু-মাসিমা তবে আপনার গাড়িটাকে ছুঁলেন কেন? তিনি সেদিন তো আপনারই গাড়িতে চড়ে এখানে এসেছিলেন।

—অ্যাঁ? হ্যাঁ। গাড়িটা কিন্তু তাঁরই। মাধব রায় ওই গাড়ি তাঁর স্ত্রীর নামে কিনেছিলেন।

—বাড়িটাও কি....।

—হ্যাঁ, ঠিক সন্দেহ করেছ। বাড়িটা চারুশীলা রায়ের বাড়ি। পুণ্যাত্মা মাধব রায়ের দানের দাপট থেকে রক্ষা পেয়ে সামান্য কয়েক লাখ টাকার শেয়ার আর ডিবেঞ্চার আমার কপালে জুটেছে। বিশ্বের ইতিহাসে মাধব রায়ের উইল হল ম্যাগনাকার্টা। ....ও কী। তুমি হাসছ বলে মনে হচ্ছে। বোধ হয় তোমার মনে হয়েছে যে, লোকটা প্রলাপ বকছে। তা নয়। আমি স্পেডকে স্পেড বলি। বিন্দুকে সিন্ধু বলি না।

গল্প শুনেছিল সুপ্রভা, কেনও এক পাগলা পুরুত মঙ্গলঘটের উপর কুলো চাপিয়ে দিয়ে কুলোর পূজো করেছিল—কুলায় নমঃ, কুলায় নমঃ। সুপ্রভার আশার ভাগ্যটাও যেন কুলোচাপা সেই মঙ্গলঘটের মত মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। ভালবাসার ছোঁয়া আছে, এমন একটি কথাও এই ড্রইংরুমের বাতাসে বেজে উঠল না। শুধু মতামতের তর্ক আর তর্ক। সেই পাগলা পুরুষের কুলোপুজোর মন্ত্রের মত অবান্তর আর লক্ষ্যভ্রষ্ট মুখরতা। কিন্তু কুলোপুজোর এই মুখরতার শেষ হবে কবে? সহ্য করবার শক্তি ফুরিয়ে আসছে সুপ্রভার।

সন্দীপ রায়ের স্বপ্নে স্বভাবে ও শখে একেলে কোন মহত্ত্বের কী বস্তু আছে, কিছুই বুঝতে পারে না সুপ্রভা। সন্দীপ রায়ই জানে, একেলে বলতে সে কী বোঝে। এটুকু অবশ্য খুবই স্পষ্ট করে বোঝা যায় যে, নিজেকে একেলে বলতে বেশ গর্ব বোধ করেন ভদ্রলোক।

সন্দীপের সব কথার শেষে ওই একটি ভণিতা থাকে, সেটা একবার বলে নিতে কোনওদিনও ভুলে যায় না সন্দীপ। —চলো, বাইরে যাই, একটু বেড়িয়ে আসি।

বেড়িয়ে আসবার কত না সুন্দর বিচিত্র অরা বিমুক্ত জায়গার নাম বলেছে সন্দীপ। ময়দান, রেড-রোড আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সিঁড়ি। মিস সিরাজির হনি-বার, যেখানে রঙিন মোমবাতির রঙিন আলোর কাছে, দোলনা চেয়ারের ভেলভেটের উপর বসে, আর সামান্য একটু চেরি মধু খেলে জীবনটাকে মধুময় বলে মনে হবে। তার চেয়ে ভাল, ডিং-ডং কাফে, যেখানে আলোর ফোয়ারার সঙ্গে আদুড় গায়ের থরথর শিলর মিশিয়ে দিয়ে রূপসী মেয়েরা নাচে, আর প্রিয়দের পাশে প্রিয়ারা বসে মাশরুম-সুপ খায়। সমস্তক্ষণ একটা চমৎকার ঘণ্টাধ্বনির মিউজিক বাজতে থাকে। যে যার মনের কথা খুলে মনের মানুষটির কাছে বলতে পারে। অন্য কেউ, তৃতীয় কোনও একলা অভাজন কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করলেও সেসব কথার কিছুই শুনতে পায় না। ডিং-ডং কাফের বাতাসে শুধু মিউজিক নয়, ম্যাজিকও আছে।

বলতে বলতে যেন একটা ভাবের আবেগে বিহ্বল হয়ে যায় সন্দীপের গলার স্বর। অনুরোধ করে সন্দীপ—তুমি একবার দেখবে চলো, সুপ্রভা।

প্রাণের এইসব আবেগের কথা শুনে সুপ্রভার বুঝতে কিছু কি আর বাকি আছে, কেমনতর জীবন ভালোবাসেন এই ভদ্রলোক? ঘরের বাইরে এইসব আলো ছায়া আর ফোয়ারার কাছে সন্দীপের হাত ধরে আর হেসে হেসে ছুটোছুটি করবে এক সঙ্গিনী, যার প্রাণ কখনও ক্লান্ত হবে না, যার বুকটা কখনও হাঁপাবে না। বার বার ওই একটি দুর্মর অনুরোধের কথা বলে সন্দীপ ও বাড়ির ভীরু মেয়েটিকে বুঝিয়ে দিতে চাইছে যে, এই হল একেলে ভালবাসার জীবন। সে জীবনের কাছে ঘরের বাতির আলোর চেয়ে বাইরের আতসবাজির আলোটাই বেশি দরকারের আর বেশি দামের বস্তু।

বেশ তো, সন্দীপ রায় এবার সরে পড়লেই তো পারে। মিছিমিছি তার একেলে অভিরুচির গর্বটাকে এখানে নিয়ে এসে সময় নষ্ট করে কেন? সন্দীপ রায় কি মনে করেছে যে, এইভাবে এসে এসে বিদ্যাবুদ্ধি ও কালচারের চমক দেখিয়ে, চমৎকার এক কুহক সৃষ্টি করে মহিম বসুর মেয়েকে মুগ্ধ করে ফেলবে? আতসবাজির আলোর জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠবে সুপ্রভার সাবধান প্রাণ?

কিন্তু সুপ্রভা কেন তার চিন্তার মধ্যে এত সব গবেষণা পুষে রেখে আর এত কষ্ট করে সন্দীপ রায়ের এই অসাধ্যসাধনের চেষ্টা সহ্য করছে? আজই তো স্পষ্ট করে বলে দিতে পারে সুপ্রভা, আপনি এখানে আর আসবেন না।

কী আশ্চর্য, সুপ্রভা তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার সব কথা খুব গম্ভীর হয়ে আর খুব স্পষ্ট করে বলে দিতে পারলেও ওই একটি কথা আজও বলে দিতে পারল না। সন্দীপ এসে পৌঁছবার আগে সুপ্রভার প্রতিজ্ঞার মধ্যে কথাটা বেশ মুখর হয়ে বাজতে থাকে। কিন্তু সন্দীপ চলে যাবার পরেই বুঝতে পারে, কথাটা আজও বলা হল না। ভদ্রতার সংস্কারে বাধে, অভ্যাসের নিয়মে বাধে। ভাষাতে আর রুচিতেও বাধে নিশ্চয়—তা না হলে সন্দীপ রায়কে স্পষ্ট কথা বলে এখানে আসতে নিষেধ করে দিতে পারছে না কেন সুপ্রভা? সত্যিই তো, ওরকম একটা কঠোর ভর্ৎসনার কথা সুপ্রভার মুখে আসতে পারে না। সন্দীপ রায় নামে এই ভদ্রলোক যাচ্ছেতাই খামখেয়ালের যেমনতর মানুষ হোক না কেন, তার নিজের কাছে তো নিজের একটা সম্মান আছে। নির্বোধ মানুষ ভিখিরীকে ঢিল মেরে তাড়িয়ে দিতে পারে, কিন্তু ওরকম নির্বোধের কাণ্ড কি সুপ্রভার মত মেয়ের পক্ষে সম্ভব? তা ছাড়া, সন্দীপ রায়কে একটা ভিখিরী বলে মনে করা সুপ্রভার মত মেয়ের কোনও অহংকারের সাহসেও সম্ভব নয়।

তবে কি মেঘের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সিঁদুরের মত কোনও আশার বিদ্যুৎ সুপ্রভার এই উদাস গম্ভীরতার মধ্যে ধৈর্য ধরে লুকিয়ে রয়েছে? সত্যিই সেদিন বিকেল থেকে আকাশের মেঘ খুব কালো হয়ে ঘনিয়ে উঠেছিল, যদিও মাসটা ফাল্গুন। কিন্তু প্রথম বিদ্যুৎ চমকে উঠল অনেক পরে, সন্ধ্যাটা যখন বেশ ঘনিয়ে উঠে একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে, তখন। জানালার কাচের গায়ে বিদ্যুতের ক্ষণচমকের আভা হঠাৎ শিউরে উঠতেই, সুপ্রভার মাথাটা যে ভয়-পাওয়া লজ্জার আঘাতে ঝুঁকে পড়ে। কারণ, ভয়-পাওয়া এই লজ্জাটা যে একটা গোপন আশার হঠাৎ-বিদ্যুতের চমক। আসুক না সন্দীপ, এসে এসে একদিন তো সত্যিই বলে উঠতে পারে : আমার সঙ্গে বাইরে গিয়ে তোমার ছুটোছুটি করবার কোনও দরকার নেই সুপ্রভা। ওতে কী আর এমন আনন্দ আছে? আজ এখানেই বসে সারা সন্ধ্যাটা তোমার সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।

বাঃ, কী অদ্ভুত ধৈর্যধরা আশা? রুমাল দিয়ে চোখ মোছে সুপ্রভা। কপালটাকেও এক হাতে

শক্ত করে টিপে ধরে। জাগা মনের কাছে ঘুমন্ত মনের আশাটা ধরা পড়ে গিয়েছে। বুকের ভিতরে অদ্ভুত একটা কষ্টও ছটফট করছে। সাবধান মনের ভিতরে এমন অদ্ভুত ভুল আর কবে আর কেমন করে ঢুকে পড়েছে, ভগবান জানেন।

উঠে গিয়ে দরজার পর্দা সরিয়ে আকাশ-ভরা অন্ধকারের চেহারাটার দিকে তাকিয়ে থাকে সুপ্রভা। বৃষ্টি পড়ছে। ঝড়ও শুরু হয়েছে। দমকা বাতাসের দাপটে জানানি চামেলির লতাটা ছেঁড়া-ছেঁড়া হয়ে লনের ঘাসের উপর শুয়ে পড়েছে। সন্দীপ বোধ হয় আজ আর আসবে না।

ভাবতে গিয়ে হেসে ফেলে সুপ্রভা। দু'মাস আগেও এই ড্রইং-রুমের ভিতরে একলা হয়ে বসে থাকার শান্ত জীবনের কোনও সন্ধ্যাতেও সুপ্রভা কি কল্পনা করতে পেরেছিল যে এরকম একটা জটিল অদৃষ্টের সমস্যা তার চোখের এত কাছে এসে দাঁড়াবে? কী চমৎকার সমস্যা! একজনের আশা, সুপ্রভা একদিন খুশি হয়ে আতসবাজির আলোর কাছে গিয়ে ছুটোছুটি করবে রাজি হয়ে যাবেই যাবে, কোনও আপত্তি করবে না। আর একজনের আশা, সন্দীপ একদিন এসে, ড্রইংরুমের এই জয়পুরি বেলোয়ারিবাতির আলোর কাছে বেশ শান্ত হয়ে বসে থাকবে আর উঠতেই চাইবে না। সমস্যাটা যেন দু'জনের দুই আশার লটারির দ্বন্দ্ব। বলে ফেলবে সন্দীপ। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ছুটোছুটি করবার কোনও সাধ আমার নেই। এখানে তোমার কাছে এসে বসে থাকতে ভাল লাগছে।

ক্যাডিলাকের হর্নের শব্দ বেজে ওঠে। বৃষ্টি আর ঝড়ের শব্দের সঙ্গে মিশে গিয়ে গাড়ির হর্নের শব্দটা যেন একটা মায়াবাঁশির উতলা স্বরের মত বেজে উঠেছে। সুপ্রভার দুই চোখের তারায় জয়পুরি বেলোয়ারিবাতির আভাও ঝিলিক দিয়ে হেসে ওঠে। আজ আর একটুও গম্ভীর হতে পারে না সুপ্রভা। স্বপ্নময় আশার আবেশ সত্যিই সুপ্রভার এই জাগা চোখের দৃষ্টিটাকে নিবিড় করে দিয়েছে।

ঘরে ঢুকেই হেসে ওঠে সন্দীপ। —আমি ঝড়-বৃষ্টি একটুও পছন্দ করি না।

সুপ্রভাও হাসে। —ঝড়-বৃষ্টি তো আপনার একটুও ক্ষতি করতে পারেনি।

সন্দীপ—কী বললে?

—আপনি তো গাড়িতে এসেছেন, বৃষ্টিতে ভিজতে তো হয়নি।

—কিন্তু গাড়িটাতে স্পিড দিতে পারিনি, বড়ই অসুবিধে হয়েছে। প্রায় শম্বুকগতির মত খুবই আস্তে আস্তে থেমে থেমে আসতে হয়েছে।

—বসুন।

—হ্যাঁ, বসব বটে। এসেছি যখন, তখন কিছুক্ষণ তো বসতেই হবে। তবে বেশিক্ষণ নয়।

—কোনও কাজের তাড়া আছে?

—না, একটুও না। আমার কাজের সব তাড়া বিকেলের আগেই ফুরিয়ে যায়। টাকা-পয়সার হিসেবের কোনও কাজ আমি সন্ধ্যেবেলা কিংবা রাতেরবেলার জন্য রেখে দিই না। অবাধ সন্ধ্যার অবাধ আনন্দ, এ না পেলে মানুষ বাঁচবে কী নিয়ে?

—আপনার বিরুদ্ধে আমাদের সবারই কিন্তু একটা অভিযোগ আছে।

—অ্যাঁ? অভিযোগ? কী অপরাধ করেছি যে অভিযোগ থাকবে?

—আমাদের এখানে আপনি শুধু এক কাপ চা ছাড়া সামান্য একটু খাবার খেতেও আপত্তি করেছেন। আজ কিন্তু খেতে হবে।

—কী খাওয়াবে? চিংড়ি কাটলেট।

—না, মা আজ নিজের হাতে ক্ষীর-সন্দেশ তৈরি করেছেন। বলেছেন, সন্দীপকে আজ ক্ষীর-সন্দেশ খেতেই হবে।

—মাকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে দিও। সেকেলে মধুরতার এসব জিনিস খেতে মন্দ নয় বটে, দুঃখের বিষয়, তবু আমি এসব জিনিস খেতে পছন্দ করি না।

—কী খেতে পছন্দ করেন, বলুন।

—যদি বলি, ইংলিশ-স্টেক পছন্দ করি, তবে? তবে ও জিনিস আমাকে এখনই খাওয়াতে পারবে?

—পারব। তবে এই মুহূর্তে নয়, এক ঘণ্টা সময় লাগবে। কিন্তু বলুন তো, ইংলিশ-স্টেক কি খুব একেলে জিনিস? আমি তো জানি, রাজা আর্থারের এক রাঁধুনে চাকর প্রথম এই ইংলিশ স্টেক তৈরি করে রাজার পাতে দিয়েছিল। খেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন রাজা আর্থার। সে তো পাঁচশো বছরেরও আগের ব্যাপার।

—সন্দীপ—তার মানে...অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে...

সুপ্রভা—আমি বলতে চাই, ইংলিশ স্টেক বয়সে আমাদের ক্ষীর-সন্দেশের চেয়ে কম বুড়ো আর কম সেকেলে নয়।

—তার মানে, তুমি আজও আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে না।

—যাব বটে, কিন্তু....

—কিন্তু আজ নয়, এই তো?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কেন?

—ভাল দেখায় না।

—তোমার মনের মধ্যে সেকেলে কূপের একটা মণ্ডূক না থাকলে, তুমি এরকম অদ্ভুত কথা বলতে পারতে না। যাই হোক, আমার কথা শুনে তুমি আজ রাগ করতে পারো, কিন্তু একদিন তোমার ভুল ভাঙবে।

হাতঘড়ির দিকে তাকায় আর উঠে দাঁড়ায় সন্দীপ। —যা-ই হোক, আজ তোমাদের ক্ষীর-সন্দেশ খেলাম না বলে কিছু মনে করো না। আমি তো আবার আসবই, না এসে পারব কেন? তুমি আমাকে শত ভুল বুঝলেও আমাকে তোমরই কাছে আসতে হবে। ....হ্যাঁ, বেশ সুন্দর একটা বিলিতি গল্পের ছবি এসেছে। আমার মনে হয়, গল্পটা শুনলে তোমার এখনি ছবিটা দেখে আসতে ইচ্ছে করবে। গল্পটা শুনবে তো বলি।

—বলুন।

—বিখ্যাত এক ডাক্তারের সঙ্গে পার্কের ভিতরে রোজই ঘুরে বেড়াত একটি তরুণী। এই তরুণী হল বিখ্যাত ডাক্তারের বিখ্যাত হাসপাতালের মেঝে মোছবার একজন মেড, তার মানে ডাক্তারেরই বেতনভুক এক চাকরানি। ডাক্তারের সময় কম কাজের অন্ত নেই, তাই পার্কের ভিতরে বেড়াবার সময়টুকুর মধ্যেই কিছু কথা বলে ওই মেড-মেয়েটিকে কালকের মত ধোয়া-মোছার কাজের হিসেব বুঝিয়ে দিতেন। ওই পার্কে লর্ডদের আর নাইটদের মেয়েরাও বেড়াতে। ডাক্তারের

সঙ্গে মেড-মেয়েটিকে রোজ বেড়াতে দেখে সবারই ধারণা হয়ে গেল যে, মেয়েটি ওই বিখ্যাত ডাক্তারের বাঞ্ছিতা প্রেমিকা। ডাক্তার যেদিন কাজের ডাকে শহরের বাইরে যান, কী আশ্চর্য মেড-মেয়েটি সেদিনও পার্কে একলা বেড়াতে আসে। লর্ডদের আর নাইটদের মেয়েরা তাকে দেখে খুব সৌজন্য আর সম্মানের ভঙ্গিতে মাথা হেলিয়ে আর হেসে হেসে অভিনন্দন জানায়। কিন্তু একদিন ওই মেড-মেয়েটির কাজের একটা ভয়ানক ভুলের জন্য রুষ্ট হয়ে ডাক্তারমশাই তাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিলেন। পরদিন পার্কে বেড়াতে এসে ডাক্তার দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, মেড-মেয়েটি এসে তাঁর কাছে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটি বলছে : আমি চাকরি চাই না, মাইনে চাই না। শুধু আপনার সঙ্গে বেড়াতে চাই। ডাক্তার ভ্রূকুটি করেন—কেন? মেয়েটি বলে, লর্ডদের আর নাইটদের মেয়েরা আমাকে আপনার প্রিয়া মনে করে খুশি হয়েছে আর অভিনন্দন জানিয়েছে। আমি আমার এই সম্মানটুকু বাঁচিয়ে রাখতে চাই। ডাক্তার বললেন—সেটা তো নিতান্ত মিথ্যে সম্মান, ওদের একটা ভুল ধারণার দেওয়া সম্মান। মেয়েটি বললে—আমার জীবনে ওই ভুল সম্মান তো কোনও নির্ভুল সম্মানের চেয়ে কম সত্য নয়। ওদের ভুল ধারণার সঙ্গে যে আমার জীবনের অনেক বাঁধা পড়ে গিয়েছে।

—তারপর কী হল?

—ডাক্তার এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না। বেশ দুঃখিত হয়ে আর চোখের জল মুছে মেয়েটি চলে গেল। সেদিন চলে গেল বটে, কিন্তু একদিন ফিরে এসে ভয়ানক প্রতিশোধ নিল।

— প্রতিশোধ?

—হ্যাঁ, ডাক্তার পার্কে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় তোয়ালে জড়িয়ে আর মেঝে মোছবার বুরুশ হাতে নিয়ে মেয়েটি সেই ডাক্তারের কাছে এসে দাঁড়াল। চমকে উঠল লর্ডদের ও নাইটদের পার্কচারিণী মেয়েরা। ছি, ছি, এই ডাক্তার যে একটা চাকরানির সঙ্গে প্রেম করেছে। সবাই ডাক্তারের দিকে ভ্রূকুটি করে তাকায়। ডাক্তারের সম্মান চুলোয় গেল। —গল্পটার আসল তত্ত্বটা বুঝতে পারছ তো?

সুপ্রভা—না।

সন্দীপ—বাইরের সত্যটাই জীবনের আসল সত্য, ভিতরে যত মিথ্যে থাকুক না কেন।

—তার মানে?

—তার মানে লোকে যদি মনে করে যে তুমি একজন মস্ত বড় বিদুষী, তবেই তুমি সত্যিকারের একজন বিদুষী—তোমার মনের ভিতরে সামান্য অ-আ-ক-খ থাকুক বা না থাকুক। আর, আমার পেটের ভিতরে দশটা প্লেটো আর অ্যারিস্টটলের পাণ্ডিত্য গিজগিজ করলেও লোকে যদি সেটা দেখতে না পায়, তবে আমি কিসের পণ্ডিত? লোকে তো আমাকে গণ্ডমূর্খ বলেই জানবে। তাই বলছিলাম...।

আবার ব্যস্ত হয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকায় সন্দীপ, বেশ ব্যস্ত স্বরে কথা বলে।—তাই বলছিলাম, মানুষের ভালবাসার জীবনও এই নিয়মে চলে। লোকে যদি জানে, দেখে, খুশি হয় আর মনে মনে করে যে, অমুক শ্রীমান অমুক শ্রীমতীর মধ্যে ভালবাসা হয়েছে, তবে...তবে তার চেয়ে বেশি আর কিছু হল না বলে একেবারে অখুশি হবার তো কোনও কারণ থাকতে পারে না।

কথার আবেগ হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে সুপ্রভার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সন্দীপ। বোধ হয়

হঠাৎ চোখে পড়েছে সন্দীপের, সুপ্রভার চোখের তারা দুটো যেন ভয় পেয়ে থরথর করে কাঁপছে।

ঠিকই দেখেছে আর বুঝেছে সন্দীপ। ভয় পেয়েছে সুপ্রভা। এইবার স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছে, কী চায় সন্দীপ। সন্দীপের একেলে জীবনতত্ত্বের সারকথার নিদারুণ শব্দটা এতদিনে স্পষ্ট করে শুনতে পাওয়া গেল।

সন্দীপ বলে—আমার ভয় হয়, আমার কথাগুলি তুমি ভুল বুঝে আমাকেও ভুল বুঝবে।

সুপ্রভা বলে—আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করব না। কিন্তু আপনি নিজেই একদিন ঠিক বুঝবেন যে, আপনি আজ অনেক ভুল কথা বলে ফেলেছেন।

হাসতে থাকে সন্দীপ। —বেশ তো, যদি আজ বুঝিয়ে দিত পার যে, আমি ভুল কথা বলেছি, তবে তো ভালই হয়। তোমার ভাল, আর আমারও ভাল.....আচ্ছা, আজ তবে চলি।

সুপ্রভা—আসুন।

সন্দীপ—কাল কিন্তু আমি তোমার কোনও আপত্তির কথা শুনব না। আমি আজই ফোন করে হাউসের বক্স রিজার্ভ করে রাখব। তোমাকে যেতেই হবে, ছবিটাকে একবার দেখতেই হবে।

বৃষ্টি নেই, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঝাপসা চোখে একটা ঝাপসা দৃশ্য দেখতে থাকে সুপ্রভা। চলে যাচ্ছে সন্দীপ। একটা আশাহত শূন্যতার মধ্যে সুপ্রভার আত্মাটাকে ডুবিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে সন্দীপ রায়। যাক, আবার তো আসবে।

চার

দমদমের রঙিন 'নিরঞ্জন'-এর লনের পাশে জাপানি চামেলির লতা সন্ধ্যার ফুরফুরে বাতাসে যখন দুলতে শুরু করেছে, আর ড্রইংরুমের একটি কোচের উপর বসে একমনে একটা তার ছেঁড়া গিটারের নতুন তার বাঁধছে সুপ্রভা, তখন দমদম থেকে অনেক দূরে কালীঘাটের এক ক্লাবের গানের জলসাতে গান শুনছে সন্দীপ রায়। সন্দীপের পাশের চেয়ারে বসে গান শুনছে এক তরুণী, রাসেল স্ট্রীটের মিস ডি' সিলভার বিউটি সেলুনে প্রায় রোজই গিয়ে হেয়ার ড্রু সেরে আসে কালীঘাটের যে মেয়ে, যার নাম সিপ্রা। ইস্পাতের প্লেট দিয়ে তৈরি দুটো বিরাট আকারের ইংরেজি হরফ, দুটো 'টি' পাশাপাশি বসানো আছে যে বাড়ির পোর্টিকোর মাথার উপর, সেটা ট্র্যাক্টর ট্রেডার্স-এর মালিক অনাথ চৌধুরীর বাড়ি। এই অনাথ চৌধুরীর মেয়ে সিপ্রা চৌধুরী। আজ সিপ্রা চৌধুরীর মাথাতে যে খোঁপা দেখা যাচ্ছে, সেটার নাম শাহাজাদি খোঁপা। কাল ছিল একটা গেইশা খোঁপা, পরশু দিন ছিল লায়লা খোঁপা।

জলসার আসরের ওদিকে একদল ছেলে মুখ টিপে-টিপে হাসে আর ফিসফিস করে বলাবলি করে : উনি তো ওঁর খোঁপা দেখাবার জন্য গানের জলসাতে এসেছেন। উনি গানের ধার ধারেন না। তবে হ্যাঁ, কেউ কেউ আবার ওঁর খোঁপা দেখবার জন্য গানের জলসাতে আসেন।

এক ভদ্রলোক চেঁচিয়ে ওঠেন—আস্তে! বড় গণ্ডগোল হচ্ছে।

ছেলের দল আরও আস্তে, আরও চাপা স্বরে কথা বলাবলি করে : ওই যে, যে ভদ্রলোক এখন সিপ্রা চৌধুরীর সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে কথা বলছেন, তিনি তো পরশু দিন এই জলসাতে এসে সিপ্রা চৌধুরীর খোঁপার দিকে তাকালেন আর গলে গেলেন।

একটু বেশি রস করে কথাগুলি বললেও ফিসফিসে স্বভাবের ওই ছেলের দল মিথ্যে কিছু

বলেনি, খুব বাড়িয়েও বলেনি। ক্লাবের অনেক অনুরোধের চাপে পড়ে শেষে রাজি হয়েছিলেন সন্দীপ রায়, মাত্র সাতটার সময় দশ মিনিটের জন্য এসে জলসার শুধু উদ্বোধন করে দিয়েই সে চলে যাবে। এরকম গানের তীর্থে ধৈর্য্যের কাকের মত ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে সে পারবে না। সময়ও নেই, রুচিও নেই।

জলসার উদ্বোধনের কাজটা সেরে দিয়ে, অর্থাৎ প্রকাণ্ড একটা পিতলের পিলসুজের দশটা পলতে জ্বালিয়ে দিয়ে, আসরের চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে, একটু হেসে আর আবছা নমস্কারের ভঙ্গিতে মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে দিয়ে যখন চলে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল সন্দীপ, তখন এই সিপ্রা চৌধুরী এগিয়ে গিয়ে সন্দীপের কাছে দাঁড়িয়েছিল আর হেসেছিল। সন্দীপ বলেছিল—আপনি বোধ হয় আমাকে কোনও কথা বলতে চান!

সিপ্রা—হ্যাঁ। আমি এই ক্লাবের মিউজিক সেকশনের সেক্রেটারি সিপ্রা চৌধুরী।

উৎফুল্ল হয়ে হেসে ওঠে সন্দীপ। —বাঃ, আপনার খুব সাহস আছে বলে মনে হচ্ছে।

—একথা কেন বলছেন?

—নইলে এরকম একটা সাংঘাতিক কর্তব্যের সেক্রেটারি হতে পারবেন কেন?

—না, একটুও সাংঘাতিক নয়। যা কিছু দরকার হয়, সবই হরেনদা করেন। আমি শুধু নামেই সেক্রেটারি।

—আপনি ভাল গাইতে পারেন নিশ্চয়?

—না, না, গান-টান আমার আসে না। সবাই অবশ্য মনে করে যে, আমি খুব ভাল গাইতে পারি, গানও ভাল বুঝি।

—এরকম শখের সেক্রেটারি হবার শখ ছাড়া আর কোনও শখ নেই?

—না, একটুও না।

—আমি তো মুক্তচোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আছে।

—সে কী। কী আশ্চর্য। কী দেখতে পাচ্ছেন?

—আপনার চমৎকার খোঁপার শখ আছে।

হেসে হাঁপ ছাড়ে সিপ্রা। —তাই বলুন। হ্যাঁ, খোঁপার শখ আছে।

সন্দীপ—ভাল শখ। আপনার সুরুচির প্রশংসা করতে হয়।

সিপ্রা—কিন্তু বড় পিসি তো একটুও প্রশংসা করেন না। বকে-বকে আর কিছু রাখেন না।

—বড় পিসিরা ওরকম বকাবকি করবেনই। তাঁরা হলেন বিঁড়ে-খোঁপার সেই যুগের, খুব বিদ্‌ঘুটে না হোক বেশ ঘুটঘুটে সেই যুগের মানুষ।

—আমিও বড় পিসিকে প্রায় একরকম কথা শুনিয়ে দিই। কিন্তু শুনিয়ে দিলেই বা কী হবে? রেহাই নেই। বড় পিসি বকতেই থাকেন।

—কাকে বকেন? আপনাকে, না আপনার খোঁপাটাকে?

—আমাকে বকেন, খোঁপাটাকেও বকেন।

—খুব ভুল করেন বড় পিসি। বকাবকি না করে বরং আপনার হাতের কাজের প্রশংসা করা তাঁর উচিত ছিল।

—না, এটা আমার হাতের কাজ নয়, মিস ডি'সিলভার বিউটি সেলুনের হাতের কাজ।

এইবার বেশ চেঁচিয়ে ওঠে সন্দীপ—তাই বলুন। খোঁপাটার তা হলে একটা নাম আছে নিশ্চয়।

—হ্যাঁ, এটা ইরানি স্টাইলের খোঁপা। নাম, লায়লা খোঁপা।

—বেশ সুন্দর নাম। লায়লা খোঁপা দীর্ঘজীবী হোক।

—ঠাট্টা করছেন না তো?

—এই তো ভুল বুঝলেন। আমি একেবারে মন খুলে কথা বলি, তাই অনেকে আমাকে বুঝতে ভুল করে। ভাল কথা বললে ভয় পায়, আর ঠিক কথা বললে সন্দেহ করে যে, বেঠিক কথা বলছি। বিশ্বাস করুন, আপনার লায়লা খোঁপা সত্যিই সুন্দর খোঁপা, দেখতে আমার মত বেরসিক ব্যাঙ্কার মানুষের চোখেও ভাল লাগছে।

উজ্জ্বল হয়ে হাসতে থাকে সিপ্রা চৌধুরীর চোখ দুটো। —বড় পিসি বলেন, লায়লা খোঁপা না ছাই, ময়লা খোঁপা।

সন্দীপ—বলতে দিন। ওসব কথা কানে তুলবেন না।

সিপ্রা—কিন্তু আপনি শুধু বাতি জ্বালিয়ে কাজ সেরে দিলেন, কিছু বললেন না কেন। সবাই আশা করেছিল, আপনি কিছু বলবেন।

—আজ কিছু বলবার ইচ্ছে হল না। যদি আবার একদিন আসি তবে বলব।

—যদি নয়, বলুন আসবেন। এই গানের জলসার আয়ু সাত দিন। কথা দিন কাল আবার আসবেন।

—কাল নয়, পরশু দিন আসব।

কথা রেখেছে সন্দীপ রায়। সিপ্রা চৌধুরীর কাছে দু'দিন আগের সেই উৎফুল্ল অঙ্গীকারের মান রক্ষা করেছে।

বেশ নামকরা গুণী-ওস্তাদ এসেছেন। আসরের তানপুরার ভিড়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওস্তাদেরা বসে আছেন। রামপুরের, লক্ষ্ণৌ-এর আর গোয়ালিয়রের ওস্তাদ।

গান শুরু হবার আগে তানপুরার গুঞ্জন শুরু হতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সন্দীপ। গানের আসরকে লক্ষ্য করে চমৎকার এক অনুরোধের কথা বলে। —গুণীরা আমার জিজ্ঞাসার সাহস মাফ করবেন। আমি জানতে চাই, পরজ রাগের সঙ্গে শুদ্ধ মধ্যম মাঝে মাঝে লাগিয়ে দিয়ে বসন্ত রাগ কি গাওয়া যায় না? আমার ধারণা, গাওয়া যায়। এখন উপস্থিত গুণীজনদের কেউ যদি সেটা গেয়ে শোনাতেন, তবে সবাই শুনে সুখী হত।

রামপুরের ওস্তাদ বলেন—হাঁ হাঁ, সো ভি হো সক্‌তা।

হরেনদা চেঁচিয়ে ঘোষণা করেন—আপনারা মন দিয়ে শুনুন, ওস্তাদজি বসন্ত রাগ গাইছেন।

সবারই উৎসুক চোখের দৃষ্টি যেন একটা চমকিত বিস্ময়ের আবেগে সন্দীপের মুখের দিকে ছুটে যায়। কে এই ভদ্রলোক? গানের এত গূঢ় তত্ত্বের খবর যিনি রাখেন, তিনিও নিশ্চয় একজন গুণী।

এদিকে-ওদিকে গুঞ্জন শোনা যায়—এস-আর। এস-আর। বালিগঞ্জের সন্দীপ রায়। শুধু টাকাতে নয়, ইনি জ্ঞানে-গুণে-বিদ্যায় আর ট্যালেন্টেও বড়লোক।

শ্রীবিনায়ক হালদার, যিনি হরেনদার বিশেষ অনুরোধে গান শুনতে এসেছেন, আর তামাকের পাইপে কামড় দিয়ে প্রথম সারির একটা চেয়ারে বসে আছেন, তিনি তাঁর পাশের চেয়ারের অধ্যাপক

ভদ্রলোককে বলেন—উনি একজন ইনটেলেকচুয়াল। আপনাদের আলট্রা-মডার্ণ হিমাদ্রি মিত্তিরের চেয়েও অনেক মডার্ণ। যেমন আইডিয়াতে, তেমনই বাস্তব জীবনে।

এই সব গুঞ্জন আর মন্তব্যের শব্দ নিশ্চয় শুনতে পাচ্ছে সন্দীপ। তার পাশে বসে আছে যে সিপ্রা চৌধুরী, সেও নিশ্চয় শুনেছে। যার নাম করে এত প্রশস্তি উপচে উঠেছে, তার চোখ দুটো যতটা উজ্জ্বল হয়ে হাসছে, তার চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে হাসছে সিপ্রা চৌধুরীর দুই চোখ।

রামপুরের ওস্তাদ বসন্ত রাগের আলাপ শুরু করেছেন। সন্দীপ বলে—চলুন, সিপ্রা চৌধুরী।

চমকে ওঠে সিপ্রার শাহাজাদি খোঁপার মুক্তোর ঝালর।—সে কী, বসন্ত রাগ শুনবেন না?

—না।

—কিন্তু আপনিই তো অনুরোধ করলেন যে...।

—হ্যাঁ, আমিই বসন্ত রাগ গাইতে বলেছি। ব্যস, ওই পর্যন্ত। সাধ হয়েছিল, দুটো কথা বলি। বলে দিয়েছি, আমার সাধও মিটে গিয়েছে, আর এখানে বসে থাকতে পারছি না। চলুন, বাইরে যাই।

—আমিও যাব?

—নিশ্চয়। অবিশ্যি আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে...

—না, না, আপত্তি কেন হবে?

উঠে দাঁড়ায় সন্দীপ। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় সিপ্রা। শ্রোতাদের প্রথম সারির দুটি চেয়ার খালি করে দিয়ে দু'জনে একসঙ্গে হেঁটে বাইরে চলে যায়।

জলসার ভলান্টিয়ার ছেলেরা, যারা প্রবেশপথের মুখে জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে, তারা হাঁকডাক করে।—এই যে, এদিকে, ওই যে আপনার গাড়ি, ওই ল্যাম্পপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

সিপ্রা বলে—আমি ভুলে গিয়েছিলাম, আপনি তাই বোধ হয় ইচ্ছা করে আমাকে দিয়ে কর্তব্যের কাজটা করিয়ে নিলেন।

সন্দীপ—কী বলছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না।

সিপ্রা—মান্য অতিথি যখন গানের সভা ছেড়ে চলে যান, তখন গান সেকশনের সেক্রেটারির কর্তব্য হল, অন্তত গেট পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে এসে তাঁকে বিদায় দেওয়া।

—আপনি ভুল বুঝেছেন। আমি ভুলেই গিয়েছি যে আপনি হলেন ক্লাবের গান সেকশনের সেক্রেটারি।

—যা-ই হোক, স্বীকার তো করবেন যে সেক্রেটারি তার....।

—স্বীকার করি, সেক্রেটারি তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন। এখন আমি আমার কর্তব্য পালন করব। আপনাকে একটা ভাল ছবি দেখতে নিয়ে যাব।

সিপ্রার চোখে একটা বিস্ময়ের আবেশ টলমল করে। সে বিস্ময় যেন সিপ্রার মুগ্ধ প্রাণের একটা শিহরণ। কথা বলতে গিয়ে সিপ্রার গলার মৃদু স্বর যেন বিহ্বল হয়ে আরও মৃদু হয়ে যায়।—আমি ছবি দেখি বটে, কিন্তু আপনার সঙ্গে ছবি দেখতে যাওয়া...ভাবতে কেমন যেন লাগছে। এতটা কি এত শিগ্‌গির....।

হঠাৎ নীরব হয়ে যায় সিপ্রা। আর, সন্দীপ রায়ও হঠাৎ সিপ্রার একটা হাত ধরে ফেলে কথা

বলে। —কী বললে?

সিপ্রা—আপনার সঙ্গে ছবি দেখতে যেতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আজ এখনই কেন?

সন্দীপ—আজই সকালে ছবির হাউসে আমি টেলিফোন করে একটা বক্স রিজার্ভ করে রেখেছি।

—তবে একবার বাড়িতে গিয়ে, বড় পিসিকে একটু বলে নিয়ে, তারপর না হয়...।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে সন্দীপ—ছবির সময় হয়ে এসেছে সিপ্রা।

—কিন্তু ছবি শেষ হতে তো বেশ রাত হয়ে যাবে।

—রাত দশটা হয়ে যাবে।

—তবে?

—এখানে গানের জলসা কি রাত দশটার আগে শেষ হবে?

—না।

—তুমি কি গান শেষ না হবার আগেই বাড়ি চলে যেতে?

—না।

—বড় পিসি জানেন না যে, তুমি গানের জলসায় এসেছে?

—জানেন।

—তাঁকে কি এমন কোনও কথা বলে এসেছ যে, তুমি রাত দশটার আগেই বাড়িতে ফিরবে?

—না।

—তবে আজ এখনই আমার সঙ্গে ছবি দেখতে যেতে তোমার চিন্তা করবার কিছু নেই। কেউ তোমার কাছে কৈফিয়ত দাবি করবে না। করবে কি?

—না।

—তবে চলো।

—চলুন।

আজ এখানে গাঢ় সন্ধ্যায়, কালীঘাটের একটি কাদামাখা পথের উপর চাকার দাগ এঁকে দিয়ে চকচকে ক্যাডিলাক যখন সন্দীপ রায় ও সিপ্রা চৌধুরীকে নিয়ে নতুন উল্লাসের হর্ণ বাজিয়ে ছুটতে শুরু করে, তখন এখান থেকে অনেক দূরে সেখানে দমদমের 'নিরঞ্জন'-এর গেটের কাছে একটা গাড়ির শব্দ শুনতে পেয়ে সুপ্রভার মন থেকে অনেকক্ষণের অপেক্ষার সব অস্বস্তি ঝরে পড়ে যায়। ভদ্রলোক এতক্ষণে পৌঁছলেন। আগে কোনওদিনও এত দেরি করে আসেননি।

ড্রইংরুম থেকে বের হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই বুঝতে পারে সুপ্রভা, না সন্দীপ আসেনি। ক্যাডিলাক নয়, একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয়, হঠাৎ খারাপ হয়ে গিয়েছে ট্যাক্সিটা। তাই বনেট তুলে ইঞ্জিনের কলকব্জার উপর ঠোকাঠুকি করছে ড্রাইভার।

ঘরে ঢুকে আবার দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকায় সুপ্রভা। না, আজ আর আসবেন না সন্দীপ রায়। কিন্তু কেন? হঠাৎ কোনও অসুখে পড়ে যাননি তো?

তার বাঁধা গিটারটাকে হাতে তুলে নেয় সুপ্রভা। কিন্তু গিটার যেন আনমনা সুপ্রভার অসাবধান হাতের একটা ধাক্কা খেয়েছে। মিথ্যে একটা ঝংকার তুলে নীরব হয়ে যায় গিটার।

কিন্তু ওদিকে ততক্ষণে সন্দীপ রায়ের ক্যাডিলাক পার্ক স্ট্রীটের মোড় পার হয়ে গিয়েছে। সিপ্রা বলে—উঃ, এত জোরে গাড়ি চালাবেন না। আমার বেশ ভয় করছে।

সন্দীপ হাসে—আমি কোনও কিছুই আস্তে চালাতে পারি না। আস্তে চলতেও পারি না। যেমন আমার এই গাড়িটা, তেমনই আমার জীবনটাও স্পিড ভালবাসে।

সিপ্রা—তা আমি জানি।

সন্দীপ—তুমি কেমন করে জানলে?

—হরেনদার কাছে আপনার অনেক কথা শুনেছি।

—নানারকম ভয়ের কথা বোধহয়?

—না, একটুও ভয়ের কথা নয়। আমি কত কতবার ভেবেছি, যদি আপনাকে কোথাও দেখতে পাই, তবে একটু ভাল করে দেখব।

এক হাত স্টিয়ারিং-হুইলের উপর রেখে অন্য হাতটাকে সিপ্রা চৌধুরীর কাঁধের উপর এলিয়ে দেয় সন্দীপ। —এ কথা বলে দিয়ে তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করে দিলে, সিপ্রা।

—আপনিও কি একটা কথা বলে আমাকে নিশ্চিন্ত করে দিতে পারেন না?

—পারি। কিন্তু তুমিই বলো, কী কথা শুনতে চাও?

—আপনি বুঝে দেখুন, কী কথা শুনতে পেলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।

—আমি রোজ তোমাকে দেখতে চাই। একটি দিনও বাদ দিতে চাই না। একথা শোনার পরেও যদি তোমার মনে কোনও প্রশ্ন থাকে, তবে....।

ছবির হাউসের কাছে পৌঁছে গিয়েছে দুরন্ত স্পিডের ক্যাডিলাক। সন্দীপ হেসে ফেলে—এখন ছবিটাকে একটু ভাল করে দেখো। আমি একটুও হিংসে করব না।

আলোয় ঝলমল সিনেমা নিকেতনের ভিতরে ছায়াবৃত হলের দর্শকমঞ্চের এক দিকে আরও ছায়াবৃত বক্স যেন একটি নিবিড় নিরালা। তারই ভিতরে সন্দীপ রায়ের পাশে বসে সিপ্রা চৌধুরীর প্রাণটা বোধহয় সব প্রশ্ন হারিয়ে বিহ্বল হয়ে গিয়েছে। তবু সিপ্রার মনে হয়, সন্দীপের হাতটা এখনই এত উতলা না হয়ে একটু শান্ত হলে ভাল হত। নইলে ঘুমিয়ে পড়বে সিপ্রা, ছবি দেখা আর সম্ভব হবে না। সিপ্রার গলাটাকে এভাবে এক হাতে জড়িয়ে ধরে থাকলে সন্দীপও কি ছবিটাকে ভাল করে দেখতে পারবে?

ছবিতে পার্কের ভিতরে ডাক্তারের পাশে পাশে হেঁটে ডাক্তারের অর্ডার আর উপদেশের কথা শুনছে হাসপাতালের মেড-মেয়েটি। মেয়েটির মুখে কী সুন্দর হাসি আর চোখে কী চমৎকার চাহনি। মুখে কোনও কথা না বললেও বুঝতে পারা যায়, ওই মেয়ের প্রাণটা কী কথা বলছে।

চমকে ওঠে সিপ্রা। সন্দীপ বলছে—চলো বাইরে যাই।

সিপ্রা—ছবি তো সবেমাত্র শুরু হয়েছে। এখনই চলে যেতে চাইছ কেন?

—ও ছবি এখন না দেখলেও চলবে।

—তবে চলো।

ছবির ঘর থেকে বের হয়ে এসে আর লাউঞ্জের সোফার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে যায় সন্দীপ, থেমে যায় সিপ্রা। সন্দীপ বলে—না, এখানেও নয়। চলো, একেবারে বাইরে চলে যাই।

একেবারে বাইরে এসে আর ফুটপাথের এদিক ওদিক দু'দিকে দু'বার ভ্রূক্ষেপ করেই সিপ্রার হাত ধরে সন্দীপ রায়।—এইবার আমরাই ছবি হয়ে একটু ঘুরে বেড়াই, কেমন?

সিপ্রা—আঃ, হাতটা ছাড়ুন।

সিপ্রার হাতটা ছেড়ে দিয়ে হেসে ফেলে সন্দীপ।—তোমার মনে সেকেলে লজ্জার কালিঝুলি কিছুটা আছে মনে হচ্ছে।

—আমার অবস্থাটা একটু ভেবে দেখবেন তো। কত লোক যাওয়া-আসা করছে, এর মধ্যে চেনা লোকও থাকতে পারে। কী মনে করবে তারা, যদি দেখতে পায় যে, অনাথ চৌধুরীর মেয়ে একেবারে বেপরোয়া হয়ে এক ভদ্রলোকের হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

—মনে করবে যে, অনাথ চৌধুরীর মেয়ে তার ভালবাসার মানুষটির সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—সেটাই তো আমার ভয়।

—বুঝতে পারছি না, কী করে তোমার এই ভয় ভেঙে দেওয়া যায়।

—আজ এখন ফিরে চলুন।

—তারপর?

—কাল একবার হরেনদার কাছে বলুন, তারপর হরেনদা যেন একবার বড় পিসির সঙ্গে কথা বলেন।

—কী কথা? কিসের কথা?

—তোমার ইচ্ছের কথা।

—আমার ইচ্ছের কথাটা তুমি বুঝেছ, এটাই কি যথেষ্ট নয়?

—আমার পক্ষে যথেষ্ট বৈকি। কিন্তু...কিন্তু কিছু মনে করো না, আজ আমার সত্যিই লজ্জা করছে। বিয়ে হয়ে যাক, তারপর দেখবে, তোমার হাত ধরে চলতে আমার একটুও লজ্জা করবে না।

—বিয়ে যেদিন হবে, সেদিন তো হবেই। সেটা কেউ খণ্ডাতে পারবে না। কিন্তু তার আগে কি আমি তোমাকে একটি দিনও দেখতে পাব না?

—পাবে বইকি, নিশ্চয় পাবে। বলতে গিয়ে সন্দীপের হাত ধরে ফেলে সিপ্রা।—যদি কোনও সোমবার রাসেল স্ট্রীটে মিসেস ডি' সিলভার সেলুনের কাছে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, তবে আমাকে নিশ্চয় দেখতে পাবে।

—বেশ, তোমার ভালবাসার এটুকু আহ্লাদনও আপাতত আমার কাছে যথেষ্ট। চলো, এবার বাড়ি ফিরে যাই।

—চলুন, কিন্তু আমার বাড়ি পর্যন্ত যাবেন না। আমাকে ভবানীপুরের কোথাও, মার্কেটের কাছে কিংবা সিনেমা হাউসের কাছে নামিয়ে দেবেন।

পাঁচ

রাসেল স্ট্রীটের একটি ল্যাম্পপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষার যে নায়িকা, যার নাম সিপ্রা চৌধুরী, তার মন-প্রাণ শুধু একটি শব্দ শোনবার জন্য ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। সন্দীপের ক্যাডিলাকের সাইরেন-হর্নের শব্দ। শব্দটাকে মনে-প্রাণে চিনে ফেলেছে সিপ্রা। গাড়িটা চোখে পড়বার আগেই, শুধু হর্নের শব্দ শুনে বুঝে ফেলতে পারে সিপ্রা, সন্দীপ আসছে। মাঝে মাঝে অন্য গাড়িও সাইরেন-হর্ণ বাজিয়ে ছুটে যায়। সে গাড়িকেও চোখে না দেখে শুধু হর্নের শব্দ শুনেই বলে দিতে পারবে সিপ্রা, ওটা সন্দীপের গাড়ির সাইরেন-হর্নের শব্দ নয়, ওটা এক বুড়ো সাহেবের রেসিং-গাড়ির

সাইরেন-হর্নের শব্দ। শব্দ শুনেই যখন বুকের ভিতরে অদ্ভুত এক চঞ্চলতার ঝংকার শিউরে ওঠে, নিঃশ্বাসের বাতাসে নিবিড় হয়ে যায়, তখন বুঝতে পারে সিপ্রা, এ নিশ্চয় সন্দীপের গাড়ির হর্নের শব্দ। এতক্ষণে সন্দীপ আসছে!

আজ সন্দীপকে বলতে হবে : এখানে এসে পৌঁছতে এত দেরি করে দাও বলেই তো ফিরতে এত দেরি হয়। রোজ রাত দশটায় বাড়ি ফেরবার কোনও কৈফিয়ত বড় পিসি আর বিশ্বাস করতে পারছেন না। বড় পিসির বকাবকির দুরন্ত ভাষা যে চড়-চাপড়ের চেয়েও দুরন্ত হয়ে উঠছে, সেটা তুমি কল্পনা করতে পার না বলেই আমার অনুরোধ গ্রাহ্য করছ না, বাড়ি ফিরতে রোজই রাত করে দিচ্ছ। রোজই দশরকমের মিথ্যে কথা বলে বড় পিসির কাছে কৈফিয়ত দিতে আমার একটুও ভাল লাগছে না।

অনাথ চৌধুরীর মেয়ে সিপ্রা চৌধুরীর ঘরের জীবনে বড় পিসির বকুনি যেমন একটা ভয়, তেমনই একটা মায়াও বটে; মরুভূমিতে যেমন রুক্ষ খেজুর গাছের ছায়াও ছায়া। বাড়িতে আরও মানুষ আছে কিন্তু কারও কাছ থেকে বকুনি শোনবার ভয় নেই সিপ্রার। বড় পিসি মাঝে মাঝে খুব রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠেন—হোটেলবাড়ি! হোটেলবাড়ি! কেউ যেন কারও কেউ নয়। মেয়েটাকে একবার কাছে ডেকে নিয়ে কেউ কোনদিন একটা মায়ার কথাও বলে না, কী অদ্ভুত বাড়ি রে বাবা।

বাপ অনাথ চৌধুরীর কাছে তাঁর কাজ-কারবার এমনই ধ্যানজ্ঞান আর তপস্যা যে, মেয়ের সঙ্গে পাঁচটা মিনিটও কথা বলবার সময় পান না। মাসের মধ্যে বড়জোর একটা-দুটো দিন, সিপ্রাকে চোখে পড়লে জিজ্ঞাসা করে ফেলেন—কেমন আছিস? সিপ্রা যদি বলে, কাল হঠাৎ খুব জ্বর হয়েছিল, তবু অনাথ চৌধুরীর মুখে দ্বিতীয় কোনও প্রশ্নের কথা বেজে ওঠে না। তিনি ব্যস্ত লয়ে চার-পাঁচটা ফাইলকে বড় ফিতে দিয়ে একসঙ্গে জড়িয়ে বাঁধতে থাকেন, জার্মানির ক্রুপস্ হের্শেল আর মার্সিডিজের সঙ্গে তাঁর করেসপণ্ডেসের বড় বড় ফাইল।

বড় পিসি রাগ চাপতে গিয়ে চাপাস্বরে গজগজ করেন—টাকাওয়ালা লক্ষপতির ঘরের চেহারা আমি অনেক দেখেছি। কিন্তু এমনটি আর কোথাও দেখিনি। মা-মরা মেয়ের এমন অনাদর, তাও আবার বাপের কাছে, কেউ কি কোথাও দেখেছে? আমি তো দেখিনি।

প্রতিবেশী নন্দবাবুর স্ত্রী যেদিন আসেন, সেদিন বড় পিসি বেশ গলা ছেড়ে তাঁর আক্ষেপের অনেক কথা বলেই ফেলেন : মেয়ের বাপ-ভাগ্যির ছিরি তো এই, দাদা-ভাগ্যির ছিরিটাই বা কী রকম? এক দাদা সপ্তাহের মধ্যে ছ'দিন শ্বশুরবাড়িতে থাকবার পর একদিন এসে এবাড়িতে থাকবেন। আর এক দাদা মাসের মধ্যে উনত্রিশ দিন সাহেবি হোটেলে থাকবার একদিন এসে এ বাড়িতে থাকবেন। আমি ভাবি, ওরা একদিনের জন্যেই বা আসে কেন? না এলেই তো পারে।

নন্দবাবুর স্ত্রী হাসতে থাকেন।—তা বললে চলবে কেন দিদি?

বড় পিসি—জানি জানি, সবই বুঝি, ওরকম করে বাপের সম্পত্তিতে একটু ছুঁয়ে না থাকলে ওদের চলবে কেন? কিন্তু বোনটাকে একটু তো দেখবি। এক দাদা বোনকে শুধু একটি কথা বলেনঃ পড়ছি, না পড়া ছেড়ে দিয়েছিস? আর এক দাদা শুধু বলেন—ইংরেজিটা খুব ভাল করে শিখে নিবি, নইলে কিস্সু হবে না। ব্যস্, ওই পর্যন্ত। দাদারা এই খবরটুকুও রাখেন না, কিংবা ভুলেই গিয়েছেন যে, বোনটা দু'বছর আগেই বি-এ পাস করেছে।

চলে যাবার জন্য নন্দবাবুর স্ত্রী উঠে দাঁড়াতেই বড় পিসির গলার স্বর যেন ফুঁপিয়ে ওঠে।—

মেয়েটার জন্যে কেউ কিছু ভাববে না, শুধু আমি যেন চুরির দায়ে ধরা পড়েছি। একরোখা অবাধ্য মেয়েকে সামলে রাখতে আর চিন্তে করতে করতে আমার আয়ু যে ফুরিয়ে এল। আমি তবে কাশী যাব কবে?

সন্ধ্যাবেলা সিপ্রাকে মিররের সামনে দাঁড়িয়ে সাজতে দেখে বড় পিসির উগ্র মুখরতার স্বর হঠাৎ নরম হয়ে যায়: দেখতে সুন্দর, লেখাপড়া ভাল শিখেছে, সে মেয়ের জন্যে একটি সৎপাত্র পেতে কোনওই অসুবিধা নেই। কিন্তু সেজন্য চেষ্টা হবে, তবে তো! বাপ কোনও চেষ্টা করেন না, দু-দুটো দাদারও কোনও চেষ্টা নেই। জলজ্যান্ত একটা বউদিও তো আছে। সেও কি একটু চেষ্টা করতে পারে না? ইচ্ছে করলেই পারে। কিন্তু ইচ্ছে করবে কেন? যে বউ পূজোর দিনেও শ্বশুরকে একটা প্রণাম করবার জন্যে আসে না, সে কি তার শ্বশুরের মেয়ের জন্য কোনও দরদ বোধ করতে পারে? কখ্খনও পারে না। আমি জানতে চাই, এরা কি তবে সত্যিই মেয়েটাকে সূর্য-চন্দ্রের নামে উৎসর্গ করে দিয়েছে?

সন্ধ্যা হতেই সিপ্রা যখন বড় পিসিকে ডাক দিয়ে বলে, আমি এখন একটু বাইরে যাচ্ছি, তখন বড় পিসির আপত্তি আর অনিচ্ছার প্রাণটা আবার চেঁচিয়ে ওঠে—শুধু ফ্যাশন আর ফাংশান—ফাংশান আর ফ্যাশন! এই নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাস তো দে। আমি কিছুই বলব না। আমি বলবার কে?

সিপ্রা হাসে। —তুমি না বললে কে আর বলবে?

বড় পিসি—আমি তবে স্পষ্ট করে বলছি, শুনে নাও মেয়ে। যদি এবছরেও তোমার বিয়ে না হয়, তবে আমি আর এখানে থাকব না। আমি কাশী চলে যাবই যাব।

রাসেল স্ট্রীটের একটি ল্যাম্পপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে অনেক বিস্ময়ের কথা ভাবতে গিয়ে একটা নতুন বিস্ময়ের দৃশ্য কল্পনা করতে পারে সিপ্রা। আশ্চর্য হয়ে হরেনদার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন বড় পিসি। হরেনদা বলছেন : একজন খুব সৎপাত্র সিপ্রাকে পছন্দ করে ফেলেছে, এইবার বিয়ের একটা শুভদিন ঠিক করতে হবে। বড় পিসির এতদিনের রুষ্ট মেজাজের চোখ-মুখের উপর কী চমৎকার খুশির হাসি ফুটে উঠেছে।

কিন্তু সন্দীপ এসে গিয়েছে। হাসছে সন্দীপ। সন্দীপও কি সিপ্রার কল্পনার এই ছবিটাকে দেখে ফেলেছে? তাই তো মনে হয়। সন্দীপের মুখে এত সুন্দর হাসি ফুটে উঠতে কোনওদিনও দেখেনি সিপ্রা।

সিপ্রা বলে—বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেশ সুন্দর নিরালা জায়গা অনেক আছে।

সন্দীপ—নিরালা?

হাত দিয়ে মুখের হাসিটা চেপে নিয়ে সিপ্রা বলে—হ্যাঁ। কেউ দেখতে পাবে না।

সন্দীপ—কেউ যদি না-ই দেখল, তবে কী আর হল, কোন লাভটা হল?

সিপ্রা—আমাদের দু'জনের লাভ হল।

সন্দীপ—তাহলে তো বলতে হয়, অমাবস্যার রাতে একটা শ্মশানের বাঁশঝোপের ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে বসে থাকা আরও ভাল, কাকপক্ষীও দেখতে পাবে না।

সিপ্রা—লোকে না দেখলে কী আসে যায়?

সন্দীপ—সবই আসে যায়। লোকে না দেখলে, তোমার জীবনের কোনও কিছুই সত্য হয়ে

উঠতে পারে না।

সিপ্রা—কিছুই বুঝলাম না।

সন্দীপ—বেশি বোঝাতে হলে তো বেশি মুখ খুলতে হয়।

সিপ্রা—হ্যাঁ, বেশ তো, মুখ খুলেই বলো না কেন? কোন কথাটাই বা মুখ খুলে বলতে তুমি বাকি রেখেছ?

সন্দীপ—বিয়ে ব্যাপারটা দু'জনের মধ্যে যে কী সম্পর্কের ব্যাপার, সেটা সকলেই জানে। তবু গায়ে হলুদ-টলুদ মেখে সেটা লোককে জানিয়ে আর বুঝিতে দিয়ে হয়। দুজনের ভালবাসার ব্যাপারটাকেও তেমনি লোককে জানিয়ে দেখিয়ে আর বুঝিয়ে দিতে হয়।

সিপ্রা—বাঃ, খুব বললে! লোকে দেখলেই সব হয়ে গেল?

সন্দীপ—আসলটার সবই হয়ে গেল। লোকে যদি না জানল যে, তুমি আমাকে ভালবাস, তবে আমি কী করে দেখব আর জানব আর বুঝব যে, কে আমাকে হিংসে করছে আর কে-ই বা আশ্চর্য হচ্ছে। তা হলে আমিই বা কী করে কোন গর্বটা বোধ করব?

সিপ্রা—সত্যি করে যদি ভালবাসা না থাকে, আর মেলামেশার ও ছুটোছুটির কাণ্ড দেখে লোকে যদি মনে করে ভালবাসা হয়েছে তবে....।

সন্দীপ—একই ব্যাপার। সেটাও জীবনের একটা লাভ। ধরো, কেউ ভুল করে আমার গলায় মালা পরিয়ে দিল, সেজন্য মালাটা তো আর মিথ্যে হয়ে যায় না, আমার গলাটাও নয়।

সিপ্রা—বুঝলাম না।

সন্দীপ—এর মধ্যে না বোঝবার মত কিছু নেই। আমি খুবই সোজা সহজ সরল সত্য কথা বলছি।

সিপ্রা—আমার কথা শোনো। সামনে একটা পুকুর, সে পুকুরের এক কোণে কেয়ার ঝোপ, পুকুরের জলে বড়-বড় পদ্মপাতা ভেসে রয়েছে। পেছনে আইভি লতার মস্ত বড় একটা মাচান। আর দু'পাশে হাসনুহানার ঝাড়। এর মধ্যে বসে গল্প করতে কি তোমার ভাল লাগবে না?

সন্দীপ—কতক্ষণ বসে থাকতে হবে?

—অন্তত দুটো ঘন্টা তো বসে থাকা উচিত।

—না, ওরকমের নিরালা আর ওরকমের একঘেয়ে তপস্যা আমার ধাতে সইবে না।

—আমার সঙ্গে বসে দু'ঘন্টা গল্প করলে কি একঘেয়ে তপস্যা করা হয়? তা হলে তো বলতে হয়, আমাকে সঙ্গে নিয়ে তোমার রোজই চার ঘন্টা ধরে ছুটোছুটি করাও একটা একঘেয়ে তপস্যা।

মাথাটাকে হঠাৎ কাত করে দিয়ে, শাহাজাদি খোঁপার মুক্তাঝালর দুলিয়ে, মুখ টিপে হেসে, আর দুই চোখের কালো ভুরু দুটোকে বিলোল করে দিয়ে সন্দীপের মুখের দিকে তাকায় সিপ্রা—মুখ খুলে বলতে লজ্জা করছে, তবু বলছি। চলো, আমি তোমার কাঁধে মাথা রেখে আর চুপ করে বসে থাকব। আর তুমি খুব আস্তে গুনগুন করে বসন্ত রাগ গাইবে। কেউ শুনতে পাবে না? শুধু আমি শুনব।

—অ্যাঁ? কী বললে? বসন্ত রাগ?

—হ্যাঁ!

—সেটা আবার কিসের রাগ?

—মনে নেই? সেদিন গানের জলসাতে তুমিই তো বললে, কী করে বসন্ত রাগ গাইতে হয়।

—ও হ্যাঁ। বলেছিলাম ঠিকই। বলবার দরকার ছিল, তাই বলেছিলাম।

—কিন্তু সে গান তুমি নিশ্চয় গাইতে জান, গাইতে পার।

—মোটেই জানি না, একেবারেই পারি না। গানের জলসার উদ্বোধন করতে হবে, তাই গান নিয়ে ভালমন্দ তর্কাতর্কির একটা বই থেকে ওই কয়েকটা কথা জেনে নিয়েছিলাম। ....কী? কী ভাবছ?

—কিছু ভাবতে পারছি না।

—তুমি যেমন ক্লাবের গানের সেক্শনের সুগায়িকা-সেক্রেটারি, আমিও তেমনই গানের সুগায়ক-পণ্ডিত।

—ঠাট্টা করছ কেন? আমি গান শুনতে ভালবাসি, গান শোনা আমার একটা শখ। শুধু হরেনদার অনুরোধের চাপে পড়ে সেক্রেটারি হয়েছি। কিন্তু তুমি...।

—বলো, মনে হচ্ছে আজ তোমার মুখে প্রশ্ন-সরস্বতী ভর করেছে।

—তুমি সেদিন নিজেই ভাল ছবি দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলে, আর আমাকেও সেই ছবি দেখবার জন্যে নিয়ে গেলে, কিন্তু...।

—এই রে! এ যে দেখছি সাদাসিধে প্রশ্ন-সরস্বতী নয়, কালো কুটিল সন্দেহ-সরস্বতী ভর করেছে।

—কিন্তু, তুমি তিনটে মিনিটও না ফুরোতে উঠে পড়লে।

—তোমাকে যখন কাছে পেয়ে গেলাম, তখন একটা ছবির কাছে আর বসে থাকবে কেন? তিন মিনিট ছবি দেখেছি, তাই যথেষ্ট। তার বেশি দেখা আমার সাধ্যিতে কুলোয় না।

—ছবিটাকে তা হলে তুমি আগে দেখনি।

—না।

—তবে কী করে বললে যে, এটা খুব ভাল ছবি।

—আমার বন্ধু বিনায়ক এই ছবির গল্পটা একদিন আমাকে শুনিয়েছিল।

—শুনতে তিন মিনিটের বেশি সময় লাগেনি?

—অ্যাঁ?—হ্যাঁ। যতদূর মনে পড়ে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগেনি।

সন্দীপের দুই চোখের উচ্ছল উজ্জ্বলতার হাসিটা হঠাৎ যেন একটা ময়লা ধোঁয়ার ঝাপটা লেগে আহত হয়েছে। সিপ্রার মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কথা বলে সন্দীপ।—ধান ভানতে এত শিবের গীত একটুও ভাল শোনাচ্ছে না, সিপ্রা।

সিপ্রা হাসতে চেষ্টা করে।—শিবের গীত বলছ কেন? আমি তো তোমারই গীত গাইছি।

—তুমি আমার কোনও কথাই বুঝতে পারছ না, বার বার শুধু একই কথা বলছ। এটা কি আমার গীত হল, না তোমার সন্দেহের গীত হল?

—ছি ছি, ওকথা বলো না। বলতে নেই। আমার মনে একটুও সন্দেহ নেই, আমি বরং নিজেরই উপর রাগ করছি, কেন তোমার সব কথা বুঝতে পারি না।

—আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি, তোমার মনের সমস্যাটা কী?

—কী?

—তোমার মত মেয়ের মনে যতটা একেলে রুচি থাকা উচিত ছিল, ততটা নেই। থাকলে আমাকে বুঝতে তোমার একটুও অসুবিধে হত না।

—বুঝি না, একেলে রুচি বলতে তুমি কী বলতে চাইছ। পাড়াতে কেউ কেউ আমার নিন্দে করে, অনেকে আবার প্রশংসাও করে যে, আমি বড় বেশি আপ-টু-ডেট মেয়ে।

—খুব ভুল কথা নয়।

—আমি যা-ই হই না কেন, আমি তো নির্ভয়ে তোমার কাছে এসেছি। তুমি যেখানে নিয়ে গিয়েছ, সেখানে গিয়েছি আর যতক্ষণ থাকতে বলেছ, ততক্ষণ থেকেছি। বড় পিসি রোজই ধমক দিয়ে বলেছেন, এত রাত পর্যন্ত কোথায় থাকিস? আমি স্পষ্ট করে বড় পিসিকে বলে দিয়েছি : যেখানে থাকতে ভাল লাগে, সেখানেই থাকি। এরপর যদি আমি সবচেয়ে আনন্দের কথাটা স্পষ্ট করে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তবেই কি আমি একটা সেকেলে বস্তু হয়ে গেলাম?

সিপ্রা চৌধুরী তার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের সেই কথাটা আজ স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা না করলে, আজ এতক্ষণ ধরে রাসেল স্ট্রীটের ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে দু'জনের মধ্যে এত কথা বলাবলির ব্যাপার হত না।

সিপ্রা বলছে—আর দেরি করা কি ভাল দেখায়? আরও দেরি করবার কি কোনও দরকার আছে? তুমি শুধু বলে দাও, বিয়েটা কবে হবে, কবে হলে ভাল হয়। আমি তা হলে তারিখটা হরেনদাকে একবার জানিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে যাব। তারপর যা-কিছু করবার, বড় পিসিকে আর বাবাকে জানিয়ে দেবার আর বুঝিয়ে দেবার সব দায় হরেনদাই বইবেন।

এতক্ষণ ধরে এত কথা বলাবলির পর আবার সিপ্রার এই জিজ্ঞাসার কথাটা ফিরে এসেছে। এর আগে দু-চারবার এই জিজ্ঞাসার আভাস সিপ্রার মুখের হাসিতে, চোখের কালো তারার চঞ্চলতায়, আর দু-চারটে লাজুক ভাষার শব্দে ফুটে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু আজ বড়ই স্পষ্ট করে ফুটে উঠেছে।

এই দু মাস ধরে শুধু প্রতি সপ্তাহে একটি সোমবারে নয়, সব বারেই সন্দীপের ক্যাডিলাক তৃষ্ণার্ত হয়ে ছুটে এসেছে, অপেক্ষার নায়িকা সিপ্রা চৌধুরীকে বুকে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে। দুরন্ত হয়ে ছুটেছে। যেখানে মানুষের মেলা, যেখানে আলোর মেলা, যেখানে উৎসব আর এগজিবিশন, সেখানে উপস্থিত হয়ে দু-চার মিনিট জিরিয়েছে ক্যাডিলাক, তারপর আবার ছুটেছে। দুমাসের মধ্যে সন্দীপের সঙ্গে তিনবার এয়ারপোর্টে আর একবার হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেও ঘুরে বেড়িয়ে এসেছে সিপ্রা।

ক্যাডিলাক একটুও ক্লান্ত হয়নি, ক্লান্তিবোধ করে না। কিন্তু সিপ্রা চৌধুরী একটু ক্লান্ত না হয়ে পারেনি। আজও আবার ছুটোছুটি করবে নাকি? সিপ্রার মুখে এরকম প্রশ্ন শুনে সন্দীপেরও বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে, এটা সিপ্রা চৌধুরীর ক্লান্তিরই প্রশ্ন। হেসে হেসে সিপ্রাকে বুঝিয়েছে সন্দীপ : ভালবাসা কখনও ক্লান্ত হতে পারে না সিপ্রা, ঝর্নার জল কখনও ক্লান্ত হয় না। কিন্তু সন্দীপের মুখের এ ধরনের উপমাময় ভাষা শুনেও সিপ্রার মুখের হাসিটা ঝর্ণার জল কলস্বরে উচ্ছলিত হয়ে উঠতে পারেনি।

সন্দীপ বলে—তা হলে কি আজ এখানে শুধু দাঁড়িয়ে থাকাই হবে?

সিপ্রা—তুমি তো এখনও স্পষ্ট করে কিছু বলছ না।

সন্দীপ—আমাকে কি একটু ভেবে দেখবার সময়ও দেবে না?

সিপ্রা—ভেবে দেখবে? এখনও...।

সন্দীপ—পাঁজির পাতা ওল্টাতে হবে না ঠিকই, তবু তো একটু ভাবতে হবে। যেকোনও দিনকে চট করে একটা শুভ দিন বলে ধরে নেওয়া তো উচিত নয়।

হঠাৎ-জ্যোৎস্নার আলোর মত একটা হঠাৎ-তৃপ্তির হাসি সিপ্রার মুখে চমকে ওঠে। সিপ্রার প্রাণের ভিতরে উৎকণ্ঠ জিজ্ঞাসাটার সব বিষাদ সেই আলোর ছোঁয়া লেগে এক মুহূর্তেই মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। রাস্তার লোকের আর গাড়ির যাওয়া-আসার দৃশ্যটা যেন সিপ্রার চোখেই পড়ছে না। সন্দীপের গায়ের রঙিন ফ্যানেলের কোটের যে বোতামটা সন্দীপের বুক ছুঁয়ে রয়েছে, তারই উপর লুটিয়ে পড়ে সিপ্রার একটা হাত। —বেশ তো, একটু ভেবে নাও। একটা দিন ঠিক করবার জন্যে কতই বা আর ভাবতে হবে?

সন্দীপ—ভাবতে এমন কিছু সময় লাগবে না। আজ কিংবা কাল কিংবা পরশু, এর মধ্যেই আমি ভেবে ফেলব। কিন্তু আজ কি আমি এখান থেকেই চলে যাব?

সিপ্রা—না, কখ্খনও না।

সন্দীপের একটা হাত শক্ত করে ধরে নিয়ে সিপ্রা বলে—চলো, কী যেন নাম, কোন রেস্টুরেন্টে যাবে বলছিলে?

সন্দীপ—অরোরা?

সিপ্রা—না, অরোরা নয়।

সন্দীপ—তবে কলরডো।

সিপ্রা—না-না, ওরকমের কোনও নাম তো বলনি।

সন্দীপ—আমারও ঠিক মনে পড়ছে না। আমি বলি, আজ আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই।

সিপ্রা—কিন্তু আজ যে সত্যিই...তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না....কেন আজ তোমার সঙ্গে ছুটোছুটি করতে এত ইচ্ছে হচ্ছে।

সন্দীপ হাসে—তবে চলো, গাড়িটা যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাই।

চকচকে ক্যাডিলাক ছুটতে শুরু করে বটে, কিন্তু তার সেই উদ্দাম বেগ আজ আর নেই। যেন একটু আনমনা হয়েছে দুরন্ত উল্লাসের ক্যাডিলাক। দিক্‌ভ্রান্তের মত কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে, ঘুরে এসে আবার সেদিকেই চলে যাচ্ছে।

আলিপুরের সড়কের একটা ল্যাম্পপোস্টের কাছে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় ক্যাডিলাক।

গাড়ির ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে সড়কের পাশের একটা বাড়ির দিকে তাকায় সন্দীপ। বাড়ির লনের সবুজ ঘাস আর বারান্দার উপর টবে বড় বড় ডালিয়ার উপর নকল জ্যোৎস্নার আলো ছড়িয়ে দিয়ে জ্বলজ্বল করছে ব্যালকনির উপর পূর্ণিমার চাঁদের মত চেহারার একটা ল্যাম্প।

আবার ছুটতে শুরু করে ক্যাডিলাক। দশ মিনিটও লাগে না, হাজরা রোডের মোড়ের কাছে এসেই থেমে যায়, যেখানে চেঁচিয়ে হাঁকাহাঁকি করছে রজনীগন্ধার একটা ফেরিওয়ালা।

সিপ্রার চোখে একটা নিবিড় তৃপ্তির আলো যেন বিহ্বল হয়ে ভাসতে থাকে।—রজনীগন্ধা কিনবে বুঝি?

সন্দীপ—কী বললে?

সিপ্রা—ভালই হবে। তোমার দেওয়া রজনীগন্ধা আজ হাতে ধরে রেখেই বড় পিসিকে বলব আজ তুমি আমাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করবে না। হরেনদা এসে তোমাকে বলবেন, এ রজনীগন্ধা কোথা থেকে এসেছে।

সন্দীপ—আমি তো রজনীগন্ধা কিনব বলে এখানে থামিনি।

সিপ্রা—তবে এখানে থামলে কেন?

সন্দীপ বলে—এটা হাজরা মোড়, যেখানে রোজই তোমাকে নেমে যেতে হয়।

—অ্যাঁ, তাইতো! বলতে বলতে ব্যস্ত হয়ে গাড়ি থেকে নেমে যায় সিপ্রা।

ছয়

দমদমের হেমলতার কাছে চিঠি লিখছেন বালিগঞ্জের চারুশীলা রায়।—আমার স্বপ্ন ব্যর্থ হল, হেম। জানতে পেরেছি যে, সন্দীপ তোমাদের ওখানে যায় না। কিন্তু কোথায় যে যায়, তা জানি না। আমার বিশ্বাস ছিল, তোমাদের বাড়ির বাতাস গায়ে লাগলে আমার ছেলের সব বিকার শান্ত হয়ে যাবে। তোমার মেয়ে সুপ্রভা তো হীরের-টুকরো মেয়ে! তাই আশা করেছিলাম, সে মেয়ের কাছে এসে কাচও কাঞ্চন হয়ে যাবে। তাই আমি ইচ্ছে করেই সেদিন সন্দীপকে সঙ্গে নিয়ে তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। খুব ভুল করে ফেলেছি, হেম। তোমরা আমাকে ক্ষমা করো। ভগবান আমাকে ক্ষমা করুন।

দমদমের মহিম বসুর বাড়িতে সেই চকচকে মোটরগাড়ি আর আসে না। একটি মাস পার হয়ে গেল, তবুও আর এল না। তাই সন্দেহ করেছেন চারু উকিলের মা: এ কী রে বাবা, মেঘটা শুধু গর্জে গেল, বর্ষাল না।

শৈলবালা এরকম কোনও সন্দেহ না করে, কিন্তু বেশ চিন্তিত হয়ে একদিন মহিমবাবুর বাড়িতে এসেছিলেন, আর হেসে হেসে হেমলতার কাছে তাঁর আশার কথাটা বলেছিলেন : মনে হচ্ছে, আপনাদের এখানে শিগগিরই একটা শুভ ব্যাপার হবে।

হেমলতা বললেন—না।

—আপনি ভাল আছেন?

—হ্যাঁ।

—মহিমবাবু ভাল আছেন?

—হ্যাঁ।

—বিকাশ ভাল আছে?

—হ্যাঁ, চিঠি পেয়েছি ভাল আছে।

—সুপ্রভা ভাল আছে?

—হ্যাঁ।

—ওই যে চমৎকার ছেলেটি, যে আপনাদের এখানে প্রায় রোজই আসত, সে এখন কোথায়?

—জানি না।

—কিন্তু সে কি আর আসবে না?

—না।

—সে কি একথা নিজেই বলে দিয়ে গিয়েছে?

—না, তার মা যে চিঠি লিখেছেন, সে চিঠি পড়ে বুঝেছি যে তাঁর ছেলের আর এখানে আসবার মন নেই।

হেমলতার শান্ত মুখটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে, আর নিজেরাই একটা করুণ নিঃশ্বাসের উচ্ছ্বাস সামলে নিয়ে চলে গেলেন শৈলবালা। তিনি জানেন যে, তাঁর একটা দুর্নাম আছে। তিনি নাকি বড়ই ছিঁচকাঁদুনে স্বভাবের মানুষ। লোকে বলে, ছিঁচকাঁদুনে শৈলদি।

হেমন্তবাবুর কাছে এসে কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন শৈলবালা—বিয়ে হবে না।

হেমন্তবাবু—কেন?

শৈলদি—ছেলের মা নিজেই চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছেন, সুপ্রভাকে তাঁর ছেলের পছন্দ হয়নি।

হেমন্তবাবু—কী আশ্চর্য, নিজেকে কি একটা দেবতা বলে মনে করে বালিগঞ্জের মাধব রায়ের ছেলে?

হেমন্তবাবুর মুখ থেকে সন্দীপের মা চারুশীলার এই চিঠির কথা শুনতে পেয়েছেন সেই ভদ্রলোক, কালীঘাটের গানের জলসাতে যিনি সেদিন উপস্থিত ছিলেন, হেমন্তবাবুরই ভাগ্নে বিনায়ক হালদার, যাঁর চোখে সর্বদা সোনার ফ্রেমের চশমা চিকচিক করে, যিনি সব সময় ধূমপানের একটি সুবঙ্কিম পাইপ কামড় দিয়ে ধরে রাখেন, সে পাইপের মধ্যে ধোঁয়া কিংবা তামাক থাকুক বা না থাকুক।

এই বিনায়ক হালদারের মুখ থেকে খবর শুনে সন্দীপ জানতে পেরেছে যে, মা একটা চিঠি লিখে দমদমের সেই অদ্ভুত বাড়ির কাউকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, বিয়ে হতে পারে না, হবেও না।

বালিগঞ্জের রায়ভবনের দোতলার একটি ঘরে বিনায়কের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলে সন্দীপ, হাতের গেলাসের হুইস্কি উছলে ওঠে।—মাতৃদেবী তো জীবনে একটাও ভাল কথা বলতে পারলেন না, ভাল একটা কাজও করতে পারলেন না। এই প্রথম একটি ভাল কাজ করলেন। বেশ করেছে, চিঠি দিয়ে সত্য কথাটা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়ে ভাল করেছেন।

প্রতি সপ্তাহে রবিবারের সকালবেলাতে সন্দীপ রায়ের বাড়িতে একবার না এসে পারেন না বিনায়ক হালদার। সন্দীপ জানে, কথায় কথায় বিনায়ক সন্দীপকে জানিয়েও দিয়েছে যে, সন্দীপের ইনটেলেক্ট আর পার্সোনালিটি বিনায়কের কাছে সত্যিই শ্রদ্ধাময় একটি বিরাট বিস্ময়। তিনি নিজেও স্বাধীন চিন্তার মানুষ, কিন্তু সন্দীপ রায়ের স্বাধীন চিন্তার অবাধ উদারতা তাঁকেও বিস্মিত করেছে। কোনও ইনহিবিশন নেই, চিন্তায় ও আচরণে কোনও পুরনো বিশ্বাসের উপদ্রব নেই, সন্দীপ রায়ের মত দ্বিতীয় কোনও বিশুদ্ধ আধুনিক মানুষ বিনায়কের চোখে কখনও পড়েনি।

সন্দীপও তাঁর ভক্ত এই বিনায়ক হালদারের একজন অনুরাগী বন্ধু। কোনও রবিবারের সকালবেলাতে বিনায়ক এলে সন্দীপের সকালবেলার প্রাণটা যেন দুঃসহ একটা শূন্যতা বোধ করে। সন্দীপেরই ইচ্ছার মমতায় সন্দীপের ব্যাঙ্কে একটি কাজ পেয়েছেন বিনায়ক হালদার। কাজটা কোনও চাপ দিয়ে বিনায়কের স্বাধীন চিন্তার জীবনটাকে উৎপীড়িত করে না। যেদিন ইচ্ছে হয়, সেদিন একবার ব্যাঙ্কে যান বিনায়ক। অফিসের একটি কামরার নিভৃতে বসে এক পেয়ালা চা পান করেন আর চলে যান। ব্যাঙ্কের সকলেই জানে যে, বিনায়ক হালদার হলেন সন্দীপ রায়ের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, বিনা কাজের ও মোটা মাইনের একজন সম্মানিত পোষ্য।

এহেন বিনায়ক হালদার আজ তাঁর হাতের গেলাসে চুমুক না দিয়ে, আর একটু আশ্চর্য হয়ে সন্দীপের মুখের দিকে তাকান।—আমি ভাবছি, ওখানে তোমার মেলামেশার ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত ম্যাচিওর করল না কেন? হেমন্তমামার কাছে যা শুনেছি, তাতে আমার তো মনে হয়েছে যে, সে মেয়ে সত্যিই চমৎকার মেয়ে।

সন্দীপ—তোমার এরকম মনে হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয়নি।

—কেন হয়নি বলতে পার?

—পারি। সে মেয়ে হল সেকেলে অভিরুচির একটি পুতুল।

—তাই বল। গেলাসে চুমুক দিয়ে নিয়ে হাঁফ ছাড়েন বিনায়ক হালদার।

সন্দীপ বলে—তুমি তো জান, আমি আর যা কিছু সহ্য করতে পারলেও, সেকেলেপনা কিছুতেই সহ্য করতে পারি না।

বিনায়ক—জানি, খুব জানি। ওটা সহ্য করা উচিতও নয়। কিন্তু...।

গেলাসে আর একটা চুমুক দিয়ে বিনায়ক বলেন—কিন্তু এই যে সেদিন দেখলাম, যে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তুমি গানের জলসা থেকে চলে গেলে, যার সঙ্গে তোমার এখন মেলামেশা চলছে, সে মেয়েকে তো বেশ একেলে অভিরুচির মেয়ে বলে মনে হয়েছে।

—খুব একেলে না হোক, খুব সেকেলেও নয়।

—আমার মনে হয়, মেলামেশার ব্যাপার ম্যাচিওর করতে খুব বেশি সময় না লাগলেই ভাল হয়।

সন্দীপ—তুমি কিন্তু খুবই অদ্ভুত কথা বলে ফেলেছ বিনায়ক। ভালবাসা কি বাজপাখি? দেখবে আর সেই মুহূর্তে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবে, এটা কি ভালবাসার নিয়ম?

বিনায়ক— না না, কখ্খনও না, হতেই পারে না!

বিনায়ক গেলাস রেখে দিয়ে আর পাইপ ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছাড়তেই, সন্দীপ বোতলটাকে বিনায়কের গেলাসের দিকে এগিয়ে দেয়। —আর একটু নাও।

বিনায়ক—হ্যাঁ, নেব। কিন্তু তুমি....যে সেই দুটি মাত্র চুমুক দিয়ে গেলাসটাকে রেখে দিয়েছে, আর তো একবারও তুলছ না দেখছি।

সন্দীপ—তুমি তো জান, আমি কোনও'অভ্যাসের দাস হতে পারি না। একেবারেই না। ওই যা-কিছু যেটুকু যতক্ষণ ভাল লাগে, ব্যস, তার বেশি আর নয়।

বিনায়ক—আমি দেখেছি, সবকিছুতে তোমার কেন যেন একটা অনীহা আছে।

সন্দীপ—আছে হয়ত। আমি সাঁতার দিতে ভালবাসি, ডুব দিতে ভালবাসি না। এটা যদি জলের প্রতি অনীহা হয়, তবে হল।

...ওঃ ওঃ ওঃ। বিনায়ক হালদার বিহ্বল হয়ে বুকভরা শ্রদ্ধার উদ্‌গার তুলতে থাকেন। —ওঃ, তুমি কত সহজ করে জীবনের কত কঠিন রহস্যের তত্ত্ব বুঝিয়ে দিতে পার, সন্দীপ! এ না হলে আমার মত কট্টর-যুক্তিবাদী মানুষ কি তোমার কাছে আসত, আর তোমার মুখের কথা শুনতে এমন দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করত?

সন্দীপ—আমি কোনও বই পাঁচ-পাতার বেশি পড়ি না। কোনও ছবি তিন মিনিটের বেশি দেখতে পারি না, কোনও গান এক মিনিটের বেশি শুনি না। যদি অমৃত পাই, তবুও আমি শুধু

একটু সিপ করব, তার মধ্যে নিজেকে চুবিয়ে দেব না। আমি বেশিক্ষণের কোনও কিছুই চাই না, বিনায়ক।

বিনায়ক—খুব ভাল। সুন্দর ফুলটাকে একবার দেখলাম, বড় জোর আর একবার দেখলাম। তারপর আর তো কিছু করবার নেই। একঘেয়েমি জীবনের বিউটি নষ্ট করে।

সন্দীপ—সময়ের অপচয় আর অপমান করাই হল সেকেলে মনোবৃত্তির সবচেয়ে বড় আনন্দ। কবি হতে হলে সারারাত চাঁদ দেখতে হবে, ধার্মিক হতে হলে সারারাত চাঁদ দেখতে হবে, ধার্মিক হতে হলে দিনে পাঁচ লক্ষ নাম জপ করতে হবে, পণ্ডিত হতে হলে একটা শ্লোককে রোজ একশোবার করে সারা বছর পাঠ করতে হবে, সেকেলে সাধের এই জঘন্য স্বভাবটা আসলে কিন্তু একরকমের কাঙালপনা!

বিনায়ক—নিশ্চয় নিশ্চয়, কাঙালপনা বইকি?

সন্দীপ—এই কাঙালপনারই নানারকম গালভরা নাম আছে। নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, একাগ্রতা...।

হেসে চেঁচিয়ে ওঠেন বিনায়ক। কৃতজ্ঞতা, লেগে থাকা, পড়ে থাকা। সবটুকু খাব, সবখানি নেব, শেষ পর্যন্ত দেখব, চিরকাল অপেক্ষা করব, ইত্যাদি ইত্যাদি! ডুবে মরবার যত দড়ি-কলসি। আমাদের স্থিতপ্রজ্ঞ-দাদার কথা তোমাকে কোনওদিন বলেছি কি?

সন্দীপ হাসে—না।

বিনায়ক—বাগবাজারের স্কুলমাস্টার হরলালের বড়দা, আমি তাঁর নাম রেখেছি স্থিতপ্রজ্ঞ-দাদা। উঃ, ভদ্রলোক একুশ বছর ধরে শুধু এক পাণিনি পড়েছেন।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে সন্দীপ।—অথ্যাৎ ব্যাকরণ-বিদ্যার একটি ঝাঁকমুটে হয়েছেন। বীভৎস। এটাই হল সেকেলে স্কলারশিপ, যার মধ্যে ইনটেলেক্টের কোনও কাজ থাকত না। যা-ই হোক, আমি বলতে চাই, নিষ্ঠা-ফিষ্ঠা সবই দরকার। কিন্তু তার একটা মাত্রা থাকা চাই।

বিনায়ক—নিশ্চয় চাই।

সন্দীপ—আমি বলতে চাই, কৃতজ্ঞতা ভাল, কিন্তু কৃতজ্ঞতার বন্ধনটা ভাল নয়। নিষ্ঠা-ফিষ্ঠা মন্দ নয়, কিন্তু নিষ্ঠার বন্ধন ভাল নয়।

বিনায়ক—ওঃ ওঃ, তুমি সত্যিই....।

সন্দীপ—তুমি অভিযোগ করতে পারো, সন্দীপ রায় নামে লোকটা বুঝি শখের ভালবাসার একটা ভ্রমর। আজ এই ফুলে, কাল সেই ফুলে...।

বিনায়ক—না না না, এরকম কদর্য অভিযোগ আমি করতেই পারি না।

সন্দীপ—যেটা আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ানক ভয়, সেটা হল ওই ভয়। ভুল করে যেন সেকেলে স্বভাবের কোনও মেয়েকে জীবন সঙ্গিনী না করে ফেলি। দোষ বল আর গুণ বল, আমি এই ভয়টাকে খুব ভয় করি।

বিনায়ক—এটা তোমার ভয় নয় সন্দীপ, এটা তোমার সৎসাহস।

সন্দীপ—আমি যা, আমি তা। আমি নিজেকে জানি। নিজের মনের সঙ্গে তো কোনও ফাঁকি চলে না বিনায়ক। ভাল করে না বুঝে-সুঝে, একটু যাচাই না করে, কাউকে চট করে বিয়ে করে ফেলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমরা নিন্দে কর, বা যা-ই কর।

বিনায়ক—নিন্দে করব কেন? কখ্খনও না। এটা তো আদর্শবাদী মানুষের সতর্কতা, সততা।

ঘরের দরজার কাছে এক আগন্তুকের হাস্যময় মূর্তি দেখা দেয়। চেঁচিয়ে ওঠে সন্দীপ। —ওই দেখো বিনায়ক, যাকে দেখলে আমার এই সকালবেলার আনন্দ একেবারে নস্যাৎ হয়ে যাবে, তিনি এসেছেন।

খাকি-রঙের মোটা কাপড়ের শার্ট, আর খাকি-রঙের শক্ত জিনের ঢিলে প্যান্টালুন, দু-তিন দিনের না কামানো গালে ছাঁটা ঘাসের মতো খোঁচা খোঁচা দাড়ি, এইরকমের শ্রীসম্পন্ন একটি মূর্তি। সে মূর্তির হাতে কালো কাপড়ের একটা রুমাল।

বিনায়ক হালদার ডাকেন—এসো মন্দার।

সন্দীপ—ঘেঁটু ফুলের নাম মন্দার!

কালো রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ঘরের ভিতর ঢোকে মন্দার। ধপ করে সোফার উপর বসে। সঙ্গে সঙ্গে সন্দীপ তার হাতের সেই গেলাসটা মন্দারের কাছে এগিয়ে দেয়, যে গেলাসে সন্দীপের দুই চুমুকের ছোঁয়া লেগে আছে।—নাও, গিলে ফেলো।

মন্দারের মুখে অদ্ভুত এক নিবিড়-শান্ত হাসি ফুটে ওঠে। এক চুমুকে গেলাসের তরল অবদানের সবটুকু খেয়ে ফেলেই ঢেঁকুর তোলে মন্দার।—আজ ভেবেছিলাম, আসব না।

সন্দীপ—সে কি? তুমি আসবে না, আমার এমন সৌভাগ্য কি কোনওদিনও হবে?

মন্দার—আমাকে যদি একটা গরম কোট কিনে এনে না-দাও তবে এই মাঘের কোনওদিনও তোমার এখানে আমার আসা সম্ভব হবে না, বন্ধু।

সন্দীপ—'কিনে এনে না-দাও' কথাটার মানে কী হয়, বন্ধু? আমি তোমার মাইনে-করা একজন চাকর, নাকি বন্ধু? আমি তোমার জন্য গরম কোট কিনব, নিজের হাতে বয়ে নিয়ে আসব, আর তোমার করকমলে সমর্পণ করব, তুমি এতটা আশা কর কোন সাহসে, হে বন্ধু?

মন্দার হাসে।—তুমি তোমার বাঁ হাতে কুড়িটা টাকা আমার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেই তো পার, বন্ধু! তা হলেই আমি টাকাটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে যেতে আর গরম কোটটা কিনে ফেলতে পারি, বন্ধু।

সত্যিই বন্ধু। সন্দীপের কলেজ জীবনের এক ক্লাসের বন্ধু। অতীতের সেই বন্ধুত্বের দাবিতে মন্দার আজ সন্দীপের এক গেলাসের বন্ধু হতে পেরেছে।

তিন বছর আগে, এই রকমই এক মাঘের শীতের সকালবেলাতে মন্দার দত্ত হঠাৎ এসে দাবি করেছিল।—আমাকে একটা চাকরি দিতেই হবে সন্দীপ। নইলে আমি একেবারে না খেয়ে মরে যাব।

সন্দীপ—কিন্তু চাকরি করবার কি তোমার সামান্য যোগ্যতাও আছে? আমি তো ভুলে যাইনি যে, তুমি অঙ্কেতে শূন্য পেয়েছিলে, ইংরেজিতে তিন আর বাংলাতে সাত।

—আমি কি তোমার জুতো মোছবার চাকরিটাও করতে পারব না? নিশ্চয় পারব।

—বাজে কথা বলো না।

—তা হলে তুমি একটা কাজের কথা বলো। মোট কথা, আমাকে টাকা দিতেই হবে, কোনও কাজ দাও বা না-দাও।

—মাস গেলে ত্রিশটা টাকা দিতে পারি, তার বেশি নয়।

—তাই দিও।

—কিন্তু মনে রেখো, আমার এই চারিটির মেয়াদ মাত্র একটি বছর, তার বেশি নয়।

—বেশ।

কথা ছিল, মাস শেষ হলে একদিন এসে ত্রিশটা টাকা নেবে আর চলে যাবে মন্দার। কিন্তু মন্দার দত্ত নিজের ইচ্ছায় একটা কাজ খুঁজে বের করেছে। কাজ করবার জন্য রোজই একবার এ-বাড়িতে আসে মন্দার। সন্দীপের চাকর মালী আর বাবুর্চিকে বকাবকি করে। সবারই কাজের ভুল ধরে। সবাইকে শাসায় এবার ভুল করলে আর রক্ষে নেই। যে ভুল করবে, তাকে একেবারে ডিসমিস করে দেওয়া হবে। শাসানি শেষ হবার পর বেশ শান্ত হয়ে চা আর পাউরুটি খায় মন্দার। তারপর চলে যায়।

নীচের তলার ঘরে ও বারান্দায় মন্দার দত্তকে একদিন ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখে বিনায়ক হালদার জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আপনি বোধ হয় এ বাড়ির নতুন কেয়ারটেকার?

মন্দার জবাব দিয়েছিল—হ্যাঁ, কেয়ারটেকার বলতে পারেন, আবার ডোন্ট-কেয়ারটেকারও বলতে পারেন।

খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিল সন্দীপ, প্রথম যেদিন এক রবিবারের সকালবেলাতে মন্দার দত্ত হন্তদন্ত হয়ে এই ঘরের ভিতরে ঢুকেছিল। ধমক দিয়েছিল সন্দীপ।—তুমি এখানে এলে কেন? তোমাকে তো আমি ডাকিনি।

মন্দার—বিনায়কবাবু যদি এখানে আসতে পারেন, তবে আমিও কি আসতে পারি না? আমিই তো তোমার পুরনো বন্ধু, বিনায়কবাবু সেদিনের বন্ধু।

সন্দীপ—না, তুমি এখানে আসবে না।

মন্দার—বিনায়কবাবুর মত আমিও কি একটু হুইস্কি পেতে পারি না। বিনায়কবাবুর মত আমিও কি তোমাকে সম্মান করতে পারি না?

হেসে ফেলে সন্দীপ—তা হলে কী আর বলি, তা হলে একটু হুইস্কি খেয়েই যাও।

সন্দীপের আপত্তি এইভাবে টলিয়ে দিয়ে, এই ঘরের ভিতরে এসে বসবার, আর সন্দীপকে সম্মান করবার যে অধিকার নিজের চেষ্টায় তৈরি করে নিয়েছিল মন্দার, সে অধিকার আজও অটুট আছে। সন্দীপকে সম্মান করবার একটা পদ্ধতিও নিজের জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে তৈরি করে নিয়েছে মন্দার। মন্দারকে লক্ষ্য করে যে ভাষায় যত কৌতুক করুক না সন্দীপ, তার সে কৌতুকের মধ্যে তাচ্ছিল্যময় যত উল্লাস থাকুক না কেন, মন্দার শুধু হাসে। মন্দারের এই অমধুর হাসিটাই হল সন্দীপের প্রতি মন্দারের খুশি-প্রাণের সম্মানময় অর্ঘ্য। মন্দরাকে তুচ্ছ করে কৌতুক উপভোগ করবার অভ্যাসটা সন্দীপেরও একটা নেশা হয়ে উঠেছে, যেন সন্দীপের ব্যক্তিত্বেরই একটা নেশা। সে নেশাতে দুই চুমুক হুইস্কির নেশার চেয়ে বেশি মাদক আবেশ আছে।

সন্দীপ বলে—দেখছ বিনায়ক, মন্দারকে আজ হাসপাতালের মড়াঘরের একটা দারোয়ানের মতো দেখাচ্ছে কী না?

মন্দারের মুখের শান্ত হাসিটা থমথম করে।

বিনায়ক বলেন—হ্যাঁ, ঠিক, সেই রকমই দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু দাড়িটা কামিয়ে ফেললে....।

মন্দার বলে —দাড়ি কামাতে পয়সা লাগে।

সন্দীপ—শুনলে তো বিনায়ক, মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্যের যুক্তিটা?

মন্দার হাসে, শুধু হাসে। শান্ত নীরব হাসি। কিন্তু সন্দীপের উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দটা যেন একটা নিগূঢ় তৃপ্তির ঝংকার।

সন্দীপের কোনও কথার কিংবা কোনও সঙ্কেতের অপেক্ষায় না থেকে, মন্দার হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপরে রাখা বোতলটাকে কাছে টেনে নেয়। গেলাসে হুইস্কি ঢালে, এক চুমুকে খেয়ে ফেলে ঢেঁকুর তোলে।

সন্দীপ বলে—আহা, কী নির্লোভ, কী লজ্জাশীল একটি সজ্জন এই মন্দার দত্ত। শুনছ বিনায়ক?

বিনায়ক— বলো, বলো।

সন্দীপ—এই বিশ্বে, এমন চিজটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।

মন্দার দত্ত তার হাতের কালো রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছে আর হাসে।

সন্দীপ—ছেলেবেলায় গল্পের বই-এর ছবিতে হাট্টিমাটিমটিম দেখেছিলাম। আমাদের মন্দার দত্ত হলেন একটি জ্যান্ত হাট্টিমাটিমটিম, যদিও চেহারাটা ভিন্ন রকমের।

মন্দার হাসে—সন্দীপের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে —আজ বেশ ভালো লাগছে।

সন্দীপ—কেন?

মন্দার—কেন আবার কী? তোমার সবই ভাল। তোমার বাবুর্চি, তোমার মালী, তোমার বেয়ারা, সবাই ভাল।

সন্দীপ—আমার নামটা করছ না যে? আমি বুঝি ভাল নই?

মন্দার—সেটা কি আর বলতে হবে? তোমার মত মানুষ হয় না। এবার শুধু....।

সন্দীপ—এত লজ্জা করে হাসছ কেন?

মন্দার—এবার শুধু তোমার মত ভাল কেউ একজন এ বাড়িতে চলে আসুক।

সন্দীপ—শুনলে তো বিনায়ক, কী কথা বলছে মন্দার?

বিনায়ক—শুনেছি।

সন্দীপ—মন্দার এতদিনে এই প্রথম একটা ভাল কথা, মানুষের মত কথা বলল।

টেলিফোনের শব্দ বেজে উঠেছে। রিসিভার হাতে তুলে নিয়ে কথা বলে সন্দীপ—কে? দীপালি? কী খবর?....না, আজ নয়। কী বললে? আশার পথ চেয়ে বসে থাকতে আর ভাল লাগে না? তা তো লাগবেই না। কিন্তু আজ আমার অনেক কাজ আছে...হ্যাঁ, ওটাও কাজ, অস্বীকার করছি না। ...না, কালও নয়। পরশু অর্থাৎ সোমবারে যাব...হ্যাঁ অবশ্য অবশ্য।

পাইপের ধোঁয়া মুখ ভরে টেনে নিয়ে আর দুই চোখে একটা চকচকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ধরে নিয়ে কথা বলেন বিনায়ক—দীপালি! এখন তবে হোয়ার ইজ সিপ্রা?

সন্দীপ হাসে—যেখানে আছে, সেখানে আছে।

বিনায়ক—তার মানে বোধ হয় এই যে...।

সন্দীপ—তার মানে যেখানে ছিল, সেখানে আছে। আমি আর কি করতে পারি বলো?

সাত

দীপালি সোমের জন্মদিন। টেবিলের উপর বিরাট আকারের একটি কেক। কেকের উপর রঙিন আইসিং-এর প্রলেপ যেন চমৎকার করে আঁকা একটি ছবি। সে ছবিতে হ্রদের নীল জলের উপর

পঁচিশটা লাল পদ্ম ভাসছে। টেবিলের উপর পঁচিশটা ডালিয়ার পাশে পঁচিশটা মোমবাতি জ্বলছে।

দীপালির কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে কথা বলে সন্দীপ। —আমি মনে করেছিলাম, বড়জোর আঠারোটা মোমবাতি জ্বলবে, তার বেশি নয়। কোনওমতেই নয়।

সন্দীপের পিঠে একটা চিমটি কেটে দীপালি হাসতে থাকে।—একথার মানে কী? নিশ্চয় কোনও অষ্টাদশীর জন্যে তোমার প্রাণটা আইঢাই করছে।

সন্দীপ—একুটও না, কোনওদিনও না, কখ্খনও না।

দীপালি—তবে একথা বললে কেন, উইকেড বয়?

সন্দীপ—বুঝতেই তো পারছ, কেন বলেছি। দেড় বছর আগে তোমাকে দেখে মনে হয়েছিল, এ মেয়ের বয়স আঠারোর বেশি হতে পারে না। দেড় বছর পরেও দেখে মনে হয়েছে—বয়স যা-ই হোক না কেন, চেহারাটা আঠারো।

দীপালি—একই কথা।

সন্দীপ—কার কথা?

দীপালি—তোমার স্বপ্নের লোভটার কথা। ভাবছ, অষ্টাদশী খুব মিষ্টি। সুইট এইটটিন! আহা সুইটি এইটটিন।

সন্দীপ—টোয়েন্টিফাইভ ইজ সুইটার।

যে দীপালির সঙ্গে আজ এখন অত অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বলছে সন্দীপ, দু'মাস আগে তার নামও জানত না; যদিও দেড় বছর আগে তাকে শুধু চোখে দেখবার একটা ব্যাপার ঘটেছিল। দিল্লি থেকে কলকাতায় ফেরবার পথে সন্দীপকে যখন পালাম এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে কিছুক্ষণ বসে থাকতে হয়েছিল, তখন এক বৃদ্ধ বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে সন্দীপের কিছু বার্তালাপ হয়েছিল। ভদ্রলোকের নাম মহাদেব সেন। মহাযুদ্ধের কয়েকটা বছর মিলিটারির জন্যে দু'লক্ষ তাঁবুর অর্ডার সাপ্লাই করে, এবং আরও পাঁচ-সাতটা কাজ কারবার করে নিয়েই মহাদেব সেন সেই যে বিরাম গ্রহণ করলেন, আজও তিনি সেই বিরামের মধ্যে রয়েছেন।

মহাদেব সেন বলেছিলেন—আমরা যাচ্ছি শ্রীনগরে ছেলেকে দেখতে। ছেলে হল আর্মি মেডিকাল-কোরের কর্নেল। প্রতি মাসে ফরোয়ার্ড এরিয়া থেকে মাত্র একদিনের জন্যে শ্রীনগরে আসবার অনুমতি পায়। সেইজন্যে আমরাও প্রতি মাসে দু'একদিনের জন্যে শ্রীনগরে যাই, ছেলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়। কলকাতায় আলিপুরে আমার একটা বাড়ি আছে বটে, তবে থেকেও লাভ নেই। আমরা এখন দিল্লিতেই থাকি।...আপনার ব্যাঙ্ককে বলে বাড়িটাকে বিক্রি করিয়ে দিতে পারবেন?

ভদ্রলোক তখনি তাঁর পকেট থেকে বের করে তাঁর নামের যে কার্ড সন্দীপের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে আলিপুরের বাড়ির নাম আর ঠিকানাও ছিল।

সন্দীপ—অ্যাঁ? বাড়ির নাম এমসেন? আমি এই বাড়ি দেখেছি। এতদিনে বুঝলাম, বাড়িটার নাম এমসেন কেন?

মহাদেব সেন একটু হেসে নিলেন। —মিলিটারির যত সাহেব অফিসার সবাই আমাকে এমসেন বলে ডাকত। নামটা আমারও খুব পছন্দ হয়েছিল। তাই নতুন বাড়িটাকেও এমসেন নাম দিয়ে দিলাম।

সন্দীপ—সুন্দর বাড়ি।

এমসেন—সুন্দর বাড়ি তো বটে, কিন্তু একেবারে খালি বাড়ি।

সন্দীপ—ভাড়া দিয়ে দিন না।

এমসেন—না। হয় বেচে দেব, নয় খালি পড়ে থাকবে।

শ্রীনগরের প্লেন ছাড়বার সময় যখন হয়ে এসেছে, ঠিক তখন এমসেন তাঁর আত্মপরিচয়ের পারিবারিক বিবরণ খুব তাড়াতাড়ি ও খুব সংক্ষেপ করে শুনিয়ে দিলেন। —এই সব বাচ্চা-কাচ্চা আমার নাতি-নাতনী, আমার ছোট মেয়ের ছেলে-মেয়ে। আর ওই যে মেয়েটি এয়ার হোস্টেসের সঙ্গে গল্প করছে, ওটি হল আমার বড় মেয়ের মেয়ে।

যে মেয়েকে সেদিন এয়ার হোস্টেসের সঙ্গে গল্প করতে দেখেছিল সন্দীপ, সেই মেয়েই হল আজকের এই দীপালি সোম। স্বামীর সঙ্গে বিয়ের বিচ্ছেদ হবার পর এমসেনের বড় মেয়ে যখন আবার বিয়ে করে নতুন স্বামীর ঘরে চলে গেলেন, তখন তিনি তাঁর দশ বছর বয়সের মেয়ে দীপালিকে তার দাদুর ঘরে রেখে দিয়ে গেলেন। দীপালি তাই দাদুর অজস্র আদরের আলো দিয়ে লালিত একটি দীপ। দাদু ডাকেন, দীপ। সে ডাক শুনে সন্দীপও দীপালিকে এখন 'দীপ' বলে ডাকে।

এমসেনের ছোট জামাইয়ের চাকরিটা হল এক ব্রিটিশ জাহাজ কোম্পানির চাকরি। এ বছর সিঙ্গাপুর, সে বছর আবাদান, পরের বছর কলম্বো; চাকরিটা যেন অস্থিরতার বিশ্ব-পরিক্রমা। ছোট মেয়েকে তার স্বামীর সঙ্গে থাকতে হয়। লেখাপড়ায় স্থায়ী সুযোগের দরকারে তাঁর ছেলেমেয়েরা দাদুর কাছে স্থায়ী আশ্রয়ে থাকে। রব, রিটা, লোলা আর সোনা।

আজ থেকে দু'মাস আগের যে রাতে সন্দীপ রায়ের চকচকে ক্যাডিলাকের ভিতর থেকে সিপ্রা চৌধুরী শেষবারের মত নেমে চলে গিয়েছিল, সেই রাতেই তো আলিপুরের 'এমসেন'এর ব্যালকনিতে চাঁদবাতির জ্যোৎস্না দেখেও সন্দীপের মনে প্রশ্নটা চমকে উঠেছিল, সেই এমসেন কি সত্যিই সপরিবারে দিল্লি থেকে আবার আলিপুরে ফিরে এসেছেন?

পরের দিনই সকালবেলা টেলিফোন করে জানতে পেরেছিল সন্দীপ, না, বিক্রি হয়ে যায়নি বাড়িটা। এমসেনই সপরিবারে ফিরে এসেছেন। আর সেই যে সকালবেলাতে আলিপুরে গিয়ে এমসেনের সঙ্গে দেখা করে আর খুশি হয়ে চা খেয়েছিল সন্দীপ, তারপর আর বোধ হয় ভেবে দেখবার মত একটুও সময়ও পায়নি যে, কিংবা ভেবে দেখবার ইচ্ছাও হয়নি যে, রাসেল স্ট্রীটের একটি ল্যাম্পপোস্টের কাছে ফুটপাথের উপর এখনও কেউ দাঁড়িয়ে থাকে কী থাকে না।

দীপালি সোমের সঙ্গে সন্দীপের এই দুই মাসের মেলামেশার জীবন যেন একটা উৎসবের জীবন। তার মধ্যে আবেশ আবেগ ও আকুলতার কী না আছে! ক্যাডিলাকের অক্লান্ত ছুটোছুটি তো আছেই; গান আছে ফুল নিয়ে লোফালুফি আছে, তুলোর বল নিয়ে পিটাপিটির খেলাও আছে, আর ব্যালকনির উপরে চাঁদবাতির জ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়িয়ে গলা জড়াজড়ির দৃশ্যও আছে। সামনের বাড়ির জানালা থেকে উঁকি-দেওয়া একটা মেয়েলি মুখের ছায়া চমকে ওঠে আর সরে যায়। দীপালি সোম বলে—দেখেছে তো বয়ে গেছে।

দাদু এমসেন বলেছেন—ওর নামটা যদিও দীপালি, ওকে আমি যদিও দীপ বলে ডাকি, ওর বিউটি যদিও সত্যিই একটা দীপই বটে, তবু ওকে আমার মাঝে মাঝে পাগলি-ঝোরা বলে ডাকতে

ইচ্ছে করে। ওর আনন্দটা বড়ই চঞ্চল। চাণক্যপুরীর রাস্তায় একবার ট্রাফিক-পুলিসের সিগন্যাল তুচ্ছ করে এত জোরে গাড়ি চালিয়েছিল, যে আর একটু হলে...।

মাথা দুলিয়ে হেসে উঠেছে দীপালি—না সন্দীপ, আর একটু হলেও কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হত না। দাদু যতই ভয় করুক, আর আমি যত জোরে গাড়ি চালাই না কেন, অ্যাক্সিডেন্ট আমার কোনওদিন হয়নি, হয় না, হবেও না।

সন্দীপের মনে হয়েছে, এমসেনের এই বেশ-সুন্দর নাতনীর পাগলি-ঝোরা স্বভাবটা আরও সুন্দর। সত্যি, দীপালি সোমের প্রাণটা যেন ক্লান্তিহীন আবেগের ঝর্ণা, বেড়াতে বের হয়ে কোথাও পাঁচ মিনিটও থেমে থাকতে চায় না। এক-একদিন রেড রোডে রাত দশটার নীরবতার উপর যেন রাগ করে হেসে ওঠে দীপালি। মোটর গাড়িটার গায়ে আস্তে একটা চড় মেরে ছটফটিয়ে ওঠে।

এই মরুভূমির মধ্যে আর এক মিনিটও দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না। চলো, তোমার অরোরা কিংবা কলরডোর জ্যাজ শুনি।

দেখে খুশি হয়েছে সন্দীপ, পাঁচ মিনিট জ্যাজ শুনেই ছটফট করে উঠেছে দীপালি। সন্দীপের হাত ধরে টেনেছে—চলো।

রাতের চৌরঙ্গীর পথে হাজার হাজার লোকের চোখের উপর দীপালির কোমরে হাত রেখে চলতে চলতে সন্দীপ যেন শুনতে পায়, বুকের ভিতরে অদ্ভুত এইরকম একটি সঙ্গিনীর জন্যেই তো পাগল হয়ে উঠেছিল তোমার জীবনের উপোসি আশাটা। উপরে একেলে রুচির জলুস, আর ভিতরে সেকেলে রুচির অন্ধকার, এমন দো-আঁশলা প্রাণের মেয়ে নয় দীপালি।

দীপালি একবার নয়, অনেকবার বলেছে—আমার মনে কিন্তু একটা ভয় আছে, সন্দীপ।

—ভয়? সে কি? কিসের ভয়?

—ভয় এই যে, তুমি একদিন হয়ত চট করে বলে ফেলবে : চলো এবার ছাঁদনাতলায় দাঁড়াই।

—আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, কোনওদিনও ওকথা বলব না।

—তোমার সঙ্গে যেখানেই যাই আর যেখানেই দাঁড়াই, ছাঁদনাতলায় দাঁড়াতে পারব না।

দীপালির কথা শুনে সন্দীপের প্রাণ যেমন বিস্ময়ে বিহুল হয়ে গিয়েছে, তেমনই নির্ভয় আনন্দে ভরে গিয়েছে।

আলিপুরের বাড়ির লনে ঘুরে-ফিরে সঙ্গিনী দীপালির সঙ্গে সন্দীপের গল্প করবার ইচ্ছেটা এক-একদিন থামতেই চায় না। বিকেল থেকে শুরু হয় গল্প, আর রাত ন'টায় দাদু এমসেনের ডাক শুনে গল্পের আনন্দটা চমকে ওঠে। এমসেন ডাক দিয়েছেন—ভেতরে এসো, বৃষ্টি পড়ছে।

তাই তো, সত্যিই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কিন্তু ভেতরে এসে বসলেও গল্প করবার আবেগটা বসে পড়ে না। বাইরের বৃষ্টির মত গল্প করবার মুখর আনন্দটাও ঝুরঝুর করে ঝরে পড়তে থাকে।

সন্দীপ বলে—দাদুর কাছে শুনলাম, তুমি নাকি ক্লে-পিজিয়ন শুটিং-এ ফার্স্ট হয়েছিলে?

দীপালি—হ্যাঁ, তিনবার ফার্স্ট হয়েছি।

হাত দুটোকে হঠাৎ একটা রাইফেল তোলার ভঙ্গিতে তুলে ধরে, সন্দীপের বুকের দিকে তাক করে হাসতে থাকে দীপালি—এতদিনে শুধু মাটির পায়রা বধ করেছি, এবার বালিগঞ্জের একটা জীবন্ত পায়রাকে বধ করব।

সন্দীপ—সে পায়রা বেচারা তো বধ হয়েই গিয়েছে। আবার কেন? কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি,

আলিপুরের পায়রা কি এখনও বধ হয়নি?

পাগলি-ঝোরার চঞ্চল হর্ষের কলস্বর হঠাৎ যেন একটু নিবিড় হয়ে ছলছল করে, দীপালি বলে—সে কথা আর জিজ্ঞেস করছে কেন? সত্যি, আমি কোনও স্বপ্নে ভাবতে পারিনি যে, একটা অচেনা মানুষকে একদিনেই এত ভাল লেগে যাবে।

বাড়িয়ে বলেনি, দীপালি। সেই প্রথম দিন, যেদিন এমসেনের বাড়িতে এসে চা খেয়েছিল সন্দীপ, সেদিন দীপালি শুধু একবার সন্দীপের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়েই দাদুর চেয়ারের গা-ঘেঁষে আর চুপ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। দাদু যখন বললেন, এবার আমাদের দীপের একটা গান শোনো সন্দীপ, শুধু তখন একবার চমকে উঠে আর হেসে হেসে সন্দীপের মুখের দিকে আরও ভাল করে তাকিয়ে দাদুর কথার জবাব দিয়েছিল দীপালি। —উনি গান শুনতে ভালবাসেন কিনা, জানি না।

সন্দীপ—খুব ভালবাসি।

কী সুন্দর স্বরে আর কী চমৎকার ভঙ্গিতে কথাটা বলেছে সন্দীপ। শুনে মনে হয়েছিল দীপালির, গানকে নয়, সন্দীপ যেন দীপালিকেই বলছে, খুব ভালবাসি।

একবার অবশ্য সন্দেহ হয়েছিল দীপালির, এটা হয়ত দীপালির মনের একটা আশার কুহকের কথা। সন্দীপ রায় শুধু চা খেয়েই চলে যাবার জন্যে এসেছেন। শুধু দাদুর কথার মানরক্ষা করবার জন্যে গান শুনতে রাজি হয়েছেন। কিন্তু দীপালি তার মনের এই মুহূর্তের মুগ্ধতার কাছে অস্বীকার করতে পারেনি যে, শুধু দাদুর ইচ্ছেটা নয়, দীপালিরও খুশি-মনের ইচ্ছেছটাও সন্দীপ রায়কে গান শোনাতে চাইছে।

দীপালি হাসে—আমি কি এই চায়ের টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে গান গাইব?

এমসেন ব্যস্তভাবে বললেন—না না, তোমরা দু'জন এখন ওই ঘরে গিয়ে বসো।

দাদুর ব্যস্ততা ও আগ্রহের রকম দেখে দীপালির আর বুঝতে বাকি থাকে না যে, দাদুর প্রাণটা নাতনীর প্রাণের আগেই সন্দীপকে পছন্দ করে ফেলেছে। কুঁড়ি ধরতে আর ফুল ফুটতে একটুও সময় নিল না। আশ্চর্যের ব্যাপার বটে। কিন্তু একটুও আশ্চর্য বলে তো মনে হচ্ছে না। কারোলবাগের 'হামেশা বাহার' নামে লেডিজ ক্লাবটা যেদিন একটু উদার হয়ে নারী-পুরুষের মিক্সড্ ক্লাব হয়ে গেল, আর পুরনো নিয়মটাকে শুধরে নিয়ে প্রস্তাব দিল যে, এবার থেকে বিবাহিত মেয়েরা তাদের স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাবে আসতে তো পারবেই এমন কি ইচ্ছে করলে কুমারী মেয়েরা তাদের বয়-ফ্রেণ্ডকেও সঙ্গে নিয়ে ক্লাবের আনন্দে সামিল হতে পারবে, সেদিন এমন কিছু খুশি হতে পারেনি দীপালি। বরং একটু অস্বস্তি বোধ করেছিল যে, হিমাংশু মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাবের ভিতরে ঢুকলে সবাই মনে করবে, এই বুঝি দীপালি সোমের ফ্রেণ্ড। হিমাংশুকে এড়িয়ে একা একা ক্লাবে আসবার আশা কম। বড্ড ছিনেজোঁক স্বভাবের মানুষ এই হিমাংশু। ফ্যান্সি ড্রেসের আসরে মথুরার গয়লানি সাজবে বলে মনে করেছিল দীপালি। হিমাংশুও অদ্ভুত একটা জেদ ধরে বসল, সে মথুরার গয়লা সাজবে। দূর দূর রাগ করে ফ্যান্সি ড্রেসের অনুষ্ঠানের দিনে ক্লাবেই যায়নি দীপালি। আর, অজিত খোশলার আশাও একটা বলিহারি জেদ। এক বছর ধরে অকারণে দৌড়াদৌড়ি করেছে অজিত। রোজই একবার এমসেনের কারোলবাগের বাড়িতে হাজিরা দিয়েছে। কারোলবাগের কাকও এত নিয়মিত সময়ে আর এত লোভী হয়ে কারও বাড়িতে আসে না। বাড়ির বাইরের ঘরে,

যে ঘরে টিউটরের কাছে বসে লেখাপড়া করে রব আর রিটা, সেই ঘরের ভিতরে একটা গদিহীন চেয়ারের উপর বসে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় পার করে দিয়েছে অজিত। দীপালি শুধু একবার ওই ঘরের ভিতরে এসে অজিতের সামনে বড় জোর দু'তিন মিনিট দাঁড়িয়েছে আর হেসে হেসে কথা বলেছে—ছবি আঁকতে অজন্তা যাচ্ছেন কবে?

অজিত হাসে—আগে আপনার ছবি আঁকব, তারপর যাব।

দীপালি—কবে আঁকবেন বলে আশা করেন?

অজিত—আপনি যেদিন বলবেন।

দীপালি—তবে সেই আশাতেই থাকুন।

হঠাৎ কথা ফুরিয়ে দিয়ে আর হাসির ফোয়ারা উথলে দিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গিয়েছে দীপালি। আর, অজিত খোসলা সেই হাসির ফোয়ারার শব্দ শুনে ধন্য হয়ে চলে গিয়েছে। পরদিন আবার এসেছে।

ফ্লাইং-অফিসার কুশল সিং-এর প্রেমিকা মঙ্গলার কাছে অজিত খোসলার কথা বলতে গিয়ে বার বার হেসে ফেলেছিল দীপালি। মঙ্গলা বলেছিল—ওকে দৌড়তে দাও, তুমিই শুধু ওইরকম একটু হেসে ওকে আরও দৌড় করিয়ে হয়রান করে দাও। তারপর নিজেই সরে যাবে।

তাই হয়েছিল। এক বছর ধরে দৌড়াদৌড়ি করবার পর অজিত খোসলা আর আসেনি। ছবি আঁকতে অজন্তা চলে গেল। জানে না দীপালি, ফিরে আর দিল্লিতে কখনও এসেছিল কি না অজিত।

সন্দীপকে দেখে প্রথম দিনেই দীপালি সোমের মনে ফুলবনের হঠাৎ উতলা বাতাসের মত সাড়া জাগিয়ে যে ইচ্ছেটা দেখা দিয়েছিল, সে ইচ্ছে কোনও দিনও আর কাউকে দেখে কখনও দীপালির মনে দেখা দেয়নি। তাই সন্দীপকে গান শোনাতে কোনও কুণ্ঠা বোধ করেনি। পর পর দুটি গান গেয়েছিল দীপালি। 'বাঁধিয়ে কী দিয়ে, রেখেছো হৃদি এ' ; তারপর 'দিল মেরে দিওয়ানা'।

প্রথম দিনেই দীপালির গানের মধ্যে অকুণ্ঠ অভ্যর্থনার যে স্বাদ পেয়েছিল সন্দীপ, সে স্বাদ এই দুই মাসের মেলামেশার মধুরতায় আরও মিষ্টি হয়ে গিয়েছে। কেনই বা না হবে? দীপালির মুখের দিকে তাকিয়ে কোনওদিনও সামান্য একটু গম্ভীরতার ছায়া দেখতে পায়নি সন্দীপ। কোনওদিনও কোনও আনমনা ভাবনার ছায়া দীপালির চোখেমুখে ফুটে উঠতে দেখেনি। দীপালির মনপ্রাণ যেন সর্বক্ষণ হাসছে। সন্দীপের সঙ্গিনী হয়ে ছুটোছুটি করবার এই জীবনের মধ্যেই দীপালি তার প্রাণের সবচেয়ে বড় আনন্দের স্বাদ পেয়ে গিয়েছে।

দীপালির জন্মদিনের পরদিনের বিকেলবেলাটা যে এত সুন্দর হয়ে দেখা দেবে, ভাবতেই পারেনি দীপালি। বর্ষাকালের কলকাতার ভাগ্যে এরকম ঝলমলে বিকেল একটা দৃশ্যের মত দৃশ্য বটে। বাইরে বের হবার জন্যে তৈরি হয়েই ছিল দীপালি। কিন্তু কি আশ্চর্য, আজ যেন মনের ভুলে বেশ একটু অদ্ভুত রকমের সাজ করে ফেলেছে। ক্রিম মাখানো ফাঁপানো চুলের স্তবক, ডবল বেণী। ফুরফুরে স্বচ্ছ মসলিনের সেই জেব-উন্নিসা নয়, একটা লালপেড়ে ধনেখালি, আঁচলটা কোমরেতে এক পাক জড়ানো। গায়ে সেই ছোট রেশমি চোলির একফালি আবরণ নয়, একটা ব্লাউজ। কপালে কুমকুমের টিপ। দেখে সন্দেহ হতে পারে, দীপালি সোম বুঝি ইচ্ছে করে এরকম মূর্তিমতী আটপৌরেটি হয়ে কোনও ফ্যান্সি ড্রেসের আসরে গিয়ে চমক সৃষ্টি করবার মতলব ধরেছে।

সন্দীপ এসেই চমকে ওঠে—এ কী?

দীপালি হাসে—মন্দ কী?

সন্দীপ—মন্দ না হোক, ভালও নয়। এরকম সাজে দীপকে বেশ একটু নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে।

দীপালি বলে—যেমনই দেখাক, আজ এই রকমই সাজবার শখ হল।

সন্দীপ—কিন্তু...।

দীপালি—কিন্তু আবার কী? অত খুঁটিয়ে চিন্তা করছ কেন? বাইরে গিয়ে এই বিকেলবেলার আলোতে ময়দানের কাছে একবার দাঁড়াই, তখন বলো, কেমন দেখাচ্ছে তোমার দীপালিকে।

সন্দীপের হাত ধরে টান দিয়ে, আর কলকল হাসির ফোয়ারা উথলে দিয়ে কথা বলে দীপালি—না ময়দানে নয়, আজ তোমার সঙ্গে অনেক দূরে চলে যাব। চলো, ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে যত দূর পারি চলে যাই। সূর্য ডুবলেই ফিরে আসব।

হেসে ওঠে সন্দীপ, দীপালির কাঁধে হাত রাখে।—বাঃ, তোমার মুখ থেকে একথা শোনবার জন্যেই তো কান পেতে রয়েছি।

বাড়িয়ে বলেনি সন্দীপ। সন্দীপের প্রাণটাই হেসে উঠেছে, যেন মেঘমুক্ত নীলাকাশের হাসি। দীপালির কলকল হাসির শব্দের মধ্যে পাগলি-ঝোরার প্রাণের এক ঝলক হর্ষের শব্দ শুনতে পেয়েছে সন্দীপ।

দীপালি বলে—চলো।

সন্দীপ বলে—চলো, আর দেরি করে লাভ নেই।

আট

ডায়মন্ডহারবার রোডের পাশে একটা ধানক্ষেতের কাছে এসে থেমে পড়েছে সন্দীপের ক্যাডিলাক। এদিকে ধানক্ষেতের জলের মধ্যে নীলকলমি ফুটে রয়েছে। ওদিকে ধানক্ষেতের শেষ সীমাটা গাছপালা নিয়ে ডুবন্ত সূর্যের লাল আভার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। সন্দীপের পাশে দাঁড়িয়ে অপলক চোখে ডুবন্ত সূর্যের ছবি দেখছে দীপালি। বড়ই শান্ত আর বড়ই স্থির, দীপালির এই মূর্তি।

একটুও হাসছে না দীপালি, কোনও কথাও বলছে না। আকাশের রঙিন আভা দীপালির মুখের উপর ছড়িয়ে পড়েছে ঠিকই। কিন্তু দীপালি তো এতক্ষণের মধ্যে একবারও সন্দীপকে জিজ্ঞাসা করল না, বলো কেমন দেখাচ্ছে আমাকে? জিজ্ঞাসা করলে বেশ স্পষ্ট করেই বলে দিতে পারবে সন্দীপ, না, মোটেই ভাল দেখাচ্ছে না।

দীপালি কি সত্যিই কিছু ভাবছে? না, শুধু মনে মনে ওর নিঃশ্বাসের শব্দগুলিকে শুনছে? ইচ্ছে হয় সন্দীপের, দীপালির এই শান্ত ও স্তব্ধ মূর্তির কাঁধটাকে আস্তে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে যে, এদিকে এভাবে আর বেশি সময় নষ্ট করলে ওদিকে কলরডোর জ্যাজ ফুরিয়ে যাবে। ডুবন্ত সূর্যের ছবিটার মধ্যে কী এমন বিস্ময় আছে যে, ওরকম অপলক চোখে তাকিয়ে দেখতে হবে।

দেখতে পায় সন্দীপ, দীপালির এতক্ষণের শান্ত মুখটা বেশ গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। কেন? ভুরু দুটোই বা এমন করে কুঁচকে রয়েছে কেন? দুঃসহ অস্বস্তিটাকে আর সহ্য করতে না পেরে ডাক দেয় সন্দীপ—দীপ।

কী অদ্ভুত ব্যাপার। সাড়া দেয় না দীপালি? ডুবন্ত সূর্যের রাঙা আলোর জাদুতে কি বোবা হয়ে

গিয়েছে দীপালি? না, কান দুটোই বধির হয়ে গিয়েছে?

চেঁচিয়ে ওঠে সন্দীপ—দীপ, শুনছ?

দীপালি—শুনছি, বলো।

সন্দীপ—চলো, আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ নেই।

দীপালি—সত্যিই আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। ইচ্ছে করছে, বসে পড়ি।

সন্দীপ—কোথায় বসবে? সড়কের এই ধুলোর উপর?

হাসতে চেষ্টা করে দীপালি—তা....আজ না হয় ধুলোর উপর একটু বসলামই।

সন্দীপ—তোমার এই অদ্ভুত আটপৌরে সাজ দেখে আমার ঠিক এই ভয়ও হয়েছিল যে তুমি আজ একটা কিম্ভুতকাণ্ড না করে ছাড়বে না।

দীপালি—তবে চলো, ফিরেই যাই।

সন্দীপের ক্যাডিলাক আবার শব্দ করে কলকাতার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ছুটতে থাকে। দীপালি বলে—আজ কিন্তু আর কোথাও যাব না। কলরডোর জ্যাজ না হয় আর একদিন শোনা যাবে, আজ থাকুক।

সন্দীপ—কেন?

দীপালি—আজ আর ইচ্ছে করছে না।

সন্দীপ—ইচ্ছে বা করছে না কেন?

দীপালি—কিছু মনে করো না, আজ সত্যিই বেশ ক্লান্তি বোধ করছি।

চমকে ওঠে সন্দীপের বুকটা। দীপলির মুখে ক্লান্তির কথা। এ যে একটা মিথ্যে পৃথিবীর বাজে ঠাট্টার প্রতিধ্বনি। পাগলি-ঝোরার জল কি গতি হারিয়ে হঠাৎ একটা হ্রদ হয়ে গেল, কোনও পদ্মফুল ফুটবে আশা করে?

আলিপুরের এমসেনের ফটকের কাছে এসেই থেমে যায় ক্যাডিলাক, ভিতরে আর ঢোকে না। নেমে যায় দীপালি, সন্দীপ কিন্তু স্টিয়ারিং চাকাতে হাত রেখে সিটের উপর বসেই থাকে।

দীপালি—এ কী? তুমি নামবে না? ভিতরে যাবে না?

সন্দীপ—তুমি আজ বড়ই ক্লান্তি বোধ করছ। তোমাকে আর বিরক্ত করা উচিত নয়।

দীপালি—ছি-ছি, তুমি খুবই ভুল বুঝেছ। তোমার কাছে বসে থাকতে তো ক্লান্তি নেই। তোমার যতক্ষণ ইচ্ছে থাকো, যতক্ষণ ইচ্ছে আমাকে বসিয়ে রাখো। আমার তাতে কোনও ক্লান্তি হবে না, একটুও না।

গাড়ি থেকে নেমে আর দীপালির সঙ্গে হেঁটে বারান্দার উপরে উঠতেই থমকে দাঁড়ায় সন্দীপ। —আজ আর উপরে যাব না, দীপ, এখানেই বসি।

দীপালি—বেশ তো, এখানেই বসি।

চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে বারান্দার দেয়ালের গায়ের আলো নিবিয়ে দেয় দীপালি।

—এ কী করলে? চেঁচিয়ে ওঠে সন্দীপ।

দীপালি—মনে হচ্ছে, সামনের বাড়ির জানালাতে একটা ছায়া দাঁড়িয়ে আছে আর এদিকে তাকিয়ে আমাদের দু'জনকে দেখছে।

সন্দীপ—দেখুক না, তাতে আমাদের কিসের ক্ষতি?

দীপালি—না সন্দীপ, ওরকম করে কেউ আমাদের দু'জনকে দেখবে কেন? আমরা কি দুটো আশ্চর্য প্রাণী?

—তোমার ক্লান্তির রহস্যটা বোধ হয় বুঝতে পেরেছি।

—কী বুঝলে?

আমার সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যেতে তোমার আর ইচ্ছে হচ্ছে না।

—না, অনেক তো হল। আর কেন?

—কিন্তু এরকম ঘরকুনো হয়ে আর থিতিয়ে বসে থাকাই কি ভালবাসার একমাত্র নিয়ম?

—না, তা নয়. কিন্তু সর্বক্ষণ ছুটোছুটি করাই কি একমাত্র নিয়ম?

—বুঝতে পারছি না, দীপ; তোমাকে আজ এরকম একটা তর্কের ভূতে ধরেছে কেন? তুমি তো কোনওদিনও এরকমের একটিও কথা বলনি।

—খুব সত্যি সথা, কোনওদিনও বলিনি।

—বরং ঠিক এর উল্টো কথা বলেছিলে।

—বলেছিলাম।

—তবে আজ আবার হঠাৎ মিছিমিছি....।

—আজ হঠাৎ মনে হয়েছে যে....।

সন্দীপ বলে—বলো, আজ হঠাৎ কী মনে হয়েছে?

কথা বলতে গিয়ে দীপালির গলার স্বর যেন নিবিড় হয়ে ভরাট হ্রদের জলের মত টলমল করে।

—মনে হয়েছে, তোমাকে আমি ঠকাচ্ছি।

সন্দীপ—তার মানে?

দীপালি—তোমাকে আমি খুব বেশি ছুটোছুটি করিয়েছি। আর তুমিও অদ্ভুত, শুধু ছুটোছুটি করেই খুশি হয়েছ।

সন্দীপ—খুশি হওয়া উচিত, তাই খুশি হয়েছি। তোমারও খুশি থাকা উচিত।

দীপালি—না।

সন্দীপ—তবে কি ছাঁদনাতলায় যাওয়া উচিত?

দীপালি—ওরকম করে তুচ্ছ করে কথাটা বলোনা।

সন্দীপ—তুমিই একদিন ছাঁদনাতলাকে তুচ্ছ করে আর ঠাট্টা করে বলেছিলে যে, এটা একটা ফাঁসিতলা।

দীপালি—বলেছিলাম, খুব ভুল কথা বলেছিলাম। তখন তো ধারণা করতে পারিনি যে, তোমার জন্যে আমার মনে অন্য রকমের একটা মায়া এসে আমাকে এত ভাবিয়ে তুলবে।

হেসে ফেলে সন্দীপ। —অন্য রকমের মায়া। কথাটা শুনতে ভালই লাগে। কিন্তু...

—কিন্তু কী?

—অন্য রকমের মায়াটা সাত তাড়াতাড়ি একটা বাঁধাবাঁধির ব্যাপার হয়ে উঠলে ভাল হয় না।

—খারাপই বা হয় কী?

—সেটা তোমাকে আমি শতকথা বলেও বোঝাতে পারব না।

—কেন পারবে না?

—তোমার মত মেয়ের মনেও একটা সেকেলে গোঁয়ার্তুমি আছে বলে মনে হচ্ছে।

—সেকেলে?

—হ্যাঁ।

—ভালবাসার মানুষটা যদি বিয়ে করতে চায়, তবেই কি সেটা একটা সেকেলেপনা হয়ে গেল?

—আমি ঠিক ওকথা বলছি না।

—তবে কী বলছ?

—আমি বলছি, একটু দেরি করা উচিত।

—দেরি করে লাভ কি?

—লাভ আছে। দেরীটা হল ভালবাসার পরীক্ষা।

—দুটো মাস তো পার হয়েছে। পরীক্ষার যা কিছু ছিল, তাও হয়ে গিয়েছে।

—আমি এখনও ঠিক স্পষ্ট করে বুঝতে পারছি না দীপ, তুমি কী বলতে চাইছ।

—তুমি তোমার মার কাছে আমার কথা কোনওদিন বলেছ?

—না।

—এবার তবে বলে দাও।

—আরও দু'তিনটে মাস দেরি করলে কি ভাল হয় না?

—আর দেরি করতে ইচ্ছে করছে না। বিশ্বাস করো সন্দীপ, আমি বড্ডক্লান্ত। আর ছুটোছুটি না করে তোমার বুকের উপর শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

দীপালির শেষ কথাটা যেন ছোট একটা উচ্ছ্বাসের মত শব্দ তুলেই নীরব হয়ে গেল। হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল নাকি দীপালি? কিংবা ঢোঁক গিলে একটা নিঃশ্বাসকে বুকের ভিতর আটকে রেখে দিল? বারান্দায় অন্ধকার, তাই দেখতে পায় না সন্দীপ, ক্লে পিজিয়ন শুটিং-এ তিনবার ফার্স্ট হয়েছে যে মেয়ে, সে মেয়ের চোখের পাতা কেমন করে ভিজে যায়।

সন্দীপ—সত্যি যদি বুকের উপর শুয়ে পড়বার ইচ্ছে হয়ে থাকে, তবে শুয়ে পড়লেই তো হয়। বাধা কোথায়? অসুবিধেরই বা কী আছে।

দীপালি—ছি সন্দীপ, এরকম ভয়ানক কথা বলতে নেই। তুমি নিশ্চয় আমার উপর রাগ করে কথা বলছ। না, রাগ করো না সন্দীপ।

সন্দীপ বলে—আচ্ছা, আমি এখন চলি।

দীপালি—এসো। মা কী বললেন, সে কথা আমাকে কিন্তু কালই বলবে।

সন্দীপ—মা যদি বলেন, এখনই নয়। কিংবা কোনওদিনও নয়, তবে?

দীপালি—তবে আমি নিজেই তোমার মার কাছে যাব আর বলব যে, আমি তো একটা রকেট নই মা, আমি মানুষেরই মেয়ে। একটা শূন্যের মধ্যে আর কতকাল ছুটে বেড়াতে পারি, বলুন?

সন্দীপ—আচ্ছা।

নয়

মৃদু ঝড়ের বাতাস হঠাৎ এক-একবার মত্ত হয়ে উঠছে। বাগানের শিরীষের মাথা থেকে শুকনো পাতার এক একটা ঝটকা জানালা পার হয়ে ঘরের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ছে। সন্দীপের গেলাসের ভেতরেও কয়েকটা শুকনো পাতা ভাসছে। গেলাসের হুইস্কির এই অবস্থার চেহারাটা সন্দীপের চোখে পড়েনি। তাই গেলাসটাকে হাতে ধরেই বসে আছে। যে চিন্তার ঝঞ্ঝাট থেকে এইমাত্র মুক্ত হয়ে গিয়েছে সন্দীপের উদ্বিগ্ন মন, সে চিন্তার একটা আবছায়া এখনও মুখের আর চোখের উপর থমকে রয়েছে।

এই দশ দিনের মধ্যে আলিপুরের এমসেনের বাড়িতে আর যেতে পারেনি সন্দীপ। টেলিফোনেও দীপালিকে কোনও কথা বলতে পারেনি। দীপালিও এই দশদিনের মধ্যে একবারও টেলিফোন করে সন্দীপকে কোনও কথা জিজ্ঞেস করেনি। একটুও স্বস্তি বোধ করতে পারেনি সন্দীপ। সব সময় মনের মধ্যে একটা ভয় ছমছম করেছে, এই বুঝি দীপালির অদ্ভুত জিজ্ঞাসার কথাটা ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল। রাস্তার গাড়ির শব্দ শুনে চমকে উঠতে হয়েছে, এই বুঝি এমসেনের বাড়ির গ্যারেজের সেই কড়া রঙের টুয়ার ছুটে এল।

দশদিন পর আজ এইমাত্র, এই পাঁচ মিনিট হল, দীপালির জিজ্ঞাসার কথাটা টেলিফোনে বেজে উঠেছে।—কে? সন্দীপ?

সন্দীপ—হ্যাঁ, আমি।

—তোমার কি অসুখ করেছে? শরীর ভাল নয়?

—অসুখ করেনি, শরীর ভাল আছে।

—কাজের চাপ বেড়েছে?

—না।

—তবে এলে না কেন? আসছ না কেন?

—তুমি কি আজ সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে একটা ছবি দেখতে যেতে পারবে?

—না।

—কিন্তু আমাকে তো যেতেই হবে।

—যেও।

—আর কি কিছু তোমার জিজ্ঞেস করবার আছে?

—না।

—তবে আর...।

—তবে শোনো, শুধু একটি কথা বলতে চাই।

—বল।

—আমি কোনওদিনও ভুলেও আপনার মায়ের কাছে গিয়ে কোনও কথা বলব না।

—কী বললে?

—আপনি এখন একেবারে নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন, মিস্টার রায়। আপনার নাম করে কোনও কথা কারও কাছে বলতে, আমার নিজের কাছেও বলতে, আমার মনে একবিন্দু ইচ্ছেও আর নেই।

খট করে একটা শব্দ করে স্তব্ধ হয়ে গেল টেলিফোন। বুঝতে কোনও অসুবিধে নেই, দীপালির শেষ জিজ্ঞাসার সব কথা শেষ হয়ে গিয়েছে, রিসিভার নামিয়ে দিল দীপালি।

সন্দীপের এই দশদিনের ভয় আর অস্বস্তির তো সমাধি হয়ে গেল। তবু সন্দীপের চিন্তান্বিত মুখটা এখনও পরিচ্ছন্ন ও প্রসন্ন হয়ে উঠতে পারেনি। আলিপুরের এমসেনের নাতনীর ভেলকি দেখে আশ্চর্য হয়েছে সন্দীপ। কী ভয়ানক ভেল্‌কি! জেব-উন্নিসা মসলিন এক মুহূর্তের মধ্যে আটপৌরে ধনেখালি হয়ে গেল! সন্দীপের নিশ্চিন্ত প্রাণের বিশ্বাসটাকে হঠাৎ এভাবে অপমানিত করতে দীপালির একটু ও বাধল না। দীপালির ভেলকি যেন একটা হিংস্র নখর, সন্দীপের জীবনের সুস্বপ্নটাকে ছিঁড়ে দিয়েছে।

বিনায়ক যদি জিজ্ঞাসা করে, কী হল, দীপালিকে বিয়ে করতে তোমার অনিচ্ছা কেন? —তবে জবাব দিতে পারবে সন্দীপ—না অনিচ্ছা নেই, তবে ভয় আছে।

ভয় এই যে, বিয়ে হয়ে যাবার পর দীপালির ভেলকি আরও ভয়ানক হয়ে উঠবে। ঘরের বাইরে বের হতেই চাইবে না। যদি নিতান্তই বের হতে চায়, তবে মাসি-পিসির বাড়ি ছাড়া আর কোথাও যেতে চাইবে না। সন্দীপের হাত ধরে আর হেসে হেসে ঝলমলে বাইরের উৎফুল্ল আলো-ছায়ার কাছে ঘুরে বেড়াতে কোনও আনন্দ পাবে না। মনে করবে, এসব হল দীপালির যত পণ্ডশ্রম। শামুক যেমন ডোবার পাঁকটুকুর মধ্যে থেকেই সুখী, দীপালিও তেমনই ঘরকুনো আহ্লাদের একটা ডোবার পাঁকটুকুর মধ্যে থেকেই সুখী হয়ে যাবে। দীপালির ভাব-ভঙ্গি, কথা ও ভাষার মধ্যে এরকমের একটা নিউরোসিসের লক্ষণ ধরা পড়ে গিয়েছে। এরকম মেয়ের সঙ্গে সন্দীপের বিয়ে হলে, সেটা নিতান্ত শরীরের বিয়ে ছাড়া আর কিছু হবে না, হতেও পারে না।

এমসেনের নাতনী বলেছেন, যে তাঁর আর ছুটোছুটি করতে ভাল লাগছে না। কিন্তু তিনি তো ভালই জানেন যে, সন্দীপ রায় ঘরকুনো জীবনকে ঘেন্না করে, ছুটোছুটি করতেই ভালবাসে। তবে তিনি আর কী করবেন, কেমন মন নিয়ে সন্দীপ রায়কে ভালবাসতে পারবেন? তিনি কি এমনই মহীয়সী যে, পাপকে ভালবাসেন না, কিন্তু পাপীকে ভালবাসবেন? তোমার ছুটোছুটিকে ভাল লাগে না, কিন্তু তোমাকে ভাল লাগে। বাঃ, কী চমৎকার একটি মিথ্যেবাদী হেঁয়ালির কথা! জিজ্ঞাসা করি, সন্দীপ রায়ের প্রাণের স্বভাবটাকে না ভালবেসে সন্দীপ রায়কে ভালবাসতে পারা যাবে কী করে?

বিশ্বাস ছিল, দীপালি কখনও হেঁয়ালি হয়ে যাবে না। বিশ্বাস ছিল, বিয়ে হোক না না হোক, দীপালি সোম চিরকাল সন্দীপ রায়ের মনের সঙ্গে মন মিলিয়ে, সন্দীপের হাত ধরে চারদিকের সব সাধ ও সব আনন্দের কাছে ঘুরে বেড়াবে। দীপালি হবে সন্দীপের তৃপ্তি ও গর্বের ছবি, আর সন্দীপ হবে দীপালির তৃপ্তি ও গর্বের ছবি। সন্দীপ রায়ের সে বিশ্বাস ওই মেয়েই তো মাতিয়ে তুলেছিল। তুমি মেয়েই না সেদিন ব্যালে দেখে বিহ্বল হয়ে হাজার লোকের চোখের সামনে, সন্দীপ রায়ের বুকের উপর তোমার মাথাটাকে হেলিয়ে দিয়েছিলে? সন্দীপ রায়ের সে বিশ্বাস তুমি কত সহজে ভেঙে দিলে। এটা যদি নিওরোসিস না হয়, তবে বলতে হয়, এটা সাপিনীর স্বভাব। আচমকা আর খুবই অকারণে তুমি সন্দীপ রায়ের নিশ্চিন্ত প্রাণটার উপর ছোবল দিয়েছ। তোমাকে ক্ষমা করতে পারি না।

কই, বিনায়ক এখনও আসছে না কেন? মন্দারই বা আসতে এত দেরী করছে কেন?

এতক্ষণে চোখে পড়ে সন্দীপের, গেলাসের ভিতরে আবর্জনা ভাসছে, শিরীষের শুকনো পাতা। গেলাসটাকে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে দরজার দিকে তাকায়।

বিনায়ক আর মন্দার, দু'জনে এক সঙ্গে হেঁটে আর হেসে হেসে ঘরের ভিতরে ঢোকে। টেবিলের উপর রাখা গেলাসটাকে হাত বাড়িয়ে নেয় মন্দার। বিনায়ক তাঁর পাইপের মুখের ভিতর তামাক এঁটে ও টিপে দিয়ে সন্দীপের দিকে তাকান আর কথা বলেন।—আজ সন্দীপকে একটু প্রসন্ন দেখাচ্ছে।

সন্দীপ—অপ্রসন্নতারই উল্টো পিঠের নাম প্রসন্নতা। নয় কি?

বিনায়ক—ওঃ ওঃ, তোমার কথার স্টান্ট বড় চমৎকার, বড়ই সুন্দর। এবং স্টান্ট হলেও কত লজিকাল। আমার জিজ্ঞাস্য, তোমার প্রসন্নতার উল্টো-পিঠে সত্যিই কি কোনও অপ্রসন্নতা আছে?

সন্দীপ—আছে। ...এঃ, মন্দারের বকরাক্ষুসেটা দেখলে না, বিনায়ক?

বিনায়ক মুখ ঘুরিয়ে মন্দারের মুখের দিকে তাকান। সন্দীপ বলে—ওই গেলাসের মধ্যে এই রকম অনেকগুলো শুকনো শিরীষপাতা পড়েছিল। বকরাক্ষুসে এক চুমুকে হুইস্কির সঙ্গে পাতাগুলোকেও গিলে ফেলেছে।

মন্দার—আমি মনে করেছি, ওটা একটা স্টাইল।

সন্দীপ—হুইস্কির মধ্যে আবর্জনার মত একগাদা শুকনো শিরীষপাতা; এটা স্টাইল হয় কী করে?

মন্দার—বড়লোকের স্টাইল ওইরকমই হয়।

বিনায়ক—যাক, যা হবার ছিল তা হয়েই গেল। তুমি তোমার স্টাইলে আর একটু হুইস্কি খাও, মন্দার। এবার তুমি বলো সন্দীপ, কী যেন বলছিলে? হ্যাঁ, প্রসন্নবাবুর সঙ্গে তোমার কী বিষয়ে কী যেন মতভেদ আছে?

সন্দীপ—মনে হচ্ছে, আজ বেশ তৈরি হয়ে এসেছ, বিনায়ক। কোথায় গিয়েছিলে যে এতটা রসস্থ হতে হল?

বিনায়ক—গুণাকর দত্তের নাম শুনেছ? একদা যাঁহার অর্ণবপোত ভ্রমিল-ভারত-সাগরময়, সেই গুণাকর দত্তের নাম কখনও শুনেছ?

সন্দীপ—না।

বিনায়ক—না শোনবারই কথা। আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগের ইন্ডোবার্মা শিপিং কোম্পানীর প্রাক্তন ডিরেক্টর গুণাকর দত্ত আজ একজন অশ্ববিদ্যামহার্ণব, রেসুড়ে জগতের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।

মন্দার—বুড়োটাকে আমি দেখেছি। আলখাল্লার মত দেখতে মস্ত বড় একটা পাঞ্জাবি আর ঢলঢলে পায়জামা পরে, আর বাঘছালের জুতো পায়ে দিয়ে পার্ক সার্কাসের বাজারে মুরগি কিনতে আসে।

বিনায়ক—না, না। গুণাকর দত্তের চেহারাটা বাঘের মত নয়; মুরগির মতও নয়। বেশ সুন্দর চেহারা।

সন্দীপ—যা-ই হোক, তুমি গুণাকর দত্তের কথা বলো।

বিনায়ক—তা হলে তো বলতে হয়, কোনও গুণ নাই তার কপালে আগুন। শেয়ার-টেয়ার

সব বেচে দিয়ে আর শেয়ার-বেচা টাকার প্রায় সবই ঘোড়ার নামে এবং আরও বিবিধ আনন্দের নামে ফুঁকে দিয়ে চমৎকার একটি নির্ধনপতি সদাগর হয়ে গেলেন গুণাকর দত্ত। সাতটি বছর, ব্যস, তারই মধ্যে সব কিছু ফুস।

হাসতে থাকে সন্দীপ। —বিনায়ক হালদারের প্রাণ আজ তূরীয়ানন্দের সাগরে ডুবে গিয়েছে।

বিনায়ক—ঠিক, খুব ঠিক। গুণাকর দত্তের অনুরোধের চাপে পড়ে জলীয় বস্তুটা খুব বেশি খেয়ে ফেলেছি। এর চেয়ে ভাল হত, যদি সক্রেটিসের মত এক গামলা হেমলক খেয়ে ফেলতাম।

মন্দারও হাসে—আমলকিতে নেশা কাটে না, তেঁতুলে কাটে।

সন্দীপ—আর কাটে গবেট মন্দারের কাঁচা মাথাটাকে চিবিয়ে খেলে।

বিনায়ক—গুণাকর দত্ত কিন্তু সত্যিই একজন সুপারম্যান। যখন ধনপতি ছিলেন, তখন আমির আলি অ্যাভেনিউ-এর যে বাড়ির ফ্ল্যাটে ছিলেন, আজও সেই বাড়ির সেই ফ্ল্যাটে আছেন। ঠাটবাট দেখলে কারও সামান্য একটু সন্দেহ করবারও সাধ্যি হবে না যে, উনি বস্তুত একজন শূন্যকুম্ভ। দশ বছর ধরে শুধু ধারকর্জ করে যে এরকম একটা জমকালো জীবনের খরচ চালিয়ে দিতে পারা যায়, সেটা গুণাকর দত্তকে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না।

মন্দার—কিন্তু কই, আমি তো চেয়ে চেয়েও পাঁচটা টাকা ধার পাই না।

বিনায়ক—তোমার কথা আলাদা। তুমি হলে একজন সাংঘাতিক মন্দার দত্ত। তুমি গুণাকর দত্ত নও। তুমি কালো রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছ। তোমাকে চিনে নিতে আর বুঝে ফেলতে কারও ভুল হতে পারে না। যাই হোক, এবারে একটু কান লাগিয়ে আমার কথাটা শোনো, সন্দীপ।

সন্দীপ—কান লাগিয়েই আছি, বলো।

বিনায়ক—গুণাকর দত্ত একবার তোমার কাছে এসে বিশেষ দরকারের কিছু বলতে চান। তুমি যদি আসতে বল, তবেই তিনি আসবেন। নচেৎ নয়।

সন্দীপ—না, এসব লোকের কোনও বিশেষ দরকারের কথা শুনতে আমি রাজি নই। বিশেষ দরকার মানে তো ওই একটি দরকার, টাকা ধার পাওয়ার দরকার।

বিনায়ক—না, তিনি আমাকে বলেছেন এবং তোমাকেও বলতে বলেছেন যে, টাকা ধার চাইবার কোনও ইচ্ছে নিয়ে নয়, তিনি অন্য কোনও বিষয়ে, একেবারে ভিন্ন কোনও বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান। আমার মনে হয়, ফরেন কারেন্সি নিয়ে তিনি একটা সমস্যায় পড়েছেন।

সন্দীপ—বুঝেছি। না না, ওসব ব্যাপারে তাঁকে কোনও সাহায্য করতে পারব না। কাজেই কোনও আলোচনা করতে পারব না।

বিনায়ক—উনি কিন্তু জানেন যে, তুমি এ বিষয়ে অনেককে সাহায্য করেছ।

সন্দীপ—করেছি, বেশ করেছি। কিন্তু তাঁর মত একজন নির্ধনপতি সদাগরকে ও বিষয়ে সাহায্য করবার কোনও গরজ আমার নেই।

বিনায়ক—যাক তাহলে গুণাকর প্রসঙ্গ একেবারে চুলোয় যাক। এখন বলো, কী যেন তুমি বলতে চাইছিলে?

মন্দার—সন্দীপ বলছিল যে, এদিকে প্রসন্ন আর ওদিকে অপ্রসন্ন, মাঝখানে তা হলে কে আছে?

মন্দারের মুখের দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করে সন্দীপ—ইনিও দেখছি চিদানন্দ সাগরে ভাসতে

শুরু করেছেন।

বিনায়ক—আমারও কিন্তু একই প্রশ্ন, কে আছে?

সন্দীপ—তার মানে?

বিনায়ক—মানে হল, কেউ কি এখনও আছে, না কেউই নেই?

সন্দীপের চোখের ভ্রূকুটি বেশ শক্ত হয়ে ওঠে। —না, কেউই নেই। কিন্তু আজ হঠাৎ এ প্রশ্ন করলে কেন?

বিনায়ক—কদিন আগে তোমাকে দেখলাম কিনা, তখন রাত নটা হবে, তুমি একাই গাড়ি থেকে নামলে, আর জুলিয়াসের ফটোস্টুডিওতে ঢুকলে।

সন্দীপ—হ্যাঁ, ঠিকই দেখেছ। মনের ভুলে, বিশ্বাসের ভুলেও বটে, একজন ট্রেটরের ফটোর বিশ কপি প্রিন্ট করতে দিয়েছিলাম। জুলিয়াসকে বলে এলাম, আর প্রিন্ট করবার দরকার নেই।

বিনায়ক—ট্রেটর?

সন্দীপ—হ্যাঁ, তাকে ট্রেটর বলাই উচিত।

বিনায়ক—আমার কিন্তু এটা বিশ্বাস করতে...।

সন্দীপ—যে মেয়ে দুমাস ধরে হাসাহাসি করে হঠাৎ একদিন গম্ভীর হয়ে যায়, তাকে তুমি কী বলবে?

—বলব, তার মনের ভিতরে নতুন কিছু এসেছে।

সন্দীপ—যে মেয়ে দুমাস ধরে ছুটোছুটি করার পর হঠাৎ একদিন বলে ফেলবে, আর ভাল লাগছে না, বসে পড়তে ভাল লাগছে, তাকে তুমি কী বলবে?

বিনায়ক—বলতে তো ইচ্ছা করে যে, তার পায়ে ব্যথা হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা এত সরল নয় যে, এত সরল করে বলা যায়।

যে মেয়ে মসলিনের শাড়ি ছাড়া অন্য কোন শাড়ি ছোঁয় না, কাশ্মীরি সিল্ক যার খস্‌খসে বলে মনে হয়, সে মেয়ে যদি হঠাৎ একদিন একটা আটপৌরে ধনেখালি পরে বসে, তবে তাকে তুমি কী বলবে?

—বলতে হয়, তার মনের মধ্যে একটা আটপৌরে বিপ্লব ঘটে গিয়েছে।

—সে মেয়ে যদি হঠাৎ বিয়ে করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে, তবে তাকে ওই সন্দেহ করতে হয় না কি, যে....।

—সন্দেহ হয়, তার এখন গৃহিণী হবার সাধ হয়েছে, বাহিরিণী হয়ে থাকতে তার আর ভাল লাগছে না।

—কিন্তু তার স্বামী মশাইয়ের অবস্থাটা কী দাঁড়াবে?

—তোমার মত স্বামী হলে অবস্থাটা খুবই শোচনীয় হবে।

—সেইজন্যেই আমি সাবধান হয়েছি।

বিনায়ক—খুব ভালো করেছ।

সন্দীপ—তার ঘরকুনো আহ্লাদের দাড়ি আমার জীবনটাকেও ফাঁসি দিয়ে ঘরের কোণে রেখে দেবে।

বিনায়ক—ঠিক সন্দেহ করেছ। তোমার হাত ধরে বাইরে বেড়াতে তার ভয়ানক লজ্জা হবে।

বাবুর্চিকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেই হেঁসেলে ঢুকবে। সুর করে লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়তে শুরু করবে।

মন্দার—একটু রাত করে বাড়ি ফিরলে মুখ শুঁকবে।

সন্দীপের চোখ দুটো দপ করে জ্বলে ওঠে। ওরকম একটি কট্টর গিন্নিপদার্থের মুখে মুখ রাখতে আমার গা ঘিনঘিন করবে। ওরকম মেয়েকে আমি ঘেন্না না করে পারি না।

বিনায়ক—কাজেই, যা হওয়া উচিত তাই হয়েছে। তুমি বেঁচে গিয়েছ আর, সে মেয়েও বেঁচেছে।

মন্দার—কাজেই, তোমার যখন কোনও সঙ্গিনী সত্যিই নেই, তখন আজ সন্ধ্যায় দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে একটা ভাল ছবি দেখে এসো।

সন্দীপ—অন্য দিন হলে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আজ পারব না। আজ আমাকে একটা নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যেতেই হবে। জয়াজী লিমিটেড তাদের একটা নতুন ফ্যাক্টরি চালু করবে। জয়াজীর সেক্রেটারি দু'বার ফোন করে বলেছেন—আপনাকে আসতেই হবে, না এলে খুব দুঃখিত হব।

মন্দার উঠে দাঁড়ায় আর হাসতে থাকে।—কাজেই দশটা টাকা দাও। আমরা দু'জনে আজ সন্ধ্যায় ছবি দেখবার সাধ মিটিয়ে নিই।

সন্দীপ—দিচ্ছি। ছবি দেখবার পর ট্যাক্সি করে বিনায়ককে বাড়িতে পৌঁছে দিও।

মন্দার—তা হলে আরও পাঁচটা টাকা দাও।

সন্দীপ—এই নাও।

দশ

হাইড রোডের পাশে বিরাট এক সেকেলে বাগানের আম, জাম আর তেঁতুলের বড় বড় পুরনো গাছের ভিড়ের কাছে যে প্রকাণ্ড বাড়িটাকে মাথাভাঙা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে অনেকের সন্দেহ হত যে, এটা বোধ হয় কোম্পানীর আমলের কোনও বাবু মহাশয়ের বাগানবাড়ির করুণ অবশেষ, আজ আর সেই বাড়িটার সেই চেহারার কোনও চিহ্ন নেই। আজ সন্ধ্যায় সেখানে আলোর মালা জড়িয়ে ঝলমল করছে জয়াজী লিমিটেডের নতুন ফ্যাক্টরির বাড়ি। পুরনো আম জাম আর তেঁতুলের কোনও চিহ্ন নেই। সেখানে আজ ঘাস-মরা জমির উপর একটা রঙিন সামিয়ানা দাঁড়িয়ে আছে। পঞ্চাশটি টেবিল আর দুশো চেয়ার। টেবিলের উপর পানামোদের ক্রকারি সাজানো রয়েছে।

ফ্যাক্টরির সামনে একটি মেশিনের কাছে বার্মিংহামের জনৈক মিস্টার ওয়েবস্টার অল্পকথার একটি বক্তৃতায় ফ্যাক্টরির উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা জানালেন। জনৈকা ভারতীয় তরুণী নারকেল ফাটিয়ে মেশিনের গায়ে নারকেলের জল ঢেলে দিলেন। সুইচ টিপে দিলেন মিস্টার ওয়েবস্টার। সঙ্গে সঙ্গে গরগর করে মেশিনের আনন্দের শব্দ কাঁপতে শুরু করে দিল। ফ্যাক্টরির উদ্বোধন হয়ে গেল। চাকা লাগানো একটা চেয়ারের উপর বসে থেকেই হোস্ট জয়াজী তাঁর গেস্টদের ধন্যবাদ জানালেন। বেশ কষ্ট করে ধন্যবাদের বক্তৃতাটা পড়লেন জয়াজী, তাঁর জিভের জড়তা এখনও ভাল করে কাটেনি। ছ'মাস আগে পক্ষাঘাতের স্ট্রোক হয়ে বেচারা জয়াজী একেবার শয্যাশায়ী হয়ে গিয়েছিলেন। এখনও হাঁটতে পারেন না, ভাল করে দাঁড়াতেও পারেন না, তাই চাকা-লাগানো চেয়ারে বসে তাঁকে ঘোরাফেরা করতে হয়।

সামিয়ানার তলায় পানামোদের আসরের একটি প্রান্তে চাকা-লাগানো চেয়ারের উপর বসে

রইলেন জয়াজী। দেখতে পায় সন্দীপ, জয়াজীর চাকা-লাগানো চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে অতিথিদের সঙ্গে কথা বলছেন যে ভদ্রলোক, তিনি যেন জয়াজীর প্রতিনিধি হয়ে অতিথিদের আপ্যায়িত করবার ভার নিয়েছেন। ভদ্রলোকের মাথাটার সবই সাদা, কাঁধটা বেশ ঝুঁকে রয়েছে, চুরুটধরা হাতটা মাঝে মাঝে থরথর করে কেঁপে উঠছে। বেশ বয়স হয়েছে ভদ্রলোকের। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারা যায় না, ভদ্রলোক কি বাঙালী, না অবাঙালী? সাদা পাঞ্জাবি, সাদা পায়জামা, কাঁধে একটি জরিদার সাদা চাদর, কিন্তু ভদ্রলোকের মুখের হাসিটা একটুও সাদাটে নয়। বেশ উচ্ছল হাসি, লালচে হাসি মনে হয়। ভদ্রলোক এরই মধ্যে নিশ্চয় দু'চার পেগ পানীয় সেবন করে নিয়েছে, নইলে, তাঁর মুখটা এত লালচে হয়ে উঠবে কেন? ভদ্রলোকের মুখে ভাষার শব্দ নেই বললেই চলে, হাসির শব্দটাই বেশি। বুঝতে অসুবিধে নেই, এটা তাঁর জিভের কোনও জড়তার ব্যাপার নয়; সেবনজাতীয় একটা বিহ্বলতার ব্যাপার।

কিন্তু আর একজন যিনি তরতর করে ঘুরে ফিরে অতিথিদের সঙ্গে কথা বলছেন, তিনি কে? যিনিই হোন, তিনিও বোধ হয় এই আসরে আপ্যায়িকার কাজ করছেন। তিনি বোধ হয় জয়াজীর কোনও আত্মীয়া।

গত বছর কলকাতাতে লণ্ডনের এক ব্যালে দল এসে অর্কিড-কুইন নামে যে রূপকথার নাটক নেচে দেখিয়েছিল, তার মধ্যে অর্কিড-কুইনের সাজ হাসি আর ভঙ্গি সবচেয়ে বেশি মনমাতানো দৃশ্য। দেখে কে না মুগ্ধ হয়েছিল? সন্দীপের মনে হয়, আপ্যায়িকা ওই তরুণী নিশ্চয় অর্কিড-কুইন ব্যালে দেখেছে। খুব ভাল করে দেখেছে নিশ্চয়। তা না হলে ঠিক সেই অর্কিড-কুইনের মতো সাজ হাসি আর ভঙ্গি নিয়ে নিজের চেহারাটাকে এত মাতিয়ে তুলতে পারত না।

এই আসরে যেমন দেশি অতিথি, তেমনই বিদেশী অতিথি; যেমন পুরুষ অতিথি, তেমনই মহিলা অতিথিও আছেন। কিন্তু কেউ একজনও সন্দীপের পরিচিত নন। সন্দীপের টেবিলের তিন দিকের তিনটি চেয়ারই শূন্য। এরকমের একলা বসে থাকতে যদিও সন্দীপের একটুও ভাল লাগে না, তবু সন্দীপের মনে কোনও অস্বস্তি ছটফট করে না। সৌজন্যের খাতিরে আর দশটা মিনিট বসে থেকে, তারপর জয়াজীকে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যেতে হবে, এই তো।

আপ্যায়িকা তরুণী এসে সন্দীপের পাশের টেবিলের কাছে দাঁড়িয়েছে। অতিথিদের সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলছে তরুণী, সেটা ইংরেজি ভাষা। তারপরের টেবিলের কাছে গিয়ে যে ভাষায় কথা বলল সেটা উর্দু। কাছের আর একটি টেবিলের কাছে গিয়ে যে ভাষায় কথা বলে হেসে উঠল তরুণী, তার অর্থটা না বুঝতে পারলেও এটুকু বুঝতে পারে সন্দীপ, ওটা ফরাসি ভাষা। ওই টেবিলের অতিথিরা বোধ হয় ফরাসি কনস্যুলেটের লোক। গালের উপর হাতের একটা আঙুল ছুঁইয়ে রেখে আর মৃদু শ্রাগ করে কাঁধ দুটোকে একটু উথলে দিয়ে অন্য টেবিলের দিকে চলে গেল তরুণী।

কোনও সন্দেহ নেই, আপ্যায়নের আর্ট খুব ভাল আয়ত্ত করেছে এই তরুণী। সবারই মন জুগিয়ে হাসছে কিন্তু কাউকে মন জোগাচ্ছে না। তরুণীর পরিচয় অনুমানেও কিছুই ধরা যাচ্ছে না। বাঙালি, না অবাঙালি? বিবাহিতা, না অবিবাহিতা? তবু কেন যেন মনে হয় তরুণী বোধ হয় তার মনটাকে গোপন সোনার কাঠির মত এখনও তার বুকের কোটরে লুকিয়ে রেখেছে, কাউকেই স্পর্শ করতে দেয়নি।

কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপারটা এই যে, যে নারী তার সুহাসিনী মূর্তি নিয়ে তরতরিয়ে হাঁটছে আর সব টেবিলকে লক্ষ্য করছে, সে নারী সন্দীপের টেবিলের কাছাকাছি এসেও লক্ষ্যহীন হয়ে গেল। আপ্যায়িকা তরুণী সন্দীপকে যেন দেখতেই পেল না। সন্দীপের চেহারার অহংকারটা একটু বিস্মিত হয়েছে, একটা খোঁচাও খেয়েছে বোধহয়। আপ্যায়িকা মহাশয়া কি ইচ্ছে করেই লক্ষ্যহীন হয়ে সন্দীপের টেবিলটাকে দেখল না, আর বুঝিয়ে দিয়ে গেল যে, সন্দীপের মত রূপবানের কোনও ধার সে ধারে না এবং অনেক রূপবান তার দেখা আছে?

যা-ই হোক, আর তো এখানে চুপ করেক বসে থাকবার কোনও অর্থ হয় না। এখন চলে যাওয়াই উচিত। কিন্তু মনটা এভাবে অনেকক্ষণ ধরে উঠি-উঠি করেও যেন উঠে যেতে চাইছে না। যদি জানতে পারা যেত, কে ওই তরুণী, যে এখন এই পানামোদের আসরের সব টেবিলকে হাসিয়ে আর খুশি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তবে এভাবে একটা অস্বস্তি নিয়ে থিতিয়ে থাকতে হত না। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করা যায়? জয়াজীর জিভের জড়তার কাছে, কিংবা সাদামাথা ভদ্রলোকের বিহ্বলতার কাছে এই জিজ্ঞাসার কথা বলে কোনও লাভ নেই, বলা উচিতও নয়। বললে বেশ খারাপ শোনাতেও পারে। জিজ্ঞাসা করেও যদি জবাব না পাওয়া যায়, তবে সেটা আরও খারাপ ব্যাপার হবে।

কিন্তু না জেনেও যে সত্যিই চলে যেতে ইচ্ছা করছে না। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে সন্দীপ, উঠি উঠি করেও দেড়টি ঘন্টা সময়ের মধ্যে উঠে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ট্রের উপর বোতল সাজিয়ে কতবারই তো বয় এল আর চলে গেল। বয় বলেছে, সাব পেগ? সন্দীপ বলেছে, না। সন্দীপ সেই প্রথম পেগের দু-চুমুক স্বাদ পান করে নিয়ে পিপাসা মিটিয়ে নিয়েছে। কিন্তু প্রশ্নটার পিপাসা মিটছে না, কে এই তরুণী?

এরই মধ্যে অনেক টেবিলের উপর অনেক গেলাস গড়িয়ে পড়েছে। কারও কারও করধৃতকম্পিত-গেলাস ফসকে পড়ে ভেঙেছে। এখনও ভাঙছে, ভাঙা গেলাসের ঝন্ঝনানি ক্রমেই বাড়ছে। অনেক টলমল চেহারা আসর ছেড়ে চলে গিয়েছে, চলে যাচ্ছে। অথচ, যার চেহারার মধ্যে একটুও টলমলানি প্রবেশ করেনি, যার দুই চুমুকের নেশা দুই কাশিতেই ফুরিয়ে গিয়েছে, তারই মনের মধ্যে চলে যাবার কোনও তাড়া নেই, তাগিদও নেই।

কিন্তু সন্দীপের বিফল ধ্যানের সব ক্লেশ বুঝি এবার ঝরে পড়ে যাবে। আপ্যায়িকা তরুণী হেসে হেসে সন্দীপের টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে। চোখে দেখেও আকস্মিক এই বিস্ময়ের দৃশ্যটাকে বিশ্বাস করতে পারে না সন্দীপ। অবশেষে বিশ্বাস করতে হয়। সন্দীপের টেবিলের কাছে এসে একটি শূন্য চেয়ারের উপর বসে পড়েছে সেই তরুণী. নাম-না-জানা সেই প্রহেলিকা।

—আমি এষা দত্ত। আমি আপনাকে চিনি, যদিও আপনি আমাকে চেনেন না।

বহুদিনের অদেখার পর প্রিয়জনকে দেখে কথা বলতে গিয়ে যে আবেগ গলার স্বরে উথলে ওঠে, এষা দত্তের সম্ভাষণের স্বরে যেন সেইরকম প্রীতিপ্লুত আবেগ উথলে উঠেছে।

সন্দীপ—আমি অবশ্য আপনাকে চিনি না, কিন্তু শুনে আশ্চর্য হচ্ছি যে, আপনি আমাকে চেনেন।

এষা—আপনার কি মনে পড়ে যে, আপনি একদিন চক্রবর্তীর ছবির এগজিবিশন দেখতে গিয়েছিলেন?

—মনে পড়ে।

—আপনি চক্রবর্তীকে চমৎকার একটা কথা বলেছিলেন, মনে পড়ে?

—না। সত্যিই কোনও চমৎকার কথা বলে থাকলে হয়ত মনে থাকত।

—বলেছিলেন। সে কথাটা আমার মনের মধ্যে আজও গুনগুন করে। আজও ভুলতে পারিনি। আপনি বলেছিলেন—ছবিতে রূপ ফুটিয়ে তোলাই শিল্পীর তুলির আসল কাজ নয়, সার্থককাজও নয়। আসল কাজ হল, রূপের আবেগ ফুটিয়ে তোলা।

—হয়ত বলেছিলাম, মনে পড়ছে না। এবার আপনি বলুন তো, ওকথা আমি বলে থাকলে খুব ভুল করেছিলাম কী?

—আমি আমার জীবন দিয়ে বুঝেছি, আপনি কী নির্ভুল কথা বলেছিলেন। কতবার ইচ্ছে হয়েছিল, আপনার কাছে গিয়ে আরও ভাল করে কথাটাকে শুনি, আরও ভাল করে বুঝে নিই।

—কিন্তু আমার নামও তো আপনার জানা নেই, আমার কাছে যেতেন কী করে?

—আপনি চলে যাবার পরে চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসা করে আপনার নাম-ধাম আর পরিচয় সবই জেনেছিলাম।

—তাই বলুন। রহস্যটা পরিষ্কার হল।

—কিন্তু স্মৃতিটা বোধহয় এখনও পরিষ্কার হয়নি।

—কার স্মৃতি?

—আপনার, আবার কার?

—বুঝলাম না।

—আপনার কি মনে পড়েছে যে, সেদিন আপনার খুব কাছে দাঁড়িয়ে আমি ছবি দেখছিলাম?

—আপনি? আপনি সেদিন আমার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—না হতে পারে না। আমার শুধু এইটুকু মনে পড়ে যে, চোখ খুব গাঢ়-আঁধারী একজোড়া গোগো, আর গায়ে বেশ গাঢ় নীলরঙের শাড়ি, এইরকম সাজে এক মহিলা আমার কাছেই দাঁড়িয়ে ছবি দেখছিলেন।

—তার মানে, আমাকেই দেখেছিলেন।

—সে কী? আপনিই সেই নীলাম্বরা মহিলা?

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনার স্মৃতিটা এখনও একেবারে পরিষ্কার হয়নি।

—কেন?

—আপনার কি মনে পড়ে যে, সেই নীলাম্বরা অনেকক্ষণ ধরে আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে তারপর চোখ ফিরিয়ে নিল।

—না।

—ঠিকই, সামান্য মানুষের সামান্য প্রাণের কোনও ব্যাপার আপনার মতো মানুষের চোখে পড়বে কেন?

—কিন্তু আপনিও তো কিছুক্ষণ আগে এখানে ওইরকম একটা ব্যাপার করে দেখালেন। আমার টেবিলের এত কাছে এসেও আমাকে দেখতেই পেলেন না।

—মনের ভুলে নয়, চোখের ভুলেও নয়, কোনও মেজাজের ভুলেও নয়, আমি ইচ্ছে করেই আপনাকে দেখতে পাইনি।

—অদ্ভুত ইচ্ছে।

—না, একটুও অদ্ভুত ইচ্ছে নয়। ছেলেমানুষের লোভের স্বভাব কখনও লক্ষ করেছেন?

—না।

—বাচ্চা ছেলে তার পাতের সবচেয়ে প্রিয় আর লোভনীয় খাবারটাকে রেখে দিয়ে অন্য সব হাবিজাবি খাবার আগে খেয়ে নেয়।

—তা জানি, দেখেছিও।

—আমিও তাই করেছি।, যার সঙ্গে কথা বলতে সবচেয়ে বেশি ভাল লাগবে, যাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে হবে, তাকে ইচ্ছে করেই না-দেখার মধ্যে রেখে দিয়ে চলে গিয়েছিলাম। বিশ্বাস করছেন?

—বিশ্বাস করতে অবশ্য একটু...।

—বিশ্বাস করুন, সন্দীপবাবু।

অর্কিড-কুইনের চোখে গোগো নেই। সন্দীপের এখন ভাল করে আর স্পষ্ট করে দেখতে কোনওই অসুবিধে নেই। এষা দত্তের দু'চোখের দুই কালো তারার উপর সত্যিই সুন্দর একটি আবেদনের আলো ঝিকমিক করছে।

এ কী? চমকে ওঠে সন্দীপের দুই চোখ। এষা দত্তের দুই চোখের দুই কোণ থেকে সত্যিই যে বড়-বড় দুটি জলের ফোঁটা পড়ল। এষা দত্তের শরীরটাও বোধ হয় অবশ হয়ে গিয়েছে। হাত তুলে চোখ দুটোকে মুছতেও পারছে না।

সন্দীপ—আমি সত্যিই আশ্চর্য হয়েছি, এষা। এতটা ভাবতে পারিনি।

এষা—ঠিকই, এতটা ভাবতে পারবেন কেন? একটা মানুষ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সর্বক্ষণ আপনার কথা ভাবছে অথচ আপনার কাছে কখনও আসছে না, এঠা তো কেউ ভাবতে কিংবা বিশ্বাস করতে পারে না।

সন্দীপ—আমি কখনও ভাবতে পারিনি বটে, কিন্তু আজ আমি বিশ্বাস করছি। শোনো এষা, আমি বিশ্বাস করছি।

এষা—আপনি জানেন না, আপনাকে শুধু একটু ভাল করে দেখবার জন্যে আমাকে কী নির্লজ্জ চক্রান্ত করতে হয়েছে।

সন্দীপের দুই চোখের উৎফুল্ল দৃষ্টিটা দীপ্ত হয়ে ওঠে—চক্রান্ত?

এষা—হ্যাঁ, রীতিমত চক্রান্ত। ভাবনার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে, শেষে একদিন মুখ খুলে বাবার কাছে তোমার কথাটা বলেই ফেললাম। আমার মনের আসল কথাটা অবিশ্যি নয়, তোমার সঙ্গে চেনাশোনার বন্ধ রাস্তাটা যাতে খুলে যায়, তারই জন্য একটা চেষ্টার কথা। বাবাকে বলেছিলাম, একদিন যেন তোমার বাড়িতে গিয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করে আসেন। আর তোমাকে একদিন আমাদের বাড়িতে এসে চা খেয়ে যেতে নেমন্তন্ন করেন। কিন্তু বাবার যা ভুলো মন.....যাক সে কথা, আমি বেহায়ার মত মুখ খুলে স্যারের সেক্রেটারি বলবন্ত ভাইকে ধরে বসলাম, জয়াজী লিমিটেডের নতুন ফ্যাক্টরির উদ্বোধনের দিনে সন্ধ্যাবেলার পার্টিতে যেন তোমাকে নেমন্তন্ন করেন

আর আসবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। তাই.....।

লজ্জিত হয়ে হেসে ফেলে এষা। —আমার অনুরোধের কথা শুনে বলবন্তভাই অবশ্য একটু মুখ টিপে হেসেছিলেন তবু আমি হাসিনি। কারও সন্দেহের কাছে একেবারে স্পষ্ট করে ধরা পড়ে যেতে আমার ভাল লাগে না, বরং একটু ভয়ই করে। যাক, আমার চক্রান্তের স্বপ্ন তো সফল হয়েছে। এখন তুমি যদি আমার হ্যাংলাপনা আর বেহায়াপনা ক্ষমা করে দাও, তবেই আমি নিশ্চিন্ত হই।

সন্দীপ—মনে হচ্ছে, জয়াজি পরিবারের সঙ্গে তোমার খুব মেলামেশা আছে।

এষা—হ্যাঁ, সেই কবে, প্রায় পাঁচ বছর আগে আমি জয়াজীকে স্যার বলতে শিখেছিলাম তাই অভ্যেসের নিয়মে আজও স্যার বলি। আমি স্যারের ভাইঝি মৃদুলার গভর্নেস ছিলাম। এই চাকরিটারই জন্যে জয়াজীকে স্যার বলতে হত। স্যার একদিন বললেন, এষা আব তুমকো বোম্বাই যানা পাড়েগা।

সন্দীপ—কেন?

এষা—মৃদুলা ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসল যে, সে কিছুতেই আর কলকাতায় থাকবে না। বোম্বাই তার ভাল লাগে, তাই বোম্বাইয়েই থাকবে। আমাকেও তাই মৃদুলার সঙ্গে বোম্বাইয়ে স্যারের বাড়ি জয়াজী ম্যানসনে চারটি বছর কাটিয়ে দিতে হয়েছিল।

সন্দীপ—চাকরিটা নিজে ছেড়ে দিয়েছিলে, না ওরাই—

এষা—না, আমিই ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম।

সন্দীপ—কেন?

এষা—মৃদুলার যেমন বোম্বাই ভাল লাগে, আমারও তেমনই কলকাতা ভাল লাগে। তাই চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতাতে চলে এলাম। সে চাকরিতে কিন্তু কোনও ঝঞ্ঝাট ছিল না। সত্যি কথা, বোম্বাইয়ের জীবনটাতেও কোনও ঝঞ্ঝাট ছিল না। সকাল, বিকেল, দুপুর, সন্ধ্যা আর রাত, মাঝরাত হলেই বা কী আসে যায়, শুধু বেড়াও আর বেড়াও। একবেলা মালাবার হিল, তো ওবেলা জুহু। আজ কানহেরি, তো কাল এলিফ্যান্টা দ্বীপ। যেমন মৃদুলা, তেমনই তার দাদা চিরঞ্জীব। তেমনই আবার চিরঞ্জীবের বন্ধুদল। সবাই যে আমোদের উড়ন্ত প্রজাপতি। নাচ দেখা, গান শোনা, আর ছবি দেখা; পিকনিক, হিচহাইকিং আর প্লেজার ট্রিপ—রেস্টুরেন্ট, বিয়ার-বার আর, বলতে লজ্জা করে, রাতের ক্লাবের স্ট্রিপটিজ, সব কিছুই যেন লুঠ করে প্রাণ ভরাবার আনন্দে ছুটোছুটি করা ওদের জীবনের একটা অভ্যেস।

সন্দীপ—অভ্যেসটা কি খুব খারাপ?

এষা—একটুও খারাপ নয়। আমারও একটুও খারাপ লাগেনি। কিন্তু সেজন্যে বোম্বাইয়ে পড়ে থাকব কেন? কলকাতা কি একটা গোবি মরুভূমি?

সন্দীপ—আমি তা মনে করি না।

এষা—আমিও তা মনে করি না। চমৎকার আনন্দের আর আবেগের জীবন কলকাতাতেও আছে, ইচ্ছে থাকলে আর খুঁজলেই পাওয়া যায়।

অদূরে অলস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে বয়, তার দিকে আঙুল তুলে ইশারা করে এষা— ইধর আও।

বয় এসে বলে—ফরমাইয়ে।

এষা—দুটো স্প্যানিশ-এর দুটোই কি খরচ হয়ে গিয়েছে?

বয়—একঠো হ্যায়।

এষা—নিয়ে এসো।

বয় আবার ফিরে এসে টেবির উপর এখটা বোতল রাখে, ছিপি খোলে। এষা বলে—তুমি চলে যাও, বয়। এখানে তোমার আর কিছুই করতে হবে না। আমি আছি।

সন্দীপ—তোমার এত ব্যস্ত হবার কোনও দরকার ছিল না।

এষা—ছিল। আমি যা বলছি, শোনো। আমি যা করছি, দেখো। আজ আমি তোমার মনের ভিতরে ঠাঁই পেয়ে গিয়েছি, আমার মনের আনন্দ আমি নিজের হাতে তোমার গেলাসে ঢেলে দেব।

সন্দীপ—তোমার গেলাস কই?

এষা—আমাকে ক্ষমা করো।

নিজের হাতের বোতলটাকে কাত করে ধরে সন্দীপের গেলাসে স্প্যানিশ লাল মদের ছোট্ট একটি ঝর্ণা ঝরিয়ে দেয় এষা দত্ত। সন্দীপের মুখেব দিকে তাকিয়ে আর নিবিড়-মৃদু স্বরে যেন চরম আত্মনিবেদনের একটি অঙ্গীকার গুঞ্জরিত করে শুনিয়ে দেয়—যখনই ইচ্ছে হবে, আমার কাছে চাইবে। আমি তোমাকে সব দেব। আজ শুধু আমার এই সামান্য উপহার নিয়ে খুশি হও। খাও, সন্দীপ।

গেলাস হাতে তুলে নিয়ে আর কথা বলতে গিয়ে সন্দীপেরও গলার স্বর নিবিড় হয়ে যায়।—আমার এখন আর বলতে কুণ্ঠা নেই এষা, তোমাকে ভালবাসতে আর কাছে পেতে ইচ্ছে করছে।

বুকের ভিতরে এরকমের তেষ্টার আবেগ জীবনে কোনওদিনও অনুভব করেনি সন্দীপ। চার চুমুকে গেলাস খালি করে দিয়ে এষার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। দেখতে এষার চেয়ে ঢের ঢের বেশি সুন্দর, এমন অনেক মেয়েকে চোখের কাছে আর বুকের কাছেও পেয়েছে সন্দীপ। চোখ মুখ আর নাকের ধরন-গড়নের হিসেব ধরলে, তাদের অনেকের চেয়ে এষা দত্তকে কম সুন্দর বলে মনে করতে হবে। আর, যদি শরীরটার ধরন-গড়নের হিসেব করা হয়, তবে এই এষা দত্তকে একটা ছন্দিতা ললিতা বা কোমলতা বলে কেউ মনে করবে না। কিন্তু এষা দত্তের এই অনিখুঁত রূপের মধ্যেই এমন একটি নিখুঁত মনোহারিতার জাদু আছে, যা ওসব মেয়ের কারও রূপের মধ্যে ছিল না। মনে হয় সন্দীপের, এষা দত্তের এই শখের অর্কিড-কুইন মূর্তি যদি এই মুহূর্তে নিসাজ ও নিলাজ হয়ে যায়, তবে সেই জাদু আরও দুরন্ত হয়ে উঠবে। রূপ যা-ই হোক, এষা দত্তের রূপের আবেগ খুবই আশ্চর্য লাগে সন্দীপের, এষা দত্তের মত নারী সন্দীপের জীবনের সহচরী, সন্দীপের সব আনন্দের নায়িকা হতে চায়, আর সেই ইচ্ছায় মাসের পর মাসের প্রতীক্ষা সহ্য করেছে।

এষা বলে—এই স্প্যানিশ মদের নাম জান?

সন্দীপ—না। আমি স্প্যানিশ ভাষা জানি না।

এষা—আমিও জানি না। কিন্তু নামটার অর্থ জেনে নিয়েছি।

সন্দীপ—অর্থটা কী?

এষা—অর্থ হল, আঙুরের যৌবন।

সন্দীপ—সুন্দর নাম! নামটা এষার যৌবন হলে আরও ভাল হত।

এষা—হয়ত ভাল হত।

সন্দীপ—তুমি তো বেশ ভাল ফ্রেঞ্চ বলতে পার। কোথায় শিখলে?

এষা হাসে।—অন্য কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলে দিতাম, ফ্রান্সের সরবোন ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময় শিখেছি। কিন্তু তুমি জিজ্ঞাসা করছ বলেই বলতে হচ্ছে, চন্দননগরে ছোটমামার বাড়িতে থেকে স্কুলে পড়বার সময় শিখেছি।

সন্দীপ—কিন্তু কই, আর একটু দাও। স্প্যানিশ মদিরা সত্যিই বেশ টেস্টফুল।

এষা—তোমার ড্রাইভার এসেছে?

সন্দীপ—না। গাড়ি নিয়ে আমি একাই এসেছি।

এষা—তবে থাক, আর খেও না।

সন্দীপ—কিন্তু...।

এষা—এই বস্তুটি কলকাতাতে দুর্লভ। কিন্তু বলবন্তভাই খুবই জোগাড়ে লোক। কাকে যেন টেলিফোন করে নিয়ে কোথায় যেন গেলেন, অর দু ঘণ্টার মধ্যে দুটি স্প্যানিশ নিয়ে ফিরে এলেন।

সন্দীপ—তবে দুর্লভের আর এক গেলাস টেস্ট শুভ হলে....।

এষা—না, থাক। যেটুকু খেয়েছ, তার চেয়ে বেশি এখানে আর খাওয়া উচিত নয়।

সন্দীপ—কিন্তু বিশ্বাস করো এষা, তোমার ওই পেয়ার অব লিপস, এই ঠোঁট দুটিকে চমৎকার দুটি তাহিতী ঠোঁট বলে মনে হয়।

এষা হাসে।—কোনও তাহিতি সুন্দরীর সঙ্গে কোনওদিন দেখা হয়েছিল নিশ্চয়?

সন্দীপ—হ্যাঁ, স্বপ্নে। এটা আমার স্বপ্নের অভিজ্ঞতার কথা, তাহিতি ঠোঁট বড়ই টেস্টফুল। মর্ডানিস্ট হয়েও চক্রবর্তী অবিশ্যি তর্ক করে চেঁচায়, অজন্তা ঠোঁট, অজন্তা ঠোঁট। কিন্তু অজন্তা ঠোঁট আমার একটুও পছন্দ নয়। সেকেলে কিছুই আমার পছন্দ নয়।

এষা—এবার উঠতে হয়। আর এখানে দেরি করবার দরকার নেই।

সন্দীপ উঠে দাঁড়ায়—হ্যাঁ চলো, এখানে আর কোনও দরকার নেই।

চাকা-লাগানো চেয়ার আর নেই, চলে গিয়েছেন জয়াজী। সাদামাথা সেই বৃদ্ধও নেই। পানামোদের আসরে তখন মাত্র দু'জন অবশিষ্ট অতিথি আছেন, আর কেউ নেই। তাঁরাই দুই চেয়ারের উপর নেতিয়ে পড়েছেন, ঘুমিয়ে আছেন। প্রায়-নিস্তব্ধ আসরের প্রায়-নির্জন পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে সন্দীপ রায় আর এষা দত্ত গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ায়। এষা বলে—আমাকে এখন বাড়িতে পৌঁছে দিতে তোমার কি কোনও অসুবিধা কিংবা....।

সন্দীপ—চুপ! চলো। বলো, কোথায় তোমার বাড়ি?

এষা—আমির আলি অ্যাভিনিউ।

ছুটে চলে সন্দীপের উৎফুল্ল ক্যাডিলাক। সন্দীপের পাশে যেন নিবিড় এক আবেশের সুখে বিভোর হয়ে আর নীরব হয়ে বসে থাকে এষা, সন্দীপের ভালবাসার অঙ্গীকার পেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছে যার এতদিনের আশা, আর অপেক্ষা।

সন্দীপ বলে—আমি কবি নই, কবিতা করে মনের কথা বলতে পারি না। তবু বলতে ইচ্ছে করছে, আমরা দু'জন যেন দূর আকাশের একটা তারার দিকে ছুটে চলেছি।

এষা—হ্যাঁ, আমরা কোনওদিনও থামব না, জিরোব না, ক্লান্তও হব না।

সন্দীপ—আজই কে যেন আমির আলি অ্যাভিনিউ-এর কথা বলছিল....। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বিনায়ক বলছিল, আমির আলি অ্যাভিনিউয়ের গুণাকর দত্তের কথা।

এষা—আমার বাবা, গুণাকর দত্ত। তাঁকে তো তুমি আজ দেখেছ, স্যারের ইনভ্যালিড চেয়ারের কাছে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। আজকের পার্টির গেস্টদের সঙ্গে কথা বলবার দায়িত্ব তো তাঁকেই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁর মনটা শিশুর মনের মত এমনই সরল আর ভুলো যে, সে দায়িত্ব ভুলে গিয়ে নিজেরই অবস্থা তরল করে তুললেন। স্যার বাধ্য হয়ে শেষে আমারই উপর সে দায়িত্ব তুলে দিলেন।

সন্দীপ—জয়াজীর সঙ্গে তোমার বাবা বোধ হয় অনেকদিন থেকে একটা জানা-শোনা সম্পর্ক আছে।

এষা—হ্যাঁ, মৃদুলার গভর্নেস এষা দত্তের বাবা গুণাকর দত্ত, এই পরিচয়ের সূত্রে স্যারের সঙ্গে বাবার একটু মেলামেশার সম্পর্ক হয়েছে। কিন্তু যিনি তাঁর আসল বন্ধু ও একমাত্র বন্ধু, তাঁর নাম বোধহয় তুমিও শুনেছ।

—শুনেছি বোধহয়। বোধ হয় কেন, মনে হচ্ছে নিশ্চয় শুনেছি।

—বাবার বন্ধুর নাম, পিটার শ্যামলাল।

—অ্যাঁ? কয়লার রাজা বলে যাঁর একটা সুনাম আছে, সেই পিটার শ্যামলাল?

—হ্যাঁ, তাঁর ঘোড়ারও সুনাম আছে।

—থাকবারই কথা।

—তাজ মুল্‌কি বিক্রম স্যামসন বীরবাহাদুর আর সোহরাব, নামগুলি তুমি শুনেছ নিশ্চয়।

—শুনেছি বোধহয়।

—এরা সত্যিই এক-একটি হিরো। পিটার শ্যামলালের এইসব রেসহর্সের নাম তুমি সিঙ্গাপুর আর কলম্বোতেও শুনতে পাবে। আমার বাবা এই পিটার শ্যামলালের সব কাজ-কারবারের একমাত্র অ্যাডভাইসর।

—বাঃ।

—আমার মনে অবিশ্যি, একটা দুঃখ আছে, বাবা আমার চেয়ে তাঁর এই বন্ধুকেই বেশি ভালবাসেন।

সন্দীপ—না এষা, এরকমের দুঃখ-টুঃখ মনের মধ্যে পুষে রেখে কোনও লাভ নেই। যে যেখানে যেমনটি আছেন, তিনি সেখানে তেমনটি হয়ে থাকুন, আমাদের সেজন্যে চিন্তিত হবার কোনও মানে হয় না।

এষা বলে—এবার সত্যিই যে একটু থামতে হবে, সন্দীপ।

সন্দীপ—এটা কি তোমাদের বাড়ি?

এষা—বাড়িটা আমাদের নয়। এই বাড়ির দোতলার তিন নম্বর ফ্ল্যাটের একটি ঘর তোমার এষার ঘর। যে ঘরে আজ সারারাত জেগে বসে থাকবে তোমার এষা, মনে মনে একজনের সঙ্গে কথা বলবে, আর ঘুমোতেই পারবে না। আচ্ছা, আমি এখন নামি। আসি।

সন্দীপ ডাকে—এষা! নেমে যাবার আগে...।

এষা—বলো।

সন্দীপ—তাহিতি ঠোঁট?

এষা—হ্যাঁ, তোমার ইচ্ছে।

এগার

কলকাতার মাঘ ফাল্গুন চৈত্র আর বৈশাখ—একের পর এক এসেছে আর চলে গিয়েছে। ময়দানের আকাশনিম বিলাতি শিরীষ আর মাদাগাস্কারি গুলমোরের ফুল ও পাতার শোভা বদলে গিয়েছে। কিন্তু এই চার মাসের মধ্যে আমির আলি অ্যাভিনিউয়ের একটি বাড়ির সামনে একটি দৃশ্যের চেহারা একটুও বদলায়নি। সন্ধ্যা হলেই সন্দীপের ক্যাডিলাক ছুটে এসে এই বাড়ির সামনে দাঁড়ায়। কোনওদিন কিছুক্ষণ, কোনওদিন অত্যন্ত অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার চলে যায়। প্রতিবেশীদের চোখে এই বাঁধা-ধরা নিয়মিত দৃশ্যটা কোনও কৌতূহল জাগিয়ে তোলে কি তোলে না, সেটা কারও চোখে কিছুই বোঝা যায় না। অন্যে পরে কা কথা, এই বাড়িরই তিন নম্বর ফ্ল্যাটের দ্বিতীয় ঘরের খোলা দরজার কাছে একটি চেয়ারের উপর যাকে বসে থাকতে দেখা যায়, তাঁরও চোখে কি কোনও কৌতূহল চঞ্চলিত হয়? একটুও না। কন্যা এষা দত্ত যখন সন্দীপের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলতে বলতে আর সিঁড়ি ধরে উপরে ওঠে কিংবা নেমে চলে যায়, তখন পিতা গুণাকর দত্ত নিবিষ্ট চিত্তে খবরের কাগজ পড়তে থাকেন, চোখ তুলে একবার তাকানও না। ক' দিনই বা তাঁকে দেখতে পেয়েছে সন্দীপ? এই চার মাসের মধ্যে মাত্র পাঁচবার। এষা নিজেই বলেছে—বাবা রাত্রিবেলাতে এখানে থাকেন না। সন্ধ্যে হতেই বেরিয়ে যান, আর ফিরে আসেন সকালবেলা।

সন্দীপ—কোথায় যান? এতক্ষণ কোথায় থাকেন?

এষা—এই বাড়ির সাত নম্বরে যিনি থাকেন, তিনি একজন মিস্টার লাহিড়ী। তিনি লোকের কাছে রটিয়ে বেড়ান—মেয়ের ঘরের ভিতরে রাত্রিবেলা অদ্ভুত ও বেপরোয়া হাসাহাসির শব্দ বরদাস্ত করতে পারেন না বলেই, গুণাকর দত্ত সন্ধ্যে হতেই বাইরে চলে যান আর হাওড়া স্টেশনের ওয়েটিংরুমে শুয়ে থাকেন। পাশের বাড়ির জয়ন্ত মল্লিককে যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তিনি বলবেন যে, মেয়েরই ইচ্ছায় বা হুকুমে বাবা গুণাকর দত্ত রাত্রিবেলাতে ঘরে থাকেন না। বড় হলের একটা জুয়ার ক্লাবে রাত কাটিয়ে সকালবেলা বাড়িতে ফিরে আসেন। আর, আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমি বলব যে, পিটার শ্যামলালের ইচ্ছা ও অনুরোধের মানরক্ষা করবার জন্য তার বন্ধু গুণাকর দত্ত রোজই রাত্রিতে তাঁর বাড়িতে গিয়ে কাজ-কারবারের ভালমন্দ অবস্থার কথা আলোচনা করেন, পরামর্শ দেন, আর ডিনারের পর সেখানেই একটি ঘরের বিছানাতে শুয়ে বুড়ো মানুষটি রাত্রিবেলার বাকি কয়েকটা ঘন্টা পার করে দেন।

সন্দীপ—আমাকে আর বেশি বলতে ও বোঝাতে হবে না এষা। লাহিড়ী একটা নিরেট মিথ্যেবাদী আর জয়ন্ত মল্লিক একটা গবেট মিথ্যেবাদী। ওদের যা ইচ্ছে হয় তাই বলুক, আমাদের সেজন্য চিন্তিত হবার কোনও মানে হয় না।

হেসে ফেলে এষা—যে যেখানে যেমনটি আছে সে সেখানে তেমনটি থাকুক। তা নিয়ে আমাদের চিন্তা করবার কিছু নেই।

সন্দীপও হাসে—হ্যাঁ, চিন্তা করে কোনও লাভও নেই।

এই চার মাসের মধ্যে সন্দীপের জীবনের রূপ একটুও বদলায়নি। কিন্তু ভাবনার স্বভাবটা বদলেছে। আনন্দের ছুটোছুটি কোনও প্রোগ্রামের জন্য সন্দীপকে কিছুই আর ভাবতে হয় না। সন্দীপের ভাবনাটা উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করে, আজ সন্ধ্যায় সন্দীপের জীবনের আবেগটাকে এষা তার নিজেরই ইচ্ছার আর উৎসাহের দুরন্ত টানে নিয়ে কোথাও কোনও আনন্দের কাছে নিশ্চয়

পৌঁছে দেবে। নিশ্চিন্ত হয়েছে সন্দীপ।

বিনায়ক বলেছে—এটা তোমার সৌভাগ্য, সন্দীপ। দেশি ফিলসফির কথাও এই যে, প্রকৃতিই কাজ করেন এবং পুরুষ তাঁকে অনুসরণ করে চলেন। বিনায়কের কথা শুনে খুব বেশি হয়েছে সন্দীপ। —যা-ই বলো বিনায়ক, দেশি ফিলসফির যত বাজে কথার মধ্যে এটা কিন্তু একটা ভাল কথা।

সন্দীপ তো এত জেনেও কোনওদিন জানাতে পারেনি যে, এই কলকাতাতে ওরমক চমৎকার একটা ক্লাব আছে। এষারই ইচ্ছায় কথায় ও আগ্রহে একদিন সেই ক্লাবে গিয়ে আলো-ঝলমল সুইমিং পুলে সাঁতারের কাছে কোথায় লাগে রাজহংসীর সাঁতার? ছোট্ট একটি বিকিনি পরে সুইমিং পুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল এষা। একটানা দশ মিনিট ধরে সাঁতার কাটল। এষার চমৎকার ব্রেস্টস্ট্রোক সুইমিং পুলের জল উথলে দিয়ে যেন সন্দীপের চোখের আর বুকের তৃপ্তিটাকেই উথলে দিয়েছে।

এষা বলেছে—আমার কোনও সমস্যা নেই সন্দীপ। ঘর নামে কোনও ভয় আমার প্রাণে নেই।

সন্দীপ—কী বললে? ঘর-বাঁধা জীবনকে তোমার ভয় করে না?

কলকল করে হেসে ওঠে এষা। —ঘর আমাকে বাঁধতে পারে না, পারবেও না। আমিই ঘরকে বাঁধতে পারি।

সন্দীপ—ঠিক বুঝলাম না।

এষা—ঘরের বাইরে আমি তোমাকে যে আনন্দ দিতে পারি, ঘরের ভিতরেও সে আনন্দ দিতে পারি। আমার কাছে দুই-ই সমান।

এষার মুখের এই কথা শোনবার পর দশটা দিনও পার হয়নি, একদিন সন্দীপের প্রাণটা এই বিশ্বাসে ভরা হয়ে গেল যে, ঘরের জীবনটাকে আনন্দ-উতলা করে তুলতে জানে এষা। মিথ্যে বলেনি এষা, বাড়িয়েও বলেনি।

সে ঘর আমির আলি অ্যাভিনিউ-এর এই বাড়ির দোতলার তিন নম্বর ফ্ল্যাটের একটি ঘর। সেই ঘরের ভিতরে একটি উৎসবের উচ্ছ্বসিত মধুরতার মধ্যে ডুবে গিয়ে সন্দীপের প্রাণটা যেন নতুন একটি বিশ্বাসের মুক্তা পেয়ে গেল। না, এষার মত মেয়ে ঘরবাসিনী হতে চাইলেও ভয় করবার কিছু নেই। তাতে সন্দীপের জীবনের সাধ আশা আর আনন্দ একটুও ব্যথিত হবে না।

চার-পাঁচটা বোতল থেকে চার-পাঁচ রকমের পানীয় ঢেলে কাচের জারের বুকটা পরিপূর্ণ করে দিয়ে হাসতে থাকে এষা। —তোমার চেনা ওই অরোরা আর কলরডোর বার-এ কীই বা পাওয়া যায়? কী-ই বা ওরা জানে? একঘেয়ে স্বাদের যত সাদামাটা ড্রিঙ্ক ছাড়া কী-ই বা ওরা দিতে পারে? আমি যা দিচ্ছি সেটা একবার খেয়ে দেখো। তারপর বলো, কেমন স্বাদ আর কেমন লাগল।

সন্দীপ—এটা তুমি কী তৈরি করলে?

এষা—এটাকে বলা চলে, প্যারাডাইস ককটেল। অ্যাপ্রিকট ব্যাণ্ডির সঙ্গে ড্রাই জিন, তার উপর একটু লেমন জুস ঢেলেছি। কিন্তু আমার নিজের রুচির ফর্মূলা একটু অন্য রকমের। আমার প্যারাডাইস ককটেলে কিছু ক্রিম দিতে হয়। তাই দিয়েছি। খেয়ে দেখো, তারপর বলবে কেমন লাগল।

তিন-চার চুমুকের টানে যতখানি পারা যায় খেয়ে নিয়ে সন্দীপ হাসতে থাকে। —ভাল, কিন্তু বড়ই লঘু।

এষা।—হ্যাঁ, এটা মেয়েদেরই রোচে ভাল। আমার মনে হয়, তোমার দরকার মার্টিনি কিংবা দু'নম্বরের শেরি টুইস্ট। যা-ই হোক, সে না হয় আর একদিন হবে, আজ শুধু এই....।

সন্দীপ—আমার বিশ্বাস, এই লঘু প্যারাডাইস বার চারেক পেটে পড়লে বেশ গুরুতর হয়ে উঠবে।

এষা—হোক না।

সন্দীপ—তুমি দেখছি, এক চুমুকের টানেই গেলাস খালি করে দিচ্ছ।

এষা—এই রকমই আমার অভ্যেস। গেলাস হাতে আমি আর বেশি টিকুতে পারি না। আর এরকম করে এত দূরেও বসে থাকতে পারি না।

নিজের চেয়ার ছেড়ে সন্দীপের চেয়ারের কাছে এসে আর চেয়ারের কাঁধটা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এষা।

কী যেন ভাবছে এষা। শরীরটা হঠাৎ এক-একবার দুলে উঠছে। হয় মনের ভিতরে একটা নতুন ইচ্ছার দোলা, নয় লঘু প্যারাডাইসের আবেশ। এষার দু'পায়ের পাতা যেন কার্পেটের উপর একটা ছন্দ দুলিয়ে আর বুলিয়ে দিচ্ছে!

সন্দীপ—এ কী হচ্ছে, এষা? এরই মধ্যে আর এতটুকুতে তোমার স্টেপ যে টলতে শুরু করেছে।

এষা—আমার স্টেপ কখনও টলেনি সন্দীপ। এতটুকুতেও না, অতটুকুতেও না।

সন্দীপ—তবে?

এষা—তবে বলতে হয়....কী বলব ভেবে পাচ্ছি না। কিন্তু কথা দিচ্ছি তোমাকে, ভাল ফ্লোর যদি কখনও পাই, তবে আমার স্টেপের কাজ তোমাকে তখন দেখিয়ে দেব।

সন্দীপের চোখে মুখে যেন চকিত বিস্ময়ের শিহর ছড়িয়ে পড়ে। যাকে সেদিন মন-মাতানো সাজ আর ভঙ্গির অর্কিড-কুইন বলে মনে হয়েছিল, তার শরীরটা যে সত্যিই গুণের আর কাজের একটি সোনার খনি।

এক হাতে কোমর জড়িয়ে ধরে সন্দীপ। —তুমি আমাকে আশ্চর্য করে দিলে, এষা। যত দিন যাচ্ছে, আমি ততই বেশি আশ্চর্য হচ্ছি।

এষাও সন্দীপের গলা জড়িয়ে ধরে। —আমি গর্ব করছি না, তবু বলব , কী জানে আর কতটুকুই বা জানে ওরা?

সন্দীপ—কারা? কাদের কথা বলছ?

এষা—ওই, তোমাদের সেই রাতের ক্লাবের মেয়েগুলো, যে ক্লাবের তুমি একজন ন্যাওটা ভক্ত। একটা বাজে বলরুমের যত ভাড়া করা বাজে নাচনি। নাচের কী আর কতটুকুই বা ওরা জানে? আহা, মিসেস থাম্বাটা নামে সেই ধুমসি, কী নাচই নাচলেন। যেমন কিম্ভুত বডি-সোয়ে, তেমনই কিম্ভুত ফুটওয়ার্ক। এটুকু শিক্ষা নেই যে, ওয়ালজে ন্যাচারাল টার্ন থেকে রিভার্স টার্নে যেতে হলে ওরকম বকের মত শুধু স্টেপ তুললে আর ফেললেই হয় না। মাপ মত এগোতে আর পেছোতে হয়।

এমন করে কোনওদিনও এত মুক্তকণ্ঠ হয়ে নিজের গুণের পরিচয় প্রকাশ করেনি এষা। আজ বোধহয় ইচ্ছে করেই সন্দীপের প্রাণটাকে শত রকমের বিচিত্র বিস্ময়ে ভরে দেবার জন্য এক একটি বিরাট পর্দা সরিয়ে দিয়ে সন্দীপকে এক একটি নতুন আকাশের জ্যোৎস্না দেখিয়ে দিচ্ছে, সন্দীপও দেখে দেখে বিহ্বল হয়ে যাচ্ছে।

অপলক চোখে এষার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সন্দীপ। এষার চোখে ছোট্ট একটি ভ্রূকুটি, বুঝতে অসুবিধা নেই সন্দীপের, ওটা নিবিড় এক অভিমানের ভ্রূকুটি। কিন্তু কেন? কী ভাবছে এষা? এষা বলে—তুমিই বা আমার কী আর কতটুকু জেনেছ? কতটুকু চিনেছ?

স্বীকার করে সন্দীপ—না, চিনতে পারিনি। কিন্তু আজ বলতে পারি, চিনেছি।

সন্দীপের গলা ছেড়ে দিয়ে সরে যায়, আবার নিজের চেয়ারের কাছে গিয়ে টেবিলের একটা ট্রের ঢাকা সরিয়ে সন্দীপের হাতের কাছে এগিয়ে দেয়।

সন্দীপ—খাবারও আনিয়ে রেখেছ?

এষা—না আনিয়ে উপায় কী? রোজারিও'র কিচেনের প্যাটিস তোমার খুব পছন্দ, তাই আনিয়েছি। নইলে আমি নিজের হাতেই....আমি বলব, কী আর কতটুকুই বা জানে তোমার রোজারিও? ওরা কি পারবে, তোমার জন্যে রোস্ট ডাক আ'লোরাঁজ তৈরি করে দিতে? জানে কি ওরা, ফ্রেঞ্চ চিজ সুপ তৈরি করতে হলে তিন কাপ চিজের সঙ্গে অন্তত দু'চামচ শেরি আর চার কাপ চিকেন স্টক মেশাতে হয়?

প্যারাডাইস ককটেলের জাগ সন্দীপের হাতের কাছে এগিয়ে দেয় এষা—খাও, খেয়ে ফেলো। আর আমাকে দশ মিনিটের জন্য ক্ষমা করো, আমি আসছি।

দশ মিনিটও লাগে না, তিন মিনিটের মধ্যে প্যারাডাইস ককটেলের শেষের ফোঁটাটাকেও খেয়ে নিয়ে শূন্য জাকের দিকে তাকিয়ে থাকে সন্দীপ। জাগের কাচ ঝিকঝিক করে হাসছে। সেই হাসির মধ্যে যেন সন্দীপের একটা স্বপ্ন হাসছে। সেই স্বপ্নের মধ্যে যার মুখটা হাসছে, সেটা এষারই মুখ।

—এই যে আমি। তোমার এষা। চিনতে পারছ তো?

দশ মিনিট শেষ হবার আগেই অদৃশ্য অন্তরাহ থেকে যেন একটি অনাবরণ কুহকের ছবি হয়ে আবার ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে এষা। যে শাড়ি গায়ে জড়িয়েছে, সেটা একটা সিল্কের নেট বলে মনে হয়। স্বচ্ছ শাড়িটাকে একটা বস্তু বলেই মনে হয় না। ওটা আবরণ নয়, আবরণের একটা মায়া।

চেয়ারে বসে না এষা। টেবিলের কাছে এসে শুধু দাঁড়িয়ে থাকে। মাথা হেলিয়ে আর মাথার ফাঁপানো চুলের স্তবকটাকে একটু দুলিয়ে দিয়ে হাসতে থাকে। —বলো এবার, আমার এই লং-মোবাইল হেয়ার-ডু তোমার দেখতে ভাল লাগছে কি লাগছে না? এরকম পিন-কার্ল রিপ্‌ল তোমার পছন্দ হয় কি না?

সন্দীপ—একথা কেন আর জিজ্ঞাসা করছ?

এষা—সাজতে আমি ভালবাসি বটে, কিন্তু সেজন্য আমি খুব বেশি মাথা ঘামাই না। মাসে একশো টাকাও লাগে না। সামান্য কিছু পাস্তুরাইজড্‌ ফেস ক্রিম, এক শিশি অল-টোন শ্যাম্পু, এক শিশি স্কিনটনিক লোশন, আর একটা মাত্র নন-স্মিয়ার লিপস্টিক হলেই চলে যায়। চোখের জন্য মাসকারা পেন্সিল বড় একটা ছুঁই না, দরকার হয় না।

সন্দীপের চোখের কাছে নিজের চোখ দুটোকে এগিয়ে দিয়ে হাসতে থাকে এষা। —ভাল করে দেখে নাও, একান্ন টাকা দিয়ে কেনা নকল আইল্যাশ নয়।

নিজের ছবি উন্মোচিত করে দেখাবার একটা নেশায় পেয়েছে এষাকে। সে আজ এই মুহূর্তে

সন্দীপকে বোধ হয় একটি পরম বিস্ময়ের সত্য বুঝিয়ে দিতে চাইছে যে, পৃথিবীতে যত আলো রং আর স্বাদুতা আছে, সবই এষার মন-প্রাণ ও শরীরের মধ্যে আছে। সন্দীপ একেবারে মুগ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এষার এই নেশার আবেগ থামবে না।

দেখতে পায় এষা, সন্দীপের চোখে চরম ব্যাকুলতার ছবিটি এইবার ফুটে উঠেছে। এষা বলে—বলতে পার, কেন আমি এখন এরকম একটা হালকা সাজ করেছি? ....বলতে পারলে না। তবে শোনো....।

সন্দীপ—বলো।

এষা—তোমার কোলে বসতে হবে, তাই এরকম সাজ। ...অ্যাঁ, এত আস্তে আস্তে কী বলছ তুমি? পাগল হয়ে গেলে নাকি?

সন্দীপ—না, কিছু বলছি না। শুধু ভাবছি একটা কথা। শুধু মনে পড়ছে, ড্রাইডেনেব কবিতার কয়েকটা কথা। হে প্রিয়া, আমাকে তোমার ওই দুই ঠোঁটের উপর চিরকাল পড়ে থাকতে দাও ; তোমার দুই ঠোঁটের স্বাদের কাছে দেবতাদের সুধারসও বিস্বাদ।

সন্দীপের কাছে এসে দাঁড়ায় এষা। তোমার সেকেলে ড্রাইডেন কী আর কতটুকুই বা বুঝেছেন?

নন-স্মিয়ার লিপস্টিক দিয়ে রাঙানো এষা দত্তের দুটি চমৎকার তাহিতি ঠোঁট তখনি সন্দীপের মুখের উপর লুটিয়ে পড়ে বিচিত্র কারুকলার দুরন্ত-মধুর স্বাদ ঝরিয়ে দিতে থাকে। দেখে খুশি হয় এষা সে স্বাদের প্লাবনে সন্দীপের মুগ্ধ হৃৎপিণ্ডটা ভেসে যেতে চাইছে।

সে রাতে সন্দীপের ক্যাডিলাক সকাল পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল। আমির আলি অ্যাভিনিউয়ের শিমুলের মাথার উপরে যখন অনেক রোদ ছড়িয়ে পড়েছে, তখন এষার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ক্যাডিলাকের কাছে এসে দাঁড়ায় সন্দীপ। রাতজাগা অলস ও অচল গাড়িটা আবার সচল হয়ে ছুটতে থাকে।

বারো

রূপের আর গুণের যত রকমের সুন্দরতা আছে তা থেকে তিল তিল করে নিয়ে একসঙ্গে করলে তিলোত্তমা হয়। এরকম একটা কল্পনার কথা শুনতে পাওয়া যায়। এষাকে তবে কী বলতে হয়? তিলোত্তমা?

সন্দীপ রায়ের মনটা অনেকবার প্রশ্ন করে এষার কথা ভেবেছে আর হেসেছে। হাসিটা আদ্যিকেলে গল্পের কল্পনার কথাটাকে ঠাট্টা করেছে বটে, কিন্তু সন্দীপের মনটাকে নয়। সন্দীপের মন কাল্পনিক গ্যাসের বেলুন নয়। যুক্তি না মানলে কিছুই মানে না সন্দীপ! যুক্তি আর প্রমাণ দিয়ে এষাকেও বিচার না করে পারেনি সন্দীপ। এর আগে অনেক আশা করে যাদের খুব কাছে গিয়ে খুব ভাল করে দেখতে পাওয়া গেল, তাদের প্রাণবস্তুর আর জীবনটার ষোল আনার মধ্যে চার আনা আলো, বারো আনা অন্ধকার। যাকে একটু উজ্জ্বল বলে মনে হল, তারও আলো পাঁচ-ছয় আনার বেশি নয়। এষার তুলনায় তারা কিছুই নয়। তুলনা করলে বলতে হয়, বিজলী বাতির আলোর কাছে মেটেপিদিমের আলো। যা চেয়েছিল ও আশা করেছিল সন্দীপ, তার সবই এষার আছে। যা আশা করতে পারেনি সন্দীপ, যে আনন্দ স্বপ্নেও জানা ছিল না, তাও যেন এষার হাতে মালা হয়ে দুলছে। চাইলেই পাওয়া যায়। না চাইলেও পাওয়া যায়। এষার কথা ভাবতে গিয়ে

কল্পনার ভাষাটা যদি একটু বাড়াবাড়ি করে, তবে করুক না। কল্পনা তো কোনও মিথ্যেকে লুকিয়ে রেখে কথা বলছে না।

সন্দীপের জীবনে এষা দত্ত একটি বিস্ময়কর প্রাপ্তি। যেন সুপ্রসন্ন অদৃষ্টের আকস্মিক উপহার। যদি সন্দীপ সেদিন ভুল করে কিংবা কুঁড়েমি করে জয়াজী লিমিটেডের নতুন ফ্যাক্টরির উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত না হত, তবে সন্দীপের জীবনটা আজও বোধ হয় কোনও একটা পুরো পুরনো মিথ্যা কিংবা আধখানা নতুন কোনও মিথ্যার সঙ্গে ছুটোছুটি করে শুধু হয়রান হত। এষাকে পাওয়া যেত না। সে বঞ্চনার চেয়েও একটি আরও অদ্ভুত বঞ্চনা এই হত যে, জীবনে কোনওদিনও জানতে পারত না সন্দীপ, কী তৃপ্তি থেকে জীবনটা বঞ্চিত হল।

আমির আলি অ্যাভিনিউ-এর রাস্তার শিমুল নতুন ফুলে রঙিন হয়ে উঠেছে। সন্দীপের জীবন যে নতুন আহ্বানের সঙ্কেত পেয়ে বিহ্বল হয়ে গিয়েছে, সেটাও কম রঙিন নয়। প্রতি সন্ধ্যায় আমির আলি অ্যাভিনিউ-এর এই বাড়ির দোতলার তিন নম্বর ফ্ল্যাটের একটি ঘরে এষা দত্ত যে অভ্যর্থনার নায়িকা হয়ে সন্দীপের অপেক্ষায় থাকে, সে অভ্যর্থনা বসন্তোৎসবের চেয়ে কম রঙিন নয়। এই উৎসবের আবির গুলাল কুঙ্কুম আর রংঝারি, সবই হল এষা। ভালবাসার অতিথিকে শত তৃপ্তি দিয়ে অভিষিক্ত করতে এষার কোনও কুণ্ঠা নেই।

হেসে হেসে জুহুর সমুদ্রস্নানের গল্প করতে করতে এষা একদিন হঠাৎ বলে ওঠে—সব পরীক্ষাই তো দিলাম, এবার...।

সন্দীপ—অ্যাঁ? কী বললে? থামলে কেন?

এষা—না, যতটুকু বলেছি ততটুকুই বলেছি। এর বেশি কিছু বলব না।

সন্দীপ—তবে কী করে বুঝব যে, তুমি কী বলতে চাইছ?

এষা—কেন? যতটুকু বললাম, তাতে কি কিচ্ছু বোঝা যায় না?

সন্দীপ—সত্যিই বুঝতে পারছি না। কিসের পরীক্ষা কবে কোথায় দিলে?

সন্দীপের মুখের দিকে তাকিয়ে এষার দুই চোখের সুস্থির দৃষ্টির মধ্যে যেন একটা প্রশ্নের বিস্ময় জ্বলজ্বল করছে। কথাটার অর্থ একটুও কেন বুঝতে পারল না সন্দীপ, বোধ হয় এই নীরব প্রশ্নটারই বিস্ময়।

পরমুহূর্তে হাতের রুমাল তুলে মুখ-চাপা দিয়ে হেসে ওঠে এষা।—আমি কিন্তু বুঝেছি, তুমি কেন বুঝতে পারছো না।

সন্দীপ—তাহলে তুমি বলো, কি বুঝেছ।

এষা— তোমার বোধ হয় মনে হয়েছে যে, আমি বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি।

সন্দীপ—না না, কখনও নয়।

এষার দুই চোখের দৃষ্টি আরও জ্বলজ্বল করে। —আমি সেরকম মেয়ে নই সন্দীপ, যারা বিয়ের শর্তে ভালবাসে।

সন্দীপ—আমি জানি, আমি জানি।

এষার দুই উজ্জ্বল চোখ আরও প্রখর হয়ে হাসে। —যাকে আমি ভালবাসলাম, সে যদি আমার সঙ্গে চিরকাল থাকে, তবেই আমার সব পাওয়া হয়ে গেল; বিয়ে হোক বা না হোক।

সন্দীপ—আমিও তাই বিশ্বাস করি, এষা। বিয়েটা ভালবাসার শর্ত হবে কেন? বিয়ে তো

ভালবাসার শেষ নয়, বিয়ের পরেও ভালবাসা থাকে। ভালবাসা তার নিজের জোরেই বেঁচে থাকে, বিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখে না। কাজেই.....

এষা—কাজেই আমরা বেশ আছি, খুব ভাল আছি।

সন্দীপ—আমি একথা বলি না যে, বিয়ের কোনও দরকারই নেই। বিয়ে যদি হয় তো হয়ে গেল। কিন্তু বিয়ে কি ভালবাসার একটা....। বলতে গিয়ে হেসে ফেলে সন্দীপ। —আমি শুধু সেকেলে শাস্ত্রী পণ্ডিতকে নয়, একালের বড় বড় মাথাওয়ালা চিন্তাবিদকেও জিজ্ঞাসা করতে চাই, হ্যাঁ মশাই, বিয়েটা কি প্রেমের সায়েন্টিফিক রেজাল্ট, অথবা একটা অবধারিত অপরিহার্য স্বাভাবিক পরিণাম?

এষা—মনে হচ্ছে তোমার গেলাস খালি হয়ে গিয়েছে?

সন্দীপ—হ্যাঁ।

এষা—তাই বলো।

সন্দীপ—অ্যাঁ? আমার বেশ নেশা হয়েছে বলে সন্দেহ করছ?

এষা—না না, বিশ্বাসের কথাটাকে খুব জোর দিয়ে বললে অনেক সময় ওরকম শোনায়।

হাসতে থাকে সন্দীপ। —না, তা হলে আর জোর দিয়ে কোনও কথা বলব না। বরং তুমি বেশ একটু জোর দিয়ে....। এষাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে সন্দীপ।—সেদিনের মত বেশ শক্ত করে একটু...।

এষা—আমার একটা অনুরোধের কথা শুনবে?

সন্দীপ—নিশ্চয় শুনব, বলো।

এষা—আজ আমাকে মাপ করো। ছেড়ে দাও। শান্ত হয়ে বসো।

সন্দীপ—বেশ তো, ছেড়ে দিচ্ছি; কিন্তু...তুমি যেন আনমনা হয়ে অন্য কোনও কথা ভাবছ।

এষা—ভাবতে বাধ্য হচ্ছি সন্দীপ। কত চেষ্টা করলাম, না আর ভাবব না; তবু ভাবনাটা যেন জোর করে মনের মধ্যে ঢুকে যন্ত্রণা দিচ্ছে।

সন্দীপ—কিসের ভাবনা?

এষা—স্যারের ভাইঝি মৃদুলা কলকাতাতে এসেছে। আমাকে দেখেই আমার একটা হাত শক্ত করে ধরে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে, অব তুমকো নেহিঁ ছোড়েঙ্গে।

সন্দীপ—এর মানে?

এষা—এর মানে, মৃদুলা এখন ওর বাবার সঙ্গে টোকিওতে যাবে আর সেখানেই থাকবে। মৃদুলা বলেছে, এষাদিকেও যেতে হবে, ওর সঙ্গে থাকতে হবে, মাস্ট মাস্ট মাস্ট। তুমি তো জান না সন্দীপ, মৃদুলা ওব বাবার কত আদরের মেয়ে। মৃদুলা যদি ওর বাবাকে ধরে বসে যে, এষাদিকে পাঁচ হাজার টাকা মাইনে দিতে হবে, তবে রাজি হতে এক মুহূর্তও দেরি করবেন না মৃদুলার বাবা।

সন্দীপ—এসব কী অদ্ভুত কথা বলছ এষা। কোথাকার কে এক মৃদুলা...পাঁচ হাজা টাকা মাইনে...টোকিও। এসব শুনতে আমার একটুও ভাল লাগছে না।

এষা—আমারও কি শুনতে ভাল লেগেছে? একটুও না।

সন্দীপ—তুমি আপত্তি করে, শুধু স্পষ্ট করে একটা 'না' বলে দিয়ে ওরকম অদ্ভুত অনুরোধের মুখ বন্ধ করে দিলেই পারতে।

এষা—আমি আপত্তি করেছি। স্পষ্ট করে 'না' বলে দিয়েছি। তবু....।

সন্দীপ—তবু আবার কী?

এষা—টোকিওর জন্যে আমার প্রাণ কাঁদে না, পাঁচ হাজার টাকা মাইনের জন্যেও নয়। কিন্তু মৃদুলা খুব দুঃখ পাবে, শুধু এই কথা ভেবে আমাকে খুবই কষ্ট পেতে হচ্ছে। ভেবেছিলাম, তোমাকে এসব কিছুই বলব না। তবু বলে ফেললাম।

সন্দীপ—আমাকে না বললেই ভাল করতে।

এষা—ঠিকই বলেছ। কিন্তু এসব কথা নিয়ে তোমার তো ভাবনা করবার কিছু নেই।

সন্দীপ—ঠিক, আমার ভাবনা করবার কিছু নেই, শুধু শুনতে ভাল লাগে না, এইমাত্র।

এষা আবার আনমনা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এষার পিঠে হাত বুলিয়ে কথা বলে সন্দীপ। —মৃদুলার কথা ভেবে তোমারও তো এত দুঃখ বোধ করবার কিছু নেই। তুমি মৃদুলার কথা ভুলে যাও। ...আচ্ছা, আমি এখন তবে চলি।

এষার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসবার পর বাড়িতে ফিরে এসেও সন্দীপের মনটা সারাক্ষণ অদ্ভুত এক অস্বস্তির পীড়ন সহ্য করতে থাকে। মৃদুলার আবদেরে অনুরোধ যেন সন্দীপের জীবনের সৌভাগ্যটাকে ছিঁড়েকুটে নষ্ট করে দেবার একটা চক্রান্তের দাবি। রাতের ঘুমটাও বার বার তিনবার ভেঙেছে। বুঝতে পেরেছে সন্দীপ, অস্বস্তিটা স্বপ্নের মধ্যেও ঢুকেছে। মাঝে মাঝে এই অস্বস্তির জ্বালা এত তীব্র হয়েছে যে, এবার ইচ্ছেটাকেও সন্দেহ করে ফেলেছে সন্দীপ। এষা অবিশ্যি বলছে যে, মৃদুলাকে খুব স্পষ্ট করে 'না' বলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সত্যিই কি সেকথা বলেছে এষা? এষার টোকিও চলে যাওয়া যে সন্দীপের ভালবাসার সর্বনাশ, এই সহজ-সরল বাস্তব সত্যটি কি এষার বুঝতে কোনও অসুবিধে আছে, একটুও না। হতে পারে, অসম্ভব নয়, সন্দীপকে আপাতত একটা মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে এষা একটা বানানো কথা বলেছে, মৃদুলাকে 'না' বলে দেওয়া হয়েছে। ওদিকে মৃদুলাকে হয়ত 'হ্যাঁ' বলে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছে এষা। কিন্তু এষার বুদ্ধিটাকে এরকম ভয়ানক একটা দু'মুখো সাপ বলে বিশ্বাস করতে পারে না সন্দীপ। না, না, সন্দেহ নয়। সন্দেহ করবার কিছু নেই। শুধু এষাকে ভুল বোঝবার ভয় থেকে রক্ষা পেতে চায় সন্দীপ। কিন্তু, কি আশ্চর্য, তবু অস্বস্তির ভার একটুও হালকা হয় না কেন? এই অস্বস্তির ভার অনেক হালকা হয়ে যেত, যদি শুধু এটুকু জানতে পারা যেত যে, এষা যা বলেছে সেটা এষার জীবনের কোনও ক্লান্তির ভাষা নয়; সত্যিই মৃদুলা নামে একটা উৎপাত এষাকে টোকিওতে নিয়ে যাবার জন্য টানাটানি শুরু করেছে।

তাই আর দেরি করে না সন্দীপ। পরদিন ব্যাঙ্কে যাবার আগেই সন্দীপের ক্যাডিলাক ছুটে গিয়ে জয়াজীর বাড়ির গেটের কাছে এসে দাঁড়ায়।

জয়াজী তাঁর অফিস ঘরে চাকা লাগানো চেয়ারের উপর বসে আছেন। সন্দীপকে দেখতে পেয়ে বেশ খুশি হয়ে কথা বলেন জয়াজী—এসো, তোমার কথা আমার মাঝে-মাঝে মনে পড়ে। মনে পড়বেই তো, মাধববাবু আমার কারবারের কাজে কত সাহায্যই না করতেন; সেসব কথা তো ভুলে যাইনি। হ্যাঁ, যদি ব্রেনে প্যারালিসিস হত, তবে সবই ভুলে যেতে হত।

জিভে জড়তা থাকলেও খুব উৎফুল্ল হয়ে কথা বললেন জয়াজী।

সন্দীপ—মনে হয়, আপনি এখন বেশ সুস্থ আছেন।

জয়াজী—মোটামুটি।

সন্দীপ—আপনার ভাইঝি মৃদুলা বুঝি টোকিও যাচ্ছে?

জয়াজী—হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি কি মৃদুলাকে চেন?

সন্দীপ—না, আমি এষাকে চিনি। তার কাছ থেকে শুনলাম যে...।

জয়াজী—বুঝেছি, এষাও তোমাকে চেনে।

সন্দীপ—মৃদুলা বোধহয় এষাকে টোকিওতে নিয়ে যেতে চাইছে।

জয়াজী—জানি না; এরকম কোনও চমৎকার খবর আমার কানে আসেনি। ....হ্যাঁ, এষা কি তোমার কোনও আত্মীয়া?

সন্দীপ—না।

জয়াজী—বুঝেছি, বুঝেছি। তোমার বোধহয় জানতে ইচ্ছে হয়েছে, এষাও টোকিওতে যাবে কি যাবে না?

সন্দীপ—হ্যাঁ।

জয়াজী—হ্যাঁ, ঠিকই, এই বয়সে জানতে-টানতে খুব ইচ্ছে হয়।

সন্দীপ—আমি এখন তবে চলি।

জয়াজী—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তবে আবার এসো।

সন্দীপের নিঃশ্বাসের বাতাসে এখন আর কোনও যন্ত্রণা নেই। মিথ্যে অস্বস্তির গুমোট ভেঙে গেল। নিজেরই কাছে নিজেকে বেশ লজ্জিত বোধ করে সন্দীপ। এষাকে ভুল বোঝবার ভয় থেকে রক্ষা পাওয়া গেল। ক্লান্ত হয়নি এষা। এষার প্রাণে, এষার ভালবাসার প্রাণেও সেই ওদের ভীরু প্রাণের হঠাৎ বাতিকের মতো অদ্ভুত কোনও ক্লান্তি দেখা দেয়নি।

কিন্তু কী ভয়ানক আশ্চর্য, অস্বস্তিটা তবু সরে যেতে চাইছে না। জয়াজী যদিও কিছু বলতে পারলেন না, তবু বিশ্বাস করতে হয় যে, মৃদুলা সত্যিই এষাকে টোকিওতে নিয়ে যেতে চাইছে। মৃদুলার অনুরোধটা যদি খুব কাঁদাকাটি শুরু করে দেয়, তবে এষা কি শেষ পর্যন্ত টোকিওতে না যাওয়ার ইচ্ছেটাকে শক্ত করে ধরে রাখতে পারবে? টোকিওতে কবে যাবে মৃদুলা? যাবার দিন কি ঠিক হয়ে গিয়েছে? না যাওয়া পর্যন্ত সন্দীপকে এই অস্বস্তির পীড়ন সহ্য করতে হবে। সব সময় মনটা কিম্ভুত একটা ভয় পুষে রাখবে, এই বুঝি মৃদুলার জন্যে এষার মমতা উথলে উঠল, তারপর ঢেউয়ের মত দুলতে শুরু করল, আর সেই ঢেউয়ের উপর দিয়ে মৃদুলার সঙ্গে তার গভর্নেস এষা দত্তকেও নিয়ে জাহাজটা চলে গেল। সে দুর্ভাগ্য কেমন করে সহ্য করবে সন্দীপ? মনে হয়, মৃদুলা নিশ্চয় আজ আবার টেলিফোনে এষাকে ডেকেছে। আর এষাও সেই ডাক শুনেই ছুটেছে; মৃদুলার কাছে গিয়ে বলেছে—আমি তোমার সঙ্গে না গেলে কি চলবেই না, মৃদুলা?

এটা তো এষার মনের একটা ভয়ানক দুর্বলতার ভাষা? এষা নিজেও বুঝতে পারছে না যে, মৃদুলার অনুরোধের কাছে কত তাড়াতাড়ি নেতিয়ে পড়েছে এষার অনিচ্ছার শক্তিটা।

আজ সন্ধ্যায় আমির আলি অ্যাভিনিউ-এর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছুতেই দেখতে পায় সন্দীপ, সড়কের শিমুল গাছের একটা ডাল ভেঙে ঝুলছে। ভাঙা ডালের সব ফুল শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। যেন পুড়ে গিয়েছ। সত্যিই কি এটা একটা দুর্লক্ষণ।

উপরতলায় ওঠবার সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াতেই বাড়ির দারোয়ান সেলাম করে সন্দীপের হাতে একটা চিঠি ধরিয়ে দেয়। এষা লিখে রেখে গিয়েছে এই চিঠি— এইমাত্র মৃদুলা ফোন করে

ডাকল। তাই যাচ্ছি। তুমি রাগ করো না। কাল সন্ধ্যায় তুমি তো আসছই, আবার দেখা তো হবেই।

ফিরে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসতেই বুঝতে পারে সন্দীপ, এখনই গাড়ি চালিয়ে চলে যাওয়া উচিত নয়। জীবনে কোনওদিন কোনও শেরিতে কিংবা হুইস্কিতে সন্দীপের হাত দুটোকে এত অবশ করে দিতে পারেনি। এষার মমতা-ভীরু মন মৃদুলার অনুরোধের কাছে যে বিকিয়ে যেতে পারে, তারই সঙ্কেত শিমুল গাঝের ভাঙা ডালের সঙ্গে ঝুলছে।

জানে না, বুঝতেও পারে না সন্দীপ, গাড়িতে সিটের উপরে এভাবে স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে কতখানি সময় ফুরিয়ে গেল। সন্দীপকে এভাবে বসে থাকতে দেখে কেউ আশ্চর্য হয়েছে কি হয়নি, তাও বুঝতে কিংবা দেখতে পায়নি সন্দীপ।

না, আর এই অস্বস্তি সহ্য করবার কোনও অর্থ হয় না। এরকম হারাই-হারাই সদা-ভয়-হয় অবস্থা কবিতার মধ্যেই থাকুক, মানুষের জীবনে থাকতে পারে না। আর দেরি না করে চরম নিষ্পত্তি করে ফেলাই উচিত।

দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে সন্দীপ, ট্যাক্সি থেকে এষা নামছে। হেসে হেসে হাত তুলে সন্দীপকে ইশারা করছে—এসো।

আজ সন্ধ্যায় দোতলার তিন নম্বর ফ্ল্যাটের সেই ঘরে শেরির গেলাসে চুমুক দিয়ে সন্দীপ স্পষ্ট ভাষায় চরম নিষ্পত্তির কথাটাই বলে ফেলে—এবার তুমি তৈরি হয়ে থাকো, এষা। আর আমি তোমাকে এখানে পড়ে থাকতে দেব না।

চমকে ওঠে এষা—কী বললে, ঠিক বুঝলাম না।

সন্দীপ—আমার ইচ্ছা, আমাদের বিয়েটা এবার হয়ে যাক, আর দেরি করবার কোনও মানে হয় না।

এষা—বিয়ে?

সন্দীপ—হ্যাঁ, আমি জানি তুমি বলবে যে, বিয়ে হলেই বা কি আর না হলেই বা কি? না, আমি আর একথা শুনতে চাই না, যদিও খুব সঙ্গত কথা।

এষা—বেশ তো, বিয়ে হবে, বিয়ে হোক। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করবার কি কোনও দরকার আছে?

সন্দীপ—আছে।

এষা—কেন?

সন্দীপ—আমার জীবনে তুমি তো একটা বন্ধন নও। বন্ধন হতেও পারবে না, হবেও না। এটা যখন বুঝতে পেরেই গিয়েছি, তখন আর দেরি করব কেন?

এষা—বেশ, তোমার ইচ্ছে হলে আমার তো কোনও অনিচ্ছে হতে পারে না।

সন্দীপ—তবে শোনো, আজ এখনই তুমি আমার সঙ্গে যাবে, আমার কাছেই থাকবে। আমি সাত দিনের মধ্যেই বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলব।

এষা—এবার আমার একটা অনুরোধের কথা শুনবে?

সন্দীপ—বলো।

এষা—আমি তোমার সঙ্গে এখনই তোমার বাড়িতে যাব। তোমার কাছে অনেকক্ষণ থাকব। কিন্তু রাত্রিতে আমাকে এ বাড়িতেই পৌঁছে দিয়ে যেও। সন্দীপ, প্লিজ।

সন্দীপ—বেশ, কিন্তু আমার আরও একটা অনুরোধ আছে। তুমি এই ক'দিন কোনও সকাল দুপুর কিংবা বিকেলে আমাকে সঙ্গে না নিয়ে এ বাড়ির বাইরে কোথাও যাবে না, মৃদুলা ডাকলেও না।

হেসে ফেলে এষা—বেশ তো, এটা আমার পক্ষে একটুও কঠিন কথা নয়।

সন্দীপ—তবে চলো।

ঘর থেকে বের হয়ে এষার হাতটা এক হাতে বেশ শক্ত করে ধরে রেখেই গাড়িতে ওঠে সন্দীপ।

তের

থেকেও নেই, এই অবস্থা যেমন একটা অদ্ভুত নাস্তিত্ব, তেমনই সেই তবুও আছেন, এই অবস্থাও একটা অদ্ভুত অস্তিত্ব। বালিগঞ্জের রায়ভবন, এত বড় একটি তিনতলা বাড়ির সবচেয়ে ছোট ঘরে যিনি থাকেন, চারুশীলা রায়, তিনি এই রকমই একটি অদ্ভুত অস্তিত্ব। প্রতিবেশীদের অনেকে ভুলেই গিয়েছেন যে, চারুশীলা রায় আজও এই বাড়িতে আছেন। ন'মাসে ছ'মাসে ক্বচিৎ কখনও তাঁকে বাইরে বের হতে দেখা যায়, তখন প্রতিবেশীদের সবারই মনে পড়ে, হ্যাঁ, মাধব রায়ের স্ত্রী এখনও এই বাড়িতে আছেন।

বছর দু'য়েক আগে অ্যাটর্নি নরেশবাবুর স্ত্রী, তাঁর ছোটমেয়ে সুমিত্রার বিয়ের নেমন্তন্ন করতে এসে যখন এই ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তখন বেশ চমকে উঠেছিলেন। —একী চারুদি! আপনি এই ছোট্ট ঘরে থাকেন।

চারুশীলা হেসে হেসে বলেছিলেন—হ্যাঁ, আমি এই আকাশ-ঘরে থাকি।

ঠিক কথা, চারুশীলার জীবনটা যেন শূন্যতার আকাশের মধ্যে একটুকরো ঠাঁই নিয়েছে। তেতলার বারান্দা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা ঝুল-চাতালের উপর কাঠের একটি ছোট কেবিন-ঘর, যে ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে মাধব রায় রোজই ভোরের আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্যোদয় দেখতেন। আজ সেই ঘরের মেঝের উপর চারুশীলার ছোট একটি বিছানা আর ছোট একটি ডেস্কের উপর মাধব রায়ের খুব ছোট একটি মার্বেল মূর্তি। সন্ধ্যা হলে যখন তাঁর এই আকাশ ঘরে আলো জ্বালেন চারুশীলা, তখন পালিশ করা বিকানির মার্বেলের মাধব রায়ের চোখ দুটো চিকচিক করে। চারুশীলা বলে ফেলেন—তুমি হাসছ, না কাঁদছ, বুঝতে পারছি না।

দমদমের হেমলতাকে তাঁর চারুদি যে কথা বলেছিলেন, সেটা চারুদির জীবনের একটা করুণ সত্য : আমি আর গান গাইতে পারি না হেম! মাধব রয়ের মৃত্যুর পর একদিনও গান গাইতে পারেননি চারুশীলা। তিনি আছেন বটে, তাঁর গলার গান মরে গিয়েছে। মাঝে কয়েকটা দিন তাঁর মনটা অশান্ত হয়ে খুব ছটফট করেছিল। নিঃশ্বাসটা যেন বার বার আর্তনাদ করেছে—স্বপ্ন ব্যর্থ হল, স্বপ্ন ব্যর্থ হল। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে পেয়েছেন, পাশের বাড়ির জানালার কাছে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে পাখিকে দেখবার চেষ্টা করছে। একটা ঘুঘু পাখি, ফরফর করে উড়ে উড়ে গাছের এই ডাল ছেড়ে ওই ডালে বসছে। বুঝতে অসুবিধা নেই, মেয়েটি একটি নতুন বউ। চারুশীলার মনটা বলে উঠেছে, স্বপ্ন ব্যর্থ হল। আর একটি বাড়ির জানালার গরাদ ধরে নাচানাচি করছে একটা এক-বছর বয়সের বাচ্চা। চারুশীলার নিঃশ্বাসটা ডুকরে উঠেছে। স্বপ্ন ব্যর্থ হল।

না, আর জানালার কাছে এসে কখনও দাঁড়িয়ে থাকেন না চারুশীলা। আর মনটাও কয়েকদিনের মধ্যে নিজেই শান্ত হয়ে গিয়েছে। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখবার কিছু নেই। শূন্য, সবই শূন্য।

অনেকদিন পর আবার চমকে উঠেছেন চারুশীলা। ঘুমটা ধড়ফড়িয়ে ভেঙে গিয়েছে। জেগে উঠেই বিকানীর মার্বেলের মাধব রায়ের দিকে তাকিয়েছেন আর কথাও বলে ফেলেছেন—কেন তাকালে?

স্মৃতির ভাষা আর স্বপ্নেতে শোনা একটা ডাক। ডেকেছেন মাধব রায়। কোনওদিন কোনও স্বপ্নেতে সে মানুষটা এমন করে তাঁকে কখনও ডাকেনি। খুব আস্তে কথা বলা যাঁর অভ্যাস, সেই মাধব রায় কত জোরে চেঁচিয়ে ডাক দিয়েছেন—চলো চারু, একটু তাড়াতাড়ি করো, নইলে ফিরতে বেশ রাত হয়ে যাবে। চলো, এখান থেকে বের হয়ে সোজা হাঁটা দিয়ে, বুদ্ধ মন্দিরটা একবার দেখে নিয়ে, লেক হয়ে, তারপর রাসবিহারীতে এসে, সম্ভব হলে মহানির্বাণের ভিতরে একটু উঁকি দিয়ে, তারপর গড়িয়াহাট মার্কেট থেকে কিছু সাদা পদ্ম, না পাই কিছু শালুকই না হয় কিনে নিয়ে এলাম।

আজ বিকেলে বিছানায় শুয়ে বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন চারুশীলা। কখন সন্ধ্যা হয়েছে, কখন বিশুর মা এসে ঘরের আলো জ্বেলে দিয়ে গিয়েছে, কিছুই বুঝতে পারেননি। স্বপ্নেতে মাধব রায় এসে ডাক দিয়েছেন বলেই ঘুমটা ভেঙে গেল।

উঠে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন চারুশীলা। বারান্দার জাফরির জালের ভিতর দিয়ে টুকরো টুকরো জ্যোৎস্না এসে মেঝের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। সেদিন তাঁর হাত থেকে ফসকে গিয়ে অনেকগুলো সাদা শালুক মেঝের উপর পড়ে গিয়েছিল। দেখে মনে হয়েছিল, শালুকগুলি যেন টুকরো টুকরো জ্যোৎস্না।

আজ অনেকদিন পরে শুকনো চোখ দুটো আবার এমন করে ভিজে গেল কেন? একলা প্রাণটা তাই একটু রাগ করেই জিজ্ঞেস করতে চায়, আর কেন ডাকো?

সে বসন্ত সে বরষা, সে আনন্দ সে ভরসা,
আঁধারে মিলায়ে গেছে, আর পবে নাকো।

আজকের সন্ধ্যার বাতাসের ভাবটাও বেশ উতলা। তাই বারান্দার ওদিকের একটি টবের বুকের ছোট্ট তুলসী গাছটা মাথা দুলিয়ে কাঁপছে। আস্তে আস্তে হেঁটে তুলসীটার কাছে এসে দাঁড়াতেই চারুশীলার শূন্য প্রাণের অভিমান আরও উতলা হয়ে ওঠে। তাই আবার নীরব হয়ে থাকতে না পেরে বলেই ফেলেন; কবিতার কথাগুলি তাঁর গলার স্বরে বেশ উতলা হয়ে বেজে ওঠে :

আর কেন ডাকো?
এখন কিসের দাবি? হারায়ে গিয়েছে চাবি
ভেঙে গেছে বীণা বাঁশি, আর হবে নাকো!

না, মনটাকে আর এভাবে কাঁদিয়ে কোনও লাভ নেই। মাঝে-মাঝে এরকম এক-একটা ডাক শুনতে পেলেই তো হল। হোক না স্বপ্ন; সে মানুষটার সঙ্গে এই বাড়ির এই সিঁড়ি ধরে নেমে গিয়ে, সোজা হাঁটা দিয়ে, বুদ্ধ মন্দিরটা একবার দেখে নিয়ে, লেক হয়ে আবার রাসবিহারীতে ফিরে আসা যাবে। গড়িয়াহাট মার্কেটের সাদা শালুকও কিনতে পারা যাবে। না. সবই হারিয়ে যায়নি। তার পায়ের শব্দ তো এ বাড়িরই বাতাসের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে চমকে উঠলেন চারুশীলা। মনে হয় দোতলার বড় ঘরের ভিতর থেকে

শব্দটা ছিটকে বের হয়ে সন্ধ্যাবেলার বাতাসটাকে যেন ক্ষেপা কুকুরের মত কামড়ে দিয়ে আবার চুপ হয়ে গিয়েছে। কিসের শব্দ? এরকম ভয়ানক একটা বিশ্রী শব্দ দোতলার বড়ঘরের ভিতরেই বা বেজে উঠবে কেন? বড়ঘর যে একটি জাগ্রত স্মৃতিঘর। মাধব রায় তাঁর শখ আর মায়া দিয়ে যে রকম করে সাজিয়েছিলেন, আজও ঠিক সেরকমেরই সেজে রয়েছে এই বড়ঘর। সেই সব সোফা, সেই মেহগনির টেবিল। চার দেয়ালের গায়ে সেই চারটি বড় বড় রঙিন ছবি—গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ার, নীলাচলের সমুদ্র, কৈলাস ও মানস আর শিলং-এর পাইনবন ও ঝর্না।

একগাদা কাচের বাসন একসঙ্গে মেঝের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে গেলে যেরকমের শব্দ হয়, এই শব্দও তেমনই একটা বিকট ঝনঝনানি। কই, বিশুর মা এখনই গিয়ে জেনে আসুক, এ কিসের শব্দ।

শুধু পাঁচটা মিনিট স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে আর অপেক্ষা করতে হয়। বিশুর মা আসতেই জিজ্ঞাসা করেন চারুশীলা—কোথায় ছিলে?

বিশুর মা—এখানেই ছিলুম, মা।

—বিশ্রী একটা শব্দ হল, শুনেছ?

—শুনেছি।

—জেনেছ, কিসের শব্দ?

—জেনেছি। বাবুর্চিকে শুধোলুম কিসের শব্দ হলো গা? বাবুর্চি বলে, টেবিল থেকে কাচের গেলাস বোতল জগটগ সব হঠাৎ পড়ে গিয়েছে, তাই শব্দ হয়েছে।

—ঘরের ভিতর কারা ঢুকেছে? বলতে পার?

—হ্যাঁ মা, পারি। বাবুর্চি যা বললে, তাই বলতে পারি।

—বলো।

—আমাদের সাহেব আর একজন লেডি সাহেব।

—তুমি এখনই একবার বাইরে যাও, বিশুর মা। একটা ট্যাক্সি ডেকে আন।

—কেন মা?

—আমি এখনি হাওড়া স্টেশনে যাব।

—কেন মা? কোথায় যাবেন আপনি?

—যেখানেই যাই, আর এখানে ফিরে আসব না।

—এ কী বলছেন মা, শুনে যে আমার ভয় করছে, মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

হেসে ফেলেন চারুশীলা। —কোনও ভয় নেই। তুমি যাও, ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এসো, একটুও দেরি করো না।

পাঁচটা মিনিটও সময় লাগে না। আকাশ ঘরের ডেস্কের উপর থেকে মাধব রায়ের ছোট্ট মার্বেল মূর্তিটাকে কাগজে জড়িয়ে হাতে তুলে নিয়ে সিঁড়ি ধরে নেমে গেলেন চারুশীলা। গেটের কাছে গিয়ে থামলেন ও দাঁড়িয়ে রইলেন।

ট্যাক্সি আসে। পিছনের কোনও আলো আর কোনও ছায়ার দিকে একটিবারও মুখ ফিরিয়ে তাকালেন না চারুশীলা। চলে গেলেন।

স্টার্ট দিতে গিয়ে ট্যাক্সির ইঞ্জিন খুব জোরে শব্দ করে উঠতেই খুব বিরক্ত হয়ে ওঠে সন্দীপ

রায়ের সান্ধ্য আনন্দের শান্তিটা। এসময়ে কে এল? কোন নির্বোধ?

নতুন গেলাস হাতে নিয়ে জানালার কাছে এসে দেখতে পায় সন্দীপ, না কেউ আসেনি। কেউ গেল বোধহয়।

—কে চলে গেল ফটিক? ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করে সন্দীপ।

বাবুর্চি জবাব দেয়। —মা চলে গেলেন।

—কোথায় গেল?

—ঝি বলছে, তিনি হাওড়া স্টেশনে চলে গেলেন।

জানালার কাছ থেকে সরে এসে আবার সোফার উপর এষার পাশে বসে পড়ে সন্দীপ। —মাতৃদেবী বেশ একটা ড্রামাটিক কাণ্ড করলেন।

এষা—কী ব্যাপার?

সন্দীপ—তিনি হাওড়া স্টেশনে চলে গেলেন। খুব সম্ভব তিনি কোন্নগরে তাঁর উকিল ভাইয়ের বাড়িতে চলে গেলেন। তার মানে এই বাড়ি ছেড়ে দিলেন।

এষা—কেন?

সন্দীপ—বেশ বুদ্ধি রাখেন, তাই এই কাণ্ডটা করলেন। যেন আমি আর কোনওদিনও তাঁকে একটা কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেবার কোনও সুযোগ না পাই।

এষা—কিসের কর্তব্যের কথা?

সন্দীপ—ক' দিন আগে আমি তাঁকে সবিনয়ে অনুরোধ করেছিলাম : আর দেরি না করে তুমি এবার বাড়িটাকে আমার নামে গিফ্‌ট করে দাও। তিনি শুধু একটি কথা বললেন : না। অথচ...।

এষা —কী?

সন্দীপ—অথচ সকলের কাছে এমন একটা ভাব দেখান যে, বাড়িটার জন্যে তাঁর মনে কোনও মায়া নেই। শুধু মাধব রায়ের স্মৃতিটুকুর জন্য যা কিছু মায়া। তাই ইচ্ছে করে তিনতলাতে ছোট একটা কাঠের ঘরে থাকেন। কেউ জিজ্ঞাসা করলেই উদাস হাসি হেসে অদ্ভুত একটা কথা বলেন : এই আকাশ-ঘরে থাকতে আমার ভাল লাগে। আমি দেখে সত্যিই বেশ আশ্চর্য হয়েছি, বৈরাগ্যের বুলি কী ভয়ানক চালাক হতে পারে।

এষা—তুমিই বা এমন অনুরোধ করতে গেলে কেন? কী দরকার ছিল? তিনি গত হলে এ বাড়ির স্বত্ব তো তোমারই হয়ে যাবে।

সন্দীপ—হবে; যদি তিনি সুস্থচিত্তে গত হয়ে যান তবে। এ ধরনের সেকেলে মানুষের মতিগতির কোনও স্থিরতা নেই। পুণ্যি বাতিকের ঝোঁকে হয়ত হঠাৎ একদিন কোথাকার কোনও এক গরু-হাসপাতালের নামে বাড়িটাকে গিফ্‌ট করে ফেলবেন। কিন্তু দেখলে তো এষা। সেকেলে মানুষের মেজাজটা বোভাইন হলে বুদ্ধিটা কত চাণক্যাইট।

আবার উঠে গিয়ে আর ঘরের দরজা খুলে দিয়ে ডাকতে থাকে সন্দীপ—ফটিক! ফটিক! একটা ঝাঁটা আর ঝুড়ি নিয়ে শিগ্‌গির এখানে একবার এসো। মেঝের উপর ছড়ানো এইসব ভাঙা কাচের সব টুকরো এখনি সরিয়ে নিয়ে যাও।

সন্দীপের সান্ধ্য জীবনের সাধ ইচ্ছা আর তেষ্টা এখন আর যাযাবরের মত ছুটোছুটি করে না। এমন কি, আমির আলি অ্যাভিনিউ-এর কোনও বাড়ির দোতলার তিন নম্বর ফ্ল্যাটের কাছে গিয়ে

দরজার কলিংবেলের বোতাম টিপতে হয় না। এষা দত্তের ঘরের উৎসব ঠাঁই-বদল করে সন্দীপেরই বাড়ির এই বড়ঘরের ভিতরে চলে এসেছে। সন্দীপকে বের হতে হয় না। রোজ সন্ধ্যায় যথাসময়ে যেমন আদেশ করেছেন সাহেব, ড্রাইভার বাবুলাল তেমনই সন্দীপের চকচকে ক্যাডিলাককে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়ে লেডি সাহেব এষা দত্তের বাড়ির কাছে হাজির করে আর লেডি সাহেবকে তুলে নিয়ে চলে আসে।

তারপর যখন রাত নিবিড় হয়, তখন শুনতে পাওয়া যায়, টালিগঞ্জের পুলিস ব্যারাকের বিউগলের ঘুমকাতুরে স্বর বাতাসে এলিয়ে পড়ে ফুরিয়ে গেল, তখন এষা দত্ত তার এলিয়ে পড়া মাথাটাকে সন্দীপের বুকের কাছ থেকে সরিয়ে নেয়, আর উঠে দাঁড়ায়—এবার যেতে হয়।

ড্রাইভার বাবুলার বারবার কাশতে থাকে, এষা দত্ত আবা ক্যাডিলাকের ভিতরে উঠে বসে। লেডিসাহেবকে আমির আলি অ্যাভিনিউ-এর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরে আসে ক্যাডিলাক। কাশি থামিয়ে বাড়ি চলে যায় বাবুলাল।

এই নিয়মটা সন্দীপের ইচ্ছার সৃষ্টি হলেও এষাও খুশি হয়ে বলেছে—এই ভাল। তোমার ওরকম ছুটোছুটির কষ্ট আমার চোখে আর একটুও সহ্য হচ্ছে না। আমার কাছে তোমার আর ছুটে আসতে হবে না, আমিই তোমার কাছে যাব। তোমার গাড়িটা ভাল বটে, তোমার হাতে গাড়িটা চলেও ভাল, তবু বিশ্বেস নেই। তোমার আনমনা হাতটা সামান্য একটু কেঁপে উঠলে গাড়িটা যে কী ভয়ানক কাণ্ড করে ফেলবে, ভাবতে আমার বুক কাঁপে। না সন্দীপ, এই ভাল, আমিই আসব।

আজ নিয়ে পর পর চারটি সন্ধ্যা ও রাত ভবনের এই বড়ঘরের ভিতরে অনেকক্ষণ থেকেও সন্দীপের মনের সব অস্বস্তি শান্ত করে দিতে পারেনি এষা। কারণ মৃদুলা এখনও টোকিও চলে যায়নি। এই চারদিনের মধ্যে অন্তত সাতবার এষাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে সন্দীপ : আর তো মাত্র ক'টা দিন বাকি। আমি এরই যে কোন একটি দিনে বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলব। কিন্তু তুমি কি তোমার বাবাকে কথাটা একবার বলে নেবে না?

এষা—বলব।

সন্দীপ—না, আর বলব বলব করো না। বলে দাও।

অন্যদিনের মত আজও রাতটা যথাসময়ে নিবিড় হয়ে উঠেছে। রাস্তার নীরবতার মধ্যে শুধু বুড়ো রাত-ভিখারীটা গলার স্বর কঁকিয়ে কঁকিয়ে ঘুরছে। সন্দীপ বলে—কাচের গেলাস পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে যাওয়ার শব্দের মধ্যে একটা মিউজিক আছে। নয় কি? তোমার কী মনে হয়?

এষা—তোমার যা মনে হয়, তাই। আমার তো ভিন্ন করে একটা মন নেই।

সন্দীপ—যে যা বলুক, আমি বলব শাঁখের শব্দের মধ্যে ওরকম মিউজিক নেই। একটুও না।

এষা—লোকে কিন্তু মনে করে যে, শাঁখের শব্দ খুব পয়া, খুব শুভ।

হেসে ফেলে সন্দীপ—আমি মনে করি কাচের গেলাস ভাঙবার শব্দ আরও পয়া, আরও শুভ। একটা সুলক্ষণ।

যেন একটা চকিত বিদ্যুতের আভা এষা দত্তের মুখের উপর ছড়িয়ে পড়েছে! সন্দীপের একটা হাত শক্ত করে ধরে আর বুকের কাছে টেনে নিয়ে কথা বলে এষা—হ্যাঁ শুভ, নিশ্চয় শুভ। তোমার কথাতে একটুও ভুল নেই, সন্দীপ। এতক্ষণ তোমাকে কথাটা বলিনি, বলতে পারিনি, তাই এখন বলছি। কাল সকাল ন'টার সময় শুভ কাজটার সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গিয়েছে। বাবাকেও

বলা হয়ে গিয়েছে। বাবার অনুমতিও পাওয়া হয়ে গিয়েছে।

সব অস্বস্তির অবসান। সন্দীপের চোখের মুগ্ধ দৃষ্টিটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।—এষা, তুমি সত্যিই একটি বিস্ময়। কী আশ্চর্য, কাল সকাল ন'টায়?

এষা—হ্যাঁ, সন্দীপ। রেজিস্ট্রার বিনয়বাবুকে জানিয়ে রাখা হয়েছে। তোমার পক্ষে আর আমার পক্ষে যাঁরা উপস্থিত থাকবেন তাঁদেরও বলে রাখা হয়েছে। আমি শুধু বলবন্তভাইকে ফোন করে একটু বলে দিয়েছিলাম। শোনা মাত্র বলবন্তভাই সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

হেসে ফেলে সন্দীপ।—আমার কিন্তু একটা বিশ্রী অসুবিধে আছে। আমার ঘুম ভাঙতে বেশ দেরি হয়।

এষাও হাসে—আন্দাজ ক'টার সময় তোমার ঘুম ভাঙে।

সন্দীপ—আটটার আগে নয়।

এষা—আমি সকাল ছ'টায় তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দেব।

সন্দীপ—সে কী? সেটা আবার কী করে সম্ভব হবে?

সন্দীপের কাঁধের উপর একটা হাত তুলে দেয় এষা—আমি তো আজ এখানে তোমার কাছেই থাকব।

সন্দীপ—বাড়ি যাবে না?

এষা—না।

সন্দীপ—এঃ, আমার প্ল্যানটা মাঠে মারা গেল।

এষা—তোমার প্ল্যান? সেটা আবার কী?

সন্দীপ—তোমাকে চমকে দেবার প্ল্যান। আমি মতলব এঁটেছিলাম, আজ তোমাকে কিছুতেই বাড়ি ছেড়ে যেতে দেব না। আজও না, কালও না, কোনওদিনও না। কিন্তু তুমিও কি ভেবে রেখেছিলে যে তুমি আজ রাতে বাড়ি যাবে না?

এষা—না। তোমার কথা শুনে মনটা এত নিশ্চিন্ত আর এত খুশি হয়ে গেল যে, এক মুহূর্তের মধ্যে একটা সাধের স্বপ্ন দেখে ফেললাম। সকাল সোয়া ছটায় আমি তোমাকে জাগিয়ে দেব, নিজের হাতে মনের মত করে সাজাব। তারপর এখান থেকে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে সে বাড়িতে একবার যাব। দশ মিনিটের মধ্যে আমি সেজে নিয়ে সাড়ে আটটার মধ্যে রেজিস্ট্রার বিনয়বাবুর অফিসে পৌঁছে যাব। তারপর সন্দীপ....তারপর আমি তোমার স্ত্রী। এবার তুমি বলো, আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলো, যেন আমার প্রাণটা শুনতে পায়।

এষার মাথাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে সন্দীপ, এষা দত্তের ভালবাসার বিপুল মমতায় বিহ্বল ও বিস্মিত সন্দীপ, প্রীত ও কৃতার্থ সন্দীপ। —তারপর , আমি তোমার স্বামী।

চোদ্দ

বালিগঞ্জের রায়ভবনের ঘরের ভিতরে সেই সন্ধ্যায় কাচের গেলাস চূর্ণ হওয়ার যে শব্দটাকে শাঁখের শব্দের চেয়েও শুভাবহ সুলক্ষণ বলে মনে করেছিল সন্দীপ, সেই শব্দটা এখন এই বড়ঘরের ভিতরে প্রতি সপ্তাহের অন্তত একটি সন্ধ্যার নিয়মিত শুভ উৎসব হয়ে উঠেছে। কোনওদিন একটু

কম, কোনওদিন একটু বেশি, বিহ্বল ও বিবশ অনেক হাতের ঠেলা লেগে কাচের গেলাস জাগ আর জার টেবিল থেকে পড়ে যাচ্ছে আর ভাঙছে।

সন্দীপ রায়ের এই বিবাহিত জীবনের সান্ধ্য আসরে যাঁরা নিয়মিত উপস্থিত হয়ে থাকেন, তাঁরা হলেন সেই ক'জন ভদ্রলোক, যাঁরা বিয়ের রেজিস্ট্রেশনের দিন অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন। মিল এজেন্ট সুরজিৎ সামন্ত, মেজর পৃথ্বীরাজ, কুমার সুরঞ্জন, শেয়ার ডিলার অনিমেষ ঘোষ আর জয়াজী স্যারের সেক্রেটারি সেই বলবন্তভাই। সন্দীপেরই মত এক-একটি সুখী চেহারা; বয়সে কেউ ত্রিশ, কেউ বা পঁয়ত্রিশ। বিনায়ক হালদারও আসেন, কিন্তু সামান্য কিছুক্ষণ থেকেই চলে যান। কিন্তু যার উপস্থিতি একেবারেই পছন্দ করে না সন্দীপ, সেই লোকটি কালো রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে আর উৎফুল্ল হয়ে সন্দীপের এই ঘরোয়া সান্ধ্য আসরে উপস্থিত হতে কখনও ভুলে যায় না। সন্দীপ শেষে বলতে বাধ্য হয়েছে।—তুমি এত রেগুলার না হলেও তো পারো, মন্দার।

মন্দার—কেন সন্দীপ, আমি কোনও অপরাধ করলাম? আমি না হয় এটিকেট জানি না, ইংরেজি বলতে-কইতে পারি না, কিন্তু কাউকে তো বিরক্ত করি না।

মন্দারের কথার কোনও প্রতিবাদ করতে পারে না সন্দীপ। দেখেছে সন্দীপ, মন্দারকে দেখতে পেয়ে সবাই যেন আরও খুশি হয়। মন্দার ঘরে ঢুকলেই হাসিখুশির একটা সাড়া পড়ে যায়। সবাই ডাকে—মন্দার এখানে বসো। মন্দার, প্লিজ টেক ইওর সিট হিয়ার। মন্দরাবাবু আইয়ে, হামারে নজদিগ বৈঠিয়ে।

মন্দারকে দেখে আর মন্দারের চালচলন আর কথাবার্তার রকম-সকম দেখে এষা যেন একটু গম্ভীর হয়ে যায়। কিন্তু বিরক্ত হয়েছে বলে মনে হয় না। একদিন আসরে গল্প আলাপের উচ্ছল হর্ষের মধ্যে মন্দারের কণ্ঠস্বর হঠাৎ উদাত্ত হয়ে বেজে উঠল। —মিসেস রায়ের বোধহয় একটু বরফ চাই।

চমকে ওঠে এষা।—হ্যাঁ, চাই বইকি। কিন্তু আপনি উঠছেন কেন? আপনি বসুন, মন্দারবাবু।

কিন্তু এষার আপত্তি মাঠে মারা গেল। মন্দার উঠে এসে টেবিলের জাগের ভিতর থেকে বরফের একটা বড় চাকলা তুলে নেয়। কালো রুমাল দিয়ে বরফের চাকলাটিকেও জড়িয়ে ধরে মেঝের উপর ধোবিয়া আছাড়ের ভঙ্গিতে ঠুকে-ঠুকে গুঁড়ো করে ফেলে। একটা ছোট জারের মধ্যে সেই বরফ গুঁড়ো ঢেলে দিয়ে এষার হাতের কাছে এগিয়ে দেয়। মন্দারের ব্যস্ততার রকম-সকম দেখে এষা হেসে হেসে যেন লুটিয়ে পড়তে চায়।

হেসে ফেলে সন্দীপও—মন্দার একটু বেশি ক্লাউনিশ।

এষা বলে—বেশ মজার মানুষ।

প্রতি সপ্তাহের এই ধরনের এক-একটি উৎসব নিতান্ত অকারণ উল্লাসের ব্যাপার নয়। কারণ থাকে। এক-একটা শুভ ঘটনার স্মৃতিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য এক-এক সন্ধ্যার উৎসব আহ্বান করা হয়। আহ্বান করবার নায়িকা স্বয়ং এষা রায়। কোন সপ্তাহের কোন দিনে কী কারণে আনন্দ করা হবে, এষাই বলে দেয়। প্রথম দিনের সান্ধ্য সমাবেশের উপলক্ষ ছিল, সন্দীপ রায় ও এষা রায়ের বিবাহিত জীবনের শুভারম্ভ। শুভ ঘটনার মাসগুলিকে তো একসঙ্গে হাতের কাছে পাওয়া সম্ভব নয়। ওই তারিখগুলিকে নয়, বারগুলি স্মরণ করতে হয়। স্মরণ করেছে এষা, চক্রবর্তীর

এগজিবিশনে যেন প্রথম সন্দীপকে দেখতে পেয়েছিল এষা, সেদিন ছিল সোমবার, জয়াজী লিমিটেডের ফ্যাক্টরি উদ্বোধনের দিনে প্যানামোদের আসরে সন্দীপের সঙ্গে প্রথম কথা বলেছিল এষা, সেদিন ছিল বুধবার। এষার জন্মদিন শুক্রবার। সন্দীপের জন্মদিন রবিবার। এইরকম ও এইভাবে এক একটি শুভবার কোনও একটি সপ্তাহে উদ্‌যাপিত হয়। সেই শুভবারে ব্যাঙ্ক থেকে সন্দীপকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হয়। এষার কাছ থেকে শুনে নিতে আর জেনে নিতে হয়, আর বাবুর্চি ও বেয়ারাকে বলে দিতে হয়, আজ কী কী বস্তু কতটা করে কিনে নিয়ে আসতে ও রেডি করে রাখতে হবে।

এষা যেদিন বলে ফটিককে পাঠালে হবে না, তুমি নিজেই যাও, সেদিন সন্দীপকেই মার্কেটে গিয়ে এষার পছন্দের শেরি ও জিন কিনে আনতে হয়।

ব্যাঙ্কের সবাই জেনেছে, সাহেব বিয়ে করেছেন। তাই একদিন সকালবেলা একটা দরখাস্ত হাতে নিয়ে ব্যাঙ্কের ক্লার্ক তমোনাশ এসে এই বাড়ির বারান্দার উপর দাঁড়িয়েছে। দরখাস্তের বক্তব্য—ব্যাঙ্কের কর্মী আমরা সবাই আপনার শুভজীবন কামনা করে একটু আনন্দ করতে চাই। আশা করি, আপনি এজন্য কিছু টাকা মঞ্জুর করবেন।

বাড়ির বেয়ারা সেই দরখাস্ত হাতে নিয়ে সন্দীপের কাছে পৌঁছে দিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। দরখাস্ত পড়ে হেসে ফেলে সন্দীপ।

এষা—কী ব্যাপার?

সন্দীপ—আমার ব্যাঙ্কের লোকেরা আমার বিয়ে হয়েছে শুনে আনন্দ করবার জন্য কিছু খেতে চাইছে। সেইজন্য ওদের কিছু টাকা চাই।

এষা—দিয়ে দাও।

দরখাস্তের উপর মঞ্জুরী টাকার অঙ্কটা লিখে গিয়ে আর সই করে বেয়ারাকে ডাক দেয় সন্দীপ—নিয়ে যাও।

এষা—কত টাকা দিলে?

সন্দীপ—একশো টাকা।

এষা হাসে—বাঃ।

সন্দীপ—তুমি কী বলো? আর একটু কম করে দেব?

এষা আবার হাসে।—তোমার ইচ্ছে।

দরখাস্তটা বেয়ারার হাতে না দিয়ে আবার কলম চালিয়ে একশো টাকার অঙ্কটাকে কেটে নতুন একটা ক্ষীণতর অঙ্ক বসিয়ে দেয় সন্দীপ।—নিয়ে যাও।

দরখাস্ত হাতে নিয়ে বেয়ারা চলে যেতেই প্রশ্ন করে এষা,—কত দিলে?

সন্দীপ—একান্ন।

সন্দীপের মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে এষা এইবার বেশ অদ্ভুত স্বরে হেসে ফেলে।—বাঃ।

সন্দীপও হাসে।—এ মাসে কত টাকার কাচের গেলাস আর জাগ ভেঙেছে বলতে পার?

এষা—না।

সন্দীপ—ফটিক বললে, দেড়শো টাকার।

এষা—বেশ তো, মন্দ কী? শখের জন্যে মানুষ কত দেড়শো টাকা গুঁড়ো করে দেয় তা কি জান না?

সন্দীপ—আমি যে তা জানি, সেটা তুমিও জান।

এষা—আমি তো শুধু জানি যে, তুমি আমার জন্যে এ পর্যন্ত মাত্র আড়াই হাজার টাকা খরচ করেছ। একটা লিকলিকে চেন-নেকলেস, তার লকেটে এইটুকু এক টুকরো হীরে, ব্যস।

সন্দীপ—এটা আবার কী রকমের কথা বললে এষা? এই যে প্রত্যেকে সপ্তাহে একটা-না-একটা আনন্দের জন্যে এত টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে, সেটা কি....।

এষা—সেটা তো আমার জন্যে তুমি খরচ করছ না।

সন্দীপ—কী বললে?

এষা—তোমার জীবনের, তোমার ঘরের সুখের জন্যে তুমি টাকা খরচ করছ, আমার জন্যে নয়।

সন্দীপ—তোমার কথাগুলি আরও হেঁয়ালি হয়ে গেল।

এষা—একটু হেঁয়ালি হয়ে যায়নি। তুমি বাইরে ছুটোছুটি করে হয়রান হয়ে যাচ্ছিলে, আমি তোমাকে সেই মিথ্যে হয়রানি থেকে রক্ষা করে তোমার জীবনকে একটি সুখের ঘর পাইয়ে দিয়েছি। তুমি যেরকম সুখের ঘর চেয়েছিলে, ঠিক সেই রকম সুখের ঘর।

সন্দীপ—যা-ই হোক, আমার মনে হয় যে, আমার সুখের এই সব খরচ একটু কমিয়ে ফেললে ভাল হয়, তাতে আমার সুখের কিছু কমতি হবে না।

এষা—খরচ যখন কমবার হবে, তখন নিজেই কমে যাবে। কিন্তু সেজন্য তুমি কোনও চেষ্টা করো না, সন্দীপ। তাতে ফল ভাল হবে না।

চমকে ওঠে সন্দীপ। এ কি সত্যিই এষা কথা বলছে?, না দ্বিতীয় কোনও ডেলফির ওরেক্‌ল্ কথা বলছে? বুঝতে পারা যায় না, এষার ভাষাটা হেঁয়ালি, না কথা বলবার এই নতুন ভঙ্গিটা হেঁয়ালি? এষার গলার স্বরও যে বদলে গিয়েছে মনে হচ্ছে।

সবকিছুই কত তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে। সন্দীপের সাধ-অসাধ ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার দিকে একটু ভ্রূক্ষেপও না করে সব বদলে যাচ্ছে। স্কচ-হুইস্কির স্বাদটাও অন্যরকমের হয়ে গিয়েছে, সেই ঝাঁজ আর পাওয়া যায় না। দু'চুমুক খেলেই ঢেকুর তুলতে হয়। যেন ঝাল-মেশানো ডাবের জলের ঢেকুর। কবে আর নিজের হাতে শেরি-টুইস্ট তৈরি করে খাওয়াবে এষা? অনেকদিন তো পার হয়ে গেল। কত সহজে আর কত শিগগির এষা তার এই সেদিনের সেই ব্যাকুল শপথের কথাটা ভুলে গিয়েছে।

বাইরে বেড়াতে যাবার সেই ব্যস্ততা ও তাড়া আজ আর নেই। ক্বচিৎ কখনও এষা যদি হেসে হেসে হঠাৎ বলে ফেলে যে, আজ একটা খুব বাজে ছবি দেখতে ইচ্ছে করছে সন্দীপ, তবে এষার সঙ্গী হয়ে বাইরে বের হবার জন্য অবশ্য একটু ব্যস্ত হয়ে উঠতে হয়। পুরনো আনন্দের স্বাদটা বুকের ভিতরে আবার একটু ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করে।

একদিন হঠাৎ এইরকমই ভঙ্গিতে হেসে হেসে গলার চেন-নেকলেসের হীরের লকেটকে দুই আঙুলের টিপের মধ্যে আর বেশ জোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কথা বলতে থাকে এষা।—আজ ইচ্ছে করছে, খুব বাজে একটা....।

সন্দীপ—কিন্তু ও কী করছ? লকেটটা যে ছিঁড়ে পড়ে যাবে।

এষা—যাবে তো যাবে। তোমার আড়াই হাজার টাকার ক্ষতি হবে, তার বেশি তো নয়।

এটাই বা কী কম হেঁয়ালির কথা। সন্দীপের আড়াই হাজার টাকার ক্ষতিটা যেন নিতান্ত তুচ্ছ একটা ক্ষতি, বটগাছের একটা পাতা ধুলোর উপর পড়ে গেলে গাছটার যেমনতর ক্ষতি হয়ে থাকে।

কিন্তু এষার গলার ওই নেকলেসের হীরের দামটাকে সামান্য একটা বটপাতা বলে মনে করলেও তো এষার মনে রাখা উচিত যে, ওটা বটপাতা নয়, ওটা সন্দীপের ভালবাসার প্রতীক, স্ত্রী এষার গলাতে স্বামী সন্দীপের প্রথম উপহার।

সন্দীপ—কী যেন বললে তুমি?

এষা—আজ বিকেলে একটা বাজে জায়গাতে বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছে করছে।

সন্দীপ—বলো, কোথায় যেতে চাও?

এষা—ঢাকুরিয়া লেক।

সন্দীপ—আমি তা হলে ব্যাঙ্ক থেকে একটু আগেই.....।

এষা—না না, তোমাকে একটুও ব্যস্ত হতে হবে না। তোমার আজ আমার সঙ্গে বেড়াতে বের না হলেও চলবে। তুমি আজ অন্য একটা গাড়ি নিয়ে ব্যাঙ্কে যাও, ক্যাডিলাক থাকুক।

এরপর পুরো একটি মাসের মধ্যে কোনও একটি দিনও এষার সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যাবার জন্য সন্দীপকে ব্যস্ত হতে হয়নি। ক্যাডিলাক আছে, বাবুলাল ড্রাইভার আছে, এষার বাইরে বেড়াতে যাবার ইচ্ছেটার জন্য সন্দীপের সঙ্গ তার দরকার হয়নি। এষা একাই বের হয়েছে আর ফিরে এসেছে।

বড়ঘরের টেবিলের কাছে একটি কাচের গেলাস হাতে নিয়ে একলা বসে থাকে সন্দীপ, আর খোলা জানালা দিয়ে কলকাতার চৈত্র সন্ধ্যার উতলা বাতাস ঘরের ভিতরে ঢুকে হুটোপুটি করে। তখনও সন্দীপের মনের ভিতরে কোনও প্রশ্ন খুব বেশি হুটোপুটি করে না। শুধু মনে হয়, এষা সত্যিই একটি অদ্ভুত....চমৎকার....দুরন্ত হেঁয়ালি।

মনে হয়, তাই ভয় হয় সন্দীপের, এষা যদি কোনওদিন বাইরে বেড়াতে যাবার আগে হঠাৎ বলে ফেলে, আজ তুমিও চলো—তবে সত্যিই ব্যস্ত হয়ে উঠতে পারবে সন্দীপ? বোধ হয় পারবে না। যদি জোর করে নিজেকে ব্যস্ত করিয়ে নিয়ে এষার সঙ্গে বেড়াতে বের হয় সন্দীপ, তবেই বা কী হবে? সেই দুরন্ত আনন্দের স্বাদটা কি আবার সন্দীপের রক্ত ও নিঃশ্বাসের মধ্যে তেমন করে মেতে যাবে না। বললে, খুব ভুল বুঝবে এষা। হয়ত একটা সন্দেহই করে বসবে যে, এষার জন্যে সন্দীপের প্রাণের ভিতরে সেই ভালবাসা বুঝি আর নেই।

একটা কথা কিন্তু ঠিকই বলেছিল এষা, বড়ঘরের ভিতরে এষার জীবনের স্মৃতিপুলকিত সান্ধ্য আমাদের হর্ষ যখন কমে যাবার হবে, তখন নিজেই কমে যাবে। ঠিকই কমে গিয়েছে। যেদিন ঢাকুরিয়ার লেকে বেড়িয়ে আসবার জন্যে একাই বের হয়ে গেল এষা, তারপর এই তো পুরো তিনটি মাস পার হয়ে গেল, কিন্তু কই, বড়ঘরের ভিতরে অতিথিদের আমোদিত সমাবেশ তো আর হয়নি। বাবুর্চি ফটিকও কোনদিন অভিযোগ করে ভাঙা ক্রকারির কোনও হিসাব দাখিল করেনি।

এরই মধ্যে এষা একদিন হেসে হেসে বলে ফেলেছে।—তুমি কি একটা ব্যবস্থা করে দেবে না, আমার যে বেশ অসুবিধা হচ্ছে।

সন্দীপ ঠাট্টা করে হাসে।—এত দূরে বসে কথা বললে তো অসুবিধে হবেই।

চেয়ার থেকে উঠে সন্দীপের কাছে এসে একই সোফার উপর বসে আর সন্দীপের হাতের উপর হাত রাখে এষা—ঠাট্টা করে কথাটা বললে কেন সন্দীপ? এটা তো তোমার দাবির কথা।

সন্দীপের বুকের বাতাস যেন পুরনো সৌরভে ভরে গিয়ে নিবিড় হয়ে যায়। এ তো কোনও হেঁয়ালি নয়, সেই এষাই কথা বলছে। এষার হাতটাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে এষার মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে সন্দীপ। দেখতে পায় সন্দীপ, ঠিকই তো, কোনও ভুল নেই, নন-স্মিয়ার লিপস্টিকের রঙিন প্রলেপ নিয়ে সেই তাহিতি ঠোঁট সেই রকমই ফুল্ল হয়ে ফুটে রয়েছে।

সন্দীপ বলে—আমি থাকতে তোমার কোনও অসুবিধে হবে, এষা?

এষা—দুঃখের কথা, তুমি থাকতেও আমার অনেক অসুবিধে হচ্ছে। তুমি তোমার ব্যাঙ্কে আমার নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দাও, যেন আমি অন্তত একলাখ পর্যন্ত ওভারড্র করতে পারি।

সন্দীপ—বেশ তো, তাই হবে। আজকালের মধ্যেই হয়ে যাবে।

এষা—আরও একটি কাজ করো। তুমি তোমার ব্যাঙ্কের তরফে চিঠি লিখে দোকানগুলোকে জানিয়ে দাও যে, আমার সই-করা স্লিপ পেলেই যেন আমার দরকারের জিনিসগুলি পাঠিয়ে দেয়।

সন্দীপ—দোকানগুলোর নাম ঠিকানা একটা কাগজে লিখে আমাকে দিও।

এষা—লিখেছি, কাগজটা তোমার ডায়েরির মধ্যে রেখে দিয়েছি।

সন্দীপ—বেশ করেছ। আজকালের মধ্যেই দোকানগুলোকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেব।

এষা হাসে—আজকালের আজটা কিন্তু ফুরিয়ে এসেছে। বলো, কালকের মধ্যে সব ব্যবস্থা করে দেবে!

সত্যিই এখন রাত দশটা। ভাষার ভুলটা বুঝতে পারে সন্দীপ। ঠিকই, আজ নয়, কালই সব ব্যবস্থা করে দিতে হবে। কিন্তু আজকাল রাত দশটার সময় এষাকে এমন করে এত কাছে কবেই বা পাওয়া যায়? খুব কম। সে তো আজ প্রায় এক মাসের একটি রাতের কথা। ঘুমের মধ্যে যেন একটা ব্যাকুল নিশির ডাক শুনতে পেয়ে জেগে উঠতে হয়েছিল। এষার ঘরের বন্ধ দরজার উপর বার বার হাত ঠুকে সন্দীপের ব্যাকুল ইচ্ছেটা বার বার মাথা ঠুকেছিল। এষা তারপর দরজা খুলে দিল। কিন্তু কী অদ্ভুত একটা কথা কত সহজে বলে দিল এষা আর কোনওদিনও আমার ঘরের বন্ধ দরজার উপর এরকমের হামলা করবে না। যখন তখন তোমার ইচ্ছে হলেই কিছু হবে না। আমার ইচ্ছে হলে তবেই হবে।

আজ এখন তো ঘুমিয়ে পড়েনি এষা, যদিও রাত দশটা বেজে গিয়েছে। এষার জাগা প্রাণটা সন্দীপের কত কাছে, সন্দীপের সঙ্গে হাতে হাতে বাঁধা হয়ে সোফার উপর বসে আছে।

এষা—মনে হচ্ছে, আজ তুমি আমার হাতটাকে এখন ছেড়ে দিতে পারবে না।

সন্দীপ—না। এখন তুমি আমার কাছেই থাকবে।

এষা—থাকব।

এরপর, এই রাত ফুরিয়ে যখন ভোর হয়ে যায়, আর অদ্ভুত একটা শব্দ শুনে সন্দীপের ঘুম

ভেঙে যায়, তখন বুঝতে পারে সন্দীপ, শব্দটা পাখির ডাকের শব্দ নয়, ক্যাডিলাকের ইঞ্জিনের শব্দ। কী আশ্চর্য, আজ এই ভোরবেলাতেই কোথায় বেড়াতে যাচ্ছে এষা?

এর পর আরও কত রাত এল আর ফুরিয়ে গেল, কিন্তু এষাকে কোনও রাতেও তো ঠিক এমন করে এত কাছে আর পাওয়া গেল না। ভাবতে বেশ আশ্চর্য লাগে সন্দীপের, এষার ভালবাসার ইচ্ছেটা যেন ঢেউয়ের বুকে চাঁদের ছবি। এই ভেসে উঠছে, এই ডুবে যাচ্ছে। কখন যে কাছে এসে বসবে আর হাতের উপর হাত রাখবে, কোনও ঠিক নেই। আবার কখন যে সরে যাবে, কোনও ঠিক নেই। বুঝতেও দেয় না, কখন সরে গেল। এষাকে একদিন আর একবার একটু ঠাট্টা করে আর হেসে হেসে জিজ্ঞাসা করলে হয়—কী গো সুনয়না, তোমার কি কখনও নয়নে পড়ে না যে, এই ঘরের এই সোফার উপর এক ব্যক্তি তোমারই আশায় রাত দশটা পর্যন্ত বসে আছে আর হাই তুলছে?

এক মাসের মধ্যে কত দিন আর কত রাত তো পার হয়ে গেল, কিন্তু ওরকম একটা সামান্য ঠাট্টার কথাও এষাকে কখনও বলতে পারেনি সন্দীপ। কেন পারেনি? বুঝতে পেরেছে সন্দীপ, বড় বেশি ভালবেসে ফেললে মানুষের মন এই রকমই নরম হয়ে যায়। ভয় হয়, এরকম নিরীহ ঠাট্টার কথা শুনেও হয়ত খুব দুঃখ পাবে এষা।

কিন্তু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, তুমি কি বালুচর শাড়ি দিয়ে ঘরের যত দরজা ও জানালার পর্দা তৈরি করবে? একদিনে একসঙ্গে সাতটা বালুচর শাড়ি কিনে ফেললে কেন? আজই ব্যাঙ্কের কাছে শাড়ির দোকানের বিল এসেছে, বিলের টাকাও মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবু একবার এষাকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে সাতটা বালুচর কেন?

একথাও এষাকে জিজ্ঞেস করতে পারেনি সন্দীপ। জুয়েলার ঠাকুরদাসেরও একটা বিল এসেছে। গ্রেগরির ওয়াইন-স্টোরের বিল এসেছে। কোনও সন্দেহ নেই আরও বিল আসবে, আসতেই থাকবে।

কিন্তু একটা বিল দেখে সন্দীপের চোখের বিস্ময় যেন বুকের ভিতরে গিয়ে থমথম করে। এ কী ব্যাপার! এষার প্রাণটা যেন ফল্গুর অন্তঃশীলা ধারার মতো একটা কাণ্ড করে বসে আছে। এই বিলটা হল জেন্টস ড্রেসের একটা বিল। বিল পাঠিয়েছে ড্রেসমেকার 'চ্যাম্পিয়ান'। বিলের মধ্যে কোট শার্ট আর ট্রাউজার আছে, আদ্দির আর সিল্কের পাঞ্জাবিও আছে। এষার ভুলো মনের তুফানি কাণ্ড দেখে যা মনে হয়েছিল, তা তো সত্য নয়। যার কাছে আসতে ভুলে যায় এষা, তাকে ভুলে থাকতে পারেনি। তারই জন্য উপহার যোগাড় করে রেখেছে। তবু জিজ্ঞাসা করতে হবে এষাকে : তুমি কেমন করে জানতে পারলে যে, এই মাসের একুশ হল আমার জন্মদিনের তারিখ?

কিন্তু কী অদ্ভুত এষার ভুলো মনের কাণ্ড? একুশ তারিখ এসেছে; সকাল থেকে সন্ধ্যা, তারপর রাত দশটা পর্যন্ত আশায় আশায় অপেক্ষাও করেছে সন্দীপ। কিন্তু কোথায় এষা, আর কোথায়ই বা এষার উপহার? বড়ঘরের টেবিলের উপর শেরির একটি বোতল আর দুটি গেলাস রেখে ফিরে-আসা ক্যাডিলাকের হর্ণের আর ফিরে-আসা এষার হাসির শব্দ শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে বসে থেকে সন্দীপের নিশ্চল শরীরটাও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দুপুরের রোদে তিন ঘন্টা দৌড়াদৌড়ি করলেও বোধহয় মানুষের শরীর এত ক্লান্ত হয় না। আর, দু'মিনিটের স্বপ্নটাও যেন একটা মরে-যাওয়া শোভার ভয়ানক বিশ্রী ছবি। আলমোড়াতে এক ঘন্টার শিলাবৃষ্টিতে হোটেলের অত বড়

ফুলবাগানটার সেই শ্মশানদশার ছবি। ফুল নেই, পাতা নেই, দাঁড়িয়ে আছে শুধু যত নেড়া কাঠির ঝোপ।

পনের

চমকে দেবার মত আর আশ্চর্য হবার মত ঘটনার নতুন দৃশ্য প্রায় রোজই দেখতে হচ্ছে। বালিগঞ্জের রায়ভবন যেন এক অন্তহীন নাটকের স্টেজ। সন্দীপের মনে হয়েছে, হ্যাঁ, স্টেজই বটে। সবচেয়ে মজার কথা, এই নাটকে সবাই আছে, শুধু নেই এক সন্দীপ রায়। বাবুর্চি বেয়ারা ড্রাইভার চাকর আর মালী, ওরাও আজকাল যেন শুধু এক দিদি-সাহেবকে দেখতে পায় আর বার বার সেলাম করে। এষাকে দেখতে পেলে সবাই যেন ক্রীতদাসের মত এক একটি বিনীত ভঙ্গির মূর্তি হয়ে যায়। এষার ডাক শুনতে পেলে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। সেদিন গ্যারেজের কাছে অচেনা একটা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দীপকে তেমন কিছু আশ্চর্য না হলেও ভাবতে হয়েছে কী চায় লোকটা, গ্যারেজের কাছেই বা দাঁড়িয়ে আছে কেন? লাল জ্যাকেট আর সাদা প্যান্ট, মাথায় সাদা টুপি, কে এই লোকটা?

বুঝতে দেরি হয়নি সন্দীপের, অচেনা কেউ নয়, খুব চেনা। লোকটা হল ড্রাইভার বাবুলাল। বাবুলালকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারা গেল, নীল রঙের উর্দি দিদি-সাহেবের পছন্দ নয়, তাই বাবুলালের নতুন রঙের উর্দি হয়েছে।

বারান্দার সিঁড়িতে পাথুরে সিংহটার কেশরের উপর বেশ শ্যাওলা জমেছে। দেখতে পেয়ে সেদিন সিংহটার ঘাড়ের উপর একটা পা তুলে দিয়ে আর ঘষে ঘষে শ্যাওলা তুলতে অনেক চেষ্টা করেছে সন্দীপ। কিন্তু তুলতে পারা গেল না। কেশরের খাঁজে খাঁজে শ্যাওলা জমেছে ; সহজে সরবে কেন?

বিকেলের সব আলো তখনও ফুরিয়ে যায়নি, সন্ধ্যে হতে একটু দেরি আছে। তাই সিংহের ঘাড়ে একটা পা রেখে সিগারেট মুখে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সন্দীপ। কিন্তু একটা নতুন দৃশ্য দেখে চমকে উঠতে হয়।

ট্যাক্সি থেকে নামলেন এক ভদ্রলোক। বেশ ঘষা-মাজা পরিচ্ছন্ন চেহারা। গায়ের পোশাকটা নিতান্ত প্লাস-টু বটে; শুধু শার্ট আর ট্রাউজার, গরমের দেশে যেটা খুব বেশি চক্ষুশূল নয়; কিন্তু বিকেলের রোদে ভদ্রলোকের পোশাক যেরকম চিকচিক করছে, তা দেখে ধারণা করতে হয় যে, পোশাকের কাপড়টা সিল্কের ড্রিল ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। ক্রিম রঙের শার্ট আর বাদামি রঙের ট্রাউজার। ছোট-বড় অনেকগুলো প্যাকেট দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আর বুকের উপর চেপে রেখে ভদ্রলোক এদিকেই আসছেন।

কিন্তু আর অনুমান করবার দরকার হয় না। সন্দীপের মুখের সিগারেটের আগুনটা যেন আশ্চর্য হয়ে আর চমকে চমকে জ্বলতে থাকে। চিনতে আর বুঝতে পেরেছে সন্দীপ, মন্দার এসেছে।

সন্দীপের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় মন্দার।—বেচারা সিংহটাকে ওরকম করে মাড়াচ্ছ কেন?

সন্দীপ—তবে কি তোমাকে মাড়াব?

মন্দার হাসে—আমাকে মাড়িয়ে তোমার আর কী লাভ হবে?

সন্দীপ—কিন্তু তোমার এ দশা কেন?

মন্দার—খারাপ দশা বলছ? না, একটুও না। আমি তা মনে করি না। আমি খুব ভাল আছি। আমার এখন বেস্পতির দশা।

সন্দীপ—আমি জিজ্ঞেস করছি, এসব কী? কিসের বোঝা?

মন্দার—এসব এষা রায়ের ফরমাশি জিনিসের বোঝা।

সন্দীপ—কিন্তু এসব বোঝা তোমার বইতে হচ্ছে কেন?

মন্দার—এষা রায়ের ইচ্ছে আর আমারও ইচ্ছে। তিনি নিজের মুখে বলেছেন, তাই তাঁর ফরমাশ খাটছি।

সন্দীপ—তাতে তোমার কী লাভ হচ্ছে?

মন্দার—বাঃ, লাভ নয়? অনেক লাভ। দু'দশ টাকা যখনই চাইছি, তখনই তিনি দিয়ে দিচ্ছেন। না চাইতেও দিয়েছেন। তিনি তোমার মত কিপটে মানুষ নন। তিনি এখন বাড়িতে নেই বোধহয়?

বলতে বলতে বাড়ির ভিতরে চলে যায় মন্দার। বাড়ির ভিতরে কোথায় কোন ঘরের ভিতরে জিনিসগুলি রাখতে হবে, সবই নিশ্চয় মন্দারের জানা। মন্দারের কথা শুনে আর ভাবভঙ্গি দেখে এখন বুঝে নিতে হবে কোনও অসুবিধে নেই যে, ফরমাশ খাটবার জন্য এ বাড়িতে আনাগোনা করা এখন মন্দারের জীবনের একটা স্বচ্ছন্দ অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। গৃহবলিভুক্ পায়রার এই মন্দার এষার বকশিশভুক্ একটি প্রাণী।

দু'তিন মিনিটের মধ্যেই বাড়ির ভিতর থেকে ফিরে আসে মন্দার। সন্দীপ বলে—কিন্তু, এষার কাছ থেকে এরকম পোষাক-টোশাক চাইতে তোমার একটুও লজ্জা হল না কেন, মন্দার?

মন্দার—বিশ্বাস করো, আমি চাইনি। উনি নিজের ইচ্ছেতে দয়া করে দিয়েছেন। নইলে আমার কোনও দরকার ছিল না। আমাকে তো একটা বাঁধিপোতার গামছাতে মানিয়ে যায়।

সন্দীপ হেসে ফেলে—কিন্তু তুমি কি সেটা বিশ্বাস কর?

মন্দার—করি বৈকি। আমি আগে যখন গণেশদার ব্যামাগারে একসাইজ করতাম, তখন আমার এমনই অভাব ছিল যে, একটা শালুর জাঙ্গিয়াও কিনতে পারিনি। অগত্যা বাঁধিপোতার গামছা পরেই প্যারালাল বারে পিকক হতাম, রিং-এ টি হতাম। ব্যামাগারের একটা পুরনো ফটোতে তুমি দেখতে পাবে, জাঙ্গিয়া-পরা মদ্দদের মধ্যে শুধু আমি একা গামছা পরে দাঁড়িয়ে আছি।

চলে যায় মন্দার। সন্দীপ আবার সিগারেট ধরায়। যাক, এতদিনে আর এতক্ষণে একটা অদ্ভুত রহস্যের ঘোর কেটে গেল; ড্রেসমেকার 'চ্যাম্পিয়নে'র সেই বিলের রহস্য। বিলে লেখা পোশাকের ফর্দটা ছিল মন্দারের জন্য এষার খুশিমনের যত বকশিশ-সামগ্রীর ফর্দ।

কোন সন্দেহ নেই, মন্দার দত্ত একটি বাঁধি পোতা গামছা ছাড়া আর কিছু নয়; এষা সেই গামছা দিয়ে পা মুছে নিচ্ছে। তবু এষাকে একটু বলে দেওয়া উচিত যে, এরকম অদ্ভুত মানুষকে দিয়ে ফাই-ফরমাস ন. খাটানোই ভাল। অভাবী ইডিয়টিক মানুষ ভুল করে কিংবা বোকামি করে কখনও যে ক্ষতি করে ফেলবে, তার কোনও ঠিক নেই।

বলি বলি করেও কথাটা এষাকে কোনওদিন বলতে পারে না সন্দীপ, যদিও পুরো একটা মাস পার হয়ে গেল। এক মাসের মধ্যে অন্তত সাতবার এষার সঙ্গে সন্দীপের মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়েছে। গাড়ির কথা, নতুন কার্পেটের কথা, জল বাতাস আর হিট ও হিউমিডিটির কথাও অনেক হয়েছে। কিন্তু ওই সামান্য কথাটা এষাকে বলে দেওয়া আর সম্ভব হয়নি। বললে হয়ত খুবই ভুল বুঝে

ফেলবে এষা। হয়ত মনে করে বসবে যে, তার একটা সামান্য দয়া-দাতব্যের ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ করে সন্দীপ একটি নিরেট সেকেলে স্বামীর মত স্ত্রীর উপর ওভার লর্ডগিরি করতে চাইছে। মুখে হয়ত কিছু বলবে না, কিন্তু মনে মনে অসন্তুষ্ট হবে। আর এষার সেই চাপা অসন্তোষের চাপে বেচারা মন্দারের সব বকশিশের আশা থেঁতলে যাবে।

ক'দিন পরে একদিন ব্যাঙ্ক থেকে বাড়ি ফিরে এসেই মনে হয় সন্দীপের, আজ বোধ হয় বড়ঘরের ভিতরে বড় রকমের কোনও ব্যাপার হবে। বাবুর্চি ফটিক টাটকা ন্যাপকিন কোমরে জড়িয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। শব্দ শুনে বোঝা যায়, বড়ঘরের ভিতরে চেয়ার টেবিল সাজানো হচ্ছে। মস্ত বড় একটা ফুলদান আর ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে বেয়ারা বড়ঘরের ভিতরে ঢুকছে।

করিডরের এদিক থেকে ওদিকে হেঁটে বেড়াচ্ছে এষা। বালুচর শাড়ির আঁচল লুটিয়ে পড়ে মেঝের গা বুলিয়ে চলছে। এষার পায়ের ভেলভেটের চটি মেঝের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলছে। শব্দ না করলেও বোঝা যায়, বালুচরের আঁচল আর ভেলভেটের চটি আজ বেশ উতলা হয়েছে।

সন্দীপকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে এষা—তোমার আর একজন যে বন্ধুআছেন, যাঁর নাম বিনায়ক, ইচ্ছে হয় তো তাঁকে একবার ফোন করে বলে দিতে পারো, যে আজ সন্ধ্যা সাতটায় এখানে যেন আসেন।

সন্দীপ—কেন?

এষা—বিশেষ ব্যাপার আছে।

সন্দীপ—কী?

এষা—খুব ঘটা করে নয়, ছোট্ট করে একটা অ্যাজ ইউ লাইক' হবে। যাক, যা তোমাকে বলবার ছিল, বলে দিলাম, তুমি দয়া করে গেস্টদের আসবার একটু আগেই এসো।

সন্দীপ—আর কিছুই কি বলবার নেই?

এষা—না; তোমাকে বলবার মত আর কী কথা থাকতে পারে, ভেবে পাচ্ছি না।

সন্দীপ—আমাকে একটু বলবে তো, আজকের আনন্দের উপলক্ষ্যটা কী?

এষার রঙিন ঠোঁট কেঁপে কেঁপে হাসতে থাকে। —সত্যিই শুনতে চাও?

সন্দীপ —অবশ্যই চাই।

এষা—তবে শোনো। এষা এতদিনের তার মনের মত আর প্রাণের মত মানুষ পেয়েছে—এই হল উপলক্ষ্য।

সন্দীপের দুই চোখে, বুকের ভিতরেও একটা রঙিন বিস্ময়ের আবেগ কেঁপে কেঁপে হাসতে থাকে। অন্য কেউ নয়, সত্যিই যে সেই এষা কথা বলছে। সন্দীপের মন-প্রাণ রূপ গুণ আর রক্তমাংসের সবচেয়ে বড় গর্বটাকে অভিনন্দিত করে কথা বলছে এষা। এষার একটা হাত বুকের উপর তুলে নিয়ে সন্দীপের এখনই বলে দিতে ইচ্ছে করছে যে.....কিন্তু কোথায় এষা?

ব্যস্ত হয়ে চলে যাচ্ছে এষা। যেতে যেতে একটা দুঃসহ অভিযোগের কথা বলছে। —ওঃ, এই অবেলায় গায়ে গরম জল ঢেলে আবার চান করতে হবে। এতবড় একটা একেলে মানুষ হয়েছেন, কিন্তু ঘরে স্টিম বাথের একটা সরঞ্জাম রাখতে পারেননি।

শুধু আজ নয়, এই ক'মাসের মধ্যে এষা অনেকবার এভাবে আর প্রায় এইরকমের ভাষায় সন্দীপের একেলে অভিরুচির প্রাণটাকে যেন কঠিন একটা ঠাট্টার টোকা দিয়ে কথা বলেছে। বোধ

হয় বুঝিয়ে দিতে চায় এষা, সন্দীপ রায়ের একেলে অভিরুচির অহংকারটা এষার কাছে যেন একটা ঘুণধরা আবর্জনা। সন্দীপের জীবনটা নতুন আনন্দের তেষ্টায় দুরন্ত হয়ে কতদূরেই বা এগিয়ে যেতে পেরেছে? রঙিন পাথরের রেলিং দিয়ে ঘেরা একটা লিলি পণ্ড পর্যন্ত, এই তো। কিন্তু এষার জীবনের তেষ্টা যে অনেক অনেক দূর এগিয়ে যেতে মুক্ত মত্ত ও দুরন্ত একটা পাহাড়ি ঝর্নার কাছে পৌঁছে গিয়েছে। অস্বীকার করে না সন্দীপ। তাই এষার ঠাট্টার টোকায় সন্দীপের মনটা একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেও মুখে কোনও প্রতিবাদের ভাষা চঞ্চল হয়ে ওঠে না, উঠতে পারে না।

নতুন করে কিছু আর ভাববার দরকার নেই। এষাকেও কোনও কথা আর জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই। কোনও লাভ নেই। মোটামুটি একটা নীরব অস্তিত্ব হয়ে পড়ে থাকাই যে এখন সন্দীপের পক্ষে একটা নিরুদ্বেগ শান্তির জীবন, এ সত্যটাকে মনেপ্রাণে মোটামুটি বুঝেই ফেলেছে সন্দীপ।

ঠিকই, আজ সন্দীপের না জানলেও চলত, কেন আর কিসের জন্য বড়ঘরের ভিতরে আজ বিশেষ উৎসবের দরকার হয়েছে। সাতটা বাজবার পনেরো মিনিট আগেই সন্দীপ এসে বড় ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ায়। বিনায়ক এলেন সাতটার দশ মিনিট আগে।

হেসে ডাক দেয় সন্দীপ—এসো বিনায়ক, ভিতরে গিয়ে বসো।

সাতটা বাজবার পাঁচ মিনিট আগে একসঙ্গে উপস্থিত হলেন পৃথ্বীরাজ, সুরঞ্জন, সুরজিৎ, অনিমেষ আর বলবন্তভাই।

—ওয়েলকাম। সন্দীপের মুখের হাসিটা উচ্ছ্বসিত হয়ে আগন্তুক অতিথিদের সবাইকে অভ্যর্থনা জানায়।

আগন্তুক অতিথিরা ভিতরে চলে যেতেই হাতঘড়ির দিকে তাকায় সন্দীপ, সাতটা বাজতে তিন মিনিট বাকি। আজ বোধহয় মন্দার আর আসবে না।

সন্দীপের মনের মধ্যে অনুমানের ভাষাটা ফুরিয়ে যেতে না যেতেই দেখতে পায় সন্দীপ, মন্দার এসে গিয়েছে। কিন্তু....এ কী, মন্দারের এ কী রকমের অদ্ভুত সাজ। সিল্কের পাঞ্জাবি আর ফরাসডাঙা ধুতি, মন্দার যেন কোম্পানীর আমলের একটি সম্ভ্রান্ত বাঙালিবাবুর মূর্তি।

মন্দারের চেহারাটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে সন্দীপ। সন্দীপের চোখের তারা দুটো যেন জ্বলে জ্বলে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু হেসে ফেলে সন্দীপ।—আজ এরকম অপরূপ সাজে সাজবার ইচ্ছে হল কেন, মন্দার?

মন্দারও হাসতে থাকে। —আমার নিজের ইচ্ছেতে নয়, সন্দীপ। মিসেস রায়ের ইচ্ছেতে। উনি যেমনটি বলে দিয়েছেন, আমি ঠিক তেমনটি সেজেছি।

সন্দীপ—যাও, ভিতরে গিয়ে বসো।

সাতটা বাজতে এক মিনিট বাকি। এইবার সে-ই এসে দরজার কাছে দাঁড়ায়, যে আজ বড়ঘরের বিশেষ উৎসবের অধীশ্বরী, এষা। আজ এষার গায়ের শাড়ি আর চোলির আবরণ প্রকারে যেমন খুব রঙিন, আকারে, তেমনই খুব সামান্য। এই ছোট্ট চোলি আর একটুখানি শাড়ি যেন ফুলের গায়ের উপর রঙিন পরাগের দুটি ছোপ। সন্দীপের বুকের ভিতরে সব প্রশ্নের সমাধি তো হয়েই গিয়েছে, তবু সমাধিটাই যেন কেঁপে ওঠে। বিস্ময়ের কথাটা হঠাৎ মুখ থেকে বের হয়ে শুধু সামান্য একটা শব্দ করে ফেলে—এ কী! অদ্ভুত সাজ।

এষা হাসে—এই তো....‘ড্রেস অ্যাজ ইউ লাইক’।

সন্দীপও হাসে। —ভাল, মনে হচ্ছে....অ্যাজ ইউ লাইক করতে গিয়ে শেষে একটা স্ট্রিপ-টিজ করে ফেলবে।

সন্দীপের হাতের উপর মৃদু-লঘু একটা টোকা দিয়ে হেসে ওঠে এষা—ফেললাম বা; তাতে তোমার তো কোনও ক্ষতি নেই। চলো, ভিতরে যাই।

এষার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে, হেসে হেসে অদ্ভুত এক খুশির আবেগ উচ্ছলিত করে বড়ঘরের ভিতরে ঢুকে গেস্টদের সহাস্য মূর্তিগুলোর দিকে তাকায় সন্দীপ। গেস্টরা হাত তুলে খুশির সঙ্কেত জানায়—ওয়েলকাম। কিন্তু কী আশ্চর্য, সামান্য একটা কথা বলতে গিয়ে ওরা ওরকম অদ্ভুত স্বরে হেসে উঠল কেন? ওরা কি কাগজের হংসমিথুন দেখে চমৎকার কৌতুকের হাসি হাসছে?

ডোভার লেনের হরিপদ প্রতি বছর পয়লা বৈশাখ অদ্ভুতরকমের ঘুড়ি উড়িয়ে খুব আমোদ জমিয়ে তোলে। উড়ছে ঘুড়ি, কাগজের হংসমিথুন; হরিপদর হাতের নাটাইয়ের এক একটা অদ্ভুত টানের কায়দাতে কতরকমই না ঢঙ দেখিয়ে ঢলাঢলি করছে কাগজের হংস ও হংসী। হংসী তার গলা দিয়ে হংসের গলাটি জড়িয়ে ধরছে। হাততালি দিয়ে হেসে উঠছে রাস্তার ভিড়। ঠিকই, কৌতুকেরই দৃশ্য বটে।

বিনায়কের পাশের চেয়ারে বসে আর শেরির গেলাস হাতে নিয়ে দেখতে থাকে সন্দীপ, এষার হাতের গেলাসটাই যেন মাতাল হয়ে বার বার এষার মুখের উপর উপুড় হয়ে পড়ে যাচ্ছে। দশ মিনিটের মধ্যে দু'বার গেলাস খালি করে ফেলেছে এষা। এষার চোখ-মুখ বিহ্বল হয়ে কী চমৎকার হাসি হাসছে।

লেডি অব দি লেক! লেডি অব দি লেক! হাততালি দিয়ে হেসে উঠছে শেরির নেশার আমেজে আমোদিত অতিথিরা। জানত না সন্দীপ, কোনওদিন জানবার সুযোগও হয়নি যে এষার আবার এরকম একটা উপাধি আছে।

কিন্তু বিনায়ক জানে বোধ হয়, তা না হলে এরকম অদ্ভুতভাবে কেশে কেশে ধোঁয়া ছাড়বে কেন বিনায়ক?

সন্দীপ বলে—কী বিনায়ক, তুমি দেখছি কথাটা শুনে একেবারে আশ্চর্য হয়ে কেশেই ফেললে।

বিনায়ক—না, একটুও আশ্চর্য হইনি। কথাটা আমি তো নতুন শুনছি না। এর আগে দুবার শুনেছি। একদিন সকালবেলা, একদিন সন্ধ্যোবেলা। লেকের জলে নৌকা বাইছেন এষা রায়, আর ওঁরা সবাই লেকের ধারে দাঁড়িয়ে রুমাল উড়িয়ে আর হেসে হেসে চিৎকার করছেন, লেডি অব দি লেক। লেডি অব দি লেক!

চেঁচিয়ে হো-হো করে হেসে উঠলেন পৃথ্বীরাজ—লাফ অ্যাজ ইউ লাইক।

মস্ত হাসির হল্লা জেগে ওঠে। সবাই হাসছে, নানারকম সুরে ও স্বরে; যেন বিকট এক অপার্থিব জগতের যত হাস্যরসের মিশ্র কাওয়ালি।

সুরজিৎ সামন্ত গেলাস হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। চেঁচিয়ে উঠলেন—ডান্স অ্যাজ ইউ লাইক।

মেঝের উপর ঘুরে ঘুরে আর হেলে-দুলে একপাক নেচে নিয়ে আবার চেয়ারের উপর বসে পড়লেন সামন্ত।

হাত থেকে গেলাস পড়ে যাচ্ছে। হাতের ঠেলা লেগে কাচের জার উল্টে যাচ্ছে, পড়ছে আর

ভাঙছে, ঝন্ ঝন্ ঝন্। এই অবিরল তরলতার আবর্তের মধ্যে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কখনও বা শক্ত ভঙ্গিতে পা ফেলে ফেলে ঘুরে বেড়ায় শুধু একজন, মন্দার দত্ত। এষার বকশিশভুক্ প্রাণী সেই মন্দার দত্ত হঠাৎ একটি কঠোর প্রভুত্বের কলোসাস হয়ে উঠেছে। এষার টেবিলের চারদিকে আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়াচ্ছে মন্দার। তাই এষাকে শুভেচ্ছা জানাবার আবেগময় চেষ্টাগুলি এষার টেবিল থেকে একটু তফাতে থেকে কলরব করছে, এষার টেবিলের কাছে এসে একেবারে হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়তে পারছে না। মন্দারের দিকে হাত তুলে চেঁচিয়ে ওঠে সুরঞ্জন—থ্যাংক ইউ বডিগার্ড।

হ্যাঁ, বড়িগার্ডই বটে। মন্দার দত্তের চরিত্রটা তো সন্দীপের অজানা নয়, নিজের ইচ্ছেতে একটা পছন্দমত কর্তব্য তৈরি করে নেওয়া তো মন্দারের পুরনো অভ্যেস। এই মন্দারই নিজের ইচ্ছেতে বাবুর্চি ও বেয়ারাকে ধমক-ধামক করে এবাড়ির কেয়ারটেকারের একটা কর্তব্য তৈরি করে নিয়েছিল।

কিন্তু বডিগার্ডের একটা অদ্ভুত সাহসের কাণ্ড দেখে চমকে ওঠে সন্দীপ। সত্যিই যে এষার বডিকে গার্ড করছে মন্দার। এরই মধ্যে দু'বার এষার হাত থেকে গেলাস কেড়ে নিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছে মন্দার। টলতে টলতে তিনবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে এষা, বোধহয় নাচতে চায় এষা। কিন্তু তিনবারই হাত তুলে এষার ঘাড়টা একটু চেপে দিয়ে এষাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছে। দেখলে সন্দেহ হয়, এষার ঘাড়ে হাত রাখবার এই দুঃসাহসের কর্তব্যটাও নিজের বুদ্ধিতে তৈরি করে নিয়েছে মন্দার।

ভ্রূকুটি সামলাতে গিয়ে সন্দীপের কপালটা কুঁচকে যায়। হাত তুলে আর তুড়ি বাজিয়ে ইশারা করে ডাকতেই সন্দীপের কাছে এসে দাঁড়ায় মন্দার। —বলো।

সন্দীপ—তুমি ওসব কী খবরদারি করছ? ম্যানার্স ভুলে যাচ্ছ কেন?

মন্দার—উনি বলেছেন বলেই খবরদারি করছি।

সন্দীপ—উনি বলেছেন?

মন্দার—হ্যাঁ। বলেছেন, তুমি আজ আমার কাছে থাকবে মন্দার। বেশি বাড়াবাড়ির কোনও ব্যাপার দেখলে তুমি সামলাবে।

সন্দীপ—যাও।

বিনায়কের পাইপ-ধরা মুখটা বড় বেশি ধোঁয়া ছাড়তে শুরু করেছে, বড় বেশ গাঢ় ধোঁয়া। সন্দীপের চোখের সামনের বাতাসটা যেন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। তাই আসরের মানুষগুলিকে এক একটা বিকট ছায়াজীবের মত দেখায়।

সন্দীপ—তুমি আজ খুব কড়া টোব্যাকোর ধোঁয়া ছাড়ছ, বিনায়ক।

বিনায়ক—না, না, কড়া টোব্যাকো নয়। আমি আজও আমার পছন্দের সেই ভলকানো ব্র্যাণ্ড, সেই নিতান্ত মাইল্ড টোব্যাকো কিনেছি, যেটা আমি বরাবর খেয়ে আসছি।

বিনায়কের মাইণ্ড তামাকের ধোঁয়াতেই সন্দীপের চোখে বেশ জ্বালা ধরেছে। কটকট করছে চোখ দুটো। তবু দুই চোখেব ভুরু টান করে দেখতে থাকে সন্দীপ, ছায়াজীবগুলো একের পর এক এষাকে গুডনাইট জানিয়ে চলে যেতে শুরু করেছে। আর, চেয়ার থেকে উঠেই একটা হাত বাড়িয়ে ডাক দিয়েছে এষা—মন্দার!

কী অদ্ভুত জ্বলন্ত দৃশ্য! কোনও মেঘ ধোঁয়া ছায়া কিংবা আবছায়া দিয়ে ঢাকা দৃশ্য নয়। স্তব্ধ হয়ে বসে দেখতে থাকে সন্দীপ, এক হাতে এষার একটা হাত আরেক হাতে এষার বিলোল কোমরটাকে

জড়িয়ে ধরে এষাকে আস্তে আস্তে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এষার এক অদ্ভুত বডিগার্ড। এষার পা দুটো টলছে।

বিনায়কের টোব্যাকোর সব ধোঁয়া যখন সরে যায়, সন্দীপের চোখের সামনের বাতাসটা পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন বুঝতে পারে সন্দীপ, দু'ঘন্টার মত্ততার আসর এখন একেবারে স্তব্ধ ও শূন্য। যেন জগৎ-ছাড়া একটা স্তব্ধতা ও শূন্যতার এককোণে বসে আছে সন্দীপ। না, পাশের চেয়ারে বিনায়কও নেই। কে জানে কখন কোন ফাঁকে সরে পড়েছে বিনায়ক।

সামান্য দু'চার চুমুক শেরি কতটুকুই বা নেশা ধরিয়ে দিতে পারে? কিছুই না। না, নেশার ঘোরে নয়, বিশ্রী রকমের একটা তন্দ্রার ঘোরে সন্দীপের সারা শরীর অলস হয়ে ঢুলছে; মাথাটা বারবার ঝুঁকে পড়ছে; চোখ দুটোতে তাকিয়ে থাকবার জোর আর নেই। তন্দ্রাটাও যেন ঝন্‌ঝন্‌ শব্দের ঘোর, মাথার ওপর আছড়ে পড়ছে, ভাঙছে আর গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে এক একটা কাচের গেলাস। দাঁতে দাঁত ঘষে আর দু'চোখের বড়-বড় পাতাগুলোকে বড় বড় কাঁটার মত খাড়া করে কথা বলছে এষা—আমি তো তোমার একেলে অভিরুচির পেট বেশ ভাল ক'রে ভরে দিয়েছি; তবে আর তোমার কী বলবার আছে?

—আছে; একশো'বার আছে।

—না, নেই।

এষার এক ধমকেই তন্দ্রাটা ভেঙে গেল। বুঝতে পারে সন্দীপ, মাথার ভিতরটা কটকট করে জ্বলছে, তাই তন্দ্রাটা উত্তপ্ত হয়ে ও আরাম না পেয়ে বার বার ছিঁড়ে যাচ্ছে। বাঃ, খুব চমৎকার অবস্থা! আজ তন্দ্রাতে এষার ধমক শুনতে হল, কাল স্বপ্নেতে আর পরশু হয়ত মূর্ছার মধ্যে এষার ধমক শুনতে হবে।

আজকের এই বিচিত্র অ্যাজ-ইউ-লাইক উৎসবের আসরে এষার সঙ্গে সন্দীপকে হেসে হেসে ঢুকতে দেখে বিনায়কও মুখ টিপে হেসেছে আর বলছে—আজ তোমাকে বিশেষ রকমের আনন্দিত বলে মনে হচ্ছে। সন্দেহ হচ্ছে, তোমার লাইফের একটা হাইপার-রোম্যান্টিক ব্যাপার আজ হয়ে যেরকমের হাইপার-রোম্যান্টিক আনন্দ পায়, আমিও সেই রকমই আনন্দ পেয়েছি।

বাবুর্চি ফটিক দু'বার দরজার কাছে এসে উঁকি দিয়ে চলে গেল। হাতঘড়ির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে সন্দীপ। যেন নিদারুণ এক সংকল্পের দুটি কঠোর চক্ষু হিসেব করে বুঝে নিচ্ছে; আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে দুঃসহ একটা ধৈর্য ধরে রাখতে চেষ্টা করছে। না, এখন নয়। রাত আরও গভীর হোক।

ধৈর্য ধরে বসে থাকতে গিয়ে আবার তন্দ্রার মত একটা আবেশ এসে চোখ দুটোকে জড়িয়ে ধরে, যদিও মাথার ভিতরে কটকটে জ্বালাটা একটুও শান্ত হয়নি। সন্দীপের একটা হাত হিংস্র জন্তুর থাবার মতো ভঙ্গিতে কপালটাকে শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরে।

একটা শব্দ শুনে চমকে ওঠে সন্দীপ, মুখ তুলে আর চোখ খুলে বড়ঘরের দরজার দিকে তাকায়। কিসের শব্দ? গাড়ির শব্দ নাকি? ক্যাডিলাক কি কাউকে নিয়ে বাইরে চলে গেল? শব্দটা যেন সন্দীপের তন্দ্রাটাকে মাড়িয়ে দিয়ে আর ভেঙে দিয়ে পালিয়ে গেল। সেই মুহূর্তে সন্দীপের বুকের ভিতরে ধৈর্যধরা অপেক্ষার নিঃশ্বাসটা যেন ফুঁসে উঠে শব্দ করে—রাত কত হল?

হাতঘড়ির দিকে তাকায় সন্দীপ। রাত দুটো। না আর অপেক্ষা নয়। আর ধৈর্য নয়। আর সহ্য

করা উচিত নয়। এই মুহূর্তে একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাক। সে নিষ্পত্তির জন্যে যদি মেয়েমানুষটার গলা টিপে ধরতে হয়, জিভ উপড়ে ফেলতে হয়, লোহার রডের এক আঘাতে তাহিতী ঠোঁট থেঁতলে দিতে হয়.....।

এক দৌড়ে ছুটে গিয়ে এষার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ায় সন্দীপ। দরজার গায়ে লাথি মেরে চেঁচিয়ে ওঠে—খোলো।

খুলে যায় দরজা। ঘরের ভিতরের নিবিড় নীল কুহেলিকার মত আলোটার এক ঝলক আভা খোলা দরজা দিয়ে করিডরের মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে। ঘরের ভিতর আস্তে আস্তে হেঁটে সেইখানে এসে দাঁড়ায় নিশীথ-সুখের একটি আলোড়িত মূর্তি, এষা। এষার ঢিলে পায়জামা যেমন শিথিল, তেমনই শিথিল এষার গায়ের ঢিলে জ্যাকেট। জ্যাকেটের তিন বোতাম-ঘরের দুটিই খোলা, বেল্ট আলগা হয়ে ঝুলছে। এলোমেলো চুলের একটা ছন্নছাড়া কার্ল কপালের উপর ছেঁড়া দড়ির মত ঝুলছে, এষার মাথাটা যেন এইমাত্র একটা ঝড় সহ্য করেছে। আর তাহিতী ঠোঁটের উপর দিয়ে নিশ্চয় একটা প্লাবন বয়ে গিয়েছে, নইলে নন-স্মিয়ার লিপস্টিকের রং এমন করে গলে যাবে আর ছড়িয়ে পড়বে কেন?

—ঘরের ভিতর কে চেঁচিয়ে ওঠে সন্দীপ; আহত বাঘের হৃদ্‌পিণ্ড থেকে আক্রোশের একটা গর্জন উথলে উঠেছে।

—চেঁচাবে না, আস্তে কথা বলো। —খুব শান্ত, খুব মৃদু, নিষ্কম্প স্বর।

শিউরে ওঠে সন্দীপ। সন্দীপের কণ্ঠনালীর উপর যেন ভয়ানক শক্ত একটা লাঠির বাড়ি পড়েছে, ভাষা থেঁতলে গিয়েছে, স্বর ছিঁড়ে গিয়েছে। নীরব হয়ে এষার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এষা—কী বলছিলে, বলো!

সন্দীপ—তোমার ঘরে কে?

এষা—কেউ নেই।

সন্দীপ—আছে।

এষা—এখন নেই। এতক্ষণ ছিল।

সন্দীপ—কে ছিল?

এষা—মন্দার ছিল।

সন্দীপের চোখের তারা একবার শিউরে উঠেই কুঁচকে যায়। বুকের উপর হাতুড়ি পড়ছে; ফুসফুসটা তাই চুপসে গিয়েছে। আর টিপটিপ করে না বুকটা।

এষার শান্ত চোখের দুই ভুরু প্রজাপতির পাখার মত দুলতে থাকে। —এই সামান্য একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এরকম একটা অসময়ে তেড়ে এলে কেন?

সন্দীপ—কী বললে! সামান্য কথা?

এষা—হ্যাঁ, দেখতে পাওনি, মন্দার যে এইমাত্র চলে গেল?

সন্দীপ—না।

এষা—কেন? বাবুর্চি ফটিক দেখেছে, বেয়ারা অনাদি দেখেছে, মন্দার চলে গেল। গাড়ির শব্দ শুনে মালী জেগে উঠেছে আর গেট খুলে দিয়ে দেখেছে, মন্দার চলে গেল। ওরা তো রোজই দেখছে। তবে তুমি কেন কিছুই দেখতে পেলে না?

সন্দীপ—কার হুকুমে রোজ গাড়ি ক'রে মন্দারকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়?

এষা—আমার হুকুমে।

সন্দীপ—গাড়িটা তোমার নয়।

এষা—তোমারও নয়। চারুশীলা রায়ের গাড়ি।

সন্দীপ—মন্দার তো একটা জানোয়ার।

এষা—খাঁটি জানোয়ার, মেকি মানুষ নয়।

সন্দীপ—তুমি এবাড়ি ছেড়ে এখনি চলে যাও।

এষা—এটা চারুশীলা রায়ের বাড়ি, তোমার বাড়ি নয়। তোমার কথায় আমি এবাড়ি ছাড়তে পারি না।

সন্দীপ—আমি তোমাকে ডিভোর্স করব।

এষা—খুব ভাল কথা।

সন্দীপ—তা হলে চলে যাও।

এষা—না, আদালত যতদিন না ডিভোর্স মঞ্জুর করে, ততদিন আমি এখান থেকে নড়ব না।

সন্দীপ—কেন?

এষা—আমার ইচ্ছা। কিংবা দশ লাখ টাকা দাও, এখুনি চলে যাচ্ছি। নইলে যাব না।

সন্দীপ—আমি তা হলে.....।

সন্দীপের দুই চোখের তারা, দুটো ঠাণ্ডা অঙ্গারের কুচি, হঠাৎ দপ ক'রে জ্বলে ওঠে। —আমি তা হলে তোমাকে গুলি করে মেরে ফেলব।

এষা—পৃথ্বিরাজ তা হলে এক গুলিতে তোমার খুলি উড়িয়ে দেব। সুরঞ্জন এক গুলিতে তোমার বুক ফুটো করে দেবে। আর অনিমেষ তোমার....।

সন্দীপ—ওরা তো চোরাই সোনা কারবারি, যত স্মাগলার!

এষা—তুমিও তো ফরেন কারেন্সির স্মাগলার।

না, আর এষার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে না সন্দীপ। একবার করিডরের ওদিকে, একবার সেদিকে তাকিয়ে নিয়ে শুধু ছটফট করে। যেন মাথা ঠুকবার জন্যে এই পৃথিবীর সীমার বাইরে কোনও পাষাণের কাছে ছুটে যেতে চাইছে। থরথর করে কাঁপতে থাকে সন্দীপ, যেন প্রচণ্ড বেগের একটা ঝড় এসে সন্দীপকে ঠেলছে। চেঁচিয়ে ওঠে সন্দীপ।—আমি তাহলে আত্মহত্যা করব।

হেসে ফেলে এষা। ইস্পাতের বাঁশির শিসের মত কী তীব্র সেই হাসির শব্দ। —তোমার কী আত্মা আছে যে, আত্মহত্যা করবে? বাজে কথা, মিথ্যে কথা, বাচ্চা ছেলের আবদেরে বায়নার কথা। ভাল চাও তো চুপ ক'রে চলে যাও, আর ভাল ছেলেটির মত চুপ করে ঘুমিয়ে থাকো।

সেই মুহূর্তে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে, আর খোলা দরজা আবার বন্ধ করে দেয় এষা। ব্যস্ত হয়ে নয়, শব্দ করে নয়, দরজার কপাট দুটো যেন স্টেজের দু'পাশের দুটি কাটা পর্দার মত আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে জুড়ে গেল।

কিন্তু বেশ শব্দ করে বেজে ওঠে সন্দীপের ঘরের টেবিলের একটা দেরাজ। দৌড়ে এসে ক্ষিপ্র হাতের এক টানে দেরাজ খুলে রিভলভার হাতে তুলে নিয়েছে সন্দীপ।

চেয়ারের উপর একেবারে ধীর-স্থির পাথুরে মূর্তির মত বসে থাকে সন্দীপ। মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। ছটফট করে উঠে দাঁড়ায়, লাথি মেরে চেয়ারটাকে সরিয়ে দেয়। শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। আবার ছটফট করে, সরে গিয়ে রঙিন ভেলভেট দিয়ে মোড়া ছোট সোফাটার কাঁধ এক হাতে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু চোখের সামনে ওই মিররের ঝকঝকে চেহারাটাকে সহ্য করতে পারে না। ঘর ছেড়ে আবার করিডরের উপর এসে দাঁড়ায়। না, এখানে নয়। রঙিন মোজেয়িকের উপর যেন এক খল হাসির পালিশ চিকচিক করছে। না, এখানে নয়। সরে যায় সন্দীপ। দৌড়ে গিয়ে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে যায়। সন্দীপের দু'পায়ের দুপদাপ শব্দটা মত্ত হয়ে তেতলার করিডর ও বারান্দার উপর ঘুরতে থাকে।

ছোট একটা ঘর, সে ঘরের দরজাটা তালাবন্ধ নয়, একটা কপাট খুলেই রয়েছে। ঘরের ভিতরে অন্ধকার। ঠিক জায়গা। বুকটাকে চোখে পড়বে না, কিছুই চোখে পড়বে না, তাই ছটফটও করতে হবে না।

কিন্তু ঘরের ভিতরে ঢুকেই ভয় পেয়ে শিউরে ওঠে সন্দীপের বুক। অন্ধকারের মধ্যে মেঝের উপর ছোট একটা বিছানাকে মাড়িয়ে ফেলেছে সন্দীপ। ভুতুড়ে ঘর, কী ভয়ানক ভুতুড়ে ঘর। এটা তো সেই আকাশ-ঘর। মানুষ নেই তবু তার বিছানাটা পড়ে আছে। শূন্য ঘরের ভিতরে এই জমাট অন্ধকারটা যেন একটা জমাট অভিশাপ, এখনই চেঁচিয়ে একটা বিকট হাসি হেসে কথা বলে ফেলবে, তুমি এখানে কেন?

এক লাফে ঘরের দরজা পার হয়ে আর ছুটে গিয়ে, বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তে এসে হাঁপ ছাড়ে সন্দীপ।

চুপ করে, একটা নিশ্চল আবছায়ার মত দাঁড়িয়ে থাকে সন্দীপ। সত্যিই তো, হত্যা করবার জন্যে এতক্ষণ ধরে এত ছুটোছুটি করে আত্মাটাকে খোঁজা হল। কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না। মিথ্যে হয়রান হতে হল।

অলস হাত, ক্লান্ত হাতের কব্জিতেও কোনও জোর নেই। কপাল বেয়ে ঠাণ্ডা ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। রক্তের শিরাগুলির ভিতরে হিম ঢুকছে। রিভলবারটা বোধহয় ঝুপ করে হাত থেকে খসে পড়বে।

আকাশে তারা নেই। গাছের মাথা নড়ে না, বাতাসের সাড়া নেই। তবু একটা ঘুম-ভাঙা কাক যেন ডাক ছাড়তে না পেরে কঁকিয়ে উঠছে।

না, আর এখানে মিছিমিছি দাঁড়িয়ে থাকবার কোনও অর্থ হয় না। রাত বোধহয় শেষ হয়ে এসেছে। সিঁড়ি ধরে এক পা দু'পা করে আস্তে আস্তে নেমে যায় সন্দীপ। নিজের ঘরে ঢুকে দেরাজের ভিতরে রিভলভার রেখে দিয়ে, রঙিন ভেলভেটে মোড়া সোফার উপর বসে পড়ে আর অবশ শরীরটাকে এলিয়ে দেয়।

ষোল

মিষ্টি হাসির শব্দটা সেতারের তারের ঝঙ্কারের মত বেজে উঠেছে। সন্দীপের ঘুম ভেঙে যায়, চোখ মেলে তাকায়। দেখতে পায় সন্দীপ, এষা হাসছে। এষার গায়ের ফিরোজা-নীল-শিফনের শাড়িটাও হাসছে। এষার হাতে একটা খবরের কাগজ দুলছে।

সন্দীপের কাঁধ ছুঁয়ে আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে, হাসির সেতার আবার বেজে ওঠে। —আমি ভাবছি, এরকম একটি সুন্দর মানুষের এত স্টাউট একটি শরীরের ভিতরে কি হাড়গোড় নেই? থাকলে এরকম করে কেন্নোর মত গুটিয়ে পাকিয়ে পড়ে থাকতে পারবে কেন?

সন্দীপ—কী হল?

এষা—ওঠো, সোজা হয়ে বসো।

হেসে ফেলে সন্দীপ। ঘাড় টান করে আর সোজা হয়ে বসে।

এষা—সোফা থেকে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়াও।

গা-মোড়া দিয়ে আর হাই তুলে নিয়ে হাসতে থাকে সন্দীপ। সোফা থেকে নেমে দাঁড়ায়।

এষা—ছি ছি, কী কাণ্ড! বাচ্চা ছেলেও ভুল করে এভাবে একটা সোফার উপর শুয়ে থাকতে আর ঘুমিয়ে পড়তে পারে না।

সন্দীপ—ক'টা বেজেছে?

এষা—ন'টা বেজে গিয়েছে।

সন্দীপ—এঃ! তাহলে তো সত্যিই বেশ নিবিড় একটা ঘুম ঘুমিয়ে নিয়েছি।

এষা—আমি জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি রাতটার উপর রাগ করে সকাল নটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে নিলে?

সন্দীপ—না না, রাতটার উপর রাগ করব কেন! এমন কিছু অগ্নিকাণ্ড করেনি তো রাতটা যে, রাগ করতে হবে।

এষা—সত্যি করে বলো।

সন্দীপ—তুমি সত্যি করে বলো তো, তুমি কি বালুচরের উপর রাগ করে শিফন পরেছ?

এষার হাসিটা ভোরের পাখির কাকলির মত বেজে ওঠে —না, তা কেন হবে?

সন্দীপ—তবে? এরকম কথার কি কোনও মানে হয়?

এষা—তবে আর আমাকে অবাক করে দিও না। মুখ ধুয়ে নাও, চা খেয়ে নাও। সাজ-টাজ সেরে তৈরি হয়ে নাও। ফটিককে বলে দিয়েছি, এখনি তোমার ব্রেকফাস্ট এখানে দিয়ে যাবে।

ঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়েই থেমে যায় এষা। মুখ ফিরিয়ে কথা বলে। —আজ আমি এবেলা কোথাও যাব না। তুমিই আজ ক্যাডিলাক নিয়ে বের হবে।

সন্দীপ—কেন বলো তো?

এষা—আমি ফোনে মুরারীবাবুকে বলে দিয়েছি, তুমি আজ ব্যাঙ্কে যাবে না।

সন্দীপ—কেন বলো তো?

এষা—বলছি, তুমি তৈরি হয়ে এসো তো। আমি ড্রইংরুমে আছি।

সন্দীপের তৈরি হতে আর ব্রেকফাস্ট সেরে নিতে আধঘণ্টার বেশি সময় লাগে না। এরই মধ্যে নীচতলার ড্রইংরুম থেকে দু'বার রিং করেছে এষা—একটু তাড়াতাড়ি করো, আর দেরি করো না।

সিগারেট ধরাবার জন্যে দেশলাইটা হাতে তুলে নিতেই আবার শুনতে হয়, রিং করছে এষা। —তোমার চেক-বইটা সঙ্গে নিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি করো।

চলতে চলতে সিগারেট ধরিয়ে আর তাড়াতাড়ি হেঁটে নীচতলার ড্রইংরুমের কাছে সন্দীপ

এসে পৌঁছতেই এষা বলে—তাড়াতাড়ি করতে বলছি এই কারণে, যে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করবার সময় হল আটটা থেকে দশটা।

সন্দীপ—কে ভদ্রলোক?

এষা—বলছি। চলো গাড়িতে বসো, তারপর সবই বুঝিয়ে বলছি।

ক্যাডিলাকের চকচকে বডি হাসছে। দেখতে পেয়ে, সন্দীপের খুশি চোখের তারা দুটো যেন হেসে হেসে চিকচিক করে। গাড়িতে উঠে দু'হাতে স্টিয়ারিং হুইলটাকে জড়িয়ে ধরে। সন্দীপ—বলো।

এষা। —শোনো।

হাতের খবর-কাগজটাকে সন্দীপের চোখের সামনে স্টিয়ারিং হুইলটারই উপর রেখে দিয়ে, লাল পেন্সিলের একটা দাগ সন্দীপকে দেখিয়ে দেয় এষা। —বিজ্ঞাপনটা একবার পড়ে নাও।

চার লাইনের একটা বিজ্ঞাপন। রিচি রোডের একটা নতুন বাড়ির একটা ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া নিতে হলে ল্যাণ্ডলর্ডের সঙ্গে সকাল আটটা থেকে দশটার মধ্যে দেখা করে কথা বলতে হবে।

সন্দীপ—পড়লাম।

এষা—তুমি এখনই গিয়ে এই ফ্ল্যাট ভাড়া করে ফেলো। যদি সেলামি চায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে সেলামির টাকাও দিয়ে দিও।

সন্দীপ—কিন্তু কেন বলো তো? কিসের জন্যে?

এষা—মন্দারের জন্যে। হাওড়ার একটা এঁদো গলিতে মন্দারকে আর পড়ে থাকতে দেওয়া চলে না, উচিতও নয়।

সন্দীপ—তাই বলো।

গাড়ি স্টার্ট করে সন্দীপ। এষা বলে—তারপর মন্দারের জন্যে কিছু ফার্ণিচার কিনে ফেলবে, একটা লোকের দরকার আর কম্ফোর্টের জন্য যা দরকার। দেখবে, ফার্ণিচার সবই যেন বার্মা সেগুনের হয়।

সন্দীপ—আচ্ছা।

চলতে থাকে গাড়ি। এষা বলে—মন্দারের জন্যে একটা রেনকোট কিনবে। দেখবে, জিনিসটা দেখতে ভাল হয়, আর মজবুতও হয়।

সন্দীপ—আচ্ছা।

অনেকদিন পর আবার সন্দীপের জীবনে ছুটোছুটি করবার একটা তাগিদ এসেছে, একেবারে নতুন তাগিদ। কিন্তু ক্যাডিলাক কেন যেন ঠিক সেই স্পিড আর নিতে পারছে না, যদিও খুব স্পিড নিয়ে সন্দীপের হাতের এক একটা সিগারেট তিন-চার টানেই জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

এষার ইচ্ছা আর অনুরোধের তিনটি কাজ শেষ করতে তিন ঘন্টাও সময় লাগে না। তারপর? এষা তো আর কোথাও যাবার কথা বলেনি। তারপর কোথায় যাবে সন্দীপ?

বেলা একটা বেজেছে। নতুন-কেনা রেনকোটের মস্ত বড় প্যাকেটটা হাতে নিয়ে চৌরঙ্গীর একটি শোভাময় বিরাট বিপণির বাইরের সিঁড়ির শেষ ধাপের উপর দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে সন্দীপ, কোথায় যাওয়া যায়? যাওয়ার মত জায়গা এই পৃথিবীতে কোথাও নেই, এ তো হতে পারে না।

কিন্তু কোথায়?

হ্যাঁ আছে। আবার বিপণির ভিতরে গিয়ে বিপণির সার্ভিস কাউন্টারের টেলিফোনে কথা বলে সন্দীপ। —বিনায়ক, এক মিনিটও কালক্ষেপ না করে আর ট্যাক্সি নিয়ে চলে এসো। আমার বর্তমান ঠিকানা, কলরডো বারের যে কোনও একটি কেবিন। বিয়ারের সঙ্গে হুইস্কি মিশিয়ে একটু তর্পণ করব। চলে এসো।

এরপর আর কতটুকুই বা সময় লাগে? মাত্র আধ ঘন্টা। কলরডোর দোতলার বারের একটি কেবিনের নিভৃতে সন্দীপ আর বিনায়কের উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দে দুই গেলাসের হুইস্কি মেশানো বিয়ারের বুদ্বুদ শিউরে শিউরে ফেটে যেতে থাকে।

বিনায়ক বলেন—না, এই জীবনটা কিছুই নাঃ, একটা ইঃ উঃ আর আঃ।

সন্দীপ—এটা তো সিনিকের কথা। যে মানুষ জীবনে ভাল কিছুই পেল না, ভাল কিছুই দেখতেও পেল না, আর তার সব আশা বিফল হয়ে গেল, এরকম একটা পরাজিত মানুষের কথা।

বিনায়ক—আমিও তো তাই বলছি। আমি বলছি, এটা হল ব্যাঙ্কের মুরারীবাবুর জীবনের কথা। স্ত্রী মৃত্যুর পর খুব আশা করেছিলেন যে, সুন্দরী ছোট শালীটিকে বিয়ে করবেন। কিন্তু আশা বিফলে গেল। ছোট শালী জনৈক ছোকটা ডাক্তারকে বিয়ে করে ফেলেছ। মুরারীবাবু এখন বলছেন, তীর্থে যাব, সংসারকে বিষ বলে মনে হচ্ছে।

সন্দীপ—আমি বলতে চাই, জীবনে সে-ই হল সত্যিকারের জয়ী মানুষ, যার ভালবাসা, জয়ী হয়েছে।

বিনায়ক — ওঃ, কী সুন্দর কথা। তুমি সত্যিই কত চমৎকার করে খুব অল্প কথায় বড় বড় কঠিন আইডিয়ার কথা কত সহজে বলে দিতে পার! আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে শুনি। ....কিন্তু এ যে তোমার নিজেরই কথা বলে ফেলেছ সন্দীপ। তুমি কি মনে করো যে, আমি সেটা বুঝতে পারি না? আমি কি এতই বোকা একটা ইন্টেলেকচুয়াল?

সন্দীপ—আমার বলতে কোনও কুণ্ঠা নেই, এষার ভালবাসা আমাকে সত্যিই আশ্চর্য করে দিয়েছে।

বিনায়ক—আশ্চর্য হবারই কথা। আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, সে ভালবাসার তুলনা নেই। তবু যদি তুলনা করে বলতে হয়, তবে ..না, সোনার মত ভালবাসা বলব না,কারণ সোনাতেও দাগ পড়ে। বলব, হীরের মত ভালবাসা, কোনও দাগ পড়ে না।

সন্দীপ—আমি তোমার মত অত কাব্যি করে বলতে পারি না। তবু বলব, এষার মনের ভিতরে যেন একটা আলো আছে।

বিনায়ক—আছে নিশ্চয়।

সন্দীপ—সেকেলে মেয়েরা যেমন পিদিম জেলে স্বামীর মঙ্গলের ব্রত করত, এষার ভালবাসাও তেমনই ....যাকে বলে....।

বিনায়ক—যাকে বলে, সেকেলে পিদিমের আলোর মত জ্বলছে আর স্বামীর মঙ্গলকামনা করছে।

সন্দীপ—হাঁা, ব্যাপারটা তাই দাঁড়িয়েছে বিনায়ক। আমি বুঝতেই পারিনি যে, এষার প্রাণের

ভিতরটা একেবারে....যাকে বলে..একটা স্বামী জ্ঞান স্বামী-ধ্যান সেকেলে মেয়ে।

বিনায়ক—তুমি যে আগে কিছু বুঝতে পারনি, সেটা আমি খুবই বুঝতে পেরেছিলাম। ভাবতে গিয়ে খুব রাগ হত যে, তুমি কেন কিছুই বুঝতে পারছ না?

সন্দীপ—যাক, সব ভাল যার শেষ ভাল।

বিনায়ক—আমি বলব, যার শুরু ভাল আর শেষও ভাল, তারই ভাল সবচেয়ে ভাল ভাল।

হেসে হেসে যেন লুটিয়ে পড়তে চায় সন্দীপ—তুমি একটা সিরিয়স চিন্তার কথাকেও কত সহজে হাসিয়ে দিতে পার, বিনায়ক। অদ্ভুত!

বিনায়ক—তুমি হাসতে পারো, কিন্তু আমি সিরিয়স কথা সিরিয়স করেই বলছি। সফল ভালবাসার মানুষ আমি আমার জীবনে একটিই দেখেছি।

সন্দীপ—কে সেই ভাগ্যবান?

বিনায়ক—তুমি। মনে করো না যে, আমি তোমাকে একটু তোয়াজ করে কথাটা বলছি। দেশি এপিক-এ-কচ-দেবযানীর ভালবাসার গল্প আছে। গ্রেট অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ড ভালবাসা। কিন্তু সে ভালবাসার দশা শেষে কী দাঁড়াল? বিয়ে তো হলই না, তার উপর একদিন দু'জন দুজনকে গালমন্দ করে আর অভিশাপ দিয়ে দু'দিকে সরে গেল। কিন্তু এখানে কী দেখছি? একজন আর একজনকে চিরকালের মত আপন করে নিয়েও ভাবছে, কী করে আরও আপন করা যায়।

সন্দীপ—সত্যি বিনায়ক, আমার বলতে লজ্জা নেই, এষা আমাকে এক মিনিটের জন্যেই কাছছাড়া করতে চায় না।

বিনায়ক—বুঝেছি বুঝেছি, তুমি এখন নোঙর-বাঁধা জাহাজ, মহাসমুদ্রে ভেসে বেড়াবার সাধ্যি এখন নেই।

সন্দীপ—আরও একটা কথা শুনলে বোধ হয় তুমি লজ্জা পেয়ে আশ্চর্য হবে। আমারও আর বাইরে বেড়াতে কিংবা বের-টের হতে ইচ্ছে করে না।

বিনায়ক—এই রকমই হয়, সন্দীপ। ভালবাসা এমনই একটি বন্ধন। যা-ই হোক, বাইরে কোথাও না যাও, অন্তত এখানে মাঝে মাঝে এসো। আর, বিনায়ক হালদার নামক বন্ধুটিকে মনে রেখো, একেবারে ভুলে যেও না।

সন্দীপ—না না, ভুলে যাব কেন, আসব, মাঝে মাঝে এখানেই আসব। আজ তবে এখন...।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় সন্দীপ।

বিনায়কও উঠে দাঁড়ায়। —হ্যাঁ, এখন বেদব্যাস বিশ্রাম করুক। আমরা চলি। কিন্তু....।

সন্দীপ—কী? কিছু বলতে চাও?

বিনায়ক—হ্যাঁ, তোমার হাতে এটা কী বস্তু?

সন্দীপ—মন্দারের জন্য একটা রেনকোট কিনলাম।

বিনায়ক—অ্যাঁ? কী বললে? কার জন্যে কিনলে।

সন্দীপ—মন্দার, মন্দারের জন্যে।

বিনায়ক—ওঃ ওঃ, কী আর বলি! কিছুই বলা যায় না। অনির্বচনীয়!

এসো পথিক

আজ এই মানুষটিকে দেখে কেউ কি বিশ্বাস করতে পারবে যে, ইনিই এককালে আট ক্রোশ পথ একটানা হেঁটে পার করে দিতে পারতেন? বললেও কি কেউ বিশ্বাস করবে যে, ইনিই একদিন রাগ করে রেল-লাইনের একটা লেভেল ক্রসিং-এর তালাবন্ধ বেড়া-গেট এক লাথিতে ভেঙে খুলে দিয়েছিলেন। গেট বন্ধ করে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল গেটম্যান; এদিকে আষাঢ় মাসের ঝিঁঝিডাকা সন্ধ্যাটাও ঘনিয়ে উঠেছিল। দুটো গরুর গাড়িতে বসে বর ও বরযাত্রী আট-দশটি মানুষ ছটফট করছিল। এখনও যদি গেট না খোলে, যদি ক্রসিং পার হয়ে ওদিকের পথে উঠতে না পারা যায়, তবে শীতলদীঘির নন্দীবাড়িতে ওরা পৌঁছবে কখন? মাঝ রাতে? না শেষ রাতে? কিন্তু বিয়ের শেষ লগ্ন যে রাত ন'টার মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে। আর, এই একুশে আষাঢ়ই তো এই মাসের মধ্যে শুভবিবাহের শেষ দিন।

কিন্তু খুব বেশিক্ষণ ছটফট করেনি বর ও বরযাত্রীর দল। দুই গরুর গাড়িকেও আর বেশিক্ষণ হতাশ হয়ে থমকে থাকতে হয়নি। হঠাৎ চমকে উঠেছিল আর খুশির চোখে হেসেও ফেলেছিল বর ও বরযাত্রীর দল। কে এক ভদ্রলোক, বছর ত্রিশ বয়স হবে, সাইকেল থেকে নামলেন। বন্ধ গেটের দিকে কটমট করে তাকালেন। তারপর গেটের গায়ে একটা লাথি মারলেন। তালাটা খুলে গিয়ে পাঁচ হাত দূরে ছিটকে পড়ে গেল। সেই গেট পার হয়ে, আবার ওদিকের গেটের কাছে গিয়ে ঠিক এইরকমই একটা কাণ্ড করলেন সেই ভদ্রলোক, গেটের গায়ে নিদারুণ এক পদাঘাত। ঝিঁঝিডাকা আষাঢ়-সন্ধ্যার অন্ধকার আরও বেশি ঘনিয়ে ওঠবার আগেই তরতর করে খোলা গেট পার হয়ে চলে গেল দুই গরুর গাড়ি, আর বরযাত্রীর খুশির হল্লা। তখন নয়, সেদিনও নয়, অনেকদিন পরে জানতে পেরেছিল শিমূলডাঙ্গার বর ও বরযাত্রীর দল, আর শীতলদীঘির নন্দীবাড়ি, ওই ভদ্রলোকের নাম লোকনাথ রায়, রায়গঞ্জ হাই স্কুলের মাস্টার। কিন্তু ভদ্রলোকের পা দুটো কি লোহার পা?

সেই লোকনাথ রায়, সেদিন যাঁর বয়স ছিল তিরিশ, আজ তিনি পঞ্চান্ন বছর বয়সের একটি অনড় ও অক্ষম দেহ। দুই পায়ে বাত, একটি পঙ্গু মানুষ। মালিশের তেল খেয়ে খেয়ে পা দুটো যেমন চকচকে, তেমনি কালো হয়ে গিয়েছে।

লোকনাথ রায়ের জীবনে আজ আর সেই রায়গঞ্জ নেই, সেই মাস্টারিও নেই। পঁচিশ বছর আগের সেই জীবনের ঠিকানা যেন ক্ষয়ে মুছে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। রায়গঞ্জ, রায়গঞ্জের সেই বাড়ি, রায়গঞ্জের ধানক্ষেত আর কেশে ঘাসের সেই জংলা মাঠ, তাঁর কাছে একটা স্মৃতি মাত্র, একটা পুরনো স্বপ্নের ছায়াও বলা যায়।

কলকাতার ভবানীপুরের গলিতে ছোট একটি দোতলা বাড়ি। সাত নম্বর হরি দত্ত লেন। নীচে দুটো, উপরে একটি ঘর। উপরে সেই ঘরের কোণে একটা খাটের উপর শুয়ে পড়ে থাকা এই জীবন যে একটা আধা-কবর, কিংবা জীবন্ত সমাধির মত একটা জীবন, সেটা খুবই বোঝেন লোকনাথ রায়। কারণ, বুঝিয়ে দেবার মত একটা প্রাণের নিঃশ্বাস এখনও তাঁর এই জিরজিরে বুকের ভিতরে ছটফট করে। অনেকক্ষণ শুয়ে থাকবার পর বুকের ভিতরে সেই নিঃশ্বাস যখন একটু বেশি ছটফট করে, তখন হাতের উপর ভর দিয়ে ও কোমরটাকে শক্ত করে থিতিয়ে দিয়ে শরীরের ওপর অর্ধেকটাকে কোনওমতে খাড়া করে খাটেরই উপর বসিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন, মাঝে মাঝে

বসিয়ে রাখতে পারেনও। তারপর হাত দিয়ে পা দুটো টিপে টিপে কী যেন বুঝতে চেষ্টা করেন।

কী ছাই আর বুঝবেন। শুধু মনে পড়ে যায়, এই তো সেই দুটি পা। রায়গঞ্জ থেকে সদরের কাছারিতে বেলা দশটার সময় পৌঁছতে হলে সূর্য ওঠবার আগে শেষরাতে রওনা হওয়া উচিত। লোকনাথ রায় কিন্তু সূর্য ওঠবার পর, জবাকুসুম সঙ্কাশ ক'রে স্নান সেরে নিয়ে, পাঁচটি পাকা কলা দিয়ে দুধ-মুড়ি খেয়ে নিয়ে তারপর রওনা হতেন।

পথে যেতে বুড়ো বুড়ো কত বটের ছায়া পাওয়া যেত। কিন্তু কোনও ছায়াতে এক মিনিটের জন্যেও জিরোতেন না লোকনাথ রায়, জিরোবার কোনও দরকার আছে বলে বোধ করতেন না। কারণ, সেই দুই পায়ে কোনও ক্লান্তি কিংবা অবসাদ ছিল না। মরা নদীটার কাছে পৌঁছতেই দেখতে পাওয়া যেত, শিবমন্দিরের সামনের চাতালের উপর শুয়ে পড়ে আর গা এলিয়ে দিয়ে পথহাঁটা ক্লান্তির আরাম সেরে নিচ্ছে হাটে যাবার হাটুরে মানুষগুলিও; চোখে পড়তেই হেসে ফেলতেন লোকনাথ রায়, আর ডাক দিয়ে বলতেন, কী ব্যাপার হে কৈলাসচন্দ্র, এক ক্রোশ পথ হেঁটেই পা ধরে গেল নাকি?

সেই কৈলাস আজ এখন কোথায়? সে কি এখন সেই শিবমন্দিরের চাতালের উপর গা এলিয়ে দিয়ে দুই পা দুলিয়ে দুলিয়ে পথচলা ক্লান্তির আরাম সেরে নিচ্ছে? শিবমন্দিরটাও কি আছে? বুনো কাঁটালতায় মন্দিরের সারা গা ছেয়ে গিয়েছিল, আর মস্ত বড় ফাটলের ভিতরে শুকনো ঘাস-পাতা দিয়ে বাসা বেঁধেছিল দুটো বড় বড় পাখি। লোকে বলত, ওরা ধনঞ্জয় পাখি। ওদের মধ্যে পুরুষ পাখিটা একেবারেই অন্ধ, সেটা বাসাতেই থাকে। শুধু মাদি পাখিটা উড়ে উড়ে বাইরে যায় আর আসে।

দুই হাতে কিছুক্ষণ দুই পা টিপে নেবার পর, আর ছোট জানালা দিয়ে পাশের পড়ো বাড়িটার আঙিনাতে জংলা সূর্যমুখীর ঝোপের উপর নতুন ফড়িং-এর ফূর্তির খেলা দেখতে দেখতে পঙ্গু লোকনাথ রায়ের দুই চোখ যখন অদ্ভুত হয়ে চকচক করে ওঠে, তখন একবার ভিতরের দরজার দিকে তাকান। শিবমন্দিরের গায়ের ফাটলের বাসিন্দা সেই পুরুষ পাখিটা, সেই অন্ধ ধনঞ্জয়টা চোখে দেখতে পেত না। কিন্তু লোকনাথ রায়ের চোখে তো এখনও দৃষ্টি আছে। জীবন্ত দৃষ্টি। সেই চোখে দেখবার আশাটাও তো জীবন্ত। তাই আশা করেন, তাই দরজার দিকে মাঝে মাঝে তাকাতেও ইচ্ছা করেন। আর মনে হয়, হ্যাঁ, এইবার বোধ হয় নীরজা আসবে। কোনও কাজ না থাকুক, দরকার না থাকুক, তবু এঘরে একবার আসবার কথা কি ভুলেই যাবে নীরজা?

ঘুম ভেঙেছে ভোর পাঁচটায়; তারপর পুরো দুটি ঘণ্টা ধরে লোকনাথ রায়ের এই পঙ্গু শরীরটা যে কাণ্ড করেছে, সে কাণ্ড চোখে দেখতে পেলে দেহতত্ত্বের বড় ডাক্তার চমকে উঠবেন, আর কসরতের পাকা মানুষেরও দুই চোখ কুঁচকিয়ে করুণ হয়ে যাবে। খাটের পাশের দেয়ালের গায়ে লোহার গজালের সঙ্গে বাঁধা একটা দড়ি ছাদের ওইদিকের একটা ছোট্ট ঘরের ভাঙা দরজা পর্যন্ত চলে গিয়েছে। পায়ের জোর তো প্রায় মিথ্যে হয়েই গিয়েছে, কিন্তু হাতের জোর আছে। রামদয়ালবাবু বলেন—লোকনাথের হাত দুটো কিন্তু এখনও লোহার হাত। প্রায় ঝুলে ঝুলে, হাতেরই জোরে পঙ্গু শরীরটাকে গড়িয়ে সরিয়ে ও টেনে-টেনে ছাদের ওই জায়গাটাতে ওই ঘরের ভিতরে নিয়ে যেতে পারেন লোকনাথ রায়। তারপর ফিরে এসে যদি দেখতে পান যে, ঘরের ভিতরে ও দরজার কাছেই রাখা বালতিটাতে জল আছে; তার মানে, বুড়ি ঝি সময়মত মনে করে আর কষ্ট করে জল

রেখে দিয়ে গিয়েছে, তবে ঘটি দিয়ে সেই জল মাথাতে ও গায়ে ঢালেন। আকাশে সূর্য না থাকুক, তবু বিড় বিড় করে জবাকুসুম সঙ্কাশ করেন। আর ভিজে কাপড় ছেড়ে শুকনো কাপড়ও পরেন। কারণ, হাতে জোর আছে।

কে রেখে দিয়ে গিয়েছে এই জল? নীরজা? না; নীরজা নয়। নীরজা যদি এঘরে জল রেখে দিয়ে যেত, তবে তো বুঝতেই পারতেন লোকনাথ। নীরজার হাতের চুড়ির শব্দটা টুং টাং করে বুঝিয়ে দিত, আর কেউ নয়; সেই নীরজা এসেছে। যন্ত্রণাটা যত দুঃসহ হোক না কেন, চোখ দুটো বন্ধ হয়ে থাকলেই বা কি? আর ঘরে আলো না থাকলেও কিবা আসে যায়? নীরজার চুড়ির শব্দ শুনতে পাবে না লোকনাথ, এমন ব্যাপার হতেই পারে না। কিন্তু না, নীরজা আসে না। বুড়ি ঝি, যার নাম রাজুর মা, সে-ই জল রেখে যায়। ভাতের থালাও পৌঁছে দিয়ে যায় রাজুর মা।

আজ থেকে দশ বছর আগে, যেদিন রায়গঞ্জ ছেড়ে কলকাতার ভবানীপুরের এই বাড়িতে এসে ঠাঁই নিয়েছিলেন লোকনাথ রায়, সেই দিন এরা সবাই তো, বলতে গেলে, নিতান্ত ছেলেমানুষ আর শিশু ছিল। বড় ছেলে সুকুর বয়স তখন পনেরো বছর, বড় মেয়ে টুনির তেরো বছর, আর ছোট মেয়ে টুসির এগারো।

রায়গঞ্জ হাই স্কুলের মাস্টারি, জীবনটা খুব সুখের না হলেও কম আনন্দের জীবন ছিল না। মাস্টারির মাইনের পঞ্চাশটা টাকা খুব বড় সম্বল নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু সেজন্য খুব দুশ্চিন্তা করবার তেমন কোনও ভয় ছিল না। বাড়িটা তো নিজেরই বাড়ি। তিন পুরুষ বাস করেছে যে বাড়িতে সেই বাড়ির ঠাকুর ঘরের ভিতের গায়ে সাদা পাথরের ফলকে কালো অক্ষরে তিন পুরুষ আগের শ্রী রঘুনাথ রায় দাসস্য একটি আশার নিবেদনও সংস্কৃত ভাষার শ্লোকে লেখা আছে, যার অর্থ: পণ্ডিতেরা বলেন লক্ষ্মী চঞ্চলা; কিন্তু নারায়ণের ইচ্ছায় এই গৃহে লক্ষ্মী অচলা হয়ে বিরাজ করবেন।

বাড়িটা খুব বড় নয়; কিন্তু বাগানটা আর পুকুরটা বেশ বড়। কলকাতার পাইকার এসে সেই বাগানের জামরুল আর বাতাবি লেবু গো-গাড়িতে বোঝাই করে দেবীনগরে রেল স্টেশনে নিয়ে যেত আর কলকাতায় চালান দিত। ওই নন্দীগ্রামের জমিদার বাড়ির এক বিয়েতে কাজের জন্য লোকনাথ রায়ের সেই পুকুর থেকে একবার একুশটি আধমনী চিতল তোলা হয়েছিল। কাজেই সেই লোকনাথ রায় যখন জগদ্ধাত্রী পূজোতে অনেক ঘটা করতেন, আর গাঁয়ের সব মানুষকে কাঁচা-পাকা দুরকমের প্রসাদ পেট ভরে খাওয়াতেন, তখন তাঁকে টাকা ধার করতে হত না। ধানজমির আয়; আর ওই বাগান ও পুকুরের আয়ের টাকায় জগদ্ধাত্রী পূজোর ঘটা খুব ভাল করেই কেটে যেত।

হ্যাঁ, সেসব দিনের ছবি যেন কুয়াশার সঙ্গে উবে যাওয়া একটা জীবনের ছবি। দশ বছর আগে যেদিন নিজেই শখ করে স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলে ঘরে ফিরলেন লোকনাথ স্যার, সেদিন হঠাৎ বুঝতে পেরে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, কোমরে যেন অদ্ভুত রকমের একটা ব্যথা সিরসির করে কাঁপছে। একদিন দু'দিন তারপর তিন মাসের মধ্যেও যখন ব্যথাটা একটুও সারল না, বরং আরও কনকনে হয়ে কষ্ট দিতে শুরু করল, তখন ওই নীরজাই খুব রাগ করে করে একদিন ঝগড়া করেছিল—না, তোমার আপত্তির কোনও কথা আর শুনব না।

হেসেছিলেন লোকনাথ রায়—কোনও আপত্তি করছি না। তবু আর একটা-দুটো মাস একটু ধৈর্য ধরে...।

নীরজা—না: যেতে হবে, যেতে হবে, যেতে হবে।

তার মানে, কলকাতায় যেতে হবে। কলকাতায় গিয়ে ভাল ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে। নিতাই কবরেজের ওই ছাই পাঁচন আর বেশি খেলে, আর ওই কালো ঘি আর বেশি মাখলে পঙ্গু হয়ে যেতে হবে। যাদবপুরের সুধাদি বার বার অনেক চিঠিতে বেশ কড়া করে অনেক কথা লিখেছেন। কলকাতায় এসে ভাল ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করালে এক মাসের মধ্যেই ওই রোগ একেবারে সেরে যাবে। কিন্তু দুটো পয়সার মায়া করে যদি তোমরা গাঁয়ের কবরেজি খপ্পড়ে পড়ে থাকতে চাও, তবে তাই করো। আমি আর তোমাদের ভালর জন্যে চিন্তা করতে পারব না।

রায়গঞ্জ থেকে চলে আসবার দিন নিতাই কবরেজও দেখা করতে এসেছিল। কেঁদে ফেলেছিল নিতাই কবিরাজ। আজও নিতাই কবিরাজের মুখের সেই চেহারাটা লোকনাথ রায়ের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। নিতাই কবিরাজের আদুড় গায়ের উপর একটা ময়লা উড়ুনি; সেই উড়ুনির খুঁট দিয়ে চোখ মুছছে নিতাই কবিরাজ—আমি আবারও বলছি, কলকাতায় যাবেন না রায়মশাই। আমি আবার বলছি, আর বড় জোর তিনটে চারটে মাস লাগবে, আমার ওষুধেই আপনার কোমর-ব্যথা চিরকালের মত সেরে যাবে।

কলকাতায় এসে থাকবার ও চিকিৎসা করবার জন্যে কিছু টাকা চাই। ত্রিশ বিঘে ধানজমি বেচে দিয়ে কিছু টাকা যোগাড় করা হয়েও গেল। কিন্তু তখন কি কল্পনা করতে পেরেছিলেন লোকনাথ যে, সব ধান জমি বেচে দেবার দরকার হবে? পারেননি। সব ধানজমি বিকিয়ে যাবার পরও কি সামান্য একটু সন্দেহ করতে পেরেছিলেন যে, পুকুর আর বাগানটাকেও বেচে দিতে হবে? পারেননি। ভবানীপুরের সেই বাসাবাড়িতে একটানা দশটা বছর পার হয়ে যাবার পর একদিন ভয়ানক কর্কশস্বরের একটা ধমকের ভাষা চিৎকার করে বুঝিয়ে দিল এই রোগটা ঠিক পায়ের বাত ব্যথার রোগ নয়, এটা তাঁর ভাগ্যেরই একটা ক্ষয় রোগ। সাত মাসের বাড়িভাড়া বাকি, তাই বাড়িওয়ালা চৌধুরীবাবুর দারোয়ান এসে চিৎকার করছে—হয় এখনি বকেয়া ভাড়ার সব টাকা মিটিয়ে দাও, নয় এখনই বাড়ি ছেড়ে চলে যাও।

সেদিন মনে মনে একটা হিসাবও করেছিলেন লোকনাথ। কলকাতার এই দশ বছরের জীবনটাকে পুষতে গিয়ে মোট ছাপ্পান্ন হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে শুধু এক তারক ডাক্তারকেই প্রায় সাতটি হাজার টাকা দিতে হয়েছে। খুব ভাল ও খুব নাম করা ডাক্তার তারক সেন, নীরজার ওই সুধাদির কেমন যেন দেবর হয়। আর, সুধাদির দেবর বলেই, কুটুম্বিতার একটা সম্পর্ক আছে বলেই, তা ছাড়া সুধাদি একটু বলে দিয়েছিলেন বলেই, তারক ডাক্তার নাকি তাঁর প্রাপ্য ফি-এর মাত্র অর্ধেকটুকু নিয়েছেন।

আরও একটা হিসাব করেছিলেন লোকনাথ। রায়গঞ্জে থাকতে তিন বছরে নিতাই কবিরাজের পাঁচন কিনতে খরচ পড়েছিল একুশ টাকা। ঠিক কথা, কোমরের কনকনে ব্যথাটা সারাতে পারেনি নিতাই কবিরাজের সেই একুশ টাকার পাঁচন; কিন্তু তবু তো সেদিন এই দুই পায়েরই জোরে পথ হেঁটেছিলেন লোকনাথ। স্টেশন যাবার পথে শিবমন্দির পর্যন্ত হেঁটেই চলেছিলেন, তারপর গো-গাড়িতে উঠেছিলেন। আজ কোথায় গেল সেই পাঁচন খাওয়া শরীরের দুটি খোঁড়া পায়ের সেই জোর? দেখলে আজ নিতাই কবিরাজ বোধ হয় ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলবে, এ কী হল রায় মশাই? আপনার পা দুটো যে শুকিয়ে সরু লাঠির মত হয়ে গিয়েছে।

সুধাদি বলেন, গাঁয়ের কবরেজ আপনাকে কবেই মেরে ফেলত রায় মশাই। আজও যে আপনি বেঁচে আছেন, সেটা আমাদের তারক ডাক্তারের চিকিৎসার দয়া বলে জানবেন।

—হতে পারে। বলতে গিয়ে সুধাদির সামনে সেদিন যেমন হেসেছিলেন লোকনাথ, তেমনই আরও অনেকবার হেসেছেন, যখনই মনে পড়েছে, তখনই।

কিন্তু তারপরে? চৌধুরীবাবুর দারোয়ানের ধমক স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছে, আর কলকাতায় থাকা চলবে না। থাকতে হলে আরও টাকা চাই। কোথা থেকে আসবে টাকা? এখন তো সেই রায়গঞ্জে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। বাড়িটা অবশ্য এখনও আছে; কিন্তু সেই বাড়ির অন্তঃসারহীন শূন্যতার মধ্যে বেঁচে থাকার অনেক অসুবিধেও আছে। তবু চৌধুরীবাবুর দারোয়ানের তো সেখানে গিয়ে ধমক দেবার আর চিৎকার করবার ক্ষমতা নেই।

হঠাৎ সুধাদি এসে, আর সত্যিই যেন চিৎকার করে হেসে উঠলেন—ওরে নীরু, তোদের রায়গঞ্জের বাড়িটার ভিতের গায়ে সংস্কৃত ভাষায় কী যেন লেখা আছে? লক্ষ্মী নাকি সে বাড়িতে চিরকাল অচলা হয়ে বাস করবেন?

নীরজা হাসে—হ্যাঁ, বড়দি। সত্যি তাই লেখা আছে।

সুধাদি আরও হাসেন—কী চমৎকার সত্যি কথাই না লেখা আছে। যাক সেসব কথা, এখন আসল কথা হল, বাড়িটাকে শিগগির বেচে দেবার ব্যবস্থা কর।

নীরজা—আমি তো তাই ভাবছি •

লোকনাথের দুই চোখে যেন একটা জ্বলজ্বলে আভা দপ্ করে চমকে ওঠে। প্রদীপে তেল নেই, পলতেও পুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছে, তবু যেন একটা জ্বালা জ্বলছে, সেই রকম বাতির মত চোখ। লোকনাথ বলেন—না, তা হয় না। কখ্খনও না।

সুধাদি—কেন?

লোকনাথ—আমি জানি, আমাকে দেশের বাড়িতে ফিরে যেতেই হবে।

সুধাদি হাসেন—আপনি তা হলে স্বপ্নই দেখছেন।

হাসতে হাসতে চলে গেলেন সুধাদি।

দুই

ঠাট্টা করে কথাটা বলেছেন সুধাদি, কথাটা যেন ধারালো ছুরির মত লোকনাথের বুকের ভিতরে একটা খোঁচাও দিয়েছে। কিন্তু বলতে ইচ্ছে করে, আমি স্বপ্ন দেখছি না, সুধাদি।

রায়গঞ্জের রামদয়ালবাবুকে কবেই চিঠি দিয়ে জানিয়ে রেখেছে• . হ্যাঁ, বাড়ির নীচের তলার বারান্দা আর তিনটে ঘর জেলা বোর্ডের প্রাইমারি স্কুলের জন্য ভাড়া দিতে পারি। আর, পূবদিকের দালানে যদি আলুর হিমঘর করবার জন্য দাসবাবু ভাড়া নিতে চান তবে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আর কোনও ঘর নয়। আমি শিগগির দেশে ফিরব।

হ্যাঁ, রায়গঞ্জের সেই মরা নদী, বোশেখ মাসে যাঁর পাঁক শুকিয়ে খটখট হয়ে যায়, আর আষাঢ়ের প্রথম জলের ঢল গড়িয়ে যেতেই তার উপর ডিঙি ভাসিয়ে মালোপাড়ার ছেলের দল কাছিম শিকার করে বেড়ায়, তারই ভাঙা ঘাটের চাতালের উপর বসে আজও কি গান গায় না শীতলদীঘির বিশু বৈরাগী? উপরতলার দক্ষিণদিকের ঘরের জানালার কাছে রাতের বেলায় দাঁড়ালে আর

মাঠের দিকে তাকালে সেই ভোলা ভাগ্নের মত দুঃসাহসী ছেলের গা'ও ছমছম করত ; মাঠের উপর আলেয়া দৌড়চ্ছে। রামদয়ালবাবুর বাড়ির বকুলবাগান নিশ্চয় এখনও আছে; সেই বকুলের বাতাস মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে একেবারে হর্ষনগর পর্যন্ত চলে যায়। রাজেশ্বর ঘোষের পুকুর কিনারার সেই জবা গাছ, বারোমাস যার গায়ে শুধু পাতা ধরে আর ঝরে, তার একটি ডালে শুধু একটি ফুল ফুটবে ঠিক সেদিন, যেদিন শ্যামাপূজা। সেই বছর একবার যে রাতে হৃদয় সরকারের বাড়িতে অষ্টপ্রহর নাম-কীর্তন চলছিল, ফাল্গুন পূর্ণিমার সেই রাতে স্কুলবাড়ির খেলার মাঠের পাশে সেই কদম গাছের কাছে কী দেখেছিলেন রতনমণির মা? চুপটি করে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে, তার গলায় বনফুলের মালা। কিন্তু শুধু একটি মুহূর্ত মাত্র, আর তাকে দেখা গেল না। যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল।

বুঝতে পারেন, লোকনাথ, একা তিনি ছাড়া এ বাড়ির আর কেউ দেশে ফিরে যেতে রাজি নয়। ভবানীপুরের এই বাসাবাড়ির জীবনটারও স্বপ্ন আছে, আর সে যে কী চমৎকার একটি রঙিন স্বপ্ন, তা জানেন লোকনাথ। ধানজমি-বেচা, পুকুর-বেচা আর বাগানবেচা ছাপ্পান্ন হাজার টাকার মাত্র সাত হাজার টাকা তারক ডাক্তারের চিকিৎসার দয়া কিনতে খরচ হয়েছে, কিন্তু বাকি ঊনপঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে, এই দশ বছর ধরে সত্যিই একটা স্বপ্ন কেনবার চেষ্টা হয়েছে। সুখে থাকবার স্বপ্ন। কলকাতার জীবনের যত চমৎকার ব্যস্ততার সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে আর রঙিন হয়ে থাকবার স্বপ্ন। সাজে আর আসবাবে এই বাসাবাড়ির একটা ঘর যেন সুধাদির যাদবপুরের বাড়ির নীচতলার ছোট ঘরটার একেবারে ট্রু-কপি। সোফাতে ঠিক সেইরকম চকচকে কালো পালিশ আর লাল ভেলভেটের গদি। জানালাতে লেসের পর্দার রঙও ঠিক তেমনই আসমানি নীল। এবাড়ির ঘরে যে রেডিও বাজে, তার গড়ন আর চেহারাও ঠিক সুধাদির বাড়ির জাপানী রেডিওটার মত, যেন ছোট্ট একটি খেলনা জাহাজ নীল সাগরের জলের উপর ভেসে রয়েছে। খাঁটি বর্মা সেগুনের একটা আলমারি এবাড়ির এই ঘরেও আছে। সুধাদি বলেছিলেন, তিনি ওই আলমারি পার্ক স্ট্রীটের যে দোকান থেকে কিনেছিলেন, তার নাম নিউ মডার্ন ফার্নিশার্স; নীরজাও একদিন সেই নিউ মডার্ন ফার্নিশার্সের দোকানে গিয়ে আর বেছে-বেছে ঠিক ওই রকমের এই আলমারি কিনেছিলেন। ছেলে আর দুই মেয়েও নীরজার সঙ্গে গিয়েছিল। এই আলমারিতে যে সব খেলনা আর পুতুল সাজিয়ে রাখা হয়েছে, সে সব সুধাদির বাড়ির ওই আলমারির পুতুল আর খেলনাগুলির মত। রঙিন ঝিনুক দিয়ে তৈরি একজোড়া ফুলদান, কাশ্মীরের আখরোট কাঠের পাখি, স্পঞ্জের কুকুরছানা, সাদা পাথরের হাত-কাটা ভেনাস আর প্লাস্টিকের আঙুর-থোকা। সুধাদির বাড়ির ড্রেসিং টেবিলের মত এবাড়ির এই ঘরের ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটার বর্ডারও পল-তোলা।

এই দশ বছরের মধ্যে রায়গঞ্জের কোনও আলো-বাতাসের ছোঁয়া অবশ্য লোকনাথের এই জীবনের গায়ে লাগেনি, কিন্তু রায়গঞ্জের রামদয়ালবাবুর সঙ্গে অনেকবার কথা বলবার সুযোগ হয়েছে। রামদয়ালবাবু তাঁর কারবারের দরকারে মাঝে-মাঝে যখন কলকাতায় আসেন, তখন পুরনো বন্ধু লোকনাথের সঙ্গে একবার দেখা করে যান। যেদিন আসেন রামদয়াল সেদিন লোকনাথের প্রাণে যেন রায়গঞ্জের আলো-বাতাসের উৎসব মেতে ওঠে। কত গল্প, কত হাসি, পুরনো ঘটনার কথা নিয়ে কত তর্ক আর মন কষাকষি। রামদয়াল বলেন, না তুমি খুব ভুল বুঝেছ লোকনাথ, আসল দোষ গগন সামন্তের নয়, ওর দ্বিতীয় পক্ষের মানুষটির। লোকনাথ বলেন, আমি জোর

করে বলতে পারি, আর একশোবার বলব, গগন সামন্ত মিথ্যে সন্দেহের বাতিকে বউটার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল বলেই...। রামদয়াল চেঁচিয়ে ওঠেন—ভুল ভুল, তুমি বুঝতে খুব ভুল করেছ।

রায়গঞ্জের জীবনের প্রায় কুড়ি বছর আগের একটি জীর্ণ-পুরাতন ঘটনার কথা, কিন্তু দুই বন্ধুর বাদ-প্রতিবাদের শব্দ শুনে মনে হবে, যেন আজই এই কিছুক্ষণ আগে গগন সামন্তের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বাপের বাড়ি চলে গেল। গগন সামন্তের উপর লোকনাথের মনের সব রাগ বিরক্তি আর তিক্ততা যেন টাটকা ক্ষতের জ্বালার মত কটকট করে জ্বলে উঠেছে।

রামদয়াল বলেন—কিন্তু তুমি দেশে ফিরছ কবে?

লোকনাথ—এই এবার; আর তো এখানে পড়ে থাকবার কোনও মানে হয় না। কোনও দরকারও নেই।

রামদয়াল—হ্যাঁ, যে জন্যে এখানে আসা, সেটাই যখন একটা...।

লোকনাথ—কী?

রামদয়াল—একটা প্রবঞ্চনা হয়ে গেল: তখন আর এখানে পড়ে থাকার কোনও মানে হয় না।

লোকনাথ—ঠিকই বলেছ রাম; আজ বুঝতে পারছি, সেদিন নিতাই কেন কেঁদেছিল।

রামদয়াল—সে প্রবঞ্চনা তো আছেই, কিন্তু তার চেয়ে বড় প্রবঞ্চনা বোধ হয় তোমার এই...। হঠাৎ কথা থামিয়ে দিয়ে রামদয়াল বলেন—ওই ঘরে এখন এত জোরে রেডিও বাজাচ্ছে কারা?

লোকনাথ হাসেন—যারা বাজায় তারাই বাজাচ্ছে। ওরা আছে ওদের স্বপ্ন নিয়ে।

রামদয়াল—তোমার জমিবেচা বাগানবেচা আর পুকুরবেচা টাকার সবই কি তা হলে...।

লোকনাথ—না সব নয়। বেশির ভাগ, ওদের এই স্বপ্নের দরকারে খরচ হয়েছে।

রামদয়াল এইবার ভ্রূকুটি করে কথা বলেন—খুবই অদ্ভুত কাণ্ড বলতে হবে। এরকমটি কখনও দেখিনি। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না যে, এরকমটি কখনও হতে পারে। আমার সন্দেহ হয় লোকনাথ, তুমি যদি আরও দু'এক বছর চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় থাক, তবে তোমার এই বাড়ির ওই ঘরে হয়ত একটা টেলিভিশন সেট এসে পড়বে।

লোকনাথ—অন্তত একটা রেফ্রিজারেটর যে আসবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রায়ই শুনছি, ওরা বলাবলি করছে, আর যাদবপুরের সুধাদিও এসে অভিযোগ করছেন, একটা রেফ্রিজারেটর না হলে আর মানায় না। যাই হোক, আমি কিন্তু তৈরি হয়েই আছি রামদয়াল। আর এখানে নয়। এবার সন্ধ্যাবেলা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাব।

প্রবঞ্চনার চেহারা দেখে ভয় পেয়েছেন লোকনাথ। সুধাদির গাড়ির হর্নের শব্দ শুনলেই তাঁর বুকটাও ভয় পেয়ে দুরদুর করে। তারক ডাক্তারের নাম শুনলেই চোখের তারা দুটো যেন সাদা হয়ে যায়। কিন্তু তবু এই দশ বছরের মধ্যে দশবার প্রতিজ্ঞা করে ও শেষ পর্যন্ত রায়গঞ্জের আলো-বাতাসের কাছে চলে যেতে পারেননি লোকনাথ। কারণ, ওই একটি বাধা। নীরজার দুই চোখের অদ্ভুত সেই ছলছল সজলতা। নীরজার সেই চোখের জল বড় বড় ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়ে না: চোখের কোণে লেগেই থাকে আর চিকচিক করে। মনে হয়, নীরজার বুকের ভিতরে একটা স্তব্ধ দীর্ঘশ্বাস যেন পাথর হয়ে আটকে রয়েছে; তাই কোনও কথা বলতে পারে না নীরজা; শুধু লোকনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে দিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকেন লোকনাথ, যেন তাঁর প্রতিজ্ঞার সব কঠোরতা এক মুহূর্তে বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গেল। নীরজাকে অসুখী করে. নীরজার দুই চোখ জলে ভরিয়ে দিয়ে রায়গঞ্জে ফিরে গেলেই বা কী হবে? লোকনাথ কী সুখী হতে পারবেন? অসম্ভব।

কিন্তু মাঝরাতে আবার ঘুম ভেঙে যায়। যেন হঠাৎ একটা ঢিল কোথা থেকে ছুটে এসে আচমকা তাঁর বুকের পাঁজরের উপর আছাড় খেয়ে পড়েছে। স্বপ্নের মধ্যে রামদয়ালবাবুর সঙ্গে তর্কাতর্কি করেছেন লোকনাথ; তাই ঘুম ভেঙে গিয়েছে। রামদয়াল বলছেন, তুমি এত জোরগলায় আমাকে যে কথাটা শুনিয়ে দিয়েছিলে, সে কথা তবে নিতান্ত একটা কথার কথা।

—কী বলেছি তোমাকে?

—বলেছ, যদি রাধানাথের ভোগের একবাটি খিচুড়ি রোজ জুটে যায়, তবে তোমার বাকি জীবনটা সুখেই কেটে যাবে। তোমার কাছে নাকি রাধানাথের প্রসাদের চেয়ে বড় সুখ কিছু নেই।

—হ্যাঁ, তা তো বলেছি।

—ঠিক বিশ্বাস করে বলেছ কি?

—নিশ্চয়, ওই বিশ্বাসটুকু ছাড়া আমার জীবনে এখন তো আর কোনও সম্বলও নেই। ওই বিশ্বাসের জোরেই তো বেঁচে আছি।

—তবে তোমার নীরজার চোখের জলের মায়া ছেড়ে দিয়ে রাধানাথের কাছে আজও চলে আসতে পারছ না কেন? কাজের বেলায় তো দেখা যাচ্ছে যে, তোমার কাছে নীরজার মুখের হাসিই তোমার সবচেয়ে বড় সুখ।

নিতান্তই তর্ক, তাও আবার স্বপ্নের মধ্যে। তবু বুকের ভিতরটা এমন করে চমকে আর ছটফটিয়ে ওঠে কেন? ঘুম ভেঙে যায় কেন? রোগে ভুগে ভুগে, আর নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে মনটা খুব দুর্বল হয়ে গিয়েছে, তাই কি? কিন্তু খুব সত্যি কথা, দেবতার কাছে মনের ফাঁকি লুকিয়ে রাখা যায় না। রায়গঞ্জের মন্দিরের রাধানাথ, যাঁর শাসনে দামোদরের পাগল বেনোজল রায়গঞ্জের ক্ষেতের ধান ভাসিয়ে ও পচিয়ে দিতে পারে না, তাঁর কাছে তো কিছুই অজানা নেই। কলকাতায় আসবার পর, এই দশ বছরের মধ্যে নীরজা বোধ হয় একটি দিনও ঠিক লোকনাথের কথা মনে করে লোকনাথের কাছে এসে বসেননি। হ্যাঁ, কতবার এসেছেন বসেছেন ও কত কথা বলে চলে গিয়েছেন নীরজা; কিন্তু সবই তো এই কলকাতার জীবনের যত দরকারের কথা। সুধাদি বলে দিয়েছেন, কোন দোকানে শাড়ি কেনা উচিত; এ সপ্তাহে কোন ছবি দেখা উচিত; আর মেয়েদের বাড়িতে পড়াবার জন্য একজন গ্র্যাজুয়েট মাস্টার চাই। দরকারের কথা বলে দিয়েই ব্যস্ত হয়ে চলে যান নীরজা। ব্যস্ত না হয়ে আর ওভাবে চলে না গেলেই বা চলে কী করে? নীরজাকেই তো দরকারের সব দাবি সামলাতে আর মেটাতে হয়।

তিন

পাশের ঘরে বসে কথা বলছেন যাদবপুরের সুধাদি: যে সংসারের পুরুষ মানুষ পঙ্গু আর অকর্মণ্য, সে সংসারে মেয়ে-মানুষকেই সাহস করে সব দায় নিতে হয়। তোর জামাইবাবুর বন্ধু প্রফেসর শশীবাবু বলেন; এ যুগ আর আগামী যুগটাও মেয়ের যুগ, বউদি। সে কথা তো বাড়িয়ে বলা কথা

নয়। এই ধর আমারই কথা; আমি যদি নিজের হাতে না চালাতুম, তবে কি তোর ওই জামাইবাবুর বিদ্যে-বুদ্ধিতে তিনতলা বাড়ি আর দুটো গাড়ি করা সম্ভব হত।

ঠিক কথা; নীরজাও সেসব কথা জানেন, ছোট মামার বড় মেয়ে সুধাদি, তাঁর স্বামী কমলবাবু কখনও কলেজে পড়েননি, কোনও পাস-টাস করেননি। কোনওদিন কোথাও বড়-রকমের কোনও চাকরি-বাকরি করেছেন, এ কথাও কখনও শোনা যায়নি। সুধাদির শ্বশুরবাড়ি বলতে মানকরে যে বাড়িটার অনেক কথা অনেকদিন আগেই শুনেছিলেন নীরজা, সে বাড়িকে কোনও বড়লোকের বাড়ি বলে মনে করাই যায় না; বরং বেশ খারাপ রকমের একটা গরিব বাড়ি বলে মনে করতে হয়। টিনের চালা আর মাটির দেয়াল, সেই বাড়ির কর্তা তার বড় ছেলের বিয়ে দেবার এক মাস পরে সাপের কামড়ে মারা গেলেন। পুরো পাঁচটি বছর মানকরে ওই বাড়িতে দুঃখের নরক যন্ত্রণা সহ্য করবার পর, সুধাদি একদিন নিজের বুদ্ধিতে কমলবাবুকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। হ্যাঁ, সুধাদিই কমলবাবুকে নিয়ে এসেছিলেন। কমলবাবু তো ওই টিনের চালার বাড়ি থেকে নড়তেও চাননি। সুধাদির অনেক অনুরোধ, অনেক সাধাসাধি বকাবকি ও ধমক-ধামকেও কোনও ফল হয়নি। তারপর, সুধাদি যখন একাই হাঁটা দিলেন, তখন কমলবাবুও পিছু পিছু চলে এলেন।

সকলেই জানেন, নীরজাও জানে, সুধাদিই কমলবাবুকে শিখিয়ে বুঝিয়ে আর বুদ্ধি দিয়ে মানুষ করে তুলেছেন। কমলবাবুর সঙ্গে ইনকাম ট্যাক্সের সাত-আটজন অফিসারের অন্তরঙ্গ মেলামেশা আছে। অন্তত সাত-আটটা সরকারি হেড অফিসে কমলবাবুর যাতায়াত আছে। নিজে কোনও অফিসের কেষ্ট-বিষ্টু অবিশ্যি হতে পারেননি কমলবাবু, কিন্তু তাতে কোনও অসুবিধে হয়নি। তাঁর ভাগ্যটা সাত-আট বছরের মধ্যেই সুখের তিনতলায় উঠে গিয়েছে। আজ আর শুধু একা সুধাদির হাতের আঙুলে নয়, তাঁর তিন মেয়ের আঙুলেও হীরের আংটি ঝিকঝিক করে হাসে। সুধাদি, এই সেদিনও হাসতে হাসতে বলেছেন—ভদ্রলোককে একবার জিজ্ঞেস কর তো নীরু, কে প্রথম বুদ্ধিটা দিয়েছিল? কে প্রথম বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, দু'চারজন বড় মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়, বড়-বড় অফিসে যাওয়া-আসা করতে হয়। তা না হ'লে ভাগ্যি খোলে না। মানুষটাকে শুধু এইটুকু বোঝাতেই আমার ছ'মাস লেগেছিল, এমনই অদ্ভুত নিরেট মানুষ।

সুধাদির ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যটার তুলনা করতে গিয়ে অনেকবার মনে মনে কেঁদেও ফেলেছেন নীরজা। আবার ফিরে যেতে হবে সেই রায়গঞ্জে, যেখানে সন্ধ্যা হতেই শেয়াল ডাকে, আর কালাচাঁদের বউ বিশ্রী একটা ছেঁড়া-ময়লা কাপড় পরে যখন-তখন এসে ছাইভস্ম যত বাজে ব্যাপারের খবর শোনায়। ভট্টাচার্যের মেয়ের নাকি এরই মধ্যে সাত মাস; অঘ্রাণে যার বিয়ে, বোশেখ না পেরোতেই তার সাত মাস হয় কী করে? হয় হিসেবের ভুল, না হয় মেয়েরই ভুল। দেখা যাক, আর দু'টো মাস পার হলেই যা বোঝবার তা ঠিকই বোঝা যাবে।

এমন এক রায়গঞ্জের জন্য কেন যে ছটফট করছেন ভদ্রলোক, সত্যি কিছু বুঝে উঠতে পারেন না নীরজা। আজ না হয় কাল, সুকুর একটা চাকরি হয়েই যাবে। তিনবার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েও পাস করতে পারেনি সুকু; দোষই বটে। আজ ওর বয়স পঁচিশ বছর; কিন্তু সেজন্যে তো একেবারে হতাশ হয়ে পড়বার কোনও মানে হয় না। সুকু গাইতে পারে ভাল। সুধাদি বলেছেন, আজ না হয় কাল, না হয় আরও কিছুদিন লাগবে, সুকু কি কোনও ছবিতে কাজ করবার সুযোগ পেয়ে যাবে না? আর একটু নাম করে নিতেও পারবে না? এই তো, এই পাড়াতেই থাকে ছেলেটি,

যার নাম মনু, কেরানি বলাইবাবুর ছেলে। মনুও লেখাপড়া তেমন কিছু শেখেনি। কিন্তু কে না জানে, সিনেমা-ছবির মনু এখন মাসে অন্তত তিন-চার হাজার টাকা রোজগার করে।

লোকনাথ কোনও খোঁজ খবরের ধার ধারেন না, তাই জানেন না যে, টুনি আর টুসি, দুই মেয়ের নামও বদলে গিয়েছে। টুনির নাম এখন আর প্রতিভা নয়, মিতালী রায়। টুসির নামও এখন আর বিজয়া নয়, পিয়ালী রায়। কলকাতার জীবনে যে নাম মানায়, সেইরকমই দুটি নাম নিয়েছে ওরা। সুধাদি বলেন—খুব সুন্দর নাম হয়েছে। আর একটা বছর পার হলেই মিতুর বি-এ পরীক্ষা। আর পিয়ার হবে ক্লাস টেন। কিন্তু ছেলে আর মেয়েদের জীবনের জন্য বাপের মনে সত্যিই কোনও দরদ আছে কি? দরদ থাকলে কি রায়গঞ্জে ফিরে যাবার কথা কেউ বলতে পারে? কী আশ্চর্য, দশবছর ধরে চোখের সামনে এত স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েও ভবানীপুরের এই বাসাবাড়ির জন্য সামান্য একটু মায়া করতে পারলেন না ভদ্রলোক। সত্যিই খাঁটি রায়গঞ্জের মানুষ বটে। দেখে কতবার আশ্চর্য হয়েছেন, নীরজা, মিতু আর পিয়ার খোঁপার দিকে কী বিশ্রী রকমের চোখ ক'রে তাকিয়ে দেখছেন ভদ্রলোক। উনি চান, ওরা যেন কালাচাঁদের বউ-এর মত বিঁড়ে খোঁপা বেঁধে চিরটাকাল রায়গঞ্জের টুনি আর টুসি হয়েই থাকে।

সুকু, মিতু আর পিয়া অবশ্য নীরজাকে অনেকবার বলেছে—তুমি মিছিমিছি কেন এত আশ্চর্য হও, আর কেনই বা বিরক্ত হও, মা? বাবাকে বাবার যুগে পড়ে থাকতে দাও। বাবার কোনও কথা কানে তোলবার দরকার নেই।

নীরজা হাসেন—কিন্তু তোমাদের বাবা যে রায়গঞ্জের বাড়ি বিক্রি করে দিতে রাজি নন।

সুকু চেঁচিয়ে ওঠে—তার মানে?

নীরজা—তার মানে, কলকাতার এই বাসা ভেঙে দিয়ে সবাইকে আবার সেই রায়গঞ্জে ফিরে যেতে হবে।

মিতু হেসে ফেলে—সবাইকে যেতে হবে কেন? আমরা যে এখানেই থাকব, সেকথা কি বাবা জানেন না?

যেন সৌভাগ্যের একটা নতুন সঙ্কেতের দিকে তাকিয়ে আর হাস্যময়ী হয়ে কথা বলছে মিতু। নীরজাও সেটা বুঝতে পারেন। তাই নীরজাও হাসেন—না, জানেন না।

পিয়া হাসে—বাবা কি শোনেননি যে, আমি নাচের স্কুলে ভর্তি হয়েছি।

নীরজা—না, শোনেননি।

দাদা আর দুই বোন এইবার একসঙ্গে হাসে—বাবাকে কিছুই বলবার দরকার নেই।

সুধাদির গাড়ির হর্নের শব্দ শোনা যায়। সুকু বলে—বড়মাসি অনেকদিন পরে দয়া করলেন।

নীরজা—হ্যাঁ, কে জানে, কিসের জন্য এতদিন আসতে পারেননি।

মিতু বলে—বড়মাসিকে আমাদের ঘরের আসল কথাটা এখনই বলবার দরকার নেই।

পিয়া বলে—হ্যাঁ, বড় মাসির সব ভাল, কিন্তু কেমন-যেন একটু...।

মিতু হাসে—বলেই ফেল না।

পিয়া—বড় মাসির ধারণা, উনি অনেক বড়, আর আমরা কিছুই নই।

মিতু—হ্যাঁ, বড় মাসির ধারণা, শেষ পর্যন্ত আমাদের সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবে; আর আমাদের আবার বনের পাখি হয়ে রায়গঞ্জের বনে ফিরে যেতে হবে।

নীরজা হাসেন—চুপ কর।

—দার্জিলিং-এ একটা বাড়ি কিনতে হল, নীরু। তাই এই একটা মাস বড় ব্যস্ত ছিলাম। বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন সুধাদি।

আস্তে একটা হাঁপ ছেড়ে দিয়ে সুধাদি একটু অদ্ভুত ভাবে সবারই মুখের দিকে তাকান।—কী খবর? রায়মশাই কী বলেন?

নীরজা—যা বলবার, তা তো সেদিনই বলে দিয়েছেন।

সুধাদি—বললেই হল! রায়গঞ্জের বাড়ি বিক্রি না করে এখন উপায় কী?

বলতে বলতে উঠে গিয়ে দোতলায় গেলেন সুধাদি।—আয় নীরু, আর একবার বলে দেখি।

লোকনাথের ঘরে ঢুকেই বেশ চমৎকার ঝংকারের মত স্বরে গলা বাজিয়ে প্রশ্ন করেন সুধাদি—আপনার রায়গঞ্জের ওই অদ্ভুত লক্ষ্মীমন্ত বাড়িটাকে কি আপনি সত্যিই বিক্রি করবেন না বলে ঠিক করেছেন?

লোকনাথ—আমি এ বিষয়ে আপনাদের কাছে আর কোনও কথা বলতেই চাই না; মাপ করবেন। দুই চোখ বন্ধ ক'রে পাশবালিশটাকে জড়িয়ে ধরেন লোকনাথ; আর কোনও কথা বলেন না।

এই নীরবতাও যেন একটা কঠোর অবজ্ঞা, সুধাদির পাউডার-মাখা মুখের অদ্ভুত হাসিটাকে এখনি এখান থেকে সরে যেতে বলছে। ঠিক কথা সুধাদির এই পাউডার-মাখা মুখের হাসিটাকে শুধু ভয় করেন না লোকনাথ, ঘেন্নাও করেন। ষাট বছর বয়স হয়েছে, তবু কী আশ্চর্য। তার চেয়ে বেশি আশ্চর্য, নীরজাও মুখে পাউডার মাখবার অভ্যাস করেছে। দেখতে পেয়ে সেদিন কী লজ্জাই না পেয়েছিলেন লোকনাথ, যেদিন নীরজা একটা ঝলমলে রঙিন শাড়ি পরে আর মুখে পাউডার মেখে ওইখানে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, আর রামদয়ালের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ভুলতে পারেন না লোকনাথ, রামদয়ালের দুই চোখ যেন কাঁটার খোঁচা লেগে কুঁচকে গিয়েছিল। রামদয়াল তো কখনও স্বপ্নেও বিশ্বাস করতে পারে না যে, রায়গঞ্জের লোকনাথ রায়ের স্ত্রী, যার বয়স হয়েছে পঁয়তাল্লিশ, সে মানুষ কখনও মুখে পাউডার আর রঙিন সাজে সাজতে পারে। সুধাদি সত্যিই একটি অঘটনঘটন পটীয়সী মায়া।

দুই চোখ বন্ধ করে আর বালিস আঁকড়ে এইভাবে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকতেই বুঝতে পারেন লোকনাথ, সুধাদি চলে গেলেন। সুতরাং, এই ঘরের ভিতরে এখন একমাত্র যে-জন বসে আছে, সে হল লোকনাথ রায়ের জীবনের সেই নীরজা, যার চোখে জল দেখলে লোকনাথ রায়ের বুকের ভিতরে সব নিঃশ্বাসের বাতাস যেন ব্যথা পেয়ে উতলা হয়ে যায়। নীরজা যদি অসুখী হয়, তবে লোকনাথ রায় কিসের স্বামী? কিসের পুরুষ? পঁচিশ বছর আগের রাজপুরের একটি উৎসবের ঘরে, বাসরজাগা বাতির আলোতে যে মেয়ের ভিজে চোখ দেখতে পেয়ে লোকনাথের বুকটা ব্যথায় ভরে গিয়েছিল, সেই বিশ বছর বয়সের মেয়েটিই তো আজকের ওই নীরজা। সেই ভিজে চোখ চুমো দিয়ে মুছে দিতে গিয়ে যে লোনা স্বাদের মায়া লেগেছিল আর ভিজে গিয়েছিল লোকনাথেরই ঠোঁট, সেই স্বাদ যে আজও বুকের ভিতরে তিনি অনুভব করতে পারেন। যে বাতের রোগে পঙ্গু হয়েছে তাঁর দুই পা, সেই রোগের উপর তাঁর রাগের কারণ শুধু এই নয় যে, রোগটা বড়ই কষ্ট দেয়; নীরজা হতাশ হয়, নীরজার জীবনটা অসুখী হয়ে গিয়েছে, নীরজার চোখে দুশ্চিন্তার

কষ্ট মাঝে মাঝে ছলছল করে কাঁপে, তাই রোগটার উপর এত বেশি রাগ হয়।

ঘরে এখন আর কেউ নেই, শুধু একা নীরজা। কিন্তু চোখ খুলে নীরজার দিকে একবার তাকিয়ে দেখতেও পারছেন না লোকনাথ। ভয় হয়, সেই ভয়। নীরজার চোখে সেই করুণ অভিমান বোধহয় আবার ছলছল করে কাঁপছে। সেদিন রাজপুরের সেই উৎসবের রাতে সেই বাসর ঘরে নীরজা স্বীকার করেনি, আজও নিশ্চয় স্বীকার করবে না, এই অভিমান হল ভাগ্যেরই সঙ্গে একটা অভিযোগের নীরব বিলাপ। ত্রিশ বছর বয়সের স্বামী, গাঁয়ের স্কুলের মাস্টার সেদিন চন্দনের লবঙ্গ-ছাপ দিয়ে আঁকা একটি সুন্দর ছবির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, সত্যি করে বলবে, তোমার চোখে জল কেন? আমাকে খুবই গরিব ঘরের মানুষ বলে মনে হয়েছে, তাই কি? নীরজা বলেছিল—না। কথা শুনে সেদিনের লোকনাথের ত্রিশ বছর বয়সের বুকটা খুশিতে ভরে গিয়েছিল, চোখ দুটো হেসে উঠেছিল। বলেছিলেন লোকনাথ—তবে আমিও বলছি, আমি প্রাণ থাকতে তোমাকে অসুখী হতে দেব না।

তাই ভয়, চোখ মেলে তাকালেই হয়ত দেখতে পাবেন লোকনাথ, নীরজার দুই চোখ ভিজে গিয়েছে। সেই ভিজে চোখ যেন হতাশায় অপলক হয়ে দুঃসহ একটা দুর্ভাগ্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

—নীরু। ডাক দিয়ে মুখ ফেরান আর চোখ খোলেন লোকনাথ।

—নীরু তুমি দুঃখ করো না। বিশ্বাস করো, এখন রায়গঞ্জে ফিরে গেলে আমাদের সবারই ভাল হবে।

চমকে ওঠেন লোকনাথ। কই? নীরজার চোখে তো কোনও করুণ অভিযোগ নেই, অভিমানও নেই। ভিজে চোখ নয়, শুকনো খটখটে চোখ। বরং মনে হয় নীরজার এই চোখ খুবই উজ্জ্বল হয়ে হাসছে।

লোকনাথের মুখের দিকে নয়, দরজার পর্দাটাকে এক হাতে আঁকড়ে ধরে নীরজা তাকিয়ে আছে নীচের তলার ঘরের কোনও একটা চমৎকার বস্তু কিংবা ঘটনার দিকে; তা না হলে অমন করে উজ্জ্বল হয়ে হাসবে কেন নীরজার দুই চোখ?

—কী হল? কী দেখছ নীরু? লোকনাথের মুখের ভিতরটা যেন দুঃসহ একটা বিস্ময় সহ্য করতে গিয়ে মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু নীরজা কি শুনতে পেল সেই মুখরতার কোনও শব্দ?

না, নীরজার কানে বোধ হয় লোকনাথের এত ব্যস্ত জিজ্ঞাসার কোনও শব্দ পৌঁছয়নি। জবাব দেন না নীরজা। চুপ করে শুধু দাঁড়িয়ে থাকেন আর নীচের ঘরের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকেন। সে হাসির সঙ্গেও অদ্ভুত একটা মায়াময় তৃপ্তির ঝংকার। এমন ক'রে, এত অদ্ভুত সুরেলা শব্দ করে নীরজাকে কোনওদিন হাসতে দেখেনি লোকনাথ।

রায়গঞ্জে কতবার দেখেছেন লোকনাথ, রাতের আকাশের মেঘ হঠাৎ কেটে গিয়ে যখন আধখানা চাঁদের আভা ফুটে উঠত, তখন রাধানাথের মন্দিরের কাছে কদম গাছের মাথায় ঘুমন্ত কাক উসখুস ক'রে জেগে উঠে ডাক শুরু করে দিত। কী অদ্ভুত খুশির ডাক, যেন ভোর হয়েছে।

নীরজার প্রাণটাও কি তেমনি কোনও আধখানা চাঁদ হঠাৎ দেখতে পেয়ে হঠাৎ ডেকে উঠেছে? হাতের জোরে শরীরটাকে হঠাৎ টান ক'রে আর কোমরে ভর দিয়ে উঠে বসেন লোকনাথ। ডাক দেন—একটা কথা শোনো, নীরু।

আবার চমকে ওঠেন লোকনাথ। শূন্য গুহার কাছে কথা বললেও সাড়া পাওয়া যায়, প্রতিধ্বনি বাজে। কিন্তু লোকনাথ যেন নিতান্ত একটা শূন্যতার কাছে কথা বলছেন। নীরজা কোনও সাড়া দিলেন না। আরও আশ্চর্য হয়ে, আরও চোখ বড় করে তাকাতে গিয়ে শুধু দেখতে পেলেন লোকনাথ, নীরজা ব্যস্ত হয়ে চলে গেল।

কিসের ব্যস্ততা?

চার

ভিতরে ঘরের ওদিকের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল যে আগন্তুক, যার সঙ্গে আস্তে-আস্তে হেসে হেসে কথা বলছিল বড় মেয়ে মিতালী রায়, তারই দিকে তাকিয়েছিলেন নীরজা। এবং তাই তাঁর চোখ দুটো এত উজ্জ্বল হয়ে হাসছিল।

মিতালী আর সেই আগন্তুক ছেলেটি, দু'জনে কথা বলতে বলতে পাশের ঘরে চলে গেল, আর রেডিওর গানের শব্দটা আরও জোরালো হয়ে উঠল; তাই এবার ঘরের ভিতর এগিয়ে গেলেন নীরজা। তখনই ডাক দিলেন—পিয়ালী, তুই কোথায়?

—আমি এখানে আছি।

—না, এখানে চলে আয়।

পিয়ালীর হাতে রঙিন কাগজের একটা বাক্স, তার মধ্যে এক ডজন রুমাল। চৌরঙ্গির এক কাশ্মীরি দোকান থেকে কেনা কাশ্মীরি রেশমের রুমাল। রুমালের গায়ে ডাল হ্রদের একটি পদ্মবন, তার গায়ে লেগে ভেসে রয়েছে লাল রঙের শিকারা। পিয়ালী বলে—সত্যি কথা, দেবুদা কোনও কথা একটুও ভুলে যায় না। কবে বলেছিলাম, নতুন রকমের রুমাল এনে দিতে পারেন? সে কথা দেবুদার ঠিক মনে আছে। এই দেখো, কী সুন্দর ছবিতোলা কাশ্মীরি রুমাল।

পিয়ালী বোধ হয় বুঝতে পারেনি যে, এই ঘরের ভিতরে একটা খাটের উপরে পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদর ঢাকা দিয়ে এই বিকালে এখনও শুয়ে রয়েছে যে, সে সত্যি ঘুমিয়ে পড়েনি। বুঝতে পারলে এত চেঁচিয়ে কথা বলত না পিয়ালী।

মুখের উপর থেকে চাদর সরিয়ে দিয়ে আর একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে সুকুমার কথা বলে—গোটা তিনেক রুমাল আমাকে দে।

চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করে পিয়ালী—দাদাকে একটু লোভ সামলাতে বলো, মা। আমি এই রুমালের একটাও কাউকে দেব না।

সুকুমার হাসে—একটা অন্তত দে।

পিয়ালী—কেন?

সুকুমার—দরকার আছে।

পিয়ালী হাসে—সত্যি করে বলো তো, কার জন্যে দরকার? তোমার নিজের জন্যে, না তাঁর জন্যে?

লজ্জা পেয়ে হাসি চাপতে চেষ্টা করে সুকুমার—মিছিমিছি কথা বাড়াচ্ছিস কেন? যখন সন্দেহ করেই ফেলেছিস, তখন আর...।

ঠিক কথা। যাকে এইরকম একটি রুমাল উপহার দিতে পারলে সুখী হবে সুকুমার, তারই জন্য অন্তত একটি রুমাল সে পেতে চায়। নীরজা জানেন, মিতালী আর পিয়ালীও জানে, সুধাদি তো

জানেনই, শুধু এক লোকনাথ জানেন না, কার দরকারের জন্য এইরকম একটি কাশ্মীরি রুমাল আজ সুকুমারের দরকার হয়েছে।

বড় শান্ত ও লাজুক স্বভাবের মেয়েটি, নাম তার বীণা, সুধাদিরই এক দেবরের মেয়ে। সুধাদি বলেন, মেয়েটার বয়স যখন মাত্র সাত বছর; তখন ওর মা ইচ্ছে করে বিষবড়ি খায়। আত্মহত্যার কারণ, স্বামীর উপর রাগ। সেই যে সাত বছর আগে, মেয়েটার জন্মের ঠিক এক মাস আগে কাউকে না বলে-কয়ে উধাও হয়ে গেল তাঁর সেই দেবর, তার পর আর ফিরে এল না। এক বছর পরে খবর পাওয়া গেল, জার্মানীতে আছে বীণার বাবা, সুধাদির সেই দেবর শ্রীঅমল সেন। ঠিকানাও পাওয়া গেল। সাত বছরে কম করেও তিনশো চিঠি লিখেছিল বীণার মা, ফিরে আসবার জন্য কত অনুনয় আর আবেদন। জবাবে মাত্র সাতটি চিঠি এসেছিল; অমল সেন শুধু একটি কথাই বার বার লিখে জানিয়ে দিয়েছিল, এ জীবনে সে আর দেশে ফিরবে না। সেই অমল সেন এখনও জার্মানিতেই আছে, কিন্তু জানে না বোধ হয় যে তার স্ত্রী আর এ জগতে নেই। কিন্তু বীণা নামে তার যে একটি মেয়ে এ জগতেই আছে, সেকথাও বোধ হয় জানে না। কারণ, চিঠি দিয়ে মেয়ের সামান্য একটু খোঁজখবরও করেনি অমল সেন; জানেও না যে, ওই মেয়ের বয়স এখন কুড়ি বছর পার হতে চলল, আর বিয়ে দিয়ে দেবার দরকারও হয়েছে।

সুধাদিরই বাড়িতে, সুধাদির কাছে থেকে বড় হয়েছে বীণা; কিন্তু শুধু চেহারাতেই বড় হয়েছে; শিক্ষাতে নয়। সুধাদির তিন মেয়েই শিক্ষিতা। বড় মেয়ে অঞ্জলি, মেয়ে স্কুলের টীচার, চিরকুমারী হয়ে জীবন কাটিয়ে দেবে বলে পণ করেছে, কে জানে কেন এমন পণ; তাই সে সুধাদিরই কাছে থাকে। কিন্তু বিয়ে হয়েছে যে দুই মেয়ের, তারাও সুধাদির কাছে থাকে। এক জামাই থাকেন হার্ভার্ডে, আর এক জামাই গ্লাসগোতে। পড়া আর ট্রেনিং শেষ করে জামাইদের দেশে ফিরতে নাকি এখনও ছয়-সাত বছর বাকি।

সুধাদি বলেন—বীণার জন্যেও যে বিলাত-ফেরত বর তিনি আনতে পারেন না, তা নয়। কিন্তু ভালবাসার দামটাও তো তুচ্ছ করা উচিত নয়। বীণা যখন সুকুকে ভালবাসে, আর সুকুও বীণাকে ভালবাসে, তখন সুকুর সঙ্গেই বীণার বিয়ে হলে তিনি সুখী হবেন।

কিন্তু...নীরজার এই কিন্তু কিন্তু ভাবের আসল কারণটা কী, তাও জানেন সুধাদি। জানা কথা, আপত্তি করবেন লোকনাথ। তিনি বলবেন, যে ছেলে পঁচিশ বছর বয়সের একটা জোয়ান হয়েও রোজগারের কোনও কাজ ধরতে পারল না, তার কি বিয়ে করা উচিত? কখনই নয়। তা ছাড়া, এমন নিরোজগেরে ছেলের সঙ্গে কোনও ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন? কেউ না। সুধাদি কিন্তু বলেছেন; সব সময়েই বলেন : আমি কিন্তু সব জেনে শুনেও তোমাদের ঘরে আমার বীণাকে দিতে চাই, নীরু। আমার কোনও আপত্তি নাই। সুকু এখনও রোজগারের কোনও কাজ ধরতে পারল না ঠিকই, লেখাপড়াও শিখল না, কিন্তু তবু মানুষ তো, আর মানুষের ভালবাসার কি কোনও দাম নেই?

আজ কিন্তু নীরজার মনে কোনও কিন্তু নেই। আজ তিনি আশা করতে পারছেন, এইবার সুকুর বিয়ে হয়ে যাবে, মিতুর কলেজে পড়া চলতেই থাকবে, আর পিয়ার অনেক দিনের ইচ্ছার সেই বস্তুটা, একটি গিটারও এসে যাবে।

সুকু বলেছে, দেবু আমার একটা কাজ যোগাড় করবার জন্যে ভয়ানক চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে,

মা। পিয়া বলেছে, দেবুদা আমার গিটার শেখবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে, মা। শেখাবেন ধরণীবাবু, সেই ধরণীবাবু, কালীঘাটের জলসাতে সেদিন যাঁর গিটার শুনেছিলে। সপ্তাহে একদিন আসবেন, মাসিক মাইনে নেবেন মাত্র পঞ্চাশ টাকা। দেবুদা বলেছে, সে টাকার জন্যে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। আর, মিতু বলেছে যে কথা, সেটাই সবচেয়ে সুন্দর বিস্ময়ের কথা। কথাটার সবটুকু ঠিক ভাল করে আর স্পষ্ট করে বলতেও পারেনি মিতু। বলতে গিয়ে লজ্জা পেয়ে মুখ রাঙাও করেছে। দেবু বলেছে, আমি থাকতে তোমাদের রায়গঞ্জে চলে যেতে হবে না।

—আর কী বলেছে? প্রশ্ন করতে গিয়ে নীরজার দুই চোখের তারা যেন আশ্চর্য হবার সুখে চিকচিক করে।

মিতু—আর কী বলবে? যা বলবার ছিল সবই বলেছে।

—তুই কী বললি?

—আমি বললাম, পরীক্ষাটা হয়ে যাক, পাস করি, তারপর যেদিন ইচ্ছে...।

—তারপরে? দেবু কী বললে?

—দেবু বলেছে; তাই ভাল। আর একটা বছর অপেক্ষা করতে তার একটুও আপত্তি নেই।

সুকু আর পিয়া রুমাল নিয়ে বকাবকি আর হাতাহাতি করতে থাকে। আর নীরজা টেবিলের কাছে এগিয়ে যেয়ে স্টোভ ধরান। চা করতে হবে। নীরজা জানেন, দেবু যখন-তখন চা খায়। চায়ে দুধ ভালবাসে না দেবু; দেবুর চায়ে লেবুর রস দিতে হয়। নীরজা বলেন—বকাবকি রেখে এখন একটা লেবু কেটে দে, পিয়া।

পাঁচ

পাশের ঘরের দরজার পর্দাটা দুলছে, তার দিকে তাকিয়ে থাকেন নীরজা। পাশের ঘরে এখন মিতুর সঙ্গে কথা বলছে যে দেবু, সে দেবু সত্যিই একটি বিস্ময়। এতটা আশা করেননি নীরজা। দেবু যেন এ বাড়ির ভাগ্যের মেঘলা আকাশে একটি জ্বলজ্বলে তারা হয়ে দেখা দিয়েছে। এই তো, মাত্র তিন মাস আগে, কোথায় যেন ক্রিকেট খেলতে গিয়ে দেবুর সঙ্গে প্রথম দেখা আর আলাপ হল সুকুর, আর চা খাওয়াবার জন্যে দেবুকে এবাড়িতে নিয়ে এল। তখন তো একটুও বুঝতেও পারেননি নীরজা যে, দেবু নামে সেই ছেলেটির প্রাণের ভিতরে এত মায়া আছে। ইচ্ছে করে, আজ এখনই একবার দেবুকে নিয়ে গিয়ে রায়গঞ্জের ভদ্রলোকের চোখের সামনে একবার দাঁড় করিয়ে দিতে। আর শুনিয়েও দিতে, দেখে নাও, তোমার রায়গঞ্জ সাতজন্ম তপস্যা করলেও যে ছেলে পাবে না, সে হল এই দেবু, এই কলকাতারই ছেলে। দশ টাকা ধার দিলে এক বছরে আট টাকা সুদ নিয়ে থাকেন তোমারই বন্ধু, রায়গঞ্জের রতনবাবু, যিনি তমসুকের বোঁচকা বুকে জড়িয়ে না ধরে ঘুমোতে পারেন না। আর, কলকাতার এই দেবু তার সামান্য কদিনের চেনা এক বন্ধুর বাপ-মা-বোন সবাইকে সুখী করে বাঁচিয়ে রাখবার সব খরচের দায় নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে। তোমার রায়গঞ্জের একশো আষাঢ়ে গল্পের মধ্যেও কি দেবুর মত একটি মাণিক খুঁজে পাওয়া যাবে?

কিন্তু লোকনাথের কাছে গিয়ে এই শুভ বিস্ময়ের কথা নিয়ে আলোচনা করতে চান না নীরজা। আলোচনা করে কোনও লাভ হবে না। দেবুর কথা তাঁকে আজ এখনই জানিয়ে কিংবা শুনিয়ে দেবারও কোনও দরকার নেই। তাঁকে শুধু এটুকু জানিয়ে দিলেই হবে যে, রায়গঞ্জে এখন আর ফিরে যাওয়া হচ্ছে না; কোনওদিন ফিরে যেতে হবেও না। রায়গঞ্জের বাড়ি বিক্রি করা হোক বা না

হোক, সেজন্য এবাড়ির সুখশান্তির কোনও সমস্যা আর হবে না।

ভাবতে বেশ আশ্চর্যই বোধ করতে হয়, রায়গঞ্জ বলতে কিংবা দেশের বাড়ির কথা বলতে গিয়ে বাত-পঙ্গু মানুষটির মনে যেন দশ ভাবের দশা দেখা দেয়। কখনও হেসে ফেলেন, কখনও চেঁচিয়ে ওঠেন, কখনও বা চোখ মুছে মুছে বিড়বিড় করেন। কখনও বা রাগ ক'রে অভিযোগ করেন, কলকাতার নাম করতে তুমি তো ভাবে বিভোর হয়ে যাও নীরু। কিন্তু কী আছে কলকাতায়? বড় বড় চমৎকার ফাঁকি ছাড়া আর কিছু আছে কি? মাঝে মাঝে ঠাট্টাও করেন, তোমার কাছে কলকাতা মানে সুধাদি, আর সুধাদি মানে কলকাতা। নীরজা ভাবছেন, আজ কিন্তু এখনি রায়গঞ্জের মানুষটিকে শুনিয়ে দিতে পারা যায়; শুধু এক সুধাদিকে দেখছ কেন, দেবু নামে একটি ছেলেকেও দেখতে পারো; সে ছেলে এই কলকাতারই ছেলে।

দোষ ধরলে আর খুঁত বের করতে হলে তোমার রায়গঞ্জেই বা কোন মহিমার পরিচয় পাওয়া যাবে? মিথ্যে মামলা করে তোমারই রাজেন কাকা যে তোমার ত্রিশ বিঘে ধান জমি কেড়ে নিয়েছেন, সেকথা কি ভুলে গিয়েছ? সেকেণ্ড মাস্টার অনাদিবাবু কী নীচতার কাণ্ড করেছিলেন, তাও কি মনে নেই? ইন্সপেক্টরের কাছে তোমার নামে মিথ্যে অপবাদের কথা বলে তোমার কী ক্ষতি করেছেন অনাদিবাবু, সেকথা তুমি তো সেদিনও রামদয়ালবাবুর কাছে বলছিলে। তবে আর কলকাতার নামে এত ভয় আর ঘেন্না কেন? রামদয়ালবাবুও বলেছেন, অনাদিবাবু ওই নীচতার কাণ্ডটি না করলে তুমিই হেডমাস্টার হতে। তোমার ওই রায়গঞ্জের কাঁকড়া বিছার কামড়ে তোমার সবচেয়ে আদুরে গরুটি মরে গেল, মনে আছে কি? রায়গঞ্জের নাম করে গর্ব করবার কিছুই নেই। আর খুশি হবারই বা কী আছে? আশা করবারই বা কী আছে? রায়গঞ্জে থাকলে তোমার ছেলের জন্য বীণার মত মেয়ে তুমি পেতে? না, তোমার মেয়ের জন্য দেবুর মত ছেলে পাওয়া যেত? সুকুর অবিশ্যি ভাগ্য খারাপ, কলকাতায় থেকেও লেখাপড়া ভাল শিখল না।

রায়গঞ্জে থাকতেই বা লেখাপড়ার কোন উন্নতি দেখাতে পেরেছিল সুকু? তুমিই জান, তোমার ছেলে বলেই সুকুকে পর-পর তিন বছর প্রমোশন দিয়েছিলেন হেডমাস্টার; পরীক্ষায় ফেল করাই তো সুকুর নিয়ম ছিল।

রায়গঞ্জে থাকলে মিতু আর পিয়ারও বা কী দশা হত? দুই মেয়ের কারও কপালে কলেজে পড়বার সৌভাগ্য হত না। আজও স্মরণ করতে পারেন নীরজা, রায়গঞ্জে থাকতে লোকনাথ প্রায়ই তাঁর এক ভাল ছাত্রের কথা বলতেন। সে ছাত্রের নাম সুদেব। সুদেবের বাবা সনাতন সরকার শহরে মোক্তারি করেন। মিতুর বয়স তখন দশ বছরও হয়নি। লোকনাথ তখনই সুদেবের সঙ্গে মিতুর বিয়ের কথা কল্পনা করতে শুরু করেছিলেন। বার বার বলতেন, আমি ভাবছি নীরু, সনাতনবাবুর সঙ্গে কথাটা এখনই একটু আলোচনা করে রেখে দিই।

ওই তো, ওই সুদেব, রায়গঞ্জে থাকলে মিতুর জীবনের ভাগ্যটা ওই সুদেব পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারত, তার বেশী নয়। রায়গঞ্জের লোকনাথ রায়ের কল্পনা করবার, আশা করবার, কিংবা বিশ্বাস করবার শক্তিও ছিল না যে, তাঁর মেয়ে মিতুর সঙ্গে দেবুর মত ছেলের বিয়ে হতে পারে।

রামদয়ালবাবুর সঙ্গে গল্প করবার সময় কথায় কথায় অদ্ভুত রকমের একটা অহংকারের কথাও বলেন লোকনাথ। সে কথা শুনে নীরজার হাসি পায়, দুঃখও হয়। 'রোগে আমার পা দুটো পঙ্গু ক'রে দিয়েছে রামদয়াল, কিন্তু আমি পঙ্গু হইনি।' রামদয়াল বলেন—নিশ্চয়, নিশ্চয়, খুব

ঠিক কথা। লোকনাথের অহংকার এইবার যেন হেসে হেসে ঝলসে ওঠে।—লোহারামের ব্যাকরণ পড়ে মানুষ হয়েছি, রাম, প্রাণের মধ্যে সেই লোহার কিছুটা আজও আছে।

পাশের ঘরে বসে আর শুনতে পেয়ে হেসে ফেলেছিল সুকু— বাবা যে একজন লৌহমানব, সে কথা কি তুমিও জানতে, মা?

নীরজা হাসেন—চুপ কর। রোগী মানুষ, অনেক দুঃখে মন-মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছে। তাই ওরকম অদ্ভুত কথা বলেন।

হেসে হেসে সুকুকে চুপ করিয়ে দিলেও মনে মনে স্বীকার করেন নীরজা, মানুষটার প্রাণে সত্যি লোহার মত কোনও বস্তু আছে। ভয়ানক শক্ত একটা বিশ্বাসের লোহা। বিশ্বাস করেন লোকনাথ, রায়গঞ্জে ফিরে গিয়ে রাধানাথের প্রসাদ খেতে পারলে এক মাসের মধ্যেই তাঁর ভাগ্যের সব দুঃখ ঘুচে যাবে। বিশ্বাস করেন, নিতাই কবিরাজের পাঁচন খেয়েই তাঁর রোগ সেরে যাবে। বিশ্বাস করেন, রাধানাথ শিগগিরই তাঁকে কাছে ডেকে নেবেন। বিশ্বাস করেন, তাঁর স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে সবাই সুখী হবে, যদি এখনও কলকাতা ছেড়ে রায়গঞ্জে গিয়ে আবার সেই পুরনো বাড়িতে ঠাঁই নেওয়া হয়। বিশ্বাস করেন, মোক্তার সনাতন সরকারের ছেলে সুদেবের সঙ্গে মিতুর বিয়ে হলে খুব ভাল হয়।

কিন্তু এই অদ্ভুত বিশ্বাসের লোহা যে কোনও কাজের বস্তু নয়, এই সত্যটি তাঁকে বুঝিয়ে দেবে কার সাধ্যি? উনি বলবেন, পরের কাছ থেকে উপকার নেবার লোভ হল ভয়ানক লোভী একটা পাপ। উনি বলবেন, তার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল। উনি বলবেন, কলকাতাতে সুধাদির মত মানুষকেই ভাল মানায়, তোমাদের একটুও মানায় না।

কাজেই, এমন মানুষের সঙ্গে তর্ক করে বোঝাবুঝির চেষ্টা করবার আর কোনও অর্থ হয় না। উনি ওঁর প্রাণের লোহা নিয়ে পড়ে থাকুন। কিন্তু...।

চায়ের জল ফুটতে শুরু করেছে, কেটলিটাকে নামিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করেন নীরজা—কিন্তু সুকু, তোর বাবা যদি জেদ না ছাড়ে, যদি রায়গঞ্জে ফিরে যাবার কথা আবার তোলে, তবে কী হবে?

সুকু বলে—তা হলে বলতে হবে, তুমি একাই রায়গঞ্জের বাড়িতে থাকো। আমাদের পক্ষে এখন রায়গঞ্জে ফিরে যাওয়া অসম্ভব।

নীরজা—কিন্তু সেটা কি ভাল দেখাবে?

সুকু—ভাল দেখাবে না ঠিকই, কিন্তু উপায় কী? বাবা যে আমাদের ভাল কিসে, সেটা একটুও বুঝতে পারছেন না।

নীরজা—সেই তো আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ।

পাশের ঘর থেকে ডাক দেয় মিতালী—চা হয়েছে নাকি, পিয়ালী?

—হ্যাঁ, হয়েছে। চেঁচিয়ে জবাব দেয় পিয়ালী। . .

তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে চা তৈরি করে নীরজা। সঙ্গে সঙ্গে নীরজার সেই ক্ষণিক বিষাদের চোখ দুটো আবার উজ্জ্বল হয়ে হেসে ওঠে। হ্যাঁ, দুঃখ বটে, সে দুঃখের জন্য মনের ভিতরে একটা অস্বস্তিও বোধ করতে হয় বটে। কিন্তু আর তো ভয় করবার কিছু নেই। রায়গঞ্জে ফিরে যেতে হবে না, দৈববাণীর মত একটা আশ্বাসের বাণী শুনিয়ে দিয়েছে ওই দেবু, দেবকুমার দত্ত, কলকাতার

কলেজের প্রফেসর, বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে, শ্যামবাজারে যার বাড়ি; নিজেরই বাড়ি।

নীরজা বলেন—তুই ওখানে চা পৌঁছে দিয়েই চলে আসবি, পিয়ালী। একটুও দেরি করবি না, বুঝলি?

পিয়ালী হাসে—হ্যাঁ মা বুঝেছি; আর বেশি বলতে হবে না।

ছয়

এত গরম চা, তবু তিন চুমুকেই সেই চা খেয়ে ফেলে আবার উঠে দাঁড়ায় দেবু—আমি এবার যাই মিতু।

মিতালী আশ্চর্য হয়ে তাকায়—কেন? কিসের এত তাড়া?

দেবু—সত্যি, আমার খুব লজ্জা করে, মিতু।

মিতালী—কিসের লজ্জা?

—সবাই দেখছেন, আমি এঘরে তোমার কাছে এতক্ষণ বসে আছি।

—কেন বসে আছ ; সেটা তো সকলেই জানে।

—হ্যাঁ; সেই জন্যেই তো বেশ অস্বস্তি বোধ করতে হয়।

মিতালী হাসে—তোমার মা জানেন তো?

—নিশ্চয়। আমি নিজেই তোমার ফটো মা'কে দেখিয়েছি, তোমাদের সব কথা বলেছি।

—কী বললেন, মা?

—বললেন, খুব ভাল মেয়ে; খুব সুন্দর মেয়ে।

—আর কিছু বলেননি?

—বলেছেন, তবে আর দেরি কেন? বিয়েটা হয়ে গেলেই তো হয়।

—তুমি কী বললে?

—তুমি যা বলেছ, তাই বললাম। আর একটা বছর পরে; তোমার বি-এ পরীক্ষা হয়ে যাবার পর বিয়ে হবে।

—মা কী বলেন?

—মা বলেন, তবে তাই হোক, ভালই তো।

—অ্যাঁ? তবে তো বলতে হয়, তোমার মা সত্যিই খুব সাধাসিধে সরল মনের মানুষ।

—হ্যাঁ, মিতু। আমার মা'র মত শান্ত মানুষ আমি কখনও দেখিনি। একটা মজার গল্প শুনবে?

—বলো।

—একদিন দুপুর বেলায় একটা চোর ঘরে ঢুকে মা'র একটা কাপড় চুরি করে পালিয়েছিল। পাশের বাড়ির ঝি চেঁচিয়ে উঠেছিল, ও মা, দেখতে পাচ্ছ না, চোর যে তোমার কাপড় নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। মা শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলেন, তারপর দুঃখ করলেন, চোরটা একটা ছেঁড়া কাপড় নিয়ে চলে গেল রে, দেবু।

—তার মানে?

—তার মানে, মা বলতে চান, চোর একটা ভাল কাপড় নিয়ে পালিয়ে গেলে ভাল হত।

হেসে ফেলে মিতালী।—অদ্ভুত মায়ার মানুষ।

দেবু—হ্যাঁ। একটা কথা, তুমি আমাকে একটা ভুল বুঝলে না তো?

—কেন, কিসের জন্য কী ভুল বুঝব?

—এই যে আমি বলেছি যে, তোমাদের বাড়ির দরকারের সব খরচের দায় আমি নিলাম, তোমাদের রায়গঞ্জে চলে যেতে হবে না।

—এ কী কথা বলছ তুমি? তুমি আমাদের যে উপকার করলে, সে উপকার এ পৃথিবীতে কে কার জন্যে করতে পারে?

—তোমার বাবা আর মা জানেন?

—হ্যাঁ। আমি সব বলে দিয়েছি। বাবা অবিশ্যি কিছুই জানেন না, বাবাকে কিছু বলবার দরকারও হয় না।

—ওঁরা কেউ ভুল বুঝলেন না তো?

—কেউ না। মা বরং বলেছেন, দেবু আমাদের সৌভাগ্য।

—তবে আমার সঙ্গে একটু এসো।

—কোথায়?

—চলো, তোমার বাবা আর মাকে প্রণাম করে আসি।

হেসে ওঠে মিতালী—এঃ, তুমি দেখছি তোমার মা'র মত নিতান্ত সাধাসিধে মানুষ।

—না মিতালী, আমি ওঁদের বুঝিয়ে দিতে চাই যে, আমি বাইরের মানুষ নই, আমি এবাড়ির একজন আপন মানুষ।

—একথা এবাড়ির কে না বুঝেছে?

—তবু...।

—তবে, চলো।

ঘর থেকে বের হয়ে এগিয়ে আসে মিতালী; হাসতে গিয়ে মাথা হেঁট করে।—শোনো মা, দেবু কী বলছে।

ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে যান নীরজা—কী?

মিতালী—দেবু তোমাকে আজ প্রণাম করতে চায়।

প্রণাম করে দেবু। নীরজা যেন হঠাৎ এক অদ্ভুত মুগ্ধতার আবেশে অভিভূত হয়ে ফুঁপিয়ে ওঠেন—বেঁচে থাকো, সুখে থাকো, বাবা।

মিতালী—বাবাকে প্রণাম করবে দেবু।

চমকে ওঠেন নীরজা—অ্যাঁ, উনি তো খুবই অসুস্থ, হয়ত এখন ঘুমিয়ে আছেন। আজ বরং...।

দেবুর মুখের লাজুক হাসিটা আরও নিবিড় হয়ে যেন থমথম করে।—ঘুমিয়ে থাকলে আমি না হয় কিছুক্ষণ বসে থাকব। যখন জাগবেন, তখন...।

নীরজা—তা হয়ত হতে পারে; কিন্তু, আচ্ছা এসো তবে।

ঘুমিয়ে নয়, জেগেই বসেছিলেন লোকনাথ। নীরজা বলেন—সুকুর বন্ধু দেবু তোমাকে প্রণাম করতে এসেছে।

—অ্যাঁ? সুকুর বন্ধু? আমাকে প্রণাম করতে চায়। লোকনাথের গলার স্বরে যেমন বিস্ময়, দুই চোখেও তেমনই একটা বিস্ময় উথলে ওঠে। কলকাতার এই দশ বছরের জীবনে কেউ কোনওদিন

লোকনাথকে প্রণাম করতে আসেনি। এমন কি সুধাদির তিন মেয়ের কোনও মেয়েও না। লোকনাথ শুধু জানেন, রায়গঞ্জের এক পঙ্গুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করবে, এমন মানুষ এই কলকাতাতে থাকে না, থাকতে পারে না।

প্রণাম করে দেবু। দেবুর মাথায় হাত দিয়ে বিড়বিড় করেন লোকনাথ—সুখে থাকো, বেঁচে থাকো।

দেবু বলে—আজ এখন চলি। আমার আবার একটা কলেজে সন্ধ্যায় ক্লাস করতে হয়।

নীরজা বলে—দেবু হল কলেজের প্রফেসর। এম-এ পরীক্ষাতে সোনার মেডেল পেয়েছিল।

লোকনাথ—বাঃ, সুন্দর। শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ, তোমার সবরকম কল্যাণ হোক, বাবা। এসো।

নীরজা হাসতে হাসতে ডাকেন—এসো, দেবু। ওরা সবাই তোমাকে কী যেন বলবার জন্যে মতলব এঁটেছে; তোমাকে আটক করে ধরবে বলে সবাই নীচের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

—হ্যাঁ, চলুন। দেবুও এগিয়ে আসে, আর নীরজার সঙ্গে কথা বলতে বলতে সিঁড়ি ধরে নেমে যায়।

দেবু? কে এই দেবু? দেবুর পায়ের শব্দ শুনতে থাকেন লোকনাথ, আর দুঃসহ একটা বিস্ময়ের জিজ্ঞাসা যেন তাঁর দুই চোখের সুস্থির দৃষ্টিটাকে কাঁপিয়ে দিতে থাকে। ইচ্ছা করে, ডাক দিয়ে এখনই জিজ্ঞাসা করেন, কী দেবু? সুকু কী করে তোমার মত সোনার মেডেল পাওয়া এম-এ ছেলের বন্ধু হয়? সুকু যে ক্লাশ নাইন থেকে ক্লাশ টেনে উঠতে পারেনি।

কিন্তু দেবু এখন সত্যিই নীচের তলার বাইরের বারান্দায় যেন মায়াবন্দি মুগ্ধ হরিণের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাসছে সুকু, হাসছে পিয়ালী, একটা দরজার গায়ে হেলান দিয়ে মিতালীও হাসছে। নীরজা বলেন—ওরা আজ তোমাকে এখনই ছেড়ে দেবে না, দেবু।

—কেন?

নীরজা—ওদের ইচ্ছে, তুমি এবেলা এখানেই থাকবে, খাবে, বিকাল হবার পর যাবে।

ঠিকই, নীচের তলার বাইরে বারান্দাটাকে এখন সিনেমা, ছবি তোলবার একটা ফ্লোর বলে মনে হবে। কিন্তু মুগ্ধ হরিণকে যারা ঘিরে ধরেছে, তাদের দেখে কারও মনে হবে না যে, ওদের মুখের হাসিতে ব্যাধ-ব্যাধিনীর উল্লাস আছে। বরং মনে হবে, সুন্দর-সুন্দর কৃতজ্ঞতা যেন পরম এক উপকারের চারদিকে দাঁড়িয়ে প্রাণের অভ্যর্থনা নিবেদন করতে চাইছে।

নীরজা বলেন—সুধাদির বাড়িতে সেদিন কোন হোটেল থেকে খাবার কিনে আনা হয়েছিল, নামটা কি মনে আছে, সুকু?

পিয়ালী বলে—হ্যাঁ; পার্ক স্ট্রিটে মিসেস কার্ভালো'স কিচেন।

মিতালী—হ্যাঁ, চিনে রান্নার চেয়ে গোয়ানিজ রান্না অনেক অনেক ভাল।

নীরজা—তবে তাই কর, সুকু। কার্ভালোর কিচেন থেকে খাবার নিয়ে আয়।

দেবু যেন চমকে ওঠে, কিন্তু গলার স্বর তবু একটু ভীতু হয়ে আপত্তি জানায়—না, না, মাপ করবেন। আমি ওসব খাবার খাই না, খেতে ভাল লাগে না।

সুকু—এঃ, তুমি দেখছি নেহাতই অর্থডক্স।

মিতালী মুখ টিপে হাসে—একেবারে পরমার্থডক্স। ছুটির দিনে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে যেতে না পারলে মনে করেন যে, দিনটা বৃথাই গেল।

দেবু কুণ্ঠিতভাবে হাসে—না, না, সেরকম কিছু নয়।

পিয়ালী—দেবুদার লজ্জাটা কিন্তু সত্যই পরমার্থডক্স। দিদির সঙ্গে সিনেমাতে যেতে লজ্জা, জাহাজঘাটায় বেড়াতে যেতে লজ্জা, একসঙ্গে ফটো তোলাতে লজ্জা।

নীরজা—কিন্তু তুমি কথা দিয়ে যাও দেবু, মাঝে মাঝে নিজেই আসবে, মনে করিয়ে দিতে হবে না।

দেবু—নিশ্চয়।

শব্দ করে ছুটে আসে একটা স্কুটার। বারান্দার কাছে এসে থেমেই হাত তুলে একটা আবছা প্রীতির সঙ্কেত জানায়। পিয়ালীর সারা শরীরটা দুলে ওঠে। চেঁচিয়ে ডাক দেয়—চলে এসো, মোহন।

ছেলেটি বলে—না, এখন সময় নেই। কাল সকালে আসব; যদি ডায়মণ্ডহারবারের হাওয়া খেতে চাও, তবে তৈরি থেকো।

শব্দ করে চলে যায় স্কুটার। দেবুর দিকে তাকিয়ে নীরজা বলেন—কার সাধ্যি বলবে, ছেলেটা বাঙালি নয়।

দেবু—বাঙালি নয়?

নীরজা—না। ওর নাম মোহন খোসলা। ওর বাবার মেশিন টুলের কারখানা আছে। শিগগির বিলেত যাবে মোহন, নতুন মেশিনের কাজ শিখতে।

সুকু বলে—বেচারা দেবুকে এখন তবে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

ঘরের ভিতরে চলে যান নীরজা আর সুকু। পিয়ালীও দৌড়ে গিয়ে ঘরের ভিতরে রেডিওর চাবি আঁকড়ে ধরে। চলে যাবার জন্য বারান্দার সিঁড়িতে একটা পা নামিয়ে দিয়েই থমকে যায়, আর মুখ ফিরিয়ে তাকায় দেবু। শুনতে পেয়েছে দেবু; দরজার কাছে যেন একটা অভিমানী নিঃশ্বাসের ব্যথার শব্দ করুণ হয়ে ডুকরে উঠছে। ঠিকই ছলছল করছে, মিতালীর চোখ। কী অদ্ভুত মায়া প্রীতি আর ভালবাসা দিয়ে আঁকা দুটি চোখ। ওই মিতালী যে সেদিনও দেবুর হাত ধরে বলেছে; তুমি আমাকে ভালবাস, এ সৌভাগ্য যে আমি স্বপ্নেও আশা করতে পারিনি।

দেবু বলেছিল—ও কথা বলো না। আমি জানি, তুমি আমার কে? তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি।

হেসে ওঠে মিতালীর ভিজে চোখ।—একথা আমি বিশ্বাস করি।

মিতালীর দুই চোখে আর কোনও ব্যথা কিংবা অভিমানের ছায়া নেই। টলমল করছে মিতালীর কালো চোখের মায়া; তার উপর যেন ভোরের আলোর আভাও ছড়িয়ে পড়েছে। দেবু বলে, আমি স্বপ্নেও কোনওদিন ভাবিনি যে, তোমার মত এত সুন্দর মেয়ে আমার মত মানুষকে এত ভালবাসবে। ...আচ্ছা, আসি।

সাত

প্রশ্নটা লোকনাথের বুকের ভিতরে তখনও ছটফট করছে।—কে এই দেবু? ডাক দিলেন লোকনাথ—নীরু, একবার ওপরে এসো।

নীরজা আসেন। মুখে সেই অদ্ভুত উজ্জ্বলতার হাসি, কিন্তু তারই মধ্যে যেন একটা বিরক্ত

অস্বস্তির ছায়া ছটফট করছে। নীরজা বলেন—আমার কাজের সময়ে এত ডাকাডাকি করো না।

লোকনাথ—কাজ?

নীরজা—হ্যাঁ, অনেক কাজ।

—কিসের কাজ?

—মার্কেটে যেতে হবে। দরকারের অনেক জিনিসপত্তর কিনতে হবে।

—টাকা?

—টাকা আছে। তোমাকে ভাবতে হবে না।

—কে দিল টাকা?

—দেবু।

—কেন?

—দেবু আমাদের পর নয়। দেবু এখন আমাদেরই ছেলের মত।

—তার মানে?

—দেবুর সঙ্গে মিতুর বিয়ে হবে।

—কিন্তু দেবু টাকা দেয় কেন?

—দেবে না কেন? দেবু তো তোমার সনাতন সরকারের ছেলেটির মত একটা সেকেলে সামান্য মানুষ নয়।

—দেবুর টাকা নিও না।

—কেন?

—এরকম টাকা নেওয়া পাপ।

—তোমার মতে, তাই।

—আমার মতে নয়, নীরু। এই সংসারের নিয়মের মতে, মানুষের জীবনের মতে ওটা পাপ।

—তুমি রুগী মানুষ; কেন এসব কথা নিয়ে মিথ্যে চিন্তা করছ।

—আমার প্রাণটাও কি রুগী হয়ে গিয়েছে।

নীরজা হাসি চাপতে চেষ্টা করে—সেটা তুমি বুঝে দেখ।

—কিন্তু জেনে রাখ নীরু। বলতে বলতে বিছানার ওপর উঠে বসেন লোকনাথ। হ্যাঁ, উঠে বসবার ভঙ্গি দেখলে মনে হবে, রায়গঞ্জের লোকনাথের শুধু হাত দুটোতে নয়, বুকের ভিতরেও লোহা আছে। —খুব ভুল করছ, নীরু।

নীরজা—তুমি কী করে একথা বলতে পার, আশ্চর্য।

—তার মানে?

—তুমিই তো সারাটা জীবন ভুল ক'রে সবাইকে দুঃখ দিলে। এখনও রায়গঞ্জে ফিরে গিয়ে সবাইকে আরও দুঃখের মধ্যে ফেলতে চাইছ। এতদিন তোমার ইচ্ছেয় সব হয়েছে; কিন্তু আর নয়।

—এবার থেকে তবে তোমারই ইচ্ছায় সব চলবে?

—অগত্যা, তোমার যখন কিছু করবার ক্ষমতাই নেই; তখন তোমার এত কথা আর এসব কথা শোনাবার কোনও মানে হয় না।

লোকনাথ—ভাল কথা। তবে আমাকে একাই রায়গঞ্জে চলে যেতে হয়।

নীরজা—তোমার ইচ্ছা। আমি হ্যাঁ বলব না, না'ও বলব না।

চমকে উঠলেন লোকনাথ। যেন তাঁর ফুসফুসটা হঠাৎ একটা ছুরির খোঁচা হয়ে ফুটো হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর আর কেউ নয়, সেই নীরজাই কথা বলছে। নীরজার জীবনে রায়গঞ্জের লোকনাথ আজ আর কোনও সত্য নয়। লোকনাথ কাছে না থাকলেও নীরজার জীবনের কোনও ভয় আর নেই। এ কেমন করে সম্ভব?

বুঝতে পারেননি লোকনাথ, কখন চলে গিয়েছেন নীরজা। ভবানীপুরের সাত নম্বর হরি দত্ত লেনের বাড়িটার নীচের তলায় যেন খুশি কলরবের ঝড় ছুটোছুটি করছে। সবই শুনতে পাচ্ছেন লোকনাথ। কিন্তু মনে হয়, যেন ভয়ানক এক কালবোশেখী পাগল হয়ে ছুটোছুটি করছে; গাছ-পালা, ঘরের চালা, বাগানের গাছ; সবই উপড়ে ও ছিঁড়ে লুটিয়ে দিচ্ছে। শুনতে পাওয়া যায়, বাড়িওয়ালা চৌধুরীবাবুর দারোয়ানকে ধমক দিচ্ছে সুকু—বাজে কথা বলবে তো চাবুক মেরে তোমার চামড়া ফাটিয়ে দেব। দাও তোমার বিল, আর টাকা নিয়ে সেলাম করে চলে যাও।

বাঃ, এ যে ঠাকুরমার ঝুলির গল্প। শ্বেতহস্তী হঠাৎ এসে এ বাড়ির ভাগ্যটাকে শুঁড়ে তুলে নিয়ে রাজসিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছে। বিছানার ওপর স্তব্ধ হয়ে শুয়ে থাকতে অনেক চেষ্টা করেন লোকনাথ, কিন্তু মাঝে মাঝে ছটফট করে এপাশ-ওপাশ করেন, যেন তাঁর বুকের পাঁজরগুলো আগুনের আঁচ লেগে পুড়ছে।

নীরজার চোখে-মুখে ওই উজ্জ্বলতার হাসি; এর চেয়ে দুঃসহ ভয়ের ছবি কোনও দুঃস্বপ্নেও দেখেননি লোকনাথ। না, এ জীবনে নীরজার আর সেই ছলছল ভিজে চোখ দেখতে পাবেন না লোকনাথ, যে চোখের মায়া তুচ্ছ করে আজও তিনি চলে যেতে পারেননি, রায়গঞ্জের রাধানাথের বিগ্রহের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়তে পারেননি।

কিন্তু আর তো দেরি করবার কোনও মানে হয় না। শুধু একবার রায়গঞ্জকে একটা খবর দেওয়া, যেন কাউকে পাঠিয়ে দেয়। লোকনাথকে রায়গঞ্জে নিয়ে যায়।

রায়গঞ্জের বাড়ি আর রাধানাথের মন্দির, মাঝখানে শুধু বাঁশের একটি বেড়া। সেই বেড়ার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সেই কদম, যার ছায়ার মত মিষ্টি ছায়া এ পৃথিবীর কোনও গাছতলায় আছে কিনা সন্দেহ। সেই ছায়াতে একটি মাদুর পেতে সকাল-সন্ধ্যা গড়িয়ে পড়ে থাকলে মন্দ কী? সেইখানে বসে রাধানাথের প্রসাদ খেয়ে প্রাণটাও কি জুড়িয়ে যাবে না? তারপর, যেদিন রাধানাথের ইচ্ছা হবে, সেদিন ওই কদমতলাতেই শেষ নিঃশ্বাস ছেড়ে চিরকালের মত ঘুমিয়ে পড়লেই হল।

সিঁড়ি ধরে পায়ের শব্দ উপরে উঠছে। চমকে ওঠেন, কান পেতে শুনতে থাকেন লোকনাথ। কী আশ্চর্য, সত্যিই যে রামদয়াল এসেছে।

—আমি একাই রায়গঞ্জে চলে যাব, রাম। তুমি একটা ব্যবস্থা করে দাও।

রামদয়াল—কেন?

সব কথা শোনার পর রামদয়ালও স্বীকার করেন—হ্যাঁ, অগত্যা তোমার এখানে আর না থাকাই ভাল।

আরও আশ্বাসের কথা বলেন রামদয়াল—রায়গঞ্জে থাকতে তোমার এখন তেমন কিছু অসুবিধে হবে না। নীচের তিন চারটি ঘর ভাড়া দিলে আশি-পঁচাশি টাকা পাওয়া যাবে। তা ছাড়া কালাচাঁদ আছে, সে তোমার সব রকম যত্ন নেবে। তার উপর, নিতাই কবিরাজ আছে। রতন ভট্চায আছে।

বীরু আর হর্ষনাথ আছে। সবাই, সবাই তোমার দেখাশোনা করবে। চিন্তা করবার কিছু নেই, কোনও অসুবিধে নেই।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন রামদয়াল।—আমি আজই রায়গঞ্জে গিয়ে হর্ষনাথ আর বীরুকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। তোমার হাতে এখন টাকা না থাকলেও ভেবো না। আমি দেব টাকা। পরে শোধ করে দিও।

সিঁড়ির কাছে এসেই লোকনাথের ডাক শুনে থমকে দাঁড়ায় রামদয়াল।—কী বলছ?

লোকনাথ—সত্যিই কি আমার এখন রায়গঞ্জে চলে যাওয়াই ভাল?

রামদয়াল তাঁর সাদা মাথাটাতে একবার হাত বুলিয়ে নিলেন, তারপর হাসতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু হাসিটাও যেন করুণ হয়ে গিয়ে ছল-ছল করে—যেতে ইচ্ছে করছে না, না?

লোকনাথ—না।

রামদয়াল—কেন আর কিসের জন্য, লোকনাথ?

কথা বলেন না লোকনাথ। দুই চোখ বন্ধ করে যেন নিজেই একটা অন্ধকারের মধ্যে রহস্যটাকে বুঝতে চেষ্টা করছেন।

লোকনাথের গায়ে হাত বুলিয়ে লোকনাথের একটা হাত ধরে রামদয়াল আবার প্রশ্ন করেন—কার জন্য মন কাঁদে, লোকনাথ?

লোকনাথ—বুঝতেই তো পারছ।

রামদয়াল—নীরজার জন্য।

লোকনাথ—হ্যাঁ। সংসারের বিপদ-আপদের হাজার উৎপাতের মধ্যে ওকে এখানে ফেলে রেখে, আমি যে রায়গঞ্জের রাধানাথের কদমতলাতে পড়ে থেকেও কোনও শান্তি পাব না, রাম।

রামদয়াল—তা হলে থাক, রাধানাথের যা ইচ্ছে, তাই হবে।

আট

পাড়ার লোকে বলে, সাত নম্বরের গা ঘেঁষে ওই যে পুরনো পড়ো বাড়িটা, যার ছাদ দেয়াল ফুঁড়ে ছোট ছোট অশ্বত্থের শিকড় ঝুলছে, অনেক রাতে সেই বাড়ির উপরতলার ঘরের ভাঙা জানালাতে ছায়া-ছায়া চেহারা কাদের যেন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। শব্দ করে না, খুব বেশি নড়া-চড়া করে না, শুধু দাঁড়িয়ে থাকে। ভোরের কাক ডেকে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে ওইসব ছায়াশরীর যেন ওই পড়ো বাড়ির বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

সাত নম্বরের লোকনাথ রায় যখন মাঝরাত পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে শুয়ে থেকেও ঘুমোতে পারেন না, বিছানার উপর উঠে বসেন, আর জানালা দিয়ে পড়ো বাড়ির ছাদের দিকে তাকান, তখন তাঁরও মনে হয়, ওই তো ওরা দাঁড়িয়ে আছে, আর আশ্চর্য হয়ে বিছানায় বসা এই লোকনাথ রায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। লোকনাথের তখন নিজেকে ওদেরই জগতের একটি ছায়া-মানুষ বলে মনে হয়।

পঞ্জিকা দেখে হিসেব করলে বোঝা যায়, একটা বছর পার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু চোখ বন্ধ করে আর কপালে হাত বুলিয়ে চিন্তা করবার চেষ্টা করলে মনে হয়, এক বছর হতে পারে, আবার পাঁচ বছরও হতে পারে। পা দুটো আরও সরু হয়েছে, মাথার চুল আরও সাদা হয়েছে। রামদয়াল কি

বেঁচে আছে? বেঁচে থাকলে এই এক বছরের মধ্যে তার একটা চিঠিও এল না কেন?

নীচের তলার দুটো ঘরের জীবন যে এই এক বছরে কত রঙিন হয়ে গিয়েছে, সে সত্য চোখে দেখে জানবার কিংবা বুঝবার চেষ্টা করেননি লোকনাথ। চেষ্টা করবার কথাও নেই। সে সংসারে নীরজাই রাজেশ্বরী। তাঁর এক ছেলে আর দুই মেয়ের জীবন রায়গঞ্জের অভিশাপ কাটিয়ে সুখে থাকবার এক অদ্ভুত সৌভাগ্যের নাগাল পেয়েছে, সে তো নীরজারই প্রতিজ্ঞার জয়। সুধাদিকে আজ-কাল প্রায়ই একটা কথা শুনিয়ে দেন নীরজা—আমার অন্য এক জামাই যে বিলেতে যাবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই, সুধাদি।

সুধাদি হাসেন—যাবেই তো; যদি বুদ্ধি ঠিক রেখে চলতে পারিস, তবে আমার মত তোরও দুই জামাই বিলেত যাবে।

হ্যাঁ, একটি রেফ্রিজারেটর কিনে ফেলা হয়েছে। সুধাদির বাড়িতে যে রেফ্রিজারেটর আছে, ঠিক তেমনটি। সুকু বলেছিল—দেবু কিন্তু আপত্তির একটিও কথা বলেনি, মা। একটা রেফ্রিজারেটর কেনা দরকার, শুধু এইটুকু বলেছি; অমনি দেড় হাজার টাকার একটা চেক লিখে আমার হাতে তুলে দিল।

সুধাদি একবার একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। কারণ মিতু আর পিয়া দুজনে সেদিন সুধাদির দুই মেয়ে জনা আর লীনার সঙ্গে তর্ক বাধিয়েছিল। মিতু বলেছিল, যাই বলুন জনাদি, আপনার ওই খোঁপার স্টাইল কিন্তু খুবই সেকেলে।

—তার মানে?

প্রশ্নের জবাব দিয়ে দেয় পিয়া—আপনার ওই খোঁপাটা হল, জারিনা খোঁপা। ওটা আজকাল কেউ পছন্দ করে না।

লীনা—আজকালের পছন্দটা কী?

পিয়া—এই যে, আমার খোঁপা; ক্যাথরিন হেপবার্ন স্টাইল।

জনা—কোথায় শিখলে এই স্টাইল?

মিতু—রীতিমত টাকা খরচ করে শিখতে হয়েছে। পার্ক স্ট্রীটের বিউটিসিয়ান পামেলা হ্যারিসনের নাম শোনেননি?

জনা—না।

মিতু—তারই সেলুনে গিয়ে হেপবার্ন স্টাইলের খোঁপার কাজটা শিখে নিয়েছি।

সুধাদি হঠাৎ এসে দুই চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকেন, আর বেশ একটু ঝংকার দিয়ে কথা বলেন—ঠিকই তো, নীরুর হাতে যখন এত টাকা এসেছে, তখন মেয়েদের শখের জন্যে এরকম দু চারটে বড়-খরচ তো হবেই। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করি, টাকা এল কোথা থেকে?

মিতু—সে কথা জিজ্ঞেস করবার কোনও মানে হয় না, মাসিমা।

সুধাদি—কেন?

পিয়া—আমরা তো কোনওদিন জিজ্ঞাসা করিনি, আপনার হাতে এত টাকা এল কোথা থেকে?

সুধাদি ভ্রূকুটি করে হাসতে থাকেন—সত্যি, এই এক বছরে তোরা খুব কথা বলতে শিখেছিস। ভাল।

মাস ছয় আগে হঠাৎ এক সন্ধ্যাবেলায় এই ঘরের ভিতরে তন্দ্রার মধ্যে নীরজার গলার স্বর

শুনতে পেয়ে চমকে উঠেছিল লোকনাথ। নীরজা ডাকছেন—এই দেখো, কে এসেছে।

—কে? কে? দুই চোখ টান করে দেখতে থাকেন লোকনাথ। লোকনাথের বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আর হাসছে একটি মেয়ে। টুনি আর টুসির সঙ্গে তুলনাই চলে না, রূপসী মেয়ে নয়, নিতান্ত সামান্য সাধারণ চেহারার একটি মেয়ে। মুখে কিন্তু বেশ শান্ত একটি হাসি; আর চোখের তারা দুটোও খুব কালো।

নীরজা বলেন—ওর নাম বীণা, সুধাদির এক দেবরের মেয়ে; সেই দেবর জার্মানিতে থাকে। তোমাকে প্রণাম করতে এসেছে।

—প্রণাম? আমাকে? বলতে বলতে আশ্চর্য হয়ে উঠে বসেন লোকনাথ।

নীরজা হাসেন—হ্যাঁ, ও যে আমাদের সুকুর বউ।

লোকনাথের দুই চোখে যেন একটা জ্বালার শিখা ধিকধিক করে কাঁপে—কবে সুকুর বিয়ে হল?

নীরজা—আজ।

—কেমন বিয়ে?

—আজকাল যেমন হয়, রেজিস্টারি করে।

—হোক, কিন্তু আজকাল কি বিয়েতে শাঁখ বাজে না?

নীরজা মুখে আঁচল দিয়ে হাসেন—হ্যাঁ, রায়গঞ্জের বিয়ের মত বিয়ে হলে শাঁখ বাজে।

—তবে রায়গঞ্জের মত প্রণাম করাবার জন্য এই মেয়েকে এখানে নিয়ে আসা উচিত ছিল না।

নীরজা—ঠিক, যা ভয় করেছিলাম, তাই হল। সুকুও ঠিক বুঝেছে, তুমি এসব কথা বলবে বলেই সুকু এখানে আসতে চাইল না।

লোকনাথ—ভালোই করেছে। বুঝতে পারছি না, সুকুর বউ বা কেন আসে? আমাকে প্রণাম না করলেও তো বেশ চলে যাবে, চলে যাচ্ছেও।

বীণা কিন্তু তখনি লোকনাথের দুই সরু পায়ে মাথা ঠেকিয়ে একটা প্রণাম করে ফেলে। লোকনাথ বলেন—কী বলব, বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, সুখে থাকো।

চলে যায় বীণা। নীরজাও তখনি চলে যেতেন, কিন্তু কথা বলে বাধা দিলেন লোকনাথ—সুকু বিয়ে করল কেন?

নীরজা—এ আবার কেমন কথা? বিয়ের বয়স হয়েছে। একটি মেয়েকে ভাল লেগেছে। তাই তাকে বিয়ে করেছে। এর মধ্যে আবার কেন কিসের?

লোকনাথ—সুকু কি কোনও কাজকর্ম করে?

—হ্যাঁ।

—কিসের কাজ?

—একটা কারখানায় কাজ করে, দেবু পাইয়ে দিয়েছে এই কাজ। মাইনে সামান্য, একশো দশ টাকা মাত্র।

—সুকুর এখন বিয়ে না করাই ভাল হত।

—কেন?

—কলকাতার মত জায়গায় ওই রোজগারের ভরসায় কারও বিয়ে করা উচিত নয়।

—শুধু রোজগারটাই বড় করে দেখছ কেন? একটা ছেলের জীবনের ভালবাসার কি কোনও দাম নেই?

—আছে নিশ্চয়, কিন্তু সত্যিই যদি ভালবাসা হয়।

—এসব কথা, রামদয়ালবাবুকে শোনাবে; আমাকে শোনাবার কোনও মানে হয় না।

—তোমাকেও শোনাবার দরকার আছে, নীরু, তোমারও শোনবার দরকার আছে।

—আমার তো মনে হয়, কোনও দরকার নেই।

—তুমি একটু একলা মন নিয়ে, সুধাদির বাড়িতে যাওয়া একটা মাস বন্ধ রেখে, আর পার যদি, রায়গঞ্জের রাধানাথের মূর্তিটাকে একটু স্মরণ করে একবার ভেবে দেখো, তবেই বুঝতে পারবে, এমন করে সব কিছু উল্টে-পাল্টে দিতে নেই।

নীরজা—এই জন্যেই সুকু তোমার কাছে আসতে চাইল না।

—কী জন্যে?

—যা বোঝ না, তাই নিয়ে খামকা যত আপত্তির ধর্মকথা বলো না। তুমি তো কাউকে সুখে রাখতে পারলে না, আমরা যা-হোক নিজের বুদ্ধিতে আর চেষ্টাতে সুখে থাকবার একটু চেষ্টা করছি। এর মধ্যে তুমি যে কী ভুল দেখলে, কী অন্যায় দেখলে, তা তুমি জান, আর তোমার রায়গঞ্জের রাধানাথ জানেন।

—নীরু! চেঁচিয়ে ওঠেন লোকনাথ।

—কী বলো? চেঁচিয়ে ওঠেন নীরজা।

—রাধানাথ সত্যই জানেন। বলতে গিয়ে পঙ্গু লোকনাথের গলার স্বর যেন একটা গর্জন হয়ে বেজে ওঠে। কিন্তু উজ্জ্বল হয়ে হাসতে থাকে নীরজার দুই চোখ। আমি আসছি, বলতে বলতে সিঁড়ি ধরে নেমে যান নীরজা।

এই রকম এক-একটি ঘটনা; এই এক বছরের এক-একটি আচমকা বিস্ময়ের মত লোকনাথের পঙ্গু জীবনের অনেক মুহূর্তকে চমকে দিয়েছে, কখনও ব্যথা দিয়ে, কখনও বা ভয় পাইয়ে দিয়ে। সবচেয়ে বেশি উল্লাস নিয়ে যে কথাটা বলেন নীরজা, সেটা হল দেবু নামে সৌভাগ্যের কথা। দেবু আমার ছেলের মত নয়, ছেলের চেয়েও আপনজন। দেবু থাকতে আমার কোনও চিন্তা নেই। দেবু ছিল বলেই তো মিতু আর পিয়া দুই বোনে শখ করে একবার শিলং বেড়িয়ে আসতে পেরেছে। শিলং-এ যাবার প্লেনের ভাড়া, শিলং-এর হোটেলে এক সপ্তাহ থাকবার খরচ, সবই দেবু দিয়েছে।

একদিন পিয়ালীর গলার স্বর শুনে লোকনাথের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। পিয়ালী এসে বলে গেল, আমি নাচের ডিপ্লোমা পেয়েছি, বাবা। মণিপুরি আর কথাকলি খুব ভাল শিখেছি। মোহনের বোন রেণু খোসলা বলেছে, এইবার, পোলকা আর বুগি-উগি শিখিয়ে দেবে।

শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েন লোকনাথ।

মিতু এসে একদিন বলে গিয়েছে—আমি পাস করেছি, বাবা। ডমেস্টিক সায়েন্সে আরএকটু হলে লেটার পেয়ে যেতাম। ভাবছি, এম-এ পড়ব কিনা।

শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েন লোকনাথ। এসব যেন এক অকল্প জগতের যত কলরব, তার অর্থ কিছু স্পষ্ট করে বুঝতে পারে না লোকনাথ। শুধু বুঝতে পারেন, তিনি হার মেনে যেখানে একবার থেমে গিয়েছেন, সেখানে এরা কেউ হার মানেনি, থেমেও যায়নি, সবাই চলেছে, এগিয়ে

যাচ্ছে। রায়গঞ্জ ওদের কাছে এখন একটা মিথ্যা বিভীষিকা মাত্র।

আজ সকাল থেকে এই সাত নম্বর হরি দত্ত লেনের নীচের তলার দুটি ঘরে যে উৎসবের মুখরতা উতরোল হয়ে বাজছে, সে উৎসবেরও কোনও খবর রাখেন না লোকনাথ। শুধু জানেন, ওদের জীবনে নিশ্চয় কোনও নতুন সুখের হাসি ফুটে উঠেছে। তাই এই উৎসব।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বীণা সেদিন এসে বলে গিয়েছিল, মিতুর চাকরি হয়েছে, বেশ ভাল চাকরি। মাইনে প্রায় তিনশো টাকা। সেই জন্য শিগগির একদিন খাওয়া-দাওয়ার একটা উৎসব করা হবে।

ঠিকই বুঝেছেন লোকনাথ। আজ এই বাড়ির জীবনে একটা নতুন উৎসবের সাড়া জেগেছে। মিসেস কার্ভালোর কিচেন থেকে অনেক খাবার এসেছে। শুধু জানেন না যে, যাকে প্রীতি আর কৃতজ্ঞতার ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা করবার কথা, সে মানুষটি এরই মধ্যে এই সকালেই এসে নীচের তলার একটি ঘরে বসে আছে।

দুপুর হল, উৎসবের হর্ষ মৃদু হতে হতে নীরবও হয়ে গেল। বোঝা যায় না, নীচের তলার ঘরে কেউ আছে কিনা। কিন্তু সিঁড়িতে আগন্তুক পায়ের মৃদু শব্দ বাজে। দেবু উঠে এসে লোকনাথের ঘরে ঢোকে, আর বিছানার কাছে গিয়ে ডাক দেয়—কেমন আছেন?

—কে তুমি? ও তুমি! তাই বলো! চমকে উঠলেও বেশ উদাস স্বরে, যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথা বলেন লোকনাথ।

—হ্যাঁ, আমি। হাসতে থাকে দেবু। —ওরা আমাকে নেমন্তন্ন করেনি, তবু আমি এসেছি। শুধু আপনাকে একটু দেখে যাবার জন্য।

লোকনাথ—তোমাকে নেমন্তন্ন করেনি; তবে কাকে নেমন্তন্ন করল?

দেবু হাসে—সুললিতের নেমন্তন্ন ছিল। সে-ই এসেছিল।

—সুললিত? সে কে?

দেবু—সুকুর বন্ধু সুললিত সরকার। চমৎকার মানুষ। সুললিতের বাবা খুব বড় অ্যাটর্নি, চারটে চা-বাগান আছে। বাপের একমাত্র ছেলে সুললিত। কাজেই, সুললিতের জীবনে টাকা-পয়সার কোনও অভাব নেই।

লোকনাথ—বুঝলাম। কিন্তু সুললিতের নেমন্তন্ন কেন?

দেবু—সুললিতের সঙ্গে আপনাদের মেয়ে মিতালীর বিয়ে হবে। সুললিতই চেষ্টা করে মিতালীর চাকরি যোগাড় করে দিয়েছে।

—তুমি মিথ্যে কথা বলছ দেবু। হতে পারে না; অসম্ভব। তুমি ভুল করে এসব কথা বলছ।

দেবু—না, ভুল করে নয়। আপনি সুকুকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখবেন।

দেবুর মুখের দিকে দুই চোখের স্তব্ধ সাদাটে দৃষ্টিটাকে মেলে দিয়ে শুধু তাকিয়ে থাকেন লোকনাথ। দেবু বলে—আপনি কিন্তু দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি অভিযোগ করতে আসিনি।

—তোমার কোনও অভিযোগ নেই?

—না।

—তুমি কি এই একটা বছর এই বাড়ির সব দরকারের টাকা যোগাওনি?

—হ্যাঁ, টাকা দিয়েছি। কিন্তু তাতে কী হয়েছে?

—তোমার সঙ্গেই তো মিতুর বিয়ে হবে বলে কথা ছিল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু সেসব কথা আমি এখন মনে আনি না।

—এজন্য তোমার মনে কোনও রাগ নেই?

—না।

—এদের ওপর একটু ঘৃণা হয় না?

—না।

—কেন?

—মিতালী সুখী হয়েছে, বাস, আমার তো আর কিছু জানবার দরকার হয় না।

—তার মানে?

—মিতালী সুখী হলেই, আমি সুখী।

দুই হাত দিয়ে দেবুর একটা হাত আঁকড়ে ধরেন লোকনাথ।—তোমাকে চিনলাম দেবু। রাধানাথ তোমাকে সুখে রাখুন।

দেবু—নিশ্চয়, আপনার আশীর্বাদ যখন আছে, তখন আমি সুখে থাকবই।

লোকনাথ—তুমি তো এই কলকাতারই ছেলে? শ্যামবাজারে থাক?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু আর শ্যামবাজারে থাকব না।

—কেন?

—বাড়ি বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

—এ বাড়ির সুখের দাবি মেটাবার দায়ে? তাই না?

—এসব কথা তুলবেন না। যা হল ভালই হল; এ বিশ্বাস আমার আছে।

চোখে হাত বুলিয়ে চোখ মোছেন লোকনাথ।—দেবু?

—বলুন।

—তুমি এর পর কোথায় থাকবে? আমাকে ঠিকানাটা লিখে দিয়ে যাও।

—যে আজ্ঞে।

পকেট থেকে কাগজ বের করে ঠিকানা লেখে দেবু।—যাচ্ছি দমদমের বসাকবাগানে একটি ভাড়া-বাড়িতে। মন্দ নয় বাড়িটা। আশি টাকা ভাড়া।

লোকনাথ—আমাকে একটা কথা দিয়ে যাও, দেবু।

—বলুন।

—আমি যদি কখনও তোমাকে ডাকি, তবে তুমি আসবে?

—নিশ্চয় আসব। সে কথা কি বলতে হবে?

লোকনাথ—এসো তবে। তুমি যদি বয়সে আমার চেয়ে এত ছোট না হতে, তবে আমি আজ তোমার পা ছুঁয়ে...।

—ছি-ছি! ও কথা বলতে নেই। বলতে বলতে লোকনাথের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে দেবু। চলে যায় দেবু।

নয়

নীরজা বলে—কী হয়েছে? তখন থেকে এত চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করছ কেন?

লোকনাথ বলেন—একটা কথা বলবার জন্যে ডেকেছি।

নীরজা—বলো

লোকনাথ—দেবুর ঠিকানা আমার কাছে আছে। হয় তুমি, নয় সুকু, কিংবা টুনি একবার দেবুর কাছে গিয়ে মাপ চেয়ে এসো।

নীরজা—কেন? কী অপরাধ করলাম যে মাপ চাইতে হবে?

লোকনাথ—ফুলকে ছিঁড়লেও পুজোর থালায় রাখতে হয়, কাদার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয় না।

—একথার মানে?

—দেবুকে তুচ্ছ করো না।

—তুচ্ছ তো করছি না। মিতু বলেছে, দেবুর উপকারের সব টাকা একদিন শোধ করে দেওয়া হবে।

—টাকা শোধ হতে পারে বটে; কিন্তু দেবুর উপকার শোধ করা সম্ভব নয়।

নীরজা হাসেন—মানুষের মন কি লোহা, যে বদলাবে না?

—কী বলছ তুমি? বুঝতে পারছি না।

—মিতুর যদি মনে হয় যে, দেবুর চেয়ে ললি অনেক—

লোকনাথ—ললি কে?

নীরজা—আমাদের সুললিত। মিতু যদি বিশ্বাস করে যে, ললির সঙ্গে বিয়ে হলেই সুখী হবে মিতু; তবু কি দেবুকেই বিয়ে করবে মিতু? এটা কি আত্মবঞ্চনা নয়? শুধু এক বছর আগের একটা কথার জন্য নিজের জীবনটাকে ঠকাবে মেয়েটা? ছি ছি, এমন কথা বলতে তোমার একটু লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল।

লোকনাথ—লজ্জা পাচ্ছি না; কিন্তু বেশ একটু ভয় পাচ্ছি, নীরু। এরকম করে সব উল্টে-পাল্টে দিও না।

নীরজা—এই জন্যেই সুকু আগে থেকে সাবধান করে দিয়েছে; বাবাকে কোনও কথা বলো না, মা। বাবা শুধু বাধা দিতে আর আপত্তি করতে জানে। আর কিছু করবার ক্ষমতা নেই।

লোকনাথ—ঠিক কথা। ঠিকই বলেছে সুকু। তবু আমি বলছি, দেবুকে তুচ্ছ করো না।

নীরজা—দেবুকে তুচ্ছ করবার কোনও কথাই নেই। দেবুও ভালই জানে, ললির তুলনায় সে কিছুই নয়।

লোকনাথ—কিন্তু এই সুললিত কি দেবুর মত মায়া নিয়ে...।

—তার চেয়ে বেশী মায়া নিয়ে ললি আমাদের কাছে এসেছে। দেবু তো তোমার মেয়েকে বিয়ে করে নিজের ঘরে নিয়ে যেত।

—সেটাই তো নিয়ম। তাতে রাগ করবার কী আছে?

—মানুষ কি নিয়মের চাকর? না, নিয়ম হল মানুষের চাকর?

—দুইই সত্যি।

—না, আমাদের দরকারে যে নিয়ম সাজে, আমরা সেই নিয়ম মানব।

—তার মানে, সুললিত তোমাদের ঘরজামাই হবে।

—রায়গঞ্জের ভাষায় কথা বলতে হলে, তাই বলতে হয়। কিন্তু ঘরজামাই নয়, ললি আমার কাছে ছেলের মত। তাই বা বলি কেন? ছেলের চেয়েও বেশি। নিজের ছেলে তো আজ পর্যন্ত নিজের টাকায় নতুন বউকে একটা শাড়ি কিনেও দিতে পারল না। কিন্তু ললি এরই মধ্যে তোমার ছেলের বউকে সোনার হার দিয়েছে।

লোকনাথ—আর শুনতে চাই না।

নীরজা হাসেন—তবে চুপ করে শুয়ে থাক আর ঘুমোও।

—ললিদা! ললিদা এসেছে। শুনতে পেয়েছেন নীরজা, চেঁচিয়ে কথা বলছে পিয়া। ললির গাড়ির হর্নের শব্দও বেজে উঠল।

নীরজা ব্যস্ত হয়ে নীচে নেমে আসেন। আর পিয়া ব্যস্ত হয়ে সুললিতের গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে নেমে, পিয়ার দুরন্ত উল্লাসের শরীরটাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে; হাসতে হাসতে, আর আস্তে আস্তে হেঁটে বাড়ির বারান্দার উপরে এসে দাঁড়ায় সুললিত।

নীরজা হাসেন, সুকুও হাসে, আর পিয়াও ছটফট করে হাসে—আমাকে ছেড়ে দিন, ওই ঘরের ভিতরে যান।

এই তো মাত্র তিন মাস আগে, দেবুর কলেজের কমনরুমে সুকুর সঙ্গে এই সুললিতের প্রথম দেখা আর আলাপ। এক বন্ধুর ছোট ভাইকে কলেজে ভর্তি করবার জন্য এসেছে সুললিত, দেবুরই ছাত্রজীবনের বন্ধু সুললিত । সুকুর সঙ্গে সুললিতের পরিচয় তো দেবুই করিয়ে দিয়েছিল। আর সুকু নিজেই উৎসাহিত হয়ে সুললিতকে তখন চা খেতে নেমন্তন্ন করে সাত নম্বর হরি দত্ত লেনের এই বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। আর মিতুও নিজেই চা নিয়ে সুললিতের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

মিতুর মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে অপলক হয়ে গিয়েছিল সুললিতের দুই চোখ। যেন অনেকদিনের হারানো একটা সুস্বপ্নকে আজ হঠাৎ ভাগ্যক্রমে আবিষ্কার করতে পেরেছে সুললিত। সুললিতের চোখে বিস্ময়, আর বিস্ময়ের মধ্যেও অদ্ভুত একটা মুগ্ধতা।

চা খাওয়া শেষ হতেই সুললিত বলে—ওয়ার্ডসোয়ার্থ প্রথম যখন মেরিকে দেখলেন, তখন তাঁর কী মনে হয়েছিল, জানেন তো?

মিতু হাসে—জানি না। আমি ইংলিশে অনার্স নিইনি।

সুললিত—ওয়ার্ডসোয়ার্থের মনে হয়েছিল, মেরি যেন ফ্যান্টম অব ডিলাইট।

মিতু—আমাকে দেখে কোনও বোকা ওয়ার্ডসোয়ার্থের মনেও এরকম কোনও ধারণা হবে না।

সুললিত—জানি না; তবে আপনার সঙ্গে আমি কোনও তর্ক করব না।

সুকু—ওকে আপনি আবার আপনি করে বলছেন কেন?

সুললিত—বেশ তো, আর কখনও বলব না।

সেদিনই সুললিতের চলে যাবার সময় মিতু বলেছিল—আবার কবে আসছেন?

সুললিত—আমাকে ওরকম আপনি করে বললে কোনওদিনও আসব না।

মিতু সঙ্গে সঙ্গে বলে—কবে আসবে বলো?

সুললিত — তুমি আসতে বলছ?

মিতু—হ্যাঁ।

সুললিত—তবে, কালই একবার আসব।

সুললিত চলে যাবার পরে সেদিনই এ বাড়ির সবাই বুঝতে পারে, এই সুললিত যেন একটি আশ্চর্যের রূপকথা। শুধু চা বাগান থেকেই বছরে আয় হয় প্রায় এক লাখ টাকা। সুকু বলে—দেবু নিজেই সুললিতের অবস্থার অনেক কথা বলেছিল। ওই সুললিত বাপের একমাত্র ছেলে। বেহালাতে তিনতলা বাড়ি আছে। শুধু হাত খরচের জন্য বাপের কাছ থেকে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা পায় সুললিত। কিন্তু বেঁচে থাকতে ছেলের প্রতি এর চেয়ে বেশি কোনও উদারতা আর দেখাবেন না অ্যাটর্নি পিতা, পি এন সরকার, প্রিয়নাথ সরকার। বাপের সঙ্গে ছেলের একটা মন-কষাকষির ব্যাপার আছে। পি এন সরকারের ইচ্ছা, তাঁর কুটুম্ববন্ধু নরেন দত্তের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে হোক। কিন্তু সে মেয়ে সুললিতের একটুও পছন্দ নয়। সে মেয়ে দেখতে মন্দ নয়, কিন্তু গ্ল্যামার বলে কিছু নেই। সে মেয়ে রাঁধে ভাল, গান করে ভাল, এম-এ পড়ে; কিন্তু সকাল-সন্ধ্যা আবার গীতা পড়ে।

হেসে ফেলেন নীরজা। মিতু আর পিয়াও হাসে। সুকু বলে—আমার ধারণা, মিতুকে সুললিতের চোখে খুবই চার্মিং বলে বোধ হয়েছে।

ভুল ধারণা করেনি সুকু। দশটি দিন এ বাড়িতে যাওয়া-আসা করবার পর সুললিত নিজেই একদিন বুঝিয়ে দিল যে, মিতুকে সুললিত ভালবেসেছে। দরজার পর্দা সরিয়ে দিতে গিয়ে সে দৃশ্য দেখতে পেয়েছিল পিয়া; ওই ঘরের ভিতরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আর মিতুকে দুই হাতে বুকের উপর জড়িয়ে ধরে রেখে, মিতুর কপালে চোখে ও মুখে চুমোর বৃষ্টি ঝরিয়ে দিয়েছিল সুললিত। ফুঁপিয়ে উঠেছিল মিতু, তোমার পায়ে পড়ি ললি, আর আমাকে মিথ্যে স্বপ্ন দিয়ে ভুলিয়ে রেখো না।

—মিথ্যে? সুললিত আশ্চর্য হয়ে তাকায়।

মিতু—তবে এখনও স্পষ্ট করে বলছ না কেন?

—এই কথা। হেসে ফেলে সুললিত, আর মিতুর হেপবার্ন খোঁপার সঙ্গে গাল ঠেকিয়ে দিয়ে প্রাণের ভিতরে চাপা একটা স্বপ্নের ভাষা উথলে দেয়—তবে মিতু; আমার সবার আগের কাজ হবে, বাবাকে জিজ্ঞেস করা, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে বাবা রাজি আছে কিনা। যদি তিনি রাজি না হন, তোমাকে যদি আমি বেহালার বাড়িতে নিয়ে যেতে না পারি, তবে আমাকেই তোমাদের এই বাড়িতে এসে থাকতে হবে।

মিতু—আসল কথাটাই তো বাদ দিলে।

সুললিত—বিয়ে? সে তো এর মধ্যে যে কোনও একটি দিনে হয়ে যেতে পারে। যেদিন বলবে, সেদিনই।

সুললিতের পকেট থেকে রুমাল বের করে নিয়ে, এক হাতে সুললিতের কপালে রুমাল বুলিয়ে দিতে থাকে মিতু। সত্যিই যে ললির নিঃশ্বাসটা বড় উষ্ণ, কপালে কুচি-কুচি ঘামের ফোঁটাও চিকচিক করছে। মিতু বলে—কিন্তু তোমার বাবা যদি রাগ করেন, তবে তোমাকে তো দুশ্চিন্তায় পড়তে হবে।

—কিসের দুশ্চিন্তা?

—দার্জিলিংয়ের চা বাগান, বেহালার বাড়ি, তোমার বাবা তাঁর এসব সম্পত্তি কি কোনওদিন তোমার হাতে ছেড়ে দিতে চাইবেন?

—এই কথা! হেসে ফেলে সুললিত।—সে জন্যে আমার কোনও ভাবনা নেই, মিতু। আমি জানি, উইল করে সব সম্পত্তি আমাকেই দিয়েছেন, বাবা; কোনও দাতব্য সেবার মিশনকে দেননি? তা ছাড়া, বাবার রাগ! সে তো পদ্মপত্রনীর। রাগের পরে দু'চার দিন মেজাজ গরম করে রাখবেন, তারপর একদিন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়বেন, তারপর সেই রাগ টুপ করে ঝরে পড়ে যাবে।

ভাগ্যিস এসব কথা কান পেতে শুনতে পেয়েছিল পিয়া; তাই নীরজা আর সুকুও জানতে পেরেছে। কিন্তু এছাড়া আর যা দেখেছিল, এবং আর যে কথা শুনেছিল পিয়া, তার সবই একটা নতুন প্রাণের জগতের বিস্ময় হয়ে পিয়ার চোখ দুটোতে চমৎকার একটা সুখের বেদনা ভরে দিয়ে নিবিড় করে দিয়েছিল। জানালার ফাঁক থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারেনি পিয়া। সত্যি, এই ললিদা যেন চুমো-খাওয়া আর জড়াজড়ি করা একটা উৎসবের হিরো। ভালবাসার অনেক নাটক-নভেল পড়েছে পিয়া কিন্তু তার মধ্যে ললিদার মত কোনও হিরোর সাক্ষাৎ পায়নি। সেই গোবেচারা দেবুদা, মিতুদির সঙ্গে এক সোফায় বসতে যার শরীরটা লজ্জায় কুঁকড়ে যেত, তার সঙ্গে এই ললিদার কত তফাত। ঢিপ ঢিপ করছে পিয়ার বুকটা, তবু জানালার ফাঁক থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারেনি। কী আশ্চর্য, মিতুদি যে একটি বারও 'না' বলে সামান্য একটা আপত্তিও করল না। হেপবার্ন খোঁপার ছাদ খুলে গিয়েছে; যেন এলোমেলো ফুলের গুচ্ছের মত ভাঙা-ভাঙা হয়ে সোফার উপর পড়ে গেল মিতুদি। কী অদ্ভুতভাবে আর কত শক্ত ক'রে মিতুদির ওই নরম শরীরটাকে আঁকড়ে ধরলেন ললিদা। না, ললিদা সত্যিই অদ্ভুত চমৎকার সুন্দর সাহসের আর আনন্দের মানুষ।

সেদিন শুধু একা পিয়ালীই বুঝতে পেরেছিল, ললিদার সঙ্গে মিতুদির বিয়ে তো হয়েই গিয়েছে, বাকি কিছু নেই, শুধু বাকি আছে একদিন বিয়ের রেজিস্টারের কাছে যাওয়া, আর খাতায় সই করা।

আর তিনমাস পরে, যেদিন মিতালীর পাসের খবর বের হল, সেদিন নয়। আরও একমাস পরে, যেদিন মিতালীর একটা চাকরি হল, সেদিনই বিয়ে হয়ে গেল। রেজিস্টারের সামনে যখন দু'জনে বসেছিল, তখন সুললিতের জামার বুকের বোতামঘরে মস্তবড় একটি লাল গোলাপ পরানো ছিল; আর মিতালীর হেপবার্ন খোঁপার সঙ্গে একটি হলদে গোলাপ।

শাঁখ বাজেনি, তবে রায়গঞ্জের মানুষটি বুঝবেন কী করে যে, এবাড়িতে দুই-জীবনের মিলনের উৎসব হয়েছে। কিন্তু সন্ধ্যার পর পুত্রবধূ সেই বীণা, যার মুখে সদা-সর্বদা একটা অদ্ভুত শান্তির হাসি লেগে থাকে, সেই উপরতলার ঘরে এসে রায়গঞ্জের রুগ্ন মানুষটিকে জানিয়ে দিল, সুললিতবাবুর সঙ্গে আজ মিতুর বিয়ে হয়ে গেল।

চমকে উঠলেন না লোকনাথ; বন্ধ চোখ দুটোকে খুলে একবার তাকালেনও না; একটি কথাও বললেন না।

হ্যাঁ, মিতু আর সুললিত একবার উপরতলার ঘরে এসে লোকনাথের খাটের কাছে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সেই আগমন আর উপস্থিতির কোনও সাড়া লোকনাথের গভীর ঘুমটাকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিতে পারেনি। মিতু শুধু বলে—বাবা ঘুমোচ্ছেন, ভালই। ঘুম ভাঙিয়ে লাভ নেই।

মিতু আর সুললিত চলে যাবার পর চমকে ওঠেন, ধড়ফড় করেন, আর চোখ মেলে তাকান লোকনাথ। বোধ হয়, কোনও দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছেন। ঠিকই, অনেকদিন পরে পুত্রবধূ বীণার কাছে একটা স্বপ্নের গল্প বলেন লোকনাথ। স্বপ্নে দেখা গেল, একটা শ্মশানের মাঠ, রাতের অন্ধকারে সেই মাঠের বুকে অনেক আলেয়া দৌড়চ্ছে। আলেয়াগুলো যেন ঝকঝকে ও সুন্দর এক-একটা হাসিমুখের জ্বলন্ত ছবি। শ্মশানের মাঠ থেকে ছুটতে ছুটতে আলেয়াগুলো যেন কানা নদীর একটা কাদাড়ের উপরে গিয়ে আছাড় খেয়ে লুটিয়ে পড়ল।

বীণা বলেছে, তাই জানতে পেরেছেন লোকনাথ, টুনি এখন চাকরি করছে। আর টুনির স্বামী সুললিত এখন এই বাড়িতেই থাকে।

নীরজা কি উপরতলার এই ঘরে আজকাল আর আসেন না? আসেন বইকি। মাঝে মাঝে আসেন। একদিন এসে খুশির আবেগে নিজেই বলে গিয়েছেন—ললির চেষ্টাতেই মিতুর চাকরিটা হয়েছে। ললির এক সিন্ধি বন্ধুর কারবারের অফিসে কাজ পেয়েছে মিতু। অফিসের গাড়ি মিতুকে নিয়ে যায়, আবার অফিসের গাড়ি এসে মিতুকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায়। মিতু বলে—কাজ বলতে তো ওই কাজ, দুটো-তিনটে যোগ আর বিয়োগ, ব্যস্। বস মিস্টার বাসবানি বলেন, মিতালী সরকার আমার অফিসের শুধু একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট নন, উনি আমার অফিসের নতুন চার্ম অ্যাণ্ড বিউটি।

শুনতে শুনতে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন লোকনাথ; তাই কোনও কথা বলেননি। আর নীরজাও সেই অদ্ভুত অসাড়তার কাছে আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে না থেকে চলে গিয়েছিলেন। অনেক কাজ বেড়েছে নীরজার। বীণা অনেক সময় ঠিক বুঝতে পারে না কিংবা ভুলেই যায় যে, সকাল দশটায় ললিকে আর একবার কফি দেওয়া দরকার। সকাল ন'টার সময় কারখানার কাজে যায় সুকু; তারপরেই যেন আনমনা হয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে বীণা। হুঁস থাকে না যে, দশটা বাজতে চলেছে। নীরজা তাই মাঝে মাঝে বেশ জোর গলায় চেঁচিয়ে বীণাকে ডাক দেন—কী গো মেয়ে, সুকুর লুচি তৈরি করে দিয়েই কি সব কাজ হয়ে গেল, মনে কর? ললির জন্য কফি তৈরি করতে হবে না?

ঠিকই বলেছেন নীরজা। সুকুর কারখানার কাজে যাবার আগে, ঠিক সকাল ন'টার সময় সুকুর জন্য আট-দশটা লুচি ভেজে দেবার পরেই যেন হাঁপিয়ে পড়ে বীণা। হঠাৎ উদাস হয়ে যায়; চুপ করে বসে থাকে।

নীরজা মাঝে মাঝে আরও স্পষ্ট করে এ বাড়ির জীবনের বাস্তব সত্যটাকেও বুঝিয়ে দেন—যার জন্যে এ বাড়ির সবাই সুখে আছে, তারই কথা ওরকম করে ভুলে গেলে চলবে কেন, বীণা? বুঝতে পেরে বীণা সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে সুললিতের জন্য কফি তৈরি করতে থাকে।

অনেকদিন পরে একদিন, সেদিন সকাল থেকেই ঝুরঝুর করে যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, সে বৃষ্টি আর থামছে না। লোকনাথের ঘুমের ঘোর আর স্বপ্নের ঘোর দুই-ই যেন একটা শব্দের আঘাত পেয়ে ভেঙে গেল। নড়ে উঠেছে লোকনাথের খাট, খাটের নড়বড়ে পায়াটাও ঘষা খেয়ে বিশ্রী একটা শব্দ করেছে।

—কে? কে? চমকে ওঠেন, আর প্রশ্ন করেন লোকনাথ।

বীণা বলে—ছাদের ফাটল দিয়ে জল ঢুকে আপনার বিছানাটাকে ভিজিয়ে দিচ্ছে, তাই খাটটাকে

টেনে একটু সরিয়ে দিলাম।

শুধু ঝুরু ঝুরু বৃষ্টির শব্দ। বাড়িটার কোনও ব্যস্ততার সাড়া-শব্দ শোনা যায় না। বীণা বলে—আমি আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি।

লোকনাথ—বলো।

বীণা—আমি আর এ বাড়িতে থাকতে পারব না, থাকব না।

—কেন?

—আপনাদের জামাই আমাকে তাঁর একজন সেবাদাসী বলে মনে করেন।

—তার মানে?

—মিতু যখন অফিসে যায়; পিয়া কলেজে যায়; আর মা যাদবপুরে বেড়াতে যান, যখন বাড়িতে কেউ থাকে না, তখনই সুললিতবাবু আমাকে তাঁর ঘরে যেতে ডাক দেন।

—কেন?

—তাঁর মাথায় পাখার বাতাস দিতে বলেন।

—তুমি কী বল?

—আমি বলেছি, আমার দ্বারা ওরকম ছোটলোকের কাজ সম্ভব নয়।

—সুকুর মা কি এসব কথা জানে; তাকে বলেছ?

—জানেন, বলেছি।

—কী বলেন সুকুর মা?

—উনি আমারই ওপর রাগ করেন। উনি বলেন, আমারই মনটা ছোটলোকের মন হয়ে গিয়েছে।

—হ্যাঁ হয়েছে। সিঁড়ির মুখের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলেন নীরজা। চমকে ওঠে বীণা; কে জানে কখন, বোধ হয় এইমাত্র যাদবপুর থেকে উনি ফিরেছেন।

বীণা বলে—তাই যদি মনে করেন, তবে আমাকে এ বাড়ি থেকে চলে যেতে বলুন।

নীরজা—হ্যাঁ, তাই বলছি। তুমি ললিকে যদি অপমান কর, তবে এ বাড়িতে তোমার ঠাঁই হতে পারে না।

বীণা—তবে তাই হোক, আমি আজ এখনই চলে যাব।

লোকনাথের ধোঁয়াটে চোখের চাহনিটা জ্বলজ্বল করে, আর নীরজার দুই চোখের তারা যেন রুষ্ট হয়ে ছটফট করতে থাকে। কারণ, দুজনেই দেখতে পেয়েছেন, বীণার মুখের ওই শান্ত হাসিটা যেন আগুনের শিখা হয়ে দাউ-দাউ করে জ্বলছে।

সুকুমার আসে, আশ্চর্য হয়ে তাকায়—এখানে কিসের এত হল্লা?

নীরজা বলেন—তোমার বউ আর এ বাড়িতে থাকবে না। এখনই চলে যাবে। তোমার যদি ইচ্ছে হয়, তবে তুমিও...।

সুকু—তুমি আমাকেও চলে যেতে বলছ?

নীরজা—তোমাদের মনে যদি ললির মান-সম্মানের জন্য কোনও দরদ না থাকে, তবে তোমাদের এখানে থেকে লাভ কী?

সুকুর ভীরু চোখ দুটো অদ্ভুত হয়ে কাঁপতে থাকে।—আমি তো তোমারই দলে, তবু আমাকেও

চলে যেতে বলছ?

নীরজা—আপন ছেলে হয়েও তুমি আজ পর্যন্ত মা বাপ বোনের জন্য কোন সুখের কাজটা করতে পেরেছ? আপন ছেলেও আপন নয়, যদি সে সংসারের কোনও কাজে না আসে। আর পরের ছেলেও আপন হয়, যদি সে আপনজনের মত কাজ করে।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে সুকু—এরপর আমি আর কী বলতে পারি?

সুকুর গলার স্বরে যেন জলে ডুবে যাওয়া মানুষের আর্তনাদের বুদ্বুদের মত মৃদু-করুণ শব্দ। বীণা এগিয়ে এসে সুকুর হাত ধরে টান দেয়—চলো।

সুকু ফ্যালফ্যাল করে তাকায়—অ্যাঁ? সত্যিই যাবে?

—হ্যাঁ।

বৃষ্টি থামেনি; কিন্তু আর দেরি করে না বীণা। সুকুর একটা হাত ধরে রেখে আর টান দিয়ে দিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে যায়। তারপর ওদের আর দেখা যায় না।

বিদ্যুৎ চমকে উঠেছে। নীরজার দিকে তাকিয়ে কথা বলেন লোকনাথ—এইবার একটা বাজ পড়লেই ভাল হয়।

নীরজা—তুমি যেন আমাকে ঠাট্টা করছ বলে মনে হচ্ছে?

লোকনাথ—ঠাট্টা নয়; ঠাট্টা করবারও শক্তি আমার নেই। আমি শুধু তোমাকে বলতে—

—কী?

—শত হোক, সুকু তোমারই ছেলে। পাগল হোক ছাগল হোক, ওকে এভাবে তাড়িয়ে দিও না।

—কিন্তু ললি কি আমার কাছে ওই ছেলের চেয়েও বেশি আপন ছেলে নয়?

—রাধানাথ জানেন।

—তবে তুমি আর কথা বাড়িয়ো না।

দশ

অনেক শিখিয়ে আর বুঝিয়ে দিলেও রান্নার কানা ঠাকুরটা কফি তৈরি করতে পারে না। অগত্যা নীরজা নিজেই সকাল দশটার কফি নিজের হাতে তৈরি করেন।

সারাদিন ঘরেই থাকে ললি, শুধু সন্ধ্যা হলে এক-একদিন বালিগঞ্জের ক্লাবে তাস খেলতে যায়।

ললির বাড়ির গাড়ি এ বাড়িতে আর আসে না। কারণ, বিয়ের পর যেদিন এ বাড়িতে এসে নতুন জীবনের নীড় বেঁধে ফেলেছে ললি, সেদিন থেকে বেহালার বাড়ি থেকে গাড়ি আসা বন্ধ হয়েছে।

ললির বাবা অ্যাটর্নি প্রিয়নাথ রায়, সত্যিই একটু বেশি কড়া স্বভাবের মানুষ; তা না হলে এরকম কাণ্ড করবেন কেন? ভাবতে গিয়ে নীরজা প্রায়ই মাঝে মাঝে বেশ অপ্রসন্ন হয়ে যান।

ললির মনে কিন্তু বাপের উপর একটুও অপ্রসন্নতা নেই। নীরজা কথাটা ওঠালেই হেসে ফেলে সুললিত :—আর কটা দিন একটু ধৈর্য ধরুন। দেখতেই পাবেন, বাবার চিঠি এসে আমাকে ডাকছে। সত্যি, বাবার বাইরেটা যতই কঠোর হোক; ভেতরটা খুবই নরম। আমাদের বাড়িতে আমার বাবা-মা'র যত ফটো আছে, তার সবগুলিতেই দেখতে পাবেন, আমি মায়ের কোলে নয়, বাবার কোলে

বসে আছি।

বাবার কাছ থেকে প্রতিমাসে যে একটি হাজার টাকা সুললিত তার হাত খরচের জন্য পেত, সে টাকাও আর সুললিতের হাতে আসে না। টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন প্রিয়নাথবাবু।

—কিন্তু আর কতদিন? বলতে গিয়ে হেসে ফেলে সুললিত। বিশ্বাস করুন, একদিন মা-মরা ছেলের জন্য হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলবেন পিতা, আর লোকের হাত দিয়ে টাকাটা পাঠিয়ে দেবেন।

নীরজা হাসেন—সে কথা আমি খুব বিশ্বাস করি।

মিতুও একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে আর ঘরের ভিতরে ঢুকে চমকে ওঠে। সুললিতের মুখের দিকে বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে তাকায় মিতু, আর হাসতে থাকে।

সুললিত—হাসছ কেন?

মিতু—একটা ম্যাজিক বলে মনে হচ্ছে, তাই হাসছি।

সুললিত—কিসের ম্যাজিক?

মিতু—আমি তো স্মিথের ক্যান্থারাইডিন ব্যবহার করি, কোনও দেশি তেল আমি মাথায় মাখি না।

সুললিত—তার মানে?

মিতু—তার মানে, আমার বালিশে চামেলী আতরের গন্ধ এল কি করে? মোহন খোসলা তো পিয়াকে চামেলি তেল উপহার দিয়েছে; পিয়া আজকাল ওই তেলই মাথায় মাখে।

সুললিত হাসে—হ্যাঁ, ম্যাজিক বটে। তবু মনে হয়, আমি যখন পোস্ট অফিসে গিয়েছিলাম, তখন বোধহয় তোমার ছটফটে স্বভাবের বোনটি এই ঘরে এসে আর বিছানায় গড়িয়ে পড়ে তোমার বালিশে মাথা রেখেছিল।

মিতু—তাই হবে।

সন্ধ্যা হতেই যখন তাস খেলতে বালিগঞ্জের ক্লাবে চলে যায় সুললিত, তখন চেঁচিয়ে ডাক দেয় মিতু—ওরে পিয়া, একবার এঘরে আসবি?

—যাই।

পিয়ালী ঘরে ঢুকতেই এক হাত দিয়ে মুখের হাসিটাকে চাপা দিয়ে কথা বলে মিতু—কী করছিলি?

—শুয়েছিলাম।

—কেন?

—খুব ক্লান্ত, তাই।

—ক্লান্তই বা কেন? আজ তো কোনও জলসাতে তোর নাচের প্রোগ্রাম ছিল না?

—না।

—তবে?

—এমনি।

—না, এমনি নয়। নিশ্চয় ললির সঙ্গে অনেক গল্প করেছিস।

—হ্যাঁ।

—তাই আমার বিছানায় শুয়ে পড়েছিলি।

—অ্যাঁ? হ্যাঁ।

—তাই তোর ললিদা খুব মায়া করে তোকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে।

—হ্যাঁ।

—তাই তোর ঠোঁটের কোণটা এখনও লালচে হয়ে ফুলে রয়েছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, তাই তোর ঘাড়ের ওখানে দাঁতের মত একটা দাগ এখনও বসে আছে।

—কী যে বলছ, কিছু বুঝতে পারছি না।

—তোর ললিদার অভ্যেসটা তো আমার জানতে বাকি নেই। এইবার তুইও জানলি, তাই না?

মুখ ফিরিয়ে আর বিড়বিড় করে কথা বলে পিয়া—হ্যাঁ, ললিদা বার বার ডাকেন, না গিয়ে উপায় কী?

মিতু—আজ প্রথম ডেকেছিল?

পিয়া—না, আরও অনেকবার ডেকেছে। কিন্তু তুমি আমার ওপর রাগ করছ কেন?

মিতু—তোর ওপর একটুও রাগ করছি না। শুধু জেনে নিলাম।

জেনে নেবার পর মিতালীর দুই চোখের হাসি আরও দুরন্ত হয়ে ছটফট করে। আজ মাইনে পেয়েছে মিতালী। নীরজার কাছে গিয়ে, নীরজার হাতের কাছে মাইনের টাকার প্যাকেটটা ফেলে দিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে ওঠে—আমি এখনই একবার বের হব, মা?

—কেন? কোথায় যাবি?

—একটা পার্টি আছে। তাতে আমারও নেমন্তন্ন আছে। মিস্টার বাসবানি আমাকে অনেক করে বলেছেন, আমি যেন অবশ্যই যাই।

নীরজা হাসেন—তবে যা, এ তো ভাল খবর। শুনতে পেয়ে কত খুশি হবে ললি।

সন্ধ্যাবেলা তাসের ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরে খবরটা শোনবার পর সত্যিই খুশি হয় ললি। কী আশ্চর্য, রাত বারোটার পর যখন বাসবানির গাড়ি মিতালীকে পৌঁছে দিয়ে গেল, তখনও খুশি হল ললি। গাড়ি থেকে নেমে মিতালী বাড়ির বারান্দাতে উঠতেই ললি যেন নতুন সুরে ও স্বরে একটা স্বাগত সম্ভাষণের বাণী শোনায়—ওয়েল ডান; আমি জানতাম, বাসবানি একদিন তোমাকে পার্টিতে ডাকবেনই; আর তুমিও কোনও আপত্তি করবে না।

নীরজা বলেন—কিন্তু পিয়াটা কোথায় গেল?

মিতু—পিয়া বাড়িতে নেই?

নীরজা—না।

নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে আর প্রশ্ন করে সুললিত—মোহন খোসলার স্কুটারের শব্দ শোনেননি?

নীরজা—হ্যাঁ, শুনেছি।

সুললিত—তবে তো বুঝতে পারা যাচ্ছে, মোহনের সঙ্গে বের হয়েছে পিয়া।

নীরজা—কিন্তু কোথায়?

সুললিত—পিয়ারও নিশ্চয় একটা প্রোগ্রাম আছে!

নীরজা—কিসের প্রোগ্রাম?

সুললিত—কোনও অনুষ্ঠানে কিছুক্ষণ নাচতে গাইতে হবে, এই আর কী।

না, বাড়ি ফিরতে খুব দেরী করেনি পিয়া। মোহনের স্কুটার বাড়ির সামনে এসে থামে আর চলে যায়। পিয়া এসে বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে।—উঃ, পুলিস সার্জেন্টটা কী বদমাস! প্রায় একটি ঘন্টা পথের উপর আটক করে রাখল, আর পুরো দশটি টাকা ঘুষ নিয়ে তারপর ছেড়ে দিল। নইলে, আরও কত আগে বাড়ি পৌঁছে যেতাম।

না, আর বেশিক্ষণ নয়। সাত নম্বর হরি দত্ত লেনের বারান্দা নীরব হয়ে যায়। শুধু শোনা যায়, দোতলার ঘরে একজন ঘুমন্ত মানুষের নাক-ডাকার শব্দ, আর পাশের পড়ো বাড়ির আঙ্গিনাতে নিমগাছের মাথায় পেঁচার ডাকের শব্দ।

এগার

রিকসা থেকে নামলেন যে মহিলা, তাঁর দিকে নীরজার দুই চোখ যেন একটু অখুশি হয়ে তাকিয়ে থাকে। মহিলাকে দেখে চিনি-চিনি মনে হয়, কিন্তু ঠিক স্পষ্ট করে চিনতে পারা যাচ্ছে না। কিন্তু এটুকু বোঝা যায় যে, এই মহিলা কলকাতায় সুখী জীবনের কেউ নন। খুব সম্ভব, ইনি কলকাতারই কেউ নন। শাড়ির চেহারা ও শাড়ি পরবার ভঙ্গি দেখে বরং মনে হয়, ইনি বোধ হয় রায়গঞ্জের কেউ হবেন। তা না হলে, দুই পায়ে অন্তত ছেঁড়া-ময়লা একজোড়া সস্তা জাতের চটিজুতো থাকত।

আগন্তুক মহিলার হাতে অ্যালুমিনিয়ামের একটা টিফিন-ডিবে। কে জানে, কী বস্তু আছে ওই ডিবের মধ্যে! রিকসাওয়ালার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে মহিলা নীরজার দিকে তাকালেন। হেসে উঠলেন, যেন জীবনের একজন অন্তরঙ্গ বান্ধবীকে দেখতে পেয়ে আনন্দের ও তৃপ্তির হাসি হাসছেন।

মহিলা এগিয়ে এসে বললেন—কেমন আছ গো বড় বউ?

চমকে উঠলেন নীরজা। রায়গঞ্জের মুখের ভাষা দিয়ে কথা বলছে, কে এই মহিলা! বড়-বউ বলে ডাক দিয়ে কথা বলত যে জগতের মেটে ঘরের যত মোটা-সোটা শাঁখাপরা বটার-মা ও ছকুর-পিসি, তাদের চেহারার ছবি নীরজার স্মৃতি থেকে একরকম মুছেই গিয়েছে। স্পষ্ট করে মনে পড়লেও তারা আজ নীরজার কাছে নিতান্ত অর্থহীন স্মৃতির ছায়াজীব বলে বোধ হয়ে থাকে। কিন্তু, কী আশ্চর্য, সেইরকম কোনও ছায়াজীব আজ নীরজার নতুন জীবনের ঘরের রঙিন পর্দাওয়ালা দরজার কাছে এসে দাঁড়াবে কেন? কী উদ্দেশ্য?

সন্দেহ হয় নীরজার, এই মহিলা নিশ্চয় পুরনো কোনো সম্পর্কের ছুতো করে বিশ-পঁচিশ টাকার সাহায্য চাইতে এসেছে। নীরজার গলার নতুন সোনার চেনের ঝকঝকে লকেটের দিকে তাকিয়ে হয়ত একশো টাকার সাহায্য চেয়ে বসবে। নীরজার দুই চোখের ভুরু বেশ অপ্রসন্ন হয়ে একবার শিউরে ওঠে আর কুঁচকে যায়।

আগন্তুক মহিলা বলেন—কী ভাগ্যি, কী ভাগ্যির কথা, রায়গঞ্জের মামাবাবুর লেখা একটা চিঠি পেয়ে জানতে পারলাম, তোমরা এই ঠিকানাতে এখানে আছ। ওঃ, সেই কবে, সেই ভয়ানক আশ্বিনে ঝড়ের বোধ হয় দু'তিন বছর আগে তোমাদের মায়া কাটিয়ে রায়গঞ্জ থেকে কলকাতায় চলে এলাম।

নীরজা—আপনাকে তো চিনতে পারছি না।

মহিলা—আমাকে চিনতে পারছ না। সে কী গো। আমি যে তোমাদের রায়গঞ্জের মাসি, বোসবাড়ির মেয়ে।

হেসে ফেলেন মহিলা—তবে আর একটু খুলেই বলি।—আমি হলাম লোকনাথের পুঁটুমাসি। লোকনাথের মা আমাকে পুঁটু বলে ডাকতেন। ওঃ, তোমার শাশুড়ি আমাকে কী ভালই না বাসতেন। আমার বিয়ের সময় তোমার শাশুড়ি, আমার সেই পারুলদি, একা একশো জনের রান্না রেঁধে দিয়েছিলেন। তুমি তো দেখনি, আমি দেখেছি, তোমার শাশুড়ীর চোখ দুটো ছিল ঠিক যেন মা-দুর্গার চোখ। তাই...।

মহিলা বলেন—তাই তোমাদের একবার দেখতে এলাম। রক্তের সম্পর্ক নাই বা থাক, তোমাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হল প্রাণের সম্পর্ক। বিয়ের পর সেই যে কলকাতা চলে এলাম, তারপর আর রায়গঞ্জ যাবার ভাগ্যি হয়নি, এমনই অদ্ভুত ভাগ্যি! চিঠি পড়ে একদিন জানতে পেলাম, লোকনাথের বিয়ে হবে। দু'দিন দু'রাত কেঁদেছিলাম। যেমনই তোমাদের মেসোটি তেমনই তাঁর খুড়ি, দু'জনেই আপত্তি করলেন, না এ মাসে ঘরের বউয়ের পক্ষে বাড়ি ছেড়ে বাইরে যাওয়ার নিয়ম নয়; শাস্ত্রে নিষেধ আছে, পঞ্জিকাতেও নিষেধ আছে। তাই লোকনাথের বিয়ে দেখবার ভাগ্যি আর হয়নি। শুনেছিলাম, লোকনাথের বউ খুবই সুন্দর। তাই তো দেখছি। আহা, তুমি দেখতে বড়ই সুন্দর গো বড়-বউ।

মহিলার মাথার সাদা চুলের মধ্যে সিঁথির রেখাটা সিঁদুরের মোটা প্রলেপ নিয়ে যেন রঙিন হাসি হাসছে। বুঝতে পারা যাচ্ছে, লোকনাথের অদ্ভুত মেসোটি বেঁচে আছেন।

লোকনাথের অদ্ভুত মাসি এই পুঁটুমাসি এইবার একটু কুণ্ঠিত ভাবে হাসেন—কথাটা বলতে আমার একটু ভুল হয়ে গিয়েছে বড়-বউ?

নীরজা—কী বললেন?

পুঁটুমাসি—তোমাকে আগে কখনও দেখিনি, অথচ জিজ্ঞাসা করে বসলাম যে, আমাকে চিনতে পারছ কিনা। দুঃখু পেয়ে পেয়ে আর হাজার রকমের যত জ্বালা সয়ে সয়ে আমার মাথার বুদ্ধিসুদ্ধিও গোলমেলে হয়ে গিয়েছে।

মনে মনে একটু সাবধান হতে থাকেন নীরজা। ইচ্ছে করে তাঁর চোখের দৃষ্টিটাকে আরও উদাস করে দিলেন। সন্দেহ হয় নীরজার, এই অদ্ভুত পুঁটুমাসির দুঃখ আর জ্বালার কারণটা নিশ্চয় টাকার অভাব, বিদ্ঘুটে একটা দারিদ্র্য। সন্দেহ হয়, এইবার টাকার সাহায্য প্রার্থনা করে বসবেন পুঁটুমাসি।

ঠিক সন্দেহ। পুঁটুমাসি বলেন—একযুগ ধরে এই কলকাতাতে চাকরি করছেন তোমার মেসো। মাইনে সেই শুরুর ত্রিশ টাকা থেকে এখন তেষট্টি টাকায় পৌঁছেছে। তোমার মেসো বলেন, তেষট্টি টাকার খোরাকে তিনটে কুকুরের পেট চলে না, তিনটে মানুষের পেট চলবে কেমন করে? কাজেই...।

নীরজা—আপনার খুড়শাশুড়ি কি এখনও বেঁচে আছেন?

পুঁটুমাসি—হ্যাঁ গো, বয়স হয়েছে ছিয়ানব্বই। তবু দরিদ্র সংসারটার জন্যে এখনও কী খাটুনিই না খাটেন আমার এই খুড়শাশুড়ি। তোমাদের মেসো এখন আর আপিস-খাটুনি খাটতে পারেন না। শুধু দু'বাড়িতে ছেলে পড়িয়ে পঞ্চাশ টাকা পান। এদিকে আমরা দু'জনে, ছিয়ানব্বই বছর বয়সের ওই বুড়ি আর সত্তর বছর বয়সের এই পুঁটুবুড়ি, দু'জনে মিলে ঠোঙা তৈরি করে মাসের মধ্যে আরও বিশ-পঁচিশ টাকা পাই। খুড়শাশুড়ি রাত জেগে ঠোঙা তৈরি করেন, আমাকে ধমক দিয়ে বলেন—খবরদার, তোমাকে রাত জেগে ঠোঙা তৈরি করতে হবে না, কখ্খনও না। আমি

কত করে বলি—আপনি এই বয়সে রাত জেগে কাজ করবেন না। উনি বলেন—কেন? তাতে ভয় কিসের? আমি বলি—তা হলে আপনার এই রোগা শরীর আর টিকবে কতদিন? উনি বলেন—আর না টিকলেই তো ভাল। কিন্তু সত্যি কথাটা তুমি জান না তো বড়-বউ, উনি মানতে চান না। উনি বলেন, ইচ্ছে করলে তো নারায়ণের নাম করে সাতটা দিন উপোস দিয়ে মরে যেতে পারি। কিন্তু তোমাদের সংসারের বিশ-পঁচিশ টাকার আয়ও যে আমার চিতেটার মত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সেটা কী ভাল হবে?

নীরজা বলেন—আচ্ছা, এখন দয়া করে আমাকে একটু রেহাই দিন। আমার কাজ আছে। ইচ্ছে করেন আর-একদিন আসবেন।

পুঁটুমাসি চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন—কেন তোমাকে রেহাই দেব? আমার সামনে বসে তোমরা দু'জনে খাবে। তোমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখবার ভাগ্যি কখনও হয়নি। আশা ছিল তোমাদের বিয়ের সময় রায়গঞ্জে যেতে পারব, কিন্তু কপালে তা লেখা ছিল না।

পুঁটুমাসি তাঁর হাতের ডিবের ঢাকনি খুলে ভিতরের বস্তুগুলির দিকে তাকিয়ে থাকেন আর কথা বলেন—নারকেল পুলি। আজই সকালবেলাতে অনেক তাড়াহুড়ো করে করেছি। ভাল হয়েছে কি না জানি না। যাই হোক...চলো বড়-বউ, ভেতরে যাই।

নীরজার সঙ্গে আস্তে আস্তে হেঁটে আর সাদা মাথাটাকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে উপরতলার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন পুঁটুমাসি। ডাক দিলেন—ওরে লোকু, তাকিয়ে দেখ, কে এসেছে।

—কে? দরজার দিকে তাকিয়ে উৎসুকভাবে প্রশ্ন করেন লোকনাথ।

—আমি তোর পুঁটুমাসি এসেছি।

চেঁচিয়ে ওঠেন লোকনাথ।—কাছে এসো পুঁটুমাসি, বিছানার উপর উঠে বসো।

বিছানার উপর উঠে বসতেই পুঁটুমাসির পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন লোকনাথ। লোকনাথের গলার স্বরে যেন নিবিড় এক মায়ার আর আনন্দের আবেশ টলমল করে।

—আমি, আমি স্বপ্ন দেখছি না তো পুঁটুমাসি? তুমি কি সত্যিই এসেছ পুঁটুমাসি?

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ। এসেছি বৈকি। ঠিকানা পেলাম, তাই দেখা করতে চলে এলাম।

এইবার লোকনাথের মাথায় হাত বুলিয়ে কথা বলেন পুঁটুমাসি—তোর সংসার বড় সুখের সংসার হয়ে উঠেছে লোকু। দেখে প্রাণটা আনন্দে ভরে গেল। শুধু তোকে দেখতে বেশ একটু কষ্ট হচ্ছে। ভাবতে পারিনি যে, আমাদের সেই ডানপিটে লোকুর শরীর কোনদিন এরকম পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। ও বড়-বউ, কাছে এসো, এই নাও, দুটো পুলি তুমি হাতে তুলে নিয়ে খাও; লোকু, তুমি দুটো পুলি তুলে নিয়ে খাও।

নীরজা—আমি খাব না।

পুঁটুমাসি—সে কী? খেয়ে দেখ, খেতে একটুও খারাপ লাগবে না।

নীরজা—না।

নীরজার সন্দেহ, দরিদ্র সংসারের পুঁটুমাসির বুদ্ধিটা একটুও দরিদ্র নয়। টাকা বাগাতে হবে, তার আগে একটা অন্তরঙ্গতার হাওয়া তৈরি করে নিচ্ছে এই পুঁটুমাসি। এই নারকেল পুলি হল পুঁটুমাসির তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আঁচলে বাঁধা ঘুষ।

লোকনাথের চোখে যেন অদ্ভুত এক স্বপ্নের আবেশ থমথম করছে। হঠাৎ কোথা থেকে যেন

পুরনো রায়গঞ্জের মায়া এসে লোকনাথ আর নীরজার মাথার কাছে কুলোর প্রদীপ দুলিয়ে দিয়ে হাসছে। কবেকার সেই পুঁটুমাসি, যে মানুষ আজ লোকনাথের কাছে অতীতের একটা হাসিখুশির গল্প মাত্র, তাকেই কাছে দেখতে পেয়ে লোকনাথের প্রাণটা বিহ্বল হয়ে গিয়েছে।

পুঁটুমাসি বলেন—হলামই বা মাসি। আমার মতলব ছিল, লোকুর বিয়েতে যদি রায়গঞ্জে যেতে পারি, তবে ফুলশয্যার ঘরে আমিও রগড় মাতিয়ে তুলব। মতলব করেছিলাম, নতুন বউকে জোর করে ঠেলেঠুলে বরের কোলে বসিয়ে দেব। কিন্তু শুধু মতলব করাই সার হল। চেঁচিয়ে হাসতে থাকেন পুঁটুমাসি।

পুঁটুমাসির হাতের ডিবে থেকে দুটি পুলি তুলে নিয়ে খেতে থাকেন লোকনাথ। তাকের উপরে রাখা একটা বাটিকে দেখিয়ে দিয়ে বলেন—পুঁটুমাসি তুমি এখন বাকি পুলি দুটোকে এই বাটিতে রেখে দাও। ওর যখন ইচ্ছে হয় খেয়ে নেবে।

তাই ভাল, তাই ভাল! তাকের বাটিতে দুটো পুলি তুলে রেখে দিয়ে পুঁটুমাসি যেন একটা খুশিভরা নিঃশ্বাস ছাড়েন।—রায়গঞ্জের বোসবাড়ির কেউ আজ আর বেঁচে নেই। এদিকেও মেসোর গুষ্টির কেউ কোথাও নেই। কী চমৎকার ভস্মমাখা কপাল, এমন কপাল বোধ হয় বনবাসী সাধু-সন্ন্যাসীরও হয় না। এদিকে আমি কারও মা নই, খুড়ি নই, জেঠি নই, পিসি নই। ওদিকে আমি রায়গঞ্জের কারও দিদি নই, মাসি নই। আমাকে মাসি বলে ডাকতে শুধু একজনই আছে, সে হল তুমি। নারায়ণ বোধ হয় আর বেশিদিন আমাকে এ সংসারে রাখবেন না। তাই ইচ্ছে হল, লোকু যখন কলকাতাতে আছে, তখন একবার তার মুখের পুঁটুমাসি ডাক শুনে আসি।

নীরজা বলেন—আমি যাই, আমার অনেক কাজ আছে।

পুঁটুমাসি বলেন—আমিও যাই। যদি বেঁচে থাকি তবে আবার আসব রে লোকু।

কেঁদে ফেলেন লোকনাথ, পুঁটুমাসি বলেন—ষাট, কাঁদিস কেন? কাঁদতে নেই।...চলি বড়-বউ।

নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে একবার হাসলেন পুঁটুমাসি। তারপর সিঁড়ি ধরে আস্তে আস্তে নেমে গেলেন।

লোকনাথ এইবার নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে থাকেন। না ভর্ৎসনা নয়। লোকনাথের ভিজে চোখের তারা দুটো আর জ্বলে উঠতে চায় না।

নীরজা বলেন—যাক, বাঁচা গেল। তোমার পুঁটুমাসি সত্যি টাকা চেয়ে বসলেন না। তবু মনে হচ্ছে, রিক্সা-ভাড়াটা দিয়ে দিলে ভাল হত।

লোকনাথ—না, তুমি বরং আমার ইচ্ছের একটা কথা শোনো।

নীরজা—বলো।

লোকনাথ—তুমি এখনই যাও, নীচে গিয়ে পুঁটুমাসিকে প্রণাম কর।

নীরজা—প্রণাম করবার কোনও দরকার তো নেই।

লোকনাথ—দরকারের জন্যে প্রণাম নয়, প্রণামই একটা দরকার। যাও, শীগগির যাও, পুঁটুমাসি বোধ হয় এখনও রিকসার আশায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।

নীরজা—আছেন, কিন্তু তুমিই বল না কেন, পুঁটুমাসির মত মানুষকে প্রণাম করে আমার মত মানুষের কী লাভ হবে?

লোকনাথ—লাভ হবে। মস্ত বড় লাভ। সে লাভ আজই চোখে দেখতে তুমি পাবে না বটে,

কিন্তু একদিন দেখতে পাবে।

নীরজা হাসেন।—পুণ্যি হবে বোধহয়?

লোকনাথ—হ্যাঁ। আমার বিশ্বাস, সে পুণ্যির জোরে তুমি তোমার জীবনের কোনও মহাভয় হতে রক্ষা পেয়ে যাবে।

নীরজা—আমার আবার ভয় কিসের?

লোকনাথ—সাপের কামড়ের ভয়।

নীরজা—বুঝলাম না। আমি তো আর রায়গঞ্জে ফিরে যাচ্ছি না। আমাকে কোন বনবাদাড়ের সাপে কামড়াবে?

লোকনাথ—কলকাতাতেও সাপ থাকে।

নীরজা—হেঁয়ালি করে কথা বলছ কেন? স্পষ্ট করে বলো।

লোকনাথ—আর বেশি বলব না। তুমি পুঁটুমাসিকে একবার প্রণাম করো।

নীরজা—বেশ, তাই করব। কিন্তু এরপর পুঁটুমাসি যেন আর আমার এখানে না আসেন।

নীচে চলে গেলেন নীরজা, লোকনাথ কান পেতে শুনতে থাকেন, নীরজা ডাক দিয়ে বলছে।

—একটু থামুন পুঁটুমাসি। আপনাকে প্রণাম করতে ভুলে গিয়েছি। একটু থামুন।

এরপর শুধু একটা নিরেট স্তব্ধতার গুমোট। আর কোনও কথা শুনতে পান না লোকনাথ।

টুং টুং টুং? একটা রিকসা চলে গেল। দুই হাত দিয়ে ঘষে ঘষে চোখ মোছেন লোকনাথ, যেন একটা সুস্বপ্নের ছবিকে ইচ্ছে করে মুছে দিচ্ছেন লোকনাথ।

বারো

কী আশ্চর্য, পড়ো বাড়ির আঙিনাতে সেই নিমগাছের পাতার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে আজ একটা কোকিল ডাকছে। পঞ্জিকা হাতের কাছে না থাকলেও বুঝতে পারেন লোকনাথ, সেই যে কবে, রামদয়াল যেদিন শুকনো মুখ নিয়ে আর দুঃখিত হয়ে চলে গেল, তারপর প্রায় দুটো বছর কেটে গেল। বেঁচে আছে কী রামদয়াল? বেঁচে থাকলে একটা চিঠিও দেয় না কেন?

বীণা চলে যাবার পর থেকে এই বাড়ির নীচের তলার দুটি ঘরের কোনও নতুন খবর শুনতে পাননি লোকনাথ। আর নতুন করে জানবারই বা কী দরকার আছে। বুঝতেই পারা যায়, আজ এই সকালবেলাতে নীচের তলার ঘরে যে উচ্ছল হাসি আর কলরব এখন উথলে উঠছে, সেটা নীরজারই স্বপ্নের জয়ধ্বনি। তবে সত্যিই কি নীরজার চোখের জল আর কোনওদিনও দেখতে পাওয়া যাবে না? অদ্ভুত আশা, অদ্ভুত কল্পনা। লোকনাথ মনে করেন, অভিশাপে জ্বলে যাওয়া জীবনের আশা আর কল্পনা এরকমই হয়ে থাকে।

নীচের তলার ঘরে চায়ের টেবিল ঘিরে তর্ক গল্প আর ঠাট্টার যে হর্ষ মেতে উঠেছে, সে হর্ষের ভাষা লোকনাথের কানে পৌঁছয় না ঠিকই, তবু বুঝতে পারেন, এটা নীরজার নিজের হাতে গড়া একটি সুখী সংসারের হর্ষ।

আনন্দের কথাটা বলতে গিয়ে হেসে ফেললেন নীরজা—শত্তুরে কী না বলে? যত ছাই আবোলতাবোল মিথ্যে কথা।

হ্যাঁ, কে এক ক্ষিতীশ বিশ্বাস নীরজার কাছে একটি চিঠি লিখেছেন : খুব জানবেন, অ্যাটর্নি

প্রিয়নাথ রায় তাঁর একমাত্র ছেলেকে তাঁর বাড়ি গাড়ি ও টাকার কিছুই দেবেন না। হ্যাঁ, কোনও সন্দেহ নেই যে, তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর সব সম্পত্তি তাঁর ছেলে সুললিতই পাবে।

নীরজা বলেন—মিথ্যুকের হাতের লেখাটা, কী আশ্চর্য, অনেকটা ললির হাতের লেখার মত।

সুললিত—এই ক্ষিতীশ বিশ্বাস হলেন আমার আপন মামা। কিন্তু এরকম একটি হিংসুটে শত্রুমামা বোধহয় পৃথিবীর কোনও ভাগনের নেই।

নীরজা—চিঠিটাকে আমি ঘেন্না করে আর একেবারে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

হাসে সুললিত—চিঠিটার উপর এত রাগ করবার কোনও মানে হয় না। যাই হোক, তবু আসল সত্যটা তো আর লুকোয়নি। বাবার সব সম্পত্তি একদিন যে আমি পাব, ভাবতে গিয়ে বুক ফেটে গেলেও সত্য কথাটা স্বীকার করেছেন মামা।

পিয়ালীর কানের কাছে মুখ নিয়ে আর ফিসফিস করে কী যেন বলে সুললিত। পিয়ালী ভ্রূকুটি করে হাসে আর সুললিতের পিঠের উপরে আস্তে একটা চাপড় মারে।—দুষ্টু!

—কী হল? নীরজা প্রশ্ন করতে গিয়ে হেসে ফেলেন।

সুললিত—পিয়ালীকে ওর গ্র্যাণ্ড সাকসেসের জন্য কনগ্র্যাচুলেশন জানালাম।

উঠে দাঁড়ান নীরজা—আমি হলাম রায়গঞ্জের সেকেলে গেঁয়ো মানুষ। তোমাদের এত ইংরেজি কথার মানে বুঝি না। দেখি, কানা ঠাকুরটা আবার পাতি লেবুর চচ্চড়ি চড়িয়ে দিল বোধ হয়।

চলে যান নীরজা। মিতালী আরও চা খায়; মিতালীর কপালের উপর আস্তে আস্তে দুলছে আর কাঁপছে চুলের যে কার্ল, সেটাকে হাতের আঙুল দিয়ে টানে আর ছাড়ে, ছাড়ে আর টানে মিতালী। কী যেন ভাবছে মিতালী।

সুললিত বলে—মিতু, বাসবানির ওই পার্টিতে কি কোনও দেশি মানুষ ছিল?

মিতালী—মাত্র একজন, আর সবই বিদেশী।

সুললিত—তাদের সঙ্গে নিশ্চয় তোমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, বাসবানি?

মিতালী—হ্যাঁ।

সুললিত—ওদের মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চয় তোমাকে নেমন্তন্নও করে রেখেছে।

—হ্যাঁ।

—কবে?

—এ মাসের শেষে গ্লাসগো থেকে মেশিন টুল ইণ্ডাস্ট্রির এজেন্ট হয়ে এসেছেন যে মিস্টার ডেভিস, তিনি এ মাসের শেষে বোম্বে থেকে কলকাতা ফিরবেন। তখন বাসবানি আমাকে জানিয়ে দেবে, কবে নেমন্তন্ন হবে।

পিয়ালীর পিঠে একটা চিমটি কাটে সুললিত—তুমি তা হলে কলেজে আর যাবে না বলেই ঠিক করেছ?

পিয়ালী—হ্যাঁ।

সুললিত—কেন?

পিয়ালী—বাংলার কৃষ্ণাদি রোজই খোঁটা দিয়ে একটা কথা শোনাচ্ছেন। কাজেই...।

সুললিত—কী কথা?

পিয়ালী—কৃষ্ণাদি বলেন, আমার সাজ দেখে ক্লাসের মেয়েরা সবাই নাকি মুগ্ধ হয়ে শুধু

আমারই দিকে তাকিয়ে থাকে; কৃষ্ণাদির লেকচারে কেউ কানও পাতে না, শোনেও না।

মিতালী—ওই খোঁটা আমাকেও কত শুনতে হয়েছিল।

সুললিত—কোথায় আর কিসের প্রোগ্রাম তোমার ছিল, পিয়ালী?

পিয়ালী হাসে—বলব না।

সুললিত—বলো না। তবে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। বেশ গোল-গাল মোটা-সোটা চেহারার এক গোয়ানিজ কালো-সাহেব, চমৎকার বেহালা বাজাতে পারেন। একটা হোটেলের তিনতলায় একটা ঘরের ভিতরে স্টেজের এককোণে দাঁড়িয়ে বেহালা বাজাচ্ছেন ওই কালো সাহেব ডিক্রুজ; আর কারা যেন স্টেজের উপর দুলে দুলে নাচছে। আর...।

—তোমার স্বপ্নের নিকুচি করি। চেঁচিয়ে হেসে ওঠে, আর লাফিয়ে চলে যায় পিয়ালী।

মিতালী বলে—তুমি দেখছি, সব খবরের রয়টার।

সুললিত—তা বলতে পারো।

মিতালী—পিয়ালীর প্রোগ্রামের এই খবরগুলো কোথায় পেলে?

সুললিত হাসে—স্বয়ং ডিক্রুজই আমাকে বলেছে। একেবারে স্পষ্ট করেই বলেছে, ওর নাইট ক্লাবের আসরে এখন সবচেয়ে চমৎকার স্ট্রিপ করতে পারে একটি নতুন রিক্রুট, একটি বাঙালি মেয়ে, নাম তার পিয়ালী রায়। ফিরিঙ্গি মেয়েগুলো ওদের শেষ পোজে তবু একটু ঢাকাঢুকির বালাই রাখে, ছোট্ট প্যান্টিটা থাকে। কিন্তু নতুন রিক্রুট নাকি তার শেষ পোজে ছবির ভেনাসের চেয়েও বেশি আদুড় হয়ে, শুধু ছোট্ট একটি জাপানি পাখার ছায়া দিয়ে কায়ার মায়াটিকে সামান্য একটু রাখেন।

—আমি যাই। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় মিতালী।—এখন আমি অন্তত পুরো পাঁচটি ঘণ্টা ঘুমোব।

সুললিত—ঘুমোও। হ্যাঁ, একটা কথা বলে রাখি। তুমি আর পিয়ালী, দুজনে কখনও একই দিনে কোনও পার্টি বা প্রোগ্রাম রাখবে না।

মিতালী—কেন?

সুললিতের দুই চোখে একটা কঠোর দাবির জ্বালা জ্বলজ্বল করে।—আমার বড় অসুবিধে হয়। একেবারে একলা হয়ে পড়ে থাকতে আমার বেশ কষ্ট হয়।

একদিন খাবার টেবিলের কাছে এসেই নীরজাকে আরও একটা কষ্টের কথা বলেছিল সুললিত। —অন্তত দুপুরের খাওয়াটার এমন দুর্দশা হলে তো চলবে না।

নীরজা—অ্যাঁ। দুর্দশা?

সুললিত—হ্যাঁ, না আছে চিকেন, না আছে পুডিং, না আছে এক-আধটুকু বিরিয়ানি পোলাউ।

নীরজা লজ্জিত হয়ে হাসেন—ঠিকই বলেছ। কিন্তু।...

সুললিত—আর তো কোনও কিন্তু নেই। আপনাদের তো এখন টাকার কোনও অভাব নেই!

নীরজা—অভাব আছে বৈকি। হ্যাঁ, ভাগ্যের জোরে আর নিজের গুণে মেয়ে দুটো মাঝে মাঝে এক আধটা প্রোগ্রাম পায়, তাই চলে যাচ্ছে।

সুললিত—আপনি তো জানেন, মিতু খাঁটি পার্লের দুটো নেকলেস কিনেছে। পিয়ালীও আধ ডজন বালুচর কিনে ফেলেছে।

নীরজার গলার স্বর এইবার বেশ মৃদু হয়ে ও কুণ্ঠিত হয়ে যেন মার্জনা চায়—আমি খুব বুঝতে পারছি বাবা, তোমার মত মানুষের এ রকম কানা ঠাকুরের রান্না খুবই খারাপ লাগে।

গম্ভীর সুললিতের খাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে আসে তখন নীরজার গলার স্বরটা যেন একটু সাহস পেয়ে কথা বলে—তোমার বাবার কাছ থেকে কোনও সাড়া তো এখনও পাওয়া গেল না, ললি।

—কিসের সাড়া?

—তোমাকে আর টাকা পাঠালেন না, নিজের কাছে ডাকলেনও না, একবার তাঁর গাড়িটাকেও এখানে পাঠালেন না।

—সে জন্য আপনার দুশ্চিন্তা কেন? যখন সময় হবে, তখন সবই হবে। অন্তত এটুকু বিশ্বাস করতে তো কোনও অসুবিধে নেই যে, বাবার মৃত্যুর পর তাঁর সব সম্পত্তি আমিই পাব। মামার লেখা চিঠিটা তো পড়েছেন। তবু—

—না না, কোনও সন্দেহ করছি না।

—মামার হাতের লেখা ঠিক আমারই হাতের লেখার মত। কিন্তু সেজন্যে যদি সন্দেহ করেন যে...

—না, না, একটুও সন্দেহ নেই।

—তবে বিশ্বাস করুন, বাবার সব সম্পত্তি আমিই পাব।

—তাই তো বিশ্বাস করতে চাই।

—বিশ্বাস করতে চাই নয়, বিশ্বাস করতে হবে।

—তুমি বাবা একদিন নিজেই যাও।

—কোথায়?

—তোমার বাবার কাছে যাও, সব কথা তাঁকে একটু বুঝিয়ে বলো।

—সেটা সম্ভব নয়।

—কেন?

—আমার অসম্মান।

—সেটা বুঝি। তবু ...

—আবার তবু কিসের?

—তবু, তোমার সম্মানের কথাটাই ধর না কেন, তোমার তো তবে একটা ভাল রোজগারের কাজ ধরা উচিত।

—না।

—বাবার কাছে যাবে না, কোনও কাজ ধরবে না; এটা কি একটা কথা হল।

—ওরকম তর্ক আমার সঙ্গে করবেন না। শুনে নিন তবে, আমি যেমন আছি, তেমনিই থাকব। আমি নড়ব না।

পাশের ঘর থেকে মিতালী আর পিয়ালী দু'জনেই একসঙ্গে গলা মিলিয়ে, যেন ভীরু দুটি গুঞ্জনের স্বর চেপে দিয়ে আর জোর ক'রে হেসে-হেসে কথা বলে—তুমি মিথ্যে কেন এসব তর্ক করছ, মা। কোনও দরকার নেই। মিস্টার সুললিত সরকার হলেন কড়া মেজাজের একটি ঔরঙ্গজেব।

সুললিতের হাতের কাছে ক্ষীরের বাটি এগিয়ে দিয়ে নীরজা আবার হাসতে চেষ্টা করেন—বেশ তো, আর তর্ক করব না। কিন্তু কী এমন বাজে কথা বলেছি যে, ললি এত রাগ করবে।

সুললিতও এইবার হাসে—এই তো আবার তর্ক শুরু করলেন।

পাশের ঘরে মিতালী আর পিয়ালী দুজনে একসঙ্গে এইবার খিলখিল করে হেসে ওঠে।—ড্রপ সিন! ড্রপ সিন নামাও এবার।

হ্যাঁ, ড্রপ সিনই পড়ে গেল। নীরজার হাত থেকে ক্ষীর তোলবার চামচটা হঠাৎ পড়ে গিয়ে আর কাচের গেলাসে লেগে ঝনঝনে আর্তনাদের মত অদ্ভুত একটা শব্দ করে বেজে উঠল। আর কোনও কথা বলেন না নীরজা।

তের

রাত কত? দশটারও বেশি হবে। কী সাংঘাতিক ঝড়, বৃষ্টিও চলছে। হাওয়ার ঝাপটা লেগে সাত নম্বর হরি দত্ত লেনের সব জানালা কাঁপছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, তবু ঘরের একটা দরজা খোলা রেখে, আর দরজার কাছে বারান্দার উপর একটা চেয়ার রেখে, তার উপর বসে আছে সুললিত। কত শক্ত হয়ে, যেন পাথরের মূর্তিটি হয়ে বসে আছে সুললিত।

নীরজা এসে বার বার তিনবার জিজ্ঞাসা করেছেন, কফি তৈরি করে দেব?

সাড়া দেয়নি সুললিত। তবু আবার এসে জিজ্ঞাসা করেন নীরজা—কফি খাবে?

সুললিত—না। কফির চেয়ে ভাল জল খেয়েছি। কফির দরকার নেই।

চমকে ওঠেন নীরজা।—তবে এখন ঘরের ভিতরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।

সুললিত—না।

সুললিতের গলায় এই 'না' শব্দটা যেন একটা গর্জন।

নীরজা—তুমি রাগ করেছ, মনে হচ্ছে।

সুললিত—কেন রাগ করব না? আমি ওদের বলেছিলাম, তোমরা দুজনে কখনও একই দিনে কোনও প্রোগ্রাম রাখবে না। তবু আমার কথা অমান্য করে আজ ওরা দুজনেই বাইরে বের হয়েছে।

নীরজা—একটু পরে ওরা তো বাড়িতে ফিরবেই; তোমার কথার অমান্য কেন হবে?

সুললিত—না, ওরা আজ ফিরবে না।

নীরজা—ফিরবে না? এ কি রকমের কথা।

সুললিত—হ্যাঁ, এই রকমই কথা। একজন গিয়েছেন ডেভিসের সঙ্গে টাটানগর। আর একজন গিয়েছে মোহন খোসলার সঙ্গে দীঘা।

নীরজা—এ তো বড় বেশি দুঃসাহসের কথা।

সুললিত—কল গার্ল দুঃসাহসী হবে না তো কি ঝি রামুর মা দুঃসাহসী হবে?

নীরজা—কল গার্ল? তার মানে?

সুললিত—কল গার্ল মানে কল গার্ল। তারা রূপসী মডার্নিটি হয়ে পয়সাওয়ালা মানুষের ফুর্তির সহচরী হয়, তার সঙ্গে রাত কাটায়, আর টাকা নিয়ে ঘরে ফিরে আসে।

সুললিতের মুখে হাসি। বার বার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বলেই সুললিতের মুখের হাসিটাকে দেখতে পাচ্ছেন নীরজা। কিন্তু দেখতে পেয়েও যেন অন্ধের মত তাকিয়ে থাকেন।

হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে নীরজার কাছে এগিয়ে আসে সুললিত। নীরজার একটা হাতও ধরে

ফেলে। আর এক হাতে নীরজার গলাটাকে জড়িয়ে ধরে।—এসো. আমার ঘরে এসো।

—এ কী সর্বনেশে কথা। চেঁচিয়ে ওঠেন নীরজা; যেন অজগরের পাকে জড়ানো একটা ভীরু হরিণের যন্ত্রণার চিৎকার।

পাশের পড়ো বাড়ির আঙিনার নিমগাছে কোনও পেঁচা আর ডাকে না। ঝড়ের ভয়ে নীরব হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সাত নম্বর হরি দত্ত লেনের দোতলায় ওঠবার পুরনো সিঁড়ি ধরে দুড়দাড় একটা শব্দের আছাড় যেন মরিয়া হয়ে উপরে উঠতে থাকে। অনেক চেষ্টা ক'রে অজগরের পাক থেকে শরীরটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড় দিয়েছেন নীরজা।

—কে? কেন? শব্দ শুনে চমকে উঠলেন পঙ্গু রোগী লোকনাথ রায়। সত্যিই যে খুবই অদ্ভুত শব্দ। কে যেন দৌড়ে ঘরের ভিতরে ঢুকল, আর লোকনাথের রোগশয্যার খাটটাকে ছুঁয়ে লোকনাথের মাথার কাছে ঘরের মেঝের উপর ধুপ করে বসে পড়ল।

—কে তুমি? আবার ডাক দিলেন লোকনাথ?

—আমি। যেন হাঁসফাঁস করে, একটা বোবা নিশ্বাস কোনও মতে কথা বলে জবাব দেয়।

—তুমি নীরু?

—হ্যাঁ।

—কী ব্যাপার?

—ভয় পেয়েছি।

—ভয়?

—হ্যাঁ।

—তবে শীগ্‌গির আলো জ্বালো, তোমার হাতের কাছেই দেয়ালে সুইচ আছে।

আলো জ্বেলে দিয়ে আবার লোকনাথের খাট ছুঁয়ে মেঝের উপর ধুপ করে বসে পড়েন নীরজা।

—কিন্তু, কিসের ভয় নীরু? খাটের উপর উঠে বসেন, আর নীরজার সেই যন্ত্রণাভীরু মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকেন লোকনাথ।

নীরজার চোখে জল, কিন্তু চোখ লুকোন না নীরজা, চোখের জলও মোছেন না। নীরজার হাতটা থরথরিয়ে কাঁপছে. যদিও নীরজার সেই হাত খাটটাকে খুব শক্ত করে ধরে রয়েছে।

—সর্বনাশ। আবার চমকে ওঠেন আর ভয় পেয়ে ফুঁপিয়ে ওঠেন নীরজা। এই ঘরেরই ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে সুললিত। কী শান্ত, কত শক্ত, আর কী দুঃসাহসী সুললিত। পঙ্গু রোগী লোকনাথ রায়কে বোধ হয় একটা মরা টিকটিকির চেয়েও নির্জীব অস্তিত্ব বলে মনে করে সুললিত। শুধু একা সুললিত কেন? নীরজাও জানেন, রায়গঞ্জের এই লোকনাথ রায় আজ একটি পঙ্গু অক্ষম ও অশক্ত রোগী মাত্র। নইলে এ ঘরে এসে. লোকনাথ রায়েরই শিয়রের কাছে মেঝের উপর বসে, আর লোকনাথের খাট এত শক্ত করে ধরে থেকেও এত ভয় পাবেন কেন নীরজা?

নীরজার দিকে তাকিয়ে আর হাত তুলে ইশারায় ডাক দেয় সুললিত—চলে এসো। ঘরের দেয়ালের গায়ে সেই ইশারার ছায়াটা নড়ছে ও দুলছে; যেন অতিকায় এক দানবের হাতের ছায়া।

নীরব স্তব্ধ ও নিঃসাড় লোকনাথ। লোকনাথ তাঁর খাটের উপর বসে শুধু দেখছেন নীরজার চোখে জল। কিন্তু কী আশ্চর্য, পঙ্গু লোকনাথের দুই অপলক চোখে যেন খুশি জ্যোৎস্নার আভা চিকচিক করছে।

দুই পা এগিয়ে আসে সুললিত। এইবার শুধু হাতের ইশারাতে নয়, চাপা ধমকের মত ভঙ্গিতে গলার স্বর বেশ তীব্র করে নিয়ে ডাক দেয়—চলে এসো বলছি।

দুই চোখ বন্ধ করে মাথাটাকেও খাটের শক্ত কাঠের উপর নামিয়ে দিয়ে কাঁপতে থাকেন নীরজা।

—মনে হচ্ছে, হাত ধরে টেনে নিয়ে না গেলে, তুমি আসবে না। বলতে বলতে নীরজার কাছে এসে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় সুললিত, আর পকেট থেকে সিগারেট বের করে নিজেরই হাতের পাঞ্জার উপর ঠুকতে থাকে।

কিন্তু সেই মুহূর্তে সুললিতের হাত থেকে খসে পড়ে গেল সিগারেট। পঙ্গু লোকনাথের দুটি হাত, কী ভয়ানক শক্ত হাত, সত্যি যেন লোহা আছে সেই হাতে, সুললিতের গলা টিপে ধরেছে। দুই হাত ছুঁড়ে, বার বার লোকনাথের বুকটাকে ধাক্কা দিয়ে, লোকনাথের হাতের সাঁড়াশি থেকে গলাটাকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে সুললিত। লোকনাথের সাঁড়াশি হাত কিন্তু একটুও কাঁপে না। লোকনাথের মুখে কী ভয়ানক এক সুখের উল্লাস কাঁপছে। লোকনাথের দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দাঁতের সাদাটা ঠিকরে পড়ছে, যেন একটা জন্তুর হিংস্রতা ঝকঝক করছে।

সুললিতের দুই চোখের তারা উল্টে গিয়েছে। মুখের দুই কষ বেয়ে ফোঁটা-ফোঁটা লালচে লালা ঝরে পড়ছে। এইবার খাটেরই কাঠের উপর সুললিতের মাথাটাকে চেপে ধরেন, আবার ঠুকতেও থাকেন লোকনাথ। সুললিতের গোঙানির শব্দটা এইবার আরও অদ্ভুত হয়ে যায়। যেন মাথা ঠুকছে একটা বোবার আর্তনাদ।

হঠাৎ ঝুপ ক'রে মেঝের উপর পড়ে গেল সুললিতের শরীর। লোকনাথের সাঁড়াশি হাতের পেষণ থেকে হঠাৎ ছাড়া পেয়ে গেল সুললিতের গলা। বোধ হয় সুললিতের গলার ঘামে পিছল হয়ে গিয়েছে লোকনাথের হাত; তাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুললিতের সেই পতিত দেহটার একটা হাত শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরেন লোকনাথ।—জানোয়ারের সব পাঁজরা গুঁড়ো করে দেব।

সুললিত হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলে—আমাকে ছেড়ে দিন; আমি এখনই এবাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

সুললিতের হাত ছেড়ে দিলেন লোকনাথ। খুব জোর একটা হাঁপ ছাড়লেন। তারপর শুয়ে পড়লেন।

চোদ্দ

আর ঝড় নেই, বৃষ্টিও নেই। হরি দত্ত লেনের রাত একটার অন্ধকারের গায়ে তবু করুণ গুঞ্জনের মত একটা শব্দ কোথা থেকে এসে যেন লুটিয়ে পড়ছে আর ছড়িয়ে যাচ্ছে।

কে কাঁদে? দরজা খুলে বাড়ির বাইরে এসে আর রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে প্রথম যিনি একটা বিস্ময়ের জিজ্ঞাসা চিৎকার করে শোনালেন ও পাড়া জাগিয়ে তুললেন, তিনি হলেন অন্নপূর্ণার বাবা, অর্থাৎ সামনের বাড়ির মহীতোষবাবু।

ওদিকের বাড়ির দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলেন রমেশবাবু—কী ব্যাপার, মহীদা?

মহীতোষ—এই সাত নম্বর বাড়িতে একটা ব্যাপার হয়েছে। মনে হচ্ছে, একজন মহিলা কাঁদছেন।

পাড়ার জিতেন একটা টর্চ হাতে নিয়ে ছুটে আসে—হ্যাঁ, মহীকাকা, আমিও শুনেছি।

মহীতোষ—কিন্তু কিছু দেখেছ কি?

জিতেন—না।

মহীতোষ—আমি দেখেছি। একে তো আমার চোখে অনিদ্রা রোগ, তার ওপর রাতের অন্ধকারেও চোখের দৃষ্টি বেশ ভালই চলে। তার ওপর কানেও একটু বেশি শুনি। রাতের বেলা পাড়ার ভেতরে একটা বিড়াল দৌড়ে গেলেও আমি শব্দ শুনতে পাই।

জিতেন—কী দেখেছেন বলেই ফেলুন না।

মহীতোষ—তখন থেকে দেখছি আর শুনছি, এই সাত নম্বরের ভেতরে যেন একটা ভূতের কাণ্ড ছুটোছুটি করছে। এই কিছুক্ষণ আগে এই বাড়ির জামাইবাবু একটা বাক্স হাতে নিয়ে আর হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলেন।

একে একে আরও অনেকে আসেন। প্রদীপবাবু, জয়ন্তবাবু, আর হেম বিনয় ও চারু সরকার। সাত নম্বরের বাড়ির সামনে সাত-আটজন প্রতিবেশী মানুষের উৎকণ্ঠ ভিড়টা এইবার বেশ আশ্চর্য হয়, বাড়ির তিনটি দরজাই খোলা। জিতেন বলে—ডাকাতি।

চারু সরকার—পারিবারিক কলহ।

প্রদীপবাবু—শোকের ব্যাপারও হতে পারে।

বলতে বলতে সকলেই একটু ব্যস্ত হয়ে সাত নম্বর বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দোতলার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়।

প্রদীপবাবু—আমি ঠিকই অনুমান করেছি, শোকের ব্যাপার।

মহীতোষবাবু—আমার সন্দেহ হয়, ফাউল প্লে।

হেম—তবে তো পুলিসে খবর দিতে হয়।

বিনয়—একটু সবুর করো।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়েন নীরজা, সেই সঙ্গে কান্নার সব শব্দও স্তব্ধ হয়ে যায়।

মহীতোষবাবু এইবার নীরজার স্তব্ধ চেহারাটার দিকে তাকিয়ে এবং বেশি বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—আপনার তো চুপ করে থাকলে চলবে না।

নীরজা—বলুন, কী বলব?

মহীতোষ—এই রুগি ভদ্রলোক কি জ্ঞান হারিয়েছেন, না মরেই গিয়েছেন?

নীরজা—দেখুন আপনারা।

জিতেন খাটের কাছে এগিয়ে যায়, আর লোকনাথেব চোখের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—এঃ মরেই গিয়েছেন।

মহীতোষ আবার চেঁচিয়ে উঠলেন—মনে হয়, এ নিশ্চয়ই মার্ডার, প্রদীপবাবু? রুগি ভদ্রলোককে কেউ খুন করেছে। কিন্তু খুন করবে কে?

প্রদীপবাবু—মহিলাকেই জিজ্ঞাসা করুন না, কেন।

নীরজার দিকে হাত তুলে আর কড়া শাসানির একটা ভঙ্গি থরথর করে কাঁপিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করেন মহীতোষ—আপনি বলুন, কে খুন করেছে? আপনি?

নীরজা—হ্যাঁ।

চমকে ওঠে পাড়ার মানুষের সেই উৎকণ্ঠ ভিড়; প্রদীপবাবু সেই মুহূর্তে কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ি ধরে নেমেই চলে যান।

মহীতোষ ছটফট করেন—আপনারা সবাই এবার বলুন তা হলে, অগত্যা কী করা উচিত। পুলিস ডাকবেন?

হেম হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—এই মহিলার কথাই বা চট করে বিশ্বাস করে ফেলতে হবে কেন? হতে পারে শোকে মাথা খারাপ হয়েছে, তাই ওরকম একটা সাংঘাতিক বাজে কথা বলছেন।

বিনয়—আমারও তাই মনে হচ্ছে।

জয়ন্তবাবু—সবার আগে একজন ডাক্তার ডেকে আনা উচিত।

হেম—আমি যাচ্ছি, আমাদের পাড়াতেই থাকেন, ডাক্তার সুমন্তদা। ডাকলেই আসবেন, যত রাত হোক না কেন।

হেমের পায়ের শব্দ সিঁড়ি ধরে দুমদাম করে নীচে নেমে যায়। মহীতোষ আবার চেঁচিয়ে ওঠেন—শুনছেন আপনি?

নীরজা—হ্যাঁ।

মহীতোষ—আমাদের কথার জবাব দিন।

নীরজা—বলুন।

মহীতোষ—আপনার ছেলে কোথায়?

—জানি না।

মহীতোষ—আপনার জামাই বা এই রাতে হঠাৎ ওভাবে হন্তদন্ত হয়ে কোথায় চলে গেল?

—জানি না।

—আপনার মেয়েরা কোথায়?

—জানি না।

জয়ন্তবাবু বলেন—থামো মহীদা, আর জেরা করে লাভ নেই। আমি বলি, মহিলার কেউই যখন এখানে এখন নেই, তখন সৎকারের ব্যবস্থা আমরাই করি। চাঁদা করে সকলেই কিছু কিছু দিলে...।

বিনয়—তুমি একবার দেখো তো জিতেন, ভদ্রলোকের বিছানার ওপর ওই পঞ্জিকাটার ভেতরে কারও ঠিকানার কাগজ-টাগজ আছে কিনা।

পঞ্জিকা হাতে তুলে নিয়েই জিতেন বলে—আছে। দেবকুমার দত্ত, বসাক বাগান লেন, দমদম। অ্যাঁ! এসব আবার কী লেখা রয়েছে : যদি খবর পাও তবে অবশ্যই তুমি একবার আসিবে, দেবু। অনুরোধ, তুমি আমাকে লইয়া গিয়া রাধানাথের চোখের কাছে কদমকুঞ্জের ছায়াতে রাখিয়া দিবে।

জয়ন্তবাবু—বাঃ, চমৎকার। এ যে খুব ধার্মিক মানুষের কথা বলে মনে হচ্ছে।

মহীতোষ বলেন—এঁদের আর একজন কুটুম্ব আছেন, যাঁর গাড়ি এ বাড়িতে প্রায়ই আসত।

জয়ন্তবাবু—কে?

মহীতোষ—যাদবপুরের কমল সেন।

বিনয় হাসে—বলুন, কমল দালাল।

জয়ন্তবাবু—তবে আমার বাড়িতে গিয়ে তুমি এখনই ফোন করে কমলবাবুকে চলে আসতে বলো। আর, আমারই গাড়ি নিয়ে বসাক বাগানে চলে যাও। কুইক; দেরি করো না।

বিনয়ের পায়ের শব্দ দুড়দাড় করে বাজতে বাজতে আর সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে যায়।

ভোর হয়ে এসেছে। পড়ো বাড়ির আঙিনার নিমগাছে ঘুম ভাঙা কাক আস্তে আস্তে একটা ডাক ছেড়েছে। ডাক্তার এসে মৃত্যুর সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে অনেকক্ষণ আগেই চলে গিয়েছেন—হঠাৎ হার্ট ফেল ক'রে মৃত্যু।

পাড়ার মানুষেরা এখন আর উপরতলার ঘরে নয়; নীচের বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে যেমন একটা অদ্ভুত অস্বস্তি, তেমনই একটা অদ্ভুত ক্লান্তিও বোধ করছেন।

আবার সাড়া জাগে। পরপর দুটো গাড়ি এসে সাত নম্বর বাড়ির স্তব্ধতার কাছে থামতে গিয়ে মিছামিছি গজরাতে থাকে। হ্যাঁ, দেবু দত্ত এসেছে, যাদবপুরের সুধাদি ও তাঁর স্বামী কমল সেনও এসেছেন।

দেবু বলে—সব খরচ আমার, আমিই ওঁকে ওঁর দেশে রায়গঞ্জে নিয়ে যাব। আপনারা শুধু তাড়াতাড়ি একটা লরি যোগাড় করে দিন।

দশ মিনিটের মধ্যে লরি নিয়ে আসে হেম। কে জানে পাড়ার কোনও ঘুমন্ত বাড়ির বাগান ভেঙে দশ মিনিটের মধ্যে একঝুড়ি টগর নিয়ে আসে বিনয়। আর, অন্নপূর্ণার মা পনেরো মিনিটের মধ্যে চন্দন আর তুলসীপাতা পাঠিয়ে দিলেন।

—এইবার লরিতে একটা ধোওয়া সাদা চাদর বিছিয়ে দাও। ওরে অন্নপূর্ণা, মা'কে বল একটা সাদা চাদর এখুনি পাঠিয়ে দিক। চেঁচিয়ে হাঁক দিলেন মহীতোষ।

তারপর আর পাঁচ মিনিটও দেরি নয়। রায়গঞ্জের পঙ্গু লোকনাথের দেহটাকে ধরাধরি করে নামিয়ে নিয়ে এসে লরির উপর তুলে দিল, হেম, বিনয় আর জিতেন।

—চলুন। লরির ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে কথা বলে দেবু। জয়ন্তবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন—আরে আরে, ও কী? থামুন একটু। মহিলাকে আসতে দিন।

দেবু—মহিলা আসবেন না। তাঁর আসবার কোনও কথাও নেই।

জয়ন্তবাবু—তার মানে? উনি কি তা হলে এখানেই একা একা...।

উচ্চকিত শব্দ তুলে, লরিটা যেন জয়ন্তবাবুর বিস্ময়ের প্রশ্নটাকে হঠাৎ ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল।

হাঁফ ছাড়েন জয়ন্তবাবু—মহীদা, আমি এবার চলি।

হেম—আমিও যাই।

জিতেন—আমিও।

কিন্তু ও কী, কখন নেমে এসেছেন মহিলা? বারান্দার লাগা ঘরের দরজার কাছে বসে কপাটের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে রয়েছেন। কিন্তু তাকিয়ে দেখছেন না কিছু; চোখ বন্ধ করে রয়েছেন।

সুধাদির দিকে তাকিয়ে মহীতোষ চেঁচিয়ে ওঠেন—এই যে, আপনি এসেছেন। আপনি তো এ বাড়ির একজন আত্মীয় মহিলা।

সুধাদি—হ্যাঁ।

মহীতোষ—তবে এতক্ষণ শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? কিছু বলছেন না কেন।

সুধাদি—কি বলব?

মহীতোষ—এই মহিলা কি এখানেই এভাবে পড়ে থাকবেন?

কমল সেনের মুখের দিকে তাকান সুধাদি। কমল সেন তখনই সুধাদির একেবারে কাছে এসে আর কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব আস্তে আস্তে ফিসফিস করে কথা বলেন—তোমার রান্নার

লোকটার কী যেন নাম?

সুধাদি—গুরুচরণের মা।

কমল সেন—তিন মাস হল সে তার গাঁয়ের বাড়িতে গিয়েছে, সে কি আর আসবে?

সুধাদি—না। চিঠি লিখেছে তার শরীর একটুও ভাল নয়। আর কাজ করতে পারবে না।

কমল সেন—তবে?

সুধাদি মাথা নাড়েন—হ্যাঁ।

নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে আর ব্যস্তস্বরে ডাক দেন সুধাদি—চলে আয় নীরু। আমার সঙ্গে চল।

উঠে দাঁড়ালেন নীরজা। সুধাদির পিছু-পিছু হেঁটে গাড়ির ভিতরে উঠলেন ও বসলেন।

যাদবপুরের সুধাদির গাড়িটা ছুটে চলে যেতেই মহীতোষ একটা হাঁফ ছাড়লেন—এর পর আর কী করবার আছে রে জিতেন?

জিতেন—কিছ্ছু না। শুধু ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটাকে বাড়িওয়ালা চৌধুরীবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিন।

গল্প

ছায়া ও কায়া

যেন কবির কাব্য থেকে তুলে নিয়ে আসা একটা ছবি—কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে বাঁধি নীড়...।

যদিও ঠিক উচ্চ বৃক্ষচূড়ে নয়, গেরুয়ারঙের কাঁকরের বেশ উঁচু একটা টিপির উপর সিমেন্ট কংক্রিটের বেশ সুন্দর গোলগাল ও ছোট্ট একটি বাড়িতে ওরা থাকে সুখে। সুশান্ত আর বন্দিতা, স্বামী আর স্ত্রী। লাক্ষা-রিসার্চের জন্য নতুন একটা ল্যাবরেটরি আর অফিস এখানে দামোদরের কিনারায় রামগড়ের বাঁয়ে শালবনের কাছাকাছি নতুন ডেভেলপমেন্টের একেবারে মাঝখানে তৈরি হয়ে ওঠার পর ওরা দুজন এসেছে। ওরা দুজনেই এই লাক্ষা রিসার্চে কাজ করে, ল্যাবরেটরিতে সুশান্ত আর অফিসঘরে বন্দিতা। গেরুয়ারঙের টিপির উপর সেই গোলগাল ছোট্ট চেহারার কোয়ার্টার থেকে একই সময়ে একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে ওরা আসে, কাজের ছুটি হলে আবার একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে যায়।

কীর্তনীয়ার গানের কলি যেন—ঝাঁপই দুঁহু দোঁহা আবেশে ভোর। লোকের চোখের সামনেও ওদের কোন কুণ্ঠা নেই। অফিসের সুপারিন্টেডেন্ট মিস্টার মাথুর, পাকা চুলে যার মাথা সাদা হয়ে গিয়েছে, এ-হেন এক প্রবীণ মানুষের সঙ্গে পথে মুখোমুখি হলেও বন্দিতা কখনও সুশান্তর গা ঘেঁষে এলিয়ে থাকা সেই ভঙ্গীটাকে একটুও আলগা করে সরিয়ে নেয় না। আর সুশান্তর একটা হাতও বন্দিতার কোমরের আধখানা জড়িয়ে তেমনই শান্ত হয়ে পড়ে থাকে। মিস্টার মাথুরই একটু অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে যান।

শুধু মিস্টার মাথুর কেন, ল্যাবরেটরির মুখার্জির স্ত্রীও সেদিন ওদের দুজনকে পথে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে একটু আলাপ করতে গিয়েই চমকে উঠলেন, মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং ভয় পেয়ে হনহন করে হেঁটে চলে গেলেন। ঘটনাটা যেন ওদের দুজনের চোখেই পড়ল না। দুজনে দুজনের মুখের দিকে ছাড়া অন্য কারও মুখের দিকে তাকাবার সময় পান না বোধহয় কিংবা তাকাতেই চায় না।

মিস্টার মাথুরের মেয়ের বিয়ের দিন, যখন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক আর মহিলাদের ভিড়ে আসর গিজগিজ করছে, তখনও আসরের আশেপাশে কোন আড়ালে বা কোণে নয়, আসরের মাঝখানে পাশাপাশি দুটি চেয়ারকে একেবারে সাঁটাসাঁটি করে ওরা দুজনে গায়ে-গায়ে প্রায় লুটোপুটি করে বসে রইল। কাছে এগিয়ে এসে কি-যেন হেসে হেসে বলতে চেষ্টা করেছিল মুখার্জি, "আপনারা দুজন কি ভুলেও কখনও...অর্থাৎ আপনি একটু এদিকে আর আপনি একটু ওদিকে...?"

খিলখিল করে হেসে ওঠে বন্দিতা। সুশান্ত মাথা দুলিয়ে হাসে—"নেভার, কখনও না।"

মুখার্জি চোখ বড় বড় করে তাকায়। "আশ্চর্য করলেন, সত্যিই আশ্চর্য আপনাদের ইউনিটি।"

সুশান্ত বলে, "আশ্চর্য হবার কিছু নেই।"

মুখার্জি আরও আশ্চর্য হয়ে বলে, "বলেন কী।"

ইংরেজী কবিতার লাইন ভেঙে কয়েকটা খাসা খাসা কথা শুনিয়ে দেয় সুশান্ত, "ইন দি এরিথমেটিক অব লাইফ, এ পেয়ার ইজ দি ইউনিট।"

অপ্রস্তুত হয়ে হাসতে থাকে মুখার্জি : "তাই বটে, ঠিকই বলেছেন আপনি।"

লোকে আশ্চর্য হয় হোক, সুশান্ত আর বন্দিতা সে-আশ্চর্যের ধার ধারে না। যাকে ভালো লাগে, তার সঙ্গে প্রতিক্ষণ একেবারে মিশে গিয়ে এক হয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। জীবনের অঙ্কে দুটি আধখানা একসঙ্গে মিশে গিয়ে এক হয়ে যায় না। দুটি আস্ত রূপ ভালোবাসার টানে যুগল হয়ে ওঠে, এক হয়ে যায়। সুশান্ত আর বন্দিতাকে দেখলে তাই মনে হয়। ওরা দুজন যখন একসঙ্গে বেড়াতে যায়, তখন মনে হয়, একটি প্রাণ তর-তর করে হেঁটে চলে যাচ্ছে।

মুখার্জি এক-একদিন সুযোগ বুঝে সুশান্তর ওই এরিথমেটিকের অহংকারটাকে যেন হঠাৎ প্রশ্ন করে চেপে ধরে : "কী মশাই, আজ বেশ তো অনেকক্ষণ ধরে ইউনিটি সাসপেণ্ড করে রেখেছেন!"

রবিবার দিন দুপুর থেকে ল্যাবরেটরিতে এসে কাজ করছে সুশান্ত। আজ অফিস বন্ধ। বন্দিতা একা পড়ে আছে সেই নীড়ে—গেরুয়ারঙের কাঁকরের ঢিপির উপর সেই গোলগাল ছোট্ট কংক্রিটের নীড়ে।

সুশান্ত হাসে, "কী বলতে চাইছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না মুখার্জি।"

"বেশ তো দুজনে ছাড়াছাড়ি হয়ে, এতক্ষণ ধরে..."

মুখার্জির কথা না ফুরোতেই বেয়ারা এসে সুশান্তকে বলে, "মেমসাহেব বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন স্যার," উঠে দাঁড়ায় সুশান্ত। মুখার্জির মুখের দিকে নীরবে যেন তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল একটি সগর্ব হাসির ঝিলিক হেনে দিয়ে চলে যায়। মুখার্জি আশ্চর্য হয়ে বলে, "তাই তো!"

পরের দিন দেখা হতেই মুখার্জি একটু ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে, "মিসেস যে কাল এত হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন, আর আপনিও ব্যস্ত হয়ে চলে গেলেন...কোন কারণ ছিল নিশ্চয়?"

"ছিল নিশ্চয়।"

"কি হয়েছিল?"

সুশান্ত হাসে, "কিছুই না। উনি ঘরে বসে একা-একা রোমিও জুলিয়েট পড়ছিলেন, হঠাৎ বই বন্ধ করে চলে এলেন।

মুখার্জির মুখটা লজ্জা পেয়ে আরও কাঁচুমাচু হয়ে যায়, "সত্যিই আমি এতটা কল্পনা করতে পারিনি।"

হ্যাঁ, ল্যাবরেটরিতে আর অফিসের এই কাজের সময়টুকু ছাড়া আর কোন মুহূর্তেও ওরা ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকতে চায় না। কাজের মধ্যেও অন্তত বার তিনচার ওরা আনমনা হয়, উঠে যায় এবং বাইরে গিয়ে লনের উপর কিংবা শালকুঞ্জের আড়ালে একটু মুখোমুখি হয়ে আর দেখাদেখি করে আবার কাজের মধ্যে ফিরে আসে।

বাড়ির বাইরে যখন শালবনের হাওয়া গায়ে লাগিয়ে ওরা ছটফট করে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে থাকে, তখন মনে হয় ওদের প্রাণ ছটফট করে কী-যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। একটা কালো পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে। লাল মেঘের একটা টুকরো ভাসতে ভাসতে একটা সাদা মেঘের টুকরোর উপর লুটিয়ে পড়ল, মিলে গেল, মিশে গেল, এক হয়ে গেল। কেঁপে ওঠে বন্দিতার মাথাটা, বন্দিতা বলে, "চলো বাড়ি যাই।"

দুজনের বুকের ভিতর থেকে ব্যাকুল হয়ে ফুটে ওঠা দুটি উষ্ণ নিঃশ্বাসের নিবিড় শিহর যেন ওদের জীবনটাকে সেই মুহূর্তে বাড়ির দিকে, সেই গোলগাল কংক্রিটের নীড়ের দিকে, আবার

ফিরিয়ে দিয়ে চলে যায়।

আমলকীর গায়ে পাশের ওই বুনো লতাটা একবার লুটিয়ে পড়লেই হলো; দামোদরের বালিয়াড়িতে জলের ছোট ছোট দহের উপরে দু'টি রঙিন হাঁসের ছায়া পাথরের আড়ালে একটু সরে গেলেই হলো। সেই মুহূর্তে ওরা দুজনে আনমনা হয়ে যায়। আর এগিয়ে যেতে ইচ্ছা করে না। তখনই বাড়ি ফিরে যায় সুশান্ত আর বন্দিতা।

কংক্রিটের নীড়ে, এক ফালি বারান্দার উপরে একই সোফায় দুজনে বসে গ্রামোফোন রেকর্ডের গান শোনে। গানের ভাষা আর সুর দুই-ই হঠাৎ আবেশে বিভোর হয়ে যায়। গানের মধ্যে দুটি অনুরাগের আবেগ কাছাকাছি হয়ে হৃদয়ে হৃদয় রাখতে চাইছে। সুশান্ত আর বন্দিতা, দুজনের চোখের তারায় সেই আবেশের ছোঁয়া এসে যেন লুটিয়ে পড়ে। সুশান্ত বলে, "চলো, ভেতরে যাই।"

ভিতর বলতে ওই একটি ঘর। বড় সুন্দর করে সাজানো, যেন চিরক্ষণের বাসকশয়নবিধুর একটি ঘর। ওই ঘরের ভিতর গিয়ে তৃপ্ত ও শান্ত হয়ে যায় সুশান্ত ও বন্দিতার জীবনের আবেশ। যেন একেবারে নীরব হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে কপোত-কপোতীর প্রাণ। জগতের সব আলো-ছায়া, সব শব্দ-ছন্দ-রং আর রূপকে এইভাবে কাজে লাগিয়ে ওরা ওদের এই আবেগময় জীবনের মধুর একটি উত্তাপের মায়া টেনে আনে। সুখী হয় ওরা।

কিন্তু এতদিন পরে আজ হঠাৎ এ কী হলো? এমন করে আতঙ্কিতের মতো শালবনের দিক থেকে হন্তদন্ত হয়ে নীড়ে ফিরে এল কেন সুশান্ত আর বন্দিতা। আকাশের বুকে মেঘে মেঘে ঢলাঢলি ছিল, শালবনের গাছের ছায়াতে ছায়াতে অনেক জড়াজড়িও ছিল, তবু কেন এমন করে ছাড়াছাড়ি হয়ে আর ভিন্ন ভিন্ন দুটি আধখানা হয়ে ওরা ফিরে আসে? হাত-ধরাধরি ছিল না, গায়ে গায়ে লুটোপুটিও ছিল না। বরং যেন বেশ একটু আগু-পিছু আর এদিক-ওদিক হয়ে দুজনে কংক্রিটের নীড়ে ফিরে এসে বারান্দার সোফার উপর নীরব হয়ে বসে রইল।

সেদিনই সন্ধ্যায় ক্লাব-ঘরে টেবিল-টেনিস খেলতে খেলতে ল্যাবরেটরির মুখার্জি অফিসের ললিতবাবুর দিকে তাকিয়ে কথা বলেন, "সুশান্তবাবুদের ইউনিটি কেমন যেন চমকে উঠেছে মনে হলো। ও-রকম করে এলোমেলো হয়ে বাড়ি ফিরতে তো কোনদিন ওদের দেখিনি।"

ললিতবাবু হাসেন : "বলতে পারি না। কিন্তু শালবনের দিকে আর-এক রকমের ইউনিটিকে আজ ঘুরে বেড়াতে দেখেছি।"

"কে? কারা? নতুন লোক বোধহয়?"

"হ্যাঁ, এক মাসের জন্য সেটেলমেন্টের যে অফিস আর ক্যাম্প এসেছে, তারই সার্ভেয়র প্রভাতবাবু ও তার স্ত্রী।"

"এঁদের ইউনিটি কি ওইরকমের শুধু জড়াজড়ি আর...।"

ললিতবাবু হাসে : "না না, সে-রকম কিছু নয়। দুজনেই দেখতে বেশ সুন্দর, দুজনেই বেশ হেসে হেসে গল্প করে আর ঘুরে বেড়ায়, দেখতে বেশ ভালোই তো লাগে মশাই।"

"তা হলে মনে হচ্ছে, সুশান্তবাবুদের ইউনিটি, এই নতুন ইউনিটিকে দেখে বেশ একটু রাগ করে ফেলেছে।"

ললিতবাবু আরও জোরে হাসেন, "তা জানি না মশাই।"

এবং সেই সন্ধ্যাতেই কংক্রিটের নীড়ে একই সোফায় পাশাপাশি একটু আলগা হয়ে বসে গল্প

করে সুশান্ত আর বন্দিতা।

সুশান্ত বলে, "তুমি ওই ভদ্রলোককে চেন নাকি বন্দিতা?"

বন্দিতা বলে, "কী আশ্চর্য, বলেইছি তো, কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হলো। তুমিও তো বললে...। থাক্‌গে ওদের কথা, তুমি আজ আর-একবার তোমার সেই চেনা মেয়েটার কথা বলো তো, কিছুই লুকোতে পারবে না কিন্তু।"

সুশান্ত হাসে : "আর নতুন করে বলবার কি আছে? সবই তো তোমাকে বলেছি।"

"দেখতে কেমন ছিল মেয়েটা?"

"ভালোই। কিন্তু আমি কোনদিন ওকে বলতে যাইনি যে, তুমি দেখতে বড় ভালো। সে-মেয়ে ছ'বছর ধরে এই আশা করে দিন কাটিয়ে দিয়েছে যে, আমি ওকে বিয়ে করব।"

সত্যি কথাই বলেছে সুশান্ত। অতীতের ছ'বছর ধরে গড়ে ওঠা একটা ইতিহাসের সার কথাটুকু বন্দিতার কাছে বলেছে সুশান্ত। গিরিড়ির এক হরেনবাবু ও তাঁর মেয়ে নলিনীর কথা। সে-ইতিহাসের সবটুকু বন্দিতার কাছে না বললেও চলে, বলবার দরকারও হয় না। তা না হলে আজ সুশান্তকে আরও অনেক কথাই বলতে হতো।

কোন এক অভ্র-কারখানার অফিসে অল্প মাইনের একটা চাকরি করতেন হরেনবাবু। আর ম্যাট্রিক পাস করে সেই কারখানার অফিসেই আরও অল্প মাইনের একটা চাকরি নিয়ে যেদিন কাজ করতে গেল সুশান্ত, সেদিন হরেনবাবু বললেন, "তুমি কলেজে পড়, সুশান্ত। তোমার মামা যদি পড়ার খরচ না দিতে পারেন, তবে আমিই দেব।"

কলেজে পড়বার জন্য পাটনা রওনা হবার আগের দিন হরেনবাবুর বাড়িতে সুশান্তর নিমন্ত্রণ ছিল। সেদিনই বুঝেছিল সুশান্ত—কেন, কিসের জন্য হরেনবাবু সুশান্তর পড়ার খরচ দিতে চান। যেটুকু বুঝতে বাকি ছিল সেটুকুও বুঝিয়ে দিল হরেনবাবুর মেয়ে নলিনী : "ছুটির সময় আসবেন তো, না পাটনাতেই থাকবেন?" কথাটা বলেই সুশান্তর মুখের দিকে যেভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল নলিনী, তাতে বুঝতে আর কিছু বাকি থাকে না যে, এরই মধ্যে সুশান্তকে চিরকালের আপন ভেবে বসে আছে নলিনী। ছ'বছর ধরে কলেজের সব ছুটিতে পাটনা থেকে ফিরেছে সুশান্ত, নলিনীর চোখের আশা প্রতি বছরে আরও হাসি-হাসি হয়ে ফুটে উঠেছে। চৈত্র মাসের ভোরে বেড়াতে বেড়াতে উশ্রীর ঝরনা পর্যন্ত চলে গিয়েছে সুশান্ত আর নলিনী। তাছাড়া অনেক দেনাও করলেন হরেনবাবু; সুশান্তর এম.এস-সি. পরীক্ষার ফী দেবার সময় মধুপুরের সেই এক টুকরো জমিটাকেও বেচে দিয়ে টাকা যোগাড় করলেন।

তারপর বোটানিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট সুশান্ত যেদিন সাড়ে চার-শো টাকার মাইনেতে ফরেস্ট রিসার্চের সার্ভিস নিয়ে আলমোড়ার দেওদারের ছায়ায় দাঁড়িয়ে গিরিডির কথা ভাবল, সেদিনই প্রথম বুঝতে পারল সুশান্ত, বড় অন্যায় আশার দাবি দুই চোখে আর মনে মনে পুষে রেখেছে নলিনী, আর নলিনীর বাবা হরেনবাবু। পাটনার বন্দিতাকেই বার বার মনে পড়ে। বন্দিতার আশা মিথ্যে করে দিতে পারবে না সুশান্ত। তা ছাড়া আরও একটা সত্য কথা। নলিনীর মতো মেয়ে বুকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে কল্পনা করলেও যে মনের কোণে কোন পিপাসা আকুল হয়ে ওঠে না।

সোফার উপর বন্দিতার মূর্তিটা জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে। সুশান্ত বলে, "একটা রেকর্ড বাজাই, কেমন?"

বন্দিতা বলে, "থাক্।"

সুশান্ত হাসে, "তুমি কিন্তু সেই গল্পটার অনেক কিছুই বোধ হয়...।"

"কিছুই লুকোইনি, সবই বলে দিয়েছি। আমি কী করতে পারি বলো, যদি একটা লোক আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে?"

বন্দিতাও সত্যি কথা বলে দিয়েছে। প্রায় সাত বছর ধরে একটা লোকের জীবনের আসা বন্দিতার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে এসেছে। বন্দিতা কিন্তু কোনদিন তাকে বলতে যায়নি যে, আমিও তোমার কাছে যাবার জন্য আশা করে রয়েছি।

সে-ইতিহাসের আর সব কাহিনী সুশান্তর কাছে বলে বৃথা মুখ ব্যথা করবার দরকার হয় না। বলেও না বন্দিতা। নইলে বন্দিতাও বলতে পারত যে, সে-লোকটা শুধু একটা উপকারের জোরে বন্দিতার জীবনটাকে কিনে নিতে চেয়েছিল।

গয়ার মুন্সেফী আদালতের উকিল চঞ্চলবাবু যেদিন হার্টের অসুখে কাবু হয়ে বিছানায় আশ্রয় নিলেন, সেদিন সবার আগে এই কথাটাই ভেবে চোখ মুছেছিলেন, কি হবে তাঁর একটিমাত্র মেয়ে বন্দিতার উপায়? সেদিন কোথা থেকে এসে একটি ছেলে যেন গায়ে পড়ে চঞ্চলবাবুর উদ্বেগ শান্ত করতে চেষ্টা করেছিল। সেটেলমেন্টে আমিনের কাজ করে, ষাট টাকা মাইনে পায়, সেই ছেলেটির নাম প্রভাত। পাটনার কনভেন্টে চলে গেল বন্দিতা, স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত অনেক পড়া পড়ল বন্দিতা, এবং সব খরচ প্রভাত নামে সেই আমিন মানুষটাই প্রতি মাসে চঞ্চলবাবুর হাতে তুলে দিয়ে গেল। এর মধ্যে একবার বড়দিনের ছুটিতে গয়াতে এসে বন্দিতার আর-কিছু বুঝতে বাকি থাকেনি, কিসের আশায়, এত উপকার করে চলেছে প্রভাত।

বন্দিতার মুখের দিকে অনেকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থেকে প্রভাত বলে, "তুমি তো আবার পাটনায় চলে যাবে, আর ফিরে আসবে সেই মে মাসে...তোমার একটা ফটো আমায় দিয়ে যাও বন্দিতা, নইলে দিনগুলো যে সহ্যই করতে পারব না।"

আপত্তি করেনি বন্দিতা, প্রভাতের হাতে ফটোটা তুলে দিতে গিয়ে লজ্জাও পেয়েছিল; কিন্তু আর বেশি কিছু নয়। এবং পাটনাতে বি.এ. পরীক্ষার পাসের খবর বের হবার দিন সুশান্তর সঙ্গে সিনেমার ছবি দেখতে গিয়ে সুশান্তর পাশে বসেই হঠাৎ আনমনা হয়ে বুঝতে পেরেছিল বন্দিতা, উপকারের বিনিময়ে এ কী অদ্ভুত ডাকাতি করতে চায় প্রভাত? তা হয় না। প্রভাতের মতো একটা মানুষ চোখের কাছে চোখ রেখে হাসছে, ভাবতে যে একটুও ভালো লাগে না, কোন ইচ্ছাই বুকের বাতাস নিবিড় করে তোলে না।

গয়ার প্রভাত আর গিরিডির নলিনী জানতেও পারেনি, কবে এক শুভসন্ধ্যায় আলমোড়াতে পরিপাটি করে সাজানো একটি ঘরে এবং সুন্দর করে সেজে আসা এক সোসাইটির চোখের সামনে সুশান্তর বিয়ে হয়ে গেল।

তারপর? সোফার উপর পাশাপাশি বসে গল্প করতে করতে সুশান্ত বলে, "গিরিডির কোন খবর আমি জানি না, রাখিও না।"

বন্দিতা বলে, "আমিও। গয়ার খবর আমি শুধু এইটুকুই জানি যে, বাবা ভালো আছেন, আবার প্র্যাকটিস শুরু করেছেন।—তাছাড়া আর কোন খবর রাখি না।"

সুশান্ত আর বন্দিতা কতক্ষণ এইভাবে সোফার উপর এতটা তফাত হয়ে আর আলগা হয়ে

পাশাপাশি বসে আছে তার হিসেবও রাখতে পারে না বোধহয়। দুজনের মাঝখানে যেন মস্তবড় ভয়ানক তীক্ষ্নমুখ একটা কাঁটার বেড়া হঠাৎ কোথা থেকে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। নড়লেই গায়ে বিঁধবে। তাই একটুও নড়ে না। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে সুশান্ত আর বন্দিতা।

সারা শালবনের মাথা আর দামোদরের বুক আলোতে ডুবিয়ে দিয়ে ওই যে অতবড় জ্বলজ্বলে চাঁদ জেগে উঠেছে, তাও বোধহয় ওদের চোখে পড়ছে না। অনেকক্ষণ পরে কথা বলে বন্দিতা, "আচ্ছা, ওরা দুজন বেহায়ার মতো ওদিকে ওই মহুয়ার ভিড়ের দিকে কেন চলে গেল, আন্দাজ করতে পার?"

"হ্যাঁ, আমারও সন্দেহ হয়েছিল, ওরা যেন কেমন একটা বিশ্রী রকমের মতলব নিয়ে...।" বলতে বলতে চমকে উঠে দাঁড়ায় আর চেঁচিয়ে ওঠে সুশান্ত, "বন্দিতা!"

বন্দিতা উঠে দাঁড়ায়, "কী?"

"ওই দেখ, ওরাই যে যাচ্ছে মনে হচ্ছে।"

ছটফট করে আর্তনাদের মতো স্বরে বন্দিতা বলে, "কোথায় যাচ্ছে বলতে পার?"

সুশান্তর মুখটা যেন একটা দুঃস্বপ্নের ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করে : "হয় বাঁধের দিকে, নয় নতুন ক্যানেলের দিকে, বোধহয় রাঁচি রোডের দিকে..."

"তবে শুধু এখানে দাঁড়িয়ে দেখে লাভ কি? চলোই না একবার।"

"আমিও তো তাই বলছি।"

কংক্রিটের নীড়ের ভিতর থেকে যেন দুই মাতাল শিকারীর মতো উতলা মূর্তি নিয়ে ছুটে বের হয়ে আসে সুশান্ত ও বন্দিতা। বন্দিতার গলার স্বরটা যেন দাঁতে দাঁত পেষা শব্দের মতো কটকট করে ওঠে, "যদি একবার হাতে হাতে ধরে ফেলতে পারি...।"

সুশান্তর গলার স্বর চাপা আক্ষেপের মতো হাঁসফাঁস করে ওঠে, "আমার কিন্তু এখনও বিশ্বাস আছে যে...।"

"কিসের বিশ্বাস?"

"ওই মহিলার পক্ষে কোন রকমের অসভ্যতা সম্ভব নয়।"

"আমার কিন্তু বিশ্বাস, ওই ভদ্রলোকের পক্ষে কোন রকম বাজে বিশ্রী ব্যবহার একেবারেই সম্ভব নয়।"

কিন্তু কোথায় কত দূরে, কোন্ দিকে চলেছে ওঁরা?

আলেয়ার মতো চটুল, দূরের সেই দুটি ধাবমান মূর্তির দিকে চোখ রেখে এগিয়ে যেতে যেতে হাঁপাতে থাকে সুশান্ত। বন্দিতার গায়ের আঁচল বার বার খসে যায় আর লাল কাঁকরের ধুলোর উপর লুটিয়ে পড়ে। এই জ্যোৎস্নায় পাগল হয়ে ওই ছায়া-ছায়া দুটি রহস্য বোধহয় পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে চলে যাবার জন্য তরতর করে শুধু এগিয়ে চলেছে। কোথায় গিয়ে থামবে কে জানে?

থেমেছে। ঠিক জায়গাটিতে এসে থেমেছে। রাঁচি রোডের উপর যে জায়গাটিতে ইউক্যালিপটাসের ছায়া থমথম করে আর পথ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে থাকা থেঁতলানো ফুলের গন্ধরসে ঢুলুঢুলু হয়ে বাতাস উড়ে যায়, ঠিক সেইখানে ছোট কালভার্টের লোহার রেলিংয়ের গায়ে হেলান দিয়ে ওরা দাঁড়িয়েছে। সুশান্ত আর বন্দিতাও আড়ালের শিকারীর মতো আস্তে আস্তে ছায়া লুকিয়ে আর পা টিপে টিপে ইউক্যালিপটাসের পাশে এসে দাঁড়ায়। এই তো এখানে দাঁড়িয়েই কালভার্টের উপর

দাঁড়িয়ে থাকা ওই ছায়ায় নাক-চোখগুলিকেও যে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ফিসফিস করে সুশান্ত বলে, "আর এগিয়ে যাবার দরকার নেই বন্দিতা।"

দু চোখ অপলক করে দেখতে থাকে বন্দিতা, ওই তো হেসে উঠেছে তারই চোখের সাত বছর ধরে দেখা একটা চেনা মুখ। সুশান্তর কানের কাছে মুমূর্ষু মাছির গুঞ্জনের মতো গুনগুন করে বন্দিতা, "ইস, ছি-ছি, কী রকম অদ্ভুত হাসি হাসছে লোকটা।"

কিসের আক্ষেপ? সাত বছর ধরে দেখা সেই সামান্য মানুষটার মুখের হাসিকে দেখতে ভালো লাগবে না, বন্দিতার সেই বিশ্বাস চমকে উঠেছে, ঠকে গিয়েছে, তাই কি? সুশান্তও কি মনে করেছিল যে, ছ'বছর ধরে দেখা সেই সামান্য মেয়েটার মুখের হাসি দেখতে এত ভালো লাগতে পারে না?

বাঃ, বেশ তো! খুব ওস্তাদ! কী ভয়ানক! বন্দিতার বুকের ভিতরে যেন আছাড় খেয়ে পড়তে থাকে এক-একটা পরম চমকের নীরব আর্তনাদ। লোকটাকে বাঘ-বাঘ মনে হয়, যেন দুটি থাবা দিয়ে মেয়েটার মস্তবড় ওই খোঁপাটাকে আঁকড়ে ধরেছে। মেয়েটাকে খুন করবে নাকি ওই ভয়ানক লোভী পিপাসী লোকটা?

মহিলার দুটি ছটফটে হাতের চুড়ি থেকে ঝিকঝিক করে ঠিকরে পড়েছে জ্যোৎস্নার আগুন। চমকে উঠে চোখের উপর রুমাল চেপে ধরেই আবার রুমাল নামিয়ে নেয় সুশান্ত। ছি-ছি, ইউক্যালিপটাসের থেঁতলানো ফুলের গন্ধরসে বিভোর হয়ে মাতাল হয়ে গিয়েছে ওই মেয়ে, নইলে হাত দুটোকে লোকটার কাঁধের উপর অলসভাবে ফেলে দিয়ে এমন করে ঢলে পড়বে কেন?

মিশে গিয়েছে, মিলে গিয়েছে, কী ভয়ানক এক হয়ে গিয়েছে ওই দুই মুখের হাসি! দেখতে পাওয়া যায় না ওদের মুখ। চাঁদ না ডুবে-যাওয়া পর্যন্ত ওরা বোধহয় মুখ আর তুলবে না। এইভাবেই এই রাতের একটা জ্যোৎস্নামাখা রহস্যের শক্ত পাথর হয়ে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকবে।

একটা ভিন জগতের রূপ যেন বন্দিতার দু চোখে আবেশ ধরিয়ে দিয়েছে। বন্দিতার অপলক চোখ দুটো টলমল করে। আনমনার মতো বলে, "তুমি কি কিছু বললে?"

সুশান্তর শান্ত নিঃশ্বাসের বাতাসও যেন উষ্ণ হয়ে কোন এক নতুন রূপের জগতে গিয়ে কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। বন্দিতার প্রশ্ন শুনেই চমকে উঠে বলে, "না, কিছু বলিনি। কিন্তু এবার বাড়ি ফিরলেই তো হয়।"

বন্দিতা বলে, "চলো।"

সুশান্ত আর বন্দিতা। আর দুজনের একসঙ্গে বেড়াতে যাবার দরকার হয় না। সুশান্ত বলে, "থাক্, ওই শালের জঙ্গলের মধ্যে আর দেখবার কি আছে?" বন্দিতাও স্বীকার করে : "দামোদরের ওই একঘেয়ে স্রোতের মধ্যে নতুন করে দেখবার আর কী এমন বস্তু আছে যে, রোজই একবার যেতে হবে?"

কংক্রিটের নীড় থেকে দুজনকে একসঙ্গে বের হতে হবে, আর ল্যাবরেটরি ও অফিস থেকে আবার দুজনের একসঙ্গে ফিরে যেতে হবে, এটাও যে একটা একঘেয়ে নিয়ম। কোন দরকার হয় না। সুশান্ত একটু আগেই কোয়ার্টার থেকে বের হয়, একটু পরে বন্দিতা। অফিস থেকে যাবার সময় বন্দিতাই একটু আগে চলে যায়, একটু পরে সুশান্ত।

সন্ধ্যা হলে কংক্রিটের নীড়ের বারান্দায় একই সোফায় দুদিকে চুপ করে বসে থাকে সুশান্ত ও বন্দিতা। গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজে। কত অনুরাগের ভাষা আর আবেশ গেয়ে গেয়ে ক্লান্ত হয় রেকর্ড। দুজনে শুধু কান পেতে শোনে।

কোলের উপর মরক্কো-বাঁধানো শেক্সপীয়র রেখে রোমিও-জুলিয়েট পড়ে বন্দিতা, কিন্তু পড়ে পড়ে ক্লান্ত হয় শুধু। পাশেই বসে আছে সুশান্ত নামে মানুষটি বন্দিতার প্রেমের জীবনের পরম পাওয়া, তার দিকে একবার চোখ তুলে তাকাতেও ভুলে যায়।

কারা যেন হঠাৎ এসে এই পৃথিবীর সব আলো-ছায়া-শব্দ আর রঙের রূপ থেকে সেই মধুর উষ্ণতার শিহরটুকু লুট করে নিয়ে চলে গিয়েছে। তাই ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে সুশান্ত আর বন্দিতার শ্বাসবায়ু। চোখের সামনে মেঘে মেঘে যতই ঢলাঢলি করুক আর ছায়ায় ছায়ায় যতই জড়াজড়ি করুক, এই বারান্দার কোন মেঘলা সন্ধ্যায় অথবা কোন রাতের নীরব প্রহরে দম্পতির মনের আবেশে উতলা হয়ে ওঠে না। —ভিতরে চলো। এই ছোট কথাটি আর শুনতে পায় না কংক্রিটের নীড়ের এই ছোট বারান্দাটা। চিরক্ষণের বাসকশয়নবিধুর সেই ঘরটাও যে উদাস হয়ে আর শূন্য হয়ে পড়ে আছে। ও-ঘরের ভিতরে যাবার জন্য স্বামী-স্ত্রীর নিঃশ্বাসে কোন স্বপ্নময় আবেগ উতলা হয়ে ওঠে না, চোখ-মুখে কোন আবেশ ধরে না।

"ভেরি স্ট্রেঞ্জ!" প্রবীণ মাথুর সাহেবও দেখে চমকে ওঠেন আর মনে মনে বলে ফেলেন এবং আশ্চর্য হয়ে যান। মার্কেট থেকে ফিরছে সুশান্ত আর বন্দিতা, কিন্তু কেউ যেন কারও কেউ নয়। সুশান্ত আগে আগে, আর বন্দিতা পিছু পিছু। সন্দেহ করেন মাথুর সাহেব, দুজনের মধ্যে কোন অভিমানের ঝগড়া ঘটেছে বোধহয়।

ললিতবাবুর বোনের বিয়ের দিনে এক ঘর লোকের আসরের মধ্যে আরও অদ্ভুত একটি কাণ্ড ঘটে গেল। সুশান্ত আর বন্দিতা যেন দুটি ভিন জীবনের মানুষ, কারও সঙ্গে কারও মুখের চেনাও নেই, সুশান্তর পিছনের চেয়ারে চুপ করে বসেছিল বন্দিতা। এবং ল্যাবরেটরির মুখার্জি এসে সেই ঘরভরা লোকের চোখের সম্মুখে চেঁচিয়ে উঠল, "এ কী ব্যাপার? আপনাদের এরিথমেটিক অব লাইফ হঠাৎ এরকম হয়ে গেল কেন? প্লাস-মাইনাসে কাটাকুটি হয়ে গেল নাকি?"

সুশান্তর মুখটা হাসতে গিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যায়, আর বন্দিতা হাসতেই পারে না। শুকনো চোখ দুটোকে যেন ভয়ানক এক বিদ্রূপ কামড় দিয়ে ধরেছে।

মুখার্জিই বলে, "কিন্তু ওঁরা দুজন তো ওঁদের এরিথমেটিক বেশ ঠিক রেখেই চলে গেলেন!"

"কে?"

বন্দিতা চমকে ওঠে : "কারা?"

মুখার্জি বলে, "সেটলমেন্টের ওই প্রভাতবাবু ও তাঁর স্ত্রী।"

সুশান্ত চমকে উঠে প্রশ্ন করে, "চলে গেছে নাকি?"

"এই তো কিছুক্ষণ আগে ওঁরা চলে গেলেন। ডালটনগঞ্জে চলে গিয়েছে, সেটেলমেন্টের ক্যাম্প আর অফিস।"

গেরুয়ারঙের কাঁকরের টিপির উপর কংক্রিটের নীড়। বারান্দার উপর সেই একটি সোফা ললিতবাবুর বোনের বিয়ে দেখে বাড়ি ফিরতেই রাত দশটা বেজে গিয়েছে। এখন তো অনেক

রাত। সোফার এদিকে আর ওদিকে তবু চুপ করে বসে থাকে সুশান্ত আর বন্দিতা।

হঠাৎ যেন দপ করে জ্বলে ওঠে সুশান্তর গলার স্বর : "আমি সবই বুঝতে পারছি বন্দিতা, তোমার এখন আর কিছুই ভালো লাগছে না।"

"তার মানে?"

চেঁচিয়ে ওঠে সুশান্ত, "তার মানে, আমাকে ভালো লাগছে না।"

কঠোর একটি ভ্রূকুটি করে শাণিত স্বরে বন্দিতা বলে, "আমিও যে বুঝতে পারছি, আমাকে তোমার একটুও ভালো লাগছে না।"

"ঠিক বুঝেছ।"

"তুমিও ঠিক বুঝেছ।"

"এই অবস্থায় কি করতে হয়, কি করা উচিত জান?"

"জানি, আমার চলে যাওয়া।"

"এবং আর কখনও ফিরে না আসা।"

"বেশ, তাই হবে।"

একই সোফার দুদিকে দুজনের জীবনের দুটি ঘৃণা হয়ে পড়ে থাকে দুটি মূর্তি, সুশান্ত আর বন্দিতা।

দামোদরের মিষ্টি হাওয়া আর শালবনের গন্ধ কতক্ষণ ধরে এই কংক্রিটের নীড়ের বুকের ভিতর ঢুকে হুটোপুটি করছে, তার হিসেব ওরা কেউ রাখে না। দু'চোখের আধঘুমের আবেশ নিয়ে অলস হয়ে একই সোফার দুদিকে পড়ে থাকে সুশান্ত আর বন্দিতা নামে দুটি দেহ।

রাত কখন ভোর হবে কে জানে? এখনও সারা আকাশ ভরে তারা ঝিকমিক করছে। জোর করে চোখ মেলে তাকায় সুশান্ত, যেন জোর করে জেগে উঠতে চাইছে প্রাণটা, কিন্তু জোর পাচ্ছে না। বুকের ভিতর ছটফট করছে প্রশ্নটা, বন্দিতা নামে এই নারীকে কি জীবনে আর ভালো লাগিয়ে নিতে পারাই যাবে না?

হঠাৎ ছটফট করে ডেকে ওঠে সুশান্ত : তুমি কি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লে?

বন্দিতা বলে, "না।"

"তা হলে কি ভাবছিলে এতক্ষণ ধরে?"

আস্তে আস্তে মুখ তুলে সুশান্তর মুখের দিকে তাকাতে চেষ্টা করে বন্দিতা, কিন্তু বলতে পারে না যে, সব শান্তিকে মিথ্যে করে দেবার জন্য, সুশান্ত নামে ওই মানুষটিকে তার নিঃশ্বাসের কাছে ভালো লাগিয়ে নেবার জন্য, এতক্ষণ ধরে মনের ভিতর উপায় খুঁজতে গিয়ে বৃথা আরও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বন্দিতা। সত্যিই কি কোন উপায় নেই?

সুশান্তর গলার স্বর হঠাৎ নিবিড় হয়ে যায় : "আমি বলতে পারি। আমি এতক্ষণ যা ভাবছিলাম তুমিও তাই ভাবছিলে।"

চমকে উঠে সুশান্তর দিকে একটু সরে আসে বন্দিতা। বলে, "তুমি কি ভাবছিলে?"

"রাঁচি রোডে কালভার্টের উপর জ্যোৎস্নারাতে দাঁড়িয়ে থাকা সেই ওদের দুজনের কথা।"

"হ্যাঁ।"

সুশান্তর মূর্তিটা যেন মনের ভুলে সরে এসে বন্দিতার গা ছুঁয়ে ফেলে। ছাড়াছাড়ি দুটি প্রাণ যেন কিসের টানে আবার কাছাকাছি হয়ে আসছে।

সুশান্ত বলে, "ভদ্রলোকের কাণ্ডটা মনে পড়ছে?"

"খুব মনে পড়ছে।"

"কেমন? দেখতে খারাপ লেগেছিল?"

সুশান্তর একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে বন্দিতা : "একটুও না। এবার তুমি বলো।"

"কী?"

"সেই মহিলার কাণ্ড!"

দু'হাতে বন্দিতাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সুশান্ত বলে, 'সুন্দর।'

দামোদরের মিষ্টি বাতাস আর একবার হুটোপুটি করে, এবং তারই সঙ্গে যেন লুটোপুটি করে উষ্ণ নিঃশ্বাসের শিহর।

সুশান্ত বলে, "চলো ভেতরে যাই।"

মিছার মা

নুটুর মা, হরির মা, দাসুর মা আর পুঁটির মা। একই গাঁ থেকে ওরা এসেছে। একই বস্তির এক ঘরেতে একই সঙ্গে থাকে সবাই। তা ছাড়া আছে আর একজন। তার নাম হলো মিছার মা।

ঢাকুরিয়া স্টেশন ছাড়িয়ে আর একটু এগিয়ে ডায়মণ্ড হারবারের ট্রেন যেখানে একেবারে জোরে শিস ছেড়ে আর বেগ বাড়িয়ে দিয়ে চলতে শুরু করে, সেখানে রেল লাইনের বাঁ দিকে তাকালে দেখা যায় এই বস্তি। বর্ষার সময় বস্তির ঘরগুলি যেন জলের উপর ভাসে, আর গলে গলে পড়ে দেয়ালের মাটি।

একটি ঘরের মাটির মেজে মাত্র, লম্বায় দশ হাতের কিছু কম আর চওড়ায় দু'হাতের কিছু বেশি। ভাড়া দিতে হয় প্রতিমাসে পঁচিশ টাকা! অর্থাৎ মাথা পিছু পাঁচ টাকা। মাটির মেজেটাকেই সমান সমান পাঁচটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছে সবাই। লম্বায় তিন হাত আর পাশে দু'হাত জায়গার এক একটি ভাগ। রাত্রি হলে সারাদিনের গতর-খাটা জীবনের ক্লান্তিকে তারই মধ্যে টান করিয়ে শুইয়ে নিতে পারা যায়। কেরোসিনের যে কুপিটা জ্বলে, সেটাও ভাগের জিনিস। মাথা পিছু এক পয়সা করে চাঁদা ধরতে হয়েছে, কারণ মোট পাঁচ পয়সা হলো কুপির দাম। ত্রিশটি রাত্রির উগ্রগন্ধ ধোঁয়া আর ময়লা আলোর জন্য মোট খরচ পড়ে পাঁচ আনা। সুতরাং, হিসেবে কোন গোলমাল হয় না। প্রতিমাসে মাথা পিছু এক আনা জমা করলেই কেরোসিনের খরচ কুলিয়ে যায়।

নুটুর মা, হরির মা, দাসুর মা, পুঁটির মা আর মিছার মা—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঠিকা-ঝিয়ের কাজ করে জীবন কেটে যায় যাদের, তাদেরই পাঁচজন। পাঁচটা ছেঁড়া মাদুর, তার উপর এক-এক টুকরো চট, আর এক-একটা কাঁথা। একটি করে পেটরাও আছে প্রত্যেকের। ঐ মাদুর চট আর কাঁথা, আর পেটরার মধ্যে যা আছে, তাই নিয়েই হলো পাঁচজনের যথাসর্বস্ব। চোরের ভয় আছে, তাই কাজের ফাঁকেই, কিংবা কাজ ফাঁকি দিয়েই এক-একবার চলে আসে। দরজা খুলে ঘরে

ঢোকে, পেটরা খুলে দেখে, তারপর নিশ্চিন্ত হয়। তারপর আবার দরজার কুলুপ দিয়ে কাজে চলে যায়।

বর্ষার ভয় আছে, চোরের ভয় আছে, গ্রীষ্মের সময় আর এক রকম ভয় আছে। গতবছর এই যথাসর্বস্বও পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। বৈশাখের দুপুরে ট্রেনের ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়ার সঙ্গে আগুনের ফুলকি কয়েকটা ছুটে এসে পড়েছিল শুকনো বিচালি ছড়ানো চালের উপর। সন্ধ্যাবেলা কাজ থেকে ফিরে এসে দেখেছিল সবাই, পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ঘর। কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই ছাই-এর স্তূপ ঘেঁটে পাঁচটি পেটরার কোন চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায়নি। পোড়া কপালের ছাইটুকুও চুরি করে নিয়ে গিয়েছে চোর। কপাল চাপড়ে একই সঙ্গে কেঁদেছিল সবাই—নুটুর মা, দাসুর মা, হরির মা, পুঁটির মা, আর মিছার মা।

আবার নতুন চালা তুলে দিলেন বস্তির মালিক। কিন্তু ভাড়াও বাড়িয়ে দিলেন। এখন দিতে হয় মাথা পিছু পাঁচ টাকা, আর তখন দিতে হতো মাথা পিছু তিন টাকা, মাসে পনের টাকা।

আর একটা ভয়, সেই ভয় হল সবচেয়ে বড় ভয়। জ্বরের ভয়। যদি মাথাটা কেমন করে ওঠে, হাত-পাগুলি তেতে ওঠে আর কাঁপতে থাকে, নিঃশ্বাসের বাতাসটা জ্বলতে থাকে তবেই হয়েছে। একদিন দু'দিনের টানা উপোসে যদি জ্বর ছাড়ে তো ভাল, তা না হলে হয় পাগল না-হয় ভিখিরী করে ছাড়বে ঐ জ্বর। কাজে কামাই দিতে হবে আর মাইনে কাটা যাবে। তাই জ্বর গায়েই কাজে ছুটতে হয়।

আবার, সব বারেই কি জ্বর গায়ের জ্বালা নিয়ে যেতে পারা যায়? পারা যায় না। ঘরের অন্ধকারে মাদুরের উপর শুয়ে হঠাৎ মরণভয় চেপে বসে বুকের উপর। ঢাকুরিয়ার কবরেজের কাছে গিয়ে চার আনার পাঁচন কিনে আনতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তবু পেটরার ভিতর হাত দিতে ইচ্ছা করে না। চারটি আনা পয়সা মিছামিছি খুইয়ে দিয়ে লাভ নেই। বুঝতে পারে, মিথ্যে এই মরণভয়, এত সহজে মরণ হয় না। আর মরণ যখন সত্যিই আসবে, তখন কি আর চার আনার পাঁচনে তাকে ঠেকানো যাবে। —না গো নুটুর মা, তুমি কাজে যাও, পাঁচন কিনতে হবে না। হাঁপ ছেড়ে আবার পাশ ফিরে শুয়ে থাকে হরির মা।

মাঝে মাঝে, বছরে অন্তত তিন চার বার প্রত্যেকেরই জীবনে এইরকম পরীক্ষা দেখা দেয়। কোনবার নুটুর মা, আবার কোনবার হরির মা, দাসুর মা, আর পুঁটির মা, আর মিছার মা, এইরকমই মরণভয় সহ্য করে, কিন্তু পাঁচন কিনে চার আনা পয়সা নষ্ট করতে পারে না।

নুটু, হরি, দাসু আর পুঁটি—নেহাত কতগুলি নাম নয়, মাত্র কতগুলি কল্পনা নয়। ওরা সত্যিই আছে। ওরা বেঁচে আছে। যে-যার নিজের প্রাণ বাঁচাবার খোরাক যোগাড় করার জন্যই পৃথিবীতে কোথাও না কোথাও ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। এই রকমই এক একটা বস্তির মধ্যে ঠাঁই নিয়ে আছে সবাই এবং এই বাড়িতেই মাঝে মাঝে তাদের দেখতে পাওয়া যায়। আসে দাসু, আসে হরি অর নুটু। আলতা পায়ে দিয়ে আর হাতে কাঁচের চুড়ি বাজিয়ে পুঁটিও আসে তার বরের সঙ্গে।

সন্ধ্যাবেলা লেকের চারিদিকে ঘুরে মসলা-মুড়ি ফেরি করে দাসু। নুটু যাদবপুরের এক মোটর বাসে খালাসীর কাজ করে, আর হরি হলো বড়বাজারের এক দোকানের চাকর। পুঁটি আর ঝি-এর কাজ করে না। তার বর বিড়ির দোকান দিয়েছে, আর দোকান চলছেও ভাল। মায়েতে ছেলেতে সুখ-দুঃখের কথা হয়, আবার ঝগড়াও বাধে। সব মা'র মন এক রকম নয়, সব ছেলের প্রকৃতিও

একরকম নয়। হরি আসে শুধু মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে। নুটু এসে কখনো একটা নতুন গামছা আর কখনো বা দু-চার আনা পয়সা দিয়ে যায় মাকে। দাসু এসে শুধু ঝঞ্ঝাট বাধায়, উল্টে দুটো টাকা চেয়ে বসে। দাসুর মা চিৎকার করে গালি দেয়—টাকা কোত্থেকে পাব রে, আর পেলেই বা তোকে কেন দেব রে গাঁজাখেকো মুখপোড়া। পুঁটি আর একদিন এসে একগাল হেসে বলে—আজ কাজে কামাই দে না মা!

—কেন লো?

—আজ মুগ খিচুড়ি রেঁধেছি, চল দুটি খেয়ে আসবি।

সবারই ছেলে বা মেয়ে আসে, আর এসে ঝগড়া করে, নয় হাসে, কিন্তু মিছার মা'র মিছা কেন আসে না?

আসবার কথা নয়, কারণ ঐ নামটাই যে মিছা। মিছার মা কারও মা নয়। একটা নাম ওর নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সে নামটা এই বস্তির জীবনে এসে অনেকদিন আগেই অচল হয়ে গিয়েছে। নুটুর মা, হরির মা, দাসুর আর পুঁটির মা'ও আজ মনে করতে পারে না যে, ওর নাম হলো মুক্তো, ওদেরই গাঁয়ের সেই ভানু দাসের বউ মুক্তো। মুক্তো হলো নিঃসন্তান। কিন্তু সবাই যখন অমুকের মা আর তমুকের মা, তখন মুক্তোই বা কারও মা হবে না কেন? যেন চার জনের নামের চাপে পড়েই মুক্তোর নামও হঠাৎ বদলে গেল একদিন। আজ কারও মনে পড়ে না, মুক্তোকে মিছার মা বলে কে ডাক দিয়েছিল প্রথম। ঠাট্টা করে নয়, সত্যই যেন একটা দরকারে পড়ে, যেন বস্তির এই চারজন সন্তানবতীর নামের আর গতরখাটা ঝি-জীবনের সঙ্গে মুক্তোকে মানিয়ে নেবার জন্যই ঐ নাম দেওয়া হয়েছে। সন্তান নেই, হয়নি কোন দিন। তাই মুক্তো হলো মিছার মা।

—কি হলো তোর, আজ কাজে যাবি নি মিছার মা?

নুটুর মা'র ডাক শুনে বিরক্ত হয়, আর উত্তর দিতে গিয়ে যেন বিড়বিড় করে মিছার মা'র মেজাজ—কিছু হয়নি, ইচ্ছে হয়েছে কাজে যাব না, তুই চেঁচাস কেন?

রোজ নয়, মাঝে মাঝে সমব্যথিনীর এই রকম মিষ্টি কথারও তেতো জবাব দেয় মিছার মা। জবাবের ভাষা শুনে আর অকারণ রাগের রকম দেখে কখনো রাগ করে আবার কখনো হেসে চলে যায় নুটুর মা।

কারণটা কিন্তু কেউ অনুমান করবার কিংবা বুঝবার চেষ্টা করে না। মিছার মা হয়ে পড়ে আছে মুক্তো, সহজ হয়ে গিয়েছে এই নামটা, কিন্তু তবু যেন মাঝে মাঝে এই নাম সহ্য করতে পারে না মুক্তো।

সেদিন ঠিক হলো, রথের মেলা দেখতে যাওয়া হবে।—তুই যাবি নাকি মিছার মা? দাসুর মা'র কথার উত্তরে হেসে হেসেই জবাব দেয় মুক্তো—যাব বৈকি।

চুল বাঁধল, ধোওয়া শাড়ি পরল মুক্তো। আর, যাবার সময় হতেই ডাক দিল পুঁটির মা—চল মিছার মা।

হঠাৎ যেন ফোঁস করে উঠল মুক্তোর নিঃশ্বাসের শব্দ। মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তার পরেই ঝামটা দিয়ে বলে—তোরাই যা, আমি যাব না।

—তবে থাক, মেজাজ নিয়ে ধুয়ে খা।

তিন জন ছেলের-মা আর একজন মেয়ের-মা রাগ করে পাল্টা ঝামটা দিয়ে চলে যায়। ঘরের

দাওয়ার উপর নিঃশব্দে একা বসে বিনুনি খুলতে থাকে মুক্তো, মিছার মা মুক্তো।

এই রকম প্রায়ই হয়, হয়ে আসছে আজ ক' বছর ধরে। নাম বদলে দিয়ে মুক্তোকে বেশ মানানসই করে এই ঘরের চারজনের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তবু যেন ঠিক মিলে যেতে পারেনি মুক্তো। ঐ অকারণ বিরক্তি, মুখভার, ফোঁস করে ওঠা আর ঝামটা দেওয়া, একটা কি যেন এলোমেলো হয়ে রয়েছে মনের মধ্যেই। মনের দিক দিয়ে চার জনের মধ্যে বেশ একটা বেমানান হয়েই রয়েছে মুক্তো।

শুধু মনের দিক দিয়ে কেন, বস্তির সকলে তো স্বচক্ষে দেখতেই পায়, বয়েস ও চোখ-মুখের চেহারায় ঐ চারজন নারীর মধ্যে বেশ ভিন্ন হয়ে আর বেমানান হয়ে রয়েছে এই নারী, যার নাম মিছার মা। চারজন প্রবীণা ও বর্ষীয়সীর মধ্যে মাত্র একজন, যার বয়স বেশ কাঁচা। পরিপাটি করে বিনুনি বাঁধে, যত্ন করে আলতা পরে, মিছার মা'র এই সব শখ ভাল চক্ষে দেখে না বস্তির মানুষ, যদিও মিছার মা দেখতে ভাল আর বিনুনিতে ও আলতাতে ওকে মানায়ও ভাল।

বস্তির আর সকলে যে চক্ষেই দেখুক, এই ঘরের চারজন প্রবীণা ও বর্ষীয়সীর কাছ থেকে বেশ একটু লাই আদর আর ক্ষমাই পেয়ে থাকে মিছার মা। সন্ধ্যাবেলা কাজের বাড়ি থেকে মিছার মা'র ফিরতে যদি একটু দেরী হয়ে যায়, তবে একটু ভয় পেয়ে আর উদ্বেগ নিয়ে দাওয়ার উপর এসে বসে থাকে চারজন, আর ফিরে আসার পর ধমক-ধামকও দেয়। —রাত করিস কেন, বয়স ভুলে যাস কেন লো বে-আক্কেলে ছুঁড়ি?

অভিভাবিকাদের ভাবনার রকম দেখে হেসে ফেলে মুক্তো। —মানুষের ভুল কি শুধু রেতের বেলাতেই হয় হরির মা, দিনের বেলাতেও তো হতে পারে।

হেসে ফেলে হরির মা—দোহাই তোর ঠাকুরের, রেতে হোক আর দিনে হোক, ভুলটুল করিস না মিছার মা।

—চুপ কর। রুক্ষস্বরে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে মুক্তো। গম্ভীর হয়ে আর মুখ ভার করে হরির মা'র দিকে তাকিয়ে থাকে। চোখের ভাব দেখেই বোঝা যায়, ঠিক সেই, আবার ঠিক সেই রকম অকারণে হঠাৎ রাগ করেছে মুক্তো। কিন্তু আর কিছুই বলে না। আর বলবেই বা কেমন করে? নিজেও কি ঠিক বুঝতে পারে এ ছাই অদ্ভুত রাগ কেন দপ করে জ্বলে উঠে মেজাজ খারাপ করে দেয়!

দাসুর মা বলে—তোর মাথার মধ্যে কি সাপ লুকিয়ে আছে নাকি লো? এরকম হঠাৎ ফোঁস করে উঠিস কেন?

মুক্তোও আর কোন উত্তর না দিয়ে শান্তভাবেই ঘরের ভিতর ঢোকে।

এইভাবেই জীবন চলে, রেল লাইনের পাশের এই বস্তিতে, চারজন বর্ষীয়সী সত্যিকারের মা, আর কাঁচা-বয়সের এক মিছার মা'র ঘরের জীবনে এর চেয়ে বেশি কোন ঝঞ্ঝাট দেখা দেয় না।

ঝঞ্ঝাট দেখা দিল একদিন।

কোথা থেকে মোটাসোটা আর কুচকুচে কালো চেহারার এক বছর বয়সের একটা বাচ্চা ছেলে নিয়ে এল মুক্তো।

চিৎকার করে হরির মা—এটাকে কোত্থেকে নিয়ে এলি মিছার মা?

মুক্তো হেসে হেসে বলে—তেতলা বাড়ির দারোয়ান দিল।

হরির মা—কার ছেলে?

মুক্তো—দারোয়ানেরই মেয়েমানুষের ছেলে।

নুটুর মা—তা মুখপুড়ী মেয়েমানুষটা কই?

মুক্তো—মরেছে।

দাসুর মা—কিন্তু তার জন্য তুইও মরবি না কি?

মুক্তো—মরব কেন? এটাকে পুষব।

পুঁটির মা রাগ করে একটু শান্তভাবেই বুঝিয়ে বলে—মানুষের ছেলে পোষা কি চারটিখানি ঝঞ্ঝাট মিছার মা? নিজের পেটের ধান্দায় দু'বেলা ঘরের বাইরে খাটতে হয় যাকে, ছেলে পুষবার সময় কই তার?

মুক্তো—ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যাব।

নুটুর মা ধমক দেয়—একা একা বন্ধ ঘরের ভেতর ছেলে পড়ে থাকবে, আর তুই বাইরে বাইরে ধেই ধেই করে নাচবি, কেমন?

হরির মা—ছেলে যে কেঁদে সারা হবে।

দাসুর মা—মনার মা'র সর্বনাশের কথা শুনিসনি?

পুঁটির মা—বাচ্চাটার পায়ে দড়ি লাগিয়ে সেই দড়ি দাওয়ার খুঁটোর সঙ্গে বেঁধে রেখে রোজ কাজে চলে যেত মনার মা। একদিন ফিরে এসে দেখে, বাচ্চাটাকে ক্ষেপা কুকুরে কামড়ে, মেরে রেখে চলে গিয়েছে।

মোটাসোটা কুচকুচে কালো বাচ্চাটাকে কোলের উপরেই জোরে চেপে ধরে আঁতকে ওঠে মুক্তো। তারপরেই কেঁদে ফেলে—এ কি সর্বনেশে কথা বলছিস, পুঁটির মা।

পুঁটির মা সান্ত্বনার সুরে বলে—বেড়ালের ছানা পুষলেও মায়া পড়ে যায় মিছার মা, তুই তো ইচ্ছা করে মায়া করবার জন্যেই এটাকে পুষবি। বাঁচবে কি মরবে কোন ঠিক নেই, যেচে ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নিস না মিছার মা।

হরির মা বলে—ফিরিয়ে দিয়ে আয়।

দাসুর মা বলে—আমি বাপু এক কথা বলে দিচ্ছি, আমি ঘরের মধ্যে এসব নোংরামির বালাই সহ্য করব না।

ফোঁস করে ওঠে মুক্তো—তোর দাসু কি একেবারে সেয়ানা হয়ে জন্মেছিল নাকি লো?

দাসুর মা—কিন্তু সে তো তোর ঘর নোংরা করতে যায়নি আঁটকুড়ি।

পুঁটির মা মাঝে পড়ে ঝগড়া থামিয়ে দেয়। দাসুর মাও একটু শান্ত হয়। তোমরাই বল, আমি চার বেলা নাওয়া-ধোওয়া করি, আমার একটু শুধু বাতিক আছে, এখন এই ঘরের ভিতর একটা অজাত-কুজাত ছেলের নেংরামি যদি...।

নুটুর মা—না না, সেসব চলবে না। ছেলে ফিরিয়ে দিয়ে আয় মিছার মা।

ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছে মুক্তোর কোলের উপর। অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে কাঁদল মুক্তো। তারপর ঘুমন্ত ছেলেটাকে বুকের ওপর তুলে নিয়ে ঘরের দাওয়ার উপর থেকে নেমে ধীরে ধীরে চলে গেল।

পুঁটির মা এগিয়ে গিয়ে মুক্তোর কানে কাছে ফিস্ ফিস্ করে বলে—ভুল করিস না মিছার মা। পরের ছেলেকে পরের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে চলে আয়। নিজের ছেলে হলে না হয়...।

চমকে ওঠে মুক্তো। পুঁটির মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে ভাঙা গলায় মুক্তো বলে—কি বললি পুঁটির মা?

—কিছু না, তুই এই ঝঞ্ঝাট ফেরত দিয়ে আয় এখন।

নিজের ছেলে হলে না হয়...কি জানি কি বলতে গিয়ে থেমে গেল পুঁটির মা। দাওয়ার উপর চুপ করে বসে আবোলতাবোল চিন্তা করে মুক্তো। ক'দিন থেকে কাজে বের হয়নি মুক্তো, আজও যাবে না।

ভানু দাসের বউ মুক্তো, কিন্তু কোথায় সেই ভানু দাস? আজ দশ বছরের মধ্যেও তার কোন সাড়া নেই। সেই যে ধানের ক্ষেতে দাঙ্গা করল আর পুলিস আসবার আগেই পালিয়ে গেল, তারপর থেকে সেই মানুষটার ছায়াও আর দেখা দিল না। লোকটা ভেসে গেল, কিন্তু মুক্তোকেও ভাসিয়ে দিয়ে গেল। নইলে গাঁয়ের চাষীর বউকে কি আজ শহরের এই বস্তিতে এসে ঢুকতে হয়, আর পেটের ভাতের জন্য পরের বাড়ির থালা-বাসন ধুয়ে বেড়াতে হয়! আবাগা বেঁচে থাকলেও পুলিসের ভয়ে আর ফিরে আসবে না, মরে থাকলে তো ফিরবেই না। ঐ লোকটাই মুক্তোকে চিরকালের মতো মিছার মা করে রেখে সরে পড়েছে। কিন্তু ইচ্ছা করলেই তো এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পারে মুক্তো। উপায়ও তো আছে! আজ একবছর হলো একটা অনুরোধ মরিয়া হয়ে ছায়ার মতো মুক্তোর পিছনে ঘুরছে। পয়সা আছে লোকটার। বাজারের কাছেই পথের উপর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আলুর দোকান সাজিয়ে বসে থাকে লোকটা। ওর নাম নন্দ।

নন্দর কোন কথার কোন উত্তর দেয়নি মুক্তো। ছায়ার মতো পিছনে পিছনে এসেছে নন্দ। রেল লাইনের কাছ পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। বলেছে—কিন্তু আমি যদি তোকে স্ত্রী মনে করি, তবে তুই আমাকে স্বামী মনে করতে পারবি না কেন মুক্তো?

চুপ করে শুনেছে, আর শুনেই রেল লাইন পার হয়ে বস্তিতে ঢুকেছে মুক্তো। নন্দর ছায়া কোন জবাব না পেয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে শুকনো মুখ নিয়ে ফিরে চলে গিয়েছে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, বস্তির ঘরে ঘরে কুপি জ্বলছে। ট্রেনের ইঞ্জিনের লাল ধোঁয়া অন্ধকারে নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ভাবতে গিয়ে আনমনার মতোই বস্তির কাদামাখা সরু পথের দিকে তাকিয়ে থাকে মুক্তো, আর কি আশ্চর্য, যেন মুক্তোর মনের সব ধোঁয়া ভেদ করে সেই কিন্তু মূর্তিটাই একেবারে ঘরের কাছে এসে মুক্তোর চোখের কাছে দাঁড়ায়।

নন্দ বলে—আমি কি বাঘ না ভালুক, এরকম করিস কেন মুক্তো?

উত্তর দেয় না মুক্তো। এত দিন সত্যই বাঘ আর ভালুকের মতই মনে হয়েছিল লোকটাকে। কিন্তু আজ কেন জানি মনে হয়, মানুষটা মানুষেরই মতো।

নন্দ বলে—তুই ঘরে ঘরে এঁটো বাসন ধুয়ে বেড়াবি, এ যে আমি আর সহ্য করতে পারছি না মুক্তো।

মুক্তোর একেবারে চোখের কাছে এসে নন্দ বলে—এত ভাববার কি আছে মুক্তো? আমি খাটব আর টাকা আনব, তুই শুধু সেজে বসে থাকবি ঘরে।

চকিতে নন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে, তারপরে সন্ত্রস্তের মতো চারদিকে তাকায় মুক্তো। নন্দর কথার মধ্যে মস্ত বড় এক লোভের আশ্বাস বাজছে আর চারদিকে তেমনি কতগুলি কঠিন ধিক্কারও

থমথম করছে! হ্যাঁ, একটি ছেলে কোলে নিয়ে ঘরের ভিতর সেজে বসে থাকতে চায় মুক্তো। কিন্তু সে কি করে সম্ভব? তা হলে চিরকালের মতো এই ঘরের বার হয়ে যেতে হয়। গাঁয়ের নাম ডুবিয়ে দিয়ে, এই বস্তির ও এই ঘরের নাম ডুবিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে...তারপর...।

নন্দ বলে—এত ভয় করবার কি আছে মুক্তো? এই তল্লাটেই আর থাকব না আমরা। জাতের লোক, চেনা লোক, গাঁয়ের লোক, কেউ খুঁজে পাবে না আমাদের। স্বামী-স্ত্রী হয়ে সুখে ঘর করব আর...।

মুক্তো হাঁসফাঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে বলে—তুমি এখন যাও।

নন্দ—তা হলে কথা রইল, একদিন এসে....।

মুক্তো—যাও যাও, এখন শিগগির চলে যাও।

চলে গেল নন্দ—সঙ্গে সঙ্গে হরির মা এসে ঘরের দাওয়ার উপরে ওঠে। প্রশ্ন করে—আজও কি কাজে যাসনি মিছার মা?

মুক্তো বলে—না যাইনি, আর কোনদিনও কাজে যাব না।

হরির মা বিস্মিত হয়—এ কেমন কথা? কাজ করবি না তো খাবি কি?

মুক্তো—কপালে যা আছে, তাই খাব।

হরির মা ভ্রূকুটি করে—তোর কথাবার্তা তো ভাল মনে হচ্ছে না মিছার মা।

নুটুর মা, পুঁটির মা আর দাসুর মা আসে। তারপর আরও প্রবল এবং আরও মুখর হয়ে ওঠে এই চারটি গতর-খেটে-বেঁচে-থাকা বর্ষীয়সীর মনের সন্দেহ। কাজে যাবে না আর খাটবে না, তবে খাওয়াবে কে এই মেয়েকে? ও কি এই দাওয়ার উপর বসে বেণী দুলিয়ে আর আলতা রাঙানো পা ছড়িয়ে দিয়ে ভাত-কাপড় গয়না রোজকার করতে চায়? সে হবে না, কখনো না! তার চেয়ে এখনই দূর হয়ে যাও। জাত-পাতের মুখে কালি দিয়ে, যে কোন নরকে চলে যাও। এখানে থেকে ওসব চলবে না।

হরির মা আক্ষেপ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কেঁদেই ফেলে—ওরে, তুই যে সম্পর্কে আমার জা হোস রে মিছার মা। তোর সোয়ামি ভানু যে হরির বাবার আপন মেসোর ভাইয়ের ছেলে।

পুঁটির মা ভয়ে কেঁপে ওঠে—ভানু যদি কখনও ফিরে আসে, তবে তোকে যে ঝুঁটি ধরে তুলে নিয়ে হাঁড়িকাঠে ফেলে বলি দেবে লো।

অভিযোগের উত্তাপ আর ধিক্কারের বর্ষণ একটু শান্ত হবার পর মুক্তো হঠাৎ বেহায়ার মতো হেসে ওঠে।

পুঁটির মা বলে—আবার কি হলো?

মুক্তো বলে—আমি যদি বিয়ে করি তবে কি দোষের হবে পুঁটির মা?

পুঁটির মা চোখ বড় করে তাকায়। —বিয়ে? তোর তো বিয়ে হয়েই আছে। আবার বিয়ে কেমন করে হবে?

মুক্তো—বিধবার তো বিয়ে হয়।

পুঁটির মা—তুই বিধবা নাকি?

মুক্তো—হ্যাঁ, মানুষটা এতদিন মরেই গিয়েছে নিশ্চয়।

হরির মা চেঁচিয়ে ওঠে—তবে এতদিন কপালে সিঁদুর রাখলি কেন মুখপুড়ী?

মুক্তো একটুও রাগ করে না। বরং খিলখিল করে হেসে ওঠে—আমি যেমন মিছার মা, তেমনি আমার ঐ মিছা সিঁদুর।

পুঁটির মা বুঝিয়ে বলে—ধর, বিয়েই না হয় করলি। তারপর, ভানু যদি ফিরে আসে? কি হবে উপায়?

মুক্তো—তখন না হয় গলায় দড়ি দেবো।

হরির মা বলে—এখুনি দে।

কিন্তু এত হুমকি আর উপদেশে কোন ফল হলো না। সত্যই আর কাজে গেলো না মুক্তো। পেটরা খুলে পয়সা বের করে উনুন হাঁড়ি কাঠ আর চাল ডাল কিনে আনে মুক্তো। দাওয়ার একটি কোণ চট টাঙিয়ে আড়াল করে নেয়। সেইখানে বসে রান্না করে মুক্তো। কখনো দুপুরে, কখনো বিকেলে, আর কখনো সন্ধ্যায়, মাত্র একটি বার এক ঘণ্টার মধ্যে তড়বড় করে রান্না সেরে নেয়, আর খেয়ে নিয়ে ঘরের ভিতর পড়ে থাকে। মাদুরের উপর অলস একটা দেহ ছটফট করতে থাকে। যখন কেউ থাকে না ঘরে, তখন শিয়রের পুঁটলির উপর মুখ গুঁজে দিয়ে অবাধে কেঁদে নেয় মুক্তো। চমকে ওঠে এক একবার, মনে হয় নন্দর ছায়া এসে উঠেছে দাওয়ার উপর।

নটুর মা দেখে আশ্চর্য হয়, হরির মা দেখে হাঁফ ছাড়ে আর আশ্বস্ত হয়, আর পুঁটির মা ও দাসুর মা দেখে কষ্ট পায়, এ আবার কোন্ রোগে ধরল মিছার মাকে। সত্যিই বেণী দুলিয়ে আলতায় পা রাঙিয়ে দাওয়ার উপর বসে না মুক্তো। বিয়ে-টিয়ে করবে বলে যে সব ফস্টি-নস্টি করল, তাই বা সত্য হলো কোথায়? বরং, কি যেন এক মরণ গোঁ ধরেছে, যার জন্য অষ্টপ্রহর মাদুরের উপর গড়াচ্ছে আর ছটফট করছে। এক মাসের মধ্যেই কি ভয়ানক রুগিয়ে গেল ছুঁড়ি!

নটুর মা মুক্তোর গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা দেয়—তোর কি হয়েছে বল দেখি?

বলতে বলতে নটুর মা মনের আর একটা ভয়ানক সন্দেহ দূর করার জন্য দু'চোখ নিয়ে মুক্তোর একেবারে গায়ের উপর ঝুঁকে পড়ে দেখতে থাকে!

দাসুর মা বলে—যদি হয়েই থাকে, তবে ক'দিন লুকিয়ে রাখবে? ধরা তো পড়তেই হবে।

খিল খিল করে হেসে ওঠে মুক্তো। শুনতে ভালই লাগে বুড়িদের ভীরু মনের আশঙ্কার কথা, আর গম্ভীর মুখের আলোচনা।

নটুর মা —যাই করিস বাছা, ভুলেও নিজের এমন সর্বনাশটা করিস না।

—না গো না! বলতে গিয়েই ফুঁপিয়ে ওঠে মুক্তো।

কিন্তু মনে হয় মুক্তোর, এই সর্বনাশটা নেই বলেই খালি হয়ে রয়েছে বুকটা। নটুর মাও যেন শান্ত করার জন্যই একটু আদর করার ভঙ্গিতে মুক্তোর মাথায় হাত দিয়ে ডাকে—মিছিমিছি কেন ইচ্ছে করে নিজের মনটাকে জ্বলিয়ে কষ্ট পাচ্ছিস মিছার মা—কপাল মেনে চলতে হবে তো।

উত্তর দেয় না মুক্তো। ফোঁপানিও থামে না। আর চার বর্ষীয়সী কোন কথা না বলে চুপ করে বসে থাকে। এতদিনে যেন বুঝতে পেরেছে সবাই, মিছার মা'র এতদিনের খেপা মেজাজের সব রহস্য। কিন্তু উপায় কি? মিছার মা হয়ে তবু বেঁচে থাকা যায়, কিন্তু জাত মান ডুবিয়ে দেওয়া যে মরণের বড় মরণ।

কেরোসিনের কুপি জ্বলে। ধোঁয়া-মাখা আলো মিটমিট করে দরজার কাছে। বুড়িরা যে যার মাদুরের উপর গড়িয়ে পড়ে, সারাদিনের ক্লান্ত এক একটা বাসন-মাজা, ঝাঁট দেওয়া আর কাপড়-

কাচা জীর্ণ-শীর্ণ জীবন। ঘুমিয়ে পড়ে সবাই, শুধু মুক্তোর চোখে ঘুম আসে না। যেমন ভাল লাগে না মিছার মা নাম, তেমনি ভাল লাগে না বুড়িদের সন্দেহভরা চোখের সামনে এইরকম মিথ্যে পোয়াতির মতো মিছিমিছি কাতরাতে। মিটমিট করে একটা স্বপ্ন জ্বলে মুক্তোর দু'চোখে। চমকে ওঠে মুক্তো, কেরোসিনের কুপির আলো যেন দাওয়ার উপর একটা ছায়া দেখতে পেয়ে হঠাৎ ছটফট করে উঠেছে।

মাদুর ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় মুক্তো। দেখতে পায়, হ্যাঁ ঠিকই হয়েছে।

নন্দ এসে দাঁড়িয়ে আছে। ফুঁ দিয়ে কুপিটা নিভিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায় মুক্তো। ফিসফিস করে বলে—যাব তোমার সঙ্গে, কাল রাতে এস, অনেক রাতে।

চলে যায় নন্দ।

ভোর হয়। সবার আগে মাদুর ছেড়ে উঠে বসে নুটুর মা, আর দেখতে পায়, আরও আগে উঠে বসে রয়েছে মিছার মা, ঘুম-কাতুরে আলসে মিছার মা। কি আশ্চর্য! প্রশ্ন করে নুটুর মা—আজ কি কাজে বের হবি?

মুক্তো বলে—হ্যাঁ।

নুটুর মা—মনে রাখিস, আজ ঘরের ভাড়া দিতে হবে।

হ্যাঁ, মনে আছে মুক্তোর, এই ঘরের ভাড়া জীবনে শেষবারের মতো চুকিয়ে দিতে হবে আজ।

কাছাকাছি দুটো বাড়িতে মুক্তোর প্রায় এক মাসের মাইনে বাকি পড়ে আছে। আর অনেকদিনের আগের দুটো বাড়ির কাছেও পাওনা আছে। সে প্রায় আজ দু'বছর আগের কথা। একটা বাড়ির গিন্নিমার কথার ঝাঁঝে অতিষ্ঠ হয়ে আর রাগ করে চলে এসেছিল মুক্তো। আর একটা বাড়ির গিন্নি পর পর তিন মাস মাইনে না দিয়ে শুধু মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে রাখছে দেখে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছিল মুক্তো। যাব যাব করেও আজ দু'বছরের পাওনা টাকা আদায় করতে যেতে পারেনি মুক্তো।

কিন্তু আজ আদায় করে নিতে হবে। আজ যে এই তল্লাট ছেড়েই রাতের অন্ধকারে ভেসে চলে যেতে হবে চিরকালের মতো। ঘর ভাড়া মিটিয়ে দিতে হবে, আর কিছু কাপড়-চোপড় কিনে নিতে হবে। পেটরাতে আর একটি আনাও বোধহয় নেই। টাকার দরকার আছে।

দরকার নাই বা থাক, পাওনা ছেড়ে দেব কেন? গেলাসের গায়ে ছাই-এর একটা দাগ লেগে থাকলেও যারা চেঁচিয়ে উঠেছে, তিন বার করে সেই গেলাস না ধুইয়ে যারা ছাড়েনি, তাদের কাছ থেকে পাওনা টাকা চেঁচিয়ে আদায় করে নেওয়াই তো উচিত। আর ভয় কিসের? মায়াই বা কেন আসবে এই তল্লাটের জন্য, যেখানে না খাটিয়ে নিয়ে কেউ এক ঘটি তেষ্টার জল দেয় না?

ঘর ছেড়ে বস্তির সরু রাস্তা, তারপর রেল-লাইন, রেল-লাইনের পাশে শিউলি গাছ, তারপর ছোট মাঠটা পার হয়ে একটা পাকা সড়ক, সড়কের দু'পাশে নতুন নতুন দোতলা আর চারতলার ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়ায় মুক্তো। এক এক করে তার কাজের বাড়িতে ঢোকে, আর পাওনা আদায় করে নিয়ে চলে আসে।

একটা বাড়ির শেষ দিনের এক বেলার মাইনে কেটে নিলে আর একটা বাড়ি মাইনের হিসাবটাই কেমন যেন এলোমেলো করে দিল। করুক, কোন ক্ষতি নেই। বাড়ির গিন্নি কথা শুনিয়েছে, তেমনি

গিন্নিকেও কথা শুনিয়ে দিয়েছে মুক্তো। আর এই তল্লাটের কোন চোখ রাঙানি আর চেঁচানিকে ভয় করবার গরজ নেই মুক্তোর।

বাকি রইল পুরনো বাড়ি দুটো। এখান থেকে একটু দূরে, ট্রাম লাইনের কাছাকাছি সেই দুটো বাড়িতে সেই মানুষগুলি এখনো আছে কিনা কে জানে। একটা বাড়ির সম্বন্ধে কোন দুশ্চিন্তা নেই, কারণ সেটা হলো বড়লোকের বাড়ি, আর নিজেদেরই বাড়ি, ভাড়া বাড়ি নয়। ওরা নিশ্চয় আছে, ওদের কাছ থেকে আদায়ও করা যাবে নিশ্চয়। দু'বছর আগের পাওনা, বাড়ির কর্তা আর গিন্নি হিসাব ভুলে গেলেও ভুলতে দেবে কেন মুক্তো? চেঁচিয়ে বাড়ি আর পাড়া মাত করে বুঝিয়ে দিতে হবে, ভালয় ভালয় পাওনা মিটিয়ে না দিলে আরও অনেক ছোটকথা শুনতে হবে, যতই না বড়লোক হও।

শেষ পর্যন্ত তাই হলো, বড় বাড়ির কর্তা ও গিন্নি কিছুতেই মনে করতে পারলেন না যে, ঝি মিছার মায়ের মাইনে বাকি পড়ে আছে। কিন্তু মিছার মা গলা খুলতেই মনে পড়ে গেল কর্তার, একুশ দিনের মাইনে বোধহয় দেওয়া হয়নি। মিছার মা বলে—একুশ দিন নয়, আটাশ দিন, আপনার মেয়ে-জামাই যেদিন এল আর গিন্নিমা আমাকে যাচ্ছেতাই বললেন, সেদিনের তারিখটা মনে করে দেখুন।

বাড়ির গিন্নি চেঁচিয়ে ওঠেন—ছোটলোক হয়ে এত বড় কথা...।

মুক্তো—ছোটলোকের পাওনা পয়সা ফাঁকি দিতে চান, কেমনতর বড়লোক আপনি? ছোটলোকের চেয়েও...

বাড়ির গিন্নি হুংকার দেন—সাবধান!

কর্তা বলেন—যাক, আটাশ দিনের মাইনেই হিসেব করে দিয়ে দিচ্ছি।

ঠিক ঠিক হিসাব করে টাকা দিলেন কর্তা, মুক্তোও চলে গেল, কিন্তু পাঁচ মিনিট পরেই ফিরে এসে আবার বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে মুক্তো, কারণ গেটের দরজা একেবারে তালা লাগিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। —ঠগ, ঠগ, তিনতলাওয়ালা ঠগ অচল নোট ধরিয়ে দিয়েছে।

পাঁচ টাকার একটা নোট হাতে নিয়ে পথচারী ভদ্রলোকদের ডেকে ডেকে দেখায় মুক্তো।—দেখুন তো বাবু, এই নোট কি বাজারে চলবে?

পথচারী ভদ্রলোক বলেন—না, এটা জাল নোট। কেউ বা জিজ্ঞাসা করে—কোথায় পেলে এ জাল নোট?

হাত তুলে তিনতলা বাড়িকে দেখিয়ে দিয়ে চিৎকার করে মুক্তো—ঐ যে তিনতলাওয়ালা জালিয়াত দিয়েছে।

কিন্তু মুক্তোর চিৎকারে তিনতলা বাড়ির ফটকের লোহার গরাদ একটুও বিচলিত হলো না। মুক্তোই শেষ পর্যন্ত হাঁপিয়ে, ক্লান্ত হয়ে আর অভিশাপ দিয়ে চলে গেল।

বাকি আর একটা বাড়ি। সেটা হলো ভাড়া-বাড়ি; আশঙ্কা হয়, হয়তো সে বাড়িতে গিয়ে কতকগুলি নতুন লোকের মুখ দেখতে পাবে মুক্তো। ঝি-এর তিন মাসের মাইনে বাকি রেখেছে যারা, তারা কি আর চার মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি রাখেনি, আর তারপর কি বাড়িওয়ালা না উঠিয়ে ছেড়ে দিয়েছে তাদের?

পথ চলতে থাকে মুক্তো, কিন্তু মনে হয়, সে বাড়ির লোকগুলি দেনার চাপে আর পাওনাদারের

তাগিদে এতদিনে পালিয়েই গিয়েছে নিশ্চয়। কম তো নয়, তিন মাসের মাইনে ত্রিশটি টাকা পাওনা ছিল সেখানে।

মনে পড়ে সে বাড়ির লোকগুলির চেহারা। কর্তার বয়স অল্প, কিন্তু তবু টাক পড়েছে মাথায়। একটা মেয়ে আছে, আট-নয় বছর বয়স হবে। আর আছেন গিন্নি। বড় কাজের মানুষ, আর বড় বেশি মিষ্টি কথার মানুষ ঐ গিন্নি। লোকগুলি মন্দ ছিল না, কিন্তু শুধু মিষ্টি কথার জোরে মাসের পর মাস মাইনে ফাঁকি দেওয়াও তো ভদ্রলোকের কাজ নয়। মনে পড়ে, সে বাড়ির গিন্নিকে বৌদি বলে ডাকত মুক্তো। বয়স বেশি নয় গিন্নির।

সঙ্গে সঙ্গে তিন বছরের পুরনো স্মৃতির ছবি যেন চঞ্চল করে দিয়ে আর একটা কথা মনে পড়ে যায় মুক্তোর, বৌদির তখন সাত-আট মাস চলছে। মুক্তো কাজ ছেড়ে চলে আসার সময় বৌদি বলেছিলেন, আর অন্তত একটা মাস থেকে যাও মিছার মা।

থাক এসব পুরনো কথা, আর একটু এগিয়ে গিয়ে সেই বাড়িটারই কাছে গিয়ে থেমে যায় মুক্তো। এই বাড়িরই নিচের তলার ভাড়াটে হলো সেই টাকপড়া দাদাবাবু আর সেই বৌদি। দেখতে পায় মুক্তো, দরজার সামনে সেই কচি সুপুরি গাছটা আছে, আর বেশ একটু বড়সড়ও হয়েছে। তিন বছরটা তো কম সময় নয়।

বাড়িতে ঢুকে খুশিই হলো মুক্তো। কলতলায় বসে এঁটো বাসন মাজছিলেন বৌদি। মুক্তোকে দেখতে পেয়েই আশ্চর্য হলেন আর হেসে হেসে বললেন বৌদি—এ কি মিছার মা, এতদিন কোথায় ছিলে তুমি?

মুক্তো বলে—বেঁচেই ছিলুম গো বৌদি।

বৌদি—আমি কিন্তু মরতে চলেছিলুম।

মুক্তো—কেন?

বৌদির বাসন মাজা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বলেন—আগে একটু জিরিয়ে নাও আর চা খাও, তারপর বলছি।

শুনে খুশি হয় না মুক্তো, বরং একটু গম্ভীর হয়েই বসে থাকে। এই ভয়ই করছিল মুক্তো, এবাড়ির এই সব মায়া-কথার আর মিষ্টি ভাষার ফাঁদে পড়লে পাওনা টাকাগুলিই মারা পড়বে। টাকা আদায় করতে এসে এই চালাক বৌদির ভাল ভাল কথার সঙ্গে মন মাখামাখি না করাই ভাল। আজ মনে মনে শক্ত সঙ্কল্প এঁটে এসেছে মুক্তো, যদি টাকা না দিতে পারেন বৌদি, তবে টাকার বদলে বৌদির হাতের একটা আংটি চেয়ে নেবে মুক্তো। ফরসা কাপড় পরবে, দু'কানে সোনাদানা চড়িয়ে বসে থাকবে, অথচ ঝি-এর মাইনে দেবার বেলায় টাকা হয় না, এটাও একটা চালাকি নয় তো কি?

চা খেল মুক্তো। বৌদি বলেন—তুমি তো আমাকে সেই অবস্থায় ফেলে চলে গেলে মিছার মা। তারপর সে কি দুর্দশা। নিত্যি মূর্ছা যাই আর তারপরেই শরীরের গাঁটে গাঁটে অসহ্য ব্যথা। যা হোক, হাসপাতালে তো গেলুম, ফাঁড়াও ভালয় ভালয় কেটে গেল, কিন্তু বিপদে পড়লুম বাচ্চাকে নিয়ে।

চেঁচিয়ে ওঠে মুক্তো—বাচ্চা কই বৌদি?

বৌদি হাসেন—বাচ্চা এখন আর একেবারে বাচ্চা নয়। টুলুর বয়স তো এখন প্রায় দু'বছর

হয়েছে মিছার মা।

উঠে দাঁড়ায় মুক্তো—কই, টুলু কই?

এইবার বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে থাকেন বৌদি। —আজ মাস দুই হলো খুব অসুখে ভুগছে টুলু। জ্বরটা কিছুতেই ছাড়তে চায় না।

বৌদির কোন নির্দেশের অপেক্ষায় না থেকে ব্যস্তভাবে ঘরের দিকে চলে যায় মুক্তো। এই ঘরের সবই চেনা। এ ঘরের প্রত্যেকটি কোণের ধুলো ঝাঁট দিয়ে সরিয়েছে যে, তার কাছে কিছুই তো নতুন নয়।

কিন্তু ঘরের ভিতর ঢুকতেই ঘরের চেহারাটা কেমন নতুন নতুন লাগে মুক্তোর চোখে। অনেক কিছু ছিল এই ঘরের মধ্যে, তার অনেক কিছুই এখন আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। দেওয়াল ঘড়িটা নেই, বড় আয়না আর আলমারিটা নেই। বড় পালঙ্কটাও নেই। দেওয়াল আলমারিতে আরশির আড়ালে ঝক্ ঝক্ করত পাঁচটা থাকে সাজানো কাঁসা আর তামার বাসন। কতকগুলি ছোট ছোট রুপোর থালা বাটি পানদানি আর পুতুল ছিল। সেসব কিছুই আর নেই। আলনার দুটি পাট দাদাবাবুর ধুতিগুলিতেই ভরে থাকত। আজ সেখানে মাত্র একটি আধময়লা গেঞ্জি আর একটি ধুতি ঝুলছে। বৌদির চেহারাটাও চোখে পড়ে। কানে দুল নেই, আংটিও নেই। আর সেই মেয়েটা, সেই রমা, ঢেঙা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কি রোগা!

তক্তাপোশের উপর বিছানায় শুয়ে রয়েছে ছোট্ট একটা শিশু। তারই মাথার কাছে পাখা হাতে বসে আছে বৌদির বড় মেয়ে রমা। এগিয়ে যায় মুক্তো।

দুই চোখ অপলক করে ঘুমন্ত টুলুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মুক্তো। তারপর সরে যায়। ঘরের ভিতর থেকে চলে এসে বারান্দার উপর বসে পড়ে। একটা হাঁপ ছেড়ে মুক্তো বলে— তোমাদের এ কি রকম দশা হলো বৌদি, কিছুই যে বুঝতে পারছি না।

বৌদি বলে—চাকরি না থাকলে যা হয়। তোমার দাদাবাবুটির কপালে যে কোন্ গ্রহের কোপ পড়েছে, জানি না। তিন বছর হতে চলল, শত চেষ্টা করেও কোন চাকরি পাচ্ছেন না, অথচ কি কাজই না জানেন। এখন শুধু এখানে ওখানে ছেলে পড়িয়ে যা আনছেন, তাতে...।

হঠাৎ চুপ করে গেলেন বৌদি। মুক্তো বলে—ছেলের ওষুধ-বিষুধ ঠিক চলছে তো, না তাও...।

বৌদি বলেন—কেমন করে চলবে? এই তো দেখ, আজ তিনদিন হলো এক বন্ধু ডাক্তার এসে ওষুধের নাম লিখে দিলেন, কিন্তু আজও ওষুধ আনতে পারা গেল না। পনেরটা টাকার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তোমার দাদাবাবু।

আবার চুপ করেন বৌদি। তারপরেই যেন একটা দুঃসহ আক্ষেপ চাপতে না পেরে হঠাৎ ছটফট করে ওঠেন—ছেলেটা এল, কিন্তু দুর্ভাগ্যই যে সঙ্গে করে নিয়ে এল মিছার মা।

—ছি-ছি-ছি! বৌদির মুখের দিকে কঠোরভাবে তাকিয়ে পাল্টা ধিক্কার দেয় মুক্তো। —তোমার মিষ্টি মুখ যে একেবারে তেতো হয়ে গিয়েছে বৌদি। এমন কথা কি বলতে হয়? তোমাদের পোড়াকপাল দিয়ে ছেলেটার প্রাণটাকে পোড়াচ্ছ তোমরাই, উল্টে ছেলের ভাগ্যির নামেই কুকথা, ছিঃ।

এদিকে ওদিকে ঘুরে ফিরে কাজ করতে থাকেন বৌদি। ক্লান্ত ও অবসন্নের মতো চুপ করে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বারান্দার উপর বসে থাকে মুক্তো অনেকক্ষণ।

যেন এই অবসাদ থেকে উঠে দাঁড়াবার জন্যে একটা চেষ্টা করতে চায় মুক্তো। বলে—আমাকে আর এক বাটি চা দিতে পার বৌদি?

—নিশ্চয়।

যতক্ষণ চা তৈরি করেন বৌদি, ততক্ষণ চোখ বন্ধ করে যেন একটা স্বপ্ন খুঁজতে থাকে মুক্তো। বৌদির ডাকে যখন চমক ভাঙে তখন চোখ মেলে তাকায় আর চা খায়। তারপরেই উঠে দাঁড়ায় মুক্তো। আর, বৌদির মুখের দিকে শক্তভাবেই তাকিয়ে বলে—ওষুধের নাম লেখা কাগজটা আমাকে দাও বৌদি।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন বৌদি। মুক্তো যেন ভয় দেখিয়ে চিৎকারের মতোই কর্কশ স্বরে বলে—দাও বলছি।

ওষুধের নাম লেখা কাগজটা নিয়ে এসে মুক্তোর হাতে তুলে দেন বৌদি। মুক্তো তার শাড়ির আঁচলের এক কোণের একটা গিঁট খুলে নোট আর টাকাগুলি একবার গুনে নেয়। তারপরেই চলে যায়।

তারপর, দুপুর হবার আগেই এই নিচেরতলার টাক-পড়া দাদাবাবু ফিরে এসেছে, আর দুপুর হতেই আবার বের হয়ে গিয়েছে। রমা খেয়েদেয়ে কিছুক্ষণ বই পড়েছে, তারপর ঘুমিয়ে পড়েছে। আর, একগাদা কাপড় কেচে, তারপর বারান্দার উপরেই ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন বৌদি।

বাড়ির মধ্যে শুধু জেগে থাকে একজন। ঘরের ভিতরে তক্তাপোশের পাশে পাখা হাতে নিয়ে ঘুমন্ত টুলুর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে মুক্তো।

যেমন যেমন বলে দিয়েছেন বৌদি, সব মনে আছে মুক্তোর। টুলু জাগলেই ওষুধ খাইয়ে দেয়, আর মাথায় পাখার বাতাস দিয়ে আবার ঘুম পাড়িয়ে দেয়। টুলুর ছোট্ট বুকের উপর থেকে চাদর সরিয়ে, আর ছোট জামাটার বোতাম খুলে মালিশের ওষুধ লেপে দেয় টুলুর বুকের উপর। টুলু আরামে ঘুমোতে থাকে। তুলতুলে ও ছোট একটা বুক নিঃশ্বাসের বাতাসে কাঁপে, যেন একটা স্পর্শের মায়ায় থেকে থেকে ঝুঁকে পড়ে মুক্তোর বুক। টুলুর কপালে হাত বুলিয়ে, টুলুর কপালে চুমো খেয়ে আবার নিজেকে কিছুক্ষণের মতো শান্ত করে রাখে মুক্তো।

সব মনে আছে মুক্তোর, বৌদি যেমন বলে দিয়েছেন। এক একবার টুলু হঠাৎ চোখ মেলে তাকায়। মুক্তো ডাকে—কি চাই বাবু?

টুলু বলে—মিষ্টি জল।

এক হাতে ওষুধের গেলাসে মিছরির জল ঢেলে নিয়ে টুলুর মুখের কাছে তুলে ধরে মুক্তো। আর এক হাতে টুলুর ছোট দেহটাকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে মুক্তো। মিষ্টি জল খেয়ে শুয়ে পড়ে টুলু, তারপরেই ঘুমিয়ে পড়ে। আবার হাতে পাখা তুলে নেয় মুক্তো।

ঝন্ ঝনএ্। একটা শব্দ যেন হঠাৎ চমকে উঠল, বোধহয় বৌদির হাত থেকে পড়ে গিয়েছে একটা থালা। সেই সঙ্গে চমক ভাঙ্গে মুক্তোর, আর ঝন্ ঝন্ করে বেজে ওঠে তার বুকের ভিতরটা। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এইবার যেতে হবে।

যেন এতক্ষণ ধরে একটা মূর্ছার মধ্যেই পড়েছিল মুক্তো। এইবার জ্ঞান হয়েছে। আস্তে আস্তে

দরজার কাছে এগিয়ে এসে নিচু গলায় ডাক দেয় মুক্তো—বৌদি গো।

বৌদি এসে বলেন—কি?

মুক্তো ছটফট করে—এবার আমায় যেতে দাও বৌদি।

বৌদি বিষণ্ণভাবে বলেন—আমি তোমাকে যেতে দেবার কে মিছার মা। তুমি যে উপকার করলে, সে কাজ...

মুক্তো—চুপ করো বৌদি। আমি যাই।

বৌদি—কাল আসবে তো একবার?

মুক্তোর চোখ দুটো কাঁপতে থাকে ভীরু অপরাধীর মতো। —কাল? হ্যাঁ, দেখি কিন্তু কাল কি আসতে পারব বৌদি?

বৌদি—কাজের এক ফাঁকে চলে এস একবার।

বৌদির কথার উত্তর দেবার আগেই আর একটা শব্দ শুনে চমকে ওঠে মুক্তো।

—যাবে না। কচিগলায় এক অদ্ভুত আদেশের শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে টুলুর দিকে তাকায় মুক্তো। দেখতে পায়, চোখ মেলে মুক্তোরই দিকে তাকিয়ে আছে টুলু। ব্যাপার দেখে হেসে ফেলেন বৌদি।

আবার দরজার কাছ থেকে ফিরে এসে টুলুর বিছানার কাছে দাঁড়ায় মুক্তো। —কি বলছো বাবু?

হাত বাড়িয়ে মুক্তোর শাড়ির আঁচল খপ্ করে ধরে ফেলে টুলু।

আবার সেই জ্বরে কাতর আর দুর্বল একটা শিশুকণ্ঠের স্বর বেজে ওঠে—যাবে না।

বৌদি ফিসফিস করে বলেন—আপত্তি করো না মিছার মা। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক একটু, এখুনি ঘুমিয়ে পড়বে, তারপর যেও।

ঠিক বলেছেন বৌদি। এক মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল টুলু। আস্তে আস্তে, অতি সাবধানে আর ভয়ে ভয়ে ঘুমন্ত টুলুর মুঠো থেকে আঁচল ছাড়িয়ে নিল মুক্তো।

কিন্তু বৌদির দিকে তাকাতেই ছলছল করে ওঠে মুক্তোর চোখ।—জেগে উঠে আমাকে আবার খুঁজবে না তো বৌদি?

বৌদি বলেন—খুঁজতে পারে, আশ্চর্য কি।

আর একমুহূর্ত দেরি করে না মুক্তো। দরজা পার হয়ে হনহন করে চলে যায়। যেন ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভরা একটি গভীর রাতে এক সিঁধেল চোরের মতোই এই ঘরের ভিতর ঢুকেছিল মুক্তো, কিন্তু হঠাৎ ভোর হয়ে গিয়েছে, তাই ভয়ে পেয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে হলো।

রাত্রির অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে রেল লাইনের পাশের বস্তি। একটি ঘরের ভিতর তখন একজন জেগে বসে আছে, আর কুপিতে কেরোসিনের আলো জ্বলছে। একটি ছায়া এসে ওঠে সেই ঘরের দাওয়ার উপর।

ঘরের ভেতর থেকে বের হয়ে আসে মুক্তো। নন্দ বলে—চল মুক্তো।

মুক্তো বলে—না।

নন্দ আশ্চর্য হয়—না।

মুক্তো—আমি যাব না।

নন্দ—তবে মিছে কথা বলে আমাকে এভাবে ঠকালি কেন মুক্তো?

মুক্তো—হ্যাঁ,সত্যিই মিছে কথা বলেছি আর ঠকিয়েছি। কিন্তু তুমি মাপ করে দাও।

নন্দ সন্দিগ্ধভাবে বলে—ব্যাপার কি, একটু খুলেই বল না মুক্তো?

মুক্তো—ছেলে ফেলে রেখে চলে গেলে পাপ হবে।

নন্দ—তোর ছেলে আছে নাকি?

মুক্তো—আছে।

নন্দ বলে—বেশ তো, ঘর ছেড়ে চলে আসতে না-ই বা পারলি, কিন্তু ঘরে থেকেই তো মাঝে মাঝে...।

মুক্তোর গলার স্বর দপ্ করে জ্বলে ওঠে—আর কিন্তু, টিন্তু নয়, সোজা চলে যাও, নইলে এখুনি হাঁকডাক করে পাড়া জাগিয়ে তুলব বলে দিচ্ছি।

দাওয়ার উপর থেকে বাইরের অন্ধকারের মধ্যে সেই মুহূর্তে যেন টুপ করে ঝরে পড়ে আর সরে পড়ে নন্দর ছায়া।

কোন শোরগোল জাগল না, কিন্তু তবু অকস্মাৎ দাওয়ার উপর একটা রহস্যপূর্ণ ছায়ার উৎপাতেই যেন বিচলিত হয়ে ঘরের ভিতরের মানুষগুলির ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠল নুটুর মা, দাসুর মা, হরির মা আর পুঁটির মা।

নুটুর মা—কি লো মিছার মা, তুই এখনো জেগে রয়েছিস কেন?

দাসুর মা—এখনো কুপি জ্বলছে কেন?

কোন জবাব না দিয়ে হাসতে থাকে মুক্তো।

হরির মা বিরক্ত হয়ে বলে—বেশি রঙ ঢলাস নি মিছার মা।

কিন্তু মুক্তো সত্যিই হেসে হেসে চোখে মুখে রঙ ঢলিয়ে বেহায়ার মতো বলে—আমি মিছার মা নই গো হরির মা।

নুটুর মা—তবে তুই কি? ছেলের মা?

মুক্তো মাদুরের উপর গড়িয়ে পড়ে আর হাসে—তা তোকে বলতে যাব কেন? তুই বুঝবিই বা কি?

নুটুর মা চিৎকার করে—কি বললি?

মুক্তো বলে—তুই এখন ঘুমো, আর আমাকেও একটু ঘুমোতে দে।

নির্বন্ধ

দামোদর বাঁকের ওপর চিত্রপুর থানা। কত ভদ্রলোক এখানে বেড়াতে এসে বিমুগ্ধ মন্তব্য করেছেন—'এ তো থানা নয়, এ যে স্যানাটোরিয়াম।' বাস্তবিক চিত্রপুরের জল এত মিঠে, আকাশ এত নীল, বাতাস এত গা-জুড়ানো, এত স্বাস্থ্যপ্রাণ এর রূপালী রোদ।

কেউ বা বলেছেন—'এ তো থানা নয় এ যে আশ্রম।' হঠাৎ দেখলে তাই মনে হয়। সুগন্ধ ও সুবর্ণ দেশী বিদেশী ফুলে ভরা থানার বাগান, কাঠগোলাপের বেড়া দিয়ে ঘেরা। সামান্য বাতাসে গন্ধামোদে ভরে ওঠে। নানা জাতের বাহারে লতা মাচান বেয়ে উঠছে থানাবাড়ির চালার ওপর। টালির চালা ছেয়ে গেছে সবুজ পাতার আস্তরণে।

অনেক নীচে নেমে দামোদর। দু'পাশে গেরুয়া পলিমাটি ছড়িয়ে দামোদরের পাথুরে শিরদাঁড়া এঁকেবেঁকে মিলিয়ে গেছে দক্ষিণের পাহাড়ের ভিড়ে।

দারোগা বিভূতির ছ'বছর হয়ে গেল চিত্রপুরে। এত সুন্দর জায়গাটা, কিন্তু তবুও—ছ'বছর থাকার পর আর মন টেঁকে না। অন্য থানায় বদলি হবার চেষ্টা করে। তার ওপর রয়েছে আর একজনের তাগিদ—বিভূতির স্ত্রী মায়া। সবচেয়ে বেশি অতিষ্ঠ হয়েছে মায়া। শুধু একটানা একঘেয়ে ছ'বছর এক জায়গায় থাকাটাই তার কারণ নয়। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে এ প্রসঙ্গ নিয়ে ছোটখাট বচসা প্রায়ই হয়।

মায়া বলে—বদলি হও এখান থেকে।

বিভূতি—কোথায় যাবে? মির্জাবাদে? কালাজ্বরে গিলে খাবে।

মায়া—তবুও ভাল। দিনরাত্তির মারধর, 'বাপ-রে মা-রে' আর শুনতে পারি না।

বিভূতি—যেখানেই যাও, এ শুনতেই হবে।

মায়া—তাহলে আমায় পাঠিয়ে দাও ধানবাদে, বাবার কাছে।

বিভূতি এবার ভাল করে তর্কের জন্য প্রস্তুত হয়ে নেয়—বাবার সঙ্গে হাসপাতালের কোয়ার্টারে এতদিন ছিলে কি করে, যেখানে যখন তখন মানুষ চেড়াফোঁড়া চলেছে? সেখানে 'বাপ-রে মা-রে নেই?

মায়া—কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা? সেখানে মানুষের ভালোর জন্য, রোগ সারাবার জন্যে চিকিৎসা হয়। সে বাপ-রে মা-রে অন্য রকম।

বিভূতি—এখানে বুঝি রোগ বাড়ানো হয়? গুঁতোগুঁতি এমনিতে দেখতে বড় খারাপ, কিন্তু কেসগুলো কেমন চটপট পরিষ্কার হয়ে যায়। এটা থানা, বজ্জাতি সারানো হয় এখানে। তোমার হাসপাতাল এমন কিছু স্বর্গ নয়।

মায়া—আইনে যখন আসামীকে মারধর করার নিয়ম নেই, তখন তোমার অত মাথা ব্যথা কেন?

বিভূতি—তা জানি। রাত্তিরে তুমি যে আসামীদের জন্য খিচুড়ি রেঁধে দিলে, সেটাও আইনে নেই। এ'রকম দু'চারটে আটপৌরে আইন তৈরি করে নিতে হয়। নইলে থানা চালানো চলে না।

মায়া—বেশ, এবার থেকে খিচুড়ি রেঁধ তুমি। আমার দ্বারা নিত্য ও ঝঞ্ঝাট সহ্য করা আর চলবে না। সরকার আমায় মাইনে দেয় না, আমি পেনসন পাব না।

দারোগা বিভূতি, ছোট দারোগা ও বড় জমাদার—চিত্রপুর থানার প্রায় সকলেরই মন চিত্রপুরের ওপর অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছে। আকর্ষণ শুধু এর জলহাওয়াটুকু। নইলে এই এলাকাটা যত রকম চুরি, বজ্জাতি খুন-খারাপির আড়ত বিশেষ। দিনরাত তদন্ত, তল্লাস, গ্রেপ্তার আর চালান নিয়ে উগ্র রকমের ব্যস্ততা। সাধারণ মানুষের মত বেঁচে থাকার আনন্দ লোপ পেতে বসেছে। সকাল সন্ধ্যা মূর্তিমান পেনাল কোডের মত এই উর্দিভূষিত জীবন। বদলির জন্যে প্রত্যেকেই ছটফট করে।

কিন্তু একেবারে নির্বিকার ছোট জমাদার কড়ে খাঁ। থানাবাড়ি যখন প্রথম তৈরি হয় তখন থেকে কড়ে খাঁ এখানে—সে আজ পনের বছরও হতে পারে। ওর মুখে আজও কোনো আক্ষেপ শোনা যায় না। ওর বদলি হবারই বা কি প্রয়োজন? পেনসন নিয়ে চলে যাওয়াই উচিত। কড়ে খাঁ বেশ বুড়ো হয়েছে।

কড়ে খাঁ বলে, যাব কেন? বাঘ চলে গেলে জঙ্গলে আর রইল কে?

ছোট জমাদারের 'কড়ে খাঁ' নামটি কবে দেওয়া সেটা আজ আর সঠিক জানা যায় না। সই করবার সময় লেখে আকবর খাঁ। কিন্তু এ নাম বললে বিভূতিও চট করে বুঝতে পারবে না, লোকটা কে? কিন্তু বলা হোক—কড়ে খাঁ, সদরের পুলিসমহল থেকে শুরু করে চিত্রপুর এলাকায় যত গাঁ গঞ্জ আর বস্তির ছেলেবুড়ো প্রত্যেকে চিনে ফেলবে—ছোট জমাদার।

কড়ে খাঁ রোহিলা পাঠান। বুড়ো মানুষ। প্রশান্ত সৌম্যমূর্তি একজন হাজী সাহেবের মত ধর্মপ্রাণ চেহারা। দাড়িতে মেদি পাতার রঙের ছোপ ফিকে বাদামী হয়ে এসেছে। পাকা ভুরু। লালচে গায়ের রঙ এত বয়সেও ময়লা হয়নি। তবে চামড়া কুঁচকে গেছে, শ্লথ হয়ে গেছে মাংসপেশী। তবুও কড়ে খাঁ সোজা হয়েই চলে, লাফালাফি করতে কোনো জোয়ানের চেয়ে কম যায় না। সে শুধু ওই পেটাই করা লোহার মত হাড্ডির জোরে। এই জীর্ণ খাপের ভেতর ক্রূরতার যে ছুরি লুকিয়ে আছে, তার ধার আজও কমেনি।

চিত্রপুরের শিশুরা দেব দানব ভুত প্রেতের উপকথার মত ঠাকুরমার মুখে শুনেছে, কড়ে খাঁ সাঁড়াশি তাতিয়ে জিভ টেনে ধরে, আলকাতরা মাখিয়ে গাছে ঝুলিয়ে তলায় আগুনের ধুনি জ্বেলে দেয়। লোকের গলায় বাঁশ চেপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাচে, মুখে থুথু দেয়। কাস্তে দিয়ে পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে হাত কেটে নেয়—যত রক্ত ঝরে তত হাসে।

এই হলো কড়ে খাঁ—বড্ড কড়া—ক্রূর।

অরণ্যরাজ্য জুড়ে চিত্রপুর এলাকা। সড়কের ওপরে চিত্রপুরের গঞ্জ। সবচেয়ে বড় বাড়িটা—আধুনিক ঢঙের যেটা—চিত্রপুরের টিকাইত ধনঞ্জয় গোঁসাইয়ের। গোঁসাই শুধু জমিদার নয়, ব্যবসায়ীও। ঐ যে সেগুন কাঠের ইয়ার্ড, পঞ্চাশটা করাত চলছে—সেটা গোঁসাইয়ের। মাঠের ওপর যতগুলি পাঁজায় ইঁট পুড়ছে, যতগুলি ভাঁটার চুনের ঘুটিং পুড়ছে, ওসব গোঁসাইয়ের। গঞ্জের এত বড় গালার কারখানাটা, সেটারও মালিক গোঁসাই। গোঁসাইয়ের এক পুরুষেই আমলকীর জঙ্গলে এত ঐশ্বর্য গজিয়ে উঠল কি করে? ব্যবসায়ী বুদ্ধি আর ফৌজদারী প্রতিভা একই আধারে আশ্রয় নিলে যা হয় তাই হয়েছে। অন্য সরিকের গোঁসাইরাও তো রয়েছে, তাদের মাটির দেয়াল এক বর্ষায় ধসে গেলে এক পুরুষেও আর সারানো হয় না।

চিত্রপুরের বস্তিতে থাকে দোসাদরা আর ডিহিগুলোতে মুণ্ডারা। অর্ধেক চিত্রপুরী গোঁসাইয়ের খামারে খাটে, বাকী অর্ধেক গোঁসাইর জমি চষে আধবাটায়। যে যার সামর্থ্য মত কুলগাছে কিছু কিছু লাক্ষাগুটি ফলায়। বেচতে হয় সবাইকে গোঁসাইয়র গদিতে। সারা চিত্রপুরে হেন মুণ্ডা-দোসাদ নেই যে টিকাইত গোঁসাইয়ের কবলায় বাঁধা নয়।

চিত্রপুরের ছেলেবুড়ো ভয় পায় থানাকে—যে থানায় কড়ে খাঁর মত নরসিংহ বিরাজমান। আর চিত্রপুরের থানা ভয় পায় টিকাইত ধনঞ্জন গোঁসাইকে। সদরের উকীলমহল থেকে শুরু করে মার্চেন্ট ও অফিসারমহল পর্যন্ত গোঁসাইয়ের গতিবিধি অবারিত—সর্বত্র খাতির আর আপ্যায়ন।

যে কোনো উদ্যোগে চাঁদার খাতায় গোঁসাইয়ের সই পড়ে মোটা অঙ্কের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে। গুণে গুণে দেড় হাজার ভোট খেলে গোঁসাইয়ের পাঞ্জায়। ইলেকসনের লড়াইয়ে যার দিকে ঢলে গোঁসাই, তার ভাগ্য প্রসন্ন হয়। দেড় হাজার হাতি পুষলেও এখন আর এতটা প্রতিপত্তি কেউ পায় না—এটা গণতন্ত্রের যুগ।

প্রথম প্রথম বিভূতি তার অফিসারি স্পর্ধা নিয়েই চলতে শুরু করেছিল। গোঁসাইয়ের মাত্র দু'একটি প্যাঁচের দাপটে সে স্পর্ধা নুইয়ে এল মন্ত্রশান্ত ভূজঙ্গের মত। গোঁসাই এ পর্যন্ত চারজন দারোগার চাকরি খেয়েছে। গোঁসাইয়ের নতুন মোটর গাড়ির চাকাটার দিকে তাকিয়ে বিভূতি নিজেকে শান্ত করে আনে—অসম্ভব নয়, ঐ চোদ্দ-হাজারী গাড়ির চাকার তলায় নব্বই টাকার দারোগাগিরি গুঁড়ো হয়ে যেতে কতক্ষণ?

টিকাইত গোঁসাইয়ের কথা মনে পড়লেই বিভূতির যেন যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। সমস্ত অন্তর দিয়ে সে তখন বদলি প্রার্থনা করে। মাছ ধরার সখ ছিল। গোঁসাইয়ের পুকুরে মাঝ ধরতে গিয়ে যে সব কথা শুনে সে ফিরে এসেছে, তার চেয়ে জংলীদের বিষমাখা তীরের আঘাত ভাল। গা থেকে ইউনিফর্ম খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। এমন দারোগাই ছেড়ে দিয়ে টোলের পণ্ডিতী ধরাই উচিত।

কড়ে খাঁ হেসে হেসে বলে, শেখো দারোগাজী, শেখো। আমি আজ পনর বছর ধরে দেখে আসছি। দেখি আর কতদিন। পেনসন নেব না হুজুর—জিন্দেগী পর্যন্ত দেখবো, এই বেইজ্জতির মার কতদিন চলে, কবে ইনসাফ হয়।

সকালবেলায় থানার বারান্দায় চৌকিদারেরা হরেক রকমের আসামী নিয়ে বসে থাকে। বিভূতি ডায়েরী আর রিপোর্ট লেখে। চিত্রপুর থানা চালানো সোজা ব্যাপার নয়। অনেক দারোগা এখান থেকে চরম দুর্গতি নিয়ে ফিরেছে। তবে ছোট জমাদার কড়ে খাঁ যতক্ষণ আছে, কাজ একরকম চলে যাবেই। অন্তত অপরাধ কবুল হবে ও অপরাধী ধরা পড়বেই। চুরি, ডাকাতি, খুন, ডাইনী-পোড়ানো, নরবলি, বিষ খাওয়ানো বা মদচোলাই—প্রত্যেকটি কেস অতি পরিষ্কারভাবে প্রমাণসহ ধরা পড়ে যায়। এর মূলে ছোট জমাদার কড়ে খাঁ—তার হাতের মারের মহিমা। কড়ে খাঁর মারে কবুল করবে না এমন দাগী আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি।

কড়ে খাঁ প্রায়ই আপসোস করে বলে, আরে আমার এক চড়ে বড় বড় শের বাপের নাম বলে দেয়, কিন্তু কোনো ব্যাটা আসামী কি বিনা মারে কবুল করলো? আমার হাতের মার খেতে নিশ্চয় ওদের ভাল লাগে।

চৌকীদারেরা একে একে তাদের রিপোর্ট লেখাবার পর বিভূতি ডাকে, কড়ে খাঁ।

টুলের ওপর বসে বসে কড়ে খাঁ ঝিমোচ্ছিল, বিভূতির ডাকে উঠে দাঁড়িয়ে হাই তুলে একবার দাড়িতে হাত বুলিয়ে নিল। তারপর নির্লিপ্তভাবে মুঠো করে ধরলো তার মোটা সিঙ্গাপুরী বেতের লাঠিটা।

বিভূতি কতবার বলেছে, কড়ে খাঁ, রিপোর্টগুলো একবার কান দিয়ে শুনে নিও আগে, তারপর যাকে যেমন উচিত তেমনি মারধর করো।

—যা মাইনে, তাতে অত মেহনত আর দেমাক খরচ করা পোষায় না হুজুর। রিপোর্ট আবার কি শুনবো। সব শালা চোর।

কবুল করবার সময় বিভূতি একটু সতর্ক থাকে। কড়ে খাঁর মাত্রাজ্ঞান নেই। মুর্গী চোর বা খুনের আসামী দু'জনকেই কড়ে খাঁ সমানভাবে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে। তার কারণ, কার কি অপরাধ সে খোঁজ সে রাখে না।

বিভূতি ডাকলো, কড়ে খাঁ।

কবুল করাতে হবে।

আসামী একটা ঢ্যাঙা গোছের দোসাদ ছোঁড়া। রূপোর হুঁকো চুরি করেছে। দোষ স্বীকার করছে না, চোরাই মালের হদিসও দিচ্ছে না।

দোসাদ ছোঁড়াটাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার কড়ে খাঁ তার ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে দেখে নিল। ছোঁড়াটা খুব রোগা, তবে হাড়গুলো মজবুত। খালি গা, বড় বড় চুল, গলায় একটা কুঁচের মালা। একটা নোংরা গামছা কোমরে জড়ানো, ট্যাকে একটা খৈনির ডিবে।

কবুল করাবার আগে কড়ে খাঁ কতগুলি প্রক্রিয়া পালন করতো, রাগের গ্যাস চড়িয়ে নেবার জন্য। ছোঁড়াটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কড়ে খাঁ দাঁতে দাঁত চেপে বললো, হুঁ, বুঝেছি এ শালা দেখছি একটা সাপ, বিলকুল সাপ।

সপাং—কোমরের ওপর পড়লো কড়ে খাঁর সিঙ্গাপুরী বেতের বাড়ি। কোথায় গেল বৃদ্ধ আকবর খাঁর সেই প্রশান্ত সৌম্য হাজী সাহেবের মূর্তি। একটা কেশরফোলা রুষ্ট সিংহ যেন শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়েছে। যেন নিজেকে অনুপ্রাণিত করার জন্য কড়ে খাঁ মাঝে মাঝে হুংকার ছাড়ছে, মারো, শালা সাপকো মারো!

ছোঁড়াটা দোষ কবুল করে ফেলেছে, মাল কোথায় আছে তাও বলে দিয়েছে। কড়ে খাঁর বেতের বিদ্যুৎস্ফূর্তি শান্ত হয়ে এল।

আর একজন আসামী —বুধু ওঁরাও। বারান্দার মেঝের ওপর ঠকাস্ করে মাথাটা ঠুকে, বুকে হাত দিয়ে বললো, ভগবান জানে হুজুর, আমি ওদের শুয়োর চুরি করে খাই নাই।

বিভূতি ডাকলো, কড়ে খাঁ।

বুধু ওঁরাও আদুড় গা, সমস্ত শরীরে কালো কালো কুঁদো মাংসের চাপ। মাথার বাবরী চুলে একটা চিরুনি গোজা, হাতে কাঁসার থালা, ঝকঝকে সাদা দাঁত।

—এ শালা ভালুক, বিলকুল ভালুক। মারো শালা ভালুককো। কড়ে খাঁ বেত হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লো বুধু ওঁরাওয়ের ওপর। দু'মিনিটেই স্পষ্ট কবুল আদায় হয়ে গেল।

বিকেলের দিকে থানার ফটকে শোনা গেল গোঁসাইয়ের মোটরের হর্ণ। চৌকীদারদের মধ্যে একটা ব্যস্ততার সাড়া পড়ে গেল। বিভূতি মুখে হাসি টেনে কিছুদূর এগিয়ে গোঁসাইকে অভ্যর্থনা করলো, আসুন, আজকাল যে এদিকে ভুলেও আসেন না। আশ্রিতজনকে এ উপেক্ষা কেন?

—বড় নাম খারাপ করছো বিভূতিবাবু। —গোঁসাই বিভূতির তোষামোদের কোনো প্রশ্রয় না দিয়েই বললো। বিভূতিকে নিরুত্তর দেখে নিজেই আবার প্রসঙ্গ টেনে চললো, —শুধু মুর্গীচোর ঠেঙিয়ে থানা চালানো যায় না। সেই গ্যাং কাল আবার আমার দু'গাড়ি গুড় লুঠ করেছে। চিত্রপুরের দারোগাগিরি চেয়ারে বসে হয় না। বাইরে বের হতে হয়।

গোঁসাইয়ের দৃষ্টি পড়লো কড়ে খাঁর দিকে। কড়ে খাঁ তার নিজেরই চোখ দুটো নামিয়ে নিল। এতক্ষণ সে শুধু দেখছিল. গোঁসাইকে, ক্রূর লুব্ধদৃষ্টি দিয়ে।

গোঁসাই বললো, কি বুড়ো, একটা আদাব বন্দেগী করাও ভুলে গেছ দেখছি।

কড়ে খাঁ ভ্যাবাচাকা খেয়ে জানাল, বন্দেগী হুজুর!

তারপর হুকুম হলো, বিভূতিবাবু, ওই চোট্টা দলটার উপদ্রবের একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলো, এস-পি জিজ্ঞাসা করলে যাতে আমি জবাব দিতে পারি। আর—এই বুড়ো, তুমি এবার পেনসন নাও বাবা, শুধু বসে বসে লাঠিবাজি আর চলবে না।

ফটক পর্যন্ত এসে নমস্কার জানিয়ে বিভূতি গোঁসাইকে বিদায় দিল।

সন্ধ্যেয় থানাবাড়ি একটু নিঝুম হয়। বারান্দায় টিমটিম করে কেরোসিনের বাতি জ্বলে। বিভূতি একবার চারিদিক ঘুরে ফিরে তার দিনের প্রোগ্রাম শেষ করে।

কড়ে খাঁর নামাজ শেষ হয়। রুটি তৈরী করে। খাওয়া শেষ করে বারান্দায় একটা কম্বলের আসন পেতে বসে। চৌকীদারেরা উনুন জ্বেলে ভাত চড়ায়। গল্প আলাপ আরম্ভ হয়।

কড়ে খাঁ চোখ বুজে শোনে চিত্রপুরের দুরন্ত দুঃখের ইতিহাস। চৌকীদারেরা মন খুলে সব কথাই আলোচনা করে। —সবই তো জানি। গুড় লুঠ করেছে কারা, তাও জানি। মুণ্ডাদের কাজ। কেন করবে না জমাদার সাহেব? বড়দিনের সময় একমাস ধরে ওরা শুধু জঙ্গল ঝালোয়া করেছে। টিকাইতজী যত অফিসারের ছেলে নিয়ে শিকার ফূর্তি করেছে। মজুরী এক সের ছাতুও পায়নি মুণ্ডারা।

ডোমন চৌকীদার বলে, দোসাদেরা সাতদিন ধরে টিকাইতজীর একটা জঙ্গল কেটেছে। ঘোড়ার মত খেটেছে বেচারারা। এক পয়সা নগদ মজুরী পায়নি। সব কবলায় সুদ বাবদ কাটিয়ে দিয়েছে।

ইয়া আল্লাহ্—একটা হাই তুলে নিয়ে কড়ে খাঁ যেন ধমক দিল—আরে ছাড় ওসব কথা। একদিন এর বিচার হয়ে যাবে।

নানু চৌকীদার বললেন, তুমিও আজব মানুষ জমাদার সাহেব। বুড়ো হয়েছ, আর কেন? এবার পেনসন নিয়ে বাড়ি যাও। এখন আর কি? তোমার তো শুধু মাটি নেওয়া বাকী আছে। তা নয়, এখানে বসে আসামী নিয়ে শুধু মারধর আর কাটাকাটি!

কড়ে খাঁ রেগে উঠল. উল্লু নেহি তো। আমি বুড়ো. আর এইসব জোয়ানদের চেহারা দেখ! কাউয়াভি দেখে ভয় পায় না।

কড়ে খাঁর উষ্মায় চৌকীদারদের মধ্যে হাসির সোর পড়ে গেল। ডোমন বলে—ছোট জমাদারের মেজাজ এই রকম, পেনসনের কথা বললেই বিগড়ে ওঠে।

লণ্ঠন নিয়ে বিভূতি একবার হাজত ঘরটা ঘুরে যায়। এর পর ঘরে ফিরে তাকে আরও একটা পরীক্ষা পার হতে হয়। এ পরীক্ষায় একমাত্র গতি মায়া।

মায়া বিছানা ছেড়ে উঠতে চায় না, যাও আসামীদের ওপর অত দয়াধর্ম যদি দেখাতে হয় তবে যাও তোমার সাকরেদ কড়ে খাঁর কাছে। ওই মাঝরাত্তিরে উঠে খিচুড়ি রেঁধে দেবে।

এসব অভিযোগের উত্তরে বিভূতির মুখে এ সময় নিছক সকরুণ অনুনয়ের ভাষা ছাড়া আর কিছু বার হয় না। একটানা মিনতির পালা চলে—দাও, দাও লক্ষ্মীটি। সেই কাল বিকেলে সদরে পৌঁছে তবে ব্যাটারা খেতে পাবে। শুধু চালেডালে একটু ফুটিয়ে দাও। তা হলেই হবে।

শেষপর্যন্ত কিন্তু মায়াকে উঠতেই হয়, রাতদুপুরে হাঁড়ি ঠেলে খিচুড়িও রাঁধতে হয়।

চিত্রপুর থানার এই একটি চিত্র। আজ ছ'বছর ধরে চিত্রপুরের দারোগাপদে সমাসীন বিভূতি এই অভিনয়ে অভ্যস্ত হয়েছে। ক্লান্তি তেমন হয়নি, তার চেয়ে গ্লানি বেশি। বদলি হতে ইচ্ছে করে, এখনি পেনসনের সম্ভাবনা থাকলে আরও ভাল হত। কিন্তু ছোট জমাদার কড়ে খাঁ—নিত্যদিনের এই সংহারধর্ম যেন তার সত্তার সঙ্গে মিশে গেছে। বয়সে বুড়ো হয়েও লোকটা এখনও একটুও কাবু হয়নি। পেনসন নেবার কথাও বোধহয় সে ভুলে গেছে।

মায়া সকালে উঠে জানালা খুলেই কৌতুহলী চোখ দুটোকে আরও বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। বন্দুক কাঁধে ছোট দারোগা ফিরছে, সঙ্গে গোটাকয়েক চৌকীদার আর সেপাই। সঙ্গে আসামীও আছে—একটি যুবতী মেয়ে, ছেঁড়া খাটো কাপড়ে শরীর ঢাকা, গলায় একটি গিলে আর ভেলার মালা। আরও আছে, বছর আটেকের একটা ছেলে ও গোটা দশেক গাঁজার চারা আর মদ চোলাইয়ের হাঁড়ি। মায়া নিবিষ্ট দৃষ্টি দিয়ে আর একবার মেয়েটাকে দেখে নিয়ে স্টোভ ধরাতে চলে গেল।

চা খেয়ে ইউনিফর্ম চড়িয়ে বিভূতি বাইরে যাবার উদ্যোগ করতেই মায়া বললো, শোন, আজ যে আসামী এসেছে, তাকে কিন্তু মারধর করতে পারবে না, সাবধান!

বিভূতি—সকালবেলা আবার কি আরম্ভ করলে? আজ একটা গ্যাংয়ের আসামীরা এসেছে, লাই দিলে কেস ফেঁসে যাবে। আমার চাকরির দফা সেরে দেবে গোঁসাই।

মায়া—আমি দিব্যি দিলাম, আসামীর গায়ে হাত তুলো না, আসমী পোয়াতি মানুষ।

বিভূতি দরজার বাইরে পা বাড়াতেই মায়া আবার কি যেন বলে। বিভূতি মুখ ঘুরিয়ে তর্জন করে উঠলো, চুপ রও, ডোন্ট...

উর্দি গায়ে চড়ালেই বিভূতির মুখে ইংরাজী ফুটে ওঠে।

মায়া ব্যর্থ রোষে লাল মুখে একবার শুধু বলে, আচ্ছা।

তারপর নিষ্ফল অভিমানে বিছানায় গিয়ে লুটিয়ে পড়ে মায়া। সশব্দে বন্ধ করে দেয় জানালাটা, থানার বারান্দাটা যেন চোখে না পড়ে। পেয়ালার চা কিছুক্ষণ বাষ্প ছেড়ে ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

মাঝরাত্রে। খুব বড় একটা বর্ষণ হয়ে সবেমাত্র থেমেছে। দামোদরে জেগে উঠেছে সুস্বন কলরোল। শত শত ঝরনা জঙ্গলের ভেতর হঠাৎ মুখর হয়ে উঠেছে।

থানার ফটক ডিঙিয়ে একটা লোক চিৎকার করে দৌড়ে এল। বিভূতি, কড়ে খাঁ, ছোট দারোগা আর চৌকিদারেরা ঘুম ছেড়ে বারান্দায় এসে জমা হলো।

হন্তদন্ত হয়ে বিভূতি ঘরে এসে ঢুকল একবার। মায়ার ত্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, আমার বেল্ট আর রিভলভারটা দাও শিগগির। তুমি দরজা বন্ধ করে রাতটুকু জেগেই কাটিয়ে দাও। আমি আসছি।

অন্ধকারে থানার পুলিসদল এগিয়ে চললো চিত্রপুরের গঞ্জের দিকে। টিকাইত গোঁসাইয়ের বাড়ির কাছে এসে তারা থামল।

কিছুক্ষণ পরে বাড়ির ভেতর থেকে বিভূতি আর ছোট দারোগা ফিরে এল। সঙ্গে আসামী, চিত্রপুরের বিধাতা ধনঞ্জয় গোঁসাই।

গোঁসাই একবার বললো, 'বুঝে কাজ করছো তো বিভূতিবাবু?'

বিভূতির কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হলো ছোট্ট একটি শব্দ, 'ইয়েস্!' সে আজ যেন সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে

অনুভব করছে, সতিাই সে দারোগা।

গোঁসাই তার কেরানীবাবুকে ডেকে বললেন, সব দেখলে তো? গাড়ি বের করো। ভোরেই সদরে চলে যাও। আমি চললাম বিভূতিবাবুর অতিথি হয়ে। গোঁসাইজীর ঠোঁটে বিদ্রূপের বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো।

ভোর হয়েছে, থানার ফটকের বাইরে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে গেছে। খুনের আসামী টিকাইত ধনঞ্জয় গোঁসাই বসে আছে বিভূতির সামনে টুলের ওপর। বিভূতির ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট লেখা হয়ে গেছে। ছোট হিস্যার গোঁসাই যেমন গরীব, তার বউ তেমনি সুন্দরী। তাকে খুন করেছে ধনঞ্জয়। লাশ গুম করা হয়েছে, এখনও পাত্তা হয়নি।

বিভূতি কলম ধরলো গোঁসাইয়ের স্টেটমেন্ট লিখতে। কড়ে খাঁ এরই মধ্যে দু'বার নমাজ সেরেছে। তার বহুদিনের বন্ধু পুরানো টুলটার ওপরে গিয়ে বসলো দূর বারান্দার কোণে। কড়ে খাঁ আজ ঝিমুতে পারছে না। মোটা সিঙ্গাপুরী বেতের লাঠিটা হাতের গোড়ায় টেনে রেখে আকাশের দিকে ঘোলাটে চোখের স্থিরদৃষ্টি তুলে বসে আছে। বহু প্রতীক্ষার, বহু কামনার এক দূর স্বপ্নছবি আজ মূর্ত হয়ে উঠেছে সম্মুখে।

গোঁসাই বলে, স্টেটমেন্ট আমি যা দেব, তাই লিখবে তো বিভূতিবাবু?

বিভূতি—গো অন।

গোঁসাই—ছোট হিস্যার গোঁসাইয়ের বউকে খুন করেছে দারোগা বিভূতি বোস, লাশ গুম করেছে দারোগা বিভূতি বোস...।

গলার স্বর নামিয়ে গোঁসাই বলে, যা বলছি বিভূতিবাবু, সবই বর্ণে বর্ণে সত্য প্রমাণিত হয়ে যাবে। তুমি এ-কথা অবিশ্বাস কর?

নির্বোধ বিস্ময়ে বিভূতি গোঁসাইয়ের দিকে তাকালো। গোঁসাইয়ের বিদ্রূপের হাসির জ্বালায় ধীরে ধীরে বিভূতির চোখ দুটো কুঁচকে ছোট হয়ে এল ভীরুতার প্রতিবিম্বের মত।

গোঁসাই বলে, শোন বিভূতিবাবু, সোজা কথা, সোজা রাস্তা। নগদ নগদ দিয়ে দিচ্ছি, দু'হাত ভরে দিচ্ছি। রাজি হও তো বল, নইলে কেরানীবাবু চললো সদরে। তোমার আমার লড়াইয়ে কে জিতবে, এ-বিষয়ে কি তোমার কোনো ধারণা নেই?

বিভূতি মুখ নামালো, কলমও নামিয়ে রাখলো। গোঁসাই উৎসাহ দিয়ে বলে, ব্যস্ এবার কাউকে ডাকো। কেরানীবাবুকে খবর দিক যে সদরে যেতে হবে না। একটু তাড়াতাড়ি কাউকে পাঠাও, নইলে ওদের গাড়ি বেরিয়ে যাবে।

অনেকক্ষণ পার হয়েছে। বুড়ো কড়ে খাঁর গায়ে যেন জ্বরের জ্বালা ধরেছে। দারোগাবাবু করছে কি এতক্ষণ ধরে? কি এত কলমবাজি? সত্যিই সে বুড়ো হয়নি। তার স্থবির শরীরের শিরা উপশিরায় এতদিন ধরে সে লালন করে এসেছে ঐ প্রখর সংহারতৃষ্ণাকে; এই পরম লগ্নে আজ তার মহানির্বাণ হবে।

বিভূতি ডাকে, কড়ে খাঁ!

এই সেই আহ্বান, যার জন্যে কড়ে খাঁর যৌবনের ধার ছুরির মত ঐ জীর্ণ খাপে এতদিন অটুট হয়ে আছে। সমস্ত চিত্রপুরের রক্তাক্ত বেদনার রূপ তারই ক্রূরতার ভেতর এই দীর্ঘ দিন ধরে

প্রতিমূর্ত হয়ে এসেছে। তারই পরিসমাপ্তি আসন্ন। কবুল করাবার আনন্দের আস্বাদ আজ চরম হয়ে উঠবে।

সিঙ্গাপুরী বেতের লাঠি হাতে তুলে এগিয়ে এল কড়ে খাঁ।

বিভূতি একটা চিঠি তুলে নিয়ে বলে, কড়ে খাঁ, একটু তাড়াতাড়ি দৌড়ে যাও। গোঁসাইজীর কেরানীবাবুর হাতে দিও।

কাঁপতে কাঁপতে চিঠিটা নিয়ে কড়ে খাঁ নেমে এল বারান্দা থেকে। একটা চৌকীদারের ওপর এই কাজের ভার চাপিয়ে দিয়ে কড়ে খাঁ বারান্দার কোণে টুলের ওপর এসে বসে পড়লো।

অলস অবসন্ন কড়ে খাঁ স্থির হয়ে বারান্দার কোণে বসে আছে। বাদামী দাড়ির গুচ্ছ ফুর ফুর বাতাসে উড়ছে। পাকা ভুরু দুটো ঝুলে পড়েছে চোখের কোটরের ওপর।

বিভূতি একবার উঠে দাঁড়ালো। চোখ দুটো বাষ্পায়িত আকাশের মত ম্লান। বিভূতির মনে হলো, কড়ে খাঁ এইবার সত্যিই পেনসন নেবে। ও শরীরে আর শক্তি সামর্থ্যের কোনো নিশানা নেই। জরাগ্রস্ত, লোলচর্ম বিগলিত পেশী এক অশীতিপর বৃদ্ধের শব কুঁকড়ে পড়ে আছে বারান্দার কোণে।

রাতের পাখি

বাগানের পাঁচিলের গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটা নিমগাছ। এরকম চেহারার নিমগাছ এ পৃথিবীতে অনেক আছে। জঙ্গলে আছে, জাঙ্গালে আছে, সড়কের এপাশে আর ওপাশেও আছে। ওই যে ফল্গুর ওপারে, অনেক দূরে, একটা টিলার মাথার উপরে সেকেলে একটা কেল্লাবাড়ির ধ্বংস ইঁট-পাথরের হাড়গোড় ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে, সেখানেও ঠিক এমনই চেহারার নিমের একটা জঙ্গল অনেক ছায়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই নিমের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকাবার কিছু নেই। তাকিয়েও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। গয়ার অক্ষয়বাবু কিন্তু তাঁর বাগানে এ-হেন একটা নিতান্ত সাধারণ ও সামান্য চেহারার নিমেরই দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে আছেন।

কচি নয়, বুড়ো নয়; একটা মাঝারি আকারের নিমগাছ। অক্ষয়বাবু এখন একেবারে ঠিক-ঠিক হিসেব করে বলে দিতে পারবেন, যদি আজকের এই ফাল্গুন মাসটাকেও হিসেবের মধ্যে ধরা হয়, তবে এই নিমের বয়স হলো আট বছর এক মাস।

গত এক বছরের মধ্যে একটা দিনও অক্ষয়বাবু তাঁর বাড়ির পিছনের এই বাগানে সকাল দুপুর বা বিকেলের কোন ক্ষণেও বেড়াতে আসেননি। মাত্র এক বিঘে জমি নিয়ে সবজি ও ফুলের একটা বাগান। মস্ত বড় চেহারার একটা কদম আছে, আর ছোট-ছোট চেহারার কয়েকটা আম লিচু পেয়ারা আর আলুবোখরা আছে। লোকের চোখে এমন কিছু বাহারে বাগান নয়; কিন্তু অক্ষয়বাবুর কাছে খুবই আদুরে বাগান। রিটায়ার করবার পর অক্ষয়বাবুর জীবনের অবসর নিতান্ত একটা আলস্য হয়ে নেতিয়ে পড়েনি। এই বাগানই তাঁর শ্রান্ত জীবনের অচঞ্চল অবসরের প্রাণটাকে নতুন একটা আগ্রহ আর ব্যস্ততা দিয়ে একটু চঞ্চল করে রেখেছে। সন্ধ্যাবেলা দেখে গেলেন, গোলাপের কুঁড়ি সামান্য একটু ফুল্ল হয়েছে, পাপড়ির মুখটা সামান্য একটু খুলেছে। সকাল হতেই সব কাজের আগে একবার বাগানে এসে দেখে যান, কুঁড়িটা ফুটলো কিনা। যদি দেখা যায়, ফুটেছে

কুঁড়ি, বেশ উৎফুল্ল হয়ে হাসছে সেই গাজিপুরী গোলাপ, তবে আবার অন্য সব কাজের আগে একবার ঘরের দিকে ফিরে আসবেন, আর ঘরের ভিতরের দিকে তাকিয়ে বলে উঠবেন—গাজিপুরী গোলাপ এবার ফুটতে শুরু করেছে, সুচারু।

রেলওয়ের সার্ভিসে ছিলেন অক্ষয় মিত্র, পুরো চল্লিশটি বছর। সে জীবন ছিল নিরন্তর দৌড়াদৌড়ির জীবন। মাসের পনরটা দিন ট্রেনেই কেটেছে। সঙ্গে কাগজপত্রের ফাইলের বোঝা আর সঙ্গী একজন চাপরাশি। এক স্টেশনে ট্রেনে উঠেছেন, অন্য স্টেশনে নেমে বুকিং অফিসের খাতার যত হিসাবের কিলবিলে অঙ্কের যোগ-বিয়োগের পরীক্ষা করেছেন। না, এখন আর হিসেবও নয়, অঙ্কও নয়, আর নিরন্তর ট্রেনযাত্রার ঝাঁকুনিও নয়। এখন তিনি নিজের ইচ্ছায় আস্তে আস্তে হাঁটেন; যখন খুশি তখন বাগানের ঘাসের উপর থমকে দাঁড়ান আর দেখতে থাকেন, ওই ছোট্ট কপি ক্ষেতের খাত দিয়ে কলকল করে জল গড়িয়ে যাচ্ছে। কুয়ো থেকে জল তুলছে আর ঢালছে বিশ্বেশ্বর, বিশুমালী।

কিন্তু কোনদিনও তিনি এই নিমের দিকে কখনও চোখ তুলে তাকিয়েছেন কিনা সন্দেহ। তাকিয়ে থাকলেও ঠিক এরকম দুটো অদ্ভুত স্নেহাক্ত বিস্ময়ের চোখ নিয়ে নিশ্চয় তাকাননি। বাগানের পাঁচিল-ঘেঁষা একটা নিমগাছ, এটা এই বাগানের চেহারার বাহার বাড়িয়ে তোলেনি। বাগানটার কাছেও এই নিমগাছটা নিশ্চয় একটা শোভাও নয়। তার চেয়ে অনেক বেশী শোভা ধরে ওই কদম, ভাদ্র মাসের বৃষ্টির জলের ছোঁয়া পেয়ে তখন নতুন কোরকে ছেয়ে যায় গাছটা।

এই এক বছরের মধ্যে একদিনের জন্যেও বাগানে আসেননি অক্ষয়বাবু; তার কারণ এই যে, এই একটা বছর তাঁর বুকের ভিতরে যেন শুধু শুকনো ধুলো উড়েছে; আর চোখের কাছে ভেসেছে ভয়ানক এক ছাই-ছাই শূন্যতা। অমল, অক্ষয়বাবুর একমাত্র ছেলে অমল আর নেই। প্রায় এক বছর হলো অমল একদিন অক্ষয়বাবুর এই বাড়ির সব আনন্দ মিথ্যে করে দিয়ে চলে গিয়েছে। অদ্ভুত একটা জ্বর, সে জ্বরের মতিগতির রহস্য কোন ডাক্তারই ধরতে পারলেন না। পুরো তিন দিন সেই জ্বরে বেহুঁশ হয়ে থাকবার পর শেষে মরেই গেল ছেলেটা। আটাশ বছর বয়সের ছেলে, এঞ্জিনীয়ার ছেলে, মাত্র দু'বছর আগে যে ছেলের বিয়েও হয়ে গিয়েছিল, যার বউ বাইশ বছর বয়সের একটা মেয়ে, সেই তপতীও এখন এই বাড়ির একটা ঘরের ভিতরে চুপ করে একটা চেয়ারের উপর বসে লেস বুনছে।

আজ যে আবার হঠাৎ, পুরো একটি বছর পরে বাগান দেখতে বের হয়েছেন অক্ষয়বাবু, তার কারণ এই নয় যে, তিনি নিজেই জোর করে নিজেকে বারান্দার চেয়ার থেকে তুলে ধরেছেন আর হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে বাগানের ভিতরে নিয়ে এসেছেন। আজও তাঁর বুকের ভিতরে শুকনো ধুলো উড়ছিল, কিন্তু ওই তপতীর একটা কথা শুনেই যেন সেই ধূলো হঠাৎ একটু থিতিয়ে গেল। তপতী নিজেই এসে বলে গেল, বাবা, আপনি এরকম চুপ করে বসে থাকবেন কেন? অন্তত এই বাগানে একটু ঘুরে-ফিরে বেড়ালেও তো পারেন।

কথাটা সুচারুও শুনতে পায়। ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে তপতীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন সুচারু। চিক্‌চিক্ করে সুচারুর দুই চোখ; যেন তাঁরও প্রাণের একটা দীর্ঘশ্বাসের একটা গুমোট আবার একটু ভেঙে গেল। তারই ছেলে অমল যে-মেয়ের জীবনটাকে একটা শূন্যতার মধ্যে বসিয়ে রেখে দিয়ে চলে গিয়েছে, সেই মেয়ে নিজেই উঠে এসেছে, আর এই

বাড়ির স্তব্ধ প্রাণটাকে বাগানের হাওয়াতে বেড়াতে যাবার জন্য অনুরোধ করছে।

তপতীর অনুরোধের কথাটা শুনে অক্ষয়বাবুর নিদারুণ বিষাদের ওই মুখেও যেন একটা সান্ত্বনার হাসি ফুটে ওঠে—হ্যাঁ, যাচ্ছি, তোমার লেস বুনতে বোধহয় আরও অনেক সুতো লাগবে।

তপতী—হ্যাঁ। যা ছিল সব ফুরিয়ে গিয়েছে।

অক্ষয়বাবু—রঙীন সুতো কিনে আনবো? খুব সুন্দর রেশমী সুতো?

তপতী—আনুন।

তখনই চাকর গোবিন্দকে ডাক দিয়ে আর টাকা দিয়ে বাজারে পাঠিয়ে দিলেন অক্ষয়বাবু—সবচেয়ে ভাল রেশমী সুতো, দাম যা-ই হোক না কেন, এখুনি কিনে নিয়ে এস।

তারপর উঠে এসে বাগানে বেড়াতে শুরু করেছেন। তারপর এই নিম গাছের দিকে তাকিয়েছেন। থমকে দাঁড়িয়েছেন। মনে পড়েছে অক্ষয়বাবুর, সে-বছর ছুটিতে রুড়কি থেকে এসে যখন একটা মাস বাড়িতে ছিল অমল, তখন একদিন হঠাৎ কোথা থেকে একটা নিমের চারা নিয়ে এসে নিজের হাতেই পাঁচিলের এইখানে পুঁতে দিয়েছিল। অক্ষয়বাবুও তখন এই বাগানের ঠিক এখানেই দাঁড়িয়ে ডালিমের গাছটাকে দেখছিলেন। আর, অমলকে দেখতে পেয়েই হেসে ফেলেছিলেন—ওটা কিসের চারা অমল?

—নিমের চারা।

—এত গাছ থাকতে নিম কেন?

—শুনেছি, নিমের হাওয়া খুব ভাল।

আজ অমল নেই; কিন্তু ওর পোঁতা ওই নিমগাছটা আছে, যে গাছটা কোনদিনও অক্ষয়বাবুর সামান্য একটু, শুধু একটু চোখ দিয়ে দেখা আদরও পায়নি, সেই গাছটা আজ যেন অক্ষয়বাবুর দুই চোখের সব আদর কেড়ে নেবার জন্যে আস্তে আস্তে মাথা দোলাচ্ছে।

নিমের গোড়াতে অনেক আগাছার ভিড়; তারই ভিতর থেকে মাথা তুলে বের হয়ে এসেছে তেলাকুচার লতা। নিমটার গা বেয়ে উঠে তেলাকুচার লতাগুলি নিমের পাতাভরা মাথাটাকে ছেয়ে ফেলেছে। ঝুলে ঝুলে হাসছে তেলাকুচার টুকটুকে লাল পাকা-ফলগুলো। দুটো টিয়ে পাখিও এসে নিমের ডালে বসেছে। পাকা তেলাকুচা খেয়ে খেয়ে টিয়ের খুশি-প্রাণের ডাকও বেজেই চলেছে। যে টিয়ের ডাকের শব্দ কোনওদিনও শুনতে ভাল লাগেনি; সে টিয়ের ডাক শুনতে আজ বেশ ভালই লাগে।

কিন্তু এই নিমের কথাটা তপতীর কাছে গল্প করে না বলাই ভাল। শুনলে তপতীর মন আবার নিঝুম হয়ে যাবে, মুখটা করুণ বিষাদে ভরে যাবে। দোতলার যে-ঘরটা তপতীর ঘর, তারই জানালার কত কাছে দাঁড়িয়ে আছে এই নিমগাছ। যদি ঝড়ের বাতাসে খুব বেশী জোর থাকে, আর এই নিমের মাথাটাকে একটু বেশি দুলিয়ে দেয়, তবে একটা ডালের পাতা যে সত্যিই তপতীর ঘরের জানালাটাকে ছুঁয়ে ফেলবে। তখন তো তপতীর ওই শান্ত চোখ দুটো আনমনা হয়ে এই নিমেরই দিকে তাকিয়ে থাকবে। চোখ দুটো ঝাপসা হয়েও যাবে। তপতীকে না বলাই ভাল যে, এই নিমের চারাটা একদিন অমল নিজের হাতেই পুঁতেছিল।

অমল মারা যাবার পর এই এক বছরের মধ্যে শুধু একবার, এই তিন মাস হলো, তপতী দুমকার বাড়িতে গিয়ে মাত্র দশটা দিন ছিল। কথা ছিল, সেখানে একটা মাস থাকবে তপতী। কিন্তু

তপতী যেন দুমকার বাড়ির ন'টা দিন কোনমতে সহ্য করেছে, তারপর একটা দিন শুধু ছটফট করেছে, তার পরের দিনেই আবার গয়াতে ফিরে এসেছে। তপতীকে গয়াতে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে তপতীর দাদা সত্যেন। সত্যেন দুঃখ করে বলেছে—অনেক করে বলেছি, কিন্তু তপতী আর থাকতে চাইলো না।

দুমকার বাড়ি, তপতীর দাদা সত্যেনের বাড়ি; সেখানে তপতীর বউদি আছেন, সত্যেনের তিনটে ছেলে-মেয়ে আছে, তিন বছর আগে একদিন যে-বাড়িতে ওই সত্যেনই তার বোন তপতীর বিয়েতে সম্প্রদানের মন্ত্র পড়েছে, সে-বাড়িতেও থাকতে শান্তি পেল না তপতী। ছুটে চলে এল গয়ার এই বাড়িতে, যে-বাড়িতে ওরই স্বামী অমলের যত স্মৃতির ছোঁয়া আজও লেগে রয়েছে।

এটা কল্পনাও করতে পারেননি অক্ষয়বাবু, সুচারুও পারেননি। তাঁদের শোকের বেদনার মধ্যেও যেন একটা অপরাধের লজ্জা কাঁটার মত বিঁধেছিল। অমল তো গেল, তপতীর ভাগ্যটাকেও তো শূন্য করে রেখে দিয়ে গেল। তপতীকে সান্ত্বনা দেবার ভাষাটাও যে কোন যুক্তি খুঁজে না পেয়ে এলোমেলো একটা অর্থহীন অনুনয়ের প্রলাপ হয়ে ওঠে।

সেই তপতী নিজেই শান্ত হয়েছে, আর এই বাড়ির বাপ-মার শোকার্ত প্রাণকেও যেন একটা সান্ত্বনা দিয়ে যেমন বিস্মিত তেমনই শান্ত করেও দিয়েছে।

দুমকা থেকে সত্যেনও কয়েকবার চিঠি লিখে অক্ষয়বাবুর সত্তর বছর বয়সের প্রাণে একটা নতুন সান্ত্বনা ছড়িয়ে দিয়েছে। —তপতী এখন আপনাদেরই মেয়ে। ওর তো নিজের বাবা-মা কেউই নেই। কাজেই, আপনাদের কাছে থাকতে পারলেই তপতী যে শান্ত হবে আর শান্তি পাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সুচারুর কাছে কথাটা বলতে গিয়ে অক্ষয়বাবুর চোখ ছলছল করে উঠেছিল—ছেলে গেল, কিন্তু মেয়ে পেলে, সুচারু।

বাইরের লোক হঠাৎ এই বাড়িতে ঢুকে সোজা ভিতরের এই বারান্দায় এসে দাঁড়ালে দেখতে পাবে সত্যিই এক মেয়ে তার বাবার চেয়ারের কাছে একটা বেতের মোড়ার উপর চুপ করে বসে আছে আর লেস বুনছে। বিকেলবেলা যদি সোজা দোতলাতে গিয়ে একটা ঘরের ভিতরে কেউ উঁকি দেয়, তবে দেখতে পাবে, মেয়ে চুপ করে একটা গল্পের বই পড়ছে, আর মা তার মাথায় চিরুনি বুলিয়ে চুল বেঁধে দিচ্ছেন। তপতী এখন এই বাড়ির শান্তি ও সান্ত্বনা। আর তপতীর কাছে এই বাড়ি এখন অফুরান আদর আর যত্ন। তেইশ বছর বয়সের বিধবা তপতীর জীবন চিরকালের নীড় পেয়ে গিয়েছে।

অমল যে-ঘরে থাকতো, সে-ঘরে নয়, তপতী থাকে ঠিক তার পাশের ঘরে। অক্ষয়বাবুর ইচ্ছা, আর-একটু দূরের কোন ঘর হলে ভাল হতো। মনে আছে অক্ষয়বাবুর, এই সেদিনও এক সন্ধ্যাবেলায় অমলের এই দরজা-বন্ধ ঘরের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল তপতী। অক্ষয়বাবুর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। এগিয়ে গিয়ে তপতীর মাথায় হাত বোলাতে থাকেন অক্ষয়বাবু। আর সুচারু এসেই তপতীকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন—চল, এখন আমার কাছে বসে থাকবে, লক্ষ্মীটি।

অমলের বইগুলিকে আলমারিতে তুলে বন্ধ করে রাখা হয়েছে, যেন দেখতে না পায় তপতী। যে আলনাতে অমলের জামা-কাপড় থাকতো, সেটা এখন অন্য ঘরে। অমলকে মনে পড়িয়ে দেবে,

এরকমের যা-কিছু এখনও এ-বাড়িতে আছে, তার সবই আড়ালে সরিয়ে দিতে হয়েছে। কিন্তু সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি অমলের ফটোটাকে, এটা তপতীর ঘরের দেয়ালে একটি সুস্থির স্মৃতির ছবি হয়ে রয়েই গিয়েছে। ওই ফোটোটাকে সরিয়ে দেবার কথা কখনও মনেও হয় না অক্ষয়বাবুর। ওটা তো থাকবেই। ওটাও না থাকলে আর কী নিয়ে থাকবে তপতী? ওই ফোটো তপতীর প্রাণের মধ্যে আছে বলেই তো তপতী এই বাড়িকে জীবনের চিরকালের ঠাঁই করে নিয়েছে। কিন্তু যেন আর কান্নাকাটি না করে তপতী; যেন হঠাৎ চোখ দুটোকে করুণ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটা ঘণ্টা পার না করে দেয়। যেন হাতের লেস হঠাৎ ফেলে রেখে দুটো উদাস চোখ নিয়ে আর স্তব্ধ হয়ে বসে না থাকে।

তাই এই নিমগাছের কথাটা তপতীর মনে তোলবার দরকার নেই; উচিতও নয়। এখন বরং একবার...।

হ্যাঁ, মনে হয় আজ নিজেই একবার বাজার ঘুরে এলে ভাল হয়। সুচারুকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে, কী খেতে ভালবাসে তপতী। গয়ার বাজারে এখন কমলালেবু এসে গিয়েছে মনে হয়।

বাগান থেকে ফিরে এসে আর ঘরে ঢুকে সুচারুকে জিজ্ঞাসা করেন অক্ষয়বাবু—তপতী কি এবারও সারাটা শীতকাল খালি পায়েই থাকবে? তুমি তপতীকে একটু বুঝিয়ে বল। এখনই বল। আমি আজই বাজারে গিয়ে তপতীর জন্যে নতুন একজোড়া জুতো আনতে চাই।

সুচারু—তুমি আগে নিয়ে এসো তো; তারপর আমি মেয়েকে বুঝিয়ে রাজী করাবোই।

২

বাঃ কী চমৎকার পাতা ধরেছে! নিম গাছটার দিকে তাকিয়ে অক্ষয়বাবুর চোখের এত খুশি হবার কোন অর্থ হয় না। পৌষ-মাঘে সব নিমেরই পাতা ঝরে যায়, আর ফাল্গুন-চৈত্রে নতুন পাতায় ভরে যায়। ঘন সবুজ ফিকে সবুজ আর ঘষা তামার মত রঙের কচি পাতা। অক্ষয়বাবুর মনের মধ্যেই যে স্নেহের বিস্ময় আছে, সেটাই তাঁর চোখ দুটোকে আশ্চর্য করে দেয়, যখনই বাগানে বেড়াতে এসে এই নিমগাছের দিকে হঠাৎ একবার তাকান। অমলের সেই চেহারাটাও কত স্পষ্ট করে মনে পড়ে যায়। চোখে চশমা, গায়ে গেঞ্জি, হাতে ঘড়িটাও আছে; একটা শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে অমল। নিমের চারাটাকে পুঁতে দিয়েই মাটির উপর জল ছিটিয়ে দিল অমল।

মাসের পর মাস কেটে যায়; বাগানে বেড়াতে এসে অক্ষয়বাবুর চোখে এই নিমের এক-একটা অদ্ভুত কীর্তির কাণ্ডও চোখে পড়ে। এক জোড়া কালো বুলবুল এসে নিমের পাতার আড়ালে উসখুশ করে এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে বসছে, ঘুরছে, আবার খামকা চমকেও উঠছে।

আজকাল মাঝে মাঝে তপতীকে সঙ্গে নিয়ে বাগানে বেড়াতে বের হন অক্ষয়বাবু। একদিন নিমগাছের একটা কাণ্ড দেখে হেসে ফেললেন, তপতীও হেসে ফেলে। কোথা থেকে একটা ঘুড়ি কেটে এসে এই নিমের মাথার উপর উড়ছে। ঘুড়ির সুতো নিমের পাতা আর ডালে জড়িয়ে গিয়েছে। একদল বাচ্চা ছেলে পাঁচিলের উপর উঠে আর পড়ি-মরি করে দৌড়ে দৌড়ে নিমগাছের দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু বাচ্চার দল যেই না এসে গাছটাকে ছুঁয়েছে অমনি ঘুড়িটা যেন বাতাসে মাথা ঠুকে দিয়েই উপরে উঠে গেল, তারপর দুলতে দুলতে অনেক উঁচু মগডালের মাথার উপর পড়ে আটকে রয়ে গেল।

—ও বিশু। মালীকে ডাক দিয়ে কথা বলেন অক্ষয়বাবু—গাছটার গোড়াতে এত আগাছা কেন? ওগুলো উপড়ে ফেলে জায়গাটাকে একটু পরিষ্কার করে দাও।

নিমফুল ফোটে, মৌমাছি আসে, অলস ঘুঘু সারা দুপুর এই নিমগাছের ডালে ডালে আস্তে আস্তে হাঁটে আর নিমফলে ঠোকর দেয়। বিশুমালীকে জিজ্ঞাসা করেন অক্ষয়বাবু—আগেও কি এত মৌমাছি আসতো, বিশু?

—হ্যাঁ বাবু, বহুৎ পতঙ্গভি আতা হ্যায়।

অক্ষয়বাবু—কী পতঙ্গ; প্রজাপতি, ফড়িং, এইসব?

—হ্যাঁ বাবু।

কিন্তু তেলাকুচা লতা কোথায় গেল?

—ও তো বর্ষাতমে আওয়েগা।

বিশুমালীও একদিন একটা গল্প বলে অক্ষয়বাবুর চোখের বিস্ময় আরও নিবিড় করে দিল। একটা রাতের পাখি রোজই এই নিমগাছে এসে ঘুমোয়, আর ভোর হলেই চলে যায়।

কী পাখি? জিজ্ঞাসা করেন অক্ষয়বাবু।

নাম বলতে পারে না বিশু; কারণ বিশু সেই পাখিটাকে খুব স্পষ্ট করে আর ভাল করে কোনদিনও দেখতে পায়নি।

একদিন বিকালে যখন খুব জোরে একটা ঝড় দেখা দিল, তখন বাড়ির বারান্দাতে বসেই দেখতে পান অক্ষয়বাবু, নিমের ছোট্ট একটা কচি ডাল হঠাৎ ছিটকে গিয়ে একেবারে দোতলার ঘরের বন্ধ জানালার কাঁচের উপর গিয়ে আছড়ে পড়লো। জানলাটা খুলে যায়। আর দেখাও যায়, তপতী একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তপতীর চোখ দুটোও এত আকুল হয়ে কে জানে কী দেখছে। ঝড়ের বাতাসে আলুথালু হয়ে উড়ছে তপতীর ভাঙা বেণীর চুল।

সুচারুকে ডাক দিয়ে কথা বলেন অক্ষয়বাবু। —মেয়ে যে এখনও বড় বেশি ভাবছে। কী ভাবে বলতে পার?

—যাকে না ভেবে থাকতে পারে না, তাকেই ভাবছে।

—আর কিছু ভাবছে না তো?

সুচারু—দুমকা থেকে সত্যেন বার বার চিঠি দিচ্ছে।

—কাকে চিঠি দিচ্ছে?

—তপতীকে, আর আমাকেও।

—কেন?

—এইবার কিছুদিনের জন্য, অন্তত এক মাসের জন্য তপতীকে ছেড়ে দেবার জন্য অনেক করে আমাকে লিখেছে সত্যেন।

—সত্যেন কেন এত অনুরোধ করে, বুঝি না।

—তোমারই বা এটা কী রকমের কথা হলো? অনুরোধ না করে কি পারে? মায়ার টান আছে বলেই করে। মুশকিল হলো, তপতী যেতে চায় না। আমি অনেক করে বলেছি, তবু রাজী হলো না।

—আমি বলি, এক মাস নয়, আট-দশ দিনের জন্য তপতী একবার দুমকা ঘুরে এলেই পারে।

—আমি তা-ও বলেছিলাম, কিন্তু তপতী রাজী নয়।

—কী বলে তপতী?

—তপতী বলে, যেতে যখন ইচ্ছেই করে না, তখন গিয়ে কাজ নেই। দাদা বরং একবার এসে আমাকে দেখে যাক।

অক্ষয়বাবু বলেন—আমিও তো তাই বলি।

তপতী যে এই বাড়ির আলো-ছায়ার সঙ্গে কীভাবে ওর মন-প্রাণ মিশিয়ে দিয়েছে, সেটা কোন দিন সত্যেনের চোখে পড়েনি বলেই সত্যেন বার বার চিঠি লিখে তপতীকে দুমকাতে নিয়ে যাবার অনুমতি পেতে চায়।

অক্ষয়বাবু আর সুচারু সাবধান হলে হবে কি? তপতী যখন-তখন অমলের ঘরের দরজায় তালা খুলে ঘরে ঢোকে, আর চুপ করে বসে থাকে। অমলের বইগুলির ধুলো ঝেড়ে দিয়ে আবার আলমারির ভিতরে সাজিয়ে রাখে। আর, অমলের টেবিলের দেরাজ নিজেরই একটা চাবি দিয়ে খুলে নিয়ে একগাদা চিঠি বের করে, অমলেরই কাছে লেখা তপতীর যত চিঠি। তিন-চারটে চিঠি পড়া হয়ে গেলেই আর শান্ত হয়ে থাকতে পারে না তপতী। টেবিলের উপর মাথাটাকে নামিয়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে, এই চিঠির সব আশা মিথ্যে করে তুমি চলে গেলে কেমন করে?

রাত যখন হয়, তখন নিজের ঘরে বসে বাক্সের ভিতর থেকে বের করা চিঠিগুলোকে পড়ে; তপতীর কাছে লেখা অমলের চিঠি পড়তে পড়তে তপতীর চোখে এখনও পুরনো অভিমান ছটফট করে, ভুরু কুঁচকে যায়। আবার হেসেও ফেলতে হয়। না বুঝে কী ছাই কত রাগের কথই না লিখেছে।

সত্যেনের চিঠি এলে খুশি হয় তপতী, কিন্তু চিঠি পড়লেই সেই খুশি মিথ্যে হয়ে যায়। সুচারুর কাছে নিজেই এসে বলে যায় তপতী, দাদা আমাকে ভয়ানক বিরক্ত করছে, মা। আমি কিন্তু দুমকা যাব না।

অক্ষয়বাবুও সত্যেনের চিঠি এলে অস্বস্তি বোধ করেন। সত্যেনের চিঠি যেন হাত বাড়িয়ে অক্ষয়বাবুর জীবনের শান্তিটাকে টানাটানি করতে চাইছে। তপতীর ভবিষ্যতের জন্য তো সত্যেনকে ভাবতে হয় না। সে-বিষয়ে ভাবনা করবার সব দায় নিয়েছে যারা, তারাই ভাবছে। এবাড়ির বুড়ো-বুড়ির জীবনের মেয়াদ তো প্রায় ফুরিয়েই এসেছে। অক্ষয় মিত্রের যা-কিছু আছে, এই বাড়ির আর ব্যাঙ্কের খাতায় জমা করা সব টাকা, সবই তপতীর নামে লিখে দেবার জন্য তিনি তৈরিও হয়েছেন। উকিল কান্তিবাবুর সঙ্গে কথা বলাও হয়ে গিয়েছে। তপতীর ভবিষ্যৎ কখনও টাকার অভাবে পড়ে দুঃখ পাবে না।

কিন্তু সত্যেন এসে হাজির। সত্যেনকে অনেক বুঝিয়ে ফিরিয়ে দিতে চায় তপতী। কিন্তু সুচারু আবার তপতীকে অনেক বুঝিয়ে রাজী করাতে চান, তোমার দাদা যখন নিজেই এসেছেন, তখন একবার অন্তত সাতটা দিনের জন্য দুমকা ঘুরে এস।

তপতী—আমার খুব খারাপ লাগবে, মা।

সুচারু—আমাদেরও তো খুব খারাপ লাগবে। কিন্তু সহ্য করতেও হবে।

সুচারুর ওপর রাগ করে সোজা অক্ষয়বাবুর কাছে গিয়ে ডুকরে ওঠে তপতী—আমাকে যেতে হবে নাকি বাবা?

—না না। তুমি যাবে না। চেয়ার থেকে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ান আর টলমল করতে থাকেন

অক্ষয়বাবু। আমি সত্যেনকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

সুচারু বাধা দিলেন বলেই আর সত্যেনকে স্পষ্ট করে বোঝাতে পারলেন না অক্ষয়বাবু।

দুপুর বেলাটা খাওয়া-দাওয়ার পর নীচের তলার নিরিবিলি ঘরে শুয়ে পড়ে থাকে সত্যেন। আর উপর তলার একটি ঘরে বিছানার উপর তপতীর এক পাশে বসে থাকেন অক্ষয়বাবু, আর-এক পাশে সুচারু। মেয়েকে সাত দিনের জন্য দুমকা যেতে দিতে রাজী হয়েও যেন রাজী হতে চাইছে না দুটি অদ্ভুত মমতার প্রাণ।

কথা বলতে গিয়ে ভিজে যায় তপতীর চোখের পাতা। — আমার এই বিছানা যেন ঠিক এইরকম পাতা থাকে মা। গুটিয়ে রাখবে না।

সুচারু—সব ঠিক করে রাখবো আমি, তুমি কিছু ভেবো না।

তপতী—আমি কিন্তু সাতদিনের বেশি একটা দিনও দুমকাতে থাকতে পারবো না, বাবা। সে-কথা দাদাকে ভাল করে বলে দিন।

অক্ষয়বাবু—আমি বলে দিয়েছি তপতী, তুমি কিছু ভেব না।

সন্ধ্যা হতেই ট্যাক্সি এল। রওনা হতে হবে। অক্ষয়বাবুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে তপতী। অক্ষয়বাবুর গলা ঘড়ঘড় করে। —আমি যে কী বলবো বুঝতে পারছি না। ...সাবধান সত্যেন, মেয়ে যেন হঠাৎ কোন অসুখে-বিসুখে না পড়ে।

সত্যেন করুণভাবে হাসে—না, না, আপনি চিন্তা করবেন না।

সুচারু বলেন—রাত দশটার বেশি এক মিনিটও দেরী না করে খাবার খেয়ে নিও।

খাবারের বাস্কেটটা সত্যেনের হাতের কাছে এগিয়ে দেন সুচারু।

চলে গেল ট্যাক্সি। অক্ষয়বাবুর টলমলে শরীরটা এবার ক্লান্ত হয়ে চেয়ারের উপর বসে পড়ে।

অনেকক্ষণ পরে সুচারু এসে যখন কাছে দাঁড়ান আর বেচারা সত্যেনের কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলেন, তখন অক্ষয়বাবুও হাসেন। সত্যেন বলেছে—আমার বোনের কাণ্ডটা দেখছেন তো? আমি যেন কেউ নই, নেহাতই একটা বাইরের মানুষ। তপতী আমাকে মুখের ওপর কত স্পষ্ট করে বলে দিল, বাবা আর মা-কে ছেড়ে কোথাও থাকতে আমার ভাল লাগবে না, আমার ভয় করবে।

সুচারু—যাক্ গে, সাতটা দিন তো দেখতে দেখতে পার হয়ে যাবে, তুমি আর অত মন খারাপ করো না।

সাতদিনের ছ'টা দিন পার হবার পর রাত্রিবেলা শুতে যাবার আগে অক্ষয়বাবু বলেন, তাহলে কাল সকালেই একবার স্টেশনে যেতে হয়, কী বল?

সুচারু বললেন—যেও।

সেই রাত্রিতে যখন মাঠের ঝিঁঝির ডাক ক্লান্ত হয়ে এসেছে, তখন বাগানের পাঁচিলের কাছে ঝুপ করে একটা শব্দ হয়। জেগেই ছিলেন অক্ষয়বাবু, কাজেই শব্দটাকে বেশ স্পষ্ট করে শুনলেন। কী ব্যাপার? ঘরের জানালা খুলে বাগানের দিকে তাকালেন। তারপরেই দেখতে পেলেন, এক হাতে লণ্ঠন আর এক হাতে লাঠি নিয়ে পাঁচিলের কাছে ছুটোছুটি করছে বিশুমালী। চেঁচিয়ে ওঠে বিশু—চোর! চোর!

তারপরেই বিশু আসে। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলে আর হাঁপায়—ধরতে পারা গেল

না। চোরটা নিমগাছের একটা ডাল ধরে উপরে উঠেছে, পাঁচিল টপকে ওদিকে পড়েছে, আর ভেগেছে।

অক্ষয়বাবু—কিছু নিতে পেরেছে?

বিশু—না।

ভোর হতে আর বেশি বাকি নেই। জেগেই বসে থাকেন অক্ষয়বাবু। আর ভোর হতেই ঘর ছেড়ে বাইরে এসে বাগানের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। সবার আগে মনে পড়ে, আজ তপতীর ফিরে আসবার কথা। সেই ট্রেনের আজ সকাল ন'টার আগেই গয়াতে পৌঁছে যাবার কথা।

বাগানে ঢুকেই সবার আগে চোখে পড়ে, বিশুমালী নিমগাছটার কাছে দাঁড়িয়ে কী যেন করছে।

বিশুকে অনেকবার বলেছেন অক্ষয়বাবু, তুমি নিমগাছ থেকে দাঁতন ভাঙবে না। বাড়ির সামনে সড়কের পাশে একটা নিমগাছ আছে, যত খুশি দাঁতন ওই গাছ থেকে ভেঙে আনতে পার।

—এই বিশু কেয়া হোতা হ্যায়। এগিয়ে যান অক্ষয়বাবু। এ কী কাণ্ড, নিমের মস্ত বড় আর শক্ত একটা ডাল ভেঙে ঝুলে রয়েছে। সেটাকেই হাত দিয়ে ঠেলাঠেলি করে একেবারে ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করছে বিশু।

বিশু বলে—চোর তোড় দিয়া। চোর পালিয়ে যাবার সময় নিমের এই ডাল ধরে লাফ দিয়ে পাঁচিলে উঠেছিল। চোরেরই শরীরের ভারে ভেঙে গিয়েছে এত বড় এই ডালটা।

সকাল আটটা বাজতেই অক্ষয়বাবুর স্টেশনে যাবার ব্যস্ততা স্তব্ধ হয়ে গেল। কারণ দুমকা থেকে একটা চিঠি এসেছে। তপতী লিখেছে, এখানে এরা আমাকে কিছুতেই ছাড়তে রাজী হচ্ছে না, বাবা। আরও সাতটা দিন থাকতে বলছে। আমার একটুও ভাল লাগছে না; আমি বড়জোর আর তিন-চারদিন এখানে থেকেই গয়া ফিরে যাব। আপনি চিন্তা করবেন না।

৩

সে চিঠির সাতদিন পরেও নয়, সাত মাস পরেও নয়, আজ প্রায় আট মাস হলো তপতী দুমকা থেকে গয়াতে ফিরে আসতে পারেনি। তবে তপতীর চিঠি এসেছে। প্রথম একমাসে তিনটে চিঠি, তারপর চার মাসে প্রতি মাসে একটা করে চিঠি, তারপর শেষ তিন মাসে মাত্র দুটো চিঠি।

চার মাসে আগেরও একটা চিঠিতে লিখেছিল তপতী—আমার ঘরের টেবিলে যে জিনিস যেখানে আছে, ঠিক সেখানেই যেন থাকে, মা। আমার চিঠি থাকে যে কাঠের বাক্সটাতে, একবার দেখবেন তো, সে বাক্সটার তালা ঠিক বন্ধ আছে কিনা। বাক্সটার উপরে কোন বাজে জিনিস যেন চাপিয়ে না রাখা হয়।

দু'মাস আগে তপতীর যে চিঠি এসেছে, তার অনেক কথার মধ্যে একটা ভাল কথাও আছে। —আমার শরীর ভাল, দুমকাতে শালবনের পাশে পাশে বেড়াবার খুব ভাল জায়গা আছে। গয়ার ফল্গুর মত অত চওড়া নয়, আমাদের দুমকার শালবনের কাছের নদীটা ছোট হলেও জলের বেশ স্রোত আছে। আপনিও রোজ নিয়ম করে একবার বাগানে নিশ্চয় বেড়াবেন, বাবা।

তপতীর শেষ চিঠির ভাষাটা যেন করুণ হয়ে ছটফট করছে। —আমি কবে যে এখান থেকে ছাড়া পেয়ে গয়াতে ফিরে যাব, কিছুই বুঝতে পারছি না, বাবা। আমাকে ক্ষমা করুন।

চিঠিটাকে হাতে ধরে নিয়ে অনেকক্ষণ নিজের মনেই বিড়বিড় করছিলেন অক্ষয়বাবু—আমিও যে কিছুই বুঝতে পারছি না। কী ক্ষমা করবো?

তপতীর শেষ চিঠির উত্তর তো দেওয়াই হয়েছিল—যাই হোক, তুমি আর দেরী করো না তপতী। এবার চেষ্টা করে চলে এস। বুঝতেই তো পারছো, এখানে আমাদের শূন্য হয়ে থাকতে কত খারাপ লাগছে।

কিন্তু তপতীর চিঠি আর আসে না। আসছেও না।

কিন্তু তপতী আজও হঠাৎ যদি ফিরে আসে, তবে দেখতেই পাবে যে, তার ঘরের কোন জিনিসের এই আট মাসে একটুও নড়চড় হয়নি। সেই বিছানাও তেমনই পাতা হয়ে রয়েছে। সুচারু নিজে একবার ঘরে ঢুকে পালক-ঝাড়ু বুলিয়ে বিছানা থেকে ধুলো সরিয়ে দিয়ে যান। টেবিলের উপরে তপতীর সব জিনিস, সবই ঠিক আছে। চুল বাঁধবার একটা ফিতেকে ভুল করে টেবিলের উপরে ফেলে রেখেছিল তপতী—সেই ফিতেটাও ঠিক সেই টেবিলের এক কোণে পড়ে আছে।

অক্ষয়বাবুর শরীরটাও বড় ক্লান্ত। একবার চেয়ারে বসে পড়লে আর সহজে উঠতে চান না। সামান্য একটা শব্দ শুনলে চমকে ওঠেন, বাড়ির সামনের সড়কে কিছু একটা নড়েচড়ে উঠলেই চোখ দুটো বড় হয়ে তাকায়।

মাঝে মাঝে বাগানে বেড়িয়েও আসেন। হয় সকালে, নয় বিকালে, কিংবা সন্ধ্যায়। কিন্তু খুবই আনমনার মত ঘুরে বেড়ান অক্ষয়বাবু। ডালিম ফুল ফুটেছে, কিন্তু চোখে পড়ে না। কত গাজিপুরী গোলাপের কুঁড়ি কতবার ফুটে উঠলো, কিন্তু দেখবার জন্যে দু'চোখ অপলক করে আর এগিয়ে যেতে পারেন না।

কিন্তু এ কী? একদিন হঠাৎ নিমগাছটার কাছে থমকে দাঁড়ালেন অক্ষয়বাবু। এটা তো বৈশাখ মাস, নিমের মাথা তো এত নেড়া হয়ে থাকবার কথা নয়। নিমের পাতা গেল কোথায়? শুকনো হয়ে ঝরেই গিয়েছে?, না এই ফাল্গুনে গাছে নতুন পাতা ধরেইনি?

—ও বিশু? রাতের পাখিটা আজকাল ঘুমোতে আসে না?

বিশু হাসে—না। গাছে যদি ভাল করে পাতা ধরে তবে আবার আসতে পারে।

নিমের নেড়া নেড়া ডালগুলি ঝড়ের আভাসে আর দোলে না; শুধু নড়বড় করে। আষাঢ় মাসের প্রথম তিনদিন খুব বৃষ্টি হয়ে গেল, তবু ওই নিমের গায়ে কোন নতুন পাতার সবুজ ছিটেও ফুটে উঠলো না।

আষাঢ়ের আরও কয়েকটা দিন পার হয়ে গেল। একদিন সকালবেলা খুব কড়া রোদের আলোতে সারা বাগান ভরে গেল। সেদিন বিকেলে বাগানে বেড়াতে গিয়ে চমকে উঠলেন অক্ষয়বাবু। দেখলেন নিমটার বুকে একটা গজাল বিঁধে রয়েছে।

কে করলে এই কাণ্ডটা? বিশুমালীকে জিজ্ঞেস করতেই বুঝতে পারলেন অক্ষয়বাবু, এটা বিশুমালীরই একটা দরকারের গজাল। কাপড় শুকোতে দেবার জন্য দড়ি টানাতে হবে, তাই নিমগাছটার বুকে ওই গজাল পুঁতে দিয়েছে বিশু।

অক্ষয়বাবু বলেন—গাছটাতে গজাল না পুঁতলে কি চলতো না?

বিশু বলে—এ গাছে আর কোন জোর নেই, বাবু।

—কেন?

—গাছের শিকড় ইঁদুরে কুরে দিয়েছে।

—কোথায় ইঁদুর?

—সে কি আর চোখে দেখতে পাবেন? মাটির তলায় ইঁদুরের রাস্তা আছে। পাঁচিলের ওদিক থেকে ইঁদুর এদিকে এসে গাছের শিকড় কুরে দিয়ে চলে যায়।

—বাঃ, খুব অদ্ভুত ব্যাপার। বলতে বলতে চলে যান অক্ষয়বাবু। আর বাগানে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করে না। আর বেড়িয়ে দেখবারই বা কী আছে? সেই তো যত পেয়ারা আতা আর ডালিম। ঠাসাঠাসি একগাদা সূর্যমুখীর গায়ের উপর ফড়িং উড়ছে। মুলোর ক্ষেতের জলে ব্যাঙ লাফিয়ে বেড়ায়।

কয়েকদিন পরে একদিন দেখলেন, শুকনো মরা নিমগাছটার ধড়টা আর নেই। বিশুমালী গাছটাকে কেটে আর চেলা করে রেখে দিয়েছে। গাদা করে রাখা নিমের চেলার উপর গিরগিটি ঘুরছে।

বিকেলের রোদ মরে গিয়ে আবার মেঘ ঘনিয়ে উঠতেই বিশুমালী তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে নিমের ওই চেলাকাঠের গাদা ঝুড়িতে তুলে তুলে সরিয়ে দিল, রান্নাঘরের চালার নীচে জড়ো করে রেখে দিল।

না, সেই নিমের আর কোন চিহ্ন রইল না। যেখানে নিমটা দাঁড়িয়েছিল, সেখানে এখন কাঁচা মাটি ফুলে ফুলে রয়েছে। রাতের পাখিটা যদি কোন সন্ধ্যায় ফিরেও আসে, তবে একটা নিশ্চিহ্ন স্মৃতির শূন্যতা দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে চলে যাবে।

ভিতরের বারান্দার চেয়ারে চুপ করে বসে বিকেলের আকাশের মেঘের দিকে একবার তাকালেন অক্ষয়বাবু। তারপর ডাকলেন—পঞ্জিকাটা একবার দিয়ে যাও তো, সুচারু।

কে জানে পঞ্জিকা খুলে কী দেখলেন, আর কী খুঁজে বার করলেন অক্ষয়বাবু। কিন্তু পঞ্জিকাটাকে হাতেই ধরে রাখলেন। সন্ধ্যা হলো, তবু ওভাবে অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর চমকে উঠলেন—তারপর উঠে দাঁড়ালেন। —বাঃ বেশ সুন্দর বাঁশি বাজছে। বাজাচ্ছে কারা?

নিকটে নয়, অনেক দূরে, বোধহয় ফল্গুর ধারে গয়লাদের কোন বস্তিতে বাঁশি বাজছে। মেঘলা রাতের ভিজে বাতাসে ভেসে ভেসে সেই বাঁশির শব্দ যেন আরও মিষ্টি হয়ে গিয়েছে।

অনেক রাতে বিছানাতে শুয়ে পড়ে থাকলেও ঘুমোতে পারেন না অক্ষয়বাবু। মাথায় পাখার বাতাস দিয়ে সুচারু বলেন—আজ হঠাৎ এরকম করছো কেন?

অক্ষয়বাবু হাসতে চেষ্টা করেন—কিছু না। শুধু ভাবছি, আজ রাতে গোয়ালাদের বস্তির বাঁশির শব্দটাকে শুনতে এত ভাল লাগল কেন?

ভোরের দিকে ঘুমিয়েই পড়লেন অক্ষয়বাবু। কিন্তু সকাল হতেই ধড়ফড় করে জেগে উঠলেন। ভিতরের বারান্দায় এসে চেয়ারের উপর বসে পড়লেন।

চোখে পড়ে অক্ষয়বাবুর, বাগানের পাঁচিলের ওখানে, যেখানে নিমগাছটা ছিল, ঠিক সেখানে কাঁচা মাটির উপর হাত চালিয়ে কাজ করছে বিশুমালী।

হ্যাঁ, সেখানে একটা বাতাবীলেবুর চারা পুঁতে ফেলেছে বিশু। বিশুর কাছে একটা জলভরা মাটির ঘট। সেই ঘট থেকে জল তুলে নিয়ে গাছের গোড়ায় দু'চার বার ছিটিয়ে দিল বিশু। তারপর হাত ধুয়ে ফেললো।

অক্ষয়বাবু ডাকেন—শোন, সুচারু।

সুচারু—বল।

অক্ষয়বাবু—মেয়ে আর আসবে না।

চমকে ওঠেন সুচারু—কেন?

অক্ষয়বাবু হাসেন—মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

সুচারু—কে বললে?

অক্ষয়বাবু—এই তো পঞ্জিকাটা এখানেই রয়েছে, একবার দেখে নিলেই পার

শেষ প্রহর

শেষ রাতের অন্ধকার যখন ফিকে হয়ে আসতে আরম্ভ করে, আর কদম গাছের মাথার উপর খড়-কুটোর নড়বড়ে বাসার ভিতরে ঘুমভাঙা দাঁড়কাকের ডানা ফরফর করে, ঠিক সেই সময় লেভেল ক্রসিং-এর নিঝুম তন্দ্রাও যেন হঠাৎ ভেঙে যায়। লেভেল ক্রসিং-এর চৌকিদার বুধন বার বার কাশে, গুমটির ভিতরে টুং টুং করে একটানা স্বরে একটা ঘন্টির মৃদু মুখরতা বাজতে থাকে। ঝনঝন করে দুবার শব্দ হয়। লেভেল ক্রসিং-এর গেট বন্ধ করে দেয় বুধন।

শেষ রাতের আকাশে চাঁদ থাকলে ঢাকুরিয়া লেকের বুকজোড়া কুয়াশার স্তূপ দেখতে পাওয়া যায়। আর দেখা যায়, ডায়মণ্ড হারবার থেকে ছুটে আসছে যে ট্রেনটা তারই ইঞ্জিনের চোখ দুটো জ্বলে উঠেছে ডিসট্যান্ট সিগন্যালের কাছে, লাইনটা যেখানে একটু বেঁকে ডানদিকের নারকেলের সারির আড়ালে সরে গিয়েছে।

লাইনের পাশে পাশে দ্রুত হেঁটে পথ চলতে থাকে ঢাকুরিয়ার প্রভাত রায়। কারখানার বাঁশি বাজবার আগেই তাকে কারখানার ফটকে পৌঁছে যেতে হবে। কাজেই বেশ একটু তাড়াতাড়ি, প্রায় হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে হয়। কারখানাটাও তো নিকটে নয়। বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ধরে সোজা হাঁটা দিয়ে যদি ভোর পাঁচটার মধ্যে রসা রোডের মোড়ে এসে দাঁড়াতে পারে প্রভাত, তবেই কারখানার বাসটাকে ধরতে পারা যায়। কলকাতার দক্ষিণ দিক থেকে কর্মী কুড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য কারখানার এই বাসটা ঠিক ভোর পাঁচটার সময় এই মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, পাঁচটা বেজে গেলে আর পাঁচ মিনিটও দেরি করে না। আর, ঠিক ছ'টার সময় হাওড়ার সেই কারখানায়, সেই মেটাল ওয়ার্কশপের কলের বাঁশি বেজে ওঠে। কাজেই, যদি ফোরম্যান প্রভাত রায়ের কাজে আসতে দেরি হয়, তবে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে সব মেকানিক, কাজ চালু হতেই দেরি হয়ে যাবে। তাই এইভাবে শেষ রাতের আবছা অন্ধকারে প্রায় হন্তদন্ত হয়ে পথ চলতে থাকে প্রভাত রায়।

প্রত্যেক শেষ রাতে শুধু আবছা অন্ধকার গায়ে মেখে পথ চলতে হয়, তা নয়। লেভেল ক্রসিং-এর পাশ কাটিয়ে আর একটু দূর এগিয়ে গেলে লাইনের পাশে সেই কলমীদলে ঢাকা পুকুরটাকে দেখতে পাওয়া যায়। কোন কোন শেষ-রাত চাঁদ থাকে আকাশে, পুকুরের বুকের আধ-ফোটা লাল শালুকের লাল রঙটুকুও চিনতে পারা যায়। জোনাকিগুলো কদম গাছের মাথার উপরে আর থাকে না। অন্ধকার খুঁজতে গিয়ে লাইনের পাশে এই আলোকলতার ঝোপের ভিতরে ঢুকে ঝিকঝিক করে। ঐ সজনে গাছটার পায়ের কাছে একটা মাইল স্টোন। ছড়িয়ে পড়ে আছে হিমে ভেজা

সজনের ফুল। একবার থামে প্রভাত, সিগারেট ধরায়, তারপরেই আবার পথ চলতে থাকে।

সেদিন সিগারেট ধরাতে গিয়ে চমকে উঠলো প্রভাত। শেষ রাতের চাঁদ তখনো ডুবে যায়নি, তাই দেশলাই না জ্বালিয়েও দেখতে পায় প্রভাত, মাইল স্টোনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি মূর্তি।

—কে?

প্রভাতের আচমকা প্রশ্নে চমকে উঠেই সেই মূর্তি মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকায়। মূর্তির কানের দুলের পাথর ঝিক করে চমকে ওঠে, শেষ রাতের জ্যোৎস্না যেন হঠাৎ ছোট একটা বিদ্যুৎ ঝিলিক হয়ে ঝলসে উঠেছে সেই মূর্তির কানের কাছে। দু'পা পিছনে সরে গিয়ে আবার অন্যদিকে মুখ ঘোরায় সেই মূর্তি। মূর্তির পিঠের উপর ডবল বেণীর দোলা যেন একবার ছটফটিয়ে ওঠে, তারপরেই স্তব্ধ হয়ে যায়।

মুখটা স্পষ্ট দেখা যায়, দেখতে পেলেও হয়তো স্পষ্ট কিছু বোঝা যাবে না, সে নারীর মুখের রূপ কেমন এবং মুখের ভাবই বা কি রকম? কেন, কি উদ্দেশ্যে, কোন্ মতলবে, শেষ-রাতের এই স্তব্ধতার মধ্যে রেল লাইনের পাশে এই নিভৃতে এসে একা দাঁড়িয়ে আছে গোপনচারিণী রহস্যময়ীর মত এই নারী?

হিমে ভেজা আর ধুলোমাখা সজনের ফুলের রাশের উপর লুটিয়ে পড়েছে তার শাড়ির আঁচল। গলায় একটা কম্ফোর্টার জড়ানো, পায়ে স্যাণ্ডেল আছে। সন্দেহ করে, আশ্চর্য হয়, ভয়ও পায় প্রভাত।

ডায়মণ্ড হারবারের ট্রেন শব্দের শিহর তুলে ছুটে আসছে। কাঁপছে কঠিন লোহার লাইন। ইঞ্জিনের জ্বলন্ত চক্ষুর আলোক লাইনের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। নারীর মূর্তি ছটফট করে ওঠে। তারপরেই, যেন অন্ধ মাতালের মত মত্ত হয়ে ঝাঁপ দিয়ে লাইনের কাছে এগিয়ে আসে। লাইনের নুড়ি ছড়ানো পথের উপর উঠে ছুটতে থাকে সেই নারীর মূর্তি। তারের বাধায় পা জড়িয়ে যায়, ভাঙা স্লিপারে হোঁচট লেগে পড়ে যায়, কিন্তু উঠেই আবার যেন মরিয়া হয়ে একরোখা পাগলের মত ইঞ্জিনের জ্বলন্ত চক্ষুর দিকে ছুটতে থাকে। ডবণ বেণী ভেঙে ছড়িয়ে যায়, আঁচল ছিঁড়ে যায়। গলার কম্ফোর্টার মরা সাপের মত ঝুলতে ও দুলতে থাকে, পায়ের একটা স্যাণ্ডেল খসে পড়ে যায়। ভ্রূক্ষেপ নেই, ভাবনা নেই, পিছু ফিরে তাকায় না, ছুটে যেতে থাকে একটা উদ্‌ভ্রান্তের মূর্তি।

আর এক মূহূর্তও দেরী করে না প্রভাত। অনেকবার হাফ-মাইল দৌড়ের খেলায় ফার্স্ট হবার অভিজ্ঞতা আছে ফোরম্যান প্রভাত রায়ের যে দুই পায়ে, সেই পা দু'টোও হঠাৎ ছুটতে থাকে। ইঞ্জিনের জ্বলন্ত চক্ষু তখন সেই অপরিচিতার ছায়ার একেবারে নিকটে এসে পড়েছে। পিছন থেকে ছুটে এসে একটি লাফ দিয়ে অপরিচিতার সামনে দাঁড়ায় প্রভাত। পরমুহূর্তে সেই অপরিচিতার উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তিকে দুটি কঠিন বাহুর বন্ধনে বন্দী করে বুকের উপর তুলে ধরে প্রভাত, আর একটা লাফ দিয়ে সরে গিয়ে লাইনের পাশে এসে দাঁড়ায়।

লাইনের পাশে ঠাণ্ডা মাটির নিরাপদ ধুলোর উপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে প্রভাত। যেন লেভেল ক্রসিং-এর লোহার গেটের গরাদের মত কঠোর দু'টি হাতের বেড়া দিয়ে অতি কঠিন এক অবরোধ রচনা করে রাখে প্রভাত। গোপনচারিণী সেই অপরিচিতার শরীর বৃথা ছটফট করে। ফোরম্যান প্রভাত রায়ের দুই হাতের কঠিন বন্ধন তবু বিন্দুমাত্রও শিথিল হয় না। নারীর একটি হাত শুধু হিংস্র হয়ে এলোমেলো আঘাত ছড়াতে থাকে, যেন একটা নির্মম দস্যুর প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে

একটা দুর্বল অসহায়তার আঘাত। প্রভাত রায়ের গলার টাই ছিঁড়ে যায়, চশমার একটি কাচ ভেঙে যায়, কিন্তু বিচলিত হয় না প্রভাত রায়ের প্রতিজ্ঞা। ডায়মণ্ড হারবারের ট্রেনের শেষ চাকা শব্দের শেষ শিহর গড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। আবার নীরব হয় শেষ রাতের শেষ প্রহর। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে নারী। ধীরে ধীরে তার শেষ কঠিন বাহুর বন্ধন শিথিল করে প্রভাত রায়ও হাঁপ ছাড়ে।

ঠাণ্ডা ধুলোর উপর দাঁড়িয়ে অপরিচিতার শরীর যেন আর একবার শিউরে ওঠে। চোখের উপর আঁচল চাপা দেয় নারী। দেখতে পায় প্রভাত অপরিচিতার সেই করুণ মুখ, যা সত্যই বেশ সুন্দর একটি মুখ।

অপরিচিতা মুখ তুলে তাকায় না, এবং অপরিচিত এক পুরুষের এই সান্নিধ্যের বিরুদ্ধে আর সেরকম বিদ্রোহও করে ওঠে না। যেন এতক্ষণে একেবারে অসহায় হয়ে গিয়েছে অপরিচিতার জীবনের অতিসাধের এক প্রতিজ্ঞা। কিন্তু চমকে ওঠে প্রভাত রায়েরই এতক্ষণের বিস্মিত ও বিব্রত কৌতূহল। এই অপরিচিতা তো নিতান্ত অপরিচিতা নয়। এই মেয়ে তো সেই মেয়ে, প্রভাতেরই বোন হেনার বান্ধবী, কি যেন মেয়েটির নাম? প্রীতি, বাসুদেব সরকারের মেয়ে প্রীতি সরকার। কিন্তু সত্যই কি তাই? বিশ্বাস হয় না। এ নিশ্চয় প্রীতির মতই দেখতে আর একজন কেউ। নইলে, কি আশ্চর্য, প্রীতির মত মেয়ে কেন আসবে, এই শেষ রাতের শেষ প্রহরে, এই বিশ্রী নিভৃতে রেল লাইনের উপর পড়ে আত্মহত্যা করার জন্য? ঢাকুরিয়ার ঐ পাড়াতে সত্যই সুখের জীবন বলতে যদি কোন মেয়ের থেকে থাকে, তবে একমাত্র প্রীতি সরকারেরই আছে। দেখতে ভাল, লেখাপড়ায় ভাল, গানে নাচেও বা কম কি যায়?

আর একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে যায় প্রভাতের, এই তো ক'দিন আগে হেনাই খুশি হয়ে বলেছিল সেই কথা। প্রীতির বিয়েরও আর বেশি দিন বাকি নেই। সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে আছে। পাত্র ঠিক আছে, বিয়ের দিন পর্যন্ত ঠিক হয়ে আছে। মনে পড়তে প্রভাতের মনের বিস্ময় আর একবার চমকে ওঠে। সত্যই রহস্য। বোঝা যায় না, কেন এবং কিসের জন্য, ঠিক যে সময়ের সংসারের এত সুন্দর একটা ইচ্ছা এসে প্রীতিকে আপন করে নেবার জন্য তৈরি হলো, ঠিক সেই সময়ে প্রীতির জীবনে এমন কোন্ বেদনার অভিশাপ এসে লাগলো যে, জীবনটাকে একটা অপমৃত্যুর পায়ের তলায় ফেলে চূর্ণ হয়ে যাবার জন্য এখানে ছুটে এসেছে প্রীতি?

—আপনাকে আমি চিনি, তার মানে চেনা-চেনা বলে মনে হচ্ছে। কুণ্ঠিতভাবে প্র[illegible] করে তাকিয়ে থাকে প্রভাত। কিন্তু চমকে ওঠে অপরিচিতার আঁচলধরা হাত। চোখের ওপর থেকে আঁচল সরিয়ে প্রভাতের মুখের দিকে সন্ত্রস্তের মত তাকায় অপরিচিতা। তারপরেই ক্ষুব্ধভাবে বলে—মিথ্যা কথা বলবেন না। চলে যান এখুনি।

প্রভাতও রূঢ়ভাবে বলে—চলে তো যাবই, কিন্তু যাবার আগে আপনার একটা গতি করে দিয়ে যেতে হবে তো?

—কি বলছেন আপনি?

—বলছি, আপনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন, আমি বাধা দিয়েছি বলে সে-কাজ করতে পারেননি। পুলিসকে আর গার্জেনকে এ কথা জানাতে হবে।

—জানান গিয়ে।

—আপনাকে যে সঙ্গে যেতে হবে।

—কখ্খনো না।

—তাহলে আমিও আপনাকে এভাবে এখানে রেখে এখন চলে যেতে পারি না।

পাগলের মত কিছুক্ষণ অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে, তারপর চিৎকার করে ওঠে সেই ডবল বেণীর মেয়ে।—তাহলে আপনারই বিপদ হবে। পুলিসের কাছে আমি মিথ্যে কথা বলবো। বলবো, আপনি আমাকে খুন করবার চেষ্টা করেছিলেন।

হেসে ফেলে প্রভাত।—তা বলবেন, আপনার মিথ্যে কথায় যদি আমার বিপদ হয় তো হবে।

সঙ্গে সঙ্গে, যেন অসহায় শিশুর মত হঠাৎ ভয় পেয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে অপরিচিতা—আপনি না বুঝে-সুঝে মিথ্যে কেন দয়া দেখাচ্ছেন? যদি আমার ভাল চান তবে আমাকে এখানে থাকতে দিন, আর আপনি চলে যান।

কদমগাছের মাথার উপর কাকের কলরব জেগে উঠছে। অনেক ফিকে হয়ে এসেছে শেষ রাতের আবছায়ার রূপ। অপরিচিতার সেই জলভরা চোখের করুণতা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। এ যে সত্যিই প্রীতি সরকার।

প্রভাত বলে—আমি ঠিকই চিনেছি, আপনি প্রীতি সরকার।

প্রীতি সরকার আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকতে গিয়ে প্রভাতের মুখের দিকে চকিতে একবার তাকায়। ভীতভাবে প্রশ্নও করে—কিন্তু আপনাকে তো আমি চিনি না।

প্রভাত—আমাকে না চিনলেও পরিচয় বললে আমাকে চিনতে পারবেন। আমি হেনার দাদা, প্রভাত।

আঁচলে মুখ ঢাকা দিয়ে আর একবার নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে প্রীতি সরকার। কান্না চাপতে চেষ্টা করে প্রীতি, তাই কতগুলি ভাঙা ভাঙা নিঃশ্বাসের বেদনা শুধু আঁচলের চাপার আড়ালে ফোঁপাতে থাকে। দেখে মনে হয়, প্রীতি সরকারের জীবনের বিদ্রোহ হঠাৎ এভাবে একজনের কাছে ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জিত হয়েছে। সে লজ্জা সহ্য করা যায় না, সে লজ্জার বেদনা বিদ্রূপেরই মত।

প্রভাত বলে—দুঃখ করো না, লজ্জিত হবারও কিছু নেই। শুধু বিশ্বাস কর, তুমি ভয়ংকর একটা ভুল করতে চলেছিলে। ভাগ্য ভাল যে, সে ভুল করবার সুযোগ তুমি পেলে না।

প্রীতি সরকার তেমনই আঁচলের চাপার আড়ালে চোখ-মুখ লুকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আবার ফুঁপিয়ে ওঠে—আমার না মরে উপায় নেই।

প্রভাত বলে—ছিঃ, ওকথা বলতে নেই।

প্রীতি—বড় অপমান আর বড় জ্বালা। আপনি মেয়ে হলে বুঝতেন, এই অপমান আর জ্বালা কত দুঃসহ।

প্রভাত—যতই দুঃসহ হোক, সে অপমান আর জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তুমি তোমার নিজের প্রাণটাকে খুন করতে পার না। সে অধিকার তোমার নেই।

প্রীতি—তার মানে?

প্রভাত—ধর, আমি যদি সেই পথে আজ না আসতাম, আর তুমি যে ভয়ংকর কাণ্ড করতে চলেছিলে, সেটা যদি সত্যই হয়ে যেত, তবে কতজনের জীবনে তুমি দুঃখ দিয়ে যেতে, সেটা বুঝে দেখ।

প্রীতি—আমি মরলে কে দুঃখ পাবে?

প্রভাত—এটা আবার কেমন কথা বললে প্রীতি? যাঁরা তোমাকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসে, তোমার বাবা, মা ও যাঁরা আছেন, তাঁদের জীবনে কত বড় দুঃখের ব্যাপার হতো বলো তো?

প্রীতি—কিন্তু একজনের জীবনে খুবই সুখের ব্যাপার হতো।

প্রভাত আশ্চর্য হয়।—তার মানে?

প্রীতি—তিনিও নিজের প্রাণের চেয়ে আমাকে বেশি ভালবাসতেন। তিন বছর ধরে তাঁর মুখ থেকে এই কথা শুনে আসছি।

প্রভাতের কণ্ঠস্বর হঠাৎ যেন সমবেদনার ছোঁয়ায় একটু বিচলিত হয়—তারপর কি ব্যাপার হলো? তিনি আজ কোথায়?

হেসে ওঠে প্রীতি—তিনি আছেন, বেশ ভালই আছেন, আজই মাঝরাতের এক শুভলগ্নে তিনি তাঁর জীবনের এক বাঞ্ছিতাকে বিয়ে করেছেন।

—এই ব্যাপার। তাই বলো। এতক্ষণে সব রহস্যের অর্থ বুঝতে পেরে হাঁফ ছাড়ে প্রভাত। ছলছল করে প্রীতি সরকারের চোখ।

প্রীতি বলে—আপনি জানেন না, কিন্তু আপনার বোন হেনা জানে, আজকের রাতের এক শুভলগ্নে তার সঙ্গে আমারই বিয়ের ব্যবস্থা ঠিক হয়েছিল।

সমবেদনা ছায়া ভাসে প্রভাতের চোখে। কিন্তু তিনি এরকম একটা কি ব্যাপার করলেন কেন?

প্রীতি—ভগবান জানেন।

প্রভাত—তুমি কোন অন্যায় করেছিলে?

প্রীতি—আমার তো মনে পড়ে না, কোনদিন ভুলেও তার মনে কোনও দুঃখ দিয়েছি। বরং, তিন বছর ধরে শুধু ভেবেছি, কবে তার জীবনের আপন হয়ে যেতে পারবো, কবে সে আমাকে তার কাছে ডাকবে!

প্রভাত বলে—দুঃখ করো না প্রীতি। বাড়ি যাও এখন, চলো তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

কথা বলতে গিয়ে প্রভাতের গলার স্বর যেন আচমকা একটু কেঁপে উঠেই শান্ত হয়ে যায়। প্রভাতের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রীতিও যেন আচমকা একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। প্রীতি বলে—আমার দুর্ভাগ্যের কথা শুনে আপনি কেন দুঃখ করছেন প্রভাতবাবু? আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার জন্যে আপনাকেও অনেক ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে হলো।

প্রভাত—তোমাকে উপদেশ দেবার অধিকার আমার নেই, তবু তুমি আমার একটা কথা শোন।

প্রীতি—বলুন।

প্রভাত—কথা দাও আমার কথা রাখবে।

প্রীতি—রাখবো।

প্রভাত —হয় এই দুঃখকে সহ্য কর, নয় ভুলে যেতে চেষ্টা কর। কিন্তু কোন দিন আর এই রকম ভয়ানক অন্যায় করতে চেষ্টা করবে না। পৃথিবীর কত মানুষ এর চেয়ে কত বেশী অপমান আর দুঃখ সহ্য করেও বেঁচে থাকে, তোমাকেও বেঁচে থাকতে হবে।

প্রীতি—কিন্তু আমি যে তার কথা ভুলতে পারি না প্রভাতবাবু।

প্রভাত—ভুলতে বলছি না।

প্রীতি—তবে কি বলছেন?

প্রভাত—তাঁর ওপরে রাগ করে তুমি আত্মহত্যা করতে পার না। তোমার জীবনের দাম এত তুচ্ছ নয়। একজনের ভালবাসা জীবনে পেলে না বলে তুমি আর পাঁচজনের ভালবাসা তুচ্ছ করতে পার না।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে প্রীতি। কদমগাছেব মাথায় পূব আকাশের আভা ছড়িয়ে পড়ে। ব্যস্ত হয়ে প্রভাত বলে—আমার অনেক দেরি হয়ে গেল প্রীতি, তুমি আর আমাকে ভুগিও না।

প্রীতি—আমি যাচ্ছি। আপনার কাজে যান।

চলে যাচ্ছিল প্রীতি—প্রভাতই হঠাৎ বলে ওঠে। —তুমি কথা না দিয়ে যেতে পারবে না।

থমকে দাঁড়ায় প্রীতি। দেখে আবার আশ্চর্য হয়, একটা মানুষ ভোরের প্রথম আলোর মত তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। একটা মেয়ের অপমানের সব দুঃসহ দুঃখকে বুঝতে পেরে দুঃখিত হয়েছে। কথা চাইছে। প্রীতি সরকার সত্যই বেঁচে থাকবে, এই আশ্বাস না পেয়ে চলে যেতে পারছে না। মনে পড়ে প্রীতির, হেনারই মুখে শুনেছে, হেনার দাদার কথা। কারখানার ফোরম্যান, লোহা-লক্কর ঘাঁটে, কিন্তু মনটা বড় নরম। একটা অন্ধ হোঁচট খেয়ে ড্রেনের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল, তাই দেখে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছিল হেনার দাদা। এই প্রভাতবাবুই তো হেনার সেই দাদা।

প্রীতির নীরবতা দেখে আরো উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে প্রভাতের চোখের দৃষ্টি। প্রভাত বলে—আমিও কথা দিচ্ছি, আজকের ব্যাপার কেউ জানতে পারবে না। কারও কাছে আমি ভুলেও গল্প করবো না যে, তুমি আজ ট্রেনের চাকার তলায় প্রাণ দিতে এসেছিলে। আজকের ঘটনার জন্য তুমিও কোন লজ্জা বা দুঃখ বা রাগ মনে রেখ না। কিন্তু কথা দাও, আর কখনও এরকম কাণ্ড করতে আসবে না।

শান্তস্বরে, ধীরে ধীরে, প্রভাতের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে প্রীতি বলে—না, আর না, আর আমি এই ভুল করবো না আপনি বিশ্বাস করুন।

প্রভাত—বিশ্বাস করলাম। চলো তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

ঢাকুরিয়া লেকের কুয়াশার উপর রোদের আভাস পড়েছে। তাল নারকেল আর সুপারির ছায়ায় ঘেরা এক একটা ঘুমন্ত পাড়ার প্রাণ এতক্ষণে সাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে। আর একটা ট্রেন আসছে। তীব্র স্বরে বাষ্পের বাঁশি বাজিয়ে ছুটে চলে গেল ভোরের প্রথম প্যাসেঞ্জার। রেল লাইনের পাশের সরু পথ ধরে আস্তে আস্তে হেঁটে ফিরে যেতে থাকে প্রীতি সরকার। সঙ্গে প্রভাত রায়।

লেভেল ক্রসিং পার হয়ে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই থমকে দাঁড়ায় প্রীতি—এইবার আপনি আপনার কাজে চলে যান প্রভাতবাবু।

প্রভাত—চল, তোমাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

চমকে ওঠে, ভয় পায় প্রীতি। —আঃ, আপনি বোঝেন না কেন? আপনি কি আমাকে আর একটা বিপদে ফেলতে চান?

প্রভাত বিস্মিত হয়। —বিপদ!

প্রীতি—এই ভোরে আমাকে এভাবে আপনার সঙ্গে যেতে দেখলে মানুষগুলি কি মনে করবে

বুঝতে পারছেন না কেন?

ভয় পায় প্রভাত।—মনে করবে? কি মনে করবে?

প্রীতি—ঐ দেখুন, কারা যেন আসছে। দোহাই আপনার, পায়ে পড়ি আপনার, আপনি এখুনি চলে যান প্রভাতবাবু।

প্রভাত—আমি না হয় চলে গেলাম, কিন্তু তোমাকে তো ওরা দেখে ফেলবে।

প্রীতি—একা আমাকে দেখে ফেলুক, আমি মিথ্যে কথা বলবো, ওরা তাই বিশ্বাসও করবে। কিন্তু আপনি সঙ্গে থাকলে আমার কোন মিথ্যে কথাই ওরা বিশ্বাস করবে না।

হতভম্বের মত তাকিয়ে প্রীতির এই অদ্ভুত প্রলাপের অর্থ বুঝতে চেষ্টা করে প্রভাত। প্রীতি বলে—যান, যান, যান। আর একটুও দেরি করবেন না। আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, আমার মান বাঁচান।

একটা লাফ দিয়ে আতঙ্কিতের মত সরে যায় প্রভাত। তারপর হন হন করে রেল লাইনের পাশে পাশে সরু পথ ধরে প্রায় ছুটে চলে যেতে থাকে।

এলোমেলো শাড়ির আঁচলটাকে ভাল করে গায়ে জড়ায় প্রীতি। ডবল বেণীর এলোমেলো আর ভাঙা বাঁধুনি ভাল করে ভেঙে দিয়ে তাড়াতাড়ি একটা খোঁপা বেঁধে ফেলে। তারপর আরও তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলতে থাকে।

বাড়ির বারান্দার উপর এসে উঠে যখন হাঁফ ছাড়ে প্রীতি, তখন বারান্দার সিঁড়িতে পূব-আকাশের আলো এসে পড়েছে। জেগে উঠে বসে আছেন প্রীতির বাবা বাসুদেব সরকার—ক্লান্ত শরীরকে একটা চেয়ারের উপর এলিয়ে দিয়ে। প্রীতি বসে পড়তেই প্রশ্ন করেন বাসুদেববাবু—এত ভোরে কোথায় গিয়েছিলি রে?

প্রীতি হাসে—রেল লাইনের ধারে একটু বেড়িয়ে এলাম।

খবরের কাগজের আশায় পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন বাসুদেববাবু, এখনও কাগজের কোন হকারের সাড়া জাগেনি পথের উপর। গলার কম্ফোর্টার খুলে ফেলতেই দেখতে পায় প্রীতি, কয়েকটা ফুল ঝরে পড়লো বারান্দার উপর। আশ্চর্য, কম্ফোর্টারের ভাঁজে এতগুলি ফুল কেমন করে এতক্ষণ ধরে লুকিয়েছিল?

বাসুদেববাবু—ওগুলি কিসের ফুল রে প্রীতি?

প্রীতি—সজনে ফুল।

খবরের কাগজের হকার এসে বারান্দায় ওঠে। খবরের কাজের পাতার দিকে তাকিয়ে থাকেন বাসুদেববাবু। আর, প্রীতি তাকিয়ে থাকে সেই তুচ্ছ সজনে ফুলের দিকে। শেষ রাতের শেষ প্রহরের একটা অদ্ভুত ঘটনার উপহারের মত কয়েকটা সাদা ফুল।

প্রীতির চোখ দুটো হঠাৎ ছটফট করে ওঠে। বাসুদেববাবুর দিকে একবার চকিতে তাকিয়ে নেয় প্রীতি। তারপরেই ফুলগুলিকে মেঝের উপর থেকে তুলে নিয়ে ঘরের ভিতরে চলে যায়।

হেনার দাদার কাছে কথা দিলেই বা কি আসে যায়? ভালবাসার অপমান ভুলতে পারে না প্রীতি। সহ্য করতেও পারে না। বার বার মনে পড়ে, একটি মানুষের হাসিভরা মুখের ছবি, যে মুখের কোন হাসি আর কোন ভাষাকে জীবনে অবিশ্বাস করেনি প্রীতি। কিন্তু কে জানতো, সেই সব হাসি

আর ভাষা শুধু একটা অভিনয়? সেই মানুষই আজ পৃথিবীর কোন্ এক রূপের মেয়েকে বিয়ে করে সুখী হয়ে রয়েছে। প্রীতি জানে সে খবর, বিয়ের পর জীবনসঙ্গিনীকে সঙ্গে নিয়ে রাঁচি বেড়াতে গিয়েছে অতীশ। সরকারী অফিসার অতীশের পদোন্নতিও হয়েছে। সে আজ ন'শো টাকা মাইনের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট। অতীশের মা নিজেই পাঁচ পাড়া ঘুরে ঘরে ঘরে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, বড় লক্ষ্মী বউ তাঁর ঘরে এসেছে, আসা মাত্র ছেলের পদোন্নতি হয়েছে।

হ্যাঁ, কল্পনা করলে আরও অনেক কিছু বুঝতে পারে প্রীতি। অতীশ বসু নামে সেই ভদ্রলোকের সুখের এবং সাধেরও অনেক উন্নতি হয়েছে। সে মানুষ বোধ হয় এখন নতুন স্বপ্ন চোখে নিয়ে আর জীবনসঙ্গিনীর হাত ধরে হুডরুর ঝরণার ধারে বসে জলেরও খেলা দেখছে।

ছিঃ, মানুষ শত্রুকেও এমন করে ঠকায় না। কিন্তু ভদ্রলোক অতীশ বসু এমন এক মেয়েকে ঠকিয়ে আর অপমান করে সুখী হলো, যে মেয়ে সারা জীবনের যত্ন দিয়ে অতীশকেই সুখী করবার জন্য তৈরি হয়েছিল। প্রীতির ভালবাসার সব আশাকে বিনা দোষে পুড়িয়ে ছাই করে দিল অতীশ। শুধু এই অপমানের স্মৃতি দিনরাত চুপ করে সহ্য করে লাভ কি? মৃত্যুই তো ভাল ছিল, কিন্তু কোথা থেকে আর-এক অদ্ভুত আপদ এসে প্রীতিকে মরে বাঁচবার সুখটুকুও পেতে দিল না।

মনে পড়ে প্রীতির, হেনার দাদার চোখ দুটো একবার ছলছল করে উঠেছিল। প্রীতির জীবনের দুঃখ ও অপমানের জ্বালা কত দুঃসহ, সেটুকু বুঝতে পেরেছিল সেই অপরিচিত মানুষটা।

মনের যন্ত্রণা চাপতে দুহাতে মুখ ঢাকে প্রীতি। কোন ছলছল চোখকে বিশ্বাস করে লাভ নেই। হেনার দাদাও তো অতীশ বসুর জাত। ওর কথারই বা কি মূল্য আছে? ওর কাছে একটা কথার সম্মান রাখবার জন্য এইভাবে বেঁচে মরে থাকবার কোন অর্থ হয় না। হেনার দাদা বুঝবে কি করে, যার ভালবাসার বুকটা হঠাৎ শূন্য হয়ে যায়, তার পক্ষে বেঁচে থাকা কি ভয়ংকর শাস্তি?

সেদিন বেড়াতে এসেছিল হেনা। হেনাকে দেখে ভয়ানক সন্দেহ চমকে উঠেছিল প্রীতির মনের ভিতরে। হেনার দাদা, সেই অদ্ভুত মানুষটা কি তবে হেনার কাছে হেসে হেসে বলে দিয়েছে সব কথা? প্রীতির জীবনের দুঃখ নিয়ে ঠাট্টা করে, আর প্রীতির জীবনের সম্মান ও সুনাম নষ্ট করে সুখী হয় এই মানুষটারও মন?

কিন্তু এই সন্দেহের জন্যই শেষে লজ্জা পায় প্রীতি। হেনার কথায় বোঝা যায়, কোন খবরই পায়নি হেনা। হেনা বরং হেসে হেসে বলে—বিয়ের দিন পিছিয়ে গেল নাকি প্রীতি? পাত্র বোধহয় ছুটি পায়নি, তাই না?

প্রীতি বলে—তাই হবে বোধহয়।

হেনা বলে—পাত্র এখন কোথায়?

প্রীতি—কাছেই ছিল, এখন দূরে চলে গিয়েছে।

হেনা—হেঁয়ালি করে বলো না ভাই, সত্যি করে বলো।

প্রীতি হাসে—বিয়ে ভেঙে গিয়েছে।

হেনা হাসে—ভদ্রলোকের জন্য দুঃখ হয়। ঠকেছেন ভদ্রলোক, ভুল করে ভয়ানক ঠকলেন।

হেনা চলে যায় এবং প্রীতির মনটাও হঠাৎ শান্ত হয়ে যায়। তাহলে কথা রেখেছে হেনার দাদা, কাউকেই কিছু বলেনি। কিন্তু মনের এই শান্তিই যেন ধীরে ধীরে অস্বস্তি হয়ে মনের ভিতর হাঁসফাঁস করতে থাকে। হেনাকে কি যেন জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিল প্রীতি, কিন্তু ভুলেই গিয়েছে। কি বিশ্রী

ভুল! এত উপদ্রব সহ্য করলেন যে ভদ্রলোক, প্রীতিকে মৃত্যুর পথ থেকে তুলে সরিয়ে নিয়ে গেলেন, আজ কেমন আছেন আর কি ভাবছেন সেই ভদ্রলোক? হেনার দাদা প্রভাতবাবু শেষ রাতের আবছা অন্ধকার আর ফিকে জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়ে প্রতিদিন কোথায় কতদূরে আর কি কাজ করতে যান, এই সামান্য একটা প্রশ্ন করলে এমন কি আর অশোভন ব্যাপার হতো?

প্রশ্ন না করে ভালই হয়েছে। প্রশ্ন শুনে হেনা যদি হেসে ফেলতো আর জিজ্ঞাসা করতো, কোথায় কবে আর কেমন করে আমার দাদার সঙ্গে তোমার দেখা হলো প্রীতি? তবে? তবে, হেনার সেই হাসিভরা সন্দেহের ভুল ভেঙে দেওয়া সম্ভব হতো না। কোন কথাই বলা যেত না। একটা ভুল ধারণা নিয়ে চলে যেত হেনা।

এক এক করে কত শেষ রাতের শেষ প্রহর দেখা দেয় আর চলে যায়। রেল লাইনের লেভেল ক্রসিং-এর গুমটির ভিতর টুং টুং করে ঘন্টির শব্দ বাজে আর জ্বলন্ত চক্ষু নিয়ে ডায়মণ্ডহারবারের ট্রেন ছুটে চলে যায়।

শেষ রাতের শেষ প্রহরে স্বপ্নভরা ঘুম যেন অকারণে ভেঙে যায়, জেগে বসে থাকে প্রীতি। লোহার লাইন কাঁপিয়ে গুরু গুরু শব্দের ঝংকার গড়িয়ে ছুটে চলে যায় ডায়মণ্ডহারবারের ট্রেন। প্রীতি সরকারের মনের ওপর যেন টুপ টাপ করে ঝরে পড়তে থাকে শেষ রাতের হিমে ভেজা সজনে ফুল।

আর, অসহায়ের মত চুপ করে বসে মনের ভিতরে একটা মধুর অনুভবের সঙ্গে যেন লড়াই করে হাঁপাতে থাকে প্রীতি সরকার। ডাকাতের মত তাড়া করে পিছন থেকে ছুটে এসে একটা উদ্বেগভরা আগ্রহ শক্ত করে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলো প্রীতিকে, আর বুকের উপর তুলে নিল। কী ভয়ংকর কঠিন সেই দুটি হাতের বন্ধন। একটা অপরিচিতা মেয়েকে ওভাবে বুকের উপর তুলে নিতে একটুও কি লজ্জা লাগেনি মানুষটার বুকের মধ্যে?

সেদিন না হয় উপকারই করেছিলেন ভদ্রলোক, কিন্তু উপকার করতে গিয়ে যে-সব কাণ্ড করলেন, সে-কথা ভাবতে গিয়ে আজও কি ভদ্রলোকের চিন্তা একটুও লজ্জিত হয় না?

মনে হয় প্রীতির, সে-রকম কোন চিন্তার ঝঞ্ঝাটই নেই হেনার দাদার মনে। তা না হলে এই ছয় মাসের মধ্যে একবারও অন্তত খোঁজ নিতেন। নইলে নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে হতো, কেমন আছে সেই মেয়ে, যাকে তিনি শেষ রাতের শেষ প্রহরের এক সর্বনেশে নিশির ডাকের গ্রাস থেকে বাঁচালেন। সব মিথ্যে। ভদ্রলোকের চোখ দুটো ছল ছল করেছিল, মিথ্যেই এত উপদেশ দিলেন, মিথ্যেই কথা দিলেন আর কথা নিলেন। উপকারের, সহানুভূতির আর উদ্বেগের অভিনয় করে সরে পড়লেন।

শেষ রাতের শেষ প্রহরের বিরুদ্ধে যেন একটা অভিমান গুমরে ওঠে প্রীতির মনের ভাবনায়। সেই মানুষটি তো এখন সেই রেল লাইনের পাশ দিয়ে সেই মরু পথ ধরে হেঁটে চলেছে। সেই সজনে গাছের বুক থেকে এই ঝড়ো বাতাসের ছোঁয়ায় এখনও বোধহয় ফুল ঝরে পড়ে, যদি এখনও ফুল থেকে থাকে। কিন্তু সে কি আজও সেদিনের মত হঠাৎ সেখানে থামে? থামলেও কি মনে পড়ে, একটি মেয়ের জীবনের দুঃসহ দুঃখ সেখানেই একদিন মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল?

মনে পড়ে না নিশ্চয়, মনে পড়লে এই সত্য কল্পনা করতে পারতো সেই মানুষ, যে-মেয়েকে

মৃত্যুর পথ থেকে সরিয়ে সংসারের দিকে আবার পাঠিয়ে দিলো সে, সে-মেয়ে তার জীবনের সকল ক্ষণের চিন্তায় তারই মূর্তিকে স্মরণ করে। ভুলতে চেষ্টা করলেও যে ভুলতে পারে না প্রীতি। রাগ হয়, ছুটে গিয়ে প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করে। মিছামিছি একটা মেয়ের দুঃখের প্রাণকে বাঁচিয়ে দিয়ে আবার মিছামিছি এত তুচ্ছ করছে কেন হেনার দাদা? অন্ধ মানুষ হোঁচট খেয়ে ড্রেনের মধ্যেও পড়ে গেলে যে-মানুষ ডুকরে কেঁদে ওঠে সে-মানুষ কেন কল্পনা করতেপারে না, এভাবে একটি মেয়ের আশাকে তুচ্ছ করলে তাকে অপমানের কাদায় ডুবিয়ে দেওয়া হয়?

না, বড় দুঃসহ এই শূন্যতা। নতুন করে আবার এক অপমানের জ্বালার মধ্যে জীবনটাকে টেনে নিয়ে এসেছে প্রীতি। নিজেরই উপর মনের সব ঘৃণা শিউরে উঠতে থাকে। এক একটা হৃদয়হীন ছলনার কাছে ভুল লোভের ভুলে এগিয়ে গিয়েছে প্রীতির জীবন, তাই আড়াল থেকে অদৃষ্ট বোধহয় বিদ্রূপ করেছে, আর লাভ হয়েছে শুধু অপমানের জ্বালা।

আমাকে বাঁচিয়ে রেখে কি লাভ হলো আপনার? সব লজ্জার মাথা খেয়ে বেহায়ার মত এই প্রশ্ন করে হেনার দাদাকে একটি চিঠি দিতে পারা যায়। কিন্তু...ভাবতে গিয়ে অনেকক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে থাকে প্রীতি। মাঝ রাতের প্রহর পার হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ, ঢাকুরিয়ার নারকেলের পাতার ঝালর শেষ রাতের একটা টুকরো চাঁদের আলোকে ঝিকমিক করে আর ফুরফুরে বাতাসে ঝিরঝির করে। খোলা জানালা দিয়ে নিস্তব্ধ পথের দিকে একবার তাকায় প্রীতি। কোন লাভ নেই অমন একটা ভোলা মানুষকে চিঠি দিয়ে। যে মানুষ মুখ দেখেও মানুষ চিনতে পারে না, সে মানুষ চিঠি পড়ে আর কি বুঝবে ছাই।

ডায়মণ্ডহারবারের ট্রেন কি চলে গিয়েছে? প্রীতি ছটফট করে, জলভরা চোখের ঝাপসা দৃষ্টি তুলে ঘড়ির দিকে তাকায়। হ্যাঁ, শেষরাতের শেষ প্রহর এসে গিয়েছে।

সত্যিই, যেন আবার এক নিশির ডাকের আহ্বান শুনেছে প্রীতি। ঘরের দরজা খুলে বারান্দার উপর এসে দাঁড়ায়। তারপরেই পথে নেমে পড়ে।

সজনে গাছে আবার নতুন ফুল ধরেছে। পুকুরের কলমীদলের ফাঁকে ফাঁকে জলের বুকে টুকরো চাঁদের আভা চিকচিক করছে। চমকে ওঠে আর থমকে দাঁড়ায় প্রভাত।—একি, তুমি আবার এখানে কেন প্রীতি?

প্রীতি বলে—মিছামিছি চমকে উঠবেন না, ভয় পাবেন না, দুঃখও করবেন না, আমি মরতে আসিনি।

ডায়মণ্ডহারবারের ট্রেন ছুটে আসতে থাকে। ইঞ্জিনের জ্বলন্ত চোখ ফুটে উঠেছে ডিসট্যান্ট সিগন্যালের কাছে। সাবধান হয় প্রভাত। চশমা খুলে পকেটে রাখে। এই মেয়ের মুখের কথায় কোন বিশ্বাস নেই। প্রভাতের হাত দুটো এরই মধ্যে কঠিন এক আগ্রহে কঠিনতর হয়ে ওঠে। আবার বাধা দিতে হবে, পথ আটক করে থামিয়ে রাখতে হবে, যেন নিজের প্রাণের সর্বনাশ করার কোন সুযোগ না পায় এই ছন্নছাড়া মনের মেয়ে।

ধিক্কার দেয় প্রভাত—ছিঃ, তুমি কথা দিয়েও কথার সম্মান রাখবে না।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে প্রীতি।

প্রভাত বলে—তুমি আমার মনের একটা আনন্দকে নষ্ট করে দিলে।

প্রভাতের মুখের দিকে তাকায় না প্রীতি, কিন্তু প্রীতি যেন সারা অন্তর দিয়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনছে প্রভাতের সব ধিক্কার আর অনুযোগের ভাষা।

প্রভাত বলে—প্রতিদিন এই পথে যেতে একবার তোমার কথাই ভেবেছি। শুধু মনে হয়েছে, এতদিনে শান্তি পেয়েছ তুমি, ভাল আছ তুমি। কিন্তু...।

লোহার লাইন কাঁপে ঝনঝন করে। ডায়মণ্ডহারবারের ট্রেনের ইঞ্জিনের জ্বলন্ত চোখ থেকে আলো ছড়িয়ে পড়ে প্রীতির মুখের উপর। দেখতে পায় প্রভাত, জলভরা চোখ তুলে যেন অন্য এক জগতের সান্ত্বনার দিকে কি-যেন আশা করে তাকিয়ে আছে প্রীতি।

কেঁপে ওঠে প্রীতির গলার স্বর। —আমাকে ক্ষমা করুন প্রভাতবাবু।

প্রভাত রায়ের সতর্ক দুটি কঠিন হাত আবার চমকে ওঠে। এক লাফ দিয়ে এগিয়ে আসে প্রভাত রায়, আর সেই মুহূর্তে ছন্নছাড়া মনের মেয়েকে কঠোর দু'টি বাহুর বন্ধনে বন্দিনী করে জড়িয়ে ধরে রাখে, যতক্ষণ না ট্রেনের শেষ চাকার শব্দ গড়িয়ে দূরে চলে যায়।

ধীর স্থির ও শান্ত, কোন মত্ততা আর চঞ্চলতা নেই, প্রীতি সরকার যেন শেষ রাতের শেষ প্রহরের একটি সান্ত্বনার বুকের উপর পড়ে একটি মধুর অনুভবের লজ্জাকে ইচ্ছা করে বরণ করছে। অপ্রস্তুত হয়ে এবং বড় বেশি উদ্বিগ্ন দু'টি হাতের অকারণ চাঞ্চল্যে লজ্জিত হয়ে দু'পা পিছিয়ে সরে আসে প্রভাত রায়।

প্রীতি বলে—এখন বিশ্বাস করলেন তো, আমি সত্যিই মরতে আসিনি।

প্রভাত—বিশ্বাস করছি। কিন্তু কেন এসেছ তুমি?

প্রীতি—আপনার কাছে একটি প্রশ্ন ছিল, যে প্রশ্ন চিঠিতে লিখে আপনাকে জানাবার সাহস পাইনি।

প্রভাত—বলো, কিসের প্রশ্ন!

প্রীতি—সে প্রশ্ন না শুনেই আপনি সে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছেন।

প্রভাত—তার মানে?

প্রীতি—আপনি মিছামিছি রোজই আমার কথা ভেবেছেন কেন?

হঠাৎ মাথা হেঁট করে প্রভাত রায়। চুপ করে শুধু ঠাণ্ডা মাটির ধুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর কুণ্ঠিতভাবে বলে—তোমার কথা রোজই ভেবেছি, তাতে সত্যিই কি আমার কোন ভুল হয়েছে?

প্রীতি বলে—না।

কদমগাছের মাথার উপর পূব আকাশের আভা ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রীতি বলে—আমাকে কিছুদূর এগিয়ে দিন।

—চল। প্রীতির পাশে পাশে হেঁটে সরু পথ ধরে চলতে থাকে প্রভাত। কিছুদূর এগিয়ে এসেই থমকে দাঁড়ায় প্রভাত।—আর বোধহয় আমার এগিয়ে যাওয়া উচিত হবে না।

প্রীতি বলে—কেন উচিত হবে না? চলুন।

বোধহয় মনের ভুলে চলতে চলতে প্রীতির সঙ্গে অনেক দূর এগিয়ে যায় প্রভাত। প্রীতিদের বাড়ির ফটক দেখা যায়। অপ্রস্তুতের মত আবার থমকে দাঁড়ায় প্রভাত।—এবার আমি যাই।

প্রীতি—কেন?

প্রভাত—পথের লোক দেখতে পেলে সন্দেহ করতে পারে।

প্রীতি—করুক না সন্দেহ। আমার সঙ্গে আসুন।

বিস্মিতভাবে তাকায় প্রভাত।—কোথায়?

প্রীতি হাসে—আমার বাড়ি পর্যন্ত আসুন। সকলেই দেখুক, বাবাও নিজের চোখে দেখে নিন, আপনি আমার সঙ্গে এসেছেন।

অপলক চোখ তুলে প্রীতির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে প্রভাত। রাতের শেষ প্রহরের একটা ছায়া প্রভাতের পথ ভুলিয়ে দিয়ে কোথায় তাকে নিয়ে চলেছে।

প্রভাত বলে—সত্যই যেতে বলছো?

ঝাপসা চোখের কোণ দুটো রুমাল দিয়ে মুছে, প্রভাতের মুখের দিকে তাকায় প্রীতি। আস্তে আস্তে ধরা গলায় বলে—এস।

নিমের মধু

খোলার চাল, মাটির ভিত আর মেটে দেওয়াল, তার মধ্যে ছোট একটা জানালা, আর তারই উপর লুটিয়ে পড়ে রয়েছে নিকটের একটা নিমগাছের ছায়া। দেখামাত্র ভবনাথের মনের এতক্ষণের একটা স্বপ্নই যেন তেতো হয়ে গেল।

মানুষের কল্পনার প্রাসাদ অনেক সময় ধুলিসাৎ হয়ে যায় আর ভবনাথের কল্পনার প্রাসাদটা ধুলিসাৎ না হলেও একটা কুঁড়ে-ঘর হয়ে গেল। সত্যই, ভবনাথের কল্পনার মধ্যেই এতক্ষণ ধরে এই সকালবেলার আলো ঝকঝক করছিল, প্রায় প্রাসাদের মতই বড়সড় চেহারার একটা বাড়ি। কিন্তু নিমগাছের ছায়ায় ঢাকা ঐ ক্ষুদ্র আর দরিদ্র চেহারার মেটেময়লা বাড়িটার দিকে চোখ পড়তেই যেন সে কল্পনার মাথায় বাড়ি পড়ল। ধুলোর মতই ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল ভবনাথের আশা-ভরসা।

এই কি শশী এভিনিউ-এর একশো ছত্রিশের ঊনপঞ্চাশের সি? কিন্তু আর প্রশ্ন করার ও সন্দেহ করারও কোন অর্থ হয় না। জানালাটার নিচে মেটে দেওয়ালের গায়ে কয়লার আঁচড়ে একেবারে স্পষ্ট করেই লেখা রয়েছে, একশো ছত্রিশের ঊনপঞ্চাশের সি।

পথের উপরেই কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থাকে ভবনাথ, আর ভাবতে থাকে ফিরে যাওয়াই ভাল। এ হেন হাভাতে ঘরের কবাটের কড়া নেড়ে কোন লাভ নেই।

শুধু একটা হয়রানিই লাভ হলো, আর পকেটের মধ্যে শেষ সম্বল এক টাকা সাত আনা থেকে দশটা আনা একেবারে বাজে খরচে ব্যর্থ হয়ে গেল। বাড়িটা খুঁজে বের করতে অনেক সময় লেগেছে, অনেক ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে, আর ট্রাম-বাস ও রিক্সার ভাড়া যোগাতে গিয়ে খরচ হয়ে গিয়েছে পুরো দশটা আনা।

এখন মনে হয়, ঠিকই বলেছিল কালীশ। কালীঘাটের চায়ের দোকানের কালীশ।—এ কেসটা সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না ভব, রিস্ক নিয়ে লাভ নেই।

ভবনাথেরই রিস্কি-জীবনের এক অন্তরঙ্গ সুহৃদ কালীঘাটের চায়ের দোকানের বয় কালীশ কোন উৎসাহ দেয়নি, কিন্তু তবু যেন অদ্ভুত এক উৎসাহের নেশায় অস্থির হয়ে ছুটে চলে এসেছে

ভবনাথ, কালীঘাট থেকে এতদূরে বেহালার কাছে এই বিশ্রী এক জায়গায় কুশ্রী এক পথের উপর। শশী এভিনিউ-এর যা কিছু চটক তা হলো শুধু ঐ নামটার মধ্যেই। এবড়োখেবড়ো একটা কাঁচা রাস্তা, এখানে গর্ত ওখানে কাদা, গরু-মহিষের খাটাল দু'পাশে, আর মাঝে মাঝে দু'একটা নারকেল আর তাল, আর ধুলোয় বিবর্ণদেহ বাঁশঝাড়। এই হলো শশী এভিনিউ।

আজই ভোরে কালীঘাটের চায়ের দোকানে বসে খবরের কাগজটার দিকে তাকিয়ে একটা বিজ্ঞাপন পড়তে পড়তে ভবনাথের চোখে হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল একটা কল্পনা। চটপট খবরের কাগজের সেই বিজ্ঞাপন থেকে ঠিকানাটা একটা কাগজে লিখে নিয়েছিল ভবনাথ। সেই কাগজটা চার ভাঁজ হয়ে ভবনাথের হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে।

একটা নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন। আজ তিন মাস হলো নিরুদ্দিষ্ট হয়েছেন শ্রীযুক্ত সুশোভন রায়, বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন, গায়ের রঙ বেশ ফরসা, মাথার চুল সাদা, বাম কানের কাছে একটি আঁচিল, গরদের ধুতি-চাদর পরা অভ্যাস। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি সন্ধান দেন, তবে সেই উপকারের জন্য তাঁর কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে ছায়া রায়, একশো ছত্রিশের উনপঞ্চাশের সি, শশী এভিনিউ, বেহালা।

বলেছিল কালীশ, এই কেসটার মধ্যে এত মাথা ঘামাবার কি দেখলি ভব? দশটা টাকাও পুরস্কার ঘোষণা করলে না হয় দেখা যেত, ভাঁড়ারে কিছু আছে। রিস্ক নিস্ না ভব। না রে না, এ একেবারে ফাঁকা ভদ্দোরতা।

ভবনাথ বলে উঁহু, বেশ কিছু আছে, আর দিতেও পারে বেশ কিছু, তাই পুরস্কার-টুরস্কারের কথা চেপে গিয়েছে।

খবরের কাগজের দিকে আর একবার তাকায় ভবনাথ। বিজ্ঞাপনের লেখাগুলি পড়তে থাকে। শশী এভিনিউ, সুশোভন রায়, গায়ের ফরসা রঙ, গরদের ধুতি-চাদর, ছায়া রায়—প্রত্যেকটি কথার মধ্যে যে বড়লোক-বড়লোক একটা অবস্থা জ্বল্‌জ্বল্ করছে।

জ্বল্‌জ্বল্ করে ভবনাথের কল্পনা।—আমি তোকেই চ্যালেঞ্জ করছি কালীশ, মোটা মতন আদায় করে ট্যাক ভারি করে যদি ফিরে আসি, তবে তুই কি ফাইন দিবি বল?

কালীশ বলে—কিছু না। তুমি বাবা বরং আগের কেসটার আমার পাওনা শেয়ার শোধ করে দিও।

ভবনাথ—কোন্ কেস?

কালীশ—সেই চার থান সিল্ক।

ভবনাথ—সেগুলি তো আমি হাতড়েছিলুম।

কালীশ—আরে হ্যাঁ, তোর বাহাদুরি অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমি যে খদ্দের যোগাড় করে দিলুম তার জন্যে লাভের অন্তত চার আনা শেয়ারও কি আমাকে দিবি না?

হেসে ফেলে ভবনাথ—সবই ফুরিয়ে দিয়েছি মাইরি। কিন্তু আজ দেব তোকে, নিশ্চয় দেব। আর শোন, এখন চটপট ডবল ডিম ভেজে দে দেখি, খেয়ে-দেয়ে একটু তাজা হয়ে বেরিয়ে পড়ি।

কিন্তু ঐ সেই একশো ছত্রিশের উনপঞ্চাশের সি, নিমের ছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা বিদ্রূপ। ডবল ডিমে ভাজা সেই আশা ও উৎসাহ এতক্ষণ ধরে ঘুরতে ঘুরতে আর শশী এভিনিউ-এর নোংরা চেহারা দেখতেই ফুরিয়ে গিয়েছে। তার উপর ঐ বাড়ি, খোলার চাল আর মেটে দেওয়াল।

এত চেষ্টার পর, শশী এভিনিউ নামে এই অপদার্থ একটা কাঁচা রাস্তার পাশে এই বস্তির মধ্যে বাড়িটার কাছে এসেও যেন ঠিকানা হারিয়ে গেল, পথভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে শূন্য দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে ভবনাথ।

তারপরেই ছটফট করে চোখ দুটো। কি যেন চিন্তা করে ভবনাথ। দেখাই যাক না, শুধু কুঁড়ে ঘর দেখেই হতাশ হয়ে চলে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যদিও কুঁড়ে ঘর, কিন্তু ঘরের লোকগুলির নামগুলি ভদ্দোর। হয়তো সত্যিই ভদ্দোরলোক। আর ভদ্দরলোক যদি গরীব হয় তবে তো ভালই হয়। ভীতু, ভীতু, সহজেই বিশ্বাস করে, একটুতেই কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে, ধার করেও পুজোর খরচ যোগাড় করে, ভাত খেতে না পেলেও পান খায়, দুয়ার থেকে ভিখারী তাড়াতে পারে না, গরীব ভদ্দরলোকগুলি সংসারের কেমন যেন অদ্ভুত জীব।

আর, ভবনাথই বা কি কম ভদ্দর লোক! গায়ে সিল্কের কামিজ, হাতের দুটি আঙুলে আংটি, মাথার ঢেউ-খেলানো চুলগুলি একটু রুক্ষসুক্ষ, বছর পঁচিশ বয়সের ভবনাথ দুপুরের কলকাতার পথে যখন ব্যস্তভাবে হেঁটে যেতে থাকে, তখন মনে হবে যেন কলেজের ক্লাস কাট করে অত্যন্ত শিক্ষিত এক যুবক ম্যাটিনি শো-এর তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে কোন সিনেমা হাউসের দিকে চলেছে। ভবনাথের বাপ-মা ও ভাই-বোন এই বাংলাদেশের যে গ্রামে থাকে সেই গ্রামটাও ভদ্রলোকের গ্রাম। সেই গ্রাম জানে, এক ভদ্রলোকের ছেলে ভবনাথ, সেই গ্রামেরই পাল বাবুদের দোকানে চুরি করে পালিয়ে গিয়েছে, ফেরার হয়ে গিয়েছে, ওয়ারেন্ট ঘুরছে তাকে সন্ধান করে। ভবনাথের এই ইতিহাস শুধু জানে তার অন্তরঙ্গ সুহৃদ কালীঘাটের চায়ের দোকানের বয় কালীশ, আর সেই কালীশও যে আর এক গ্রামের আর এক ভদ্রলোকের ছেলে।

সুতরাং, এখনি গিয়ে যদি ঐ দীনহীন একশো ছত্রিশের ঊনপঞ্চাশের সি-এর দরজা কাঁপিয়ে দিয়ে কড়া নাড়ে ভবনাথ, আর সেই শব্দে ঘরের ভিতর থেকে ছায়া, মায়া বা আর কেউ বের হয়ে আসে, তবে ভবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে তারাও কেউ সন্দেহ করতে পারবে না যে, ভবনাথ এখন আর সত্যি সত্যি ভদ্রলোক নয়। কেউ একবিন্দু সন্দেহও করতে পারবে না যে, ভবনাথ একটা ছদ্মবেশ, ভবনাথ একটা নিষ্ঠুর ভাঁওতা, ভবনাথ একটি অতিচতুর বাগ্‌জাল, সে এসেছে মানুষকে হঠাৎ মূর্খ করে দিয়ে আর কিছু হাতড়িয়ে নিয়ে সরে পড়ার জন্য।

ভদ্রবেশী চোর তো অনেকেই আছে, কিন্তু ভবনাথ হুবহু-সে-রকম নয়। ভবনাথের চুরিরও একটা ভদ্রবেশ থাকে, অতি পরিপাটি ভদ্রবেশ। পথচারীর পকেটে হাত দিয়ে আর ঘুমন্ত মানুষের ঘরে ঢুকে যারা রিস্কি নেয় আর রোজগার করে, তাদের সম্পর্কে ঘৃণাই আছে ভবনাথের মনে। ওসব নিতান্তই ছোটলোকের রীতি। সুহৃদ কালীশের কাছেই তার এই ঘৃণার কথা মাঝে মাঝে ঠোঁট বেঁকিয়ে ব্যক্ত করে ভবনাথ—তুই তো জানিস কালীশ, কিছু লেখাপড়াও শিখেছি। কাজেই একটু বুদ্ধিসুদ্ধির কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজে আমি রিস্কি নিতে পারি না।

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত রিস্ক নেয় ভবনাথ। ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়।—এটা কি সুশোভনবাবুর বাড়ি? জোরে দরজার কড়া নেড়ে হাঁক দেয় ভবনাথ।

ঘরের ভিতর যেন কতগুলি পায়ের শব্দ দুরদুর করে বেজে উঠেছে, শুনতে পায় ভবনাথ। হয় ভয় পেয়েছে, নয় আশার সাড়া পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ঘরের ভিতরের কতকগুলি মন। উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ভবনাথ।

কতকগুলি নয়, মাত্র দুটি। একশো ছত্রিশের ঊনপঞ্চাশের সি-এর নড়বড়ে কপাটের কাঠ কেঁপে উঠল। খুলে গেল কপাট। আর ভবনাথের মুখের দিকে আগ্রহে ও কৌতূহলে অস্থির দুই জোড়া চক্ষু তাকিয়ে রইল। এক প্রৌঢ়া ও এক তরুণী। বোধহয় মা ও মেয়ে, দেখে তাই তো মনে হয়।

ভবনাথ বলে—সুশোভনবাবু কি আপনাদের কেউ...

তরুণী বলে—হ্যাঁ, আমার বাবা হন তিনি।

ভবনাথ—সুশোভনবাবুর সন্ধান চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন যে ছায়া রায় নামে...।

তরুণী—আমিই ছায়া রায়, আর এই আমার মা।

ভবনাথ—বুঝলাম। এখন তাহলে সুশোভনবাবুকে আনবার ব্যবস্থা করুন।

অত্যন্ত ব্যস্ত ও চঞ্চল হয়ে ওঠেন প্রৌঢ়া মহিলা।—বসো বাবা, বসো। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। বেঁচে থাকো, বড় হও, সুখী হও বাবা।

ভবনাথ—মাপ করবেন, বসবার সময় নেই, আমাকে এখনি অফিস যেতে হবে। শুধু ঠিকানা জানিয়ে দিতে এসেছি, সেই ঠিকানায় আপনারা গিয়ে সুশোভনবাবুকে নিয়ে আসুন, কিংবা কোন লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নিন।

ছায়া রায় ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতরে চলে যায় আর একটা বেতের মোড়া নিয়ে এসে দরজার কাছে রাখে। অনুরোধ করে ছায়া রায়—বসুন।

আপত্তি করে ভবনাথ—বসবার সময় নেই। ঠিকানাটা বলছি, লিখে নিন। কেয়ার অফ ডাক্তার তিনকড়ি মুখার্জী, বল্লবদাস কাটরা, এলাহাবাদ।

ঠিকানা শুনে শূন্য দৃষ্টি তুলে ভবনাথের দিকে তাকিয়ে থাকে ছায়া রায় আর ছায়া রায়ের মা।

ভবনাথ বলে—আমার কাকা তিনকড়ি মুখার্জী। এক পার্কের গাছের তলায় জ্বর গায়ে নিয়ে বসেছিলেন সুশোভনবাবু। আমার কাকা তাঁকে দেখতে পেয়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে নিজের বাড়িতে এনে রেখেছেন। এখন আপনাদের কর্তব্য।

কথা বলে না ছায়া রায় আর ছায়া রায়ের মা।

ভবনাথ বলে—হাওড়া থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত রেলে ইন্টার ক্লাসের একটি টিকিট আর এলাহাবাদ থেকে হাওড়া পর্যন্ত ইন্টার ক্লাসের দুটি টিকিটের দাম, তার ওপর পথের হাতখরচ বাবদ আর কিছু, এই নিয়ে বড়জোর টাকা সত্তর লাগবে, তার বেশি নয়। আজই কাউকে যদি পাঠিয়ে দেন তো ভাল হয়, কারণ সুশোভনবাবুর শরীরের অবস্থা ভাল নয়, তার ওপর মনের যা অবস্থা, কখন যে আবার কোথায় চলে যাবেন কোন ঠিক নেই।

কেঁদেই ফেললেন ছায়া রায়ের মা।

এইবার শূন্য দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে ভবনাথ। তার মনের শেষ ভরসাও যেন কাঁদ-কাঁদ হয়ে এইবার ভেঙে পড়তে চলেছে। টাকার কথা শুনেই কেঁদে ফেলেছে, এ যে-একেবারে হাভাতে ভদ্রলোকের বাড়ি। দেখতে পায় ভবনাথ, ছায়া রায়ের হাতে দু'গাছি প্লাস্টিকের বালা আর ছায়া রায়ের মায়ের হাতে দু'গাছি শাঁখা। এই মানুষগুলি জীবনে সত্তরটা টাকা দেখেছে কিনা সন্দেহ।

ভবনাথ বলে—কান্নাকাটি করে আমাকে অপ্রস্তুত করবেন না।

কান্না থামায় ছায়া রায়ের মা। —তুমি বুঝতে পারছ না বাবা।

ভবনাথ—কি বুঝতে পারছি না?

ছায়া রায়ের মা—সত্তর টাকা যোগাড় করা কি আমাদের মতো অবস্থার মানুষের পক্ষে...।

ভবনাথ—কি কাজ করতেন সুশোভনবাবু?

—দোকানে খাতা লিখতেন।

—কত মাইনে পেতেন?

—দৈনিক দু'টাকা।

—তবে গরদের ধুতি চাদর পরার শখ কেন?

—ওটা ওর ধর্মকর্মের শখ। সব সময়েই মনে মনে নাম জপ করেন। তাই সব সময়েই গরদ পরে থাকেন।

—ধর্মের বাতিক?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু ঘর ছেড়ে চলে গেলেন কেন?

—এটাও তার এক বাতিক। যখন চাকরি থাকে না তখন ধর্মের বাতিক বাড়ে, কিন্তু ঘরেই থাকেন। আর যখন আমার ওপর রাগ করেন, তখন একেবারে ঘর ছেড়ে চলে যান।

—তাহলে এরকম ব্যাপার আগেও অনেকবার হয়েছে?

—হ্যাঁ, কিন্তু চলে গেলেও দু-চার দিনের মধ্যেই ফিরে আসেন। কিন্তু এবার তিন মাসেরও বেশি হয়ে গেল, তবু ফিরলেন না দেখে বিজ্ঞাপন দিয়েছি।

বলতে বলতে আবার ফুঁপিয়ে উঠলেন ছায়া রায়ের মা—কাগজে বিজ্ঞাপনের জন্য আটটা টাকা যোগাড় করতে গিয়ে সামান্য কাঁসা-পেতল যা ছিল সবই বেচতে হয়েছে বাবা। এখন আরও সত্তর টাকা যোগাড় করতে হলে...।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে এইবার ছায়া রায়ের মা তাঁর মেয়ের মুখের দিকে তাকান।

ছায়া রায় বলে—দেখুন, সত্তরটা টাকা যোগাড় করার উপায় আছে, কিন্তু...।

দপ্ করে আবার আশার বিদ্যুৎ চমকে ওঠে ভবনাথের চক্ষে। —বলুন, কি অসুবিধে আছে?

ছায়া রায়—কিন্তু মানুষ নেই।

ভবনাথ—তার মানে?

ছায়া রায় বলে—এমন কেউ আপনজন নেই, যাকে আমাদের দুঃখের কথা বললে দুঃখিত হবে, আর নিজের কাজ বন্ধ করে এলাহাবাদের মতো দূরের জায়গায় যাবে বাবাকে নিয়ে আসার জন্য।

চুপ করে ছায়া রায়। তারপর ভবনাথেরই মুখের দিকে আরও বেদনার্তভাবে তাকিয়ে ছায়া রায় বলে—তা ছাড়া, এমন বিশ্বাসী জনও কেউ নেই, যার হাতে বিশ্বাস করে সত্তরটা টাকা ছেড়ে দিতে পারি। বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য খবরের কাগজের অফিসে গিয়েছিলেন যে চক্কোত্তি ঠাকুর, বাবারই বন্ধু, এত ভাল মানুষ চক্কোত্তি ঠাকুর, তিনিও ঐ সামান্য কাজের জন্য তাঁর খরচ বাবদ দু'টাকা নিয়েছেন। কিন্তু তাতেও তিনি খুশি নন, আজ এসে আরও একটা টাকা চেয়ে গিয়েছেন।

হেসে ফেলে ভবনাথ—বেশ ভাল ভদ্রলোকের পাল্লায় পড়েছেন দেখছি।

ছায়া রায় হাসে—কাজেই, এই উপকারটুকু করার ভার আপনাকেই নিতে হয়।

ভবনাথ—কি আশ্চর্য, আমাকেই এলাহাবাদে যেতে বলছেন সুশোভনবাবুকে আনবার জন্য?

ছায়া রায়—হ্যাঁ।

ভবনাথ চোখ বড় করে বিস্ময় প্রকাশ করে—অর্থাৎ আমিই আমার অফিস কামাই করে, সব কাজ ফেলে রেখে এখন এলাহাবাদ ছুটব?

ছায়া রায়—অনেক উপকার আপনিই তো করলেন। আপনিই যখন বাবার খবর এনেছেন, তখন তাঁকে নিয়ে আসার ভার আপনিই নিয়ে শেষ উপকার করুন।

সফল হয়েছে কল্পনা, সার্থক হয়েছে রিস্কি নেওয়া, দশ আনা খরচ আর সারা সকালের হয়রানি। বুকের উল্লাস কোনমতে চেপে চাপা চিৎকারের মতই স্বরে ভবনাথ বলে—দিন টাকা, তাহলে এখনি রওনা হয়ে যাই।

ছায়া রায় বলে—কিন্তু একটু দেরি হবে।

ভবনাথ—কতক্ষণ?

ছায়া রায় বলে—বেশিক্ষণ নয়।

মায়ের মুখের দিকে আবার যেন কি-রকম এক ভঙ্গিতে তাকায় ছায়া রায়। ছায়া রায়ের মা বলেন—একটু বসো, দুটো ভাত মুখে না দিয়ে যেও না বাবা।

এইবার সত্যই চিৎকার করে ওঠে ভবনাথ—না না, কখ্‌খনো না। আমার সময় নষ্ট করবেন না।

ছায়া রায় হাসে—বেশি সময় নষ্ট হবে না। টাকা যোগাড় করে আনতে আমার যতক্ষণ সময় লাগবে, ততক্ষণে ডাল-ভাত রান্নাও হয়ে যাবে।

নিমগাছের ছায়া দোলে। আর ছায়া রায়ের হাতে প্লাস্টিকের চুড়িতে যেন ছায়া রায়ের মুখের হাসির ছায়া দোলে। বিশ্বাসে একেবারে মূর্খ হয়ে গিয়েছে আর গলে গিয়েছে কয়লার আঁচড়ে লেখা এই একশো ছত্রিশের ঊনপঞ্চাশের সি। মাত্র আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। ব্যস, তারপর...তারপর কালীঘাটের চায়ের দোকানের কালীশের শেয়ার চুকিয়ে দিয়ে, মুর্গির দো-পেঁয়াজী ভরপেট খেয়ে সিনেমাতে গিয়ে একটা রঙ্গিলা ছবি দেখে...দূর ছাই, কি হবে সিনেমার ছবি দেখে। কালীশই তো কতবার বলেছে, তুই যে-রকম প্লে করছিস ভব, সিনেমার কোনো বেটা তারকারও সাধ্যি নেই যে ঠিক সে-রকমটি করতে পারে।

ঘরের ভিতরে চলে গিয়েছে ছায়া রায় আর ছায়া রায়ের মা। বেতের মোড়ার উপর বসে নিমগাছটার দিকে তাকিয়ে থাকে আর বিস্মিত হয় ভবনাথ। গাছ ভরে ফুল ফুটেছে। গাছের তলায় ফুল ছড়িয়ে রয়েছে। তেতো করা বিস্বাদ যার পাতা আর ফল, সেই নিমগাছের সাদা সাদা ফুল। কিন্তু এ হেন তেতো ফুলের থোকার উপর মৌমাছির থোকা বসে রয়েছে। মাটির উপর গড়াচ্ছে যে ফুল, সেই ফুলের গায়ে গড়াচ্ছে মৌমাছি। তেতো নিমেরও মিষ্টি মধু হয় নাকি? আর সেই মিষ্টি কি এতই বেশি মিষ্টি?

হঠাৎ চমকে ওঠে ভবনাথ। একটা রঙিন শাড়ির আঁচল যেন হঠাৎ ভবনাথের গা ছুঁয়ে চলে গেল। ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে, দরজা পার হয়ে আর ভবনাথেরই পাশ কাটিয়ে কোথায় যেন চলে যাচ্ছে ছায়া রায়।

ভবনাথ—এ কি, কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

ছায়া রায় হাসে, কিন্তু তার প্লাস্টিকের চুড়ির হাসির ছায়া দেখা যায় না। হাত দুটি যেন আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে।

ছায়া রায় বলে—আসছি এখনি।

চলে যাচ্ছিল ছায়া রায়—কিন্তু বিচলিতভাবে আর সন্দিগ্ধস্বরে প্রায় চিৎকারই করে ওঠে ভবনাথ—তাহলে আমিও চললাম।

থমকে দাঁড়ায় ছায়া রায়। অসহায়ের মতো তাকিয়ে আর আহতস্বরে বলে—বুঝতে পারছি, খুবই বিরক্ত হচ্ছেন আপনি। কিন্তু...।

ভবনাথ—কিন্তু আবার কি? আপনাদের কাণ্ডকারখানা আমার মোটেই ভাল লাগছে না। আপনি কোথায় যাচ্ছেন বলুন!

ছায়া রায়—টাকার যোগাড় করতে।

ভবনাথ—কোথায়?

ছায়া রায়—স্যাক্‌রার দোকানে।

ভবনাথ—তার মানে, গয়না বেচতে?

ছায়া—হ্যাঁ।

ভবনাথ—দেখি, কি গয়না, কেমন গয়না?

আঁচলের আড়াল থেকে হাত বের করে ছায়া রায়। দেখা যায়, হাতের মুঠোয় কাগজের ছোট একটা মোড়ক।

ভবনাথ—কি আছে এর মধ্যে?

ছায়া—এক গাছি সোনার রুলি।

ভবনাথ—কার রুলি?

ছায়া—আমার।

ভবনাথ—আর এক গাছি কই?

ছায়া—নেই, অনেক দিন আগেই বেচে দিতে হয়েছে।

মাটির উপর ধুলোমাখা নিমফুল আঁকড়ে পড়ে রয়েছে মৌমাছি। আনমনার মতো দুই চক্ষুর দৃষ্টি উদাস করে ধুলোমাখা নিমফুলের দিকে তাকিয়ে থাকে ভবনাথ, যেন এই সংসারেরই বাইরের একটা অদ্ভুত বস্তুর দিকে তাকিয়ে রয়েছে তার এলোমেলো মন, কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না।

হঠাৎ বলে ফেলে ভবনাথ—থামুন, কোথাও যেতে হবে না আপনাকে।

ছায়া—কিন্তু...।

বস্তি থেকে অনেক দূরে, যেন শশী এভিনিউ-এর শেষ প্রান্তের দিকেই তাকিয়ে হতাশ, ক্লান্ত ও হাঁপ ধরা ভাঙা-ভাঙা স্বরে ভবনাথ বলে—সত্তরটা টাকা খরচ করার সামর্থ্য আমার নেই, তা তো সত্যি নয়, এটা আপনি সহজেই বুঝতে পারছেন ছায়া রায়। আমি নিজের টাকাতেই এলাহাবাদে যেতে পারি, আর আপনার বাবার ট্রেন ভাড়ার টাকাও দিতে পারি। কথা হলো, সেটা করা উচিত নয়, আর আপনাদের সম্ভ্রমের পক্ষেও সেটা ভাল নয়, ভাল দেখায় না।

ছায়া—আপনি ঠিকই বলেছেন, ইয়ে...আপনার নাম তো জানি না।

লজ্জিত ছায়া রায়ের মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে ভবনাথ বলে—ভবনাথ মুখার্জী।

পর মুহূর্তেই অন্যমনস্কের মতো আবার অন্যদিকে তাকিয়ে ভবনাথ বিড় বিড় করে বলে—কি আশ্চর্য, নাম পর্যন্ত জানেন না, কিন্তু খুব তো বিশ্বাস করেন।

কিছুক্ষণ যেন স্তব্ধ হয়েই থাকে নিমগাছের ছায়া। প্রশ্ন নেই, উত্তরও নেই। বেতের মোড়া ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় ভবনাথ।

বিচলিতভাবে প্রশ্ন করে ছায়া রায়—তাহলে কি করব বলুন?

ভবনাথ—আপনাকে কিছু করতে হবে না। আমি এখন আমার টাকা খরচ করেই এলাহাবাদে যাই। ফিরিয়ে আনি সুশোভনবাবুকে, তারপর একদিন সুবিধে মতো শোধ করে দেবেন টাকাটা।

ছায়া রায়ের শুকনো চোখে এইবার যেন একটু বাষ্পের আভাস ফুটে ওঠে। —এতটা আশা করি না, এতটা উপকার দাবি করা উচিত নয়, তাই হ্যাঁ বলতে পারছি না ভবনাথবাবু।

ছটফট করে ওঠে ভবনাথের নিঃশ্বাস, ছায়া দেখে ভয়-পাওয়া শিশুর মতোই ভবনাথের চাহনিতে আতঙ্ক কাঁপে। ব্যস্ত হয়ে ওঠে ভবনাথ।—তবে আমি রওনা হলাম ছায়া রায়, আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করতে পারব না।

ছায়া রায়—মা যে আপনার জন্য রান্না শুরু করে দিয়েছেন, না খেয়ে যাবেন না।

ভবনাথ—না, তা হয় না। অসম্ভব।

নীরবে, শুধু একটু বিস্মিত হয়েই তাকিয়ে থাকে ছায়া রায়। মনে হয়, যেন জাত যাওয়ার ভয়ে অচেনা লোকের বাড়িতে খাওয়ার নাম শুনেই পালিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন ভবনাথবাবু, এলাহাবাদের ডাক্তার তিনকড়ি মুখার্জীর ভাইপো, যার হাতের দুই আঙুলে দুটি সোনার আংটি।

ছায়া রায় বলে—আমরাও ব্রাহ্মণ।

কিন্তু যেন প্রলাপ বলতে বলতেই এগিয়ে চললো ভবনাথ—বেশ তো....শুনে সুখী হলাম...ব্রাহ্মণ তো কতই আছে পৃথিবীতে...।

ছায়া রায় ডাকে—ভবনাথবাবু!

ভবনাথ মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দেয়—তোমার মাকে আমার প্রণাম জানিয়ে দিও ছায়া রায়, আমি বিদায় নিলাম।

আবার ডাকে ছায়া রায়—ভবনাথবাবু, কবে আন্দাজ ফিরছেন বলে যান।

থমকে দাঁড়ায় ভবনাথ। কি ভয়ানক মূর্খ এই একশো ছত্রিশের ঊনপঞ্চাশের সি! কিন্তু বেশি মূর্খ বলেই বোধ হয় মমতা জাগে কঠোর তস্করতায় কঠিন ভবনাথের শুকনো হৃদপিণ্ডের এক কোণে।

ফিরে আসেন ভবনাথ, আবার সেই নিমের ছায়ার নিচে শান্ত হয়ে দাঁড়ায়। চিন্তিত ভঙ্গিতে ভুরু কুঁচকিয়ে বলে ভবনাথ—আমার মনে হয়, আমি ভুল করেছি, আর তোমরাও ভুল করেছ ছায়া রায়।

বলতে বলতে আর একটা যন্ত্রণা চাপতে চাপতে কি-রকম যেন হয়ে যায় ভবনাথেব মুখের চেহারা।

ছায়া রায়—কিসের ভুল?

ভবনাথ—এলাহাবাদে যে সুশোভনবাবুকে দেখে এলাম, তিনি সত্যই এ বাড়ির সুশোভনবাবু

কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হচ্ছে।

ছায়া রায়—বাঁ কানের কাছে আঁচিল নেই?

ভবনাথ—না।

ছায়া রায়—সব সময় নাম জপ করেন না?

ভবনাথ—তা তো মনে হয় না।

ছায়া—খুব ফরসা আর লম্বা চেহারার মানুষ?

ভবনাথ—না, মোটেই ফরসা নন আর লম্বাও নন।

ঝর্ ঝর্ করে ছায়া রায়ের দু'চোখ থেকে জল ঝরে পড়ে। —তবে আপনি মিছিমিছি কেন এলেন?

ভবনাথ—হ্যাঁ, ভুল হয়ে গিয়েছে, এতটা ভেবে দেখিনি।

চুপ করে থাকে ছায়া রায়।

ভবনাথ বলে—এখন তবে তুমি বলো ছায়া রায়, আমি কি করতে পারি।

ছায়া—আমার বাবাকে খুঁজে বের করুন।

ভবনাথ—কোথায় যেতে পারেন, কোথায় থাকার সম্ভাবনা, এ রকম কিছু একটু না জানা থাকলে কেমন করে কোথায় খুঁজব?

ছায়া রায়—বাবা গঙ্গায় স্নান করতে ভালোবাসেন, কালীঘাটের মন্দিরে আরতি দেখতে ভালোবাসেন।

ভবনাথ—গঙ্গার ঘাটে আর কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে তোমরাই খোঁজ কর না কেন?

ছায়া রায়—করেছি, কিন্তু সাক্ষাৎ পাইনি। আর রোজই তো যাওয়া যায় না, সাধ্যিও নেই। তাছাড়া, এসব খোঁজাখুঁজি আর নানা জায়গায় দৌড়াদৌড়ির কাজ কি মেয়েদের পক্ষে সম্ভব?

ভবনাথ—চেষ্টা করব আমি?

ছায়া রায়—করুন।

ভবনাথ—বেশ, এবার চলি ছায়া রায়।

ছায়া রায়—আসুন।

খুবই শান্ত স্বরে, একটুও বিস্মিত ও দুঃখিত না হয়ে ভবনাথকে বিদায় বাণী শুনিয়ে দিচ্ছে একশো উনপঞ্চাশের সি। একেবারে ধীর স্থির আর শান্ত হয়ে রয়েছে ছায়া রায়ের ছায়া। কোন উৎসাহ আর বাজে না ছায়া রায়ের কণ্ঠস্বরে, কোন আশা আর চমকে ওঠে না ছায়া রায়ের চোখে।

চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয় ভবনাথ। কিন্তু ভবনাথের বুকের ভিতরেই কাঁটার আঘাতের মতো তীক্ষ্ণ একটা খোঁচা লাগে যেন। একেবারে ব্যর্থ হয়ে আর হেরে গিয়ে পালিয়ে যেতে হচ্ছে ভবনাথকে। কিন্তু একেবারে কিছুই না নিয়ে গিয়ে এত ভয়ানক শূন্য হয়ে চলে যেতে চায় না মন। দাগী জীবনে না হয় আর একটা মিথ্যার দাগ পড়ুক, ঐ মাটির দেওয়ালে আঁকা কয়লার আঁচড়ের মতো একটা দাগ।

ছায়া রায়ের চোখ জলে ধোওয়া কাচের মতো চক্‌চক্ করে। আর ভবনাথ তাকিয়ে থাকে, আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে থাকা মানুষের মতো অতিদূরের মোহে মুগ্ধ দুটি চক্ষু তুলে, ছায়া রায়ের মুখের দিকে। হঠাৎ প্রশ্ন করে ভবনাথ—তোমার বাবাকে যদি খুঁজে নিয়ে আসতে পারি

ছায়া রায়?

ছায়া রায়—আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

ভবনাথ—তার মানে?

উত্তর দেয় না ছায়া রায়। ভবনাথ যেন তার এই অন্ধকারে ঢাকা রিস্কি জীবনেরই পাথরে চাপা পড়া এক দুর্লভ লোভের ব্যাকুলতা সহ্য করতে না পেরে চেঁচিয়ে ওঠে—বলো ছায়া রায়!

ছায়া রায়—আপনি যা মনে করেন তাই।

ভবনাথ—ঠিক তো?

ছায়া—হ্যাঁ।

ভবনাথ—কোন আপত্তি নেই তোমার মনে?

ছায়া—একটুও না।

ভবনাথ—তোমার মা যদি আপত্তি করেন?

ছায়া—কেন আপত্তি করবেন মা? আপনিও তো ব্রাহ্মণ।

আর কোন প্রশ্ন নেই। যেন ছায়া রায়ের এই শেষ কথার মধুরতা মুহূর্তের মধ্যে বুকের ভিতরে লুকিয়ে ফেলেছে ভবনাথ, পাকা চোর যেমন সোনার হার গিলে ফেলে।

আর মুখ ফিরিয়ে একবার তাকায়ও না ভবনাথ। হনহন করে যেন এই পৃথিবীর কোন কাঁটার ঝোপে লুকিয়ে পড়ার জন্য ব্যস্তভাবে চলে যায় ভবনাথ।

কালীঘাটের মন্দিরে আরতি যখন শেষ হলো, আর মন্দিরের বড় দরজা দিয়ে শেষ দর্শকও যখন বের হয়ে গেল, তখন আর একবার চমকে উঠলো ভবনাথ। ছায়া রায়ের নিরুদ্দিষ্ট বাবাকে সত্যিই যে খুঁজতে এসেছে ভবনাথ। কি আশ্চর্য, এ আবার কোন্ মূর্খতার খেলা অকারণে একটা ছায়ার অনুরোধের জন্য এত সময় নষ্ট করা? শুনলে কালীশ যে হো হো করে হেসে উঠবে।

কিন্তু কালীশ নিশ্চয়ই জানে না যে, নিমেরও মুধ হয়, নিমের বিষতেতো বুকের ভেতরে যাক্ গে। এসব কথা কালীশকে বলে কোন লাভ হবে না, বেটা বিশ্বাসই করবে না।

কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে ভবনাথের। গিলে-ফেলা সোনার হারের মতো একটা আশা যেন থেকে থেকে কচ্‌কচ্ করে কষ্ট দিচ্ছে গলার ভিতরটাকে। মনে হয়, এইভাবেই রোজ সন্ধ্যায় এখানে আসা যায়, তবে নিশ্চয়ই একদিন আরতি আলোকে হঠাৎ দেখে ফেলবে ভবনাথ, ছায়া রায়ের বাবা সুশোভনবাবু, গায়ে গরদের চাদর জড়ানো লম্বা ফরসা সুশোভনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

যাই হোক, আজ এখানে কোন কাজ নেই। আবার কাল সন্ধ্যা। এখন বরং কালীশের কাছে গিয়ে, আর এক কাপ গরম চা দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নেওয়াই ভাল। কালীশটাও নিশ্চয় এতক্ষণে নানা দুশ্চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে। চলতে থাকে ভবনাথ।

চায়ের দোকনে ভবনাথ ঢুকতেই কালীশ বলে—যাক, খুব বেঁচে গেলি ভব। আর একটু দেরী করলেই নির্ঘাৎ হাতে নাতে ধরা পড়ে যেতিস।

ভবনাথ—ধরা পড়বো কেন রে বেটা!

চায়ের দোকানের টেবিলের উপর থেকে খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে এসে কালীশ বলে—এই দেখ।

শূন্য দৃষ্টি তুলে খবরের কাগজেরই বুকের এক জায়গায় একটা শূন্যতার দিকে তাকিয়ে থাকে ভবনাথ। ছায়া রায়ের আবেদন, সেই ছোট সন্ধান চাই, বিজ্ঞাপনটা ছুরি দিয়ে পরিষ্কার করে কে যেন কেটে নিয়ে চলে গিয়েছে।

ভবনাথ—এ কি ব্যাপার কালীশ!

কালীশ—হেডমাস্টার আশুবাবু ঐ বিজ্ঞাপন কেটে নিয়ে গিয়েছেন। তাঁরই বাড়িতে আছে হারানো লোকটা। এতক্ষণে বোধহয় লোকটাকে একেবারে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়েই ফেলেছেন।

চুপ করে বসে থাকে ভবনাথ।

কালীশ প্রশ্ন করে —চা খাবি?

—না।

—কেমন দেখলি, বেশ বড় লোকের বাড়ি?

—মোটেই না।

—কিছু হাতড়াতে পারলি?

—কিচ্ছু না।

—তাহলে স্রেফ?

—স্রেফ ঠকে এসেছি মাইরি।

স্নানযাত্রা

মেলাটা শুরু হয় বৈশাখী পূর্ণিমার কাছাকাছি কোন একটা দিনে; শেষ হয় এসে জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমাতে, স্নানযাত্রার শুচিতাময় উৎসবটা যেদিন বটেশ্বরপুরের মহাসমারোহের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। এই এক মাস ধরে মেলাটা যেন বটেশ্বরপুরের জীবনটাকে রকমারি জিনিস আর মানুষের ভিড় দিয়ে, আর রকমারি আনন্দের কোলাহল দিয়ে মাতিয়ে রাখে।

নাগরদোলা দোলে, এঁটো সরবতের জলে কাদা হয়ে যায় মাটি; সেই সঙ্গে বাউলের একতারা বাজে। কোলাহলের মধ্যে গান, আর গানের মধ্যে কোলাহল। ছাইমাখা মৌনীবাবা আর ঊর্ধ্ববাহু সাধু চুপ করে বসে থাকেন, আর হরিদ্বারী সাধু নানা রকম আসন ও প্রাণায়ামের কসরত দেখান।

শুধু যত মনোহারীর আর অমনোহারী খোল-ভুষির দোকান নয়, সোনা-রূপো বেচা-কেনারও দোকান বসে। পাইকারী ব্যাপারীদের বড়-বড় লেনদেন হয়; তেজারতী মহাজনের বন্ধকী কারবারও চলে। সবচেয়ে বড় কারবারী কাজ করে ভাগলপুরী গোয়ালার দল। একমাসের মধ্যে হাজার দুই গরু-মহিষ বিক্রী করে, আর স্নানের শেষে ঢোলক বাজিয়ে ওরা চলে যায়।

এ জেলার এদিকে-ওদিকে প্রায় চারদিকে ঘুরে অনেকবার রিলিফের কাজ করেছে ইন্দুনাথ, কিন্তু বটেশ্বরপুরে কোনদিন আসতে হয়েছে বলে মনে পড়ে না। কলকলি, জটাবাহিনী আর পটলেশ্বরী, তিনটে নদী তিনদিকে থাকতেও, ঐ তিন নদীর বন্যার জল বটেশ্বরপুরের ধানক্ষেতে গড়িয়ে আসতে পারেনি। বানের জল শুধু নদীগুলির ও-পার ছাপিয়ে ফকিরবাড়ি, জয়কালীগঞ্জ আর কুমীরমারিকে ডুবিয়ে দিয়েছিল।

বটেশ্বরপুরের ডাঙাতে একটি বুড়ো বট আছে, সেই বটের কাছে পুরনো মন্দিরের আঙিনায় বেশ পুরনো আর নড়বড়ে একটি রথ রাখা আছে; আর, সেই আঙিনা থেকে সামান্য একটু দূরে বাসুদেব সরোবর নামে একটা বড় ডোবা আছে। তাই বিশ্বাস করতে অসুবিধে নেই, বটেশ্বরপুরের ডাঙার বুকে এতগুলি পুণ্যি বাঁধা পড়ে আছে বলেই তিন নদীর বানের জল এদিকে গড়িয়ে না এসে ওদিকে গড়িয়ে যায়।

ইন্দুনাথের কাছে বটেশ্বরপুর জায়গাটা চেনা চেনা না হলেও নামটা যেন শোনা-শোনা মনে হয়। মেলা শুরু হবার সাতদিন আগে থেকে একটি কর্মীদল নিয়ে সড়কের পাশে ক্যাম্প করেছে ইন্দুনাথ। সবশুদ্ধ ওরা বিশজন। এদের মধ্যে বলতে গেলে একমাত্র ইন্দুনাথ ছাড়া আর সবাই বয়সে এখনও অযুবক, প্রায় ছেলেমানুষ বলা যায়। এখানে ইন্দুনাথই কর্মীদলের নেতা।

ইন্দুনাথের কাছে যিনি নেতা, যিনি এ জেলার প্রায় সকলজনের শ্রদ্ধার মানুষ সকল রকমের স্বদেশী কাজ আর সেবার কাজের যিনি প্রেরণাদাতা, সদরের উকীল সভার প্রেসিডেন্ট সেই কাঞ্জিলালমশাই কর্মীদলের এ বছরের বার্ষিক সভায় প্রস্তাবটা তুলেছিলেন। প্রস্তাবে কেউ আপত্তি করেনি। প্রকাণ্ড একটা চরিত্রবাদিতার প্রস্তাব নয়। প্রকাণ্ড একটা পাপমোচন যজ্ঞ করবার প্রস্তাবও নয়। প্রস্তাব হলো, ধর্মের নামে যেখানে মেলা বসবে সেখানে ওরকম একটা কুৎসিত কাণ্ড চলবে কেন? ওটা খুব খারাপ একটা প্রথা নয় কি? ওরকম একটা প্রথা চলতে দেওয়া সমাজের মানুষের পক্ষে কি একটা অপমান নয়?

প্রতি বছর বটেশ্বরপুরের মেলা যেখানে বসে, তারই প্রায় গা ঘেঁষে আর পুরনো মন্দির থেকে খুব সামান্য দূরে আর-এক রকমের একটা উপনিবেশ গড়ে ওঠে। এটা হলো মানুষেরই একটা অমানুষিক মেলা। ছোট-বড় প্রায় শতাধিক ছাউনি-ঘর আর প্রায় শতাধিক পতিতা। কোথা থেকে, যেন একটা অদৃশ্য জগতের আনাচ-কানাচ থেকে বের হয়ে আর ছুটে এসে ওরা এই স্নানযাত্রার মেলাতে এক মাস ধরে রোজগারের একটা ভয়ানক উৎসব সমাপন করে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। বাজারের কোন কোন লোকের মুখে এমন গর্বের কথাও শোনা গিয়েছে, শুধু হেঁজি-পেঁজি হাভাতির দল নয়, কাশীওয়ালী দেবীদাসী আসে, গাজিপুরের নাচুনী বাঈজীও আসে।

কাঞ্জিলালমশাই-এর প্রস্তাব, পিকেটিং করে এই খারাপ প্রথাটাকে বাধা দিতে হবে। কিন্তু কার উপরে একাজের ভার দেওয়া যায়?

ইন্দুনাথ আশ্চর্য হয়েছিল—কেন? আমার উপর ভার দিতে আপনার কি কোন আপত্তি আছে?

কাঞ্জিলালমশাই বিব্রতভাবে বলেন—না না, কোন আপত্তি নেই। তবে কিনা... এ কাজে একটু বেশি সাহস দরকার; কারণ এ কাজের বাধাগুলি বেশ একটু অদ্ভুত·রকমের কিনা, সেইজন্যে।

ইন্দুনাথ—তাহলে আমিই তৈরি হই।

ইন্দুনাথের ইচ্ছার এই ব্যস্ততা যেন ইন্দুনাথের একটা অভিমানের ব্যস্ততা। কঠিন বাধা তুচ্ছ করতে এত ভালবাসে যে, শান্ত দুঃসাহসের মানুষ বলে এত সুনাম রটে গিয়েছে যার, তাকে চিনতে এখনও দেরি করেন কেন কাঞ্জিলাল মশাই?

কাঞ্জিলালমশাই জানেন, এম-এ পড়ার শেষ বছরটাকে পূর্ণ হতে না দিয়ে গ্রামে চলে এসেছিল ইন্দুনাথ। দেশের উপর একটা মায়ার নেশা বলা যায়, কিংবা একটা সৎ কাজের জন্য প্রাণ দিয়ে খাটবার নেশাও বলা যায়, ইন্দুনাথের মন আর প্রাণ দুই-ই মেতে উঠেছিল। ছোট শরিকের কাকার

কাছে বসতবাড়িটা বন্ধক দিয়ে টাকা যোগাড় করে, আর প্রায় দু'বছর ধরে অনেক খাটুনি খেটে রাজীবনগরের স্কুলটা গড়ে তুলেছিল ইন্দুনাথ।

প্রত্যেকটি প্রতিজ্ঞার কাজকে জয়ী না করে ক্ষান্ত হয়নি ইন্দুনাথ। জেলার সদরে শহরে বিলাতী কাপড় অচল হয়েছে, রঘুনাথপুরের বাজার থেকে আবগারী মদের দোকান উঠে গিয়েছে, বড়গাছিয়ায় চাঁড়ালপাড়ার প্রত্যেকটি পুরুষ কৃত্তিবাস পড়তে আর নিজের নাম লিখতে শিখেছে, রাণীহাটের কুমোরেরা একটা কো-অপারেটিভ করেছে, এই সবই তো ইন্দুনাথের এক একটি সৎপ্রতিজ্ঞার সফলতা।

ইন্দুনাথের সব বিষয়সম্পত্তি একে একে বাগিয়ে ফেলেছেন ছোট শরিকের কাকা, আর যত আর্তত্রাণ ও আন্দোলনের কাজে বেহিসাব টাকা বিলিয়ে দিচ্ছে ইন্দুনাথ। বাপ নেই, মা নেই, সম্পত্তিটা তবু তো ছিল। কিন্তু সর্বস্ব খুইয়ে কাঙাল হয়ে যাবার ভয়টাও ইন্দুনাথের জীবনে যেন কোন ভয়ই নয়। কাকাও বলে দিয়েছেন, তোমার বিষয়-আশয় বলতে বিশেষ আর কিছু নেই ইন্দু, শুধু আছে রানীহাটের মেটে বাড়িটা; দাম বড়জোর তিন হাজার হবে।

সদরে ট্রেজারির সামনে একশো চুয়াল্লিশ তুচ্ছ করবার জন্য সবার আগে এগিয়ে গিয়েছিল যে, সে হলো ইন্দুনাথ। রাইফেল তুলে দাঁড়িয়েছিল গোরা সোলজারের যে দুরন্ত পিকেট, আস্তে আস্তে হেঁটে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সময় ইন্দুনাথের চোখের দৃষ্টি একটু অশান্ত হয়নি।

বন্যার সময় রিলিফের কাজে খাটতে গিয়ে কর্মীদলের ছেলেরা দেখে চমকে উঠেছে, ইন্দুদার সত্যিই কোন ভয়-ডর নেই; বোধহয় ঘৃণা বোধও নেই। কুষ্ঠী বুড়োটার পায়ের ক্ষতগুলোকে একেবারে হাত দিয়ে ছুঁয়ে আর ধুয়ে-মুছে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন ইন্দুদা, হাতটা একটুও কাঁপল না।

ইন্দুনাথের সুশ্রী মুখটাও জানিয়ে দেয়, ওর মনটা কত সুশ্রী। ক্যাম্প যেন সব সময় ফিটফাট থাকে, বিছানাগুলিকে এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকতে দেয় না। কেউ যদি ভুল করে কম্বলটাকে মেঝের উপর ফেলে রাখে, ইন্দু এসে নিজেই সেই কম্বলকে ধুলো-ঝাড়া করে আর পাট করে বাঁশের ভারার উপর তুলে রাখে।

কলেরার সময় রিলিফ খাটতে গিয়ে দেবীডাঙায় এসে একবার বেশ অপ্রস্তুত হয়েছিল কর্মীদল। গ্রামে কোন মানুষ ছিল না, কলেরার ভয়ে সবাই পালিয়েছে। কর্মীদলের ছেলেরা দেখেছিল, একটা শূন্য বাড়ির বাগানের ভিতরে ঢুকে অদ্ভুত রকমের একটা রিলিফের কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ইন্দুদা। আম গাছের একটা মরা ডাল ভেঙে পড়ে কচি শিউলিটাকে চেপে রেখেছিল। মরা আমডাল সরিয়ে দিয়ে শিউলিটাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন ইন্দুদা। অপরাজিতার লতা মাটির উপর কাদা মাখা হয়ে লুটিয়ে পড়েছিল। ইন্দুদা লতাগুলিকে বেড়ার গায়ে তুলে দিলেন। তুলসীটার চারদিকে ঘাসের জঙ্গল ঘন হয়েছিল। চটপট হাত চালিয়ে ঘাসের জঙ্গলটা উপড়ে ফেলে দিলেন ইন্দুদা।

পাঁচজনে ভাল চোখে দেখেনি, একরকমের দুঃসাহসের কাজও কত শান্তভাবে করে দিতে পারে ইন্দুনাথ। রাজীবনগরের স্কুলবাড়ির খেলার মাঠের উপর রাতারাতি একটা চালা তুলে নিয়ে মা শীতলার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল চক্রবর্তী ঠাকুর নামে একজন সাধুগোছের আগন্তুক। দেখে একটুও বিচলিত না হয়ে, আর ভালমন্দ কোন কথা না বলে ইন্দুনাথ সেই শীতলাকে তুলে নিয়ে পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছিল।

স্নানযাত্রার মেলাতে ভয়ানক কুপ্রথাটাকে বাধা দেবার জন্য পিকেটিং চালাবার সব দায়িত্ব নিয়ে বটেশ্বরপুরে এসেছে এই ইন্দুনাথ।

সারাদিন আর সারারাত, জেগে থাকে আর দাঁড়িয়ে থাকে পিকেট। কাদাটে খালটার উপরে সুপুরিগাছে ফেলে যে সাঁকোটা বাঁধা হয়েছে, ঠিক তারই মুখে দাঁড়িয়ে থাকে কর্মীদলের ছেলেদের একটা সতর্ক ভিড়। এই সাঁকোটা পার না হয়ে ওদিকে, সারি সারি চালাঘর দিয়ে সাজানো সেই নোংরা পৃথিবীটার দিকে এগিয়ে যাবার আর কোন পথ নেই। পিকেটিং-এর একটা সচল দল ঘুরে বেড়ায়, কাদাটে খালের কিনারা ধরে আসশেওরার বাদাড় পর্যন্ত। কোন বিল্বমঙ্গল যেন খাল সাঁতরে ওদিকে গিয়ে উঠবার সুযোগ না পেয়ে যায়। রাত্রিবেলা কর্মীদলের টর্চের আলো মাঝে মাঝে ঝলসে উঠে অন্ধকারটাকেও শাসিয়ে রাখে।

পিকেটিং-এর প্রথম দিনটা পার হয়ে যেতেই বুঝতে পারে ইন্দুনাথ, কাঞ্জিলালমশাই কত মিথ্যে আশঙ্কা করেছিলেন। উপদ্রব পিকেটিং-এব কাছে এগিয়ে আসেনি। এই পিকেটিংটাই যেন একটা কঠোর চক্ষুলজ্জার শাসন। কাউকে বাধা দেবার দরকারই হলো না, কারণ কোন নির্লজ্জতা এই পিকেটিং তুচ্ছ করবার জন্য এগিয়ে এল না।

কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই সন্দেহ করতে হলো, না, যেন আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে একটা বিদ্রোহ। সে রাত্রে ক্যাম্পের বেড়াতে আগুন লাগলো।

পরের রাতটাও বাদ গেল না। কিচেনের ভিতরে রাখা সব চাল-ডাল চুরি হয়ে গেল। তার পরের রাতটাও বাদ গেল না। কর্মীদলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ নিয়ে টহল দিয়ে বেড়ায় যে জনার্দন, তারই মাথার উপর ঝামা-ইঁটের একটা ঢিল এসে আছড়ে পড়লো। টহল ছেড়ে দিয়ে ক্যাম্পে ফিরে আসে জনার্দন। —না ইন্দুদা, এখানে আর টিকতে পারা যাবে না।

—খুব পারা যাবে। সারারাত আমি একাই টহল দেব। আস্তে আস্তে কথা বলে ইন্দুনাথ। কিন্তু গলার এই শান্ত স্বরটাই বুঝিয়ে দেয়, বাধা পেয়ে ইন্দুনাথের প্রতিজ্ঞার উৎসাহটাই মেতে রয়েছে।

জনার্দনের কপাল ফেটে রক্তের ধারা ঝরছে। কপালের ক্ষত আইডিন দিয়ে ধুয়ে আর কাপড়ের পটি দিয়ে বেঁধে দিয়ে জনার্দনের টর্চটা হাতে তুলে নিয়ে ক্যাম্পের বাইরে এসে দাঁড়ায় ইন্দুনাথ। চোখের দৃষ্টিটা তবু শান্ত। একটা শান্ত প্রতিজ্ঞার দৃষ্টি। আজ সারারাত ইন্দুনাথ একা টহল দিয়ে ঘুরবে।

হঠাৎ ইন্দুনাথের মুখের উপর একটা টর্চের আলোর ঝলক ছুটে এসে পড়ে। তারপর মচমচ করে জুতোপরা পায়ের একাট শব্দও এগিয়ে আসতে থাকে। ইন্দুনাথেব কাছে এসে থেমে যায় শব্দটা।

—কে আপনি? জিজ্ঞাসা করে ইন্দুনাথ।

ইন্দুনাথের মুখের উপর আবার টর্চের আলো পড়ে, আর, একটা গভীর স্বর যেন রাগ চেপে চেপে কথা বলে—এ তল্লাটে সবাই যাকে চেনে আর জানে, সেই আমি। আমি জিজ্ঞেস করছি আপনি কে?...ও হরি...এ যে তুমি...আমাদের সেই ইন্দুনাথ।

এইবার নিজেরই মুখের টর্চের আলো ফেলে আগন্তুক মানুষটা হেসে ওঠে। —দেখ তো চেয়ে আমারে তুমি চিনতে পার কিনা?

চিনতে পারে ইন্দুনাথ। বর্ধমান কলেজে পড়বার সময় বটেশ্বরপুরের জমিদারবাড়ির ছেলে যে চিরঞ্জীব ইন্দুনাথের একক্লাসের বন্ধু ছিল, সেই চিরঞ্জীব। কিন্তু সেই চিরঞ্জীবের একটা নতুন পরিচয়ও পেয়ে যায় ইন্দুনাথ। মুখ ভরা হাসি যেন বুক ভরা মদের গন্ধ উথলে দিচ্ছে চিরঞ্জীব।

চিরঞ্জীব বলে—নেই কাজ, তো খই ভাজ; এটা যে তোমার জীবনের আদর্শ, সেটা আমি সেই কলেজ যুগেই ধরতে পেরেছিলাম হে ইন্দুনাথ। কিন্তু তুমি যে শেষে আমার আদর্শকে দাগা দেবার জন্য আমরাই রাজ্যে এসে ঢুকবে, এ তো বুঝতে পারিনি রে বাবা।

ইন্দুনাথ—তোমার রাজ্য মানে কি?

চেঁচিয়ে হাসে চিরঞ্জীব—আমি যে এখন বটেশ্বরপুরের মেজকর্তা, এই সত্যটা কি তুমি জানতে না?

—না।

—জানলে বোধহয় আমার দশ হাজার টাকার তোলা আদায়ের লক্ষ্মীস্বরূপা এই মেলাটিকে বিরক্ত করতে তুমি আসতে না।

—আসতাম বই কি।

—কেন? তোমার আদর্শের চরণে কোন্ অপরাধ করেছে মেলাটা?

—এই মেলাতে একটা খারাপ প্রথা চলে, সেটা বন্ধ করতে এসেছি।

—খারাপ প্রথা? প্রথাটা যে তোমাদের স্বর্গধামেও চলে ইন্দুনাথ।

—মর্ত্যধামে না চললেই ভাল।

—কিন্তু মর্ত্যধামের চরিত্র শুদ্ধ করবার হুকুমনামা তোমাকে দিলে কে?

—তুমি ভুল বুঝেছ চিরঞ্জীব। স্নান-যাত্রার নামে একটা মেলা বসেছে, সেখানে এসব প্রথাকে প্রবেশ না করতে দেওয়াই ভাল।

—বেশ তো এবার তুমি বল, ওরা তাহলে খাবে কি?

—কি বললে?

—ওরা এখানে রোজগারের জন্য এসেছে। ওদের রোজগারের উপায় বন্ধ করে দিয়ে তুমি ওদের ভাতে মারছো। এটা কেমনতর আদর্শ হলো; আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও দেখি।

চিরঞ্জীবের মূর্তিটা যেন আহ্লাদের দোলায় দুলতে থাকে, পায়ের চকচকে পাম্পসু মচমচ করতে থাকে। মদের গন্ধে ভরা হাসিটাকেও দুলিয়ে দিয়ে চিরঞ্জীব বলে—ব্রেথা চেষ্টা ইন্দুনাথ। বুঝিয়ে দেবার সাধ্যি নেই তোমার।

ইন্দুনাথ নীরব হয়ে গিয়েছে। চিরঞ্জীবের হাসির শব্দটা যেন সত্যিই একটা কঠিন ঠাট্টার ঝামা ইঁট হয়ে ইন্দুনাথের কপালের উপর আছড়ে পড়েছে। ওরা খাবে কি? সত্যিই তো, ওদের ভাতে মারবার কি অধিকার আছে ইন্দুনাথের?

চিরঞ্জীব বলে—তুমি যে মস্ত পিকেটিং-বিশারদ, সেটা আমার অজানা নয় ইন্দুনাথ। তুমি একটা বাজারকে মদ-ছাড়া করেছ, একটা শহরকে বিলাতী-কাপড়-ছাড়া করেছ। কিন্তু বটেশ্বরপুরের মেলাটাকে প্রথা-ছাড়া করতে পারবে না বন্ধু। ব্রেথা চেষ্টা। অতএব, অবিলম্বে প্রস্থান কর। বন্ধুভাবেই তোমাকে এই উপদেশ দিয়ে গেলাম।

ইন্দুনাথ—আমি যাব না চিরঞ্জীব, তুমি বৃথা উপদেশ দিও না।

চিরঞ্জীব—তার মানে, তোমার ইচ্ছা করিবে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে?

ইন্দুনাথ—জানি না।

চিরঞ্জীব—আচ্ছা, কিন্তু শেষ যেন আমারই ইচ্ছা না হয় পূর্ণ তোমার জীবন মাঝে।

চলে গেল চিরঞ্জীব। কিন্তু চিরঞ্জীবের উপদেশ যেন ইন্দুনাথের প্রতিজ্ঞার প্রাণটার উপর কাঁটার মত বিঁধতে থাকে। সত্যিই কি চলে যেতে হবে?

সকাল হতেই ইন্দুনাথের প্রতিজ্ঞার প্রাণটাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্য সাঁকোর ওদিকের মুখের কাছে আর একটা বিদ্রোহের ভিড় দেখা দিল। এক গাদা হিংস্র ধিক্কার বিলাপ অভিশাপ করে গালাগালির ভিড়। কর্মীদলের ছেলেরা মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে; আর ইন্দুনাথ স্তব্ধ হয়ে সেই ভিড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। জীবনে বোধহয় এই প্রথম, ইন্দুনাথের সেবাব্রত শান্ত মন একটা অবুঝ দুশ্চিন্তার পীড়নে অশান্ত হয়ে ওঠে।

—কি গো বাবু, স্বদেশী করবার কি আর জায়গা ছিল না? এখানে মরতে এলে কেন?

—ধম্মের বক ঠাকুর এয়েছেন।

—জীব তরাতে এয়েছেন দয়াবিষ্টুর অবতার।

—ঝাঁটা মার্; এঁটো ছুঁড়ে মার্; বোত্তলপেটা করে ধম্ম ছুটিয়ে দে।

—ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারবার কশাই।

শাড়ির আঁচলটা শক্ত করে কোমরে জড়ানো, চোখের কোলে কাজলের মোটা প্রলেপ, খোঁপাটা এলোমেলো হয়ে ঝুলছে, এইরকম একটি মূর্তি কয়েক পা এগিয়ে একেবারে ইন্দুনাথেব চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। —রাগের কথা বলছি না মশাই, দুঃখের কথা বলছি। আপনি একটু বুঝে দেখুন।

ইন্দুনাথ—বলুন, কি বুঝতে বলছেন।

—আপনি আমাদের রোজগার এভাবে বন্ধ করে দিলে আমাদের পেট চলবে কি করে?

—রোজগারের জন্যে এখানে এসেছেন কেন আপনারা?

—কেন? এখানে এসে কোন্ ভুলটা হলো?

—এখানে লোকে ধর্মের নামে আসে, একটা স্নানযাত্রার মেলা।

—আমরাও তো সেই জন্যে এসেছি গো মশাই। ধম্মের নামে এসেছি।

সাঁকোর ওপরে একটা বুড়ো পাকুড়ের গোড়ায় সিঁদুর মাখানো একটা পাথরকে দেখিয়ে দিয়ে আর হাত তুলে কপালটাকে ছুঁয়ে ভক্তিনত একটা ভঙ্গী করে চেঁচিয়ে ওঠে কাজল-লেপা চোখের সেই নারী—চোখভুলানি মায়ের আদেশ আছে, পুণ্যিস্থানে রোজগার করতে হয়। মাগিরা চিনিসিঁদুর দিয়ে মাকে পুজো করে আর আদেশ নিয়ে তবেই না রোজগারে নেমেছে।

—ওসব কথা ছেড়ে দিন। তবে...হ্যাঁ...।

—বলুন তাহলে, আমরা কি করি?

—স্নানযাত্রা পর্যন্ত রোজগার বন্ধ রাখুন।

—তারপর?

—তারপর যা ইচ্ছে হয় করবেন।

—তা তো করবোই। তারপর থাকলেও করবো, চলে গেলেও করবো। কিন্তু একটা মাস পেটে খেয়ে বাঁচবো, তবে তো?

—সে ব্যবস্থা যদি করে দিই?

—তাহলে...। চুপ করে কি-যেন ভাবে, কোমরে শক্ত করে আঁচল জড়ানো সেই উগ্রতা।

পতিতাদের ভিড়টাও হঠাৎ চুপ করে কি-যেন ভাবে। তারপর, যেন একটা অনিচ্ছাময় স্বীকৃতির গুঞ্জন গুন গুন করে।—তবে তাই হোক। স্বদেশীবাবু যদি একটা মাসের খোরাক দিতে পারেন, তবে রোজগার না হয় বন্ধ রাখাই যাবে; পূর্ণিমার দিনটা পেরিয়ে যাক্।

চিরঞ্জীবের উপদেশের ঠাট্টাটা মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। সাঁকোর মুখে পিকেটিং তেমনই দাঁড়িয়ে থাকে। আর সেই সঙ্গে রিলিফের কাজও চলে।

কর্মীদলের তিন-চারজন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে পতিতা উপনিবেশের প্রতি চালাঘরের দরজার কাছে সিধে পৌঁছে দিয়ে যায় ইন্দুনাথ। চাল ডাল আলু আর নগদ দু'আনা।

কোন বাধা ইন্দুনাথের শান্ত মনের প্রতিজ্ঞাকে দমিয়ে দিতে পারেনি। সবচেয়ে কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছিল যে বাধা, সেটা হলো নিজেরই মনের একটা বেদনাকর অপরাধবোধের বাধা, পিকেটিং-এর ফলে মানুষগুলির ভাত বন্ধ হবে। টেলিগ্রাম করে রানীহাটের মেটে বাড়িটাকে, ইন্দুনাথের বিষয়-আশয়ের শেষ চিহ্নটাকেও কাকার কাছে বন্ধক দেবার ইচ্ছা জানিয়ে দুটি হাজার টাকা আনিয়েছে ইন্দুনাথ।

এইসব বাধাকেই বোধহয় অদ্ভুত রকমের বাধা মনে করে একটু ভয় পেয়েছিলেন কাঞ্জিলাল মশাই। কিন্তু চিঠি পেয়ে সব জানতে পেরে তিনি খুশী হবেন যে, এইসব অদ্ভুত বাধা ইন্দুনাথকে একটুও দমিয়ে দিতে পারেনি। পিছিয়ে আসতে হবে, এগিয়ে যাবার সাহস হবে না, ইন্দুনাথের জীবনে এমন ট্র্যাজেডির স্থান নেই।

এই অদ্ভুত রকমের সেবার কাজটাও ভাল লাগে। আর ভাবতে অদ্ভুত লাগে, অধঃপতিত জীবনের এই উপনিবেশের মধ্যে এমন একজন আছে, যে মানুষটা রিলিফের চাল-ডাল নিতে আপত্তি করেছিল!

সে নারীর ঘরটাকেও দেখে একটু আশ্চর্য হয়েছে ইন্দুনাথ। বেশ সাজানো গোছানো একটা সৌখীন ঘর। তার চালাঘরের মধ্যে ঘড়ি আছে, ঝকঝকে আয়না আছে। ঘরের বেড়ার গায়ে উর্বশীধরনের এক নৃত্যময়ীর রঙীন ছবিও আছে। আরও অদ্ভুত, খোঁপায় ফুল গুঁজে আর ঠিক ছবিটারই সেই উর্বশীধরনের মূর্তির মত সাজ করে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল সেই তরুণী।

প্রথম দিনে পিছন থেকে ডাক দিয়ে আর খিল্‌খিল্ করে হেসে বাধা দিয়েছিল কতকগুলি কৌতুকের কণ্ঠস্বর—ওদিকে আপনার গিয়ে কাজ নেই গো বাবু। উনি হলেন দেবদাসী। আপনার দানের চাল ডাল আলু উনি ছোঁবেন না।

সত্যিই, রিলিফের চাল-ডালের দিকে একটা ভ্রূক্ষেপও না করে, বেশ গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আর ঘাড় হেলিয়ে দিয়ে, শুধু ইন্দুনাথের মুখের দিকে তাকিয়েছিল সেই নারী।

এখানে কোন দরজায় কারও সঙ্গে কথা বলবার দরকার হয়নি ইন্দুনাথের। ইন্দুনাথের সঙ্গে কেউ কোন কথা বলতে চেষ্টাও করেনি। কিন্তু এই দরজার কাছে কথা বলতে হলো। —আপনি কি সাহায্য নেবেন না?

—না।

—কেন?

—দরকার নেই।

—কেন?

—আমার খোরাক আমি নিজেই কিনে নিতে পারবো।

—কিন্তু জানেন তো, কি নিয়ম করা হয়েছে?

—কি?

—স্নানযাত্রা চুকে না যাওয়া পর্যন্ত এখানে কোনরকমের...।

—শুনেছি। সেইরকম গর্বিত ভঙ্গীতেই দাঁড়িয়ে থাকে আর একটা তুচ্ছতার ভ্রূকুটি হেনে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সেই নারী। যেন তাজা বয়স আর তাজা রূপের একটা উদ্ধত দেমাক ইন্দুনাথের এই রিলিফকে একটা কাঙালপনা মনে করে আর ঘৃণা করে মুখ ফিরিয়ে নিল।

রিলিফের দান সেই সিধে তুলে নিয়ে চলে আসছিল ইন্দুনাথ। কিন্তু তরুণী হঠাৎ বলে ওঠে—আচ্ছা, রেখে যান।

ইন্দুনাথ—আপনার যখন পয়সা আছে, তখন এসব জিনিস আপনি নাই বা রাখলেন।

উর্বশীধরনের সেই ভঙ্গীর মূর্তিটা হঠাৎ যেন লজ্জিত হয়ে, আর একটু কুণ্ঠিতভাবে হাসে—একটা মাস না হয় নিজের পয়সা খরচ না করে আপনার দানের চাল-ডাল খেলাম।

সকালবেলায় একবার আর বিকেলবেলায় একবার রিলিফের চাল-ডাল সেই উপনিবেশের প্রতি ঘরের দরজায় পৌঁছে দিতে দিতে বুঝতে পেরেছে ইন্দুনাথ, সাঁকোর ওপারের ঐ অদ্ভুত ক্লেদাক্ত দুঃখের ইচ্ছাটা যেন কোনমতে ধৈর্য ধরে একটা মুক্তির লগ্নের অপেক্ষায় দিন গুনছে। স্বদেশীবাবুর উপদ্রবটাকে ওরা মনে মনে ঠিক ক্ষমা করতে পারেনি; একটু ভয় পেয়েছে বলেই ওরা চুপ করেছে। রিলিফের চাল-ডালকে একটা ভয়ের দান হিসাবে ওরা মেনে নিয়েছে। না নিলে চলে না, হাজতঘরে যেমন কঠিন করুণার ছাতু-রুটি না খেলে চলে না।

কিন্তু এই দান না নিলেও যার চলতো, সে নিলে কেন? ভরা-সুখের ছবির মত ওরকম একটা দর্পিত চেহারা কি সত্যিই রিলিফের এই চাল-ডাল খাবে? না, শুধু একটা তামাসা করবার মতলবে একটা কথার কথা বলে দিল আর মুখ টিপে হাসলো?

এর বেশি আর কোন প্রশ্ন ইন্দুনাথের মনে দেখা দেয়নি। এমন কোন ঘটনা নয় যে, চিন্তা করে বুঝতেই হবে। সারাদিন আর রাতের মধ্যে আর একটিবারও কুশ্রী জগতের সেই হাস্যময়ীর মুখের ছবি ইন্দুনাথের মনের ধারেকাছেও আসেনি।

কিন্তু পরের দিন সকালবেলায় রিলিফের সিধে পৌঁছে দিতে গিয়ে আশ্চর্য হতে হয়। সে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে যে, তাঁর খোঁপাতে কোন ফুলবিলাস নেই। ছবির উর্বশীধরনের সাজও নয়, ভঙ্গীও নয়। অভদ্র জীবনের কালি দিয়ে কাজলাক্ত করা একজোড়া প্রগল্‌ভ চক্ষুও

নয়। ঘরের দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে যে, সে একটি নিতান্ত স্নিগ্ধ চেহারা। সাধারণ একটা রঙীন তাঁতের শাড়ি জড়ানো একটা পরিচ্ছন্ন মূর্তি।

ইন্দুনাথ বলে—উনি কোথায় গেলেন?

মেয়েটি মুখ টিপে হাসে।—আমি কি জানি?

—আপনি কে?

—কাল জিজ্ঞেস করলে বলতাম, আমার নাম সোনালী। আজ কিন্তু ভাবছি, কি নাম বলা যায়?

ইন্দুনাথ হেসে ফেলে—বুঝলাম; আপনার নাম জানবার কোন দরকার অবশ্য আমার নেই। কিন্তু ...।

—কি?

—একটা কথা মনে হচ্ছে।

—বলুন।

—মনে হচ্ছে, আপনার এখানে আর না থাকাই ভাল।

—কেন?

—এখানে আপনাকে মানায় না।

—ওদের সবাইকে বুঝি খুব মানায়?

—না, সেকথা বলছি না। কাউকে মানায় না, তবে....মনে ...হয়...আপনাকে একটুও মানায় না।

—কেন?

—আপনাকে দেখে কে বলবে যে, আপনি এখানকার মানুষ?

—চিরকাল তো এখানকার মানুষ ছিলাম না।

—সেই কথাই তো বলছি। ঘরে চলে যান।

—ঘরে?

—হ্যাঁ।

—ঘর কোথায়? আমাকে ঘরে নেবে কে?

—চেষ্টা করে দেখুন। ঘর পাওয়া যাবে না কেন? ...হ্যাঁ, রিলিফের চাল ডাল সত্যিই খেয়েছিলেন তো? না, আপনি আবার কাউকে দান করে দিলেন?

—না, খেয়েছি।

—চল, জনার্দন—ডাক দেয় ইন্দুনাথ।

ঘরের দরজার চাল-ডাল আলু দু'আনা পয়সা রেখে দিয়ে জনার্দন বলে —চলুন।

অদ্ভুত এক শিবিরের ভিতরে ঢুকে রিলিফের চাল-ডাল পৌঁছে দেবার জন্য দিনে দু'বার করে আসা আর চলে যাওয়া; আর অদ্ভুত এক শাসন জারি করে পিকেটিং-এর কাজ সাঁকোর মুখের কাছে সারাদিন আর সারারাত পালা করে দাঁড়িয়ে থাকা, কাজটা কর্মীদলের ছেলেদের কাছে প্রথম

কয়েকটা দিন বেশ বিচিত্র বলে মনে হলেও উৎসাহটা যেন ক্রমেই থিতিয়ে আসতে থাকে। বিচিত্র কাজ বটে, কিন্তু বড় একঘেয়ে এই বিচিত্রা। ঘটনাও থিতিয়ে গিয়েছে, বিচিত্রতাও থিতিয়ে গিয়েছে।

—দূর, পরেশ আর গুরুদাস একদিন ক্যাম্পের দাওয়ার উপর অলসভাবে বসে আর প্রায় একসঙ্গে একটা আক্ষেপ করে বলে ওঠে—দূর, সত্যিই ভাল লাগে না; এর চেয়ে ভাল ছিল, যদি আরও দু'চারটে ঝামা ইঁট পড়তো।

শুনতে পেয়ে হেসে ফেলে আর ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে ইন্দুনাথ—কি হলো পরেশ, কাজটার ওপর চটে গেলে কেন?

পরেশ আর গুরুদাস লজ্জিতভাবে হাসে—এই একটা কথার কথা বলে ফেললাম। তা বলে সত্যিই কি...।

ইন্দুনাথ—আমার কাছে কাজটা কিন্তু একটুও একঘেয়ে বোধ হচ্ছে না। বরং, ভাবতে বেশ ভাল লাগছে, এ কাজে এসে বেশ একটা নতুন রকমের আনন্দ পাওয়া গেল।

ইচ্ছে করে বলা কোন কথা নয়, চিন্তা করে বলা কোন কথাও নয়, কথাগুলি যেন ইন্দুনাথের মুখের এই হাসিটার মত নিজের খুশিতে মুখর হয়ে উঠেছে।

কিন্তু সেই অদ্ভুত রিলিফের কাজে রোজ ব্যস্ত হয়ে ওঠবার কোন দরকার আছে বলে মনে করে না ইন্দুনাথ। একাজে রোজ যায়ও না ইন্দুনাথ। বরং মেলার ভিতরে ঢুকে আর ঘুরে বেড়িয়ে দিনটা পার করে দেয়।

রিলিফের কাজটা সত্যিই যে কেমন বিচিত্র ঘটনা ঘটাতে পারে, একদিন তাও দেখতে হলো, আর, আবার হেসে ফেলতেও হলো। না বলেও পারলো না ইন্দুনাথ—দেখলে তো পরেশ, কী বিচিত্র ব্যাপার। তোমরাই না বলেছিলে, বড় একঘেয়ে লাগছে?

রিলিফের চাল-ডাল পৌঁছে দিতে গিয়ে সেদিন কর্মীদলের ছেলেদের সঙ্গে ইন্দুনাথও ছিল। কিন্তু সেই অদ্ভুত শিবিরের ভিতরে ঢুকতেই দশ-বারোজন নারীমূর্তির রুষ্ট ও উতলা একটা দল অদ্ভুত এক অভিযোগের সোরগোল তুলে ইন্দ্রনাথের পথ রুখে দাঁড়াল।—কি গো বাবু, আমাদের ওপর এত বিষনজর কেন, আর সোনালীর ওপরেই বা এত খোশনজর কেন?

—এ কিরকম বাজে কথা বলছেন আপনারা? কী হয়েছে?

—সোনালী বড় সিধে পাবে কেন?

—তার মানে?

—তার মানে, শুধু সোনালীর সিধের জন্য চা-চিনি বরাদ্দ করলে কেন গো বাবু? আমরা কি চা খাই না, না খেতে জানি না? না হয় আমরা দেবদাসীটির মত সোহাগী ঢঙীটি নই।

—ভুল বুঝেছেন আপনারা।

—একটুও ভুল বুঝিনি। চোখে দেখেছি, ছুঁড়ি দিব্যি দুবেলা আকাশপানে চেয়ে চা খাচ্ছে। কেন? সোনালী কি তোমার সাধের পরানটিকে চাঁপাফুল করে খোঁপায় পরবে বলেছে?

চুপ করে কী যেন ভাবে ইন্দুনাথ; তারপর ব্যস্তভাবে বলে—আচ্ছা আপনারা এখন চুপ করুন। আমাকে একটু খোঁজ নিয়ে বুঝতে দিন, সত্যিই কী ব্যাপার।

তারপর সেই ঘর। আর ঘরের দরজার কাছে সেই নারী। দেখতে একটু চোখেও ঠেকে; সত্যিই

যেন একটা শান্ত প্রতীক্ষার মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু প্রতীক্ষার চোখ দুটো একটু উদ্বিগ্ন।

ইন্দুনাথ বলে—আপনার পয়সা আছে, আপনি দু'বেলা চা খাবেন। তাতে আমাদের কিছু বলবার নেই।

—না, কিছু বলবেন না। আমি সবই শুনেছি।

—কিন্তু আমাদের তো মিছিমিছি কতগুলি কটু কথা শুনতে হচ্ছে।

—না আর শুনতে পাবেন না।

না, আর শুনতে পায়নি ইন্দুনাথ। কেমন করে আর কেন সেই অদ্ভুত অভিযোগটার সন্দেহ সরে গেল, তাও বুঝতে কোন অসুবিধে নেই। সে বেচারী চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।

সেদিন ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতেও পাওয়া গেল, ঘরে চা-এর কোন সরঞ্জাম নেই। ঘরের মেজের উপর চুপ করে বসে আর মাথা হেঁট করে কী-যেন ভাবছে মেয়েটা, আর আস্তে আস্তে হাত চালিয়ে একটা কুলোর উপর রাখা মোটা চালের ঢেরি ভেঙে ভেঙে বোধহয় খড়কুটো বাছছে। দেখে বুঝতে পারা যায়, ও চাল রিলিফেরই ধানের চাল।

কিন্তু সে হঠাৎ একবার ইন্দুনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়েই মুখ নামিয়ে নিল, মাথা হেঁট করা ভঙ্গীটা যেন হঠাৎ একটা সাহস করতে গিয়ে হঠাৎ ভয় পেয়েছে।

ইন্দুনাথ বলে—আপনি সত্যিই চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন মনে হচ্ছে।

মাথা হেঁট করা ভঙ্গীটা একটু দুলে ওঠে। —হ্যাঁ।

—কিন্তু আপনার ঘরে এই সব ছবি-টবি আর ওসব আয়না-টায়না একটুও মানাচ্ছে না...আচ্ছা চলি...চল গুরুদাস।

পরদিন আবার এই ঘরের দরজার কাছে রিলিফের চাল নামাবার সময় ইন্দুনাথের চোখ দুটো যেন অপ্রস্তুত হয়; ঘরটা যেন নেই বলে মনে হয়।

ঠিকই, বদলে গিয়েছে ঘরের চেহারাটা। সেই ছবি-টবি নেই, আয়না-টায়নাও নেই। আরও কতগুলো আসবাব ছিল, জাঁকাল-রকমের একটা বিছানা ছিল, সবই ঠেলে-ঠুলে ঘরের একদিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর ছেঁড়া কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে।

ঘরের ভিতর জ্বলছে ছোট্ট একটা উনান। তার পাশে ঘটি বাটি আর থালা। মেজের উপর পাতা একটা মাদুরের উপর বসে এক গোছা উল আর দুটো কাঁটা নিয়ে বোনাবুনির কী একটা কাজ করছে যে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে ইন্দুনাথ যেন বিচিত্রতার আর-এক বিস্ময় দেখতে থাকে। বোধহয়, ভোরে উঠেই স্নান সেরে নিয়েছে একটা নতুন কাজের আনন্দে। ভেজা-ভেজা কালো চুলের গোছা পিঠের উপর ছড়িয়ে দিয়ে বসে আছে। গায়ের শাড়িটাও একটা লালপেড়ে সস্তা মিলের শাড়ি।

—বাঃ, তুমি যে আজ দেখছি একেবারে...। খুশির সুরে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে ইন্দুনাথ।

চমকে ওঠে স্নান সেরে নেওয়া সেই আনন্দের শান্ত চোখ দুটো।—কি বললেন?

ইন্দুনাথ—দেখে মনে হচ্ছে, তুমি একটা ব্রত-ট্রত শুরু করে দিয়েছ।

রিলিফের কাজে তিনটে দিন কামাই দিতে হয়েছে। ক্যাম্পের বাইরে বের হতে পারেনি ইন্দুনাথ।

অনেক চিঠির উত্তর দিতে হয়েছে। অনেক খরচের হিসেব লিখতে হয়েছে। কাকা পাঠিয়েছেন নতুন একটা বন্ধকী কবলা, সেটা একবার পড়ে নিয়ে সই করতে হয়েছে।

বিজয় এসে বলে—উনি একটা কথা বলছিলেন...।

ইন্দুনাথ—কে?

বিজয়—ঐ যে, সেই মহিলা, যার নাম পূর্ণিমা।

—পূর্ণিমা কে?

—ঐ যে, যিনি আগে চা-টা খেতেন।

—কি বলছিলেন?

—বলছিলেন, যদি আমাদের ছেঁড়া জামা-টামা সেলাই করবার দরকার হয় তবে উনি...।

—তোমরা ওর সঙ্গে এসব আলোচনা কর কেন?

—আমরা করিনি, উনিই করেছেন।

—উনিই বা কেন করেন?

—দোষ হলো জনার্দনের।

—তার মানে?

—কাঁধছেঁড়া আর পিঠছেঁড়া একটা কামিজ গায়ে দিয়ে জনার্দন রোজই রিলিফ পৌঁছতে যায়, তাই দেখে উনি বলছিলেন...।

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে আনমনার মত চুপ করে বসে থেকে ইন্দুনাথ বলে—তা, তোমরা যদি ভাল মনে কর, তবে নিয়ে এস তোমাদের যত ছেঁড়া জামা-টামা। দিক সেলাই করে। মনে হচ্ছে, এটা একটা সদিচ্ছার কাজ।

কর্মীদলের ছেলেদের ছেঁড়া জামার একটা স্তূপ বাঁধাছাঁদা করে সদিচ্ছার কাছে পৌঁছে দেওয়া হলো। জামাগুলি কয়েকদিন পরে সেলাই হয়ে ফিরেও এল। রিলিফের চাল পৌঁছতে আবার সদিচ্ছার ঘরের কাছে এসে যখন দাঁড়ায় ইন্দুনাথ, তখন আবার একটা অদ্ভুত বিচিত্রতার রূপ দেখে বিহ্বল হয়ে যায় ইন্দুনাথের শান্ত চোখের দৃষ্টি। পূর্ণিমার গায়ের শাড়িটার তিন জায়গায় তিনটে ছেঁড়া সেলাই করা; কিন্তু পূর্ণিমার সেই ভীরু হাসিটা যেন নতুন একটা সাহসের গর্বে রঙীন হয়ে গিয়েছে। পূর্ণিমার মুখটাকে খুবই অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে।

রিলিফের চাল নামিয়েছে বিজয়। ইন্দুনাথ বলে—চল বিজয়। কিন্তু বিজয় চলে গেলেও যেন আনমনার মত চলা ভুলে গিয়ে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে ইন্দুনাথ।

বেশ কিছুক্ষণ পরে কথা বলে ইন্দুনাথ—একটা কথা ছিল।

—বলুন।

—তুমি যে আমাদের জন্য একটা কাজ করে দিলে, সেজন্য কি কিছুই নেবে না?

—যদি দেন তবে নেব।

—কি নেবে বল?

—যা দেবেন।

—আচ্ছা। ...আচ্ছা, তুমি কি বই-টই পড়তে পার?

—সামান্য পারি।

দেরি করেনি ইন্দুনাথ। মেলার ভিতরে ঘুরে ঘুরে আর অনেক খোঁজ করে এমন একটা দোকানও পাওয়া গেল, যেখানে পাঁজি পাঁচালি আর আরও কয়েকরকম বই ছিল। তারই ভিতর থেকে একটা বই বেছে নিল ইন্দুনাথ। সামান্য বইটা কিনতে গিয়ে যে দুপুর পার হয়ে এসেছে, ক্যাম্পের খিচুড়ি ঠাণ্ডা আর শক্ত হয়ে গিয়েছে, তাও বোধহয় বুঝতে পারেনি ইন্দুনাথ।

আর, বিকাল শেষ হয়ে যাবার সামান্য একটু আগে, চোখভুলানি মা'র পাকুড়গাছের উপর যখন ক্লান্ত কাকের ঝাঁক শান্ত হয়ে বসে গিয়েছে, তখন পূর্ণিমার ঘরের কাছে এসে ডাক দেয় ইন্দুনাথ—বই নিয়ে যাও পূর্ণিমা।

যেন উপহার নেবার একটা উতলা পিপাসা ঘরের ভিতর থেকে অনেক ব্যস্তভাবে ছুটে বের হয়ে আসে। —দিন, কি বই আনলেন?

—ধর্মের বই-টই নয়। তোমার হাতে মানায় যে বই, সে বই।

বইটার নাম মলাটের উপর লেখা আছে—সহজ শিশুপালন। বইটা হাতে নিয়ে কিন্তু আর বইটার দিকে নয়, ইন্দুনাথেরই মুখের দিকে পূর্ণিমার চোখ দুটো বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকে। —আমাকে এ বই দিতে আপনার কি সত্যি ভাল লেগেছে?

—ভাল লেগেছে বই কি।

—কেন, বলবেন?

—কি বললে?

—আপনি তো সাহসী মানুষ যা ভাল বোঝেন তাই করেন; আপনি কুষ্ঠী মানুষকেও ছুঁতে ঘেন্না করেন না, কোন ভয়ডর আপনার নেই, কোন বাধা আপনি গ্রাহ্য করেন না, গোরার বন্দুককেও আপনি তুচ্ছ করতে জানেন, অপরাজিতার লতা কাদার উপর পড়ে থাকলে তাকে আপনি বেড়ার উপর তুলে দেন...।

যেন বাঁধভাঙা জলের একটা আশার কলরোল। হঠাৎ মুখর হয়ে বুকের ভিতরের একটা বদ্ধ প্রলাপ মুক্ত করে দিয়েছে মুখচোরা পূর্ণিমা। বার বার হাত তুলে চোখ দুটোকেও মুছতে চাইছে।

ইন্দুনাথ বিব্রতভাবে হাসে।—এসব গল্প তুমি শুনলে কোথায়?

—আপনার কর্মী ছেলেরাই বলেছে। মিথ্যে কথা বলেনি নিশ্চয়।

—না, মিথ্যে কথা বলবে কেন?

—তবে?

—আর বলতে হবে না, আমি বুঝেছি।

চোখ নামিয়ে নেয় পূর্ণিমা। সে চোখে একটা আশ্বস্ত আশার শান্ত হাসি ছড়িয়ে পড়ে, যেন গোপন ব্রতের মানতটা সফল হয়েছে।

স্নানযাত্রার দিনটা এসেই পড়েছে; আজ বাদে কাল। মেলার ভিড়টাও প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে।

আজই শেষ রিলিফের দিন। সকালবেলায় রিলিফের চাল-ডাল পৌঁছে দিয়ে এসেছে বিজয় পরেশ আর গুরুদাস। অন্য কাজের ব্যস্ততায় ইন্দুনাথ যেতে পারেনি। বিকেলের রিলিফ চুকে গেলেই সাঙ্গ হয়ে যাবে কর্মীদলের সেবাকাজের শেষ পালা। তারপর শুধু একটা রাত সজাগ থেকে সাঙ্গ হয়ে যাবে পিকেটের সজাগ শাসনের শেষ পালা।

তারপর, ইন্দুনাথের এই ক্যাম্পের জীবনটাও এক মাসের ধুলোময়লা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে,

ব্রতসাঙ্গ আনন্দে ব্যস্ত হয়ে রঘুনাথপুরের বাস ধরবে আর উধাও হয়ে যাবে।

আগেই কথা হয়ে আছে, স্নানযাত্রার আগের দিন চলে যাবে ইন্দুনাথ। না গেলে নয়। কাকা লিখেছেন, বন্ধকী কবলাটা রেজিস্টারী হবে; স্নানযাত্রার একদিন আগে না পৌঁছলে সকালবেলার কাছারীতে হাজির হওয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং আজ দুপুরেই রওনা হতে হয়।

ইন্দুনাথের বিছানা বাঁধাছাঁদা হয়ে প্রস্তুতও হয়ে থাকে। কাগজপত্র আর জামাকাপড় ভরে দিয়ে বাক্সটাকেও বন্ধ করে প্রস্তুত করিয়ে রাখে ইন্দুনাথ।

আর তো কোন কাজ নেই। হ্যাঁ, কাজ বলতে একটা কাজের কথা মনে হয়। দোষ কি? যাবার আগে একবার শেষ অনুরোধের কথাটা বলে দিলেই হয়—তুমি এবারে চলে যাও, পূর্ণিমা।

রৌদ্রতপ্ত জ্যৈষ্ঠের একটা মধ্যাহ্ন; এ সময়ে ঐ উপনিবেশে প্রবেশ করা রিলিফেরও নিয়মে নিষিদ্ধ আছে। কিন্তু ইন্দুনাথের মন আজ আর এসব খুঁটিনাটি বিচার করবার দরকার আছে বলে মনে করে না। পূর্ণিমাকে যে কথাটা শেষবারের মত বলে দিতে হবে, সেটাও তো একটা পরম রিলিফের বাণী।

পৌঁছে যেতে পনর মিনিটও সময় লাগে না।

পূর্ণিমার ঘরের দরজা খোলা। মেঝের উপর কোন মাদুর পাতাও নেই। মেঝের মাটির উপরে শুয়ে আছে, ঘুমিয়ে আছে পূর্ণিমা। সত্যিই পূর্ণিমা তো?

পূর্ণিমা বলেই তো মনে হয়। মুখটা স্পষ্ট দেখা যায়। স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে পূর্ণিমার সারা শরীরটাই। শাড়িটা এলিয়ে পড়েছে, তার চেয়ে বেশি এলিয়ে পড়েছে পূর্ণিমার হাত দুটো। পূর্ণিমা যেন কথাবলা কোন প্রাণ নয়, শুধু বুকভরা কোমলতার কতগুলি নিঃশ্বাস। কী ভয়ানক বেহুঁশ হয়ে ঘুম দিচ্ছে পূর্ণিমা!

যেন নিজেরই উপর হঠাৎ বিরক্ত হয়ে অপলক চোখ দুটোকে ফিরিয়ে নেয় ইন্দুনাথ; খোলা দরজার কাছ থেকে একটু আড়ালে সরে গিয়ে ডাক দেয়—পূর্ণিমা।

বোধহয় এই ডাক শোনবার জন্য ঘুমের মধ্যেও পূর্ণিমার প্রাণটা জেগেছিল। এক ডাকেই ধড়ফড় করে জেগে উঠে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় পূর্ণিমা—আমি তৈরী হয়েই আছি।

দেখতে পায় ইন্দুনাথ, সত্যিই তৈরি হয়ে আছে পূর্ণিমা। জামাকাপড়ের ছোট্ট একটা পোঁটলা, একটা হাতবাক্স আর একটা বই; একটা আয়োজন যেন যাত্রার অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়ে দরজার একপাশে জড়ো হয়ে আছে।

ইন্দুনাথ—কিন্তু যাবার জন্য আজই কেন তৈরী হয়েছ?

—আজই তো। তাই তো শুনলাম।

—কি শুনলে?

—বিজয়দা বললেন, আপনি আজই চলে যাবেন বলে ঠিক করেছেন।

—ঠিকই বলেছে। কিন্তু সেজন্য তুমি তৈরী হলে কেন?

যেন হঠাৎ বোবা হয়ে যাওয়া একটা বিস্ময়ের জ্বালা নিয়ে ইন্দুনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে পূর্ণিমা। তারপর চোখ নামিয়ে নেয়—আপনি তাহলে আজই চলে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একেবারে সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পূর্ণিমা। আর কোন কথাও বলে না।

চলে যায় ইন্দুনাথ।

স্নানযাত্রা। রথ চলেছে। হাজার হাজার লোকের চিৎকার মাতিয়ে দিয়ে আর ধুলো উড়িয়ে উড়িয়ে রথটা বাসুদেব সরোবরের দিকে চলে গিয়েছে।

ক্যাম্পের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে ইন্দুনাথ, এক-একটা স্নানের মিছিল হুল্লোড় করে ছুটে গিয়ে বাসুদেব সরোবরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। যেন কাদার বাষ্প উথলে উঠছে। সে জায়গার আকাশটাও ঘোলা হয়ে গিয়েছে।

রঘুনাথপুরের বাস কাল দুপরে ঠিক সময়ে এসেছিল, কিন্তু ইন্দুনাথ যায়নি। বিজয় বলেছিল, কেন আর একটি দিনের জন্য আমাদের নেতৃত্বহীন করবেন ইন্দুদা? থেকে যান, স্নানযাত্রার পরের দিন সকালে সবাই রওনা হওয়া যাবে।

ইন্দুনাথেরও কাজ ছাড়া প্রাণটা আজ যেন একেবারে অলস হয়ে গিয়েছে। বাইরে বটেশ্বরপুরের মেলার ধুলো রোদে পুড়ে আর গন্‌গনে আগুনের নিঃশ্বাসের মত হল্‌কা হয়ে ছুটে বেড়ায়, আর ইন্দুনাথ ক্যাম্পেরই ভিতরে একটা ঠাণ্ডা জায়গা বেছে নিয়ে বিছানার উপর অলস হয়ে শুয়ে পড়ে থাকে। বিকেল কখন ফুরিয়ে গেল আবার কখন যে বটেশ্বরপুরের ধুলোভরা সন্ধ্যার আকাশে জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমার এতবড় একটা চাঁদ ভেসে উঠলো, তাও বুঝতে পারেনি ইন্দুনাথ। ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ চোখ কুঁচকে, যেন একটা স্বপ্নকে নিংড়ে দিয়ে, যখন জেগে ওঠে আর চোখ মেলে তাকায় ইন্দুনাথ, তখন সেই নিরালা ক্যাম্পের ভিতরে বটেশ্বরপুরের শান্ত জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে।

চোখের সামনে কেউ নেই, কোন কাজের ছায়াও নেই। কিন্তু ইন্দুনাথের মনটা এই কাজ-ফুরানো আলস্য সহ্য করতে গিয়ে ছটফট করছে। এতক্ষণ ধরে যেন ঘুমের মধ্যেও ছটফট করছিল বটেশ্বরপুরের একটা মায়া-জ্যোৎস্না।

পূর্ণিমা নিশ্চয় ধারণা করেছে, এতক্ষণে বটেশ্বরপুর ছেড়ে চলে গিয়েছে ইন্দুনাথ। কিন্তু ইন্দুনাথকে এ সন্ধ্যায় আচমকা দেখতে পেলে বোধহয় একটু আশ্চর্য হবে আর খুশী হয়ে হেসে ফেলবে পূর্ণিমা।

কিন্তু ভাবতে গিয়ে চমকে ওঠে ইন্দুনাথের মন, পূর্ণিমাই যে চলে গিয়েছে! চলে যাবার জন্য কালই তো তৈরী হয়েছিল পূর্ণিমা। স্নানযাত্রা চুকে যাবার পর, সে কি এখনও সেই ঘরের ভিতর চুপ করে বসে আছে? বিশ্বাস হয় না।

যদি থাকে? বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে, আছে বোধহয়।

ক্যাম্প থেকে বের হয়ে, যেন একটা স্বপ্নালু বিশ্বাসের আবেশে বটেশ্বরপুরের জ্যোৎস্নামাখা ধুলো মাড়িয়ে, সাঁকো পার হয়ে, চোখ-ভুলানি মা'র সিঁদুরমাখা পাথরটার কাছ দিয়ে নিজেরই একটা অদ্ভুত ছায়াকে যেন টেনে টেনে নিয়ে যেতে থাকে ইন্দুনাথ।

—পূর্ণিমা!

ডাক শুনেই ঘরের ভিতর যেন লজ্জাহত একটা ভীরু আর্তনাদ শিউরে ওঠে। দেখতে পায়

ইন্দুনাথ। দু'হাত দিয়ে চোখ-মুখ ঢেকে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ছবির উর্বশীর মত সাজ করা সোনালী।

ঘরের ভিতর একটা ল্যাম্প জ্বলছে। ঝকঝক করছে আয়নাটা। বেড়ার গায়ে বিবসনা অপ্সরার ছবি ঝুলছে। খাটের উপর পাতা ফুলবাহার চাদরের রংদার ঝালর ঝুলছে।

সোনালীর মুখটা দেখা যায় না; দেখা যায় খোঁপার ফুলগুলি। ইন্দুনাথ বলে—আজও যাওয়া হলো না, তাই তোমাকে দেখতে এলাম।

কোন উত্তর না দিয়ে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রেখে সোনালী যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে—আজ জানতাম না যে আপনি আসবেন।

—তাতে কি হয়েছে?

মুখের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে দুটো তীব্র বিস্ময়ের চোখ তুলে এইবার ইন্দুনাথের মুখটাকে দেখতে থাকে সোনালী।

ঘুমন্ত মানুষের গলার স্বরের মত অদ্ভুত স্বরে ইন্দ্রনাথও যেন একটা নতুন আবিষ্কারের বিস্ময়ের সঙ্গে ফিসফিস করে।—তুমি সত্যিই সুন্দর।

সোনালীর চোখে একটা মৃদু ভ্রূকুটি শিউরে ওঠে। —আজ আমাকে সুন্দর মনে হলো?

—হ্যাঁ। নিশ্চয়।

ঘরের দরজা পার হয়ে একেবারে ঘরের ভিতরে ঢুকে সোনালীর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে ইন্দুনাথ বলে—মিথ্যে বলছি না, তুমি বিশ্বাস কর।

কোন কথা না বলে, খোঁপাটাকে এক হাতে যেন শক্ত করে খিমচে ধরে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সোনালী।

ইন্দুনাথ—তোমার ঘরটিও বেশ সুন্দর।

রং মাখানো নরম ঠোঁটের উপর সাদা সাদা শক্ত দাঁতের ধার বসিয়ে দিয়ে আর ইন্দুনাথের মুখের দিকে কটকট করে একবার তাকিয়ে নিয়ে সোনালী বলে—এঘরে আমাকে মানিয়েছে সুন্দর, তাই না?

ইন্দুনাথ—কি বললে?

সোনালী—আপনি আর কতক্ষণ থাকবেন?

ইন্দুনাথ—থাকি কিছুক্ষণ। এখন আর তো কোন কাজ নেই আমার। তা ছাড়া তোমার সঙ্গে আর তো কখনো দেখা হবে না।

সোনালীর দুই ঠোঁটের ফাঁকে যেন একটা সর্বনাশা কুহকের রঙীন হাসি লতিয়ে উঠতে থাকে। ল্যাম্পটাকে যেন ছোঁ মেরে এক হাতে তুলে নিয়ে ইন্দুনাথের মুখের দিকে তাকায় সোনালী।—আলো থাকবে, না নিভিয়ে দেব? কি পছন্দ করেন আপনি?

ইন্দুনাথ—তোমার যা পছন্দ।

সোনালীর হাতটা একবার শুধু কাঁপে। তারপর মাথা হেঁট করে সোনালী। তারপর ল্যাম্পটা হাতে নিয়েই ঘর ছেড়ে একেবারে দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ডাক দেয় সোনালী—শুনুন।

ইন্দুনাথও বাইরে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু সোনালীর মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়। —এ কি? তুমি কাঁদছ কেন পূর্ণিমা?

—আমি পূর্ণিমা নই। কিন্তু আমার একটা কথা শুনুন। ফিসফিস করে যেন একটা নিবিড় মায়ার আবেশে কথা বলে সোনালী।—আপনি চলে যান।

—কেন?

—আমার এখানে এখন মেজকর্তা আসবেন।

—কে মেজকর্তা? চিরঞ্জীব!

—হ্যাঁ।

—চিরঞ্জীব এখানে আসবে কেন?

—চিরঞ্জীব আসবে। আপনার আসতে নেই।

—কেন?

নিষিদ্ধ দুনিয়ার সেই উপনিবেশের ঘরে ঘরে তখন প্রচণ্ড হাসি-হর্‌রা আর হুল্লোড়ের নেশাক্ত উৎসব জেগে উঠছে। ছুটোছুটি করছে যত ব্যস্ত লুব্ধ আর দুরন্ত ছায়াশরীর। আর ধুলোমাখা জ্যোৎস্নার গুমোট ঝলসে দিয়ে একটা টর্চের আলো সরু পথের উপর দিয়ে যেন আছাড় খেয়ে খেয়ে এগিয়ে আসছে।

সোনালী বলে—শিগগির চলে যান। নইলে ধরা পড়ে যাবেন।

—কি বললে?

—আসুন আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—চলে যাবার জন্য একটা রাস্তা আছে। কিন্তু গাছপালায় ভরা সে রাস্তায় বড় অন্ধকার।

—তবে?

—আমি আলো ধরছি, আসুন।

সে রাস্তার প্রথম সুপুরিগাছটার কাছে এসেই আলো তুলে ধরে সোনালী—চলে যান।

চলে যেতে থাকে ইন্দুনাথ।

—শুনুন, ডাক দিয়ে আর দু'পা এগিয়ে এসে ফিসফিস করে সোনালী—দিব্যি দিয়ে বলছি, আমার কথাটা তুচ্ছ করো না লক্ষ্মীটি। ঘরে ঢুকবার আগে একবার স্নান করে নিও।

—কেন?

—তুমি ভুল করে আমার ঘরে ঢুকেছিলে।

চমকে ওঠে ইন্দুনাথ। যেন একটা সাপের ছোবল পড়েছে ইন্দুনাথের বুকের উপরে, চওড়া একটা বাজে বুক, বটেশ্বরপুরে এসে যে বুকের সাহস ভীরু হয়ে গেল, আর দুঃসাহসী হয়ে উঠল ভীরুতা। এক মুহূর্তও দেরী না করে, সরু পথের অন্ধকারের সঙ্গে একটা ভীরু ছায়ার মত ছটফট করে মিশে গেল ইন্দুনাথ।

পলাশের নেশা

শহরের পাকা চেহারার গা ঘেঁষে একটি কাঁচা চেহারার জায়গা। নাম রাজা পার্ক। মিউনিসিপ্যালিটির হাতে আসবার পর থেকে রাজা-পার্কের অনেক উন্নতি হয়েছে।

মাঝখানে বেশ বড় একটা জংলা ঝিল; সে ঝিলের চেহারা এখন অবশ্য ঠিক সে-রকম জংলা নয়, যদিও এখানে-ওখানে সবুজ পানা আর জলো লতাপাতায় ঠাসা দাম দোলে, আর দামের উপর দাঁড়িয়ে বকের সারি ঝিমোয়। ঝিলের কোণে কোণে শালুক ফোটে; এইদিকে ওদিকে জলপদ্মের পাতা ভাসে।

ঝিলের এ-পারে আর ও-পারে অনেকখানি জায়গা জুড়ে কাঁচা সবুজের মেলা। ঝিলের এ-পারের মাটিতে ফুলের ফসল একটু বেশী ফলে। তাই এ-পারটা একটু বেশি রঙিন। আর ও-পারে বড় বড় গাছের সারি আর ছোট ছোট গাছের কুঞ্জ। ও-পারটা তাই একটু বেশি ছায়াঘন।

পূর্বদিকে একটা সাঁতারু ক্লাবের ঘর আছে; পশ্চিমে একটা জিমন্যাশিয়াম। এ-পারে মাধবীলতার ঘেরান দেওয়া ছোট ছোট ঘরে মালীরা থাকে। তার মধ্যে একটি ঘর একটু বড়। সেই ঘরে থাকে সত্যনাথ।

ছায়াঘন ও-পারে একের পর অনেকখানি তফাত রেখে রেখে এক একটি লোহার বেঞ্চ পড়ে আছে। তাই সকালে ও বিকালে, সন্ধ্যায় ও রাতে ও-পারেই বেশি লোকের আনাগোনা আর বৈঠক জমে। বাদামওয়ালার হাঁক ও-পারেই বেশি শোনা যায়।

পূজার জন্য ফুল খুঁজতে এসে বুড়ো ভদ্রলোকেরা এ-পারের ঝোপেঝাপে উঁকিঝুঁকি দিয়ে খোঁজ করেন—হেড মালীটা কোথায় গেল?

সত্যনাথ হঠাৎ দেখা দিয়ে প্রশ্ন করে, "কী খুঁজছেন স্যার?"

পাঁচ বছর কাজ করার পর সত্যনাথের মাইনে এখন একটু বেড়েছে। এখন বেয়াল্লিশ টাকা। মালীরা সত্যনাথের কাছেই আক্ষেপ করে, "তোমার তো তবু কিছু বেড়েছে মাস্টার, আমাদের এক পয়সাও না।"

সত্যনাথের ঘরটাই হলো বাগানের অফিসঘর। আর অফিস বলতে ওই একটা বড় খাতা। পার্কের মরা গাছের কাঠ ওজন করে তার হিসাব ওই একটি বড় খাতাতে লিখে রাখে সত্যনাথ। মালীদের হাতে এক-আধ তোলা ফুলের বীজ যখন তুলে দিতে হয়, তখন তারও একটা হিসাব লিখে রাখতে হয়। কিছু লেখাপড়া জানে সত্যনাথ, তাই হেড মালী হয়ে বেয়াল্লিশ টাকা পর্যন্ত উঠতে পেরেছে।

সত্যনাথও মালীদের আক্ষেপের উত্তরে ওর নিজের জীবনের একটা আক্ষেপ শুনিয়ে দেয়, "ওরে ভাই, যদি গরিব না হতাম, আর সামান্য এক-আধটা পাসটাস দিতাম, তা হলে আমিও মেজ মামা দিবাকর মুখুজ্জের মত বুক ফুলিয়ে সাহেবের দোকানে হিসাব লিখতাম। এই বেয়াল্লিশ টাকার প্যাঁচে জড়িয়ে পড়ে থাকতাম না।"

সকালবেলা জিমনাশিয়ামে এসে যে-সব ছেলেরা কসরত করে, তারা বলে, "আসুন মাস্টারদা, আর একবার পীকক্‌টা একটু দেখিয়ে দিন।"

বেশ খুশি হয়ে প্যারালাল বার-এর উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সত্যনাথ। কত সহজে, একটু দুলতেও হয় না, সত্যনাথ তার মজবুত দুটি হাতের উপর ভর দিয়ে আকাশের দিকে পা ছুঁড়ে পীকক হয়।

ছেলেরা বলে, "রিং-এর টি-ফিগারটি আর একবার, মাস্টারদা!"

সত্যনাথ, "আজ থাক্।"

তারপর আর দেরি না করে চলে যায় সত্যনাথ। কাজের জীবন শুরু হয়ে যায়। একটি ময়লা হাফপ্যান্ট পরে, ময়লা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে কোমরে ময়লা গামছা জড়িয়ে খুরপি ঝারি হাতে নিয়ে পার্কের এ-পারের মাটির এখানে-ওখানে আর ঝোপে-ঝোপে কাজ করতে থাকে সত্যনাথ। বয়সটা বোধহয় বত্রিশ হলো। কাজ করতে করতে সত্যনাথের মনটাও যেন নীরবে হিসাব করে। খড়দহ থেকে ছোটখুড়ির চিঠি এসেছে—তোমার মতিগতি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কি ঠিক করিয়াছ যে বুড়ি খুড়ি মাতা বেটী মরিয়া যাইবার পর বিবাহ করিবে?

বিকাল হলে এহেন সত্যনাথই একেবারে মিথ্যানাথ হয়ে ওঠে। সত্যনাথের কপালে তখন আর সেই মাটিমাখা ঘামের চিহ্নও থাকে না। বেশ ফরসা একটি আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে দেয়, সরু কালো পাড়ের ফরসা ধুতি পরে। আর পায়ে থাকে লাল নাগরা চটি। পান বিড়ি সিগারেটের হাঁক শুনতে পেলেই এগিয়ে যায় সত্যনাথ; দু পয়সা দিয়ে একটি সিগারেটও কেনে।

আস্তে আস্তে আয়েস করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে সত্যনাথ। আস্তে আস্তে হাঁটে, ঝিলের চারদিকে একটা পাক দিয়ে বেড়িয়ে আবার এ-পারের মালীঘরের কাছে ফিরে আসে। সত্যনাথের জীবনটা রোজই বিকালে যেন ফাঁকি দিয়ে এই পৃথিবীর পরিচ্ছন্ন জনতার গায়ের হাওয়া নিজের গায়ে লাগিয়ে এই ভাবে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ায়, তারপর ফিরে এসে ওই মাধবীলতার ঘেরানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

এগিয়ে যায় সত্যনাথ; মরসুমী ফুলের কেয়ারিটার দিকে তাকায়। তারপর ওদিকে। বকুল টগর আর স্থলপদ্মের তিনটে চারাঘর। ছোট ছোট বকুল-চারার ঝুঁটি ধরে আর হেলিয়ে দিয়ে দেখতে থাকে সত্যনাথ, পাতাগুলো চুপসে গেল কেন।

বিকেলের আলো যখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, আর স্থলপদ্মের চারাগুলির গা থেকে টোকা দিয়ে দিয়ে কুচো-শামুকের কামড় ছাড়িয়ে দিচ্ছে সত্যনাথ, একদিন ঠিক এমনই শখের কাজের সময়ে একটি ডাক শুনে চমকে উঠতে হলো। কে যেন হঠাৎ প্রশ্ন করছে, "আপনি কি এই রাজা-পার্কের কেয়ার-টেকার?"

বুঝতে না পেরে, এবং বেশ বিব্রতভাবে পাঞ্জাবির পকেটে কোঁচার খুঁট গুঁজে, তারপর রুমাল বের করে হাত মুছতে মুছতে সত্যনাথও প্রশ্ন করে, "আজ্ঞে?"

প্রশ্ন করেছেন এক মহিলা। দেখতে বেশ সুন্দর ও অল্প বয়সের একজন মহিলা। পায়ে ভেল্‌ভেটের চটি, গায়ে ফিনফিনে ভয়েলের শাড়ি, গলার সোনার হারে নীল পাথরের লকেট। সিঁদুরের সরু একটা দাগও মহিলার সিঁথির ফাঁকে শুকিয়ে আছে মনে হয়। বড় বেশী ব্যস্ত মহিলার হাবভাব, বড় বেশী তীব্র হয়ে ছটফট করছে মহিলার চোখের দৃষ্টি।

আবার প্রশ্ন করেন মহিলা, "আপনি বোধহয় বোটানিস্ট?"

"আজ্ঞে?" সত্যনাথ আবার বিব্রত বোধ করে; চোখের রকমটাই যেন লজ্জা পেয়ে আমতা-আমতা করে।

মহিলা চেঁচিয়ে ওঠেন, "বলুন না আপনি এই পার্কের কেউ কিনা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"দয়া করে আপনার নামটা বলুন।"

"সত্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"আমাকে একটা খবর দিতে পারবেন?"

"বলুন।"

"দেখতে বেশ ফরসা আর লম্বা, তসরের ট্রাউজার পরেন, গলায় লাল রং-এর টাই, এই রকম কোন ভদ্রলোক কি এখানে কোন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে আসেন?"

উৎসাহের সঙ্গে উত্তর দিতে গিয়ে সত্যনাথও চেঁচিয়ে ওঠে, "হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো তাঁরা দুজন, এই দশ মিনিট আগে এই পথ দিয়ে ওদিকে গিয়েছেন।"

"কোন্ দিকে?"

"ওই যে ঝিলের ও-পারে; যেখানে পলাশের কাছে একটা বেঞ্চি আছে, সেখানে।"

"ওখানে তাঁরা কী করেন?"

"আমি তো দেখতে পাই, দুজনে বেঞ্চির উপর বসে গল্প করেন।"

"মহিলা খিলখিল করে হাসেন না?"

"আজ্ঞে?" সত্যনাথ অপ্রস্তুত হয়ে মহিলার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে, এই মহিলার মাথায় কোন দোষ নেই তো? মহিলার সুন্দর দুটি কালো চোখের তাকানিটা কিন্তু খুবই ভয়ানক! বেশ একটু ভয়ে-ভয়ে উত্তর দেয় সত্যনাথ, "তা প্রায়ই তো শুনতে পাই, সত্যিই সেই মহিলা একটু বেশি হাসেন।"

মহিলার গলার হারের নীল লকেটে শেষ-বিকালের লাল আলো মৃদু মৃদু জ্বলে। চুপ করে কী যেন ভাবছেন মহিলা। তারপর আনমনার মত বিড় বিড় করেন, "মহিলা দেখতে কেমন? আমার মত কুৎসিত?"

সত্যনাথ হাসে, "এ আবার কী রকম কথা বলছেন? সে মহিলা দেখতে ভালই, আর আপনিও তো...."

মহিলা আর একবার নিজের মনেই চমকে ওঠেন, মুখে রুমাল ছুঁইয়ে কিছুক্ষণ ভাবতে থাকেন। তারপব প্রশ্ন করেন—"ওরা কখন আসে আর কখন চলে যায়?"

"আজকাল বিকাল হতেই আসেন, আর বেশ একটু রাত হলে চলে যান।"

"দুজনে দুজনের হাত ধরে থাকে বোধহয়?"

"তা তো লক্ষ্য করিনি। মহিলার হাতে একটা ক্যামেরা থাকে দেখেছি।"

বিকেলের আলো আর নেই, ঝিলের-ওপারের ছায়াঘন চেহারা বেশ কালো-কালো হয়ে এসেছে। ঝিলের পদ্মপাতার পাশে জলের মধ্যে একটা বড় তারার ছায়া আস্তে আস্তে কাঁপছে। সন্ধ্যাতারা উঠেছে। ও-পারের কালোর মধ্যেও ফাঁকে ফাঁকে ল্যাম্পপোস্টের মাথা জ্বলে উঠেছে। ঝিলের ও-পারের আলো আর কালোর দিকে আর না তাকিয়ে ক্লান্ত মানুষের মত আস্তে আস্তে হেঁটে পার্কের

গেটের দিকে চলে গেলেন মহিলা। দেখতে পায় সত্যনাথ, গেটের কাছেই একটা রিক্‌শার উপর উঠে বসলেন, সেই নীল পাথরের লকেট-দোলানো মহিলা।

সন্ধ্যাতারা ফুটে উঠতেই ঝিলের ছায়াঘন ও-পারের এক লোহার বেঞ্চে বেশ ফরসা ও লম্বা অমিয়কুমারের পাশে বসে খিলখিল করে হেসে ওঠে যে, তারই হাত ধরে অমিয়ও হাসে: "সত্যি বলছি বেলা, আমার কথাটা তুমি একবার বিশ্বাস কর, আজকাল আর কোন অশান্তি সৃষ্টি করে না নমিতা। একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছে।"

দু'হাত তুলে খোঁপাটাকে চেপে ধরে, আর শরীরটাকে একটু টান করে, অতি লঘু একটা মোচড় দিয়ে ঘাড়টাকে দুলিয়ে, অমিয়র কাঁধে কনুই দিয়ে মৃদু একটি অবিশ্বাসের আঘাত সঁপে দেয় বেলা : "যতই বলো, আমি একটুও বিশ্বাস করি না।"

"বিশ্বাস কর, বেলা।"

"এটা না হয় বিশ্বাস করলাম, কিন্তু আর একটা? সেটা তো বিশ্বাস করতে পারি না।"

"সেটা আবার কী?"

"সেটা হলো তুমি। তুমি কী ঘরে চুপটি করে থাকতে পার? নমিতার সঙ্গে দুটি কথা না বললে যে তোমার প্রাণ আইঢাই করে।"

"মিথ্যে কথা। কোনদিন আইঢাই করেনি, আজও করে না। এমন কি ফুলশয্যার রাত্রিতেও নমিতার সঙ্গে আমি বিশেষ কোন কথা বলিনি। সারা রাত তোমারই কথা ভেবেছিলাম।"

আবার খিলখিল হাসি। বেলা বলে, "কী যেন সেই কথাগুলো? বিয়ের আগের দিন, সেই যে একখানা মস্ত বড় প্রেমের চিঠিতে নমিতা তোমাকে লিখেছিল : 'জীবনে শুধু একটিবার তোমার গলা জড়িয়ে ধরতে চাই, তারপর যদি মরেও যেতে হয়...' উঃ কী কাণ্ড রে বাবা! ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে একজন পুরুষ ভদ্রলোককে চিঠিতে এ সব কথা লিখতে...উঃ, ছি-ছি।" বলতে বলতে শিউরে ওঠে বেলা; তারপর যেন বিপুল এক অভিমানের ভারে অলস হয়ে অমিয়র মুখের কাছে বড় বড় চোখ দুটিকে ভাসিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করে, "কিন্তু আমি কি কোনদিন চিঠিতে তোমাকে ওসব কথা লিখেছি?"

"কোনদিনও না।"

"কেন লিখিনি? কেন লিখতে পারিনি? বলো, শিগগির বলো।"

"লেখবার দরকার কী?"

"ঠিক বলেছ। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারনি। যে-মানুষ কাজে ও-সব করে দেখাতে পারে, সে ও-সব কথা চিঠিতে লেখে না। আর, যে চিঠিতে ও-সব কথা লিখতে পারে, সে কাজে ও-সব করতে পারে না।"

"বুঝেছি বেলা।"

হঠাৎ শক্ত করে অমিয়র হাত চেপে ধরে বেলা : "এইবার বলো, একেবারে দিব্যি করে বলো।"

"কী?"

"নমিতা কি কোনদিন তোমার সঙ্গে ওসব কাণ্ড...?"

"কোনদিনও না।"

"তুমি কোনদিন....!"

"একদিনও না।"

শান্ত হয় বেলা। অমিয়র কোলের উপর বেলার অলস হাতটা এইবার ঢলে পড়ে। অমিয়র সঙ্গে বেলার তিন বছরের ভালবাসার ইতিহাস যেন একটা সংশয়ের দংশন থেকে মুক্ত হয়ে এতক্ষণে হাঁপ ছাড়ে, স্বস্তি পায়।

ভরা ঝিলের জলের মত টলটল করে বেলা ঘোষের চেহারাটা। পলাশের ওই শাখার মত যেন হঠাৎ নতুন হাওয়ার ছোঁয়া লেগে বেলার চেহারাটা দোলে, সেইসঙ্গে দোলে পায়ের উপর তোলা পা। হাই-হিল জুতোর উপর বেলার রঙীন শাড়ির বর্ডার-এর লেসও লুটিয়ে দুলতে থাকে। বেলার সিঁথিতেও সিঁদুরের দাগ আছে। বেলার ক্যামেরার পাশে একখানা ইংরাজী নভেলও পড়ে আছে। নভেলের প্রথম পাতায় একটা নামও লেখা আছে, টি.এন.ঘোষ।

অমিয় বলে, "মিস্টার ঘোষ কি এখনও তোমাকে চিঠি লিখে বিরক্ত করছেন?"

"না, এখন একেবারে থেমে গিয়েছেন। যদি আবার ও-সব বাড়াবাড়ি করেন, তবে আমি একেবারে আইনমত সেপারেট হয়ে যাব। ...কিন্তু...কিন্তু ...আমার কি উপায় হবে অমি?"

বেলার চোখে জল। মাথা ঝুঁকে পড়েছে। বেলার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয় অমিয়, "বলো, আমি তোমার জন্য কী করতে পারি?"

"কিছু করতে হবে না। আমি আবার দার্জিলিং-এ গিয়ে সেই একশ টাকা মাইনের চাকরিটা নিয়ে, যত বাজে বড়লোকের লোভ আর উইকেডনেস থেকে প্রাণটাকে বাঁচাতে, হয়রান হয়ে, পাগল হয়ে, মরতে মরতে...।"

ছলছল করতে করতে বেলার গলার স্বরটা যেন হঠাৎ একটা ঢেউ হয়ে আছাড় খেয়ে ভেঙে পড়তে চাইছে। অমিয় বলে, "আমি তো তোমাকে আগেই কথা দিয়েছি বেলা, বেহালার বাড়িটা তোমাকেই গিফ্‌ট করে দেব।"

"কবে?"

"ধর, এই পূজোর ছুটির পরেই দু-একদিনের মধ্যে।"

"কত রাত হলো অমি?"

"বেশি নয়। আরও কিছুক্ষণ থাকা যাক।"

"সত্যনাথবাবু!"

বিকেলের শেষে সন্ধ্যাটা একটু আবছায়াময় হয়ে উঠেছে, মাধবীলতার ঘেরানের পাশে দাঁড়িয়ে ডাক শুনতে পেয়ে চমকে ওঠে সত্যনাথ। গলায় সোনার হারে নীল পাথরের লকেট, সেই মহিলা আবার এসেছেন।

এগিয়ে আসেন মহিলা। প্রশ্ন করেন, "আজও কি ওরা আবার এসেছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কী বলাবলি করছিল ওরা?"

"আমি ও-সব কিছুই শুনিনি।"

"আমার মনে হয়, আজকাল সকালের দিকেও ওরা এখানে একবার আসে।"

"না, সকালের দিকে আসেন না।"

"নিশ্চয় আসে।"

"আজ্ঞে না।"

"আপনি কেমন করে দেখবেন যে, ওরা সকালের দিকে আসে কি না আসে?"

"আমি সব সময় এখানেই থাকি।"

মহিলার চোখে যেন একটু আশ্চর্যের আভা চমকে ওঠে। "আপনি এখানে সবসময় থাকেন, তার মানে?"

"আমি এখানেই কাজ করি।"

"কিসের কাজ?"

কুণ্ঠিতভাবে মুখে হাসি টেনে সত্যনাথ বলে, "সামান্য একটা কাজ। কেউ বলে বাগান-মাস্টারের কাজ আবার অনেকেই বলে, হেড মালীর কাজ।"

মহিলা যেন আনমনার মত বলতে থাকেন, "তার মানে, এইসব মাধবীলতা, বকুলচারা, গাছের ছায়া আর ঝিলের শালুক নিয়ে পড়ে আছেন আপনি? বাঃ, বেশ সুন্দর চাকরি করেন দেখছি!"

সত্যনাথের মনটাই যেন হাঁফ ছেড়ে একটা ভয়ের ভার থেকে মুক্ত হয়ে খুশিতে মুখর হয়ে ওঠে, "তা ঠিকই বলেছেন। সকাল-সন্ধ্যা ওই নিয়েই আছি।"

সন্ধ্যাতারা উঠেছে, অনেকক্ষণ আগেই। ঝিলের ও-পারের আলো আর কালোর দিকে তাকিয়ে থাকেন মহিলা। তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে পার্কের গেটের কাছে গিয়ে যেন এক রহস্যময় রিক্‌শার কোলে চড়ে এই জগৎ থেকে অদৃশ্য হয়ে যান।

আর, ঠিক সেই মুহূর্তে খিলখিল করে হেসে ওঠে ঝিলের ছায়াঘন ও-পার।

বেলা প্রশ্ন করে, "শুধু শুয়ে শুয়ে বই পড়ে, আর-কিছু করে না নমিতা?"

"অমিয় বলে, "না।"

"তোমার মুখের দিকে একটিবার তাকায় না?"

অমিয় হাসে, "তা মাঝে মাঝে তাকায় বই কি।"

"উদ্দেশ্যটা কী?"

"তা বলতে পারি না।"

"বোধহয়, শুধু একটিবার তোমার গলা জড়িয়ে ধরে তখ্‌খুনি মরে যেতে চায়।"

খিলখিল করে হেসে দুলতে গিয়ে বেলা ঘোষের কাঁধ থেকে পিছল সিল্কের শাড়ির আঁচল আরও পিছল হয়ে পড়ে যায়।

অমিয় হাসে : "তোমার সন্দেহটা একেবারে মিথ্যে নয় বেলা। আমারও মনে হয় যে...!"

বেলা বলে, "তোমার গলাটি জড়িয়ে ধরে, তোমার দমটি বন্ধ করে দিয়ে, নিজে বেশ টগবগ করে বেঁচে থাকতে চায় নমিতা, এই তো ওর মতলব। কেমন? ঠিক বলেছি কি না? কথা বলছ না যে?"

"বলবার আর কি আছে? তুমি ঠিকই ধরেছ বেলা। এই তিন বছর ধরে অকারণে শুধু সন্দেহ করে নমিতা আমাকে সকাল-সন্ধ্যা ঘরের ভেতর আটক করে রাখবার চেষ্টা করেছে।"

"মিস্টার ঘোষও আমাকে পাঁচটি বছর ওই রকম যন্ত্রণা দিয়েছিলেন।"

"কী আশ্চর্য!" অমিয়র গলার স্বরও যন্ত্রণায় আক্ষেপ করে ওঠে, "শুধু বিয়ে করা হয়েছে, এই জোরে ওরা মানুষকে আটকে রাখতে চায় বেলা, ভালবাসার জোরে নয়।"

সন্ধ্যাতারা ফুটে ওঠে আবার। রাজা-পার্কের জংলা ঝিলের এ-পারে মাধবীলতার ঘেরানের কাছে আলো-ছায়ার পাশে পাশে সত্যনাথের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেড়াতে থাকেন মহিলা; গলার হারের নীল পাথরের লকেটও যেন আলোর ছোঁয়া পেয়ে জ্বলে ওঠে, আবার কালোর ছোঁয়া লেগে নিবে যায়। মহিলার কালো চোখের তারা হঠাৎ বড় বেশি আশ্চর্য হয়ে যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে, "এ কী বলছেন সত্যনাথবাবু? এ যে একটা ভয়ানক রূপকথা।"

সত্যনাথ হাসে, "তা আপনি যা-ই বলুন। এই জন্যই মিউনিসিপ্যালিটি আর পুলিস আমাকে একটু খাতির করে। আর, এইজন্যই বোধহয় এই চাকরিটা আজও আছে। নইলে কবে চলে যেত হয়তো।"

মহিলা শঙ্কিতভাবে বলেন, "যা-ই হোক, আর এরকম ভয়ানক কাজের মধ্যে যাবেন না, সত্যনাথবাবু।"

"আপনি মিথ্যে ভয় করছেন। এই জংলা ঝিলের জলে নামতে আমার একটুও ভয় করে না, বরং বেশ...কেমন যেন...ইয়ে একটা মজা লাগে।"

মিথ্যে বলেনি সত্যনাথ। রাজা-পার্কের ঝিলের জলে নেমে, একেবারে জলের গভীরে গিয়ে ডাকাতের মত উল্লাস নিয়ে হাতড়ে হাতড়ে মাটির পৃথিবীর এক-একটা দুঃখের শরীরকে তুলে নিয়ে আসতে হেড মালী সত্যনাথের প্রাণে বোধহয় একটা মজাই লাগে। এই পাঁচ বছরে এই ঝিলের জলের আড়াল থেকে কম করেও পঞ্চাশটি লাশ তুলেছে সত্যনাথ। সাঁতারে কুমীরও ওর কাছে হার মেনে যাবে বোধহয়। কী ভয়ানক দম বন্ধ করে রাখতে পারে সত্যনাথ। জিমনাশিয়ামের ছেলেরা ঘড়ি ধরে পরীক্ষা করে দেখেছে, জলের নিচে তলিয়ে গিয়ে পুরো তিনটি মিনিট পরে তাজা শুশুকের মত হুস করে ভেসে উঠল সত্যনাথ।

সত্যনাথ হাসে : "এই রূপকথার কৃপায় কিছু রোজগারও তো করেছি।"

মহিলা আশ্চর্য হন: "রোজগার?"

"হ্যাঁ। একটা লাশ তুলতে পারলে পুলিস দু'টাকা আর মিউনিসিপ্যালিটি দু'টাকা বকশিশ দেয়।"

হ্যাঁ, এ এক ভয়ানক রূপকথা। পৃথিবীর যত লজ্জা ভয় আর দুঃখ, যত জ্বালা হতাশা আর নিষ্ঠুরতা যেন এক-একটা প্রাণকে চিরকালের মত নীরব করে দেবার জন্য এই জংলা ঝিলের বুকে ছুঁড়ে দেয়, আর ঝিলের জল আদর করে একেবারে বুকের গভীরে নিয়ে গিয়ে তাদের লুকিয়ে রাখে। সব সময় জাল ফেলে তাদের তোলা যায় না। পুলিসের লোক হয়রান হয়। ঝিলের জলের আড়ালে যে লক্ষ লক্ষ সাপের জটলার মত ডুবো লতার ঝোপ ছড়িয়ে আছে! কে জানে, কোন্ ডুবো ঝোপে ফেঁসে আছে লাশ? কিংবা জলের তলের সেই অথৈ পাঁক, যেন তুলতুল করছে নরম মরণের লালা। কিন্তু আঠার মত তার ছোঁয়া, ফোকলা পাগলের কামড়ের মত কী শক্ত সেই পাঁকের কামড়!

ডুবো লাশ তুলবার আগে শুধু লম্বা একটা লগি হাতের কাছে ভাসিয়ে রেখে ঝিলের এদিক-ওদিক সাঁতার দেয় সত্যনাথ। ছোট হাফ-প্যান্টের কোমর শক্ত করে গামছা দিয়ে বাঁধা. এই সময় সত্যনাথের চেহারাটাকে দেখতে বড় অদ্ভুত লাগে। যেন মাটির মানুষের তাজা প্রাণের একটা সুন্দর অহংকার জলের বুক তোলপাড় করছে। সত্যনাথ যেন জলের গায়ের চোরা গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারে, কোথায় থাকতে পারে লাশ। খাড়া লগি পুঁতে দিয়ে একটি ডুব দেয় সত্যনাথ। ডুবো লতার জাল ছিঁড়ে মানুষের লাশ বের করে সেই লাশকে একটি হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে দু'মিনিটের মধ্যে উপরে ভেসে ওঠে। ঝিলের কিনারায় দাঁড়িয়ে লোকের ভিড় চটপট হাততালি দিতে থাকে।

সত্যনাথ হাসে : "ঝিলের জল আমার ওপর বড্ড রাগ করে, তাও বুঝতে পারি। ডুবো লতার জাল কিলবিল করে কতবার আমাকে বেঁধে ফেলবার চেষ্টা করেছে। পাঁকের জোঁক কান কামড়ে ধরেছে, বুড়ো সাপ চোখের উপর লেজের বাড়ি মেরেছে, জ্বলে উঠেছে বুড়ো সাপের আঁশ। আমি কিন্তু...।"

নীল পাথরের লকেট শিউরে ওঠে : "ছিঃ, আপনি কেন এই সব পচা গলা নোংরামি উদ্ধারের জন্য...।"

হ্যাঁ, এই পৃথিবীর জীবন থেকে যত গ্লানি যেন ছুটে গিয়ে ওই ঝিলের জলের আড়ালে মুখ লুকোয়। কেউ পাগল হয়ে, কেউ কুষ্ঠরোগের ঘৃণা আর জ্বালা সইতে না পেরে, কেউ ভালবেসে ঠকে গিয়ে, কেউ গোপন পাপের লজ্জায় চমকে উঠে এই জংলা ঝিলের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আর মরেছে! বৃদ্ধ ও যুবক, গর্ভবতী বিধবা আর কুমারী, তহবিল-তছরুপের ক্যাশিয়ার আর মামলায় হেরে-যাওয়া সর্বস্বান্ত জমিদার। সত্যনাথের হাত ঝিলের ঠাণ্ডা জলকে ঘাঁটিয়ে আর ক্ষুব্ধ করে লুঠ করে আনে মাটির পৃথিবীর যত কলঙ্কের প্রমাণ। খুনীর ছুরিতে গলা-কাটা মানুষের প্রাণহীন দেহ, কিংবা মাছে-খোবলানো একটা শিশু-শরীর; নাড়ী-জড়ানো একটা পিণ্ড, সেই শিশুর বয়স এক ঘণ্টাও হবে কিনা সন্দেহ। জংলা ঝিলের জলের কাছে যে-জিনিস এত আদরের ঐশ্বর্য, সে-জিনিস লুঠ করে আনলে জলের তো রাগ হবারই কথা।

সত্যনাথ হাসে : "তবে আমার একটা দুঃখও আছে। বড় দেরিতে খবর পাই। আমি এসে জলে নামবার আগেই সুইসাইড হাসিল হয়ে যায়। জলের ভিতরে মানুষটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তখুনি বুঝতে পারি, হয়ে গেছে। একবার অবিশ্যি...।"

মহিলার গলার স্বর কেঁপে ওঠে : কী?"

"একটা বাচ্চা ছেলে জলে পড়ে গিয়েছিল। হাঁক-ডাক শুনে ছুটে এসে তিন ডুবে তিন মিনিটের মধ্যেই ছেলেটাকে পাঁক থেকে ছাড়িয়ে নিলাম। জড়িয়ে ধরে বুঝলাম, ধুকপুক করছে ছেলেটার বুক। কিন্তু...কী বলব...ভেসে ওপরে উঠতেই ছেলেটা আমার বুকের ওপর ঠাণ্ডা হয়ে নেতিয়ে পড়ল। বাঁচেনি ছেলেটা...এ কী, আপনি কাঁদছেন কেন? ঠিকই এসব কথা আপনার কাছে বলা ভুল হয়েছে, বুঝতে পারিনি।"

রুমাল দিয়ে চোখ মোছেন মহিলা। তারপর সত্যনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন দু'চোখের নিবিড় কালোর সব আশ্চর্য ঢেলে দিয়ে দেখতে থাকেন। তারপর বলেন, "আপনি সত্যই সুন্দর একটা রূপকথা, সত্যনাথবাবু।"

ঘেরানের মাধবীলতার দোলায় সন্ধ্যার বাতাস ফুরফুর করে। মহিলা বলেন, "আমি তাহলে

আজকের মত...এখন যাই, কেমন?"

সত্যনাথ বলে, "আসুন।"

ঝিলের এ-পারে, রাজা-পার্কের ফটক পার হয়ে চলে গেল সোনার হারের নীল পাথরের লকেট। আর, ছায়াঘন ও-পারে পলাশের কাছে তখন কালো আর আলোর মধ্যে খিলখিল হাসির স্বর হেলে দুলে লুটিয়ে পড়তে থাকে।

বেলা ঘোষ বলে, "কী আশ্চর্য, এ আবার কোন্ বুজরুকি ধরল নমিতা?"

অমিয় বলে, "ধরলে আমি আর কি করব বলো?"

"তোমার দিকে না হয় ভুলেও একবার তাকায় না, কিন্তু কোন্ দিকে তাকায়?"

"একটা খাতার দিকে। আজকাল সব সময় নমিতার হাতে একটা খাতা থাকে, তার মধ্যে যা খুশি তাই, কী-সব যেন লেখে।"

সন্ধ্যাতারা ফুটে ওঠবার অনেক আগে, তখন পশ্চিমের আকাশে ফাগুনের বিকালবেলার রূপ মাত্র একটু রঙীন হয়েছে। রাজা-পার্কে হেডমালীর ছোট ঘরের প্রায় দরজা পর্যন্ত এসে সোনার হারের নীল পাথরের লকেট ঝিক করে হেসে ওঠে।

সত্যনাথ এগিয়ে এসে বলে, "কখন এসেছেন?"

"এই তো আসছি।"

সত্যনাথ তার ফরসা আদ্দির পাঞ্জাবির পকেটে ফরসা ধুতির কোঁচা গুঁজে দিয়ে, হঠাৎ যেন বড় বেশি ফুল্ল হয়ে, সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বলে ওঠে, "একটা সুখবর আছে।"

মহিলা হেসে ওঠেন : "ওরা বোধহয় আজ আর আসেনি?"

"বলেন কী! ওরা তো আজ সেই দুপুর থেকেই এসে বসে আছে।"

"যাকগে ওদের কথা। আপনার কথা বলুন।"

"এই বাগান মাস্টারীর কাজ ছেড়ে দিয়ে আমি কালই চলে যাচ্ছি।"

কেঁপে ওঠে নীল পাথরের লকেট :"কি বললেন?"

"যাচ্ছি শিউড়িতে, একটা স্কুলের জিমন্যাস্টিক মাস্টারের কাজ পেয়েছি, মাইনে আশি টাকা।"

নীরব হয়ে, আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, বেশ কিছুক্ষণ ধরে মাধবীলতার ঘেরানের দিকে তাকিয়ে রইলেন মহিলা। ফিনফিনে ভয়েলের শাড়ির আঁচল তুলে কপালটাকে আস্তে আস্তে মুছলেন। তারপর যেন আধঘুমে জড়ানো ভাষার মত আস্তে আস্তে বলেন, "শিউড়ি, সে তো অনেক দূর!"

আরও প্রায় এক মিনিটকাল কোন কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইলেন মহিলা। তারপর ছায়াঘন ও-পারের দিকে তাকিয়ে বলেন, "ওরা ওই পলাশের কাছে একটা বেঞ্চিতে বসে আছে, না?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, চলি।"

চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে সত্যনাথ। ফটকের দিকে নয়, ঝিলের ও-পারের ওই পলাশের দিকে শান্তভাবে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যাচ্ছেন মহিলা। হ্যাঁ, চলেই যাচ্ছেন। একবার হোঁচট খেয়ে টলে উঠলেন মনে হলো। কিন্তু তবুও থামলেন না। ...এ কী? হঠাৎ ছুটতে শুরু করলেন কেন? ....সর্বনাশ, ও কী কাণ্ড করলেন মহিলা?

মালীরা চেঁচিয়ে হাঁক দেয়, "মাস্টারদা!" ও-পার থেকে ভিড়ের লোকের আতঙ্কিত স্বর শোনা যায়, "মাস্টার! মাস্টার! সকলেই যে জানে, জংলা ঝিলের সব নিষ্ঠুরতার সঙ্গে লড়াই করবার মত মজবুত এক ওস্তাদ থাকে এই রাজা-পার্কে, তার নাম মাস্টার।

এক দৌড়ে ঘরের ভিতর গিয়ে গামছাটা হাতে তুলে নিয়ে এসে ছায়াঘন ও-পারে ঝিলের কালো জলের কাঁপুনির দিকে ক্রুদ্ধ দস্যুর মত একবার তাকায় সত্যনাথ। তারপরেই ছুটে যায়।

পলাশের কাছে লোহার বেঞ্চির পাশে শুধু একা দাঁড়িয়ে আছে লম্বা ফরসা অমিয়, লাল নেকটাই আর তসরের ট্রাউজার-পরা অমিয়। কে জানে কখন উধাও হয়ে গিয়েছে খিলখিল হাসির বেলা ঘোষ! আর, মস্ত একটা ভিড় জমাট হয়ে ঝিলের কিনারায় দাঁড়িয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আবেগ সামলে নিয়ে ঝিলের বুকের দিকে তাকিয়ে আছে, যেখানে জলপদ্মের পাতা ভাসছে। জলের শত্রু মাস্টার, এক ডুব দিয়ে তিন মিনিট ধরে তলিয়ে আছে; খুঁজছে এক সুন্দরী মহিলাকে, যিনি সুইসাইড করার জন্য ছুটে এসে, এই তো এই মাত্র, ওই ট্রাউজার-পরা ভদ্রলোকের চোখের সামনে এক সেকেণ্ড মাত্র দাঁড়ালেন, তারপর ঝিলের জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। পুলিসের কছে খবর দিতে লোকও চলে গিয়েছে।

"বেঁচে আছে। বেঁচে আছে। সাবাস মাস্টার!" ভিড়ের উল্লাস আর হাতখানি আকুল হয়ে বেজে ওঠে। সুন্দরী মহিলাকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে উপরে ভেসে উঠেছে মাস্টার।

ভিড়ের কাছে এগিয়ে এসে কাঁপতে কাঁপতে আর গলার স্বরের থরথরানি নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করে অমিয়, "কি করে বুঝলেন যে, বেঁচে আছে?"

ভিড়ের লোক বলে, "ওই তো , দেখছেন না, মহিলা দু'হাত দিয়ে কিরকম শক্ত করে মাস্টারের গলা জড়িয়ে ধরে রয়েছে?"

হ্যাঁ, ঠিকই, অমিয়র দু'চোখের উপর একটা ভয়ানক ঠাট্টা যেন জ্বালাভরা ঘৃণা ছুঁড়ে দিয়েছে। বেশ তো দিব্যি, কী ব্যাকুল আগ্রহে একটা লোকের গলা জড়িয়ে ধরে, মরণ থেকে বেঁচে উঠতে চাইছে নমিতা। লোকটার কপালের উপর কপাল নামিয়ে দিয়ে যেন ঘুমিয়ে রয়েছে নমিতা।

অ্যাম্বুলেন্স এল। হাসপাতালে চলে গেল মহিলার সংজ্ঞাহীন শরীর।

ভিড়ের লোক বলে, "বেঁচে যাবে। সাবাস মাস্টার!"

পুলিস এল। অমিয় বলে, "হ্যাঁ, আমার স্ত্রী।"

অমিয়র দিকে তাকিয়ে ভিড়ের লোক চেঁচায়, "আগে মাস্টারকে ভাল বকশিশ করুন মশাই।"-

"বকশিশ?" আশ্চর্য হয়ে তাকায় সত্যনাথ। তারপর আর কোন কথা না বলে, কোন দিকে না তাকিয়ে, সোজা হেঁটে এসে জংলা ঝিলের এপারে মাধবীলতার যেরানের কাছে ক্লান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

অনেক তদন্তের পর পুলিস রিপোর্ট দিল, সুইসাইডের চেষ্টা নয়—হিস্টিরিয়া। মহিলা কিছুদিন থেকে শুধু শুয়ে থাকেন, কথা বলতেন না, আর খাতা ভরে কবিতা লিখতেন। রাজা-পার্কের জংলা ঝিলের নামে যত সব কবিতা।

সেদিনই খুশি হয়ে থানা থেকে বাড়ি ফিরে, সন্ধ্যাতারা ফুটে উঠবার পর, বেলা ঘোষের বাড়িতে যাবার আগে নমিতার কাছে এগিয়ে এসে আর ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে প্রশ্ন করে অমিয়,

"তুমি আমার ওপর রাগ করে এরকম কুৎসিত একটা কাণ্ড করলে কেন?"

নমিতার ভ্রূকুটিও বেশ কঠোর হয়ে ফুটে ওঠে : "কী বললে? তোমার ওপর রাগ করে?"

"হ্যাঁ।"

হেসে ফেলে নমিতা। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, "না, তোমার ওপর নয়, রাগ করেও নয়।"

চমকে ওঠে অমিয়। যেন হঠাৎ একটা হোঁচাট লেগেছে, পা দুটো অনড় হয়ে গিয়েছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অমিয়।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাতারার দিকে তাকিয়ে নমিতা বলে, "আর, কাণ্ডটাও একটুও কুৎসিত নয়।'

সুনিকেতা

কলকাতার পল্লী। লেক দূরে নয়। কংক্রিটের 'নীলকমল'। বিরাট চারতলা। কাঁচা দুধের মতো রঙ। শেষ চৈত্রের সন্ধ্যা। গুলমোরের মাথায় দুরন্ত সোনা। ছোট ছোট ঝড় উড়ে যায়।

বেড়িয়ে ফেরে সেই মহিলা আর সেই ভদ্রলোক। মহিলার বয়স পঁচিশ হতে পারে, পঁয়ত্রিশও হতে পারে। কিন্তু ভদ্রলোকের বয়স কোনমতেই পঁয়ত্রিশের বেশী হতে পারে না। মহিলা দেখতে সুন্দর। কিন্তু ভদ্রলোক মহিলার তুলনায় অনেক বেশি সুন্দর। আজ প্রায় এক বছর ধরে প্রতি সন্ধ্যায় ঠিক এই ভঙ্গিতেই দুজনে নিবিড়ভাবে দুজনের হাতে হাত বাড়িয়ে আর ধীরে ধীরে হেঁটে নীলকমলের ফটকের সামনে এসে থেমেছে।

ফটকের কাছে এত কড়া একটা আলো জ্বলে, কিন্তু সেই আলোকের অস্তিত্বই যেন ওরা স্বীকার করে না। মহিলার পিঠের উপর একটা হাত আদুরে ভঙ্গিতে তুলে দিয়ে ভদ্রলোক চাপা গলায় কি যেন বলে। প্রত্যুত্তরে শুধু মৃদু একটি ভ্রূকুটি করে মহিলা। তারপরেই মহিলার কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে ফিস ফিস স্বরে আরও কি-সব বলতে থাকে ভদ্রলোক। মনে হয়, ভদ্রলোকের দুই ঠোঁট যেন মহিলার কানের দুল ছুঁয়ে কথা বলছে।

ঝক্ করে হেসে ওঠে মহিলার চোখ। মাথা দিয়ে আস্তে একটা ধাক্কা দেয় ভদ্রলোকের কাঁধে। হো হো করে হেসে ওঠে ভদ্রলোক। মহিলা বেশ জোর গলা ছেড়েই বলে—হোপলেস! তার পরেই মুখের উপর রুমাল চেপে মহিলা তার নিজেরই মুখের হাসির উচ্ছ্বাসটাকে একটু লাজুক করে তোলে।

তারপরেই বাহুবদ্ধ দুটি পুলকিত মূর্তি তরতর করে নীলকমলের সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে থাকে। এবং তারপরেই তিন তলার একটি ছোট ফ্ল্যাটের একটি ঘরে দপ্ করে আলো জ্বলে ওঠে। গোলাপী রঙের আলো।

এ ফ্ল্যাট আর ও ফ্ল্যাটের জানালায়, পাশের বাড়ির ছাতের রেলিং-এর কাছে, এমন কি রাস্তার ওপারে দুটো বড় বড় দোতলা বাড়ির বারান্দায় সারি সারি সতর্ক ক্যামেরার মতো যে-সব জোড়া জোড়া চোখ এতক্ষণ ধরে ফটকের আলোকে আলোকিত দৃশ্যটাকে লক্ষ্য করছিল, সে-সব চোখের কৌতূহলও এইবার উঁকিঝুঁকি দিয়ে আর গলা টান করে তিনতলার ফ্ল্যাটের গোলাপী রঙের

আলোকে আলোকিত দৃশ্যটাকে দেখবার চেষ্টায় ছটফট করতে থাকে। কিন্তু বিশেষ কিছু দেখা যায় না, বোঝা যায় না, অনুমান করা যায় না। শুধু দপ্ করে আর একবার আলোর রঙ বদলায়। ফিকে বেগুনী রঙ।

কিছু বরং দেখা যায় আর বোঝা যায় রাস্তার এ ফুটপাথে না দাঁড়িয়ে ও ফুটপাথে দাঁড়ালে। দুটো গুলমোর মাথা উঁচু করে নীলকমলের তিনতলার ঐ রঙিন ঘরের জানালা দুটো প্রায় ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাতাসের উপদ্রবে গুলমোরের মাথা এদিক ওদিক একটু কাত হলেই দেখা যায়, দেয়ালে দুটো রঙিন ফটো পাশাপাশি ঝুলছে, সাদা সরু ফ্রেমে বাঁধানো, বোধহয় হাতির দাঁতের ফ্রেম। মেহগনির একটা শীর্ণ ও ঋজু স্ট্যাণ্ডের উপর একটা কাশ্মীরী সুরাহি, পিতলের উপর মীনার কাজ করা। তার মধ্যে রজনীগন্ধার লম্বা লম্বা ডাঁটা, ডাঁটার মাথায় ঘুমন্ত কুঁড়ি। কুঁড়িগুলি ফুটলেই ফটোর দুদিকে ছুঁয়ে ফেলবে বোধহয়।

ঘরের মাঝখানে একটা খাট, খাটের উপর ঝকঝকে রঙিন সাটিনের ঢাকনা। তার উপর পৃথিবীর কোন মানুষ কোনদিন বসবে বলে বিশ্বাস হয় না, এমনই নিখুঁত যত্নে সাজিয়ে-গুছিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে খাটের বিছানার কোমলতা। বড় মিররের বুকে আলো-ঝলসানো গুলমোরের সোনালী প্রতিচ্ছায়া কখনো কাঁপে কখনো দোলে। আরও আসবাব আছে এইটুকু ঘরের মধ্যেই। কিন্তু সবই যেন ছবির মতো আঁকা। নড়চড় নেই, ওলটপালট নেই। প্রায় এক বছর ধরে ঠিক এইভাবেই সাজানো। কোন আগন্তুক এ ঘরের দরজার কড়া নাড়ে না, ঘরে প্রবেশও করে না। আজ পর্যন্ত তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে এ ঘরের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। মনে হয় ঐ দুজনেরই প্রাণের রঙে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে এই ঘর, আর একটুও জায়গা নেই। তৃতীয় কোন প্রাণ প্রবেশ করলেই এই ঘরের সব রূপের ছন্দ এলোমেলো হয়ে যাবে।

যখন ঘরের পাখা খুব জোরে ঘোরে, তখন এ জানালার দিকে তাকালে দেখা যায়, রঙিন শাড়ির আঁচলের একটুখানি অংশ ফুরফুর করে উড়ছে। আর ও জানালার দিকে তাকালে দেখা যায় সিল্কের কামিজের আধখানা আস্তিন এবং ঘড়ি বাঁধা একটা কব্জি। যেন এক অর্ধনারীশ্বরের মূর্তির ডান আর বাম দেহভাগের আভাস মাত্র দেখা যায়। বুঝতে অসুবিধা হয় না, দুই জানালার মাঝখানে, ঐ দেয়ালটুকুর ওপাশে নিশ্চয়ই ভেলভেটে মোড়া ছোট একটা কৌচ আছে এবং সেই কৌচের উপর অতিঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে সেই ওরা দু'জন, যারা প্রতি সন্ধ্যায় একখণ্ড অতি নাটকীয় প্রগল্ভতার মতো বাইরে থেকে বেড়িয়ে ফেরে এবং জড়াজড়ি আর ঢলাঢলি করতে করতে নীলকমলের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যায়।

প্রায় এক বছর হলো এই ফ্ল্যাটে রয়েছে ঐ মহিলা আর ঐ ভদ্রলোক, কিন্তু নীলকমলের কোন ফ্ল্যাটের কোন মানুষই ওদের পরিচয় জানে না। ভবনের দারোয়ান ছাড়া ওদের নামও বোধহয় কেউ জানে না। এক বছর ধরে এই পাড়ার সবারই চোখে এত প্রত্যক্ষ হয়েও পাড়ার কাছে ওরা দুজনে আজ পর্যন্ত অপরিচিত রয়ে গিয়েছে। সত্যিই দুটি রঙিন ফটোই বাস করে তিনতলার এই ফ্ল্যাটের ঘরটিতে। এক বছরের মধ্যে এই ভবনের আর এই পাড়ার কোন মানুষের সঙ্গে ওরা দুজনের একজনও কখনও একবার ভুলেও আলাপ করেনি।

পাড়ার সকলেই অবশ্য এইটুকু জানে যে, মহিলা কোথাও চাকরি করেন। প্রতিদিন সকাল দশটার সামান্য কিছু আগেই একটা স্টেশন ওয়াগন এসে থামে নীলকমলের ফটকে। কোন বড়

সদাগরী অফিসেরই গাড়ি বলে মনে হয়, কারণ ড্রাইভারের উর্দি বেশ জমকালো ধরনের। তিনবার হর্ণ বাজাতেই মহিলা নেমে আসেন। গাড়ির ভিতর আরও কয়েকজন অফিসযাত্রিণী মহিলাকে সুসজ্জিত বেশে বসে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু এ মহিলা যেরকম জাঁকালো সাজে সেজে অফিসে যান, কোন রাজার বাড়ির বিয়ের উৎসবে যেতে হলেও সেরকম জাঁকালো সাজে সাজবার দরকার হয় না।

অফিসের গাড়ি আসামাত্র এ ফ্ল্যাট আর ও ফ্ল্যাটের জানালায় কৌতূহলী কতগুলি নারীচক্ষুর সমাবেশ দেখা যায় এবং গাড়ি স্টার্ট নেওয়া মাত্র চারদিকের বাতাসে ফিসফিস স্বরে একটা মন্তব্য ধ্বনিত হতে থাকে।—শাড়ির গাছ আছে বোধহয়।

মন্তব্যটা অহেতুক নয়। অনেকেই লক্ষ্য করেছে এবং আশ্চর্য হয়েছে আজ পর্যন্ত এ মহিলাকে এক শাড়ি পর পর দুদিন পরতে কখনো দেখা গেল না।

ঐ ভদ্রলোক সম্বন্ধেও একটা তথ্য এখন আর কারও অজানা নেই। ভদ্রলোক কিছুই করে না। সারা দুপুর ঘরেই থাকে।

তিনতলায় ফ্ল্যাটের ঐ একটি মাত্র ঘর। ভিতরের দিকে সরু এক ফালি বারান্দা। কিন্তু কি তকতকে ঝকঝকে ও রঙিন একটি নীড়! একেবারে নিখুঁত পারিপাট্য। ধোঁয়ার চিহ্ন এ ফ্ল্যাটে কখনো দেখা যায় না, কারণ রান্নাবান্নার কোন নোংরা ঝঞ্ঝাট এখানে নেই। দু'বেলাই হোটেল থেকে খাবার আসে। চাকর-বাকরও নেই। ভদ্রলোক সারা দুপুর ধরে ঘুমোবার পর, বিকেল হতে হতেই জেগে ওঠে এবং ঝাড়পোছ করে রঙিন নীড়ের নিখুঁত পারিপাট্য সজীব করে রাখে। মহিলা অফিস থেকে ফেরবার আগেই ভদ্রলোক একবার নীচে নেমে আসে। সিল্কের চীনা-কোট পায়জামা আর বাঘছালের চটি, এই সাজেই কত সুন্দর দেখায় ভদ্রলোককে। হেঁটে হেঁটে মাত্র রাস্তার ঐ মোড় পর্যন্ত এগিয়ে যায় এবং ফিরে আসে রজনীগন্ধার একগুচ্ছ ডাঁটাসুদ্ধ কুঁড়ি নিয়ে। এ ছাড়া আর কোন কাজ করতে ভদ্রলোককে কেউ কখনো দেখেনি।

তারপর, মহিলা অফিস থেকে ফিরে আসার পর, বেড়াতে যাবার পর্ব। ভদ্রলোক শার্ট ট্রাউজার আর টাই পরে এবং মহিলা বিচিত্রা হয়ে ওঠে তার খোঁপার বৈচিত্র্যে। অফিস যাবার সময় যেমন শাড়িতে, বেড়াতে যাবার সময় তেমনি খোঁপাতে, দুটো দিন কখনো মহিলাকে একটি রকম হতে দেখা গেল না। কাল দেখা গিয়েছিল সরু স্প্রিং-এর মতো কি-একটা বস্তু দিয়ে খোঁপাটা জড়ানো। স্প্রিং-এর মুখগুলি হলো ফণাতোলা সাপের মুখ, শিউরে শিউরে দোলে! আজ দেখা গেল, মস্ত বড় একটা রূপোর প্রজাপতি খোঁপা কামড়ে পরে আছে। যেন পরাগ খুঁজছে প্রজাপতি, তারই আনন্দে পাখা দুটো কাঁপছে।

কে ওরা? এই পাড়ার মধ্যে এটা একটা মস্ত বড় প্রশ্ন। কিন্তু এই প্রায় এক বছরের মধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না। রহস্য, রহস্য হয়েই রয়েছে। মহিলার সিঁথিতে সিঁদুরের দাগও দেখা যায় না। এটাই বা কোন রহস্য? এ কি শুধু একটা স্টাইল?

কে জানে, প্রথম কে কথাটা বলেছিল, কিন্তু এখন এ পাড়ার সর্বত্রই কথাটা ভাল করেই রটে গিয়েছে যে, নীলকমলের তিনতলার ফ্ল্যাটের ঐ ঘরে থাকে এক কিন্নর আর এক কিন্নরী।

দপ্ করে আর একবার আলোর রঙ বদলায়। তিনতলার ফ্ল্যাটের ঘর সবুজ হয়ে যায়। পাশের বাড়ির ছাদে রেলিং-এর কাছে অনেকগুলি ঘোমটা বেণী ও খোঁপা ব্যস্তভাবে আলোচনা করে—

যারা স্বামী-স্ত্রী নয়, তাদেরই বলে কিন্নর আর কিন্নরী।

রাত আর একটু কালো হয়। আর একটু সাদা হয়ে ফোটে আকাশের তারা। একটা উতলা বাতাস। লেকের জলে আলো কাঁপে। গুলমোর চঞ্চল। তার চেয়ে আরও বেশি চঞ্চল আশেপাশের বাড়ির ছাদে নানা বয়সের চোখের তারা। তিনতলার ফ্ল্যাটের ঐ রঙিন ঘরের কৌচ থেকে উঠে ঝকমকে সাটিনে ঢাকা খাটের উপর এসে বসেছে সেই দুটি মূর্তি, যাদের নাম আজও কেউ জানে না।

নাম হলো, বীথিকা রায় আর পরিমল রায়। আজ এক বছর হলো ওদের বিয়ে হয়েছে এবং বিয়ে হবার পর থেকেই নীলকমলের তিনতলার ফ্ল্যাটের এই ঘরটিতেই রঙিন নীড় রচনা করে দু'জনে আছে। কেউ ওদের দিকে তাকিয়ে দেখছে কি না, এটুকু তাকিয়ে দেখবার গরজও যেন ওদের নেই। দু'জনের চোখ দু'জনের মুখ দেখে মুগ্ধ হবার জন্য সারাক্ষণ ব্যস্ত হয়ে রয়েছে, অন্যদিকে তাকাবার সময় কই, দরকারই বা কি?

দুজনেরই জীবনে কল্পনা সত্য হয়েছে। যেন ধুলোবালির পৃথিবীতে দুটো অজাগতিকী কল্পনা তৃষ্ণার্ত চক্ষু নিয়ে মনের মতো সাথী খুঁজে বেড়াচ্ছিল। নিতান্ত আকস্মিকভাবেই সে-দুটি কল্পনার একদিন মুখোমুখি দেখা হলো। এবং কল্পনা সত্য হয়ে আর জীবন্ত হয়ে উঠতে আর বেশী সময় নিল না। তার প্রমাণ, তিনতলার ফ্ল্যাটের এই রঙিন ঘরটি, বীথিকা রায় আর পরিমল রায়ের জীবনের নীড়।

স্বামী দেখতে সুন্দর হবে, এই ছিল বীথিকার মনে সবচেয়ে বড় দাবি। সেই যখন কলেজের পড়া শেষ হয়নি, তখন থেকেই। বিয়ের প্রস্তাব এসেছে অনেকবার, কিন্তু প্রত্যেকবারই সে প্রস্তাব ব্যর্থ হয়েছে, বীথিকা তার জীবনের একমাত্র স্বপ্নের মতো সেই একনিষ্ঠ দাবিকে একটুও ছোট করতে রাজি হয়নি। পাত্রের চেহারা ভাল নয়, ও চেহারা চলবে না, স্পষ্ট করে প্রতিবাদ জানিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা করেনি বীথিকা। তিন বছর আগে শেষবারের মতো একটা বিয়ের প্রস্তাব এনেছিলেন বড়দা ; এই চাকরিটা তখন সবেমাত্র শুরু করেছে বীথিকা। সেই প্রস্তাবও অনায়াসে একটি কঠিন ভ্রূভঙ্গির আঘাতে আর মুখ ঘুরিয়ে তুচ্ছ করেছিল বীথিকা। সেই শেষ, বড়দা আর কখনো বীথিকার বিয়ের কথা উচ্চারণও করেননি।

বড়বৌদি একটু বিরক্ত হয়েই বলেছিলেন—জয়ন্তের চেহারাও তোমার ভাল লাগছে না? জয়ন্ত দেখতে খারাপ? আশ্চর্যই করলে তুমি!

বীথিকা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়—ওরকম চেহারা হাটে-বাজারে অনেক দেখা যায়।

বড়বৌদি—শুধু চেহারাই কি সব? গুণ-চরিত্র রোজগারও তো দেখতে হয়।

বীথিকা—ওসব কিচ্ছু দেখতে চাই না।

একথা শোনার পর বড়বৌদি বীথিকার মুখের দিকে তাকিয়ে একেবারে চুপ করেই গিয়েছিলেন। কে জানে, এই মেয়ের চোখের মধ্যে কোন পিপাসা লুকিয়ে রয়েছে! পৃথিবীর হাটে-বাজারে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না এমনই এক দুর্লভ রূপের পুরুষকে জীবনের সঙ্গী করতে না পারলে এই মেয়ের ঐ দুই বাঁকা ভুরুর কঠিন ভঙ্গি কখনো শান্ত হবে না। কিন্তু এত বড় স্বপ্ন পুষে লাভ কি? এমন রূপসী তুমি নও যে রূপেশ্বরেরা তোমার জন্য তপস্যায় বসে আছে। তোমার চেয়ে অনেক বেশী রূপসী পৃথিবীতে আছে, কলকাতার এই পাড়াতেই আছে, ঢের ঢের আছে।

বড়বৌদির নীরব অভিযোগটা যেন বড়বৌদির তাকাবার ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারে বীথিকা এবং তার জীবনের সবচেয়ে বড় দাবির উপর পরের মনের এই উপদ্রবের একটা হেস্তনেস্ত করে দেয় সেই মুহূর্তেই।—আমার স্বামী হবার মতো মানুষ খুঁজে নেব আমি। পাই ভাল, না পাই তাও ভাল। তোমরা আর খোঁজাখুঁজি করো না।

পরিমল রায়ের কল্পনাও ঠিক এমনটিই চেয়েছিল।

শুধু বড়লোকের একমাত্র ছেলে বলতে যে গুণ বোঝায়, সেই গুণ তিন বছর আগে পরিমল রায়েরও ছিল। বাপের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই গুণের গৌরবও শেষ হয়েছে। হাই স্কুলের মাত্র কয়েকটা ক্লাশ পর্যন্ত বিদ্যাটা এগিয়েছিল পরিমলের, তারপরেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে সব অনেক বছর আগের কথা। দু'বছর আগে পরিমল রায়ের বাপের-দেওয়া বাড়িটা যেদিন দেনার দায়ে নিলামে বিকিয়ে গেল, সেদিন পরিমলকে দেখতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল বন্ধুর দল। সেদিনও চাকরে তেল মাখিয়ে স্নান করিয়ে দিচ্ছিল পরিমলকে। কাজ করে হাত-পা'কে কষ্ট দিতে শেখেনি পরিমল। ও অভ্যাসটা পরিমলের বংশমর্যাদাতেই বাধে।

কিন্তু বন্ধুদের মেসে বন্ধুদেরই করুণার গলগ্রহ হয়ে একটি বছর পার করে দিতে পরিমল রায়ের বংশমর্যাদায় অবশ্য কিছুই বাধেনি।

বন্ধুরা অনুযোগ করত—এক বছর ধরে চেষ্টা করে একটা কাজ যোগার করতে পারলে না, এ কেমন কথা হে?

পরিমল বলে—চেষ্টা করতে জানি না ভাই। তা ছাড়া, যা তা একটা কাজ নিয়ে ফেললেই তো হয় না। প্রেস্টিজ বলেও তো একটা বস্তু আছে!

বন্ধুরা বিস্মিত হয়, সহ্যও করে এবং একদিন বিদ্রূপ করেই বলে, তুই কোনমতে একবার হলিউডে চলে যা।

—কি হবে গিয়ে?

—লুফে নেবে তোকে, ঐ রকম একটা চেহারা হলিউডে দেখতে পেলে কি আর রক্ষে আছে?

বন্ধুদের ঠাট্টা বুঝতে পারে পরিমল, কিন্তু এটাও বিশ্বাস করে যে, নেহাত মিথ্যা বলেনি বন্ধুরা। চেহারা আছে পরিমলের, এবং সে চেহারা তাকিয়ে দেখবার মতো। রূপই তো একটা গুণ, আর পরিমলের মুখের দিকে তাকালে মনে হবে শ্রেষ্ঠ গুণ! পরিমলের রূপের খুঁত অনেক খুঁজে বের করতে হয়। বন্ধুরা জানে, এবং পরিমলও এখনো ভুলে যায়নি, পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা পরিমলকে অ্যাপোলো'দা বলে ডাকে। চাঁপার কলির মতো নয়, চাঁপার কলির চেয়েও সুন্দর-গড়ন আঙুল যদি দেখতে হয়, তবে দেখতে হবে পরিমলের আঙুলকে। আঙুলের রূপের গুণে আংটিটাও কত সুন্দর দেখায়। পরিমল জানে, সে কত সুন্দর। এবং আশ্চর্য হয়, তার চেহারার উপযুক্ত মূল্য ও মর্যাদা দেবার মতো একটাও প্রাণ নেই এই পৃথিবীতে। এমন সম্পদ থাকতেও কি একটা কাজের চাকর হয়ে জীবন কাটাতে হবে? এই শ্যামল, বিধূভূষণ আর দেবব্রতের মতো?

পরিমল বলে—পাঁচ হাজার টাকা দাও, এখনি হলিউডে চলে যাচ্ছি।

বন্ধুরা বলে—হলিউড কি শুধু আমেরিকাতেই থাকে? এই কলকাতার পথে পথেই আছে। দোহাই তোমার, তুমি মেসের এই ঘর ছেড়ে পথে একটু বের হও দেখি।

পরিমল—তাতে কি লাভ হবে?

বন্ধুরা বলে—খুব হবে, একদিন না একদিন কোন হলিউডের চোখে পড়ে যাবে, এবং তারপরেই নির্ঘাত...।

পরিমল—তোমাদের রসিকতা ঠিক বুঝতে পারছি না।

বন্ধুরা তাদের রসিকতার রহস্য এইবার বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দেয়।—তারপর আর কি? হলিউডই খাওয়াবে, পরাবে, রাজার চেয়ে বেশি মজার হালে থাকবে।

গম্ভীর হয় পরিমল। বন্ধুরা রসিকতার ছলে যেন তার মনের সবচেয়ে বড় দাবির স্বপ্নটাকেই চেঁচিয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নোংরা করে দিচ্ছে। এ স্বপ্ন যে তার সত্তার মধ্যে মিশে রয়েছে। পৃথিবীর এক নারী পরিমলের এই রূপধন্য পৌরুষকে যেচে বরণ করে তারই ঘরে নিয়ে যাবে। আর কোন ভাবনা থাকবে না পরিমলের জীবনে। সব ভার তার, সেই প্রেমিকা নারীর। কাজের চাকর হয়ে থাকার বদলে রূপের দেবতা হয়ে থাকা সে-জীবনের গর্ব ও গৌরব ও পৌরুষ তার কল্পনার বুকে কান রেখে অনুভব করতে পারে পরিমল। কিন্তু যাক কল্পনার কথা বন্ধুদের রূঢ় ভাষায় আলোচনা থেকে দূরে রাখা আর গোপন রাখাই ভাল।

কিন্তু বন্ধুদের একটি অনুরোধ রক্ষা করেছিল পরিমল। মাঝে মাঝে মেসের ঘর থেকে বের হয়ে পথে এসে দাঁড়াত, তারপর যতটুকু হাঁটতে এবং যেখানে যেতে ভাল লাগত, তার বেশি ঘোরাফেরা না করে মেসে ফিরে আসত। এইভাবেই একদিন এবং অকস্মাৎ চোখে দেখার ছোট একটা ঘটনা শুধু ঘটে গেল। বীথিকা আর পরিমলের সাক্ষাৎ। সে ঘটনার একমাত্র সাক্ষী হলো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের শ্বেতপাথরের সিঁড়ি, এবং তার পরের ক'দিনের ইতিহাস মাত্র ওরা দুজনেই জানে। তারপরেই বিয়ে, যথারীতি বৈবাহিক রেজিস্ট্রারের খাতায় সই করে, সাক্ষী রেখে, আইন অনুসারে। এবং তারপরেই নীলকমলের তিনতলার ফ্ল্যাটের এই রঙিন ঘর।

বীথিকা রায় আর পরিমল রায়। রূপের আর কামনার জীবনকে সুন্দর করে আর অনন্ত করে রাখার এক অপার্থিব শিল্প যেন ওরা জানে। ধুলো কাঁটা আর সমস্যায় ভরা এই পৃথিবীর কোন কুঞ্জে চিরবসন্ত জেগে থাকে কিনা কে জানে, কিন্তু বীথিকা রায় আর পরিমল রায়ের হাসিতে নিঃশ্বাসে ও দৃষ্টিতে চিরবসন্তের আমোদ এসে বাসা বেঁধেছে। ওরা দুজনেই সত্যিই বিশ্বাস করে, ওদের জীবনের এই রঙ কখনো ফিকে হবে না, ফুরোবে না, ঝরে পড়বে না। দু'জনে প্রতিমুহূর্তে দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে আর মুগ্ধ হয়ে এ-জীবনকে এক খণ্ড হলিউড করে রাখবে।

গুলমোর শান্ত। লেকের জলে তারার ছায়া। চারিদিকের শব্দ প্রায় লুকিয়ে পড়েছে। ভদ্রলোক হঠাৎ যেন চমকে ওঠে, এবং পরমুহূর্তে মহিলার কাছ থেকে বেশ তফাতে সরে গিয়ে, মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে থাকে।

পাশের বাড়ির ছাদে আর সামনের বাড়ির বারান্দার উপর সতর্ক চক্ষুর ক্যামেরাগুলি বিব্রত হয়, বিস্মিত হয় এবং বিরক্ত হয়। এ আবার কোন দৃশ্য! আজ প্রায় এক বছরের মধ্যে কোন দিন কোন মুহূর্তও ঐ কিন্নর আর কিন্নরীকে তো এতটা তফাত হয়ে যেতে, আর ঐ ভঙ্গিতে স্তব্ধ হয়ে থাকতে কখনো দেখা যায়নি। নিতান্তই আকস্মিক, অভাবিত এবং বিসদৃশ। চোখের ক্যামেরাগুলি আশাভঙ্গের বেদনা নিয়েই ঘুমোতে চলে যায়।

বীথিকা বলে—ওরকম করে চমকে উঠলে কেন? ওভাবে বোবার মতো তাকিয়ে থেকেই বা কি

লাভ হচ্ছে? ছিঃ।

পরিমল—শুনতে ভাল লাগল না তোমার কথাগুলো।

বীথিকা—আমার কথাগুলো শুনতে ভাল লাগল না? আশ্চর্য!

পরিমল—আজ ওসব কথা নাই বা আলোচনা করলে। কাল ব'লো। কারণ আমি এখনি কি বলব, ঠিক ভেবে পাচ্ছি না।

বীথিকা—তুমি ভাববে কেন? তোমাকে ভাবতে বলেছেই বা কে? আমি শুধু জানতে চাইছি, এরকম কোন ডাক্তার তোমার জানা আছে কিনা?

এক টান দিয়ে গলার রঙিন টাইটার গেরো ফস্ করে খুলে ফেলে পরিমল। জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে।

বীথিকা—উত্তর দিচ্ছ না যে?

পরিমল—জানা আছে, এন্টালির প্রকাশ ডাক্তার এসব করেন বলে শুনেছি।

বীথিকা—তাহলে প্রকাশ ডাক্তারকেই কাল ডেকে নিয়ে এসো।

পরিমল—তার জন্য এখনি এত ব্যস্ত হয়ে উঠছ কেন? আর দু'একটা দিন ভাল করে ভেবে দেখ, তার পরেও যদি বোঝ যে...।

বীথিকা—ভেবে দেখবার আর কি আছে? যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পরিষ্কার হয়ে যাওয়াই ভাল।

আর একবার চমকে ওঠে পরিমল। হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে এবং মুখে হাসি টেনে নিয়ে বলে—গান গাইবার সময় তুমি হঠাৎ এ কোন্ প্রসঙ্গ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলে? এখন ওসব কথা থাক। নাও, এসরাজটা নিয়ে বসো।

এসরাজটা তুলে নিয়ে এসে বীথিকার কোলের উপরেই তুলে দেয় পরিমল। অন্যমনস্কের মতো এক হাতে এসরাজটাকে ধরে কোলের উপর থেকে তুলে নিয়ে পাশে রেখে দেয় বীথিকা। অপ্রস্তুত হয়ে আর ভীতভাবেই তাকিয়ে থাকে পরিমল। বীথিকার মুখ চোখ আর চিবুকের গড়নটাই যেন মুহূর্তের মধ্যে বদলে গিয়েছে। ঐ নিবিড় দুটি ভুরুর মধ্যে কেমন একটা কঠিনতা আগেও দেখেছে পরিমল, কিন্তু এখন দেখে মনে হয়, যেন ইস্পাতের দুটি ছোট ছোট বাঁকা ফলকের মতো কঠিন দুটি ভুরু। যেন জগৎ-ছাড়া এক সংকল্পের মেয়ে। আজ এক বছরের মধ্যে বীথিকাকে কোনদিন দেখে এরকম মনে হয়নি, দেখতে এরকমও লাগেনি।

পরিমল অনুনয়ের সুরে বলে—চুপ করে রইলে কেন বীথি? কথা বলো। তুমি জান, তুমি গম্ভীর হলে আমার কত খারাপ লাগতে পারে।

বীথিকা—তুমি কি চাও যে আমি ছয়-সাত মাসের ছুটি নিয়ে সুপারিন্টেডেন্টকে চটাই আর একটা প্রমোশন নষ্ট করি?

পরিমল—এ কি কখনো আমি চাইতে পারি?

বীথিকা—তুমি কি চাও যে, আমি এই বয়সেই শরীরের রক্ত খুইয়ে কতগুলো হাড় আর কাঠ হয়ে যাই?

পরিমল এগিয়ে এসে বীথিকার একটা হাত ধরে—বড় ভুল প্রশ্ন করছ বীথি। তোমার মুখ শুকনো হয়ে গেছে, এ দৃশ্য আমি স্বপ্নের মধ্যে দেখলেও বোধহয় সহ্য করতে পারব না।

বীথিকা—তুমি কি চাও যে, এরই মধ্যে আমাদের জীবনের সব ফূর্তি বন্ধ হয়ে যাক?

পরিমল—কখনো বন্ধ হতে দেব না। তুমি অনর্থক একটা আতঙ্ক কল্পনা করছ বীথি।

বীথিকা—তোমাকে ভালবেসেছি, একমাত্র তোমাকে নিয়েই চিরকাল বেঁচে থাকবার জন্য।

পরিমল—তোমার ভালবাসার তুলনা হয় না বীথি। তুমি আমাকে এত আপন ও এত নিশ্চিন্ত করেছ বলেই তো আমি নিজেকে নিয়ে গর্ব করি। পৃথিবীতে ক' জনের এমন স্ত্রী আছে দেখাক তো কেউ? তুমি তো আমার গর্ব।

বীথিকা—তুমিও তো আমার গর্ব। তবে আমার নিজস্ব গর্ব এই যে, তোমাকে সুখে রাখবার জন্য টাকা-পয়সার সব চিন্তা, সব ভাল আর সব দায় আমি মেয়েমানুষ হয়েও সব সহ্য করছি, আর চালিয়েও যাচ্ছি।

পরিমলের উজ্জ্বল চক্ষু হঠাৎ একটু নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে, যেন হঠাৎ একটা ধোঁয়া এসে লেগেছে। কুণ্ঠিতভাবে বলে—সেকথা এত স্পষ্ট করে কেন আর বলছ? বলতেই বা হবে কেন? একশোবার স্বীকার করি, তোমার তুলনা নেই।

বীথিকা—যাক, কথা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। মোট কথা হলো, এমন সুখের জীবনে যেন কোন ঝঞ্ঝাট না আসে। শুধু তুমি আর আমি, এর মধ্যে কোন ঝঞ্ঝাট আমি আসতে দেব না।

পরিমল—ঝঞ্ঝাট কেন আসবে। ঝঞ্ঝাটের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

আর্তনাদের মতোই শোনায় পরিমলের কণ্ঠস্বর। আবার উঠে গিয়ে একটু তফাতে বসে, তারপরেই পায়চারি করে, জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়, গুলমোরের মাথার দিকে নিষ্পলক চক্ষে তাকিয়ে থাকে।

হাত-ঘড়ির দিকে তাকায় পরিমল। খাবার সময় হয়েছে। জানালার কাছ থেকে সরে এসে এক হাতে কপাল টিপে ধরে আর মিররের দিকে তাকায়। তারপরেই বীথিকার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে—শুনছ?

—কি?

—তুমি খেয়ে নাও। আমার আজ আর কিছু খাওয়া উচিত হবে না। কি রকম একটা অস্বস্তি বোধ করছি।

—কিসের অস্বস্তি?

—মাথা ধরেছে, আর কেমন একটা বমি-বমি ভাব।

—তা হলে খেও না।

স্নানের ঘরে গিয়ে সাজ বদল করে আর ভিতরের বারান্দায় গিয়ে আলমারিতে রাখা হোটেলের খাবার খেয়ে, আবার রঙিন ঘরের ভিতরে ঢুকল বীথিকা।

জানালার কাছে একটা মোড়ার উপর স্থির হয়ে বসেছিল পরিমল, যেন নিঃশব্দে গুলমোরের কাছে একটু বাতাস প্রার্থনা করছে। কিন্তু গুলমোর বড় শান্ত।

দপ্ করে ঘরের আলোর রঙ বদলায়। সুইচ টিপেছে বীথিকা। ঘনঘোর মেঘে ঢাকা চাঁদের আলোর মতো অন্ধকার-মাখানো একটা থমথমে কালো রঙের আলো।

একটা বালিশ জড়িয়ে খাটের উপর এলিয়ে পড়েই বীথিকা বলে—তাহলে কথা রইল, তুমি কালই একবার এন্টালির ডাক্তার প্রকাশের খোঁজ নেবে।

—না, পারব না।

অত্যন্ত গম্ভীর ও উত্তপ্ত এক কণ্ঠের গর্জন। প্রত্যুত্তর দেয় পরিমল।

উঠে বসে বীথিকা।—কি বললে? আবার এত জোর গলা করে বললে? লজ্জা করে না ওভাবে ধমক দিয়ে কথা বলতে? তোমার ঐ ধমকের দাম কত?

উত্তর দেয় না পরিমল। শোনা যায়, পাশের ফ্ল্যাটের দেয়াল ঘড়িটা শুধু টিকটিক করে এই রাত্রির স্তব্ধতাকে বিদ্রূপ করছে।

বীথিকা বলে—তাহলে শুনে রাখ, আমিই প্রকাশ ডাক্তারের খোঁজ নেব।

কোন উত্তর দেয় না পরিমল। বীথিকাও আর কোন কথা বলে না। মোড়ার উপরেই চুপ করে বসে থাকে পরিমল, আর বীথিকা আবার বালিশ আঁকড়ে খাটের উপর পড়ে থাকে। বালিশটা অনেক রাতে ক্ষীণ কান্নার মতো শব্দ করে একবার। কিসের কান্না কে জানে।

সকাল বেলার খবরের কাগজ বলে, হলিউডে একটা অগ্নিকাণ্ড হয়ে গিয়েছে। নীলকমলের তিনতলার ফ্ল্যাটের এই রঙিন ঘরের ইতিহাসেও কি এক বছর পরে আজ হঠাৎ মাঝরাত্রি হতে না হতেই আগুন লেগে গেল? থমথমে কালো আলো, যেন বহু যত্নে সাজানো একটা সেট অঙ্গারমাখা হয়ে পড়ে রইল সারা রাত। সকাল হবার পর সেই কালো আলো নিভল।

রোদের ঝাঁজ বড় বেশি। পথের ধুলোর ঘূর্ণি ওড়ে মাঝে মাঝে। গুচ্ছ ভাঙা গুলমোর মাটিতে ঝরে পড়ে ঝুরঝুর করে। জানালা বন্ধ।

বীথিকা গিয়েছে অফিসে। পরিমল আছে ঘরে। ঘরের আবছায়ার মধ্যে বন্দী একটা ছায়া যেন ছটফট করে।

জীবনে এই প্রথম যেন নিজেকে দেখতে পেয়েছে পরিমল। এক নারীর প্রতিমুহূর্তের ইঙ্গিতের ক্রীতদাস, একটা চেহারা মাত্র সে, একটা ভাড়াখাটা পৌরুষ। রোজগেরে গৌরবে গরবিনী এক নারীর করুণার পোষ্য। এমন মানুষের ধমকের দাম কত? সত্যিই তো, কোন দাম নেই।

কিন্তু কি ভয়ানক বীথিকার কথাগুলি। একটা খুনের কথাও এরকম হেসে হেসে বলতে পারে মানুষ? জীবনের কল্পনাগুলি সত্যিই বোধহয় কতগুলি ফুলের স্তবক, কখনো কখনো সন্দেহই হয় না যে, ফুলের আড়ালে একটা সাপও লুকিয়ে থাকতে পারে। পরিমলের ঘুমন্ত হৃৎপিণ্ডে যেন হঠাৎ একটা সাপের ছোবল পড়েছে। এটাও এর আগে বুঝতে পারেনি পরিমল, তার এই চেহারার ভিতরে একটা হৃৎপিণ্ড আছে, আর সে হৃৎপিণ্ডের ভিতরে আবার একটা গর্ব ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ যেন একটা বিষের কামড় খেয়ে জ্বলে উঠেছে এই গর্ব। পরিমল সহ্য করতে পারছে না বীথিকার কথাগুলি।

গুণবতী ও শিক্ষিতা এক নারীর কাছে সে একটা সুন্দর ফটো মাত্র, স্বামী নয়। ফটোর ধমক গ্রাহ্য করবে কেন মানুষ? যে ফটো মানুষের স্বামী হতে পারে না, সে ফটো মানুষের বাপ হবে কেমন করে?

মাথার উপরে জোরে পাখা ঘোরে, কিন্তু কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরে পরিমলের। আবর্জনা, বীথিকার কাছে সেই আগন্তুক প্রাণটা শুধু একটা আবর্জনা ছাড়া আর কিছু নয়। পরিমল নামে মাত্র একটা চেহারার মানুষকে স্বীকার করে বীথিকা, তার মনুষ্যত্বকে স্বীকার করে না। নইলে

যে-মানুষের দুই বাহুর বন্ধনে আত্মহারা হয়ে যাবার জন্য বীথিকার চোখ দুটো লুব্ধ হয়ে জ্বলজ্বল করে, সেই মানুষের সৃষ্টির আত্মাটা বীথিকার কাছে একটা আবর্জনা হয়ে যায় কি করে? কি ভয়ানক ঘৃণায় শিউরে উঠেছে বীথিকা। পরিমল যেন তার দেহের শোণিত দূষিত করে দিয়েছে।

চোখ-মুখ ভাঙা-ভাঙা, হাত-পা আলগা আলগা, পরিত্যক্ত মন্দিরের এক জীর্ণ পাথুরে মূর্তির মতো চেয়ারের উপর সুস্থির হয়ে বসে থাকে পরিমল। নিদারুণ এক অপমানের বাজ পড়ে তার জীবনে বহুদিনের লালিত সেই রূপের গর্বটা এতদিনে যেন চূর্ণ হয়েছে।

সিগারেটের পর সিগারেট পোড়ে। ছাই উড়ে পড়ে রঙিন ঘরের মেঝেতে, আসবাবের গায়ে। রজনীগন্ধার বাসিডাঁটার মাথায় ফোটা কুঁড়ি নেতিয়ে পড়ে।

কিন্তু এ ঘরে আর একটা রাত্রিও থাকতে যে ভয় করে। আবার তো সেই একই অভিনয়ের পালা। সেই দুটি বিহ্বল নারীচক্ষুর দৃষ্টির ইঙ্গিতকে আর মত্ত দুটি ওষ্ঠের সঙ্কেতকে প্রতি মুহূর্তে সেবা করা। ভাবতে গিয়ে নিজের এই শরীরটার উপরেই ঘৃণা বোধ করে পরিমল। কিন্তু বীথি কি এই এক বছরের অভিনয়ের নিয়ম থেকে দূরে সরে থাকবার সুযোগ দেবে পরিমলকে? সেই পাউডার-ছিটানো একটা গলা আর স্নো-মাখানো একটা চিবুক পরিমলের মুখের উপর লুটিয়ে পড়ার জন্য কাছে এগিয়ে আসছে, কল্পনা করতে আজ শিউরে ওঠে পরিমলের অভিশপ্ত মন। দুঃসহ, কিন্তু মুখ সরিয়ে নিতে পারবে কি পরিমল? আর সরিয়ে নিলে বীথিই বা কি সেই অপমান সহ্য করবে?

ভাঙা-ভাঙা চোখ-মুখ আর আলগা আলগা হাত-পাগুলি যেন হঠাৎ জোড়া লেগে শক্ত হয়ে ওঠে। এক লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় পরিমল। এক মুহূর্ত কি যেন ভাবে। একটা চিঠি লিখে রেখে যেতে হবে কি? কি দরকার? একটা ছায়া চলে যাবার সময় তো কথা বলে না, চিঠিও লিখে রেখে যায় না। এখনি এভাবেই এই রঙিন ঘরের কাছে কোন কথার কৈফিয়তও না রেখে, শুধু দারোয়ানের কাছে চাবি রেখে দিয়ে সরে যাওয়াই ভাল।

দরজা খুলে বের হয় পরিমল, দরজার বাইরের কড়ায় তালা লাগিয়ে চাবিটি হাতে নিয়ে দু'তিন ধাপ সিঁড়ি নেমেও আসে পরিমল। কিন্তু কি অদ্ভুত দুর্বলতা। বুঝতে পারে, পা দুটো কি রকম ভারি হয়ে উঠেছে, চোখ দুটোও ভেজা-ভেজা লাগে। কিসের যেন একটা ইচ্ছা, যেন ঘুমন্ত হৃৎপিণ্ডের ভিতর থেকেই একটা অন্ধ মমতার অনুরোধ তার হাত দুটো ধরে ঘরের ভিতর ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। চলে গেলে আর কি হলো? অন্ধকারে ঢাকা একটা অঙ্কুর, সূর্যের আলো দেখবার আশায় যার প্রাণ তৈরি হয়ে উঠেছে, তাকে বাঁচাবে কে? এভাবে রাগ করে চলে গেলে সেই শিশু প্রাণটাও যে আবর্জনা হয়ে যাবে।

আবার তালা খুলে ঘরের ভিতরে ঢুকেই পরিমল অসহায়ের মতো ছটফট করতে থাকে। কিন্তু থেকেই বা কি হবে। উপায় কি? এন্টালীর প্রকাশ ডাক্তারকে ঐ সিঁড়ির উপর থেকেই গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেবার মত কই তার? সারাজীবন চাকরে তেল মাখিয়ে আর স্নান করিয়ে এই শরীরটাতে যে পক্ষাঘাত ধরিয়ে দিয়েছে! আজ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে পরিমল, এই দু'হাতে দু'মুঠো সোনার মোহর নিয়ে বীথির সামনে দাঁড়ালে, বীথির মত মেয়েমানুষ তার ধমকের দাম বুঝত নিশ্চয়। শুধু ধমকের দাম কেন? বীথি তার নিজের দেহের ভিতরে ঘুমন্ত সেই অঙ্কুরের দামটাও বুঝত। ধমক দেবারই দরকার হতো না।

কাজ? কাজ কাকে বলে তাই জানে না পরিমল। চেষ্টা কাকে বলে তাও জানে না। কাজ দেবেই বা কে? কাজ করার যোগ্যতাই বা কোথায়?

উপায়? চিন্তা করতে করতে পরিমলের চেহারাটা কি রকমের যেন হয়ে যায়। যেন একটা চোরের ছায়া, ধূর্ত অথচ অত্যন্ত কর্মঠ ও কঠোর। অকর্মণ্য হাত দুটোর পেশীগুলি যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যেন একটা সিঁদকাটা পরিকল্পনার দিকে পরিমলের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে তাকিয়ে আছে। একটা অকাজের পরিকল্পনা। বুদ্ধি নয়, ছোট একটা দুর্বুদ্ধি। সামান্য একটু অকাজের কৌশলে যদি মস্ত একটা সুকাজ হয়ে যায়, হোক না। বীথিকা বাঁচবে, বীথিকার ছেলে বাঁচবে, কাঁচা খুনের রঙ লাগবে না এই রঙিন ঘরে।

কিন্তু তারপর? তার পরের কথা আর চিন্তা করতে পারে না পরিমল। বুকের পাঁজরগুলি হঠাৎ একবার দুর দুর করে কেঁপে ওঠে। আর বেশি দেরি করলে এন্টালির প্রকাশ ডাক্তারের পায়ের শব্দ সিঁড়ি বেয়ে হুড়মুড় করে উপরে উঠে আসবে।

শুধু গেঞ্জি আর পায়জামা, একটা জামাও গায়ে দিতে ভুলে গেল পরিমল। আলনা থেকে একটা আদ্দির চাদর কাঁধে ফেলে, যেন একটা জ্বর-বিকারের জ্বালায় ঘর থেকে বের হয়ে, দরজার তালা বন্ধ করে, চৈতী দুপুরের তপ্ত পথের ধুলোর মধ্যে এসে দাঁড়ালো পরিমল।

এ ফ্ল্যাটে আর ও ফ্ল্যাটের জানালায় কতকগুলি বিস্মিত চক্ষু উঁকিঝুঁকি দেয়। তিনতলার ফ্ল্যাটের কিন্নরকে এমন অসময়ে পথে বের হতে এই প্রথম দেখা গেল। বিস্ময়ের ব্যাপার বৈকি। আরও দুর্বোধ্য বিস্ময় হলো ঐ সাজ। গেঞ্জির উপর চাদর জড়িয়ে, অদ্ভুত চেহারা করে, যেন একটা ছেলেধরার মতো চোখ করে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে লোকটা কোথায় চলে গেল।

লেকের দিকে কোকিল ডাকে, চাঁদ ওঠে আকাশের পূবে, ডায়মণ্ডহারবারের ট্রেন সিটি বাজিয়ে দূরে চলে যায়। বেরিয়ে ফেরে বীথিকা রায় ও পরিমল রায়।

আজ রবিবার। এবং রবিবার ছাড়া আর কোনদিন দুজনের একসঙ্গে বেড়াবার উপায় নেই। কারণ রঙিন ঘরের জীবনটা ছন্দ বদল করেছে।

একটা কাজ পেয়েছে পরিমল। বিখ্যাত এক ইংরাজ কোম্পানীর নতুন কারখানা হয়েছে বজবজের কাছে। এই কারখানার ওয়েলফেয়ার অফিসার হয়েছে পরিমল। পরিমলেরই ছেলেবেলার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলো কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সুতরাং কাজটা পেতে খুব বেশি অসুবিধা হয়নি পরিমলের। বন্ধুর সুপারিশে খুব সহজেই কাজ হয়ে গিয়েছে। এখন মাইনে হলো ছ'শো দশ টাকা। বছর খানেক পরে কোম্পানীর খরচে মাস দুয়েকের জন্য বিলেতে গিয়ে একটা ট্রেনিং নিয়ে ফিরতে হবে, তারপর মাইনে হবে আটশো পঁচিশ।

বীথিকা অফিস যায় সকাল দশটায়, পরিমল বের হয় সকাল এগারোটায়। ফিরে আসতে বেশ রাত হয় পরিমলের। কাছাকাছি তো নয় বজবজ, ট্রেনে যেতে হয়, ট্রেনে ফিরতে হয়। সন্ধ্যাবেলাগুলি তাই নিতান্ত উৎসবশূন্য, একেবারেই শূন্য মনে হয় বীথির, একমাত্র রবিবারের সন্ধ্যা ছাড়া।

পরিমলের সার্ভিসের মাত্র দশটি দিন পার হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র দুটি রবিবারের সন্ধ্যাকে ওরা দুজনে একসঙ্গে ধরতে পেরেছে। আজ হলো দ্বিতীয় রবিবার।

এই দশটি দিনের আগের দুটি রাত্রির কথা কোন প্রসঙ্গে আর তুলতেই চায় না বীথি। সেই

প্রথম রাত্রিটা, জানালার ধারে মোড়ার উপর বসে পরিমল, আর খাটের উপর বালিশ আঁকড়ে বীথি যে রাতটা ভোর করে দিল। তারপরেই সেই দ্বিতীয় রাত্রিটা। দু'জনে ঘরের দুদিকে দু'চেয়ারে বসেই রাত কাটিয়ে দিল।

অফিস থেকে ফিরে এসে বীথিকা দেখছিল, গেঞ্জির উপর চাদর জড়িয়ে আর চেয়ারের উপর শক্ত একটা চেহারার মতো বসে গুলমোরের শোভা দেখছে পরিমল। দেখামাত্র সেই যে রাগ করেছিল বীথি, সেই রাগ সারারাত বীথিকে একেবারে বোবা করে একটা চেয়ারের উপর বসিয়ে রেখে দিল। পরিমলের দিকে একবার তাকিয়েই অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল বীথি। মূর্তিমান একটা অকর্মণ্যতা যেন শুধু রূপের বড়াই নিয়ে বীথিকার ভালবাসার জগৎটাকে অশ্রদ্ধা করার জন্য বসে রয়েছে। কে ভেবেছিল, ঐ চওড়া বুকের ভিতর এত অকৃতজ্ঞতা লুকিয়ে থাকতে পারে? বীথিকার এই বয়সের সব আনন্দ অকালে ডুবিয়ে দেবার এই অভিসন্ধিই যদি ছিল লোকটার, তবে কেন...।

একটা অভিমান জ্বলে উঠেছিল বীথিকার বুকের ভিতর। তবে কেন ভালবাসার এত ভান করল লোকটা এই এক বছর ধরে? বিশ্বাস করে বীথিকা, এ মানুষ অন্তরে অন্তরে ভালবাসে তার একটা ছা-পোষা শখকে, বীথিকাকে নয়, বীথিকা ওর কাছে গৃহস্থালির একটা সামগ্রী মাত্র।

কিন্তু এতই যদি শখ ছিল, তবে...। তবে কি? ভাবতে পারে না বীথি, একেবারে পিছনের দেয়ালের দিকেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে রুমাল দিয়ে চোখ মোছে। সহ্য হয় না এই বোবা জ্বালা!

সকাল হয় বেশ একটু মেঘলা হয়েই। কতগুলি বৃষ্টির ফোঁটা গুলমোরের মাথা ভিজিয়ে দেয়। আর দরজার কড়া বেজে ওঠে।

চেয়ার থেকে উঠে দরজা খোলে পরিমল। কোন এক অফিসের পিয়ন সেলাম করে মস্ত বড় একটা লেফাফা পরিমলের হাতে তুলে দেয়। পিয়নবুক সই করে পরিমল। পিয়ন সেলাম করে চলে যায়।

লেফাফাটাকে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে ব্যস্তভাবে স্নানের ঘরে চলে যায় পরিমল। যখন ফিরে আবার ঘরে ঢোকে তখন বীথিকা ছেঁড়া লেফাফা আর একটা চিঠি হাতে নিয়ে পরিমলের দিকে তাকিয়ে প্রায় চিৎকার করে ওঠে—এ কি? এ আবার কি কাণ্ড করেছ?

পরিমল অতি মৃদু অথচ গম্ভীর স্বরে বলে—ও কিছু নয়, রেখে দাও।

—কোথাও বের হবে নাকি?

—হ্যাঁ।

—কোথায়?

হেসে ফেলে পরিমল। —আগে প্রতিজ্ঞা কর, আর কোনদিন কথা বন্ধ করবে না, তবে বলব।

বীথিকাও হেসে ফেলে। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে পরিমলের কাছে দাঁড়ায়। পরিমলের হাতের উপর হাত রেখে বলে—সত্যিই প্রতিজ্ঞা করছি, কখনো কথা বন্ধ করব না। তবে তুমি অমন করে ধমক দিও না লক্ষ্মীটি।

পরিমল তার কাজের চেষ্টার কাহিনী বর্ণনা করে শুনিয়েছিল। শোনাতে বেশি সময় লাগেনি। এই রবিবারের দশ দিন আগের সেই মেঘলা সকালের এক পশলা বৃষ্টি আগের দুটি কালরাত্রির সব অভিযোগের জ্বালা ধুয়ে দিয়েছিল।

নীলকমল ভবনের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সেই দু'রাত্রির ঘটনাগুলিকে এখন একটা স্বপ্নে দেখা আতঙ্কের মতো নিতান্ত অসার বলেই মনে হয় বীথির। শুধু সন্দেহ হয়, মাথাটা দুটো দিন খারাপই হয়ে গিয়েছিল বোধহয়। নইলে...ভাবতে গিয়ে লজ্জা পায় বীথি।

দপ্ করে আলো জ্বলে ওঠে তিনতলার ফ্ল্যাটের ঘরে। সাদা আলো। ঘরের ভিতরে কিছুক্ষণ মাত্র দাঁড়িয়ে থেকে তারপরেই দু'জনে আলোর বাইরে চলে যায়। ভিতরের বারান্দার অন্ধকারের মধ্যেই রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গল্প করে। পাশের বাড়ির ছাদ আর সামনের বাড়ির বারান্দা রঙিন ঘরের কিন্নর ও কিন্নরীকে দেখতে না পেয়ে আবার বিস্মিত হয়।

বীথিকা বলে—তুমি আজকাল যেন কেমন হয়ে যাও মাঝে মাঝে। ডাকলেও শুনতে পাও না। এত কি ভাবো বলো তো?

চমকে ওঠে পরিমল। তার হাত দুর্বল সিঁদেল-চোরের হাতের মতো রেলিং-এর উপর আস্তে আস্তে কেঁপে কেঁপে ঘষা খায়, রেলিংটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে পারে না। বুকের ভিতর সব নিঃশ্বাস যেন মরতে বসেছে, শিরদাঁড়াটা থরথর করে কেঁপে ওঠে।

বীথিকা আবার বলে—দেখ কাণ্ড, আবার সেই রকম চুপ করে কি যেন ভাবতে আরম্ভ করেছ!

মুহূর্তের মধ্যে যেন একটা নিঃশ্বাসের জোরে নিজেকে শক্ত করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে পরিমল—কি বলছ?

—এত গম্ভীর হয়ে কি ভাবছিলে বলো।

হঠাৎ দু'হাতে বীথির মাথা জড়িয়ে ধরে বুকের উপর টেনে নেয় পরিমল। বীথির কপালের উপর মুখ ছুঁইয়ে ব্যাকুলভাবে বলে—একটা কথা আমাকে দিতে হবে বীথি। এখনি শুনব। একেবারে স্পষ্ট করে শুনব।

—বলো, কি শুনতে চাও?

—এন্টালির ডাক্তার-ফাক্তারকে কোনদিন ডাকা হবে না।

পরিমলের বুকের উপর মাথা গুঁজে নিয়ে নীরব হয়েই রইল বীথি, অনেকক্ষণ। পরিমলের কামিজের বুক আর আস্তিন ভিজিয়ে দিল বীথির দুই চোখ। টিপটিপ করছে পরিমলের বুকের ভিতর একটা শব্দ। সে শব্দের অর্থ যেন এতদিনে বুঝতে পেরেছে বীথি। একটা অন্ধ স্নেহের উদ্বেগ যেন টিপটিপ করছে এই বুকের ভিতর। এতদিনে যেন তার এই পাথুরে দুল-পরানো কান দুটোতে এ শব্দের অর্থ বুঝবার মতো শক্তিই ছিল না।

—বীথি?

—বলো।

—বলো, ডাক্তারের দরকার নেই।

—না নেই। তুমি যখন ডাক্তার আনতে চাও না, তখন আমিও চাই না।

আর একটি রবিবার। বীথিকা আবার অভিযোগ করে বসে—তবুও তুমি কি যে ভাবো, বুঝতে পারি না।

মিথ্যা বলেনি বীথিকা। পরিমলের মনের ভিতর একটা প্রচণ্ড অভিপ্রায়ের পরিকল্পনা যেন লুকিয়ে রয়েছে; একটা প্রাণের অঙ্কুরকে সর্ব আপদ থেকে মুক্ত করার পরিকল্পনা। কথা দিয়েছে থি, কিন্তু সে কথায় নিশ্চিন্ত হতে পারেনি পরিমল। নিজের ইচ্ছাকে নয়, পরিমলেরই একটা

ইচ্ছাকে সম্মান দেবার জন্য দশ মাসের যাতনা স্বীকার করবে বীথি। এই তো তার প্রতিশ্রুতি। এই প্রতিশ্রুতিতে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

চুপ করে মাঝে মাঝে অন্যমনস্কের মতো পরিমল যা ভাবে, পরিমলই জানে যে, সে ভাবনা চুপ করে সহ্য করা কত কঠিন। মাটির মূর্তি তো নয়, জীবন্ত এক নারীর মূর্তিকে কি চক্ষুদান করা যায়, আর সে চোখে কি আবার স্বপ্ন দান করতে পারা যায়? তাই দুশ্চিন্তা না করে পারে না পরিমল, নিজেকে প্রশ্ন করে চেতনার চোখ কবে পাবে বীথিকা?

পরিমল হেসে হেসে বলে—আজকাল তোমার চোখমুখের চেহারা কি রকম হয়ে গিয়েছে, খোঁজ রাখ কিছু?

আতঙ্কিত হয় বীথি—তার মানে?

পরিমল—জীবনে কোনদিন বোধহয় তুমি আজকের মতো এত সুন্দর ছিলে না।

বীথি হেসে ফেলে—আমার মুখের গুণে নয়, তোমার চোখের গুণে এই মুখকে আজ এত বেশি সুন্দর দেখছ।

পরিমল—আমার চোখের গুণে নয়, তোমার কোলে যে আসছে, তার গুণেই তুমি এত সুন্দর হয়ে উঠেছ।

মাথা হেঁট করে বীথি, জীবনে বোধহয় এই প্রথম একটা কথার কাছে মাথা হেঁট করল। প্রস্তুত ছিল না এমন কথা শোনবার জন্য। ভাবতেও পারেনি বীথি, শোনা মাত্র মাথাটা এভাবে ঝুঁকে পড়বে।

বোঝা যায় না, ঘরের মেঝের দিকে না তার নিজেরই কোলের দিকে তাকিয়ে আছে বীথি। যেন নিশ্চল ও নিস্পন্দ এক অভিবাদনের ভঙ্গি আঁকা রয়েছে এ ঘরের বাতাসে। যেন ছোট হাত-পায়ের খেলায় ভরা একটা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে বীথিকার বুকের সব নিঃশ্বাস আর চোখের সব বিস্ময়।

পরিমল ডাকে—বীথি!

বীথি মুখ তুলে তাকায়। উঠে গিয়ে পরিমলের হাত চেপে ধরে—তুমি আজ আমাকে একটা কথা দাও।

—বলো, কি কথা চাও।

—তুমি আর কখনো ওরকম চুপ করে কিচ্ছু ভাববে না।

এক মহান সাফল্যের হাসি হো হো করে হেসে পরিমল বলে—আর ওরকম করে নিশ্চয় ভাবব না। এবার আমি নিশ্চিন্ত।

সফল হয়েছে পরিমলের প্রচণ্ড অভিপ্রায়ের পরিকল্পনা। বীথিকার চোখ স্বপ্নদান করা হয়ে গিয়েছে। ভাবনার ভার নেমে গিয়েছে পরিমলের।

এই রবিবারের সন্ধ্যাটা রঙিন ঘরের জীবনে যেন একেবারে নতুন একটা জ্যোৎস্না ঢেকে দিয়ে চলে গেল। তারপর থেকে প্রতিদিনই একটা না একটা নতুন পরিণাম দেখা দিয়ে অপার্থিব এই রঙিন ঘরটাকে পার্থিব করে তুলতে হবে।

হোটেলের খাবার আনা বন্ধ হলো একদিন। বীথি বলে—তুমি যখন সন্ধ্যাবেলাটা থাকই না, আর বেড়াতে যাওয়াও হয় না, তখন রেঁধে রেঁধেই সন্ধ্যাটা কাটিয়ে দেব। আর সকালবেলা?

সেটাও এমন কি সমস্যা! আর একটা স্টোভ থাকলেই খুব তাড়াতাড়ি সকালের রান্নাও সেরে ফেলতে পারব।

আর একদিন, একটু বেশি রাত করে পরিমল ঘরে ফিরতেই বীথিকা বলে—তোমাকে বলি-বলি করেও একটা কথা এখনো বলতে পারিনি। ভয় হয়, বললে আবার কি ভেবে বসবে।

—কি কথা?

—তোমার চেহারা এই ক'টা দিনের মধ্যে বড় বেশি খারাপ হয়ে গিয়েছে। এতটা শুকিয়ে গেলে কেন?

একটু উদ্বিগ্নভাবেই আরও প্রশ্ন করতে থাকে বীথি—খাটুনিও কি খুব বেশী? অফিসের টিফিন কি রকমের? খেতে পার তো?

পরিমল হাসে—টিফিনটা মন্দ নয়।

ভিতর বারান্দায় টেবিলের উপর খাবারের প্লেট আর বাটি সাজাতে সাজাতে বীথিকা বলে—আর একটা কথা। আমি একটা লম্বা ছুটির জন্য দরখাস্ত করেই দেব ভেবেছি। তুমি কি বলো?

—এখনই ছুটি না নিলেও চলতে পারে। আর কিছুদিন পরে দরখাস্ত করো।

খাওয়ার পাট শেষ হবার পর বীথি আবার প্রশ্ন করে—হ্যাঁ, আর একটা কথা। বলে হঠাৎ চুপ করে যায় বীথি। তখনি বলতে পারে না, কথাটা কি। মুখ ঘুরিয়ে যেন লাজুক হাসি লুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করে বীথি।

পরিমল—বলো, কি বলছিলে?

বীথি—এই ফ্ল্যাটে আর বেশি দিন থাকা উচিত হবে কি? এই একটুখানি একটা ঘর, আর এই ফালির মতো বারান্দা, এর মধ্যে কি করে যে জায়গা হবে, মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।

পরিমল—এ ঘরে থাকা আর চলবে না বলেই বুঝতে পারছি। অন্য জায়গা খুঁজতে হবে।

বীথিকার চিন্তাগুলিই যেন একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল। ফস্ করে বলে ফেলে বীথি—ছোট একটা দোলনা দুলবে, এমন একটু জায়গাও এখানে নেই।

পরিমল মুখ টিপে হাসে—কি বললে?

বীথি অপ্রস্তুত হয়েও বলে—বলেছি, বেশ করেছি।

এঁটো প্লেট ও বাটিগুলিকে একটা থালার উপর তুলে নিয়ে জলের ট্যাপের নীচে রাখে বীথি। হাত ধুতে ধুতে বলে—এ ছাই চাকরিই ছেড়ে দেব। আর ভাল লাগে না। তোমার যখন একটা ভাল কাজ হয়েই গিয়েছে, তখন আর কেন...।

হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকায় পরিমল। যেন সিঁদেল চোরের একটা ছায়ার বড় বড় দুটো চোখ পালিয়ে যাবার পথ ঠাহর করে রাখছে।

বৈশাখী সন্ধ্যা ঘনায় লেকের জলের আশেপাশে, বড় বড় নারকেলের মাথায়, আর আকাশে। পোড়া বাতাস একটু একটু ঠাণ্ডা নিশ্বাস ছাড়ে। সারা দুপুর আর বিকালের মূর্ছা থেকে মানুষের কলরবগুলি এতক্ষণে আবার জেগে উঠেছে। আর এক রবিবার।

বেড়িয়ে ফেরে বীথিকা রায় ও পরিমল রায়। এ ফ্ল্যাট আর ও ফ্ল্যাটের জানালাগুলি, সামনের বাড়ির বারান্দা আর পাশের বাড়ির ছাদ দেখে অবাক হয়ে যায়, কিন্নর ও কিন্নরী আর হাত

জড়াজড়ি করে বেড়ায় না, ফটকের আলোর কাছে দাঁড়িয়ে সেই লজ্জার মাথা-খাওয়া লীলাকলাও আর দেখা যায় না। দেখা যায়, কিন্নরীর হাতেই একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। দপ দপ করে ঘরের রঙিন আলোও আজকাল আর খেয়ালের আনন্দে ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদল করে না। কি আশ্চর্য, আজকাল ফ্ল্যাটের ভিতর বারান্দা থেকে ধোঁয়া উড়তেও দেখা যায়। রান্নাবান্না করে না কি কিন্নর আর কিন্নরী?

নীলকমলের সিঁড়ি ধরে এই বৈশাখী সন্ধ্যার প্রথম অন্ধকারের মতোই শান্ত দুটি মূর্তি গল্প করতে করতে উপরে ওঠে। দুই চোখ ভরা এক অদ্ভুত হাসির ঝলক তুলে বীথি পরিমলের দিকে তাকায়।—তোমার প্রথন মাসের মাইনেটা প্রথম কিসে খরচ করবে বলো?

হঠাৎ পা দুটো যেন টলে ওঠে পরিমলের। দেয়াল ধরবার চেষ্টা করে। নিঃশ্বাস বিচলিত হয়। আস্তে আস্তে হেসে পরিমল উত্তর দেয়—তুমি যাতে যেভাবে খরচ করতে চাও, তাই করব।

ঘরের ভিতরে ঢুকে কাশ্মীরী সুরাহির ভিতরে রজনীগন্ধার গুচ্ছ সাজিয়ে রাখতে রাখতে বীথি বলে—একটা কথা।

পরিমল—বলো।

বীথি—চাকরিটা ছেড়েই দেব ঠিক করেছি।

কথা বলে না পরিমল। আয়নার দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে যেন তার চোখেরই একটা ভীরুতাকে জোর করে লুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করে।

বীথি বলে—মন লাগিয়ে অফিসের কাজ আর করতে পারছি না, কাজে ভুলও হচ্ছে, সুপারিন্টেডেন্ট ধমক-ধামকও দিচ্ছেন।

কোন মন্তব্য করে না, উত্তর দেয় না পরিমল।

বীথি বলে—শরীরটাও কেমন হাঁসফাঁস করে। এখন থেকেই সাবধান না হলে ভুল হবে। ...না, আর অফিস যাওয়াই সম্ভব হবে না।

একটা বইয়ের ভিতর থেকে টাইপ-করা একটা চিঠি বের করে বীথি। পরিমলের কাছে এসে হাসতে হাসতে বলে—যে কথাটা তোমাকে এখনো বলিনি। আর অফিসে যাব না, চাকরির ইতি করে দিলাম, কালকেই বাই-পোস্ট অফিসে পাঠিয়ে দেব এই চিঠি।

আতঙ্কিতের মতো দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত করে হঠাৎ চিঠিসুদ্ধ বীথির হাত চেপে ধরে পরিমল।

বীথি বিস্মিত হয়—তুমি আপত্তি করছ?

পরিমল—হ্যাঁ।

যেন একটু অভিমান মেশানো ক্ষোভের সুরে বীথি বলে—কেন? তুমি থাকতে আমার আবার চাকরি করবার দরকার কি?

—আমি নেই, আমি নেই, আমার কথা ছেড়ে দাও। কিন্তু তুমি ভুল করো না বীথি।

বলতে বলতে একেবারে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় পরিমল। পাগলের মতো দুটো চোখ নিয়ে সিঁড়ির দিকে একবার তাকায়। যেন এই মুহূর্তে দরজার এই চৌকাঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করার জন্য তৈরি হয়েছে একটা বিকারের রোগী।

সন্ত্রস্তের মতো তাকিয়ে বীথি বলে—এ কি? কি বলছ তুমি? কিসের ভুল?

পরিমল—আমি ভুল, আমার চাকরি ভুল। ঐ বজবজের কারখানা, ঐ চাকরির চিঠি, ঐ

পিয়ন আর পিয়নবুক, ঐ ছ'শো দশ টাকা মাইনে, সবই ভুল।

চিৎকার করে ওঠে বীথি—তবে ওগুলো কি?

পরিমল—আমার জোচ্চুরি।

বীথি—এ শয়তানি কেন করলে?

পরিমল—শয়তানের ছেলেকে প্রকাশ ডাক্তারের বিষ থেকে বাঁচাবার জন্য। বুঝতে পেরেছিলাম, ছ'শো দশ টাকার অনুরোধ তুমি না মেনে পারবে না।

বীথিরই দু'চোখে বিষের ধোঁয়া জ্বলতে থাকে।—তুমি মুখ্খু, কালই তোমারই চোখের সামনে প্রকাশ ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসব, তারপর...।

যাত্রা-নাটকের দানবের ভঙ্গিতে হো-হো করে হেসে ওঠে পরিমল—পারবে না বীথি, কখ্খনো পারবে না। সে সাধ্যি এখন আর তোমার নেই।

খাটের উপর লুটিয়ে পড়ে বীথি। বালিশে মুখ গুঁজে দিয়ে ছটফট করতে থাকে। মিথ্যে বলেনি শয়তান। তার সারা দেহের শোণিত যে আর কয়েকমাস পরেই মধুর এক আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় দিন গুনছে। তার সারাক্ষণের ভাবনাগুলি যে এরই মধ্যে পীযূষময় হয়ে উঠেছে, অনাগত এক তৃষ্ণার্তকে কোলের উপর তুলে নেবার আশায়।

গুলমোরের মাথা দুলিয়ে দিয়ে বৈশাখী সন্ধ্যার একটা ঝড়ো বাতাস ঘরের ভিতর ঢোকে। হঠাৎই শান্ত হয়ে যায় বীথি। কি কথা ভাবতে গিয়ে মনের রাগগুলি হঠাৎ যেন কোথায় পালিয়ে গিয়েছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে অতি সুন্দর চেহারা আর অমন অকর্মণ্য জীবনের অভিশাপ নিয়ে যে লোকটা, তাকে ঘৃণা করতে গিয়ে কেমন একটা মমতাও এসে পড়ে। জোচ্চুরি করেছে লোকটা, কিন্তু কি করুণ জোচ্চুরি! বীথিকে অ-মাতা হবার কলঙ্ক থেকে বাঁচাবার জন্যই জোচ্চুরি করেছে ঐ লোকটার বুকের ভিতর লুকানো একটা স্নেহান্ধ শখ।

কিন্তু কত ধূর্ত একটা জোচ্চুরি। বীথিকার চোখের দৃষ্টি আবার হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে দুঃসহ একটা লজ্জার ভিতর ছটফট করতে থাকে। জোচ্চুরিটা কত সহজে ধরা পড়িয়ে দিয়েছে বীথিকে। মানুষের স্ত্রী নয় বীথি, ছ'শো দশ টাকার স্ত্রী; হৃদয়ের অনুরোধে নয়, টাকার অনুরোধে আর টাকার ধমকে শান্ত হয় যারা।

কিন্তু ঐ লোকটা যে টাকাও নয়, একেবারে ভুয়ো, ধূর্ত একটা টাকার গল্প মাত্র। লোকটাকে কি আর এ জীবনে শ্রদ্ধা করতে পারা যাবে? আবার একটা যন্ত্রণা করে ওঠে মাথার ভিতরে। দুর্ভাগ্যটা যেন ক্ষতের মতো মনের ভিতরে জ্বলতে থাকে। স্বামী থেকেও তার স্বামী নেই। আর লোকটারও কি দুর্ভাগ্য। স্ত্রী থেকেও স্ত্রী নেই। ঐ অকেজো জীবনের একটা মূর্তি, কোনদিন নিজের দিকে তাকিয়ে নিজের দুর্ভাগ্যটাকে চিনতে শিখবে না, সম্মান চাইবে না; পাবেও না, শুধু পুরুষের একটা ফটোর মতো এই দরজার চৌকাঠে চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকবে, তাড়িয়ে দেওয়া যাবে না, সহ্য করাও যাবে না, এ অভিশাপ কতকাল সহ্য করবে বীথিকা?

বালিশটাকে একটা ঠেলা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়ে, খাটের উপর বসে বীথিকা। পরিমলের দিকে তাকাতেই আবার চোখ জ্বলে ওঠে—তোমার লজ্জা করছে না?

—করছে বৈকি।

—তবে আর ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে থাকছো কেমন করে?

—যাবার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।

—কি বললে?

—শুধু একটি কথা বলে যাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

—কি কথা?

—ছেলেকে বেনামী করে দিও না।

কটমট করে তাকায় বীথি—তার মানে?

পরিমল—তার আগেই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আমার খোঁজ করো, আমিই এসে ছেলেকে নিয়ে যাব।

চমকে ওঠে বীথি। পরিমলের কথাগুলি শুধু নয়, গলার স্বরটাও অদ্ভুত। শান্ত অথচ কঠিন এক কণ্ঠের ভাষা। মনে হয় ঐ সুন্দর চেহারাটা নিজের গর্বে শেষবারের মতো কতগুলি সুন্দর কথার ছলনা করে রেখে দিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কোথায়? ঐ রূপের চেহারা কি নতুন করে কোন ঠাঁই পেয়ে গেল? সন্দেহ হয় বীথির। কি দুঃসহ এই সন্দেহ!

খাটের উপর থেকে নেমে, আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে পরিমলের চোখের সামনেই শক্ত হয়ে দাঁড়ায় বীথিকা।—চাকরিটা তো ভুয়ো। তবে রোজ রোজ কোথায় যাও, আর কেনই বা যাও?

উত্তর দেয় না পরিমল, বাইরের সিঁড়ির দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বীথিকার মুখের দিকে যেন আর তাকাতে চায় না পরিমল।

বীথিকা বলে—জায়গাটার নামটা বলতে দোষ কি?

উত্তর দেয় না পরিমল। নিঃশব্দে যেন এই এক বছরের রঙিন বন্ধন তুচ্ছ করে চলে যাবার জন্য একটা মুক্তিপথের দিকে তাকিয়ে আছে পরিমলের বুকের ভিতরের একটা প্রতিজ্ঞা।

বীথিকা বলে—সে জায়গাটা বুঝি আমার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর?

মুখ ফিরিয়ে বীথিকার দিকে তাকায় পরিমল।—সে জায়গাটা হলো একটা দোকান।

—দোকান? দোকানে গিয়ে জায়গা নিয়েছ? কেন?

—নিতে হলো, নিতে হয়।

—কতদিন থেকে?

—এইতো তিনদিন হলো বিশটা দিন ঘুরে ঘুরে তবে পাওয়া গেছে।

দপ্ করে বীথিকার সন্দেহটারই রঙ বদলে যায়। বিস্ময়ের সুরে চেঁচিয়ে ওঠে বীথিকা—কিন্তু দোকানে বসে কি করো তুমি?

উত্তর দেয় না পরিমল।

পরিমলের মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে বীথি। এত ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরিমলের মুখের চেহারা জীবনে বোধহয় কোনদিন লক্ষ্য করেনি বীথি। অনেক ময়লা হয়ে গিয়েছে পরিমলের মুখের রঙ। কপালের উপর যেন রোদে-পোড়া একটা বিবর্ণতার ছাপ। হাড় দেখা দিয়েছে গলার দু'পাশে। হাত দুটোর মধ্যেও যেন পাথরঘাঁটা একটি কর্কশতা ফুটে উঠেছে।

দরজার পথ আটক করে দাঁড়ায় বীথিকা। পরিমলের একটা হাত দু'হাতে শক্ত করে ধরে। দুঃসহ কৌতূহলে অস্থির দু'চোখের তারা সুস্থির করে পরিমলের উদাস মুখের কাছে প্রশ্ন করে।—বলো, দোকানে বসে কি করো তুমি?

পরিমল—কাজ করি। আশি টাকা মাইনে।

আস্তে আস্তে নত হয়ে আসে বীথিকার মাথা। কিসের ভারে অথবা কিসের ঝোঁকে, বুঝতে পারে না বীথিকা। পরিমলের একটা হাতের উপর কপাল নামিয়ে দিয়ে অলস ও অবসন্নের মতো পড়ে থাকে বীথিকার মাথা। উদ্‌ভ্রান্ত জীবনের সব আক্ষেপ ও অভিযোগ মিটে গিয়ে শুধু একটা তৃপ্তি যেন পড়ে আছে।

পাশের ফ্ল্যাটে দেয়াল ঘড়ি টিক্ টিক্ করে। মাথা তোলে না বীথি, তুলতে ইচ্ছাও করে না। বীথি নিজেই বুঝতে পারে না, এ কোন্ চেহারার গায়ে জীবনে এই প্রথম এরকম প্রণামের ভঙ্গিতে সে আজ মাথা ঠেকিয়ে রয়েছে।

—বীথি! বিচলিতভাবে ডাক দেয় পরিমল।

মুখ তুলেই বীথি জিজ্ঞাসা করে।—দোকানে বুঝি থাকবার জায়গা আছে?

—দোকানের কাছেই আছে।

—কেমন জায়গা?

—একতলার একটা ছোট ঘর।

একটা সুন্দর প্রতিধ্বনি যেন আছড়ে এসে পড়ে বীথিকার অন্তরাত্মার উপর। একটা ছোট ঘর! স্বামীর সঙ্গে থাকবার মতো ঘর! এতদিন ধরে ঘর চিনতে দেয়নি, ঘর করবার রীতি শিখতে দেয়নি বন্ধ্যা নাগিনীর মতো যে বিষাক্ত একটা সাধের ভুল, সে ভুলটা যেন নিজের লজ্জায় জ্বলে-পুড়ে মরে যায় এই ছোট একটি প্রতিধ্বনির স্পর্শে।

সব নিঃশ্বাসের চাঞ্চল্য সংযত করে মুখের উপর সূক্ষ্ম একটা দুষ্টু হাসির ছায়া ছড়িয়ে বীথি প্রশ্ন করে—তাহলে সেই ঘরেই যাচ্ছ?

—হ্যাঁ।

—আমাকে নিয়ে যাবে না?

—তুমি তো যেতে পারবে না।

—পারবো, যদি একটা কথা দাও।

—বলো।

গুলমোরের মাথা থেকে একটা ঝড়ো বাতাস ঘরের ভিতর আছড়ে এসে পড়ে। থর থর করে কেঁপে ওঠে বীথিকার তিরিশ-বছর বয়সের ভঙ্গি-মনোহর সুকঠিন ভ্রূলতা। হীরা-গলানো বেদনার মতো দুটো বড় বড় স্বচ্ছ ও তপ্ত জলের ফোঁটা টলমল করে ওঠে দু'চোখের কোণে। বীথি বলে—বলো, চিরকাল আমাকে ঘেন্না করবে, আর ছেলেকে ভালবাসবে?

দপ্ করে আলো...কি আশ্চর্য, আলো নিভে যায়। যাঃ, লোকটা ঝট্ করে সুইচ টিপে দিয়েছে। পাশের বাড়ির ছাদে আর সামনের বাড়ির দোতলায় এতগুলি দর্শক-চক্ষু হঠাৎ হতাশ হয়ে যায়। এত কাছাকাছি দুটো ব্যাকুলতা চরম মীমাংসা খুঁজতে গিয়ে এই রঙিন ঘরটাকেই যেন হঠাৎ মিথ্যা করে দিল আর অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ল।

সকালের আলো দেখা দিতে আরও মিথ্যা হয়ে গেল নীলকমলের তিনতলার ফ্ল্যাটের রঙিন ঘর। এরই মধ্যে কে জানে কখন এসে ঘর, ঘরের ফার্নিচার আর ঘরের চাবির জিম্মা নিয়েছে দারোয়ান।

ভদ্রলোক আর মহিলা নেমে এসে দাঁড়িয়েছেন ফটকের কাছে। রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে একটা ট্যাক্সি, কেরিয়ারে জিনিসপত্র বাঁধা।

এ ফ্ল্যাট আর ও ফ্ল্যাটের জানালায়, পাশের বাড়ির ছাদে আর সামনের দোতলার বারান্দায় অনেকগুলি নারীচক্ষুর সমাবেশ কৌতূহলে ছটফট করে। কি আশ্চর্য, মহিলার সিঁথিতে যে সিঁদুর দেখা যায়! তার উপর আবার মাথায় কাপড়! এতদিন পরে? কি মনে করে?

ট্যাক্সি স্টার্ট নেবার সঙ্গে সঙ্গে পাশের বাড়ির ছাদ বলে ওঠে—স্বামী-স্ত্রী, নিশ্চয়ই স্বামী-স্ত্রী!

তিনতলার ফ্ল্যাটের জানালা দুটো বন্ধ। গুলমোরের মাথায় বাসি রজনীগন্ধার একটা গুচ্ছ আটকে পড়ে রয়েছে। তার উপর পড়েছে পূব আকাশের একটুখানি আলো। দেখলে সত্যিই আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না, যেন কোথাকার এক বর-বধূ এসে ঐ রঙিন ঘরে মাত্র একটা বাসররাত কাটিয়ে দিয়ে, সকাল হতে না হতেই নতুন ঘরে চলে গেল।

ভোরের মালতী

সারা বাড়ির ব্যস্ততা আর চঞ্চলতার রকম দেখলে মনে হবে, যেন স্বপ্নে পাওয়া একটা ঘটনার পরিণাম এখনি স্বচক্ষে দেখে নিয়ে এখনি শাঁখ বাজবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে এই বাড়ির মন। কাজগুলি যেন দৌড়াদৌড়ি করছে, তর সইছে না।

যেভাবে হন্তদন্ত হয়ে মালতীর ঘরের দিকে ছুটে এলেন বড়-বৌঠান, তা'তে আর বুঝতে বাকী থাকে না যে, কিসের জন্য আর এক মুহূর্তও তর সইছে না এবং সইতে চাইছেও না এই বাড়ির মন।

বড় বৌঠানের হাতে একটি লালপেড়ে শান্তিপুরী শাড়ি, নতুন পয়সা-রঙের একটি ব্লাউজ, একটি সিল্কের সায়া, আর, আরও নানা রকমের মেয়েলি সাজের উপচার। মালতীর ঘরের দরজার কাছে এসে একবার হাঁপ ছাড়েন বড়-বৌঠান, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত-পায়ের উল্লাস যেন আপন খুশিতে ছটফটিয়ে ওঠে। এক ধাক্কায় ভেজানো কপাট ঝনঝনিয়ে খুলে দিয়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেন বড় বৌঠান।—ধর ধর; শিগগির ধর। তোমাকে আর এক মুহূর্তও ঐ সাজে আমি থাকতে দেব না।

ঘরের জানালাটাকে খোলা পেয়ে বিকেলের এক ঝলক রোদও যেন সেই মুহূর্তে লুব্ধ হয়ে এসে লুটিয়ে পড়ে লালপেড়ে শান্তিপুরীর উপর। রঙীন হয়ে ওঠে মালতীর মুখ। দেখে মনে হয়, বিকেলের রোদ ঐ শান্তিপুরীর লালপাড়ের আভা তুলে নিয়ে মালতীর মুখে মাখিয়ে দিয়েছে।

মালতীর ঐ সাদা সাজের রিক্ততা ধ্বংস করে মালতীকে এই মুহূর্তে রঙীন করে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন বড়-বৌঠান। বিশ বছর ধরে মালতীর জীবনে ঐ সাদাটে রূপ অনেক কষ্টে সহ্য করেছে এই বাড়ির মন। কিন্তু আর না। আর এক মুহূর্তও না। মালতীর গায়ে ঐ সাদা থান আর সাদা আদ্দির জামাটাকে আর এক মুহূর্তও দেখতে রাজি নয় এই বাড়ির কোন চক্ষু।

বড়-বৌঠান বলেন—নাও নাও, এখুনি প'রে ফেল।

কিন্তু বড়-বৌঠান এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেও মালতীর হাত দুটো হঠাৎ এত ব্যস্ত হয়ে উঠবে কেমন করে? মালতীর মুখের উপর রঙীন আভা চমকে উঠলেও হাত দুটো যে বিশ বছরের

অনভ্যাসের শাসনে কুণ্ঠিত হয়ে রয়েছে। আজ হঠাৎ লালপেড়ে শান্তিপুরীকে জীবনে বরণ করে নেবার জন্য এত অলজ্জ ব্যস্ততা সে মেয়ের হাতে চঞ্চল হয়ে উঠবেই বা কি করে, যে মেয়ের জীবন বিধবারই জীবনের মত আজ বিশ বছর ধরে সাদাটে রিক্ততার মধ্যে ডুবে রয়েছে? ইচ্ছা থাকলেও হাত দুটো যে লজ্জা কাটিয়ে উঠতে পারে না।

মালতী বলে—তুমি এরকম ডাকাতের মত কাণ্ড কেন করছো বড়-বৌঠান? ওগুলো এখন রেখে দাও।

মালতীর কথাগুলিকেও বোধহয় একটা লাজুক হাসির শিহর জড়িয়ে ধরেছে। লালপেড়ে শান্তিপুরীকে বিছানার উপর রেখে দিয়ে চলে গেলেন বড়-বৌঠান।

ঘুম ভেঙে চোখ মেলে তাকালেই চোখ থেকে স্বপ্ন সরে যায়; এই তো ঘুমের জীবনের নিয়ম। কিন্তু মালতীর ভাবতে আশ্চর্য লাগে, তার জীবনটা বিশ বছরের ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠে চোখ মেলতেই স্বপ্নটাকে দেখতে পেয়েছে। বিশ বছর পরে স্বামী ফিরে এসেছে যার, তার মন বিস্ময়ের আনন্দ সহ্য করতে গিয়ে একবার না কেঁদে থাকতে পারবেই বা কেন? চোখ মুছে লালপেড়ে শান্তিপুরীর দিকে তাকায় মালতী। হেসে ওঠে মালতীর চোখ।

এ যেন নতুন করে আর একবার ফুলশয্যার আহ্বান, একই প্রিয়জনের বুকের কাছে। বিশ বছর আগে এই বাড়ির আর-একটি ঘরে বৌঠানই ঠিক এমনি করে রঙীন শাড়ি হাতে নিয়ে মালতীর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে ঠিক এইরকমই ডাকাতের মত ভঙ্গীতে হুমকি দিয়েছিলেন। মালতীর সে দিনের মনের মিষ্টি-বেদনা ওর চোখ দুটোকে ঠিক এইরকমই ভিজিয়ে দিয়েছিল।

আজ বিশ বছর পরে ফিরে এসে উঠোনের ঐ শেষ কোণের করবীর কাছে ঘরের ভিতরে বসে ছোটকাকার সঙ্গে এখন কথা বলছে যে মানুষটি, সে মালতীরই জীবনের এক ফুলছড়ানো উৎসবের উপহার, মালতীর স্বামী ইন্দুপ্রকাশ, যার কোল ঘেঁষে বসে জীবনের এক অদ্ভুত ভয় লজ্জা আর মধুরতা প্রথম সহ্য করেছিল মালতী।

ফিরে এসেছে মালতীর স্বামী। আজই এই বিকেলে, মাত্র এই দশ মিনিট হলো পৌঁছেছে। আগেই জানা ছিল ইন্দুপ্রকাশ আজ আসবে। বেশিদিন আগে নয়, মাত্র তিনদিন হলো, গত বুধবারের সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে ইন্দুপ্রকাশের চিঠি পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, ছোটকাকা। তারপরেই দোতলার ঠাকুরঘরে বেজে উঠলো শাঁখ। গঙ্গার এক ভাঙা ঘাটের কাছে, ত্রিবেণীর এই পুরোনো এক দালান বাড়ির বুকের ভিতরে যেন এক উল্লাসের গঙ্গা হঠাৎ জোয়ারের ঢেউ আর কলরোল ছড়িয়ে দিল।

আজ তিনদিন ধরে ঠানদি সেই একই কথা বারবার বলছেন—মালতীর তপিস্যের ফল ফললো। ফলবে না কেন? ভগবান বোধহয় মালতীর তপিস্যে দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন।

বাড়িয়ে বলেননি ঠানদি। এই বিশ বছর ধরে মালতী যা করেছে, তাকে তপস্যাই বলতে হয়। ঐ একটি ছোটঘরের ভিতরে বসে স্বামীর ফোটো পূজা করেছে মালতী। সকাল সন্ধ্যা রাত্রি, স্বামীর ফোটোর সম্মুখে বসে স্বামীর ধ্যান করেছে মালতী। মানুষ ওভাবে শুধু দেবতাকেই পূজা করতে পারে।

মালতীর এই ছোটঘরের ভিতরে পূজার ঘরের গন্ধ থমথম করে। কখনো ধূপ জ্বলে, কখনো ধুনো পোড়ে, এবং কখনো বা জ্বলে কর্পূর। রক্তচন্দনে মাখা ফুলের স্তূপের মধ্যে স্বামীর ফোটো। এই ফোটো যেন মালতীর প্রাণের চেয়ে প্রিয় এক ইষ্টদেবতার বিগ্রহ; বিশ বছর ধরে মালতীর

সকল ক্ষণের ভাবনা ও কল্পনার সেবা পেয়ে এসেছে।

বড়-বৌঠান দেখে আশ্চর্য হয়েছেন, মাঝে মাঝে যখন রাতের বাতাসে সাদা করবীর ডালপালা বড় বেশি ছটফট করে, আর একফালি চাঁদের আলোতে ঝিকিমিকি করে উঠোনের স্যাঁতসেঁতে শ্যাওলা, তখন স্বামীর ঐ ফোটোর দিকে তাকিয়ে গুনগুন করে গান করে মালতী। বৈশাখের দুপুরে এক-একদিন মালতীর ঘরে হঠাৎ ঢুকে দেখতে পেয়েছেন ঠানদি, চুপ করে বসে মালতী তার স্বামীর ফোটোকে আস্তে আস্তে পাখার বাতাস দিচ্ছে।

মালতীর এই তপস্যার অনেক আশ্চর্য রীতিনীতির মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি আশ্চর্যকর, তার পরিচয়ও বুঝে ফেলতে দেরি হয়নি বড়-বৌঠানের। বিছানার উপর মালতীর বালিশের পাশে আর একটি বালিশ। প্রতি রাত্রিতে ঐ বিছানায় মালতীর পাশে সত্যিই একজন শুয়ে থাকে, সে হলো ঐ ফোটো। ভোর হলেই স্বামীর ফোটোকে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে আবার রক্তচন্দনে মাখা ফুলের স্তূপের মাঝখানে বসিয়ে দেয় মালতী।

বড়-বৌঠানের সঙ্গে বিশ বছরের মধ্যে কতবার ঝগড়া করেছে মালতী।—আমার দিকে ওভাবে চোখ ছলছল্ করে কখ্‌খনো তাকাবে না বড় বৌঠান। কে বললে আমি শূন্য হয়ে আছি? মিথ্যে কথা। আমি বেশ আছি। আমি স্বামীর সঙ্গেই আছি।

—তবে এসব অলুক্ষণে সাজ কেন? সধবা মানুষ সধবার মত সেজে থাকবে। সাদা থান পরা তোমার একটুও উচিত নয় মালতী।

মালতী বলে—পূজো করতে হলে এইরকমেরই সাজ হওয়া উচিত।

সত্যিই ঐ সাদা থান হলো মালতীর পূজার সাজ, মালতীর মনের রঙীনতার বিরুদ্ধে মালতীর সুন্দর শরীরটার অভিযোগ যেন অভিমান করে সাদাটে হয়ে গিয়েছে। সত্যিই বিধবা তো নয় মালতী, ওকে শুধু ঐ সাদাটে সাজের জন্য বিধবার মত দেখায়। ওর মনের সিঁথিতে সিঁদুর আছে, নিজেকে বিধবা বলে মনে করে না মালতী।

কিন্তু মালতীকে বিধবা মনে করতে ইচ্ছা না করলেও মনে করতেই হয়। এই বিশ বছরের মধ্যে ছোটকাকা তাঁর মনের রাগ সহ্য করতে না পেরে ছোটকাকীর কাছে কতবার আক্ষেপ করেছেন—ওকে বিধবা সেজেই থাকতে দাও, থাকাই উচিত। স্বামীর সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া যা, স্বামী মরে যাওয়াও তা। তা,ছাড়া, ইন্দু আজও সত্যি বেঁচে আছে কিনা, তাই বা কে বলতে পারে?

আজ সেই ইন্দুই ছোটকাকার সঙ্গে ঐ ঘরের ভিতরে বসে গল্প করছে। এই বিশ বছরের মধ্যে শতবার খোঁজ করেও ইন্দুর কোন খবর এই ভারতের কোন প্রান্ত থেকেও পাওয়া যায়নি। হঠাৎ বিয়ের পর এক মাস যেতে না-যেতে সংসার ছেড়ে কোথায় চলে গেল মানুষটা। এত বিষয়-আশয় যার, ত্রিশ বছর বয়েসের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুন্দর যৌবনের একটি তরুণ-রূপ, এত শিক্ষিত একটি জীবন, কে জানে কোন্ এক বৈরাগ্যের তাড়নায় কুড়ি বছর বয়সের স্ত্রীকে সংসারজনতার মাঝখানে একলা জীবনের অভিশাপে স্তব্ধ করে দিয়ে হঠাৎ পালিয়ে গেল। ছোটকাকা সেই দুঃখ সহ্য করতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—ছি-ছি, কোন্ এক বদ্ধ পাগলের সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে মেয়েটার সর্বনাশ করলাম!

আশ্চর্য, একেবারে সূর্য পশ্চিমে ওঠার চেয়েও আশ্চর্য, কুড়ি বছর বয়সের মালতীই ছোটকাকার কাছে এসে শান্ত দুই চক্ষুর দৃষ্টি তুলে বলেছিল—তুমি মিথ্যে দুঃখ করছো, কাকু। সে মানুষ বদ্ধপাগল

নয়, আর আমারও কোন সর্বনাশ হয়নি।

ছোটকাকা—তার মানে?

মালতী বলে—সে পালিয়ে যায়নি, আমি চলে যেতে দিয়েছি বলে সে যেতে পেরেছে।

ছোটকাকা—তাহলে বুঝলাম, তুই-ই একটা বদ্ধপাগল। কোন্ বুদ্ধিতে তুই ইন্দুকে চলে যেতে দিলি? স্বামীকে গেরুয়া পরতে সাহায্য করে যে মেয়ে, সে মেয়ের মাথা খারাপ হয়েছে নিশ্চয়।

ছোটকাকা বিশ্বাসই করতে পারেননি যে, মালতী শেষপর্যন্ত সব রাগ অভিমান ছেড়ে দিয়ে, বেশ খুশি হয়ে ইন্দুকে চলে যেতে দিয়েছিল।

বিশ বছর আগের সেই রাত্রি, যে রাত্রিতে একটি ঘরের শান্ত নিভৃতে ফুলছড়ানো বিছানার উপর বসেই প্রথম দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছিল মালতী, ত্রিশ বছর বয়সের একটি সুন্দর মুখের উপর বসানো উজ্জ্বল অথচ ভেজা ভেজা দুটি চোখ মালতীর মুখের দিকে তাকাতে না পেরে অন্য দিকে তাকিয়ে রয়েছে। স্বামীর সেই চোখের ভাষা সেই রাত্রিতে কিছুই বুঝতে পারেনি মালতী, বুঝেছিল আর কয়েকদিন পরে। স্বামীর কথা শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠেছিল, চেঁচিয়ে কেঁদে ফেলেছিল মালতী। এবং সব কথার আগে জ্বালাভরা আক্ষেপের মত অসহ্য এক অপমানের বেদনা ধিক্কার দিয়ে বেজে উঠেছিল মালতীর মুখে—তবে আমাকে বিয়ে করলে কেন? একমাস আগে ভগবানের টানে সংসার ছেড়ে গেলেই তো ভাল করতে।

হ্যাঁ, অপমান বৈকি। জীবনের প্রথম এক উৎসবের মাঝখানে যে মুহূর্তে আশা করছে মালতীর মন, পানের লালে রাঙানো তার পাতলা দুটি ঠোঁটের মায়া প্রথম জয়ের গর্বে আত্মহারা হবে, ঠিক সেই মুহূর্তে স্বামীর মুখের কথাগুলি যেন ধুলো ছিটিয়ে দিল মালতীর মুখের উপর।

ইন্দুপ্রকাশ বলে—ভেবেছিলাম, নিতান্তই ভুল ভেবেছিলাম যে, তোমার কাছে এসে দাঁড়ালে সংসারকে ভালবাসতেই ইচ্ছা করবে।

মালতী—সত্যিই ভালবাসতে ইচ্ছে করছে না?

ইন্দুপ্রকাশ—না মালতী।

মালতী—ভাল লাগছে না?

ইন্দুপ্রকাশ—একটুও না।

মালতী—থাকলে খুব খারাপ লাগবে বলে ভয় হচ্ছে?

ইন্দুপ্রকাশের চোখ দুটো আধমরা মানুষের অসহায় চোখের মত আনন্দহীন হয়ে যেন দুঃসহ এক ভয়ের দিকে তাকিয়ে কাঁপতে থাকে।—খুব খারাপ লাগবে। আর তুমিও আমাকে সহ্য করতে পারবে না।

মালতী—ভগবানকে খুঁজতে কোথায় যাবে তুমি?

ইন্দুপ্রকাশ—কোথায় যাব বলতে পারি না, তবু জানি জীবনটাকে একেবারে একলা করে দিয়ে ভগবানের কথা চিন্তা করবো।

আহত মানুষের মত ছটফট করে হঠাৎ আবেদন করে ইন্দুপ্রকাশ—ঐ একলা জীবনের আনন্দ আর শান্তির মধ্যে আমাকে চলে যেতে দাও।

অকস্মাৎ মালতীর চোখ দুটো যেন সব জ্বালা হারিয়ে শান্ত হয়ে যায়। ত্রিশ বছর বয়সের এই সুন্দর একটি পুরুষের চোখের দৃষ্টিতে এ কী অদ্ভুত কাতরতা! মুখের ভাষায় এ কি অদ্ভুত ব্যাকুলতা।

খেয়ালের ক্ষেপামি নয়, ইন্দুপ্রকাশের চোখে যেন কোন্ এক আকাশের হাতছানির ছবি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সত্যিই যে এক মহাপুরুষের জীবনের সাধ মালতীর মত মেয়ের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে মুক্তি প্রার্থনা করছে। অন্যায় হবে, পাপ হবে মালতীর, যদি এমন মানুষের জীবনকে একটা মেয়ের আলতা-সিঁদুরের কাছে জোর করে বেঁধে রাখা হয়।

মালতী বলে—তাহলে যাও।

ইন্দুপ্রকাশ—ওভাবে নয়, ক্ষমা করে আর খুশি হয়ে আমাকে যেতে বল, তা না হলে চলে যাবার অধিকার আমার নেই।

হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়ে মালতীর মাথাটা। মাত্র একমাস হলো বিয়ে হয়েছে, কিন্তু এরই মধ্যে স্বামীর জীবনের উপর কত বড় অধিকার পেয়ে গিয়েছে মালতী! নিজের মুখে স্বীকার করেছে ইন্দুপ্রকাশ, মালতী খুশি হয়ে অনুমতি না দিলে এত বড় পুণ্যজীবনের পথে এক পা এগিয়ে যেতে পারছে না মালতীর স্বামী। কোথায় অপমান? অদ্ভুত এক গর্বে ও গৌরবে যে ভরে উঠলো মালতীর মন। যে মেয়েকে ভালবাসতে পারেনি, ভালবাসতে পারবে না বলে ভয় করছে, সেই মেয়েকে তুচ্ছতার বদলে শ্রদ্ধা দিয়ে অভ্যর্থনা করছে এক মহাপুরুষের মন। গঙ্গার জোয়ার যেন জলের উপর নুয়ে পড়া একটা লতাকে বলছে, তুমি যেতে দাও, নইলে যেতে পারছি না।

চোখ মুছে হেসে ফেলে মালতী—যাও, খুশি হয়েই বলছি।

এরপর আর বোধহয় মাত্র তিন-চারটে দিন মালতীর চোখের কাছাকাছি ছিল ইন্দুপ্রকাশ। শ্বশুরবাড়ির মানুষেরা হেসে মালতীকে কতবার প্রশংসা করেছে, এমনকি ধন্যবাদও জানিয়েছে।

বড়-জা বললেন—এবার আমরা নিশ্চিন্ত হলাম মালতী।

—কেন বড়দি?

—তুমিই পারবে, তুমিই ওকে ধরে রাখতে পারবে। যতই উদাস মানুষ হোক, তোমার ঐ মুখটির মায়া তুচ্ছ করে আর সন্ন্যাস নেবার জন্য ছুটতে পারবে না।

—আগেও ছুটতে চেষ্টা করেছিলেন নাকি?

—কতবার চেষ্টা করেছে। ওর মনটাই যেন কি রকমের। আর সেইজনাই তো, ওর সব চেষ্টার ইতি করে দেবার জন্য তোমার মত এক রূপেশ্বরীকে নিয়ে এসেছি।

—ভুল করেছেন।

রাগ করে নয়, হেসে হেসে বড়জা-এর সব কথার উত্তর দিয়ে চলে যায় মালতী। ঘরের ভিতর যখন একলা হবার সুযোগ পায়, তখন মনে মনে প্রার্থনা করে মালতী—যেন শেষপর্যন্ত মনের জোর থাকে। ঐ মানুষকে যেন খুশি মনে চলে যেতে দিতে পারি।

জানতেও পারেনি মালতী, সেদিনের কখন ঠিক কোন্ সময়ে চলে গেল ইন্দুপ্রকাশ। সকাল হতেই ইন্দুকে আর বাড়ির ভিতরে কোথাও কেউ দেখতে পায়নি। যখন বিকাল হলো, তখন মালতীর টেবিলের এক কোণ থেকে একটি চিঠি তুলে নিয়ে পড়লেন আর চেঁচিয়ে উঠলেন বড়-জা। তারপর বাড়ির আর সবাই। রাত দুপুর পর্যন্ত চাপা কান্নার রোলে যেন গলে পড়তে থাকে কলকাতার সেই বাড়ির বাতাস। কিন্তু মালতী তার একলা ঘরের ভিতরে আলোর সামনে বসে শুকনো খটখটে দুটি চক্ষু নিয়ে শান্তভাবে তাকিয়ে থাকে একটি ফোটোর দিকে। মসৃণ কাগজের বুকে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে রয়েছে মালতীর স্বামী ইন্দুপ্রকাশের ছবি। বড় বড় দুটি টানা চোখে যেন

একটা আচমকা বিস্ময়ের গভীর ছায়া। পিছনে টেনে আঁচড়ানো চুলের স্তবক ফেঁপে রয়েছে। শুধু ঠোঁটের রেখা নয়, চিবুকের দু'পাশে ছোট্ট দুটি খাঁজের মধ্যেও যেন মৃদু হাসির একটি মিষ্টি শিহর ফুটে রয়েছে।

যাবার আগে ঐ চিঠিটা মালতীর জন্য লিখে গিয়েছিল ইন্দুপ্রকাশ, এবং সেই চিঠির কয়েকটা কথা মনে পড়তেই আপন মনে হেসে ওঠে মালতী।

—যদি কোন দিন বুঝতে পারি যে, তোমার কাছে গিয়ে থাকতে ভাল লাগবে, তবে আমি তোমার কাছে ফিরে যেতে এক মুহূর্তও দেরি করবো না। মনের মধ্যে ফাঁকি রেখে আমি ভুয়ো সন্ন্যাসী হতে পারবো না।

মনে মনে হেসে যেন ইন্দুপ্রকাশের মনটাকে ঠাট্টা করে মালতী। এক মাস ধরে যে মেয়েকে চোখের সামনে পেয়েও তার কপালের কুমকুমের ফোঁটার দিকে তাকাতে পারলেন না, এক মুহূর্তের মতও ভাল লাগলো না যে মেয়েকে, দূরে চলে গিয়ে সেই মুখটাকে যে মনেও করতে পারবে না ঐ মানুষ, ভালো লাগা তো একেবারে অসম্ভবের গল্প।

বেশ তো, ভালই তো, তুমি তোমার চোখে পুরুষের দৃষ্টির বদলে মহাপুরুষের দৃষ্টি পেয়েছ। তুমি তোমার একলা জীবনের শান্তি নিয়ে আনন্দভরা এক আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সুখী হও। ভালই করেছি, বাঁধা দিইনি তোমাকে। কিন্তু আমি তো মহামানবী নই, আমি যে তোমার ঐ মুখটিকে ভালবেসে ফেলেছি।

অনেক রাত। আবছা ঘুমের মধ্যে চোখ বন্ধ করে যেন বিড়বিড় করে মালতী। তারপর চমকে উঠেই আলো জ্বালে, আর অপলক চোখের তৃষ্ণা নিয়ে ফোটোর দিকে তাকিয়ে থাকে, জীবনের প্রথম ভাললাগা একটি মুখের ছবির দিকে।

ক'দিন পরে শ্বশুরবাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে ত্রিবেণীর বাড়িতে চলে এল মালতী এবং তারপর এই বিশ বছর ধরে অক্ষান্ত অক্লান্ত এক ফোটোপূজার জীবন এবং তারপর এই বিকাল। রঙীন হয়ে ফুটে উঠেছে বিকালের মালতীর মন।

ফুটে উঠবেই বা না কেন? ঠানদি বলেন, এতদিনে মালতীর তপিস্যের ফল ফলেছে। কিন্তু মালতী যে বিশ্বাস করছে, এতদিনে জয়ী হয়েছে মালতীব কপালের সেই কুমকুম। মালতীর মত মেয়ের মনের সাধ আর কাজলকালো চোখের মায়া ছেড়ে দূরে-মরে থাকা একলা জীবনের দুঃসহতা থেকে ছুটে চলে এসেছে মালতীরই স্বামী। মালতীর কাছে থাকতে ভাল লাগবে, সেই ভাল লাগার জন্য লুব্ধ হয়ে ফিরে এসেছে সেই মানুষ।

মন ভরে এই অহংকার নিয়ে আজ খেলা করতে পারে মালতী। ছোট একটা লতার মত মানুষ হয়েও গঙ্গার জোয়ারকে ফিরিয়ে আনবার আর বেঁধে রাখবার মত শক্তি তার আছে। নইলে আনন্দভরা আকাশের লোভ ছেড়ে দিয়ে মালতীর মায়াভরা চোখের কাছে বাঁধা পড়বার জন্য ছুটে আসবে কেন এ'রকম এক মানুষ?

সন্ধ্যা হতে আর দেরী নেই। বড়-বৌঠানও বোধহয় তাড়া দেবার জন্য ছুটে আসছেন। লালপেড়ে শান্তিপুরীর দিকে একবার তাকিয়েই ফোটোর দিকে তাকায় মালতী। রক্তচন্দন মাখানো ফুলের স্তূপের মধ্যে বসে এখনও চোখে সেই গভীর বিস্ময়ের ছাপ নিয়ে হাসছে ইন্দুপ্রকাশের চিবুকের দুই পাশে দু'টি ছোট্ট খাঁজ। এই ফোটোর সঙ্গে বিশ বছরের কত সন্ধ্যায় মনে মনে কত কথা বলেছে

মালতী। আজ এই মুহূর্তে মুখের হাসি দু'হাতে চেপে, ভ্রূকুটি করে আর ধমক দিয়ে শুধু বলতে ইচ্ছা করে—এতদিন পরে মনে পড়লো আর সময় হলো তোমার? হঠাৎ এসে সারা বাড়ির মনকে ব্যস্ত করে দিয়ে, মালতীকে বিশ্রী লজ্জা পাইয়ে দিয়ে....দুষ্টু...অসভ্য...লোভী কোথাকার।

বাড়ির ভিতরে উৎসবের মত চাঞ্চল্য। নানা জনের মুখে মুখে, এঘর থেকে ওঘর কত রকম কলরবের ভাষা ছুটাছুটি করে। ছোটকাকীর সঙ্গে বড়-বৌঠানের কথাবার্তার কিছু কিছু সরব স্পর্শ এই ঘরের ভিতরে মালতীর কানের কাছে এরই মধ্যে পৌঁছে গিয়েছে। শুনে নাকি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে জামাই, বিশ বছর ধরে স্বামীর ফোটো পূজা করছে মালতী। মালতীর চোখ দুটোও চঞ্চল হয়ে ওঠে। এখনি গিয়ে একবার আড়ালে দাঁড়িয়ে ইন্দুপ্রকাশের বড় বড় সেই উজ্জ্বল চোখের আশ্চর্যকে দেখে আসতে ইচ্ছা করে।

এরই মধ্যে বাড়ির লোকের কথাবার্তার টুকরো টুকরো আভাস পেয়ে আরও অনেক কথা জেনে ফেলতে পেরেছে। সত্যিই সন্ন্যাসী হতে পারেনি ইন্দুপ্রকাশ, বার বার সন্ন্যাস নেবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বার বার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কেন? কিসের জন্যে? বার বার মালতীর কথাই মনে পড়েছে, তাই। জোর করে মনকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা না করে শেষ পর্যন্ত মালতীকে দেখবার জন্য ফিরে এসেছে ইন্দুপ্রকাশ। মনে মনে আবার হেসে ফেলে মালতী, আমার মনটা যেমন ভুয়ো বিধবা, তেমনি তোমার মনটাও একটা ভুয়ো সন্ন্যাসী।

উঠোনের উপরে যেন নতুন এক কণ্ঠস্বরের রেশ ভেসে বেড়ায়। শুনতে পেয়ে চমকে ওঠে মালতীর কান, তার চেয়ে বেশি চমকে ওঠে চোখের এক পিপাসা। ঘরের জানলার কাছে আড়াল হয়ে শুধু চোখের দৃষ্টিটাকে দুর্বার এক কৌতূহলের আবেগে উঠানের দিকে ভাসিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মালতী। ঠিকই বুঝতে পেরেছে মালতী, ছোটকাকার সঙ্গে গল্প করতে করতে উঠোনের উপর পায়চারি করছে মালতীরই স্বামী ইন্দুপ্রকাশ। বারান্দা থেকে বেলোয়াড়ী ঝাড়ের রঙীন কাঁচের ঝালর কেঁপে কেঁপে আলো ছড়াচ্ছে উঠানের উপর।

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় মালতীর চঞ্চল চোখের আবেগ। কে এই ভদ্রলোক? হ্যাঁ, ইন্দুপ্রকাশই বটে, কিন্তু কত চেষ্টা করে চিনতে হয়! চিবুকের দু'পাশে সে মিষ্টি হাসির খাঁজ দুটো ভরে গিয়ে একেবারে গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। পিছনে টেনে আঁচড়ানো সেই চুলের ফাঁপানো স্তবক কী অদ্ভুতভাবে মিইয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে সাদা চুলের ছিটেও যে স্পষ্ট দেখা যায়। বেশ সৌম্য ও শান্ত এক ভদ্রলোকের বেশ রাশভারি একটি শরীর আস্তে আস্তে ছোটকাকার পাশে পাশে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

জানলা বন্ধ করে দেয় মালতী। নিথর হয়ে চুপ করে বসে থাকে। এ কি বিশ্রী অস্বস্তি! মালতীর বুকের ভিতর লোভচঞ্চল নিঃশ্বাসগুলি যেন হঠাৎ ঠকে গিয়ে হাঁসফাঁস করে কাতরাতে আরম্ভ করেছে। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে মালতী।

দরজার কপাট ঝনঝনিয়ে ঠেলে দিয়ে ঘরে ঢোকেন বড়-বৌঠান।—একি, তুমি আজও আমার কথার অবাধ্যতা করছো মেয়ে? এখনো ঐ অদ্ভুত সাজ ছাড়লে না?

মালতী বলে—আমাকে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে দাও, বড়-বৌঠান।

বড়-বৌঠান হাসেন—একা শুয়ে থাকবার অনেক সময় পাবে, এখন মাত্র সন্ধ্যা। তুমি শুধু এই শান্তিপুরীটা প'রে মাথায় একটু সিঁদুর ঘষে নিয়ে আমার সঙ্গে চল।

—কোথায়?

—ওই ঘরে জামাইকে একটি প্রণাম করে এখনি চলে আসবে। তারপর একা শুয়ে থাক না রাত দশটা পর্যন্ত, কেউ বাধা দেবে না।

—এখন থাক।

—কেন?

মালতী চেঁচিয়ে ওঠে— রাত দশটার পরেও তো প্রণাম করতে পারা যায়, তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে?

—বেশ তাই করো। কথাগুলি বেশ অপ্রসন্ন স্বরে বলতে বলতে চলে যান বড়-বৌঠান।

সন্ধ্যাটা মোটেই বিষণ্ণ নয়, কিন্তু বড় বিষণ্ণ এই সন্ধ্যার মালতী। লালপেড়ে শান্তিপুরী বিছানায় এক কোণে চুপ করে মালতীর শরীরটাকে জড়িয়ে ধরবার জন্য ওত পেতে অপেক্ষা করছে। দেখতে ভয় করে, এক ঠেলা দিয়ে ঐ লালপেড়ে শাড়িটাকে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। সন্ধ্যার মালতীর মুখে সেই রঙীন আভার কোন চিহ্ন নেই। সন্ধ্যার মালতীর মন যেন স্বপ্ন হারিয়ে তার জীবনের এক রিক্ততার দিকে তাকিয়ে বিশ বছরের ক্লান্তি নিয়ে হাঁপাতে থাকে। স্বামী নামে এক গুরুজন এসেছেন এতদিন পরে। তাঁকে শুধু প্রণামই করা যায়, এবং শুধু প্রণাম করতে হলে লালপেড়ে শান্তিপুরী পরবার কোন দরকার হয় না।

সন্ধ্যার মালতীর মন যেন আর্তনাদ করে উঠতে চায়। মনে হয়, না এলেই ভাল করতেন ভদ্রলোক। এলেনই যদি, তবে ওরকম একটি মূর্তি নিয়ে কেন এলেন? মহাপুরুষ হতে না পেরে একেবারে যে কাপুরুষ হয়ে ফিরে এসেছেন ভদ্রলোক।

মালতীর জীবনের সেই অসমাপ্ত ফুলশয্যার আশা যে এই বিশ বছরের রক্তচন্দনের স্পর্শে আরও সুরভিত হয়ে উঠেছে! সেই আশার নিবেদন নিয়ে ঐ ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই বা কি হবে? কি বুঝবেন, কতটুকুই বা বুঝতে পারবেন ভদ্রলোক? মালতীর মুখের দিকে তাকিয়ে ওই গভীরতার চোখে সেই আগ্রহ কতটুকুই বা দুরন্ত হয়ে উঠতে পারবে? মালতী তার মনের সব মুগ্ধতা দিয়ে বিশ বছর ধরে যার মূর্তিকে বুকের কাছে রেখে তার রক্তের উত্তাপ দিয়ে পূজা করে এসেছে, সে মানুষ ঐ মানুষ নয়।

ফোটোর দিকে তাকায় মালতী। ঐ তো সেই মুখ, চিবুকের দু'পাশে দুটি খাঁজের মধ্যে মিষ্টি হাসির শিহর ফুটে রয়েছে। এই বিশ বছরের মধ্যে কম করেও মালতীর তপ্ত ঠোঁটের হাজার ছাপ পড়েছে ছবির ঐ চিবুকের উপর। এর বদলে...না অসম্ভব...অসাধ্য, ভাবলে গা বমি বমি করে, মালতী তার এই মুখটা একটা নতুন লোকের রাশভারি চোখে গম্ভীর আগ্রহের কাছে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

রাত দশটা। রাতের মালতীর মন যেন মরিয়া হয়ে বিদ্রোহ করবার জন্য তৈরি হয়ে উঠেছে।

ঝনঝনিয়ে কপাট ঠেলে ঘরে ঢুকলেন বড়-বৌঠান! এবং ডাকাতের মত ভঙ্গী করে হুমকি দিলেন—আর এক মুহূর্তও এভাবে পড়ে থাকতে পারবে না, ওঠ, শিগ্‌গির, কর, মুখটা ধুয়ে নাও, চটপট পরে ফেল এই শান্তিপুরী।

লালপেড়ে শান্তিপুরী, নতুন পয়সা-রঙের ব্লাউজ আর সিল্কের সায়া হাতে তুলে নিয়ে বেশ মিষ্টি গলা করে আবার সাধতে থাকেন বড়-বৌঠান,—একটু তাড়াতাড়ি কর লক্ষ্মী. রাত হয়েছে অনেক, বেচারা একা ঘরের ভিতর বসে রয়েছে।

মালতী বলে—একটা প্রণাম করে আসতে হবে, এই তো?

বড়-বৌঠান হাসলেন—আসতে হবে মানে? প্রণাম করবে আর থাকবে। যদি বেশি লজ্জা করে তো বল, আমিই না হয় এক ঠেলা দিয়ে বরের কোলের উপর বসিয়ে দিয়ে চলে আসবো। কপাটে খিল দিতে লজ্জা যদি করে তো খিল দিও না। আমিই কপাটের শিকল তুলে তালা বন্ধ করে দেব।

মালতী—তা হতে পারে না।

বড়-বৌঠান—তবে কি হতে পারে?

মালতী—আমি গিয়ে শুধু একটা প্রণাম করে চলে আসতে পারি।

বড়-বৌঠান—এই থান পরে?

মালতী—হ্যাঁ।

বড়-বৌঠান রাগ সামলাতে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—খবরদার, ওভাবে তুমি যেতে পারবে না। বিশ বছর ধরে মিথ্যে থান পরে অনেক অভিমানের খেলা খেলেছ, আজ ঐ খেলা ভদ্রলোককে না দেখালেও চলবে।

হাত-পা গুটিয়ে বিছানার উপর স্থির হয়ে বসে থাকে মালতী। বড়-বৌঠান কী যেন ভাবেন, তারপর বেশ শান্ত স্বরে বলেন—আচ্ছা বেশ, যদি শুধু প্রণাম করেই চলে আসতে চাও, তাই করে এস। কিন্তু সিঁথিতে সিঁদুর ঘষে আর এই লালপেড়ে শান্তিপুরীটা পরে যাও।

মালতী বলে—না, তা হয় না। যদি যাই তো এই সাদা সাজেই যাব আর চলে আসবো।

বড়-বৌঠান গলা ছেড়ে চিৎকার করেন। —আমি বলছি, তোমাকে এই লালপেড়ে শান্তিপুরী পরতে হবে, স্বামীর কাছে এখনই যেতে হবে, আর স্বামীর ঘরেই সারারাত থাকতে হবে। ভদ্রলোককে অপমান করবার তোমার কোন অধিকার নেই।

মালতী—না পারবো না।

লালপেড়ে শান্তিপুরী হাতে নিয়ে জোর করে পরিয়ে দেবার জন্য মালতীর কাছে এগিয়ে আসেন বড়-বৌঠান, এবং একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরেন।

বড়-বৌঠানের হাত ছাড়িয়ে সরে যায় মালতী, চেঁচিয়ে ওঠে—আমাকে মেরে ফেললেও আমি তোমাদের কথা শুনবো না।

লালপেড়ে শান্তিপুরী যেন একটা রক্তমাখা খড়্গ, মালতীর বিশ বছরের স্বপ্নকে একটা ভুল দেবতার তৃপ্তির কাছে বলি দেবার জন্য বড়-বৌঠানের হাতে হিংস্র আহ্লাদে দুলছে। মেঝের উপর লুটিয়ে বসে পড়ে আর নিজেরই দুই হাঁটু শক্ত করে জড়িয়ে ধরে মালতী।

বাড়ির রাত দশটার নীরবতা যেন হঠাৎ উদ্বেগে বিচলিত হয়। মালতীর ঘরের ভিতরের এই হঠাৎ চিৎকারের অর্থ বুঝতে না পেরে সবার আগে ছুটে আসেন ঠানদি। তারপর আর সবাই। ছোটকাকা আসেন, ছোটকাকী আসেন, বড়দাও ব্যস্তভাবে এসে দাঁড়ান—ব্যাপার কি?

বড়-বৌঠান বলেন—ঐ অলুক্ষুণে সাজ ছাড়বে না, আর জামাই-এর কাছে যেতেও চাইছে না এই মেয়ে।

কিন্তু সেই মুহূর্তে বড়দা হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে সরে যান। ছোটকাকা লজ্জিতের মত হাত কাঁপিয়ে চশমা মুছতে থাকেন এবং ছোটকাকী আর বড়-বৌঠান মাথার কাপড় টানেন। নিঃশব্দ ছায়ার মত

এসে সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইন্দুপ্রকাশ।

ইন্দুপ্রকাশ হাসতে হাসতে বলে—আপনারা যদি এখন চলে যান, তাহলে আমিই বরং মালতীকে কয়েকটা কথা বলি, এত গণ্ডগোলের কোন মানে হয় না।

ঘরে ছেড়ে চলে যায় সকলেই। ঠানদি শুধু যেতে যেতে বলে যান—যার জিনিস সে-ই এখন বুঝে নিক, তাই ভালো।

গঙ্গার জলো-ঠাণ্ডা গায়ে মেখে নিঝুম হয়ে রয়েছে ত্রিবেণীর চৈত্র মাসের মাঝরাত। সারা বাড়ির মধ্যে আর কোন শব্দের সাড়া নেই। মেঝের উপর লুটিয়ে বসে তেমনি শক্ত করে দুই হাঁটু জড়িয়ে আর মুখ লুকিয়ে বসে থাকে মালতী। দরজার কাছে যেন হঠাৎ এসে দাঁড়িয়েছে জীবনের অজানা আর মনের অচেনা একটা নতুন মানুষের ছায়া, এখনি ঘরের ভিতর ঢুকে পড়বে। গা শির্ শির্ করে মালতীর। দম বন্ধ করে দুঃসহ মুহূর্তগুলিকে কোনমতে সহ্য করে মালতী।

কিন্তু মালতীর ঘরের ভিতরে ঢোকে না ইন্দুপ্রকাশ। চুপ করে দরজার কাছে বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে থাকে।

মালতী যেন তার কান দুটোকেও একটা বধিরতার মধ্যে লুকিয়ে ফেলতে পারে। যেন শুনতে না হয় এই ভদ্রলোকের কোন গম্ভীর লোভের হা-হুতাশ আর কাতরানির শব্দ। দু'হাতের বেড়ার মধ্যে একেবারে কানসুদ্ধ মুখটাকেই লুকিয়ে ফেলে মালতী।

কিন্তু কোন কথা বলে না ইন্দুপ্রকাশ। নিজের অস্তিত্বটাকে সত্যিই যেন ছায়ার মত একেবারে শব্দহীন করে দিয়ে শুধু দাঁড়িয়ে থাকে ইন্দুপ্রকাশ এবং বোধহয় বুঝতেও পারে না যে, নিঝুম রাতও প্রায় শেষ প্রহরে এসে শেষ ঘুমের ক্লান্তিতে একেবারে ঢলে পড়েছে।

মালতীর চোখের আর কানের উদ্বেগও বোধহয় এই একটানা অবাধ নিঃশব্দতার মধ্যে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ চমকে ওঠে মালতীর মন। সে ছায়া কি এখনো আছে, না চলে গিয়েছে? চলেই গিয়েছে বোধহয়।

মাথা হেঁট করে রেখে আর চোখ না তুলেও চকিতে একেবারে দরজার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে মালতী, সে ছায়া এখনো দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু কথা বলে না কেন? কয়েকটি কথা বলবার জন্য কত সময় ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে নষ্ট করে দিলেন ভদ্রলোক। তবে কি সত্যই কথা বলতে আসেননি? তবে কেন এসেছেন? শুধু কি দেখে যেতে? কিন্তু কি দেখতে? কি দেখলেন ভদ্রলোক?

মুখ তুলে আর চোখ তুলে ইন্দুপ্রকাশের মুখের দিকে তাকায় মালতী।

ইন্দুপ্রকাশ—তোমাকে দেখতে এসেছি, এতক্ষণে দেখতে পেলাম, মালতী।

মালতী মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকায়।

ইন্দুপ্রকাশ বলে—ওঁরা যাই বলুন না কেন, তুমি ভুল করো না। লালপেড়ে শান্তিপুরী পরে আমার কাছে তোমার আসা উচিত নয়!

মালতীর কান দুটো হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়। এখনও যে মহাপুরুষের মত কথা বলছেন ভদ্রলোক।

ইন্দুপ্রকাশ—যে যাই বলুক, আমাকে তোমার প্রণাম করাও উচিত নয়।

কেন? মালতীর মনের ভিতরে বিস্মিত একটা প্রশ্ন চমকে ওঠে। মনে হয়, মালতীকে একা ফেলে রেখে বিশ বছর ধরে পালিয়ে থাকা জীবনের ভুল আর ত্রুটির জন্য অনুতাপ প্রকাশ

করছেন ভদ্রলোক।

ইন্দুপ্রকাশ—বিশ বছর ধরে নিজের মনের ফাঁকির সঙ্গে লড়তে লড়তে হয়রান হয়ে গিয়েছি। বুঝতে পেরেছি তোমাকে বড় বেশি ভাল লাগবে বলে ভয় পেয়েছিলাম বলে সেদিন পালিয়ে গিয়েছিলাম। সেদিন নিজেকে নিজেই চিনতে পারিনি।

অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু মালতীকে ভাল লাগবে বলে মনে করে এভাবে আর ঐ চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালে মালতীর ভাল লাগবে কি না, এই প্রশ্নের ভয় নেই কেন এই ভদ্রলোকের মনে? ভদ্রলোকের একটা পুরনো লোভের এই হা-শুনতে একটুও ভাল লাগে না মালতীর।

ইন্দুপ্রকাশ বলে—কিন্তু আজ ভয় পেয়েছি মালতী, বুঝতে পারছি না, সত্যিই তোমাকে ভাল লাগবে কি?

মালতীর চোখ দুটো হঠাৎ বিশ বছর আগের সেই দিনের আহত ও অপমানিত চোখের মত দপ করে চমকে ওঠে। আবার সেই কথা? নির্বোধের মত নিজের মনকে ফাঁকি দেবার কথা?

ইন্দুপ্রকাশ—আমি আশা করেছিলাম, আমি আবার সেই মালতীর চল্লিশ বছর বয়সের জীবনটাকে বুকে জড়িয়ে শান্তি পাব।

মালতীর ঘুমন্ত চোখের উপর কে যেন হঠাৎ একটা আঘাত আছড়ে দিল, তাই যন্ত্রণাক্ত হয়ে ছটফট করতে থাকে মালতীর চোখ। কেঁপে ওঠে মালতীর হাতটা। সাদা থানের আঁচলাটাকে গায়ের উপর ভাল করে জড়িয়ে ধরে রাখে মালতী। যেন এতক্ষণে চোখে পড়েছে, বিশ বছর পর হঠাৎ ঘুম ভেঙে মালতী তার চল্লিশ বছরের বয়সটাকে দেখতে পেয়েছে। ছিঃ, এমন করেও নিজের বয়স ভুলে যায় মানুষ!

ইন্দুপ্রকাশ হাসে—তোমার চেহারা কত বদলে গিয়েছে মালতী। তুমি আর সেই রকম সুন্দর নও, কিন্তু...।

হঠাৎ বিব্রতভাবে, যেন ভয় পেয়ে কিংবা অদ্ভুত এক লজ্জার ভয় সইতে না পেরে মাথার উপর সাদা থানের আঁচল টেনে দেয় মালতী।

ইন্দুপ্রকাশ বলে—কিন্তু আর এক রকমের সুন্দর তো বটেই।

মালতীর চোখ ফুটে জল উথলে উঠবে বোধহয়। মুখ ঘুরিয়ে দেয় মালতী।

ইন্দুপ্রকাশ—লোকে বলছে, তুমি বিশ বছর ধরে স্বামীর ফোটো পূজো করেছ, কিন্তু লোকের কথা বিশ্বাস করো না মালতী।

—কেন? মালতীর মুখে প্রশ্নটা যেন দপ করে জ্বলে ওঠে। মালতীর জীবনের সবচেয়ে বড় গর্বের উপর আঘাত পড়েছে।

ইন্দুপ্রকাশ—স্বামীকে নয়, তুমি ত্রিশ বছর বয়সের একটি ছেলেকে আজও পূজো করছ মালতী।

মালতী—আমার স্বামীরই ত্রিশ বছর বয়সের মূর্তিকে পূজো করছি।

ইন্দুপ্রকাশ—না, তুমি তোমার স্বামীর ত্রিশ বছর বয়সটাকে পূজো করছো। তাই...তাই বলছিলাম, আমাকে তোমার প্রণাম করা উচিত নয়। আমি তোমার প্রণাম নেবই বা কেন?

স্তব্ধ হয়ে যায় মালতীর সব মুখরতা। নিথর হয়ে সাদা থানের আঁচলে মুখ ঢেকে চুপ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে মালতী। তারপর কী যেন বলবার জন্য আস্তে আস্তে আঁচল সরিয়ে মুখ

তুলে তাকায়।

কিন্তু সে-কথা আর বলা হলো না। নেই, দরজার কাছে কোন ছায়া নেই। চলে গিয়েছে ইন্দুপ্রকাশ।

কিন্তু যাবে কোথায়? মালতীর দু'চোখে যেন নতুন এক প্রতিজ্ঞার আক্রোশ ছটফট করে।

কিন্তু ভোর হয়ে এল যে!

ভোরের মালতীর চোখে জল।

ফোটোর দিকে চেয়ে বসে আছে মালতী। রক্তচন্দন মাখানো ফুলের স্তূপের মধ্যে ত্রিশ বছর বয়সের একটা মুখ মালতীর চল্লিশ বছর বয়সের ভারে অলস দেহের দিকে তাকিয়ে হাসছে। মালতীর মনের বিচিত্র ক্ষোভগুলিকে যেন ঠাট্টা করছে সেই হাসি, ছিঃ, ছটফট করে ওঠে মালতীর হাতটা। সেই মুহূর্তে ফোটোটাকে টেবিলের দেরাজের ভিতরে বন্ধ করে মালতী।

এখনই পাখি ডেকে উঠবে যে!

লালপেড়ে শান্তিপুরীর দিকে তাকায় মালতী। সিঁদুরের কৌটো খোঁজে মালতী। নতুন পয়সা-রঙের ব্লাউজ আর সিল্কের সায়া, মন্দ কি? টিপের কুমকুম গেল কোথায়? দেখতে দেখতে আবার রঙীন হয়ে ফুটে ওঠে ভোরের মালতীর রূপ, নতুন করে আবার এক ফুলশয্যার আশা সত্যিই যে মালতীর মনে ডাক দিয়েছে। ব্যস্ত হয়ে ওঠে, দুই হাতকে দুরন্ত উৎসাহে মাতিয়ে তাড়াতাড়ি রঙীন সাজে সেজে উঠতে থাকে মালতী।

গঙ্গার ভাঙাঘাটের উপর জলের জোয়ার অদ্ভুত এক উচ্ছলতার শব্দ ছড়ায় বাতাসে। ভোর হয়ে এসেছে। চাদর হাতে দিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে আসতেই থমকে দাঁড়ায় ইন্দুপ্রকাশ। লালপেড়ে শান্তিপুরীর আভা জড়িয়ে একটা বাধা দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে।

—এ কি মালতী?

—আমি মালতী ঠিকই, কিন্তু তুমি কী?

উত্তর দেয় না ইন্দুপ্রকাশ। ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় মালতী।

ইন্দুপ্রকাশের বিস্মিত দুই চক্ষুকে আরও বিস্মিত করে মালতী বলে—তুমি মহাপুরুষ নও। তুমি পুরুষ।

—হ্যাঁ, তাই তো তোমার কাছে ফিরে এসেছিলাম।

ছলছল করে মালতীর দুই চোখ। —তবে লালপেড়ে শান্তিপুরীর দিকে তাকিয়ে এখনও চুপ করে রয়েছ কেমন করে?

—কিন্তু তোমার চোখে আমি যে নিতান্ত...

—তুমি মেয়েমানুষের চেয়েও হিংসুটে, সামান্য একটা ফোটো হিংসে কর। লজ্জা করে না তোমার?

বলতে গিয়ে হেসেই ফেলে মালতী।

আগ্রা আর লখনউ

অমলিনা বলে, "আমাদের লখনউ ঢের ঢের ভাল, আর অনেক বেশী চারমিং, তোমাদের এই আগ্রার চেয়ে।"

দেবনাথ বলে, "আমাদের আগ্রা ঢের ঢের ভাল, আর অনেক বেশি লাভলি, তোমাদের এই লখনউয়ের চেয়ে।"

অমলিনা বলে, "আমাদের দিলখুশা, কৈসরবাগ, রেসিডেন্সি, রুমি দরওয়াজা আর চমৎকার গোমতী নদী।"

দেবনাথ বলে, "আমাদের তাজ, ইতিমদৌল্লা, ফোর্ট, ফতেপুর সিক্রি আর যমুনা।"

আগ্রায় তাজ রোডের উপর দেবনাথের এই সুন্দর স্টাইলের আধুনিক বাড়িটার চেহারাতেও যেন মোগল রুচির একটা ছায়া আছে। দরজার উপর সাদা মার্বেলের জালি আর বারান্দার শেষে লাল বেলেপাথরের ঝরোকা!

ড্রইং-রুমে বসে গল্প করে হাসে দেবনাথ আর অমলিনা, স্বামী আর স্ত্রী। কালো বুলডগ শখের পাহারাওয়ালার মতো দরজার কাছে বসে কার্পেটে মাথা ঘষে, আর দেবনাথের দুই বোন টুটু আর ফুটু বাগানে দৌড়াদৌড়ি করে সূর্যমুখী কুড়োয়, আর মখমল পোকা খুঁজে বেড়ায়।

আগ্রার ছেলে দেবনাথ, আর লখনউয়ের অমলিনা। এই তো কতদিনই বা হলো, গত মাসের মাঝামাঝি একটি দিনের ক্লান্ত প্রহরের শেষে সন্ধ্যার চাঁদ ঠিক যখন গোমতীর বুকে আলো ছড়িয়েছে, তখন শুরু হল মধুর এক উৎসব। দেবনাথ আর অমলিনার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের রেজিস্ট্রার রতনলালবাবু খাতা বন্ধ করে ওদের দুজনকে হেসে হেসে ব্লেসিং জানালেন। আবার শাঁখও বাজল, অমলিনাদের লখনউয়ের বাড়ির ফুলবাগানে ঝুর-ঝুরে মিষ্টি হাওয়া বয়ে গেল।

আগ্রার বাড়ির ড্রইং-রুমে বসে এই যে তর্ক, এটাও যেন একটা মিষ্টি রেষারেষির ঝুরঝুরে হাওয়া। দেবনাথ হাসে, অমলিনা হাসে। তর্কও গড়াতে থাকে। কিন্তু মীমাংসা হয় না, আগ্রা ঢের ঢের ভাল, না লখনউ ঢের ঢের ভাল?

এই সুন্দর হাসিভরা তর্কের ঝুরঝুরে হাওয়াটা হঠাৎ একদিন একটু তপ্ত হয়ে এলোমেলো হয়ে গেল। অমলিনা বলে, "সত্যিই, তোমার ওই অদ্ভুত সাজ আমার একটুও ভাল লাগে না।"

আশ্চর্য হয় দেবনাথ : "অদ্ভুত সাজ কেন বলছ?"

"সব সময় একটা টুইলের শার্ট আর খাকী জিনের ট্রাউজার, কী অদ্ভুত দেখতে! আলিগড় কাটলারির এজেন্টদের মতো!"

অমলিনার কথা শুনে দেবনাথের চোখে একটা হাসির শিহর ফুটে থাকে ঠিকই, কিন্তু যে ভাবে হঠাৎ এক-একবার কেঁপে ওঠে, তা দেখে মনে হতে পারে, বাতাসে যেন অকাল লু'র জ্বালা লেগেছে। তাই চোখের হাসিটা মাঝে মাঝে তেতে উঠছে।

অমলিনা বলে, "আমার একটা সামান্য অনুরোধ যদি তুচ্ছ না কর তো বলি।"

"বলো।"

"তসরের ঢিলে-ঢালা পাঞ্জাবি আর পায়জামা তোমাকে যে কী সুন্দর মানাবে, সেটা বোধহয় তুমি বুঝতেই পারছ না।"

"বুঝতে পারছি না ঠিকই।"

"আমার কথা বিশ্বাস কর, লক্ষ্মীটি। সত্যিই তোমাকে খুব ভাল দেখাবে।"

দেবনাথ হাসে : "অন্তত তোমার চোখে তো ভাল দেখাবে।"

অমলিনার চোখে যেন অভিমানের ছায়া মেদুর হয়ে ওঠে : "তাই না হয় হলো। আমার জন্য সামান্য একটু কষ্ট স্বীকার করতে..."

"না, না, কষ্ট কিসের? তুমি যদি খুশি হও তবে আমি কাবুলিওয়ালাও সাজতে পারি।"

তর্ক আর হাসিটা তপ্ত হতে হতে একটা কৌতুকের ছোঁয়ায় সিক্ত হয়ে মিইয়ে যায়। আবার স্বচ্ছন্দে গল্প করতে পারে অমলিনা আর দেবনাথ। এবং দু'দিন পরে বিকেলে বেড়াতে যাবার সময়, সত্যিই তসরের পাঞ্জাবী আর পায়জামা পরে অমলিনার কাছে এসে দেবনাথ বলে, "চল, আজ একবার সেকেন্দ্রা ঘুরে আসি।"

আগ্রার বিরুদ্ধে লখনউয়ের অভিযোগ আর অভিমান যদি এই পর্যন্ত এসে থেমে থাকত, তবে বোধহয় এইরকমই হাসি মুখের উপর টেনে আর খুশি মনে সেকেন্দ্রার ছায়ার কাছে এসে রোজই দাঁড়াতে পারত দেবনাথ, আর অমলিনার মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে পারত, "সেকেন্দ্রার বিকালের এই আলো, দূরের ঘুঘুর ডাক আর চারদিকের এই উদাস শান্তি কেমন লাগছে অমলিনা?"

কিন্তু মাত্র ওই একটি দিন, তার পর আর এই প্রশ্ন করার সুযোগ পায়নি দেবনাথ। অমলিনাও কোনদিন ভুলেও আগ্রার কোন আলো আর ছায়ার দিকে তাকিয়ে তার চোখদুটিকে বিহ্বল করে তুলতে পারল না। দেবনাথের মুখের হাসির সঙ্গে তার জীবনেরও একটা উৎসাহের হাসি যেন হেমন্তের দেওদারের পাতার মতো ফিকে হয়ে আসতে থাকে। কিন্তু অমলিনার হাসি দিন দিন আরও উচ্ছ্বল ও আরও রঙীন হয়ে ওঠে। একের পর এক জয়ী হয়ে চলেছে লখনউয়ের অভিযান।

বদলে যাচ্ছে দেবনাথ। অমলিনা যেন তার জীবনের প্রিয় সঙ্গীকে মনের মতো করে ভাঙছে, গড়ছে আর সাজাচ্ছে। দেবনাথও আপত্তি করে না। আপত্তি করার দরকার কি? তাতে লাভই বা কি? তসরের পাঞ্জাবি আর পায়জামায় সেজে, বেশ একটু নতুনটি হয়ে প্রথম যখন অমলিনার চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল দেবনাথ, তখন ঝক করে হেসে উঠে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল অমলিনার চোখ। দেবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে খুশি হোক, মুগ্ধ হোক অমলিনা। অমলিনার জীবনের আশাগুলিকে খুশি করে হাসিয়ে দিতে গিয়ে দেবনাথের হাসি ফুরিয়ে যাচ্ছে, যাক গে।

অমলিনা আপত্তি করে, "তোমার গলা ভাল, কিন্তু ঠুংরি গেয়ে গেয়ে গলা নষ্ট করছ কেন?"

"ঠুংরি তোমার ভাল লাগে না?"

"একটুও না।"

"কি ভাল লাগে?"

"গজল!"

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকে দেবনাথ। তারপর উৎসাহের সঙ্গে নড়ে-চড়ে বসে। তারপর অমলিনার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা ফিকে হাসি হেসে, গীটার বাজিয়ে গজল গায় দেবনাথ। আবেশে বিভোর হয়ে শুনতে থাকে অমলিনা। শিকার করতে গিয়ে দেখেছে দেবনাথ, চম্বলের নিরালা বালিয়াড়ির উপর দাঁড়িয়ে দূরের বিউগল শুনে ঠিক অমলিনার মতো এইরকম মুখ আর নিথর দুটি চক্ষু তুলে দাঁড়িয়ে ছিল দলছাড়া একটা চিতল হরিণী।

"অমলিনা বলে, "তুমি বুঝি শুধু ক্রিকেট ভালবাসো?"

"হ্যাঁ।"

"কেন? টেনিস কোন্ অপরাধ করেছে?"

"কোন অপরাধ করেনি। তুমি যদি বলো, তবে ক্রিকেট ছেড়ে দিয়ে টেনিসই ধরি।"

অমলিনা উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসতে থাকে : "ভালই তো।"

প্যাটেল পার্কের একটা হাওয়া হু-হু করে ছুটে এসে ড্রইং-রুমের জানালার পর্দা ফাঁপিয়ে তোলে। কিন্তু দেবনাথের বুকের ভিতরটা হঠাৎ গুমরে ওঠে, তারপর যেন হু-হু করে ফুরিয়ে যেতে থাকে পাকা ক্রিকেটিয়ারের এতদিনের যত আনন্দ আর অহংকারের নিঃশ্বাস।

স্বামীকে, জীবনের প্রিয়তম সঙ্গীকে মনের মতো করে সাজিয়ে নিয়ে জীবনের কাছে পেতে চায় অমলিনা। তাই তো এত মত্ত হয়ে উঠেছে অমলিনার দাবিগুলি। পুরনো দেবনাথ যেন অমলিনার এই দাবিগুলির এক ভয়ানক মায়ার টানে পড়ে নিজেকে ক্ষণে ক্ষণে ছিঁড়ে-খুঁড়ে একেবারে নতুন করে দিচ্ছে। অমলিনার ভালবাসার কাছে নিজের শখ আর ইচ্ছার জেদগুলিকে একটু ছোট করে দিলে দোষ কি?

টেনিস ধরে দেবনাথ। চা ছেড়ে দিয়ে কফি ধরতে হয়, অমলিনার অনুরোধ। ইংরেজী ফিল্ম নয়, হিন্দী ফিল্ম দেখতে হয়। অমলিনা বলে. "যতই বলো, গানে আর নাচে ভরা ওই হিন্দী ছবিই ভাল।"

মুগ্ধ হয়ে দেবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অমলিনা। তসরের পাঞ্জাবি আর পায়জামা, টেনিস র‍্যাকেট হাতে, খেলতে যাবার আগে বারান্দায় কার্পেটের উপর পায়চারি করে যখন কফির পেয়ালায় চুমুক দেয় দেবনাথ, তখন অমলিনার সারা মুখে যেন স্বপ্নময় একটা তৃপ্তি রঙীন হয়ে ওঠে।—এই তো, কী চমৎকার, দিব্যি সুন্দরটি!

আরও কাছে এগিয়ে এসে দেবনাথের পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমালটা বের করে দেবনাথের গলার পাউডারের মোটা মোটা ছোপ মিহি করে মুছে দেয় অমলিনা।

হেসে হেসে চলে যায় দেবনাথ। দেবনাথের জীবনের একটা গম্ভীর আর উদাস অভিমান অমলিনার হাতের আদরে চমকে উঠে আর লজ্জা পেয়ে হেসে উঠেছে। অমলিনা বলে, "এই সব টক-টক গন্ধ বিশ্রী বিলিতী'সেন্ট কখনও মাখবে না বলে দিচ্ছি। এর চেয়ে এক ফোঁটা আতর খস অনেক ভাল।"

অমলিনার কথাগুলি আবার যেন কঠোর আর দুঃসহ খটকার মতো দেবনাথের কানের উপর আঘাত দিয়ে খট করে বেজে ওঠে। গম্ভীর হয়ে যায় দেবনাথ।

আগ্রাকে ভাল লাগে না। তবু দেবনাথের একটা অনুরোধ মাঝে মাঝে রক্ষা করে অমলিনা। কখনও সকালে, কখনও বিকালে এবং কখনও বা সন্ধ্যায় দুজনে বেড়াতে বের হয়। একদিন বুলন্দ দরজার কাছে হাঁপিয়ে ও ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে অমলিনা। ব্যস্তভাবে বলে, "আর না, চল এবার বাড়ি ফিরে যাই।"

রাতের আলোতে সদর-বাজারের পথে পথে দেবনাথের সঙ্গিনী হয়ে ঘুরতে ঘুরতে অমলিনার সুন্দর মুখে ঘামের ফোঁটা ফুটে ওঠে। অমলিনা বলে, "এখানে মার্কেট করে কোন সুখ নেই। এর চেয়ে আমাদের লখনউয়ের আমিনাবাদের মার্কেট কত জমাট ; কত ভিড়, কত রোশনাই, চমৎকার

ফুর্তির মেলার মতো।"

ফতেপুর সিক্রির মহল-ই-খাস দেখে যেন ডুকরে ওঠে অমলিনার মন: "এর চেয়ে কত ভাল আমাদের রুমি দরওয়াজা। আমাদের রেসিডেন্সির গোলাপ তোমাদের তাজের গোলাপের চেয়ে কত সুন্দর; আর কী মিষ্টি গন্ধ।"

তবু আজও আগ্রায় একটা আশা যেন অমলিনাকে মাঝে মাঝে হাত ধরে আদর করে ডাকছে। বার বার বলে রাজী করিয়ে অমলিনাকে বেড়াতে নিয়ে যায় দেবনাথ। আগ্রার কী আর কতটুকুই বা দেখেছে অমলিনা? লখনউয়ের দিলখুশাবাগের পিকনিক আর ইউক্যালিপটাসের ছায়ার আনন্দ গল্প করে বলতে গিয়ে অমলিনার প্রাণটা যেন গান গেয়ে ওঠে। কিন্তু দেবনাথের বিশ্বাস, এখনও বিশ্বাস করে দেবনাথ, আগ্রার কোর্টের ভিতরে সাদা মার্বেল আর লাল পাথরের জাদুময় রূপের বুকের ভিতরে গিয়ে যদি একবার দাঁড়ায় অমলিনা, যদি শিশমহল দেখে চমকে ওঠে, আর সম্মন বুরুজের নিভৃতে শাজাহানের শেষ নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে আশ্চর্য হয়ে, শেষে জাহাঙ্গীরী মহলে পাথুরে ঝরোকার আড়ালে একটি রঙীন থামের পাশে ঠাণ্ডা ছায়া পেয়ে....।

হ্যাঁ, সেই বিকেলে দেবনাথের সঙ্গে ফোর্টে বেড়াতে গিয়েছিল অমলিনা, আর অনেক ঘুরে ফিরে ক্লান্ত হয়ে জাহাঙ্গীরী মহলের ঠাণ্ডা থামের পাশে ছায়াময় একটি নিরালার কোলে এসে দুজনে দাঁড়িয়েছিল।

কেউ নেই এখানে। বড় নীরব একটি নিরালা। অমলিনার মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে দেবনাথ। আগ্রার স্বপ্ন যেন তৃষ্ণার্ত হয়ে অমলিনার শ্রান্ত ক্লান্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে আছে। অমলিনার মুখ দেখে মনে হয়, মুগ্ধ হয়েছে অমলিনা। অমলিনারও আপত্তি নেই। সেই তৃষ্ণাকে সুখী করে দেবার জন্য তৈরি হয়ে দেবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে অমলিনা।

দু'হাত দিয়ে অমলিনার দুটি হাত ধরে বুকের কাছে টেনে আনে দেবনাথ। অমলিনার মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে দেবনাথের মুখ।

"আঃ!" যেন একটা অভিযোগ হঠাৎ আক্ষেপ করে উঠেছে। মুখ সরিয়ে নিয়ে অমলিনা বলে, "এ কী করছ! এ-রকম আমার একটুও ভাল লাগে না।"

চমকে ওঠে দেবনাথ, আর চোখ দুটোও যেন দপদপ করে : "কী রকমটা ভাল লাগে?"

"এমন একটি সুন্দর নিরালায় ভালবাসার মানুষকে কাছে পেলে কিঃ ধরতে হয় তা-ই তুমি জান না।"

"কী ধরতে হয়?"

অমলিনার দু'চোখ জুড়ে যেন একটা লাজুক অভিমান ছটফট করতে থাকে। অমলিনা বলে, "হাত নয়, গলা।"

দেবনাথ বলে, "থাক্, চল এবার বাড়ি ফিরে যাই।"

ফিকে হতে হতে এতদিনে ফুরিয়ে গিয়েছে দেবনাথের মুখের হাসি। দেবনাথ আর অমলিনার একসঙ্গে বেড়াতে যাবার পালাও ফুরিয়ে গিয়েছে। দেবনাথ আজকাল একাই বেড়াতে যায়।

দেবনাথের গম্ভীর মুখ দেখে মাঝে মাঝে রাগ করে অমলিনা : "তুমি আজকাল যেন কেমনটি হয়ে গিয়েছ।"

তেমন কিছু নয়, কিছুই বদলায়নি দেবনাথ। পরিবর্তনের মধ্যে শুধু এই যে, আর অমলিনাকে বেড়াতে যাবার জন্য কোন অনুরোধ করে না দেবনাথ। আগ্রার যমুনা মেঘলা দিনের দুপুরে এত নীলঘন রূপ নিয়ে টলমল করে উঠেও অমলিনার চোখে কোন মায়া ঘনিয়ে তুলতে পারল না। লখনউয়ের মেয়ের চোখে বোধহয় ভরা শ্রাবণের গোমতীর উল্লাস সব ঠাঁই জুড়ে টলমল করছে। অমলিনাকে বেড়াতে যেতে অনুরোধ করে কোন লাভ নেই।

অমলিনার মন দেবনাথকে যেমনটি চায়, তেমনটি হয়েই এই ড্রইং-রুমের সকাল আর সন্ধ্যাগুলি পার করে দেয় দেবনাথ। সেই তসরের পাঞ্জাবি, পায়জামা, আতর খস আর কফির পেয়ালা। অমলিনার জীবন তার মনের মতন রূপের আর রুচির একটি মানুষকে চায় এবং দেবনাথও যেন নিজেকে লুপ্ত করে দিয়ে অমলিনার সেই মনোময় মানুষের একটি জীবন্ত নকল হয়ে অমলিনাকে সুখী করে রাখছে।

অমলিনা বলে, "আমি লখনউ যাব কবে?"

"যেদিন ইচ্ছা হবে সেদিনই যেয়ো।"

"আমি এই মাসের শেষে যেতে চাই।"

"যেয়ো।"

"তোমার একটুও আপত্তি নেই তো?"

হেসে ওঠে দেবনাথ। "একটুও আপত্তি নেই অমলিনা।"

"তুমি অমন করে হেসে উঠলে যে? আমি চলে যাব, এটা কি তোমার কাছে একটা সুখের খবর?"

এই প্রথম এই ড্রইংরুমের জীবনে দেবনাথের হাসি ভোরের আকাশের মত রঙীন হয়ে ফুটে উঠেছে, আর অমলিনার মুখের হাসি আচমকা একটি ধাক্কা খেয়ে ব্যথিত হয়ে উঠেছে।

দেবনাথ অপ্রস্তুত হয়ে হাসে : "না না, সুখের খবর কেন হবে? তুমি লখনউ যাবে, সেই কথা ভাবতে তোমার কত ভাল লাগছে, তাই ভেবে আমি হাসছি।"

অমলিনাও হাসে, কিন্তু সে-হাসির জোর কোথায় যেন আলগা হয়ে ঝুলে পড়েছে। অমলিনা বলে, "আজ সন্ধ্যায় তুমি আর বেড়াতে যেয়ো না।"

"কেন?" চমকে ওঠে দেবনাথ।

অমলিনা হাসে, "অতুলপ্রসাদের গান শোনাব তোমায়।"

"সে আর নতুন কী জিনিস শোনাবে? অনেক শুনেছি। মীরার ভজন গাইতে পারবে?"

অমলিনা আশ্চর্য হয়ে তাকায়, "পারব না কেন? কিন্তু মীরার ভজন বুঝি খুব নতুন জিনিস?"

"থাক্ ওসব কথা। আমাকে কিন্তু আজ সন্ধ্যায় একবার বের হতেই হবে অমলিনা।"

মুখ ভার করে অমলিনা : "আমার সামান্য একটা অনুরোধ, তাও তুমি রাখতে পারবে না?"

"এই সামান্য অনুরোধটা না করলেই ভাল করতে অমলিনা। তুমি তো জান, আমি বেড়াতে কত ভালবাসি।"

মুখ ভার করলেও বাধা দেয়নি অমলিনা। সন্ধ্যা হতেই যখন কালো বুলডগের সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলা করে বাইরে যাবার জন্য ফটকের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে দেবনাথ, তখন ড্রইং-রুমের ভিতর থেকে হঠাৎ ছুটে এসে দেবনাথের পাশে দাঁড়ায় অমলিনা, হাঁটতে হাঁটতে ফটক পর্যন্ত

এগিয়ে যায়।

অমলিনার খোঁপার দিকে তাকিয়ে দেবনাথ হাসে : "এ কী করেছ?"

অমলিনা উৎফুল্ল হয়ে বলে, "এই সীজনের প্রথম সূর্যমুখী। কেমন? দেখতে তোমারও নিশ্চয় খুব ভাল লাগছে?"

"কিছু মনে করো না, দেখতে ভাল লাগছে না।"

"কেন?"

"খোঁপাতে সূর্যমুখী কেমন জঙ্গল-জঙ্গল মনে হয়। তার চেয়ে দু-চারটে হাসনুহানা হলে মানাত ভাল। কালোর ওপর সাদা সবচেয়ে সুন্দর মানায়।"

শিউরে ওঠে অমলিনার উৎফুল্ল চোখের আহত হাসি। আগ্রার মন যেন প্রকাণ্ড একটা অন্ধ শ্বেত-পাথর, অমলিনার খোঁপার রঙীন সূর্যমুখীর উপর আছাড় খেয়ে পড়েছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অমলিনা। হেসে হেসে বিদায় নেয় দেবনাথ : "ফিরতে বেশি দেরি হবে না।"

আশ্চর্য হয়ে আর রাগ করে লাভ কি? রাগ করবারই বা কী আছে? মানুষটা তো অমলিনাকেই নিজের মনের মতো করে কাছে পেতে চাইছে। মীরার ভজন আর হাসনুহানা ভালবাসে দেবনাথ। বেশ, তাই হোক।

বেড়িয়ে ফিরে যখন ড্রইং-রুমের দরজার কাছে এসে কালো বুলডগের কাঁধে হাত দেয় দেবনাথ, তখন খুশি হয়ে হেসে ওঠে দেবনাথের দুই চোখ। গান গাইছে অমলিনা—মীরার ভজন। বড় মিষ্টি সেই ভজনের সুর। অমলিনার খোঁপার সাদা হাসনুহানাও যেন সেই মিষ্টি সুরে মজে গিয়েছে।

"বাঃ! এত মিষ্টি গান, কিন্তু এত গম্ভীর হয়ে গাইছ কেন অমলিনা?"

"গম্ভীর?"

"হ্যাঁ. তবু তোমাকে দেখতে বেশ লাগছে।"

"আমাকে? না, খোঁপার হাসনুহানাকে বেশ লাগছে?"

"একই কথা, একই কথা।" ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় দেবনাথ।

অমলিনার বুকের ভিতর একটা তীব্র চিৎকার যেন নীরবে বেজে ওঠে, না, একই কথা নয়। কিন্তু নীরব চিৎকারের ভাষাকে নীরবে সহ্য করে অমলিনা।

অমলিনা বলে, "একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

"করো।"

"এই মসলিনের শাড়িও বোধহয় তোমার দেখতে ভাল লাগছে না?"

"আমার মনে হয়, বাংলা দেশের তাঁতের শাড়িতে তোমাকে আরও ভাল মানাবে।"

"পায়ে আলতা পরলে বোধহয় আরও ভাল মানাবে।"

হো-হো করে হেসে ওঠে দেবনাথ, "না, না, আলতা-ফাল্‌তা নয়। তবে মনে হয়, তোমাকে এই ঠকঠকে হাই-হিল জুতোর চেয়ে হাল্কা একটি ভেলভেটের স্লিপার বেশি ভাল মানাবে।"

অমলিনা আস্তে আস্তে বলে, বলতে গিয়ে কথাগুলি ফুঁপিয়ে ওঠে : "তা হলে দিও বাংলাদেশী তাঁতের শাড়ি আর ভেলভেটের হাল্কা স্লিপার। ওসব সম্পদ আমার নেই।"

"বেশ তো, কাল একবার সদর বাজারে গিয়ে পছন্দ মতো সব কিনে নিয়ে আসব।"

ড্রইং-রুম থেকে বের হয়ে তরতর করে সিঁড়ি ধরে উপরতলার ঘরে চলে গেল দেবনাথ।

দেখতে থাকে অমলিনা, দেবনাথের হাতে একটি ক্যামেরা দুলছে। কে জানে ওই ক্যামেরার কাঁচে সেকেন্দ্রার কোন্ বিকালের মায়া আর তাজের কোন্ ভোরের ছায়া ধরে নিয়ে আসছে দেবনাথ, আর লুকিয়ে বুকের ভিতর পুষে রাখছে!

কী অদ্ভুত! এ যে অমলিনা নামে এক নারীর জীবনটাকে হেসে হেসে তুচ্ছ করে, তার ফুলের রঙ আর গানের সুর পাল্টে দিয়ে, তার শাড়ির চেহারা বদলে দিয়ে অন্য কাউকে চোখের কাছে গড়ে তুলছে দেবনাথ। বেশ, তাই-ই হোক, দেবনাথের পছন্দের কাছে এইভাবে প্রতিক্ষণ নিজেকে লুপ্ত করে দিয়ে যদি ফুরিয়ে যেতে হয়, তাও ভাল। তবু সুখী হোক মানুষটা।

বাংলাদেশী তাঁতের শাড়ি পরে অমলিনা, ভেলভেটের হাল্কা স্লিপারও পায়ে দিতে ভুলে যায় না। অমলিনাকে নতুন সাজে সাজতে দেখে খুশি হয় দেবনাথ। কিন্তু কী আশ্চর্য, অমলিনার প্রাণটা যেন তার সব খুশির খোরাক হারিয়ে, শূন্য হয়ে শুকিয়ে যেতে চলেছে। ড্রইংরুমের নিভৃতে বসে যন্ত্রণায় ছটফট করে অমলিনা। সত্যিই কি দেবনাথ তার জীবনের সঙ্গিনী অমলিনার মুখের মধ্যে আর কারও মুখের ছবি দেখতে চায়? সন্দেহ করতে ইচ্ছা করে না। বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা করে, আগ্রার শ্বেতপাথরের বুকের ভিতরে এত ভয়ানক ভেজাল নেই।

রাত হয়েছিল। বড় চাঁদও উঠেছিল। বাড়ির বাগানের এক কোণে লাল পাথরের চৌকির উপর একা বসে ছিল দেবনাথ। অমলিনা হঠাৎ এসে একেবারে দেবনাথের গা ঘেঁষে বসে পড়ে : "আমাকে একটা ডাক দিতেও কি তুমি সময় পাওনি?"

"আমি জানতাম, তুমি নিজেই আসবে।"

"এতই যদি জান, তবে আমাকে কষ্ট দাও কেন?"

দেবনাথ আশ্চর্য হয় : "তোমাকে কষ্ট দিয়েছি?"

অমলিনা বলে, "থাক, এখন আর ওসব তর্কের কথা ভাল লাগে না।"

দেবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অমলিনা। খোঁপার হাসনুহানা কাঁপে, ঢাকাই তাঁতের আঁচল ফিসফাস করে এই নিরালার সব পুলক যেন আপন করে নিতে চাইছে। কী-যেন খুঁজছে অমলিনার স্নেহ-মাখানো কপালটা! আস্তে আস্তে দেবনাথের কাঁধে মাথাটা হেলিয়ে দেয় অমলিনা।

বেশ কিছুক্ষণ, কিন্তু দেবনাথ যেন এই নিরালার সব রঙীন মোহ ভুলে গিয়ে, সত্যিই আগ্রার শ্বেতপাথরের মতো সাদা হয়ে আর পাথর হয়ে বসে থাকে।

মাথা তোলে অমলিনা। দেবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে দু'চোখের দুটি তীক্ষ্ণ সন্দেহের জ্বালা ছুটিয়ে দিয়ে বলে, "কী হলো তোমার?"

দেবনাথ আশ্চর্য হয় : "কী হলো?"

"বুঝতে পারলে না?"

বুঝতে পেরে দেবনাথ হেসে ফেলে : "বুঝিনি, সত্যিই বুঝতে পারিনি অমলিনা। আমার বুকের উপর মাথা না রাখলে আমি বুঝতেই পারি না।"

ব্যস্তভাবে আর সতৃষ্ণ দুটি চক্ষু নিয়ে অমলিনার কপালের দিকে তাকায় দেবনাথ।

"থাক।" গায়ে যেন আগুনের ছোঁয়া লেগেছে। সরে যায় অমলিনা। তারপর ঘরের দিকে ছুটে চলে যায়।

ড্রইং-রুম শূন্য। কোন গুঞ্জন নেই। দেবনাথ আর অমলিনা, যে দুটি প্রাণের কলরব সন্ধ্যা-সকাল এই ঘরের ভিতরে অনেক হাসি হয়ে ঝরে পড়েছে, সেই দুটি প্রাণ এক মাসের মধ্যেও আর ভুলেও কাছাকাছি হয়নি, পাশাপাশি বসেনি, মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে কিনা সন্দেহ।

শুধু একটি কথা বলেছিল অমলিনা, "আমি এবার লখনউ চলে যাই।"

শুধু একটি কথা বলেছিল দেবনাথও, "আচ্ছা।"

সেই দিনটিই দেখা দিল। একটা সন্ধ্যা। এই সন্ধ্যায় এখনিই বেড়াতে বের হয়ে যাবে দেবনাথ। আর, এখনিই লখনউ রওনা হবে অমলিনা। বারান্দার এদিকে আর ওদিকে, ভিন্ন ভিন্ন দুটি ঘরে যে যার নিজের নিজের স্বপ্ন নিয়ে বসে আছে। যে যার নিজের পথে চলে যাবার আগে কারও সঙ্গে কারও একটি কথা বিনিময়ের কিংবা একটু মুখ-দেখাদেখির প্রয়োজনও যে আর নেই।

কলকল করে হেসে, চেঁচিয়ে আর লাফিয়ে দারোয়ানের হাত ধরে বাড়ি ফিরল টুটু আর ফুটু।

"কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?" প্রশ্ন করে দেবনাথ।

টুটু বলে, "গোয়ালিয়র রোডে কৃষ্ণাদির বাড়িতে।"

"কেন?"

ফুটু বলে, "কৃষ্ণাদির বিয়ে হয়ে গেল।"

চমকে ওঠে দেবনাথ। থরথর করে কেঁপে ওঠে মুখটা। দেবনাথের দু'চোখ ছিঁড়ে যেন একটা স্বপ্ন হঠাৎ পালিয়ে গিয়েছে।

টুটু-ফুটু তেমনই সারা বারান্দা ছুটোছুটি করে আর কলকল ভাষায় ফোয়ারা ছুটিয়ে বিয়েবাড়ির যত মজার গান, মজার সাজ আর মজার চেহারার গল্প ছড়ায়।

"কৃষ্ণাদির বর লখনউয়ের মিহিরবাবু।" চেঁচিয়ে ওঠে টুটু।

ঘরের ভিতর থেকে সেই মুহূর্তে ছুটে এসে বারান্দার কাছে দাঁড়ায় অমলিনা। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন নিজের নিশ্বাসের শব্দও শুনতে পাচ্ছে না অমলিনা।

টুটু-ফুটু চলে যায়। একেবারে নীরব হয়ে যায় বারান্দাটা। তবু দুই স্তব্ধ মূর্তি নিয়ে, যেন স্বপ্নহারা চোখের জ্বালা নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে।—এদিকে দেবনাথ ওদিকে অমলিনা।

অনেকক্ষণ পরে বড় চাঁদের আলো বারান্দার কার্পেটের উপর গড়িয়ে ছড়িয়ে যখন অদ্ভুত হয়ে যায়, তখন অমলিনার মুখের দিকে তাকায় দেবনাথ। অমলিনাও চুপ করে দেবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হঠাৎ একেবারে শান্ত হয়ে যায় দেবনাথের চোখের দৃষ্টি। "তুমি কি সত্যিই এখন লখনউ যাবে?"

"না। তুমি কোথায় যাবে?"

"কোথাও না।"

"তবে বেড়াতে যাও।"

"তুমিও সঙ্গে যাবে তো?"

"হ্যাঁ।"

তসরের পাঞ্জাবি আর পায়জামা নয়। দেবনাথ পরেছিল সেই টুইলের শার্ট আর খাকি জিনের

ট্রাউজার। তাঁতের শাড়ি নয়, খোঁপাতে হাসনুহানাও নয়, অমলিনা পরেছিল তার সেই রঙীন মসলিন, আর খোঁপায় ছিল সূর্যমুখী।

দুজনে সেই সন্ধ্যাতে পাশাপাশি হেঁটে হেসে হেসে গল্প করতে করতে তাজ রোড ধরে এগিয়ে যেতে থাকে।

মায়া মানিক

মানিক আর মানিক স্টোর্সের বয়স সমান। একই দিনে মানিক আর মানিক স্টোর্সের জন্ম। কিন্তু বয়সটা কত?

মাত্র তিন বছর। বিগত তিনটি বছরের বাতাসে একটু একটু করে বড় হয়ে মানিক আজ চার বছরে পা দিল। আজ মানিকের জন্মদিন।

কিন্তু মানিক স্টোর্সেরও কি জন্মদিন? বিগত তিনটি বছরের বাতাসে একটু একটু করে কেমনতর হয়ে শেষ পর্যন্ত কি হয়ে গেল মানিক স্টোর্স, সে কথা আপাতত থাক।

আজ আবার সেই এগারই চৈত্রটি দেখা দিয়েছে, আজ থেকে তিন বছর আগে যেদিনে মানিক আর মানিক স্টোর্স দেখা দিল পৃথিবীতে।

তিন বছর আগের সেই অদ্ভুত একটা দিনের ইতিহাসই সবার আগে বলে নিতে হয়। এই পাড়ার এবং এই ঘরেরই জানালার কাছে বসে তিন বছর আগের সেই এগারই চৈত্রকে দু'চোখের বিস্ময় দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছিল নরেন, এবং বুঝতেও পেরেছিল।

আকাশের রঙটা যেন কেমন-কেমন মনে হয়; মল্লিকবাবুদের বাগানে মস্ত বড় অশ্বত্থের মাথায় বুকে ও কোলে লক্ষ লক্ষ নতুন পাতা ঝিরঝির করে। দেখা যায়, ঘুঁটেওয়ালির ঘরের চালা ছাপিয়ে মালতীর লতা নরেনের বাড়ির উঠোনের উপর এসে নেমে পড়েছে। বাতাসের গা থেকে দুপুরের জ্বালা পালিয়ে যায়, হঠাৎ কেমন মিষ্টি মিষ্টি আর ফুরফুরে হয়ে ওঠে। বড় অদ্ভুত এই দিনটা। আর অদ্ভুত, অশ্বত্থের এই লক্ষ লক্ষ কচি পাতার ভিড়। যেন লক্ষ লক্ষ শিশুপ্রাণের কতগুলি পিপাসী ওষ্ঠ। যেমন কোমল, আর রঙটাও তেমনি, নতুন শোণিতের আভার মতো।

হঠাৎ শাঁখের শব্দ বেজে ওঠে পাশের ছোট ঘরটার ভিতর। সে শব্দে রঙিন হয়ে ওঠে নরেনের মুখ। ঐ শাঁখের শব্দে এগারই চৈত্রের সমস্ত আলো ছায়া আর শব্দগুলি যেন একটা ফুল হয়ে ফুটে উঠল।

ছোট বাড়ি, ছোট দুটি ঘর, এবং ছোট একটা উঠোন। পাড়াটাও ছোট, এবং প্রতিবেশীরাও ছোট ছোট মানুষ। কিন্তু এইসব ছোটতার মধ্যেই মুহূর্তের ভিতরে মস্ত বড় একটা জগতের গর্ব এনে দিল ঐ শাঁখের শব্দ।

ছোট ঘরের ভিতর প্রতিবেশিনী মেয়েদের ভিড়। উঠান ভরা কলরব আর চাঞ্চল্য। সব শব্দের স্নায়ুজাল জড়িয়ে একটা নবাগত প্রাণের কান্না থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

ধাই এসে ডাক দেয়—কই গো ছেলের বাপ? ছেলের কপালে সোনা ছুঁইয়ে মুখ দেখে যাও।

বাক্স হাতড়ে সোনা খোঁজে নরেন। সত্যিই তো, এই আনন্দকে সোনা ছুঁইয়ে অভ্যর্থনা করাই তো উচিত।

আরও বেশি আহ্লাদের সুর ছড়িয়ে ধাই ছড়া কাটে—মানিক এল ঘরে। এ মানিক যেমন তেমন নয়, মানিকের ছোঁয়া লেগে ধুলো সোনা হয়।

ধাইয়ের ছড়া বর্ণে বর্ণে বিশ্বাস করতে পারে নরেন। মনে হয়, একটুও বাড়িয়ে বলেনি ধাই। ছেলের কপালে সোনা ছুঁইয়ে ঘরের বাইরে এসে একবার দাঁড়ায় নরেন, যদিও আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার সময় ছিল না। কারণ, আজ তার জীবনের আর একটা সোনা-ছোঁয়ানো আকাঙ্ক্ষার প্রতিষ্ঠার দিন।

এই ছোট পাড়া থেকে বেশ কিছুটা দূরে বাজারের দিকে অনেকখানি এগিয়ে যাবার পর, পথের পাশে সারি সারি অনেকগুলি টিনের একচালা ঘর দেখা যায়। এর মধ্যে একটি একচালা ঘর ভাড়া নিয়েছে নরেন। নরেনের দোকান। রকমারি পুতুল, লেস, ফিতা, আলতা, এসেন্স, বিস্কুট, লজেন্স ও চকোলেটের সম্ভার রাধাবাজারের মহাজনের আড়ত থেকে চলে এসেছে। মহাজনের লোক এবং মুটে অনেকক্ষণ থেকে দোকানী নরেনের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

ছোট একটি মাটির গণেশ, কিছু ফুল এবং একটি ধূপদান হাতে নিয়ে একচালা ঘরের কাছে এসে থামল নরেন। জিনিসপত্র বুঝে নিয়ে মহাজনের লোককে বিদায় দিল। ধূপ জ্বালিয়ে সিদ্ধিদাতা গণেশের পায়ের কাছে সোনার একটা কুচি এবং ফুল রেখে প্রণাম করে নরেন। খেরো বাঁধানো একটা খাতার উপর চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বার বার তিনবার প্রণাম করে।

টিনের চালা এবং কাঁচা ইঁটের দেয়াল, ছোট্ট এই দোকান ঘরকে ভরে তুলতে খুব বেশি জিনিসের দরকার হয় না। সব জিনিস সাজিয়ে ফেলতে খুব বেশি সময়ও লাগে না।

দোকান সাজানো হলো। হ্যাঁ, আর একটি কাজ বাকি আছে। দোকানের একটা নামকরণ। খুব পয়া নাম দিতে হবে, যে নামের দৈবী প্রভাবে নরেনের জীবনের সব দীনতা ঘুচে যাবে। ভাগ্যের দুয়ার খুলে যাবে যে নামের অমোঘ গুণে, সেইরকম একটি সোনামাখানো নাম চাই। যে নাম নরেনের কারবারী আকাঙ্ক্ষাকে লাভে-লাভে সোনা করে দেবে, সেইরকম একটি সর্বশুভ নাম।

এগারই চৈত্রের আত্মাটা যে আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছে, সেই আনন্দেই কে যেন নরেনের বুকের ভিতরে মুখ এগিয়ে দিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলে গেল—ওর নাম মানিক।

জ্বলন্ত ধূপকাঠি সৌরভ ছড়ায়। চুপ করে ভাবতে থাকে নরেন। তার পরেই প্যাকিং-বাক্স থেকে একটা তক্তা খুলে নিয়ে তার উপর আঠা দিয়ে সাদা কাগজ সেঁটে দেয়। নীল-লাল পেন্সিল দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লেখে—মানিক স্টোর্স।

ছেলের নাম মানিক এবং দোকানের নাম মানিক স্টোর্স। নরেনের জীবনে দুটি সৌভাগ্যের আবির্ভাব-দিবস হলো এই এগারই চৈত্র। দুটি সোনা-ছোঁয়ানো ঘটনার নামকরণের দিবস হলো এই এগারই চৈত্র।

মানিক আর মানিক স্টোর্স যেন দুটি যমজ ভাই। ভূমিষ্ঠ হয়েছে একই দিনের এক সকালে, একই সোনা-ছোঁয়ানো আশার শঙ্খধ্বনির সঙ্গে। সত্যি সত্যিই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে নরেন, সুখের দিনের শুরু হলো এবার। না হয়ে পারে না। নইলে, দুটি সম্পদের আবির্ভাব কেন এমন করে প্রায় লগ্নে লগ্নে মিলে যায়?

মানিক স্টোর্সও দেখতে মানিকের মতোই, ছোট্ট অথচ বড় সুন্দর করে সাজানো। সন্ধ্যাবেলা

আলো জ্বেলে মানিক স্টোর্সের রঙিন রূপের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যায় নরেন। কত জিনিস ধরেছে এইটুকু জায়গার মধ্যে! পাঁচ টাকা দামের চীনে মাটির ফুলদান থেকে শুরু করে এক পয়সা দামের রাংতার রিস্টওয়াচ। রঙিন রবারের বেলুন দুলতে থাকে, দার্জিলিং পাথরের রঙিন মালা ঝুলতে থাকে, কাগজের বাঘের লাল জিভ লক্‌লক্ করে। রাত হলে বাতি নিভিয়ে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে যখন বাড়ি ফিরবার জন্য তৈরি হয় নরেন, তখন মনটাও কেমন যেন একটু ভার ভার বোধ হয়। ছোট্ট মানিক স্টোর্সকে এভাবে সারা রাত একা একা অন্ধকারের মধ্যে রেখে দিয়ে চলে যেতে ভাল লাগে না। বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখতে পায় নরেন, মানিক তার ছোট্ট নরম বিছানায় ঘুমিয়ে রয়েছে।

মানিক আর মানিক স্টোর্সের মধ্যে মায়ার পার্থক্য করতে চায়নি নরেন। করবার দরকারই বা কি? ওরা হলো নরেনের জীবনের একই লগ্নে আবির্ভূত একই ভাগ্যের দুটি আশীর্বাদ।

ভবিষ্যত্‌টাকেও খুব সহজে হিসাব করে বুঝতে পারে নরেন। খুব বেশি করে নয়, খুব কম করেই লাভের অঙ্কগুলিকে কল্পনা করে। প্রথম বছরের বিক্রিতে লাভ যা হবে, তাতে শুধু খরচটাই উঠে আসবে। এর বেশি আশা করা উচিত নয়। দ্বিতীয় বছরটায় ভাল লাভ হবেই হবে। মাসে অন্তত এক মণ বিস্কুট কেটে যাবেই, এবং তাতে লাভের হিসাবে প্রতি ম্যাসে চলে এল কুড়ি-বাইশ টাকা। এই রকমের আরও তো পঁচিশটি বড় রকমের চলতি মাল রয়েছে। রকম পিছু যদি মাসে দশ টাকা করেও লাভ আসে, তবে সারা মাসের লাভ হবে গিয়ে...ভালই তো হবে।

হবেই তো, কোন সন্দেহ নেই নরেনের মনে। মানিক স্টোর্স, তার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর ও সুপ্রসন্ন দিবসের আত্মার নামে, তার ছেলের নামে নাম দেওয়া হয়েছে এই দোকানের। লাভ হবেই হবে, ঐ মানিক নামের মধ্যেই সব সাফল্য ও উন্নতির যাদু লুকিয়ে রয়েছে।

—কমলা, কমলা ও ছেলের মা! ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

চেঁচিয়ে ডাক দেয় নরেন। কমলা কাছে আসতেই নরেন বলে—আর ভাবনা করি না।

কমলা—কিসের ভাবনা?

নরেন—টাকা-পয়সার ভাবনা।

কমলা—বড়লোক হয়েই গেছ নাকি?

নরেন—হইনি, হবো।

কমলা—হও।

নরেন—হবোই তো।

গলার স্বর একটু নামিয়ে ফিসফিস করে নরেন বলে—আমার কেমন একটা বিশ্বাস হয়ে গেছে কমলা, মানিকের নামে যখন দোকানের নাম দিয়েছি, তখন লাভ হবেই। এ দোকান জমে উঠবেই।

কমলা বলে—আমারও তাই মনে হয়।

মানিক স্টোর্সের প্রথম পাঁচ মাসের বিক্রির হিসেব করতে গিয়ে অনেক যোগ-বিয়োগ আর গুণ-ভাগের অঙ্কে খাতা ভরে ফেলল নরেন। বোঝা গেল, লাভ তেমন কিছু হয়নি, ক্ষতিও তেমন কিছু নয়। কিন্তু প্রথম পাঁচ মাসে এর চেয়ে আর কি বেশি আশা করা যায়?

এক গুচ্ছ ধূপকাঠি জ্বালিয়ে এবং মাটির গণেশের চার দিকে ধুনোর ধোঁয়া বার করে ছড়িয়ে

নরেন তার খেরো বাঁধানো খাতাটার উপর বার বার মাথা ঠেকায়। মনে পড়ে, পূজা আসতে আর বেশি দেরি নেই। এইবার বাজার জমবে। বিক্রির জোর খুব বেশি হলে একটা চাকর না রেখে পারা যাবে না।

পাশের দোকানে আলুওয়ালা অমূল্যকে ডাক দিয়ে নরেন প্রশ্ন করে—ও অমূল্যদা, একটা লোক দিতে পার? শুধু সকাল আর সন্ধ্যেটা আমাকে একটু সাহায্য করবে।

অমূল্য আশ্বাস দেয়—লোকের আর অভাব কি?

কিন্তু পূজাও এল, এবং পূজার বাজারও জমল। তবে মানিক স্টোর্সকে তার জন্য একটুও ব্যস্ত হবার কারণ দেখা দিল না। এদিকে নয়, এ রাস্তাতেও নয়, পূজার সাড়া জাগল গিয়ে একেবারে ঐদিকে, মোড় পার হয়ে, বড় বড় নতুন স্টলের লাইনে।

ছোট মানিক স্টোর্সে গ্যাসবাতি জ্বলে অনেক রাত পর্যন্ত। অনেক ধূপকাঠি পোড়া এবং ধুনোর ধোঁয়াতে ছোট দোকান-ঘরের বাতাস বড় বেশি পবিত্র হয়ে যায়। কিন্তু কোন গ্রাহকের পদধ্বনি এ দোকানের কাছে এসে থামে না। পথচারীর দল যেন সন্ন্যাসীর মতো নির্বিকার দৃষ্টি দিয়ে মানিক স্টোর্সের এত রঙিন সমারোহের দিকে তাকাতে তাকাতে চলে যায়। সবারই লক্ষ ঐ মোড়ের দিকে। সেই বড় বড় স্টল, যেখানে রেডিও বাজে, পাখা ঘোরে, এবং জিনিস তো নয়, জিনিসের পাহাড় যেন থরে থরে সাজানো রয়েছে।

কিন্তু এক পূজাতেই তো বাজারের ইতিহাস ফুরিয়ে যায় না। আসছে বছরও পূজা আসবে। মানিক স্টোর্সের এই ছয় মাসের পরিণামকেই ভাগ্যের চরম বলে মেনে নিতে রাজি নয় নরেন। দুর্বল নয় নরেন। আশা করবার সাহস এত সহজে ফুরিয়ে দেবার মানুষ নয় নরেন।

আর এক পূজা আসবার আগেই এগারই চৈত্র দেখা দিয়ে চলে গেল।

বড় হয়েছে, এবং আরও ফুটফুটে হয়েছে মানিক। এবং মানিক স্টোর্স আর একটু রঙিন হয়েছে, ধারে কেনা নতুন নতুন রাধাবাজারী মনোহারী সম্ভারে। জন্মদিনের উৎসবে চন্দনের ফোঁটা পড়েছে মানিকের কপালে এবং মানিক স্টোর্সের সাইনবোর্ডে।

লাভ-লোকসানের হিসাব খতিয়ে দেখেছে নরেন। হিসাবের অঙ্কগুলির দিকে তাকিয়ে যদিও বিষণ্ন হয়েছে, তবুও আশা ছাড়েনি, বরং আরও বেশি করে ধূপকাঠি জ্বালিয়েছে। বিশ্বাস করে নরেন, এ লোকসানের বিভীষিকা আর বেশি দিন থাকবে না।

লোকসানের বিভীষিকাকে দূরে সরিয়ে দেবার একটা উপায়ও অনেক চিন্তা করে খুঁজে বের করেছে নরেন। এবার থেকে প্রতিদিন সকালে মানিককে কোলে করেই দোকানে নিয়ে আসে। দোকানের মাঝখানে ছোট একটা বাক্সের উপর মানিককে বসিয়ে রাখে। একটা কাঠের ঘোড়া নিয়ে খেলা করে মানিক। ঘন্টাখানেক পরে ঘুঁটেওয়ালি এসে মানিককে কোলে করে বাড়িতে নিয়ে যায়।

বিশ্বাস করে নরেন, মানিক এসে এইভাবে একবার এই দোকানের বাতাস স্পর্শ করে গেলে, দোকানের বিক্রি বাড়বে। এবং বিশ্বাসের পরীক্ষাতেই আরও একটা বছর কেটে গেল। আবার এগারই চৈত্রের সকালবেলায় মানিকের কপালে এবং মানিক স্টোর্সের সাইনবোর্ডে চন্দনের ফোঁটা পড়ল।

কিন্তু বিক্রি বাড়েনি। দোকান ভাড়া বাকি পড়েছে। মহাজন কড়া তাগিদ দিয়ে গিয়েছে। মহাজনের একটা কিস্তি শোধ করতে গিয়ে কমলার গলার হারটা বেচে দিতে হয়েছে।

আজকাল আর মানিককে সঙ্গে নিয়ে আসে না নরেন। কিন্তু আজকাল আরও বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠেছে নরেন। ভোর হতে না হতে এসেই দোকানের ঝাঁপ খুলে ধূপ জ্বালে। দিনে দু'বার করে ধুলো-ময়লা মুছে মানিক স্টোর্সকে আরও তকতকে এবং ঝকঝকে করে রাখে। রোগী শিশুর পিতা যেমন মনের উদ্বেগে ঘুমোতে পারে না, প্রায় সেইরকমই দশা হয়েছে নরেনের। ছোট রঙিন মানিক স্টোর্স, শিশুর মতোই তো দেখতে, এবং রোগেও ধরেছে। উদ্বিগ্ন বিষণ্ণ ও ব্যস্ত না হয়ে পারে না নরেন।

কিন্তু কি নিষ্ঠুর রোগ! মুক্তির কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ধারের উপর ধার বেড়েই চলেছে। মহাজন মামলার ভয় দেখিয়ে গিয়েছে। বাড়িওয়ালা অপমান করেছে। কমলার গায়ের সোনা এক এক করে বেচে দিয়ে কোনমতে আজও মানিক স্টোর্সকে রঙিন করে রাখবার খরচ যুগিয়ে চলেছে নরেন। আলুওয়ালা অমূল্যদাও বিরক্ত হয়ে বলে—ও নরেন, এমন দোকান কি না রাখলেই নয়?

কি আশ্চর্য, তবুও মানিক স্টোর্সের উপর একটুও রাগ হয় না নরেনের। দোষ মানিক স্টোর্সের নয়। কোথায় যেন একটা ভয়ানক ভুল হয়ে গিয়েছে, তারই জন্য মানিক স্টোর্সের এই দুর্ভাগ্য। যে বিশ্বাসটা বলতে গেলে এতদিন ধরে নরেনের বুকের প্রতি অস্থি জড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছিল, সেই বিশ্বাসটাই ভাঙতে আরম্ভ করেছে। তাই সন্দেহ, মানিক স্টোর্সের ভাগ্যের সঙ্গে একটা অপয়া স্পর্শ মিশে রয়েছে নিশ্চয়, নইলে...নইলে...এমন করে সব আশা চূর্ণ হয়ে যাবে কেন?

সন্দেহটাই ক্ষণে ক্ষণে মনের ভিতর প্রশ্ন জাগায়—কিসের অপয়া স্পর্শ? কার স্পর্শ? কালো ছায়া দিয়ে তৈরি একটা কুৎসিত মুখ যেন ফিসফিস করে বলে—নিজের ছেলে হলে হবে কি? ঐ তোমার ছেলেটিই যে অপয়া। হিসেব করে দেখ, সেই এগারই চৈত্রের পর থেকে আজ পর্যন্ত কপাল তোমার পুড়েই চলেছে। ক্ষতি আর ক্ষতি, লোকসান আর লোকসান। ছেলের নামে দোকান করেছে, ঐ নামটা যে অপয়া।

ভাবতে গিয়ে কপাল টিপে ধরে নরেন। কি দুর্ভাগ্য, এমন সন্দেহও মানুষের হয়! মাঝে মাঝে নিজের মাথাটাকেই সন্দেহ করে নরেন, খারাপই হয়ে গিয়েছে বোধহয়।

তবু, এমন সন্দেহের একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলাই উচিত। আবার একদিন মানিককে কাজলের টিপ পরিয়ে আর মুখে পাউডার মাখিয়ে দোকানে নিয়ে গেল নরেন।

রঙিন মানিক স্টোর্স। একটু নতুন জগতের আস্বাদ পেয়ে নতুন করে চঞ্চল হয়ে উঠল মানিকের কৌতূহল-দুরন্ত দুটি চোখের দৃষ্টি আর দুটি ছটফটে হাত। প্রথমেই নাটাই-করা লালরঙা রিবন আর ফিতেগুলিকে খুলে তছনছ করে মানিক। তারপরেই সোনালী রঙের কাগজে জড়ানো লজেন্সের বয়ামের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল। মানিকের চঞ্চল হাত ক্ষান্ত হয় না। তাকের উপর থেকে কতগুলি টিনের বাঁশি এক থাবা দিয়ে ঠেলে নিচে ফেলে দিল মানিক। নিষ্পলক ও সতর্ক দুই চক্ষুর দৃষ্টি তুলে নরেন লক্ষ্য করতে থাকে, কোন্ কোন্ জিনিস স্পর্শ করছে মানিকের হাত, ঐ মিষ্টি মিষ্টি এবং মায়াকোমল দুটি কচি কচি হাত।

ঘুঁটেওয়ালি এসে মানিককে নিয়ে যায়। সারাদিন ধরে দোকানদারি করে নরেন। সন্ধ্যা পার

হলো, রাতও বেশ হলো। এইবার তার সন্দেহের হিসাবটাও বেশ সাবধানে যাচাই করে নিল নরেন। ঠিকই হয়েছে, কোন ভুল নেই। যে জিনিসগুলি মানিক আজ সকালে ছুঁয়ে দিয়ে গিয়েছে, ঠিক সেই জিনিসগুলিই আজ বিক্রি হয়নি। এক পয়সার একটা টিনের বাঁশিও বিক্রি হয়নি। এইটুকু ছেলের কতটুকু দুটো হাত, কিন্তু ভয়ানক হাত।

ঝাঁপ বন্ধ করার আগেই বাড়িওয়ালা ও রাধাবাজারের তিন মহাজন দোকানের সামনে উগ্রমূর্তি নিয়ে উপস্থিত হয়। মহাজন গালি দিয়েই বলে—একে দোকানদারি বলে, না চুরিবাজি বলে? মহাজনের টাকা আটক করে কারবার ফলাচ্ছ, এ কেমন ধারা কারবার হে?

নরেন বলে—টাকা নেই তো দেব কেমন করে?

মহাজন—তবে মাল ফেরত দাও।

নরেন—তাই দেব।

মহাজন—কবে?

নরেন—কাল সকালে। খুব সকালে।

আলো নিভিয়ে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করার সময় শো-কেসের কাচটা চিক্‌মিক্ করে উঠতেই মুখ ফিরিয়ে পিছনের দিকে তাকায় নরেন। পার্কের মাঝখানে একটা তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে, তার উপর একটা ভাঙা চাঁদ, এবং তারই জ্যোৎস্নায় এসে ছুঁয়েছে মানিক স্টোর্সের শো-কেসের কাচ। ব্যস্, এই তো শেষ। মানিক-স্টোর্সের জীবনকে আর কোন রাতের জ্যোৎস্না ছুঁতে আসবে না।

চাঁদটাও চেনা-চেনা। আজ তারিখটা কত? এক মুহূর্তেই মনে পড়ে যায়, আজ হলো দশই চৈত্র এবং চাঁদটা হলো সেই এগারই চৈত্রের আগের রাতের চাঁদ।

রাত ফুরোতেই দেখা দিল সেই প্রত্যাশিত কাল! চৈত্র মাসের এগার। কমলাকে কোন কথা না জানিয়ে, এবং সূর্য ওঠবার আগেই বের হয়ে গেল নরেন।

রাধাবাজারের তিন মহাজন এবং বাড়িওয়ালা আরও ভোরেই এসে দাঁড়িয়েছিল নিঃশব্দ ও ঘুমন্ত মানিক স্টোর্সের সম্মুখে। ঝাঁপ তুলে দোকান খুলেই দু'হাত দিয়ে হিড়হিড় করে জিনিসসুদ্ধ একটা তাক নামিয়ে ফেলে নরেন।

মহাজন বলে—আহা, এলোমেলো করো না। আমরাই লিস্টি করে ফেলেছি, তুমি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ।

জিনিসপত্রের লিস্টি করতে এবং দামের হিসাব করতে খুব বেশি সময়ও লাগল না। তিন মহাজন ও বাড়িওয়ালা হিসেব করে মাল ভাগাভাগি করে ফেলে। বাড়িওয়ালা বলে—তাহলে নরেন, এইবার তোমার কাছে পাওনা গিয়ে দাঁড়ালো মোটমাট বাষট্টি টাকা বারো আনা।

উত্তর দেয় না নরেন। তাকিয়ে দেখে 'মানিক স্টোর্স' সাইনবোর্ডটা ঝুলছে। যেন চিতায় চড়ানো মানুষের মুখটা এখনো দেখা যাচ্ছে, পুড়ে ছাই হয়ে যায়নি। এক লাফ দিয়ে একটা টুলের উপর উঠে দাঁড়ায় নরেন। এক টান দিয়ে সাইনবোর্ডটাকে খুলে নিয়ে মাটির উপর ছুঁড়ে দেয়। সাইনবোর্ডের লোহার আংটাটা ক্ষীণ আর্তনাদ করে দূরে ছিটকে পড়ে।

আলুওয়ালা অমূল্যদা ডাকে—ও নরেন, এখানে এসো বসো।

বসল না নরেন, বাড়ির দিকেই ফিরে চলল। যেন জীবনের এক রঙিন আকাঙ্ক্ষার শব চিতায়

তুলে দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে চলে যায় এক শোকার্তের মূর্তি।

ঘরে ঢুকেই মেঝের উপর মাদুর পেতে শুয়ে পড়লো নরেন।

কমলা কাছে এসে বিস্মিতভাবে বলে—শরীর খারাপ হলো না কি?

নরেন—শরীর খুব ভালো।

কমলা—তবে ওঠো?

নরেন—কেন?

কমলা হাসে—কেন, মনে পড়ছে না?

নরেন—না।

শুয়ে শুয়েই পাশ ফিরে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় নরেন।

কমলা বলে—মানিকের জন্য নীল রঙের একটা কামিজ কিনে নিয়ে এস।

নিরুত্তর নরেনের গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা দিয়ে কমলা আবার বলে—আর, আধ সের বাতাসা।

নরেন ঘাড় ফিরিয়ে তিক্তস্বরে প্রশ্ন করে—কিসের জন্য?

কমলা বিস্মিতভাবে বলে—আজ তোমার মানিকের জন্মদিন।

মাদুরের উপর উঠে বসে নরেন। কমলার দিকে আর একবার তীব্রভাবে তাকিয়ে বলে—আজ হলো আমার মানিক স্টোর্সের মৃত্যুদিন।

আর্তনাদ করে নরেনের হাত চেপে ধরে কমলা—কি হয়েছে, বলো। বাড়িয়ে বলো না।

নরেন—দোকান উঠে গেল।

আস্তে আস্তে চলে গিয়ে রান্নাঘরে উনানের কাছে এসে বসে কমলা। হাঁটুর উপর কপাল চেপে চুপ করে বসে থাকে। উনানের উপর হাঁড়িতে জল ফুটতে থাকে টগবগ করে। চাল ছাড়তে হবে, একেবারেই মনে পড়ে না। উঠানের দিকে তাকিয়ে কমলার উদাস চোখের দৃষ্টিটাও যেন স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপরেই কেঁদে ফেলে কমলা।

যেন কাঁদছে এগারই চৈত্র। ছেলে-হারানো মায়ের কান্নার মতোই করুণ।

ওদিকে উঠানের উপর ঘুরে ফিরে নিজের মনে খেলা করে মানিক। ঘুঁটেওয়ালির মালতী লতা ধরে একবার ঝাঁকুনি দেয়। প্রজাপতি আর ফড়িং ছটফট করে পাতার আড়াল থেকে উড়ে পালিয়ে যায়। দাওয়ার উপর খাঁচার ভিতর থেকে পোষা টিয়া কর্কশস্বরে মানিককে ধমক দেয়—ওরে ও ছেলে! খবরদার!

যেন একটা অপয়া অলুক্ষুণে দিনকে কর্কশ স্বরে ধমক দিচ্ছে খাঁচার টিয়া। মাদুরের উপর শুয়ে শুধু ছটফট করে নরেন, যেন গাড়ির চাকায় চাপা পড়া একটা আহতের শরীর ছটফট করছে। সেই এগারই চৈত্রকে ভালবাসার শক্তি খুঁজে পাচ্ছে না নরেন, যে এগারই চৈত্রের মায়ালী বাতাস সোনালী স্বপ্ন ছড়িয়ে দিয়েছিল নরেনের চোখে।

বেলা বাড়ে। রোদ তেতে ওঠে। এতক্ষণে কান্না থামিয়েছে কমলা। একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে এই বাড়ির বাতাস। যেন একটা কাঁটা বিঁধেছে এগারই চৈত্রের বুকের ভিতর, তাই তার সব মায়া ফুটো বেলুন-খেলনার বাতাসের মতো বের হয়ে গিয়েছে। মল্লিকবাবুদের অশ্বত্থ ঝির্‌ঝির্‌ করে, তবু কোন উৎসবের ইচ্ছা যেন জেগে উঠতে পারছে না নরেনের চোখের দৃষ্টিতে।

ওঘর থেকে মাঝে মাঝে কমলা উঠে এসে একবার এই ঘরের মাদুরের কাছে দাঁড়ায়। কোন

কথা বলে না কমলা, নরেনও কিছুই জিজ্ঞাসা করতে পারে না। চলে যায় কমলা।

বিকেল হয়ে আসছে, ধীরে ধীরে ফুরিয়ে যেতে চলেছে এগারই চৈত্রের দিনের আলোক। যেন এই বাড়ির বিষাদ দেখে ভয় পেয়ে চুপ করে দূরেই সরে রয়েছে মানিকের জন্মদিনের আনন্দ। নরেন আর কমলা, রাধাবাজারী খেলনারই মতো দুটি প্রাণ ভাগ্যের ফাঁকি সহ্য করতে না পেরে যেন এইবার নিজেকেই ফাঁকি দিয়ে মিথ্যে করে রাখবার চেষ্টা করছে। নাই বা হলো মানিকের জন্মদিন। না হলে ক্ষতি কি? আর হলেই বা লাভ কি?

মাদুরের উপর উঠে বসে নরেন। যেন নিজেরই বুকের ভেতরে একটা লজ্জার আর্তনাদ শুনতে পেয়েছে নরেন। একটা দোকানকে ছেলের মতো ভালোবেসে আর ছেলেকে দোকানের মতো ভালবেসে একি একটা যাচ্ছেতাই মনের অবস্থা হয়েছে, বুঝতে পেরে নিজেরই উপর রাগ করে নরেন।

কিন্তু এমন রাগেই বা লাভ কি? এমন একটা মিষ্টি শব্দও বাজে না এই ঘরের বাতাসে যে, নরেনের মনের এই অদ্ভুত রাগগুলিকে হাসিয়ে দিতে পারে। খাঁচার টিয়াটাও বোধহয় ঝিমোতে শুরু করেছে।

ইচ্ছা করে নরেনের, এখনি উঠে গিয়ে হৈ হৈ করে কমলাকে ব্যস্ত করে তুলতে, আর মানিকের জন্মদিনের আয়োজন করতে। চন্দন ঘষতে, ফুল আনতে আর বাতাসা দিয়ে পায়েস তৈরি করতে। কিন্তু কেমন যেন একটা বিশ্রী অভিমানে মনের ইচ্ছাটাই শক্তি হারিয়ে অবসন্নের মতো পড়ে রয়েছে। বড় অস্বস্তি। ঘর থেকে বের হয়ে ক্লান্তের মতোই ভিতরের দাওয়ার উপর এসে বসে থাকে নরেন।

চমকে ওঠে নরেনের চোখ। দাওয়ার উপর এক কোণে বসে খেলা করছে মানিক। কিন্তু ও কি রকম খেলা! এগারই চৈত্র যেন ঠাট্টা করে নরেনের মনের বাজে শোকগুলিকে একেবারে হাসিয়ে দেবার জন্য খেলা জমিয়ে বসেছে। খাঁচার টিয়াও হঠাৎ চিৎকার করে—ওরে ও ছেলে, ওকি?

টুক্‌রো-টুক্‌রো কাগজ, কতগুলি দেশালাইয়ের খোল, কতগুলি কাঁকর, মালতীলতার কতগুলি পাতা, দুটো ইঁট এবং আরও পাঁচ-সাত রকমের আবর্জনা সাজিয়ে বসে আছে মানিক।

চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে নরেন। তার পরেই গলা-ভাঙা স্বরে প্রশ্ন করে নরেন—এ কি হচ্ছে মানিক?

মানিক উত্তর দেয়—আমার দোকান।

হাসতে গিয়ে চোখে হাত দেয় নরেন। মানিক আবার বলে—ভাল চকোলেট আছে বাবা।

নরেন বলে—দাও, দু'পয়সার চকোলেট দাও।

দুটো কাঁকর নরেনের হাতে তুলে দিয়ে মানিক বলে—খাও।

খাওয়ার ভঙ্গি করে নরেন বলে—খেয়েছি।

মানিক প্রশ্ন করে—মিষ্টি?

নরেন বলে—খুব মিষ্টি বাবা।

চোখের কোণ দুটো মুছবার জন্য হাত তুলেই দেখতে পায় নরেন, কমলা এসে দাঁড়িয়েছে।

কমলার বিষণ্ণ মুখ সুস্মিত হয়ে ওঠে।—এ আবার কোন্ খেলা হচ্ছে?

নরেন বলে—দোকান দোকান খেলছি।

তারপরেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে নরেন। এলোমেলোভাবে ঘরের এদিক থেকে ওদিক যায় আর আসে। জামার পকেটে হাত দেয়।

কমলা আস্তে আস্তে বলে—বোধহয় ভুলেই গিয়েছ যে...।

নরেন বলে—মোটেই ভুলিনি। কি-যেন কি-রঙের জামার কথা বললে তুমি? নীল রঙের?

কমলা বলে—হ্যাঁ।

মানিকের কপালে জন্মদিনের আনন্দ এঁকে দেবার জন্য চন্দন খোঁজে কমলা, আর নীল-রঙের জামা কিনতে চলে যায় নরেন।

শিবালয়

সম্মুখে শালের বন, পেছনে তাল আর খেজুরের ছোট ছোট কুঞ্জ, বড় সড়কটা এইখানে এসে ডানদিকে খুব জোরে বেঁকে গেছে। এই বাঁকের ওপর একটা বস্তি। বস্তির মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘরটা হলো মুদি অনন্তরামের দোকান।

এই পথের মোড়, এই নতুন সরাই নামে ছোট বস্তিটার মধ্যেই অনন্তরামের দোকান। পথের উত্তরে ও দক্ষিণে পঁচিশ মাইলের মধ্যে এই একটি পান্থশালার ছায়া ও আলোক।

নামে মুদির দোকান, কিন্তু চাল ডাল ছাতু আর কেরোসিন তেল নয়—জঙ্গলের পথে যত যাত্রী যায়, সবারই পক্ষে এই দোকানটি সকল প্রয়োজনের কল্পতরু। এখানে যা আছে, তা তো পাওয়া যাবেই। তা ছাড়া যা আশা করা যায় না, তাও পাওয়া যায়, শুধু অনন্তরামের কাছে অনুরোধ করলেই হলো।

যাত্রী বোঝাই বাস থামে। চা, সরবত, ছাতু, যা দরকার সবই পাওয়া যাবে। কেউ হয়তো জ্বরের জ্বালায় ধুঁকছেন, শুধু বিশ্বাস করে চাইলে অনন্তরামের কাছে দু'চারটে কবরেজী বড়ি পাওয়া যাবে। এক-একদিন মোটর বাস পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যায়। নিষ্ঠাবান কোন পাঁড়েজীর আহ্নিকের সময় পার হয়ে যেতে বসে। কিন্তু চাইলেই অনন্তরামের কাছে পুজোর উপকরণ সবই পাওয়া যায়—কোশা কুশী ঘট গঙ্গাজল।

হ্যাঁ, পয়সা নেয় অনন্তরাম। কিন্তু শুধু পয়সা রোজগারের জন্যই সে সব সময় তৈরী হয়ে রয়েছে, একথা বিশ্বাস করা উচিত নয়। নইলে গ্রীষ্মের সময়, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তৃষ্ণার্ত যাত্রীর জন্য কলসী ভরে এত জল সাজিয়ে রাখতো না অনন্ত। জল দিতে দিতে অনন্তরাম এত ক্লান্ত হয়ে পড়তো না। এই শ্রান্তির বিনিময়ে কিছুই সে পায় না। বরং, মাঝরাতে যখন ছোট প্রদীপের আলোকে সারাদিনের বিক্রীর হিসাব করতে বসে, তখনই শুধু আবিষ্কার করে অনন্ত—সারাদিন শুধু জল বিলানো সার হয়েছে, বিক্রী ফাঁকিয়ে গেছে, পয়সার বাক্সটা ফাঁকা।

কিন্তু কে বলবে অনন্তরাম সুখী নয়? তার ছোট মুদিখানার দোকানটার মতই তার সুখের রূপ, সবই হাতের কাছে, সবই মুঠোর মধ্যে। তা ছাড়া, প্রমীলার দুটি কালো চোখের ডুবুডুবু বিস্ময় আর দুটি অভিমানভরা ঠোঁটের দিকে তাকালেই অনন্তরামের সুখী সংসারের আর একটা রূপ চোখে পড়ে, যেন মহাসাগরের একটি টুকরো। সীমা আছে, কিন্তু বৈচিত্র্যের সীমা নেই। কত ঢেউ, কত কলরোল! প্রমীলা যখন অভিমান করে কাঁদে, মনে হয় এ কান্না কখনো শেষ হবে না। যখন খুশি

হয় হাসে, তখন সে হাসিরও যেন সীমা থাকে না।

আজও এইমাত্র হিসেব শেষ হয়, রাত্রি ঘনায়। প্রদীপের আলো মৃদুতর হয়। কিন্তু অনন্তরাম চুপ করে বসে থাকে। ঘরের ভেতর থেকে কোনো সাড়া আসে না। প্রমীলা এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। ইচ্ছে করে, অভিমান করে ঘুমিয়ে আছে। আজ আর কোনো সাড়া দেবে না প্রমীলা।

ঘরের ভেতর উঠে যেতে চায় না অনন্ত। পিলসুজের কাছেই হয়তো খাবারের থালাটা পড়ে আছে, একরাশ পুড়ে-মরা পোকা ছড়িয়ে আছে থালার ওপরে, চারদিকে। এখন মনে হয়, সংসার সাগরের সুখ শুধু লোনা জলের মত। অনন্তের চিন্তায় একটা অকারণ শাস্তি ও অপমানের জ্বালা যেন ধীরে ধীরে বেদনা ছড়াতে থাকে। এতদিনেও যেন প্রমীলাকে ঠিক চিনতে পারা গেল না। প্রমীলা জীবনে কি চায়, কি সম্পদ সে খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছে, কোথায় তার শূন্যতা, কি তার না-পাওয়া, আজও তার পরিচয় আবিষ্কার করে উঠতে পারেনি অনন্ত। মুখ ফুটে বলুক প্রমীলা—কি পেলে সে সুখী হবে।

কিন্তু জীবনে কোনদিনই বোধহয় প্রমীলা বলবে না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কত শত অচেনা নরনারী, কত যাত্রী, সাধু ভিখারী অনন্তের কাছে কত জিনিস দাবী করে—কত আবদারের সুরে, কত আশীর্বাদের ভঙ্গীতে, কত কৃতজ্ঞতায়! কিন্তু প্রমীলা কিছু দাবী করে না। প্রমীলাই শুধু অনন্তের কাছে কিছু চাইতে পারে না!

প্রদীপের সলতে আর-একটু উস্কে দেয় অনন্তরাম। গভীর রাত্রির অন্ধকারে শালবনের জংলী হিংসাগুলি যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে এক-একটা হাল্‌কা ঝড় ছুটছে। এক অখণ্ড স্তব্ধতার মধ্যে ক্লান্ত পৃথিবীর ফুসফুসটা শুধু হাঁসফাঁস করছে।

তুলসীদাসের রামচরিতখানা সামনে টেনে নেয় অনন্তরাম—

আজহুঁ কছু সংশয় মন মোরে
করহু কৃপা বিনাউ কর জোরে

...করজোরে মিনতি করি হে কৃপাময়, আজও যে আমার মনে কিছু সংশয় রয়ে গেছে।

বুঝি না, কিসে এই সংশয়? কেন মন অকারণে উদাস হয়ে যায়? এই তো মাত্র দুটি মাস, প্রমীলা হাসতে হাসতে এই সংসারে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু কিসের এই মেঘ, অভিমানী চাঁদের মত প্রমীলা যার আড়ালে ক্ষণে ক্ষণে লুকিয়ে পড়ে? কিসের দুঃখ?

অনন্তের গলার স্বরের রেশ ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে আসে, দু'চোখে ঘুমের আরাম নিয়ে প্রমীলার চুড়ির নিক্বণ যেন আর একটা স্বপ্নের ভেতর ছটফট করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে—তাই শব্দ শুনতে পায় অনন্ত।

আর একবার মনের শেষ উৎসাহ দিয়ে গলার স্বর সজীব করে তুলতে চায় অনন্তরাম—

রাকারজনী ভকতি তব
রামনাম সোই সোম

তোমার ভক্তি পূর্ণিমা রাতের মত; রামনামই তো চন্দ্র! না, মিথ্যা এ সংশয়, অন্ধকার আসবে না, সবই স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। সব দেখতে পাবে তুমি।

এত শূন্যতার রহস্যকে ধরার জন্য, একটা আশ্বাস ও সান্ত্বনাকে অনন্তরামের মিষ্টি গলার সুর যন চারদিক অন্বেষণ করে বেড়ায়। শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে পড়ে অনন্ত।

সূর্য ওঠবার অনেক আগেই যেন হঠাৎ একটা আলোর ধাঁধায় জেগে ওঠে অনন্ত। রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে। ডাকের গাড়ি আসবার সময় হলো। পোড়া প্রদীপটা আবার নতুন শিখার আলোকে জ্বলে উঠেছে, প্রমীলা উঠে এসেছে, অনন্তের হাত টানছে—ছি ছি, আশ্চর্য মানুষ তুমি! এভাবে আমাকে শাস্তি দিতে হয়?

একটু অপ্রস্তুত হয়ে অনন্ত উঠে বসে। কাঁচা ঘুমের নেশা তখনো চোখমুখের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে। এলোমেলো চুল। অনন্তের মুখটা যেমন সুন্দর তেমনি করুণ দেখায়।

তার চেয়ে করুণ হয়ে ওঠে প্রমীলার মুখ—ছি ছি, তুমি কাল রাত্রে খাওনি। আমাকে এত জব্দ করে তোমার কি সুখ, বল তো?

অনন্তের ক্ষুব্ধ অন্ধ মনটা যেন আবার চক্ষুষ্মান হয়ে ওঠে। আবার তার ছোট সংসারের হৃদয়টার চেহারা নতুন করে চোখে পড়ে। সেই সমুদ্রের মতই তো, সেই নীল জল আর কত ঢেউ। প্রমীলার চোখ দুটো ছলছল করে, তবুও হাসছে, নীল জলের ওপর চাঁদের আলোর মতন। এই তো, সবচেয়ে সত্য যা, তা একেবারে মুখোমুখি দেখা যাচ্ছে।

প্রমীলা অনন্তরামের গলা জড়িয়ে ধরে—ওঠ, ওঠ, এত রাগ করতে নেই, লোকে দুষমনের ওপরেও এত রাগ করে না।

প্রমীলার নজরে পড়লো, তুলসীদাসের রামচরিতখানা সামনে পড়ে রয়েছে। বইটা খোলা। প্রমীলা বইটা বন্ধ করে দূরে সরিয়ে রাখলো। অনুযোগের সুরে কথা বলে—এই বইটাই তো আমার দুষমন।

অনন্তরাম চমকে প্রমীলার দিকে তাকায়। প্রমীলা কিছুমাত্র অপ্রতিভ হয় না। বরং তার প্রতিবাদ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে—আমার হাতের তৈরি খাবার খেতে তোমার মনে পড়লো না, আমাকে একবার ডাকলে না। সারা রাত তুলসীদাসের দোঁহা খেয়ে পেট ভরিয়েছ। আর এসব চলবে না বলে দিচ্ছি।

অনন্তরাম বিরক্ত হয়ে উত্তর দেয়—তাহলে কি হবে?

প্রমীলা—তাহলে আমিও আমার শিবালয় নিয়ে থাকবো।

অনন্তরাম আশ্চর্য হয়ে বললো—শিবালয়? কোথায় তোমার শিবালয়?

প্রমীলা—কৈলাস ভাইয়া বলেছে, আমার জন্যে ছোট একটি শিবালয় তৈরি করে দেবে। কত টাকা আর লাগবে? তুমি যদি না দাও, কৈলাস ভাইয়া দেবে।

অনন্তের মুখটা ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে আসতে থাকে। রহস্যটার কোন অর্থভেদ করতে পারে না। কবে এত শিবভক্ত হয়ে উঠলো প্রমীলা। কৈলাসই বা কবে থেকে শিবের মহিমা উপলব্ধি করে ফেললো?

প্রমীলা বলে—কথা বলছো না যে?

অনন্ত—আমার বলবার কিছু নেই।

—তাহলে আমার শিবালয় তৈরি করে দিচ্ছ?

অনন্ত—আমার সাধ্যি নেই।

প্রমীলা—বেশ, তাহলে কৈলাস ভাইয়াকে বলি।

অনন্ত প্রমীলার মুখের দিকে তীব্রদৃষ্টি ছড়িয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। একসঙ্গে যেন কয়েক শত প্রশ্ন সেই দৃষ্টির ভেতর সুতীক্ষ্ণ শরের মত ছুটাছুটি করছে। তারপর একটু শান্তভাবেই বলে—শিবালয় চাও শিবপূজার জন্য, না শিবকে অপমান করার জন্য?

প্রমীলা—এ কিরকম কথা হলো?

অনন্ত—বেচারা রামচন্দ্রজীর ওপর রাগ করে কি তুমি শিবের পুজো ধরবে?

প্রমীলা চুপ করে রইল। অনন্ত বললো—এরকম ভুল করো না প্রমীলা। রামজী হোক বা শিবজী হোক, মন থেকে যাঁকে চাও, তাঁরই পুজো কর। কিন্তু আমার ওপর রাগ করে কিংবা...

প্রমীলা—কিংবা, কি?

অনন্ত—কিংবা কৈলাস শিখিয়ে দিয়েছে বলেই তোমার শিবালয়ের সখ যদি হয়ে থাকে, তবে...

প্রমীলা একটু বেশীমাত্রায় উত্তপ্ত হয়ে উঠলো—কৈলাস ভাইয়া শিখিয়ে দিলেই কি শিবজী খারাপ হয়ে গেল? কি এমন খারাপ কাজের কথা বলেছে?

অনন্ত—কিন্তু কৈলাস কি সত্যিই...

প্রমীলা চোখ বড় বড় করে একটু বিদ্রূপের ভঙ্গীতে কথা বলে—বুঝেছি, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তোমার মতে, কৈলাস একটা মানুষই নয়। সে কি আর শিবভক্ত হতে পারে?

অনন্ত—কিন্তু সেদিন তো দেখেছি কৈলাসের মুখে মদের গন্ধ।

প্রমীলা যেন দৃপ্তভাবে উত্তর দেয়—হ্যাঁ, তোমার কথা সত্যি। কিন্তু সে কৈলাস আর নেই। সে আর মদ খায় না।

অনন্তকে আরও আশ্চর্য করে দিয়ে প্রমীলা ঘরের ভেতর চলে গেল এবং পরমুহূর্তে কতগুলি ছোট ছোট স্তোত্রের বই আর একটি বড় বই সশ্রদ্ধভাবে তুলে নিয়ে এসে অনন্তের সামনে রাখলো—এই দেখ শিবের মহিমা, আর এইগুলি সব স্তোত্র আর ভজন।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল অনন্ত। তার সংশয়ভরা প্রশ্নের পাহাড়টা নিজের মিথ্যায় চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কৈলাস আর সে-কৈলাস নয়। বোধহয় প্রমীলা আর সে-প্রমীলা নয়। সত্যি সত্যি জীবনের ধূলিকে এক নতুন বিশ্বাসে ভিজিয়ে দিয়ে ওরা শিবালয়ের পথটি তৈরি করে ফেলেছে। যে কৈলাসের মতন মানুষ দেবতার জন্য মদ ছেড়ে দিয়ে আত্মশুদ্ধি করেছে, সে কৈলাসের নিষ্ঠা ও ত্যাগের মূল্যকে ছোট করবার মত সাহস খুঁজে পায় না অনন্ত।

অনন্তের চোখে পড়ে, প্রমীলার মাথায় বিনুনি নেই। এলোমেলো রুক্ষ চুল ছিন্ন স্তবকের মত ছড়িয়ে রয়েছে। সেই টিপ আলতা পান, গয়না আর রঙীন ওড়নার সমারোহ থেকে যেন বিদায় নিয়ে প্রমীলার মূর্তিটা রক্তশূন্য ও সাদাটে হয়ে গেছে।

তবে কি সত্যি সত্যি যাত্রা শুরু হয়ে গেছে? তবে কি অনন্তের সংসারে শুধু রামচরিতমানসের দোঁহাগুলি গম্ভীর স্বরে বাজতে থাকবে? ক্রীড়াচঞ্চল শিশু-রামের দুষ্টু পায়ের নূপুর এ-ঘরের আঙিনায় কখনো যে বেজে উঠবে, তার কোন আকাঙ্ক্ষার ছায়া নেই প্রমীলার মুখে। এক মহাশ্বেতার উদাস ছায়ামূর্তি প্রমীলাকে যেন অগোচর থেকে ইঙ্গিতে আহ্বান করছে। প্রমীলা সরে যাচ্ছে। ওর আত্মা শুধু উপোস করে থাকতে চায়।

এই সাধনায় প্রমীলা একা নয়। কৈলাসের সাধকতা আর উপদেশের গুণে এই নতুন শুচিতা লাভ করেছে প্রমীলা। ভাবতে গিয়ে সব গোলমাল হয়ে যায়। সমস্ত ঘটনা আরও জটিল হয়ে পড়ে। যেন তার ছোট সংসার রামের কৃপা আর শিবের বরে এক অদ্ভুত সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু বাধবার কথা তো নয়, শাস্ত্রেও এ-কথা বলে না।

অনন্ত জিজ্ঞাসা করে—কৈলাস কি আজ আসবে?

প্রমীলা—না, আজ তার সারাদিন উপোস। গয়া গেছে, কাল ফিরবে।

অনন্ত—কৈলাসের কারবার?

প্রমীলা—কারবারে আর মন নেই কৈলাস ভাইয়ার। ট্যাক্সিটাকে অন্য লোকের কাছে ঠিকে দিয়ে দিয়েছে।

কিছুক্ষণ যেন সমাধিস্থের মত চুপ করে বসে থাকে অনন্ত। ডাকগাড়ি পৌঁছে গেছে, বাইরে হর্ণ বাজছে। প্রমীলা অনন্তের হাত ধরে আর একবার আগ্রহ করে টানলো—ওঠ, না খেয়ে রয়েছ। কিছু খেয়ে নাও। তাড়াতাড়ি কর, আমার অনেক কাজ আছে।

অনন্ত —কি কাজ তোমার?

প্রমীলা—আজ আমারও উপোস। গয়া থেকে যতক্ষণ না প্রসাদ আসবে, ততক্ষণ উপোস করে থাকতেই হবে। এরই মধ্যে পুজোর যোগাড়ও করে রাখতে হবে।

কৈলাস ভাইয়া নামে ও কাজে সত্যিই ভাই। নিকট-সম্পর্কে সে অনন্তরামের ভাই, দূর-সম্পর্কে প্রমীলারও ভাই। কিন্তু এই সম্পর্কের চেয়ে অনেক বড় তার আচরণ। কোথাও ফাঁকি নেই, নিজের সম্বন্ধে তার ধারণা রীতিমত ছোট।

জেলাবোর্ডের আঁকাবাঁকা অফুরান পথের পীচঢালা আবেগের মত কৈলাসের ট্যাক্সি হু-হু করে দৌড়ে গড়িয়ে চলে যায়—উত্তর থেকে দক্ষিণ, দক্ষিণ থেকে উত্তরে। কখন যায় আর কখন আসে কোনো ঠিকঠিকানা নেই। ওর স্থিরতা নেই, নিশ্চয়তা নেই। কৈলাসের জীবনটা যেন পথে পথে ছুটোছুটি করে ফুরিয়ে যাচ্ছে। বিশ্রাম নেবার মত কোন কঠিন ঠাঁই আজও সে খুঁজে পায়নি। আসুক ঝড় বা বর্ষা. মধ্যাহ্নের সূর্য জ্বলে উঠুক মাথার ওপর, শীতের হিম আর কুয়াশায় আড়ষ্ট হয়ে যাক সারা শালবন—কৈলাসের ট্যাক্সির কোন ভাবনা-চিন্তা নেই। হঠাৎ হর্ন বাজিয়ে, দীর্ঘ দৌড়ের মত্ততায় গোঁ গোঁ করে অরণ্যের বুক চিরে ছুটে আসে এই পথের মোড়ে; ক্ষণিকের জন্য বেগ একটু মন্দ হয়, তার পরেই আবার উধাও হয়ে যায়।

মোড়ের ওপর মাঝে মাঝে কৈলাসের ট্যাক্সি থামতো। কৈলাস কখনো গাড়ি থেকে নামতো না। গাড়ির ওপর বসে বসেই চেঁচিয়ে একটা ডাক দিত—কেমন আছ অনন্ত দাদা?

হেসে ইসারায় জবাব দিত অনন্ত—ভাল আছি।

অনন্ত জানে কৈলাস কখনো গাড়ি থেকে নেমে কাছে আসবে না। কৈলাসের গাড়ির ট্যাঙ্কে যেমন পেট্রল, তেমনি ওর পেটে মদ আর তাড়ি টলমল করছে।

অনন্ত জানতো, ডাকলেও কাছে আসবে না কৈলাস। কৈলাস জানে, অনন্ত ডাকলেও সে তার কাছে যেতে পারে না; বড় সাদাসিধে সাত্ত্বিক মানুষ ঐ অনন্ত দাদা। ঐ ছোট দোকানের দেড়-দু-টাকার বিক্রি, পিপাসিতকে জলদান আর রামচরিত মানসের আনন্দে মজে আছে অনন্ত। কেমন

একটা শুদ্ধ মনুষ্যত্ব। সজ্জনতা আর শুচিতায় অনন্তদাদা একটু অসাধারণ হয়ে আছে। মদের ঢেঁকুর তুলে এমন মানুষের কাছে এগিয়ে যেতে পারে না কৈলাস, এটা তার নিজের বিবেকেরই বাধা।

অনন্ত এক-একবার ভোরে উঠে দেখেছে, পথের ওপর গাড়ি থামিয়ে, দারুণ শীতের রাত্রিটা গাড়ির সীটের ওপরেই কুকুরের মত ঘুমিয়ে পার করে দিয়েছে কৈলাস, তবু অনন্তের ঘরে এসে আশ্রয় নেয়নি। অনন্ত রাগ করে ধমক দিয়েছে, অনুযোগ করেছে। কৈলাস হেসে চুপ করে থাকতো।

কৈলাসের ট্যাক্সি নতুন সরাইয়ের পথের ওপর অনেকবার থেমেছে আবার চলে গেছে! কিন্তু কিছুদিন আগে একবার থামতে গিয়ে যেন কিছুক্ষণের জন্য স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। দুপুরে এসে, চলি-চলি করেও চলে যেতে অনেক দেরী হয়ে গেল। অনন্তরামের ঘরেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিল কৈলাস। এই প্রথম!

এই প্রথম দেখলো কৈলাস, প্রমীলা আজকাল এখানেই থাকে।

তারপর আবার অনেকদিন কৈলাসের দেখা নেই। প্রমীলা হঠাৎ একদিন জিজ্ঞাসা করে, কৈলাস ভাইয়ার খবর কি? আর যে একদিনও এল না।

অনন্ত বলে—রোজই তো ওকে দেখতে পাই।

প্রমীলা আশ্চর্য হয়—কোথায়?

অনন্ত—এই পথেই যায়, রোজই ওর ট্যাক্সি যায়।

প্রমীলার চেহারাটা ঈষৎ বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। যেন একটা উদাস নিঃশ্বাসকে লুকিয়ে ফেলবার জন্যই বলে ওঠে—রোজ যায়, তবুও আসে না।

অনন্ত—কি করে আসবে বল? যা ভয়ানক মদ খায়? এই লজ্জাতেই আসতে পারে না। বড় দুঃখ হয় ওর জন্য। সবই তো ভাল, দেখতে শুনতে ভাল, পয়সাও ভালই রোজগার করে, কিন্তু ঐ কতগুলি পাপ ঢুকেছে। একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে।

এত স্পষ্ট করে শুনেও সমস্ত ঘটনার ঘৃণাগুলি যেন হঠাৎ একটা মমতার ছোঁয়ায় আরও হেঁয়ালি হয়ে ওঠে। আকাশের সূর্যটা যেন ক্ষণিকের দুঃখে নিবে যায়, জেলাবোর্ডের সড়কটা অন্ধকারের চাপে মুছে যায়। আর পথ দেখা যায় না। কৈলাসের আসা-যাওয়া বোধহয় চিরদিন এই অন্ধকারের আড়ালে দূরে সরে থাকবে।

কিন্তু অনন্ত জানে না, প্রমীলাও কল্পনা করতে পারেনি, এই আসা-যাওয়ার পথটুকু অটুট রাখার জন্যেই কৈলাস তখন যেন সবার অগোচরে সরে গিয়ে এক কঠোর তপস্যা করছে, মদ ছাড়বার চেষ্টা করছে। গয়া থেকে আসতে আসতে তিনবার মদের বোতল মুখের কাছে তুলে ধরে তিনবার হাত কাঁপে, নিজেকে হুঁসিয়ার করে। তারপর আর মদ খেতে পারে না। বোতলটা ছুঁড়ে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দেয়।

ঝড়ের মত ট্যাক্সি নিয়ে ছুটে চলে কৈলাস। নতুন সরাই এগিয়ে আসে। গাড়ির গতি অকারণে মন্থর হয়ে আসে। নতুন সরাই পৌঁছবার আগেই একবার হঠাৎ থেমে যায়। কিছুক্ষণ ছটফট করে কৈলাস, তারপর আর সামলাতে পারে না। একটা মদের বোতল মুখের কাছে তুলে ধরে ঢক্‌ঢক্ করে খায়।

কৈলাসের প্রতি শোণিতকণায় ও স্নায়ুতে যেন নিজের দীনতার লজ্জাও পালিয়ে যাবার নেশায় চন্‌চন্‌ করে ওঠে। আবার স্টার্ট নিয়ে জোরে এক্সিলেটার চাপে কৈলাস। নতুন সরাইয়ের মোড়টুকু কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে পার হয়ে চলে যায়। অনন্ত দোকানঘরের চৌকিতে বসে দেখতে পায়—ঐ, কৈলাস চলে গেল।

যেন নতুন সরাইয়ের ধুলোর ছোঁয়াচ বাঁচবার জন্যই কৈলাস এভাবে পালিয়ে যায়। কৈলাসের অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা দেখলে তাই মনে হয়। কিন্তু অনন্ত জানে না, প্রমীলা জানে না, নতুন সরাইয়ের মাটিতে স্থির হয়ে দাঁড়াবার জন্য জীবনের যত উদভ্রান্ত পথিকতার যাতনার মধ্যে এক সত্যিকারের বিশ্রান্তির গ্যারেজ খুঁজে বেড়াচ্ছে কৈলাস। একটা যোগ্যতার লাইসেন্স চাই, যেন তারই জন্য বড় কঠিন ট্রায়াল দিচ্ছে কৈলাস।

দূর গয়া রোড়ের ধারে, নতুন সরাইয়ের মোড়ে অনন্তরামের দোকানঘরে বাতি জ্বলে। ওদিকে ধানবাদ স্টেশনের ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডে গাড়ির পর্দা ফেলে দিয়ে পেছনের সীটের উপর কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করে কৈলাস। মদ ছোঁয় না। নিকটেই বাজারের বীভৎস গলিগুলির ভেতর ছোট ছোট কালিমাখা ল্যাম্পের পাশে এক একটা মেয়েমানুষের শরীর এখনো ফাঁদ পেতে সাগ্রহে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা আশা করে আছে, এখুনি কৈলাস ওস্তাদ আসবে এই পথে। কিন্তু রাত গভীর হয়, ওস্তাদ কৈলাস আসে না।

গাড়ির ভেতর উসখুস করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে কৈলাস। ভোর হয়। হাতমুখ ধুয়ে মুসাফিরখানায় চায়ের দোকানে বসে চার কাপ চা খায়।

যেন রোগ থেকে সেরে উঠছে কৈলাস। এইবার যেন চোখ খুলে তাকাতে পারা যায়। তাকালেই পথ চেনা যাবে। যে কটি যাত্রী পাওয়া যায়, ভাড়া যা-ই দিক্—এখুনি একটানা দৌড় দিয়ে সোজা পৌঁছে যাওয়া যায় নতুন সরাই। অনন্ত যদি ডাকে, সাড়া দিতে আর কোন বাধা নেই। হয়তো এইবার এগিয়ে যেতেও পারা যায়।

কৈলাসের ট্যাক্সি যাত্রী নিয়ে ছুটতে থাকে। বেলা বাড়ে, রোদ চমকায়, বরাকর নদীর শুষ্ক বালিয়াড়িতে অভ্রের রেণু ঝিক্‌ঝিক্‌ করছে।

রামভক্ত সাত্ত্বিক মানুষ অনন্ত এতক্ষণে পুজো সেরেছে, পাঠ শেষ করেছে, পথের পিপাসীদের জলছোলা খাওয়াবার প্রথম পালা শেষ করেছে। নতুন সরাই এসে পড়ে।

হঠাৎ কী ভেবে গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দেয় কৈলাস। না, থামতে পারা যাবে না। কোন লাভ নেই। অনন্তের ঘরটা বড় বেশি পবিত্র। কোন ধুলো নেই, ধোঁয়া নেই। যেন দেবতাদের সঙ্গে বসে আছে অনন্ত। স্নান না করে, শুদ্ধ না হয়ে ওখানে কোন মতেই যাওয়া উচিত নয়।

সত্যি ওরা দু'জন যেন রামসীতার মত। যেন ইচ্ছে করে এই গরীবানার বনবাস গ্রহণ করেছে। অনন্তের মনটা এত নিষ্কলঙ্ক, এত সাদা—তাই তো প্রমীলা এত রঙীন।

তা ছাড়া, কৈলাস আজ বিশ্বাস করে, একা একা অনন্তের ঘরে ঢুকতে পারা যাবে না। এত শক্তি নেই তার। কোন দেবতার হাত ধরেই এগিয়ে যেতে হবে। নইলে অনন্তের ঘরের কপাট খুলবে না। খুললেও, এক মুহূর্ত টিকতে পারবে না কৈলাস।

ধূলো আর ধোঁয়ার একটি ছোট ঘূর্ণি ছুটিয়ে কৈলাসের ট্যাক্সি যেন তার সকল মালিন্যের পশরা নিয়ে পালিয়ে যায়।

অনন্ত প্রমীলাকে ডেকে আর একবার বলে—দেখলে কাণ্ড কৈলাসের, আজও এল না।

প্রমীলা বলে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি?

অনন্ত—বল।

প্রমীলা—তুমি কি ওর কখনো নিন্দে-টিন্দে করেছ?

অনন্ত—কখনো না। নিন্দে করবো কেন? ও তো নিজেই ভয়ে ভয়ে পালিয়ে বেড়ায়।

প্রমীলা—চিরকাল এভাবে পালিয়ে বেড়াবে?

অনন্ত—না। যেদিন রামজীর কৃপা হবে, সেদিনই সুস্থির হয়ে যাবে। সব ভুল বুঝতে পারবে।

রামজীর কৃপা নয়, মহাদেবের আশীর্বাদ পেয়ে গেল কৈলাস। গয়া পৌঁছে ধর্মশালার আঙ্গিনায় ট্যাক্সিটাকে রেখে দিয়ে পথে বের হলো। এক জোড়া গরদের চাদর আর ধুতি কিনলো। শহরের ভিড় ছাড়িয়ে যেন একটা সঙ্কল্পের আবেগে ধীরে ধীরে পথের পর পথ পার হয়ে বিরাট ফল্গুর বালিয়াড়ির ওপর এসে দাঁড়ালো। অস্ত যাবার আগে পশ্চিমের সূর্য ঠাণ্ডা ও লালচে হয়ে উঠছে। বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে এক জায়গায় এসে থামলো কৈলাস। দু'হাত দিয়ে বালি খুঁড়ে একটা গর্ত তৈরী করলো। যেন এতদিনের ধোঁয়া আর ধুলোর জীবনের সমাধি খুঁড়ছে কৈলাস।

সূর্য ডুবে গেছে। চারিদিক আবছা হয়ে গেছে। কৈলাস হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলো, তার সমাধির কূপ ঠাণ্ডা জলে ভরে উঠেছে।

স্নান সেরে নিয়ে কৈলাস আবার ফিরে চললো। পথের ওপর একটা মন্দিরের সিঁড়ির কাছে আলো জ্বালিয়ে একটা লোক হরেক রকম ধর্মের বই বিক্রী করছিল। কৈলাস কিছুক্ষণ দাঁড়াল, কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপরেই একখণ্ড শিবমহিমা কিনে ধর্মশালার দিকে ফিরে চললো।

এরপর আর কৈলাসকে ডাকতে হয়নি। কৈলাসের ট্যাক্সি এসে নতুন সরাইয়ের পথের মোড়ে নিয়ম মত থেমে গেছে। গাড়ি থেকে নেমে সোজা অনন্তের ঘরে এসে বসেছে কৈলাস। গল্প হয়, তর্ক হয়, সন্ধ্যা পার হয়ে যায়, তবু কৈলাসকে বসে থাকতে হয়, যতক্ষণ প্রমীলার রুটি তৈরী সারা হয়। রুটি গুড় খেয়ে কৈলাস আবার চলে যায়।

এ পথে আসতে যেতে আর থামতে কোন বাধা নেই। এমন কি অনন্ত যখন ঘরে থাকে না, তখনো কৈলাস অনায়াসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এখানে এসে বসে থাকতে পারে। সব ভীরুতার সঙ্কোচ পুরনো ধুলো আর ধোঁয়ার মতই উবে গেছে।

কোন ভয় নেই কৈলাসের, কোন অপারধের কুণ্ঠা নেই তার মনে। বড় কঠিন পরীক্ষা সহ্য করে, যোগ্য হয়ে, তৈরি হয়ে তবে সে এসেছে।

ধানবাদ ট্যাক্সিস্ট্যাণ্ডে আজও যাত্রীর অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় কৈলাসকে। কিন্তু এই সময়টুকু বৃথা যায় না। সীটের পাসে শিবমহিমার বইটি রাখা আছে। স্টিয়ারিংয়ের ওপর বই খুলে ধরে কৈলাস। মাথাটা ঝুঁকিয়ে এক মনে পড়তে থাকে।

কৈলাসের বেয়াড়া বিবেকটা যেন একেবারে জব্দ হয়ে গেছে। মনের এই ক্ষমাহীন দেবতাটি ভ্রূকুটি করে এখন আর এ-কথা বলতে পারে না—অন্যায় করছো কৈলাস।

কৈলাসের অন্তর জুড়ে এক পরম আশ্বাসের বাতাস বইতে থাকে—হে স্মরহর, তুমি শ্মশানে খেলা করে বেড়াও, পিশাচেরা তোমার সহচর, চিতাভস্ম তোমার অনুলেপ, নরকপালসমূহ তোমার

মালা। তোমার আচরণ এই রকমই অপবিত্র। কিন্তু তবুও, হে বরদ শিব, যে তোমাকে স্মরণ করে তার কাছে তুমি মঙ্গলস্বরূপ।

কৈলাস আশ্চর্য হয়, এর চেয়ে আপন কোন্ দেবতা আছেন? ঘৃণিতের হাত ধরে বুকে টেনে তুলবার জন্য তিনি স্বয়ং সাজ পরেছেন। তবু ইনিই তো চন্দ্রোদ্ভাসিতশেখর, ইনিই তো গঙ্গাফেনসিতাজটা। এমন দেবতা আর কে আছেন, যাঁর নয়নে বহ্নি স্ফুরিত হয়?

চারদিকের চাঞ্চল্য ও কলরবের মধ্যেও কৈলাস যেন এক নিবিড় প্রশান্তির আস্বাদে মুগ্ধ থাকে। ধীরে ধীরে শিবভক্তের মনের আকাশে একটা নতুন গর্বের ছটা জেগে উঠতে থাকে। রাম-সীতার যুগলস্বরূপের মধ্যে কি এমন বিস্ময় আছে? এর চেয়ে বড় রূপ কি আর নেই?

কৈলাসের বুকের শোণিত হঠাৎ উষ্ণ হয়ে ওঠে। পৃথিবীর যেখানে যত যুগল মূর্তি আছে, তার সব রূপ, রং আর আভরণ আজ চূর্ণ হয়ে যাক্। বড় শান্ত, বড় নিষ্ঠুর, বেমানান আর বে-আইনি এই মূর্তিগুলি। শুধু হরগৌরী ছাড়া আর কোন মিলনের মূর্তিকে আজ পুজো করতে চায় না কৈলাস।

কোথায় তুমি হরগৌরী, পার্বতী পরমেশ্বর! সেই অঙ্গে অঙ্গে বাঁধা রূপ। অর্ধ অঙ্গে কস্তুরীচন্দন, অর্ধ অঙ্গে শ্মশানভস্ম, অর্ধাঙ্গে মন্দারমালা, অর্ধাঙ্গে করোটিমালা—অর্ধাঙ্গে দিব্যাম্বর, অপরার্ধ উলঙ্গ। অর্ধাঙ্গ স্বর্ণচম্পকের বর্ণ, অপরার্ধ কর্পূরধবল—অর্ধাঙ্গে মেঘশ্যামল কুন্তল, অপরার্ধে বিভূতি-ভূষিত জটা। শিবের অর্ধ এবং শিবার অর্ধ নিয়ে রূপের ঈশ্বর এই মূর্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছেন।

প্রমীলা উপোস করেই দিনটা কাটালো। রাতটাও উপোসে কাটলো। ভোরবেলা গয়া থেকে ফিরলো কৈলাস। হাতে একটা ঠোঙায় কতকগুলি ফুল-বেলপাতা আর প্রসাদ। কৈলাসের কপালে একটা ছাইয়ের টিপ, গায়ে গরদের চাদর। শালবনের মাথার ভিড় ঠেলে সূর্য মাত্র উপরে উঠেছে, কৈলাসের মুখের ওপর আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

কী শাণিত পবিত্র ও ভাস্বর হয়ে উঠেছে কৈলাসের মূর্তিটা। সারা মুখটা ঝকঝক করছে। কৈলাসের দিকে তাকিয়ে অনন্তর বুকটা হঠাৎ টিপটিপ করে উঠলো। কোথা থেকে একটা ভয়ার্ত স্পন্দন অনন্তের দেহমনে ঠেলে উঠছে—চেষ্টা করেও কিছুক্ষণের মত সুস্থির হতে পারলো না অনন্ত।

প্রমীলাও উঠে এসে বাইরে দাঁড়িয়েছিল। অনন্ত আবার ভাল করে দেখলো, প্রমীলার মাথার চুলগুলি কত রুক্ষ হয়ে উঠেছে। গায়ে কোন গয়না নেই, শুধু হাতে দু'গাছি চুড়ি। প্রমীলার চেহারাটা যেন কৃষ হয়ে আরও প্রখর হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো এক নতুন অভ্যর্থনার আনন্দে চিক্চিক্ করে হাসছে।

কৈলাস এগিয়ে আসছিল, অনন্ত এগিয়ে যাচ্ছিল। অনেকগুলি প্যাসেঞ্জার বাস মোড়ের ওপর এসে পৌঁছে গেছে। যাত্রীদের কলরব শোনা যায়।

কৈলাসের দিকে তাকিয়ে অনন্ত একটু ব্যস্তভাবে বললো—শুনলাম, কাল থেকে উপোস করে রয়েছ। একটু জিরিয়ে নাও, না খেয়েদেয়ে চলে যেও না।

কথাগুলি বলেই অনন্ত যেন ছটফট করে দৌড়ে চলে গেল। মোড়ের কাছে পৌঁছে তার প্রিয় জলছত্রটির কাছে দাঁড়ালো। একটা ঘটিতে জল ঠেলে নিয়ে তৈরী হলো অনন্ত।

তৃষ্ণার্তেরা একে একে ছুটে আসছে। বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতী, কেউ অঞ্জলি ভরে জল খায়, কেউ পাত্র পূর্ণ করে নিয়ে চলে যায়। কেউ বা পা ধোওয়ার জন্য লজ্জিতভাবে একটু জল চায়। অনন্ত এক ঘটি জল নিয়ে তার পায়ের ওপরেই ঢেলে দেয়। লোকটি অপ্রস্তুত হয়ে পা সরিয়ে নিয়ে কুণ্ঠিতভাবে বলে—থাক থাক। অনন্ত বলে—নাও, একটু জল নাও, ভাল করে ধোও।

একটা জয়ধ্বনির উল্লাস। সকালবেলায় শালবনের শান্তি শিউরে দিয়ে একটা ব্যাকুল হর্ষ যেন দক্ষিণ দিক থেকে ছুটে আসছে। কৌতূহলী হয়ে অনন্তরাম দূর পথের বাঁকের দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু পরেই দেখা গেল। সড়কের ঢালু ধরে তারা যেন উর্ধ্বলোক থেকে চলে আসছে। দল বেঁধে তারা আসছে। সম্মুখে একটা পড় পতাকা উড়ছে। দু'পাশে শালবনের সবুজ, পায়ের নীচে শিশিরভেজা কালো পীচঢালা পথ, মাথার ওপর রোদের আভা—তারই মধ্যে অভিযাত্রী জনতার খদ্দরের সাজ যেন শুভ্রতায় প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে।

মোড়ের যাত্রীরা চেঁচিয়ে উঠল—এসে গেছে,—এসে গেছে। এখানেও তুফান পৌঁছে গেল!

জনতা মোড়ের কাছে পৌঁছে গেল, বার বার জয়ধ্বনি করলো। সবাই ডাক দিল—চল চল, সবাই চল।

আজাদীর লড়াই শুরু হয়ে গেছে। জনতা এক মুহূর্তও অপেক্ষা করলো না। একটা মরণপণ প্রতিজ্ঞা যেন ঝড় হয়ে ছুটে চলে গেল—তসীল-কাছারির দিকে। পরশাসনের যত গ্লানি আর গ্লানির চিহ্নকে আজ ওরা অগ্নিসাৎ করবে। যজ্ঞের আগুন জ্বালতে ওরা চলে যাচ্ছে।

জনতা চলে গেল। অনন্তরামের কানে তখনো জনতার মিলিত কণ্ঠের গানের রেশ জাদুমন্ত্রের মত বাজছিল—জান হাজির হ্যায় অগর্ কর্ দো ইসারা গান্ধী। —হে গান্ধী, তুমি যদি মাত্র ইসারা কর, তাহলেই এ প্রাণ উৎসর্গ করতে আমরা প্রস্তুত আছি।

এ যে তার রামচরিতমানসের বাণী! কতবড় কী নিবিড় বিশ্বাসে, কী শ্রদ্ধাললিত স্বরে এই আত্মদানের গান গেয়েছে অনন্তরাম।

হ্যাঁ, শুধু গান গাওয়াই সার হয়েছে। কিন্তু দেখে হিংসে হয়, এই জনতা যে নিজেরাই গান হয়ে গেছে। গান্ধীজী. গান্ধীজী। রামজীর আত্মাটি বুঝি নতুন করে আবির্ভূত হয়েছেন। কী ভাগাবান তারা, যারা তাঁর পুণ্য স্পর্শ পেয়েছে, তাঁর বাণীতে আত্মহারা হয়ে গেছে।

অনন্তরামের প্রতিদিন অভ্যস্ত কাজের জীবনটা যেন আজকের ঝড়ে শুকনো ডালপালার মত ভাঙবার আগে মড়মড় করে বেজে উঠলো!

তবু কাজ করে যায় অনন্ত। মোটর বাস, মোষের গাড়ি এসে মোড়ের ওপর থামে। পালকি থামিয়ে ক্লান্ত বেহারার দল হাঁপায় আর হাওয়া খায়। দোকানের চৌকিতে বসে অনন্তরাম বিক্রী করে—আটা, ছাতু, কেরোসিন, কুইনিন, আমলকীর আচার, ভাস্কর লবণ, হরধনুর্ভঙ্গের ছবি। এই বিকিকিনির তুচ্ছ সংসার ক্রমেই নিরাস্বাদ হয়ে আসছে, মোটেই ভাল লাগে না। তবু যেন অন্যমনস্কের মত এই ধরাবাঁধা কাজের ওপর শুধু হাত ছুঁইয়ে চলে যায় অনন্ত, শুধু নিজের মনকে হাতের কাছে পায় না।

জীবনে এই প্রথম. এক নিঃস্বতার অভিমানে অনন্তরামের চিরকেলে আশাবিশ্বাসের সত্তাটি যেন কুণ্ঠিত হয়ে রইল। রামচরিত-মানস তো পরশমণি, যাঁর ছোঁয়ায় সব ভাবনা সোনা হয়ে যায়।

কিন্তু কই? মন যে তার ধুলো হয়ে ঝরে পড়ছে। যেন ঘুণ ধরে গেছে।

কংগ্রেস জিন্দাবাদ। আর একটা জয়রোলের স্রোত পথের ওপর আচমকা কোথা থেকে এসে গড়িয়ে পড়ে। বিহ্বলের মত অনন্তরাম পথের মোড়ে তাকিয়ে থাকে, জনতার উল্লাস যেন নতুন সরাইয়ের সকল দীনতার ধূলি-গ্লানি মুছে দিয়ে চলে যায়। ধীরে ধীরে মোড়ের ওপর একটা ভিড় জমে উঠতে থাকে। অনন্ত দেখতে পায়—ঐ রঘুনাথ আহীর, ঐ বুড়ো মাহাতো কাশীনাথ। ঐ যে তাদেরই সঙ্গে রাজপুত বাড়ির সব ছেলেগুলিও এসে দাঁড়িয়েছে। আরও আসছে। কী অদ্ভুত কাণ্ড! যেখানে শুকনো ডাঙা ছিল, হঠাৎ কোন প্লাবনে সেখানে যেন জলে ভরে উঠলো। আরও দেখতে পাওয়া যায়, সেই জলে ঢেউ জাগছে, মত্ত ফেনিল ঢেউ। নয়া সরাইয়ের জনতা নীল আকাশের দিকে হাত ছুঁড়ে জয়ধ্বনি করলো—স্বতন্ত্র ভারত কি জয়!

অনন্তরাম জানে, লড়াই শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু কী মনোমোহন এই লড়াইয়ের রূপ। স্তবে গানে শুচিতায় ও শুভ্রতায় এক অনুপম উৎসবের মত।

অনন্তরাম তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সেরে ফেলতে চায়। ওরা যেন চলে না যায়। একটু অপেক্ষা করুক। আর কিছুক্ষণ। আর একটু সময় দিক অনন্তরামকে। মন স্থির করে নিক অনন্তরাম। কিসের এক ভীরুতায়, কেমন এক লজ্জায় কতগুলি একেবারে নতুন অভিমানে ও মায়ায় তার মন আজ এই ঘরের ভেতরেই যেন হারিয়ে গেছে। ছুটে চলে যাবার আহ্বান পৌঁছে গেছে, সম্মুখে কোন বাধা নেই। এক অবারিত ও আলোকিত পথ। তবু...

তবু পেছন থেকে যেন একটা অন্ধকারের শিকল অনন্তরামের পা দুটো জড়িয়ে ধরেছে। প্রমীলাকে চিনতে পারা গেল না, আরও দুর্বোধ্য কৈলাস। আজ ওরা শুধু একবার অনন্তরামের সম্মুখে এসে দাঁড়াক, স্পষ্ট করে নিজের মুখেই বলে দিক, ওরা কে? তারপর আর কোন বাধা থাকবে না অনন্তরামের পথের মোড়ে ত্রিবর্ণ পতাকা দুলছে, এক দৌড় দিয়ে এই রঙীন যুদ্ধের আঙিনায় ছুটে চলে যেতে পারে অনন্ত।

ঘরের ভেতর থেকে ব্যস্তভাবে বের হয়ে এল প্রমীলা—ভাল ধূপ আছে?

অনন্ত—কেন?

প্রমীলা—পাঠ শুরু হয়েছে, ধূপ শেষ হয়ে গেছে, আরও চাই।

অনন্ত—কিসের পাঠ?

প্রমীলা—কৈলাসভাই শিব স্তোত্র পড়ছে। তুমিও এস, একবার শুনে যাও, কী সুন্দর পড়ছে কৈলাসভাই।

এক মুঠো ধূপ তুলে নিয়ে প্রমীলার দিকে এগিয়ে দিল অনন্ত। তার পরেই অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

ধূপ হাতে নিয়ে ব্যস্তভাবে চলে যেতে গিয়েই প্রমীলা থমকে দাঁড়ায়। এক-পা দু'পা করে এগিয়ে এসে অনন্তরামের একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। অনন্ত আশ্চর্য হয়ে প্রমীলার দিকে তাকাতেই দু'হাত দিয়ে মাথাটা বুকে জড়িয়ে ধরলো প্রমীলা—এত গম্ভীর হয়ে বসে আছ কেন? কি হয়েছে?

অপরাধীর মত সঙ্কোচে হঠাৎ বিব্রত হয়ে অনন্ত উত্তর দিল—না-না, সত্যিই কিছু হয়নি।

প্রমীলা হেসে হেসে চোখ দুটো বড় করে নকল শাসনের ভঙ্গীতে কথা বলে—কথা সত্যি বলছো তো?

অনন্ত—হ্যাঁ।

ব্যস্তভাবেই আবার ঘরের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল প্রমীলা।

ধীরে ধীরে একটা স্বাচ্ছন্দ্যের টানে কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে পায়চারি করে অনন্ত। বুকের ভেতর যেন এতক্ষণ একটা নির্লজ্জ অবিশ্বাসের বাতাস আটকে ছিল। মনের কপাট খুলছে, বদ্ধ হাওয়ার গ্লানি উড়ে উড়ে সরে যাচ্ছে। প্রমীলাকে একবার ডাকতে ইচ্ছে করে।

কেন?

প্রশ্ন করলে এখনো ঠিক উত্তর দিতে পারবে না অনন্ত। নিত্য দোকানদারীর স্থাবর জীবন যেন নিছক সুস্থিরতার চাপে মরচে ধরে গেছে। ওদিকে রামচরিতের সব মহিমা আজ পুঁথির বন্ধন ছিঁড়ে হিন্দুস্থানের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। শালবনের চঞ্চল সবুজে, ঘূর্ণিহাওয়ার আবেগে, জয়ধ্বনির গর্বে। প্রমীলাকে একবার আশীর্বাদ করতে চায় অনন্ত।

কেন?

এখনো স্পষ্ট বুঝতে পারে না অনন্ত। মোড়ের ওপর জনতার সামনে দাঁড়িয়ে রাজপুতবাড়ির সবচেয়ে ছোট ছেলেটা বক্তৃতা করছিল—এই ঝাণ্ডা আর এই বুক, এই আমাদের সম্বল। ব্যস্, এইবার আমরা রওনা হয়ে যাই। এই ঝাণ্ডার গায়ে আমাদের বুকের রক্তের ছিটে লাগবে। স্বরাজ নিতে হবে, আজ প্রাণের হিসাব করতে নেই। চলো চলো চলো....

চলে যেতেই হবে। অনন্তরাম যেন এতক্ষণে মনের ভেতর একটা প্রশ্নের উত্তর শুনতে পায়। কিন্তু আরও অনেক প্রশ্ন যে রয়ে গেল। এখনো উত্তর পাওয়া গেল না।

যাবার আগে রামচরিতখানা আর একবার কোলের উপর তুলে নিল অনন্তরাম। যাত্রার আগে পথিক যেন রত্নপেটিকা খুলে তার পথের সম্বল বেছে বেছে তুলে নিচ্ছে।

গুন্ গুন্ করে পড়তে থাকে অনন্ত, যেন একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বর—

রাম সিন্ধু ঘন সজ্জন ধীরা
চন্দন তরু হরি সন্ত সমীরা

রামচন্দ্র তুমি সমুদ্রের মত, সজ্জনের মেঘ। হে রাম, তুমি চন্দন তরু, সজ্জনেরা বাতাস।

হ্যাঁ, মোড়ের উপর জনতার মূর্তি প্রতিজ্ঞায় গম্ভীর হয়ে উঠেছে—ওরা মেঘের মত। হ্যাঁ, কোথাও যেন চন্দন তরুর মাথায় ঝড়ের মন্ত্র লেগেছে, ওরা বাতাস হয়ে ছুটে যাচ্ছে!

মনে মনে প্রমীলাকে আশীর্বাদ করে অনন্ত। তাকে চিনতে পারেনি অনন্ত, বড় ভুল হয়েছিল। মন বড় নোংরা হয়ে গিয়েছিল। বড় অহঙ্কার ছিল মনে মনে। আজ হৃদয়ের সব বিশ্বাস সঁপে দিয়ে অনন্ত পড়তে থাকে—

ভয়উ মনোরথ সুফল তব
শুনু গিরিরাজকুমারী
পরিহরু দুসহ কলেস সব
অব মিলিহহিঁ ত্রিপুরারি।

গিরিরাজকুমারী শোন, তোমার ইচ্ছা সফল হয়েছে। এখন সকল দুঃসহ ক্লেশ ছেড়ে দাও, শিবকে পাবে।

তাড়াতাড়ি পুঁথির পাতার পর পাতা উল্টে যায় অনন্ত। রামজীর কৃপা যেন তার জীবনে এতদিনে সত্য হয়ে উঠেছে। সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে, সব সংশয় একে একে দূরে যাচ্ছে—

...ভরত হৃদয় সিয়া রাম নিবাসু

এহঁ কি তিমির জহঁ তরণি প্রকাসু

ভাই ভরতের হৃদয়ে সীতারাম বাস করে। যেখানে সূর্য আছে, সেখানে কি অন্ধকার থাকতে পারে?

কৈলাস ভাই! আবেগ বোধ করতে না পেরে চেঁচিয়ে ডাকতে যায় অনন্ত। ছি ছি, কী ভয়ানক ভুল, কী নোংরা মনের প্রবঞ্চনা! তাই ভরতকে এতদিন চিনতে পারেনি অনন্ত।

অনন্তের চেয়ে বেশী সুখী কেউ নেই। তার সীতা আছে, ভরত আছে। অন্ধ হয়েছিল বলে এতদিন দেখতে পায়নি, তার ছোট সংসারে রামচরিতের পুণ্য জীবন্ত হয়ে রয়েছে।

করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে! পথের মোড়ে আর একটা ধ্বনি, আর একটি জনতা, আর একটা নতুন জলপ্রপাতের হর্ষ।

অনন্তরামের গলার সুরও নতুন এক আবেগের বন্যায় একেবারে ভেসে যায়—

....রাম কাজ কারণ তনুত্যাগী

হরিপুর গয়উ পরম বড় ভাগী।

রামের কাজে জীবন বলি দাও। তুমি হরিধামে যাবার মত পরম ভাগ্য লাভ করবে।

রামচরিতখানা বন্ধ করে রেখে দোকানের চৌকি থেকে একা লাফ দিয়ে নেমে পড়ে অনন্ত। খড়ম জোড়া পরে নিয়ে সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে দৌড় দেয়। পথের মোড়ে পৌঁছে যায়। ত্রিবর্ণ পতাকার প্রমত্ত ছায়া অনন্তরামের মাথার ওপর যেন চরম সমাদরের আবেগে হুটোপুটি করতে থাকে।

শিবপুরাণের একটা অধ্যায় পড়েছিল কৈলাস। ঘরের ভেতর একটা জায়গা পরিষ্কার করে নিকিয়ে দিয়েছে প্রমীলা। তারই ওপর আসন পেতে কৈলাস শান্তভাবে বসেছিল। সামনে একটু তফাতে মুখোমুখি বসেছিল প্রমীলা। ঘরের ভেতর রোদের আলো এসে পড়েছে, তবু একটা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছিল। ধূপ পুড়ছিল।

কৈলাস পড়ছিল—সেই মহাদেবই ভাস্কর, সেই মহাদেবীই প্রভা। এই শঙ্কর-শঙ্করী-ই আকাশ ও পৃথিবী, সমুদ্র ও বেলা, বৃক্ষ ও লতা...

প্রমীলা হঠাৎ অনুরোধ করে...একটু থামুন কৈলাসভাই। আমি এখনি আসছি।

পড়া থামিয়ে কৈলাস বলে—কেন?

প্রমীলা ব্যস্তভাবে দাঁড়িয়ে বলে—জল ফুটছে, ডাল ছেড়ে দিয়ে আসি, নইলে রান্না দেরী হয়ে যাবে। ডাকগাড়ী এসে গেলে ওর আবার খাবার সময় হবে না।

প্রমীলা চলে যায়। কৈলাস বইটা একেবারে বন্ধ করে দিয়ে চুপ করে বসে থাকে। এক মুঠো ধূপের গুঁড়ো নিয়ে আগুনের সরার ওপর ছড়িয়ে দেয়। ভুর ভুর করে সুরভিত ধোঁয়ায় ঘরের বাতাস আচ্ছন্ন হতে থাকে। কৈলাসের মূর্তিটা যেন তার মধ্যে অত্যন্ত অবাস্তব ও অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ পরই ফিরে আসে প্রমীলা। নিজের জায়গাটিতে বসে। আগ্রহ করে বলে—পড়ুন।

শিবপুরাণের অধ্যায়টা খুঁজে বের করতে অনেক সময় লাগে কৈলাসের, হাতটা অকারণে কাঁপতে থাকে।

হঠাৎ প্রমীলার দিকে চোখ তুলে তাকায় কৈলাস। দৃষ্টিটা বড় প্রখর, শিবভক্তেরও চোখে যেন আগুনের আভা ঝলকায়।

কৈলাস বলে—শিবের আরাধনায় কোন ফাঁকি রাখতে নেই প্রমীলা।

তারপরেই পড়তে আরম্ভ করে কৈলাস—যিনি ভূমি নহেন, জল নহেন, আকাশ নহেন। যাঁর তন্দ্রা নেই, নিদ্রা নেই, গ্রীষ্ম নেই, শীত নেই। যাঁর দেশ নেই, ঘর নেই, সেই, সেই শিবকে...

কৈলাসের গলার স্বর যেন এক কান্নার আবেগে ভেঙে পড়তে চায়। প্রমীলা স্থির দৃষ্টি তুলে দেখতে থাকে, পাঠ শোনে।

কৈলাস যেন ব্যাখ্যা করার জন্যই বলে—তার কিছু নেই প্রমীলা! সে একেবারে শূন্য।

প্রমীলা বলে—পড়ুন।

কৈলাস পড়ে—সে শুধু বিষপান করে, তাই সে নীলকণ্ঠ। সাপ তার গলা জড়িয়ে ধরেছে। তবু তারই বাম অঙ্গের শোভা হয়ে রয়েছেন স্বয়ং পার্বতী।

পড়তে পড়তে কৈলাস হঠাৎ থেমে যায়। অনেকক্ষণ মুখ নীচু করে বসে থাকে।

প্রমীলা বলে—পড়ুন।

কৈলাস তাকায় প্রমীলার দিকে। অন্তরের সমস্ত বিশ্বাস চরম আবেদনের মত ফুটে ওঠে, বুকভরা আগ্রহ নিয়ে কৈলাস ডাকে—কাছে এস প্রমীলা। পাসে বসো।

প্রমীলা সেইখানেই নিশ্চলভাবে বসে থেকে বলে—পড়ুন।

একটা ধোঁয়ার পুঞ্জ কৈলাসের ওপর দিয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কৈলাসের মূর্তিটাকেও বদলে দিয়ে গেল। যেন কৈলাসের মাথায় আগুন ধরে গেছে। মুখটা একেবারে কালো হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টিটা নীরব হাহাকারের মত, এক রিক্ত জগতের চারদিকে অসহায়ের মত ছুটাছুটি করছে।

এত সেয়ানা শক্ত মানুষ কৈলাস যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। আবোল-তাবোল বক্‌ছে—আমি শিবের পুজো কেন করি, তা আমি নিজেই জানি না প্রমীলা। বোধ হয় জীবনে কোনো গৌরীর মূর্তিকে স্বচক্ষে দেখতে পাব, সেই লোভে...

প্রমীলার নিশ্চল মূর্তিটা যেন একটা আঘাত লেগে আচমকা নড়ে উঠলো। তার পরেই আবার স্থির হয়ে রইল।

কৈলাস বলে—দেবতা হোক আর মহাপুরুষ হোক, জীবনে কারও গৌরী-লাভ হয় না জানি। মহাদেবও গৌরীর অর্ধেকটুকু পেয়েছিলেন প্রমীলা। আমি কোন ছার।

চিরকালের বোকা মেয়ে প্রমীলা চমকে উঠলো। মাথা হেঁট করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

কৈলাস যেন বুদ্ধিসুদ্ধি হারিয়ে একেবারে পাগল হয়ে গেছে—অনন্ত ভাইয়ের কাছে আমি কোনো দোষ করতে চাই না প্রমীলা, তার কিছুই কাড়তে চাই না। আমি চোর নই।

মাথা হেঁট করেই ভয়ার্ত স্বরে প্রমীলা বলে—তবে আপনি কি?

কৈলাস—আমি ভক্ত। সত্যিই আমি শুধু ভক্ত, প্রমীলা। শিব আমার ভরসা।

প্রমীলা—আপনার কথা বুঝতে পারছি না, কৈলাস ভাই।

কৈলাস—শুধু তোমার ভালবাসার অর্ধেকটুকু প্রমীলা।

প্রমীলা মুখ তুলে তাকলো—কি বললেন?

কৈলাস—আমার যেটুকু পাওনা, তাই বললাম।

প্রমীলা আর মাথা হেঁট করলো না। যেন একটা জ্বালার আঁচ লেগেছে, চোখ দুটো বন্ধ করে কিছুক্ষণ বসে থাকে প্রমীলা।

প্রমীলার চোখ নিংড়ে বড় বড় জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছিল। হঠাৎ ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়ালো কৈলাস। কোথায় গৌরী? গৌরীরূপের কোন চিহ্ন নেই এই মেয়ের মুখে। আকুল হয়ে কাঁদছে, এ যে সীতার মূর্তি। অতি বোকা, অতি ছিচকাঁদুনে অথচ অত্যন্ত টিট মেয়ে এই রামায়ণের সীতা।

একটা তাচ্ছিল্যের ঠেলা দিয়ে শিবপুরাণ পাশে সরিয়ে রাখলো কৈলাস, এই ব্যর্থ অপদার্থ মন্ত্রের জঞ্জাল। একটা ছলনার সিঁড়ি, মানুষকে ঝুটা দেবত্বের গাছে তুলে দিয়েই দূরে সরে যায়।

পালিয়ে যাবার আগে প্রমীলার সামনে একবার দাঁড়ালো কৈলাস। কৈলাসের হাত-পা কাঁপছে। শুধু একটা কথা বলার চেষ্টা করতে গিয়ে কৈলাস বুঝলো—গলা কাঁপছে।

আর মুহূর্ত দেরী করল না কৈলাস। ভেতর ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে দোকান ঘর। তারপরেই ছোট মাঠের ওপর দিয়ে এক দমে হন্‌হন্‌ করে হেঁটে পথের মোড়ে এসে পৌছাল কৈলাস।

একেবারে নির্জন হয়ে রয়েছে মোড়টা। কোনো সাড়াশব্দ নেই। বস্তির ঘরগুলির কপাট বন্ধ। কোনো গাড়ি দাঁড়িয়ে নেই, গাড়ির চলাচলও নেই। নতুন সরাইয়ের জীবনের সাড়া যেন শালবন ভেদ করে দূরান্তরে পালিয়ে গেছে। এক বৈরাগীর ছাড়াভিটার মত নতুন সরাইয়ের শব্দমুখর পথের মোড় আরও গভীর শূন্যতায় উদাস হয়ে রয়েছে।

তসীল-কাছারির ফটকটা কেল্লার দরজার মত। কাছারির চারিদিক বেঁটে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। একটা কাঁচা সড়ক নানাদিক ঘুরে ফিরে ফটকের কাছে এসে শেষ হয়েছে, প্রাচীরে ঘেরা এই ভূখণ্ডের ওপর ছোট ছোট সবুজ ঘাসের আঙিনা আর কাছারি ঘর। শুধু তসীল কাছারি নয়, কাছাকাছি আশেপাশে এক সৌভ্রাত্রের আবেগে অনেকগুলি অফিস দাঁড়িয়ে আছে। একটা খাজনাখানা আর জঙ্গল অফিস, একটা আবগারী অফিস, একটা ডাকঘর। ছোট একটা কৃষি অফিসও আছে—একটা অকেজো ট্র্যাক্টরের মরচে-পড়া কঙ্কাল কাত হয়ে পড়ে আছে সম্মুখের ঘাসের ওপর। ফটক পার হয়ে প্রথম দালান হলো থানাবাড়ি। ছোট ছোট অফিস আর ছোট ছোট আমলা, কিন্তু খুব বড় বড় কাজ হয়। এক বছরের ঘুষের টাকা এক সঙ্গে জমা করলে ইঁটের বদলে তাই দিয়ে আর একটা পাঁচিল তোলা যায়। সার্কেলের পেয়াদাটার মুখে শুধু একটু খুশি মেজাজের হাসি ফুটিয়ে তুলতে হলেও চার আনা ঘুষ দিতে হয়। কথা বলতে আট আনা—আর টেবিলের ওপর দরখাস্ত পৌঁছে দিতে এক টাকা। কয়েকটা গাঁ ডিহি বস্তি আর সরাই, কয়েকটা জঙ্গল পাহাড় ঝর্ণা আর ক্ষেত, কয়েক হাজার দীন মানুষের পাপ-পুণ্য সুখ-দুঃখ শোক ও উৎসবের মধ্যে নিতান্ত অবান্তর এই তসীল কাছারি। তারই ফটকে কয়েক শত মানুষ আজ হানা দিয়েছে, যেন এক দুঃস্বপ্নের সঙ্গে

বোঝাপড়া করতে, হিসেব নিকেশ করতে।

সমস্ত কাছারি বাড়িটার পাগড়ী আর উর্দি গরম হয়ে উঠেছে। লাঠিধারি পুলিসেরা সার বেঁধে পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে যেন পাঁচিল টপকে কেউ ভেতরে না ঢুকতে পারে। ফটকের পথ রুখে প্রথম দফায় দাঁড়িয়ে ছিল একদল গুর্খা সৈনিক, সঙ্গে একজন গোরা মেজর। টেলিগ্রাম পাওয়ামাত্র চটপট মোটর লরী দাবড়িয়ে চলে এসেছে। সদর থেকে এক রায় বাহাদুর এস-ডি-ও পত্রপাঠ দলে এসেছেন। ভুঁড়ির ওপর বেল্ট, বেল্টের সঙ্গে রিভলভার। ভুঁড়িতে যতই স্নেহপদার্থ থাকুক রিভলভারটি একেবারে স্নেহবর্জিত। থানা-ইনচার্জ দারোগাবাবু হাতে বন্দুক তুলে নিয়েছেন।

মাত্র তিন শত গ্রাম্য মানুষের একটা জনতা। কারও হাতে একটা লাঠিও নেই। মনের ভুলে লাঠি ছেড়ে দিয়েছে তা নয়, ইচ্ছে করেই ওরা আজ লাঠি ছোঁবে না। কারও মাথার খুলি ভাঙতে ওরা আসেনি। ওদের দাবীটা বড়ই অদ্ভুত। শুনতে খুবই সামান্য, বলতে খুবই সোজা, বলছেও খুব স্পষ্ট করেই। কিন্তু ভাবতে বড় ভয়ানক। এক চরম বিপর্যয়ের মন্ত্র যেন ওদের দাবীতে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। তসীল কাছারির সমস্ত নথিপত্র, কয়েক শত বছরের অপমানের ইতিহাসকে আজ শুধু ওরা হাতের মুঠোয় পেতে চাইছে। এই নথিপত্র নিয়ে ওরা চলে যাবে, কোন্ এক অলক্ষ্য বৈতরণীর জলে চিরকালের মত ভাসিয়ে দেবে কে জানে?

সবচেয়ে আশ্চর্য, অস্ত্রে আয়ুধে ও হিংস্র দম্ভে কণ্টকিত এই ফটকের মুখেই এসে ওরা ভিড় করেছে। থরে থরে সাজানো এই মৃত্যুর ভ্রূকুটি ভেদ করে, এই পথেই ওরা কাছারি এলাকায় ঢুকতে চায়। পাঁচিল টপকে ভেতরে যাবার কোনো স্পৃহা নেই কারও মনে। সস্তা পথে কোনো লাভ নেই, চালাকির কেউ ধার ধারে না। ওরা ফাঁকির তক্ষক নয়। পিস্তল বন্দুকের ঔদ্ধত্য অবাধে তুচ্ছ করে, এই দুঃস্বপ্নকে বিদ্রূপে ব্যর্থ করে দিয়ে ওরা চলে যাবে। তাই ওরা এগিয়ে যাবে। এগিয়ে চললো।

থানার জমাদার গর্ গর্ করে গলার রগ কাঁপিয়ে হুঁসিয়ারী চিৎকার ছাড়লেন—হঠ্না হ্যায় তো হঠ্ যাও, নেহি তো মর যাওগে।

ঝটপট সঙ্গীন চড়িয়ে গুর্খা রাইফেলস্ শক্ত হয়ে দাঁড়ালো।

—হঠ্ যাও হিন্দুস্থানসে! মত্ত ঝড়ের গর্জনের মত প্রত্যুত্তর দিয়ে জনতা ফটকের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল।

—হঠ্না হ্যায় তো হঠ্ যাও, নেহি তো মর যাওগে। আবার সেই গলার শিরা কাঁপানো মৃত্যুর

টোটাভরা রাইফেলগুলি নিশানা করে যেন ফণা তুলে স্থির হয়ে রইল।

—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। নবীন মেঘের ভেরীর মত জনতার সংকল্প আবার প্রত্যুত্তর দেয়।

এস-ডি-ও অর্ডার হাঁকলেন—ফায়ার!

এক রাউণ্ড গুলি বারুদের গন্ধ উড়িয়ে সশব্দে ছিটকে পড়লো। জনতা যেন আচমকা ছন্নছাড়া হয়ে সড়কের উল্টো দিকে বহু দূর পর্যন্ত পিছিয়ে গেল। কেউ পথের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপলো, কেউ হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল, কেউ আতঙ্কে দৌড় দিল।

বারুদের প্রথম দফা ধোঁয়া আর গন্ধ মিটে যেতে না-যেতেই এই পিছে হঠে-যাওয়ার দৃশ্যের

মধ্যে মাত্র একটি বেপরোয়া আত্মার ছবি ফটকের উপর হানা দেবার জন্য একলা ছুটে এগিয়ে গেল।

—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে! করেঙ্গে ইয়া—

অনন্তরামের মন্ত্রের অনুচ্চারিত সংকল্প পূর্ণ হলো। মেজরের রিভলবারের গুলি এক নিমেষে ছুটে এসে অনন্তরামের বুকের পাঁজর ফুটো করে দিয়েছে।

কয়েকটি মুহূর্তের মত, এক স্পন্দনহীন মূক পৃথিবীর স্তব্ধতার মধ্যে মাটিতে লুটিয়ে ছটফট করে নিজে রঙীন হয়ে উঠলো অনন্ত, মাটি রঙীন হলো।

এর পরের ঘটনার হিসেব অনন্তরাম জেনে গেল না। সবার আগে কারও কাছে বিদায় না নিয়েই সে চলে গেছে। কিন্তু ঐ জনতা অনন্তরামকে বিদায় দেবার জন্য কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে এসে তসীল কাছারির ফটকে দাঁড়িয়েছে। লাঠি তরবারি বল্লম বন্দুক ইঁট পাটকেল চালিয়েছে। প্রাণ দিয়েছে, প্রাণ নিয়েছে। তসীল কাছারির ফটকে শোণিতের উৎসব কিছুক্ষণের জন্য ভয়াল হয়ে উঠেছে। সমস্ত কাছারি এলাকা আগুনে পুড়ে গেছে। শুধু দালানের কালো কালো দেয়ালগুলি বিধ্বস্ত প্রেতালয়ের চিহ্নের মত দাঁড়িয়ে থাকে। অঢেল ফুলের স্তবকে শবাধার সাজিয়ে অনন্তরামকে তারা তুলে নিয়ে চলে যায়।

তসীল কাছারির ফটকে ঐ যে একখণ্ড ভূমি, অনন্তরাম যার মাটিকে রঙীন করে দিয়ে গেল, সেই মাটিই এখ-এক খাবলা লোকে তুলে নিয়ে গেল। শক্ত পাথুরে মাটি, লোকে জল ঢেলে নরম করে নিয়ে এক-এক মুঠো কাদা নিয়ে যায়, যেন এক মুঠো পুণ্যের পরমাণু।

শোণিত আর আগুনের খেলা থেমেছে। কিন্তু সকাল সন্ধ্যে লোক আসছে তসীল কাছারির ফটকে, এ গাঁ থেকে, ও গাঁ থেকে—ভিন্ন জেলার বাজার ও বস্তি থেকে—মাটি নিতে। শুধু এক মুঠো মাটি।

পোড়া কাছারির ফটকে দিনকয়েক পরে আবার দেখা দিল পুলিস আর ফৌজের লোক। আর পাহারা দেবার মত কিছু নেই। কিন্তু বাধা দেবার মত আর একটা কাজ তারা পেয়ে গেছে। ঐ একখণ্ড ভয়ানক জমির মাটিকে তারা ঘিরে ধরলো—কেউ মাটি নিতে পারবে না।

সত্যি কেউ মাটি নিতে পারে না। লোকে একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকে। তারপর হতাশ হয়ে চলে যায়।

একদিন, দু'দিন, তিনদিন—সপ্তাহ কেটে যায়। তারও পরে শালবনের মাথার ওপর দিয়ে প্রতি রাত্রিতে কৃষ্ণা তিথির ক্ষীণ চাঁদের রূপ ধীরে ধীরে ভরে উঠতে থাকে। হঠাৎ একদিন ভোরের আলোকে দেখা যায়, ঐ একখণ্ড মাটির গায়ে সবুজ ঘাসের আবির্ভাব সাড়া দিয়ে উঠেছে। পুলিস আর ফৌজের মানুষগুলিকে হঠাৎ দেখতে নতুন রকমের লাগে। যেন তীর্থভূমির পবিত্রতাকে ওরা পাহারা দিয়ে সযত্নে আগলে রেখেছে। ওরা এখনো জানে না যে ভবিষ্যতের কোনো পথিক হয়তো দেবালয় দেখবার জন্য ঠিক এইখানে, এই ভয়ানক মাটির কাছে এসে এমনি এক সকালবেলায়...

এমনি এক সকালবেলায় মাত্র কয়েকটা দিন পরে তীর্থযাত্রীর মত কয়েকটি মানুষ হেঁটে হেঁটে তসীল কাছারির ফটকের প্রায় কাছাকাছি কাশফুলে ছাওয়া মাঠের ওপরে এসে দাঁড়ালো। প্রমীলা, প্রমীলার বাবা নন্দলাল, প্রমীলার ছোট ভাই বাসুদেব আর কৈলাস।

কি দেখতে ওরা এসেছে তা নিজেরাই ভাল করে জানে না। তবু এরা তাকিয়েছিল ফটকের দিকে। বুড়ো নন্দলালের একজোড়া হতভম্ব চোখ চলে ভিজে গিয়েছে। বোধহয় লক্ষ বছরের ধৈর্যে কঠিন, পিতা হিমাদ্রির বুকের বরফে আবার নতুন করে পুত্রশোকের জ্বালা লেগেছে।

ছোট ছেলে বাসুদেব যেন কান্না লুকোবার জন্যে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হিন্দুস্থানে দেবদারু বনের একটি শিশু-ঝড় হঠাৎ বড় আকাশের মেঘের দিকে তাকাতে গিয়ে চোখে জলের ঝাপটা লেগেছে, ভাল করে বুঝতে পারছে না বলেই অভিমান হয়েছে।

সবার পেছনে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল কৈলাস।

শুধু কাঁদতে পারলো না বিধবা প্রমীলা। প্রমীলা যেন এক তপস্বিনী সিদ্ধার্থিকার সত্তা লাভ করেছে। জীবনের এত বড়ো ক্ষতিটার হিসেব খতিয়ে দেখবার কোনো গরজ নেই। কোনো দুঃখকে আজ যেন আমল দিচ্ছে না প্রমীলা। কেমন দেবী-দেবী ভাব। যেন একটা চন্দন-চর্চিত কঠিন আত্মাভিমানের মূর্তি। যাবার আগে একটা মুখের কথা পর্যন্ত না বলে যে চলে গেল, তার দেওয়া শাস্তি সে নিশ্চয় গ্রহণ করবে। কিন্তু কেঁদে কেটে নয়, হেসে হেসেও নয়—একেবারে শূন্য হয়ে গিয়ে। এই কয়টা দিন, সকাল সন্ধ্যা ও রাত্রি, শুধু গভীর বিশ্বাসে শিবনাম জপেছে আর শিবস্তোত্র পড়েছে প্রমীলা। শূন্যতার ভগবান তাকে কৃপা করে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

ঘরে ফেরবার আগে প্রমীলা একবার কৈলাসের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো—আর কাঁদবেন না, কৈলাসভাই।

এই সান্ত্বনাকে সইতে না পেরে কৈলাস যেন অভিমানী ছেলেমানুষের মত আরও বেশী আবোল-তাবোল বকতে আরম্ভ করলো—আমি শিবভক্ত। প্রমীলা বহিন তুমি বিশ্বাস কর, আমি সত্যিই ভক্ত, শুধু ভক্ত।

তপস্বিনীর হৃদয়ভরা শূন্যতার গায়ে নেহাত অসাবধানে যেন এক টুকরো মেঘের সজলতা লাগে। প্রমীলার গলার স্বর আর-একবার যেন ভুল করে মমতার ছোঁয়ায় স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে— হ্যাঁ কৈলাসভাই।

কৈলাস—তাই তো আমি শিবালয় দেখতে এখানে এসেছি।

শিবালয়! প্রমীলার শুকনো চোখের দৃষ্টি তসীল কাছারির ফটকের একখণ্ড ঈষৎ শ্যামল মাটির বেদীর ওপর গিয়ে লুটিয়ে পড়লো। দুটো পুলিস তখনো জায়গাটা পাহারা দিচ্ছে। লম্বা লম্বা লাঠির ছায়া পড়েছে মাটির ওপর।

প্রমীলাদের সামনে অনেকগুলি কৌতূহলী পথচারী লোক একটা বিস্ময়ের ভিড় সৃষ্টি করে দাঁড়িয়েছিল। তারা শুধু বুঝতে চেষ্টা করছিল—কে এরা?

হঠাৎ বুকফাটা শোকের বিলাপ বাতাসে ছড়িয়ে, সুর করে টেনে টেনে, মাথা কুটে, ক্ষমা চেয়ে, কেঁদে উঠলো প্রমীলা। গৌরী নয়, সীতাও নয়। কৌতূহলী জনতা শুধু বুঝতে পারলো, নতুন সরাইয়ের অনন্ত মুদির বউ কাঁদছে।

জঞ্জালীর জ্বালা

ওই যে রূপসী নারী, যার নাম মুক্তাকণা, যাকে আজ এক বছর ধরে সদাসর্বদা চোখের সামনে দেখছেন ছোট কুমারসাহেব, অর্থাৎ রায়জাদা অবনীশ রায়, তাকেই আজ মাঝরাতের অথবা শেষরাতের কোন প্রহরে হঠাৎ ঘুমভাঙা চোখ তুলে দেখতে গিয়ে তিনি চমকে ওঠেন। এবং চমকে উঠলেও অনেকক্ষণ ধরে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে মুক্তাকণা নামে ওই নারীর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে কি যেন বুঝতে চেষ্টা করেন ছোট কুমারসাহেব। অর্থাৎ মজ্জিলনগরের রাজবাড়ির সেই শৌখিন আর ফূর্তিবিলাসী মানুষটি, সেই রায়জাদা অবনীশ রায়।

ইনি হলেন সেই অবনীশ রায়; যিনি স্কচ-হুইস্কি, কবুতরের মাংস, ডিটেকটিভ গল্প আর তাসের রং-মিল খেলা ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু ভালবাসেন কিনা, তা কেউ জানে না। হ্যাঁ, এই এক বছর ধরে আর একটি বস্তু তাঁর ফূর্তিময় জীবনের নতুন বিলাস হয়ে উঠেছে। সে হলো ওই মুক্তাকণা। অবনীশ রায়ের ঘরনী নয় মুক্তাকণা, শুধু সঙ্গিনী, যদিও সে এক বছর ধরে দিন ও রাতের সকল মুহূর্তে অবনীশ রায়ের ঘরের শোভা আর মোহ হয়ে রয়েছে।

মাঝরাতে ও শেষরাতের কোন প্রহরে অবনীশের হুইস্কির নেশা যখন একঘুমের পর ফিকে হয়ে যায়, তখন ধড়ফড় করে জেগে উঠে দেখতে পায়, ঘরের খোলা জানালার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মুক্তাকণা। জানালার বাইরে শুধু নিরেট অন্ধকার, তা ছাড়া আর-কিছুই দেখবার নেই; তবু সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে মুক্তাকণা, দু'চোখের পলক পড়ে না।

অবশ্য রোজই নয়, মাঝে মাঝে, এবং বিশেষ করে কোন নতুন জায়গায় এসে আশ্রয় নেবার পর প্রথম কয়েকটি রাত্রিতে অবনীশের সঙ্গিনী ওই নারীর মন যেন একটা নিশির ডাক শুনতে পায়। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, যে-রাতে আকাশে আর মাটিতে ধবধবে চাঁদের আলো ছড়িয়ে থাকে, সে-রাতে কখনও এমন ঘটনা ঘটে না। চাঁদনী রাতের সঙ্গে যেন একটা আড়ি আছে মুক্তাকণার। যে-রাতে বাইরে আকাশভরা চাঁদের আলো, সে-রাতে ঘরের ভিতর ফরাসের উপর পড়ে অঘোরে ঘুমোতে থাকে মুক্তাকণা।

প্রথম দেখা গিয়েছিল, আগ্রার সেই হোটেলের ঘরে। তারপর একবার সাসারামের ডাক-বাংলোতে। তারপর মধুপুরে অবনীশের নিজেরই এস্টেটের সেই প্রকাণ্ড বাড়িতে, যার চারদিকে বসরাই গোলাপের মস্ত বড় বাগান। কে জানে কখন, বোধহয় ঠিক যখন গভীর ঘুমে অসাড় হয়ে পড়ে থাকে অবনীশ রায়ের নেশাড়ে শরীর, আর বাইরের কালো অন্ধাকরে ক্লান্ত জোনাকির পাখাও আর মিটমিট করে জ্বলে না, তখন হয় এই ঘর, নয় ওই ঘরের কোন একটা খোলা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মুক্তাকণা। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, মুক্তাকণার সারা মুখ জুড়ে সেই সময় একটা কৌতুকের হাসি থমথম করে। যেন বাইরের অন্ধকারের সঙ্গে মনে মনে একটা ঠাট্টার খেলা খেলছে মুক্তাকণা।

মধুপুরের বাড়িতে যে-দৃশ্য দেখতে হয়েছিল, সেই দৃশ্য হীরাপুরের বাড়িতে এসেও অবনীশের দেখতে হলো। ঠিক সেই রকম আবার মাঝরাতে ঘরের খোলা জানালার কাছে গিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, আর মনে হয়, সেই রকম ভঙ্গিতে হাসছে মুক্তাকণা।

দেখতে পেয়ে অবনীশের নেশালস্ মনের দুঃসহ বিস্ময় যেন ক্ষুব্ধ হয়ে কঠোর স্বরে চিৎকার

করে ওঠে : "কে তুমি? কি করছ ওখানে দাঁড়িয়ে?"

মুক্তাকণা যেন এত শক্ত ধমকের শব্দটাকে শুনতে পায়নি। আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে আর আনমনার মতো অবনীশের মুখের দিকে একটা শূন্য চাহনি নিয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপরেই চমকে উঠে বলে, "আমি, আমি, আমি।"

আস্তে আস্তে মুক্তাকণার দিকে এগিয়ে যায় অবনীশ। গম্ভীরভাবে বলে, "কী ব্যাপার মুক্তা? ও-রকম করে হাসছ কেন? তোমাকে এত অদ্ভুত দেখাচ্ছে কেন?"

সত্যিই মুক্তাকে বড় অদ্ভুত দেখায়। খোলা জানালা দিয়ে শুধু বাইরের ঘন অন্ধকারের ভয়াল চেহারাটা দেখা যায়। দিগন্ত জুড়ে ঠেসে রয়েছে সেই নিরেট অন্ধকার। আকাশে তারা ঝিকমিক করে; মনে হয় তারাগুলি ভয় পেয়ে কাঁদছে। দেখা যায় না, নিকটে বা দূরে কোথায় গাছপালার ভিড় মুখ লুকিয়ে রয়েছে। শুধু বড় বড় তালের মাথাগুলিকে এক-আধটুকু ঠাহর করা যায়। তালের পাতায় বোধহয় মাথা ঠুকছে কোন রুগ্ন শকুন। তাই একটা ক্ষীণ আর্তনাদ যেন আছাড় খেয়ে কাঁপতে থাকে। আর শোনা যায়, দূরের ঝাউবনের একটানা হাঁপানির শব্দ। বাতাস কখনও মৃদু হয়ে, আবার কখনও বা এলোপাথাড়ি ঝড়ের মতো হয়ে সেই অন্ধকারের জগৎ থেকে যত আক্ষেপ আর যত অদ্ভুত কাতরানির শব্দ ছড়িয়ে বেড়ায়। মুক্তাকণা চুপ করে আর দু'চোখ অপলক করে বাইরের সেই অন্ধকার দেখে, আর কাতরানির স্বর শোনে।

ঘরের ভিতরে আলো জ্বলে, তাই মুক্তার মুখটাকে খুব স্পষ্ট দেখা যায়। দেখতে পায় অবনীশ, বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মুক্তার চোখ দুটো যেন দপদপ করে হাসে। অত যত্ন করে বাঁধা খোঁপা, তাও যেন একেবারে ভেঙেচুরে ঝরে পড়তে চায়। ফুরফুর করে উড়তে থাকে উসকো-খুসকো চুল। মুক্তার কপালটা লালচে হয়ে ওঠে, যেন আগুনের আঁচ লেগেছে। দাঁতে দাঁতে ঘষা লেগে বিশ্রী শব্দও হয়। পান-খাওয়া ঠোঁট, মুক্তার সেই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে যেন রক্তমাখা লালা ঝরে পড়তে চায়। বড় অস্বাভাবিক মুক্তার মূর্তি। মাঝে মাঝে থরথর করে কাঁপে মুক্তার শরীরটা। ওর চোখ মুখ ঠোঁট, সবই যেন ওই অন্ধকারের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে নিঃশব্দে কথা বলছিল। কে জানে কোন ভয়ানক রহস্যের কথা! সেই রহস্য যেন একটা ভাষ্যহীন কৌতুক। তাই মুক্তার চোখ দুটো ও রকম দপদপ করে হেসে উঠছে।

অবনীশের গম্ভীর গলার স্বর শুনে আস্তে আস্তে মুখ ফেরায় মুক্তা। কিন্তু তবু মনে হয়, অবনীশের কথাগুলির অর্থ যেন সে বুঝতে পারছে না। তেমনই দুই চোখ অপলক করে অবনীশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ঘুমভাঙা চোখের ভীত বিস্মিত শিহর মুছে ফেলবার জন্য দু'হাতে চোখ ঘষে মুক্তার চোখের দিকে ভাল করে তাকায় অবনীশ রায়। কিন্তু কী অদ্ভুত, সত্যিই মুক্তাকে যে মুক্তা বলেই মনে হয় না। সারাটা দিন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, কত গানে-গল্পে আর হাসি-ঠাট্টায়, কত রঙে-ঢঙে ও রগড়ে কুমারবাবুর ফূর্তির জীবনকে মাতিয়ে রেখেছিল যে নারী, সে-নারী এখন এই মাঝরাতের স্তব্ধ প্রহরের কোন্ অভিশাপে এমন এলোমেলো হয়ে বোবা নিশাচরীর মতো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে, আর দু'চোখের তারা নাচিয়ে দপদপ করে হাসে?

অবনীশ রায়ের বিস্ময় এইবার ভয় পেয়ে শিউরে ওঠে। চেঁচিয়ে ওঠে অবনীশ, "কথা বলছ না কেন? শীগগির কথা বলো। উত্তর দাও মুক্তা।"

মুক্তার চোখ দুটো এইবার ভয় পেয়ে চমকে ওঠে। যেন এতক্ষণে অবনীশের কথাগুলি কানে

শুনতে পেয়েছে মুক্তা। ব্যস্তভাবে শাড়ির আঁচল গায়ে জড়িয়ে মূর্তিটাকে একটু স্বাভাবিক করে নিয়ে মুক্তা বলে, "কী বলব? কী শুনতে চাও তুমি?"

ভ্রূকুটি করে চেঁচিয়ে ওঠে অবনীশ, "সত্যি করে বলো।"

এইবার শিউরে ওঠে মুক্তার চোখের তারা। অবনীশের ওই প্রশ্নটা যেন তীক্ষ্ণ ছুরির মত একটা ধারালো অস্ত্র। মুক্তার জীবনের এই সুন্দর ছদ্মবেশটাকে এই মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন করে দেবার জন্য উদ্যত হয়েছে ওই প্রশ্ন। যদি উত্তর দিতে একটুও ভুল করে মুক্তা, যদি মনের ভুলে কিংবা হঠাৎ ভয়ে সত্য কথাটা বলেই ফেলে, তবে এক মুহূর্তে মুক্তার এত বড় সুখের প্রাসাদ ধুলো হয়ে যাবে। এত টাকা, এত সমাদর, এত আহ্লাদ আর এত সোনা ও জরোয়ার উপহারে ধন্য-হাওয়া ঝকঝকে জীবনের সব উল্লাস স্তব্ধ হয়ে যাবে। শুধু তাই বা কেন? অবনীশ নামে খামখেয়ালী ওই বড়লোকের মেজাজ হয়তো এই মুহূর্তে পাগল হয়ে গিয়ে তার এত আদরের মুক্তাকে ঘেন্না করে পিস্তলের একটি গুলিতে শেষ করে দেবে।

অবনীশের এই প্রশ্নটা কি তার মর্মভেদী একটা সন্দেহ? মুক্তাকণাও জানে, অবনীশের মনে মাঝে মাঝে একটা সন্দেহ বড় তীব্র হয়ে ওঠে। ভয় হয় মুক্তার, সেই সন্দেহের আঘাতে মুক্তার উপর অবনীশের এত মায়া আর ভালবাসার নেশাটাই বুঝি চুরমার হয়ে যাবে।

খিলখিল করে হেসে ওঠে : "সত্যি করে বলছি, আমি তোমারই মুক্তাকণা, শুধু তোমারই।"

হ্যাঁ, ঠিক সেই রকম ঝরণার জলের মতো উচ্ছল স্বরে হেসে উঠেছে অবনীশের সঙ্গিনী মুক্তাকণা। সকাল থেকে সন্ধ্যা, তারপর রাত, এই রূপসী নারী হেসে গেয়ে অবনীশের ফূর্তি-পিপাসাকে তৃপ্তি দিয়েছে। স্কচ-হুইস্কির নেশা কোন নেশাই নয়, যদি মুক্তাকণা নিজের হাতে গেলাস তুলে নিয়ে অবনীশের হাতের কাছে এগিয়ে না দেয়। ডিটেকটিভ গল্পের পাতার পর পাতায় ছড়ানো ঘটনার শত রহস্য নিংড়েও কোন রসের স্বাদ অনুভব করা যায় না, যদি অবনীশের বই পড়বার সময় তার গা ঘেঁষে মুক্তাকণা না বসে থাকে। বাজি রেখে মুক্তাকণারই সঙ্গে তাসের রঙ-মিল খেলে অবনীশ রায়। মুক্তাকণার কাছে মুঠো মুঠো টাকা হেরে যেতে অবনীশ রায়ের ভালই লাগে। একদিন জাগা-চোখে স্বপ্ন দেখেছে অবনীশ, মুক্তাকণার মুখটা যেন ফুলদানির উপর রাখা রয়েছে। হাসছে মুক্তাকণার সুন্দর মুখ, কাঁপছে রঙীন ঠোঁট আর চোখের কালো তারা। মনে হয় অবনীশের, মুক্তাকণা যেন তার জীবনের চিরটা কাল এইভাবে মধুর মাদক হাসিতে ভরা অফুরান যৌবনের রক্তমাংস নিয়ে থাকবে।

খুশি হয়েছে, সুখী হয়েছে অবনীশ। তাই অজস্র অঢেল উপহারে মুক্তাকণার সব সুখের দাবিকেও পূর্ণ করে দেবার জন্য সর্বক্ষণ তৈরি রয়েছে। মুক্তাকণার নিজের ব্যবহারের আলমারিতে তিনটে মখমলের বাক্স সোনার অলংকারে আর জড়োয়াতে ভরে গিয়েছে। একটা সুগন্ধ সাবান দুবার স্পর্শ করে না মুক্তা। অবনীশ নিজেই আপত্তি করে। বাসী সাবান গায়ে মাখলে মুক্তাকণার গায়ের চামড়া খসখসে হয়ে যেতে পারে, ভয় আছে অবনীশের মনে। আগ্রাতে থাকতেই মুক্তাকে কড়া হুকুম দিয়েছিল অবনীশ, "এখন থেকে রোজ আতর-জলে স্নান করবে মুক্তা। সাবধান, যেন ভুলেও কোন ভুল না হয়।"

এত বড় আদরের সিংহাসনে বসিয়ে রাখা হয়েছে যে-নারীকে, তাকে আজও মাঝে মাঝে সন্দেহ করতে হয়! অবনীশ নিজেরই উপর রাগ করে। মিছামিছি হঠাৎ ভয় পেয়ে এ-রকম সন্দেহ মনের ভিতর থেকে ডেকে আনবার দরকার ছিল না। পালিয়ে যাবে না মুক্তা, চলে যাবার কোন

লক্ষণও দেখা যায় না। কোনদিন কোন ভরা-দুপুরের আলোতে জানালার পর্দা সরিয়ে পথের মানুষের মুখের দিকে তাকায়নি মুক্তা। কাউকে চিঠি দেয় না মুক্তা; পৃথিবীর কোন আনাচ-কানাচ থেকে মুক্তার নামে কোন চিঠি আসে না। অবনীশের আদরের জগৎ থেকে মুক্তাকণাকে চুরি করে নিয়ে যাবার কোন অভিসন্ধি এই পৃথিবীতে কারো নেই। মুক্তাকণার প্রাণটাকে কিনে ফেলেছে অবনীশ। মুক্তাকণাও স্বীকার করে, মেয়েমানুষকে এমন করে এত বেশী ভালবাসা কোন স্বামীও বাসে না।

ওসব ভয় নয়। তবু কেমন যেন মনে হয়, এবং মাঝরাতের এই মুক্তাকণাকে জানালার কাছে ওই মূর্তিতে ওভাবে দপদপ করে চোখের তারা নাচিয়ে হাসতে দেখে অবনীশের মনের ভিতরটা যে শিহর সহ্য করে, সেটা একরকমের ভয়েরই শিহর। মুক্তাকণার মনের গভীরে নিশ্চয়ই কোন বেদনা লুকিয়ে আছে। নিশ্চয়ই অবনীশকে প্রাণ ঢেলে ভালবাসতে মনের ভিতর বাধছে। এবং একদিন এই বেদনার টানেই অবনীশকে ছেড়ে সন্ন্যাসিনী হবার জন্য কোথায় কোন আশ্রমের দিকে ছুটে চলে যাবে মুক্তাকণা।

মুক্তাকণার খিলখিল হাসির স্বর শুনে অবনীশের চোখের তীব্র সন্দেহ ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে যায়। সেইসঙ্গে সরে যায় ভয় এবং ভয়ের বেদনাও।

মুক্তাও বড় বুদ্ধিমতী। চট করে একটি মিনিটের মধ্যে কেমন সুন্দর আবার নতুন করে পরিপাটি সেজে অবনীশের সামনে এসে দাঁড়ায়। মুক্তাকণার গা-ভরা গহনার উপর আলোর আভা ঝলমল করে। মুক্তাকণার হাত ধরে সোফার উপর বসে অবনীশ।

মুক্তা হাসে : "তুমি হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে আর ছুটে এসে আমার মুখের দিকে ওরকম রাগ করে তাকাও কেন. বলো তো?"

অবনীশ হাসে : "তুমি কথা দাও, আর কখনও ওভাবে মাঝরাতে একা একা খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে হাসবে না?"

আশ্চর্য হয় আর ফ্যালফ্যাল করে অবনীশের দিকে তাকায় মুক্তা : "কি বলছ তুমি? যত সব মিথ্যে কথা।"

"খুব সত্যি কথা বলছি।"

মুক্তা রাগ করে : "তা হলে বলো, আমি একটা পাগল, আমার মাথায় রোগ আছে।"

আনমনার মতো আক্ষেপ করে অবনীশ : "কে জানে?"

তারপরেই হেসে ওঠে অবনীশ : "তবুও ভাল।"

কোন উত্তর দেয় না মুক্তা। শুধু কুটিল একটা ভ্রূভঙ্গী, তার মধ্যে তীব্র একটা চতুরতার ছায়া লুকোচুরি খেলতে থাকে। জানে মুক্তাকণা, এবং আজও আবার অবনীশের ওই আক্ষেপ আর অভিযোগের ভাষা শুনে বুঝতে পারে, কিসের সন্দেহে অবনীশের মাঝরাতের ঘুম-ভাঙা চোখ ওভাবে চমকে ওঠে। এক বছর ধরে এত টাকা আদর গহনা আর ভালবাসা দিয়ে কাছে ধরে রাখা নারীর মনটাকে কাছে পাওয়া গেল না, এই তো অবনীশের সন্দেহ। সাসারামের ডাকবাংলোতে সেই শীতের রাতে অবনীশ স্পষ্ট ভাষায় মুক্তাকণার কাছে এই অভিযোগ করতে গিয়ে ফুঁপিয়ে উঠেছিল। সত্যিই বড় ব্যথা পায় ছোট কুমারসাহেব। মুক্তাকণার ভালবাসায় কোন ঘাটতি কমতি ফাঁকি কিংবা ভেজাল আছে, ভাবতেই চমকে শিউরে আর চেঁচিয়ে প্রায় আধ-পাগলের মতো হয়ে যায় ভদ্রলোক।

যেমন আগ্রার হোটেলে, সাসারামের ডাকবাংলোতে আর মধুপুরের গোলাপবাগে তেমনই আজও হীরাপুরের এই বাড়িতে মাঝরাতের প্রহরে সোফার উপর বসে ফূর্তিময় জীবনের সবচেয়ে বড় সাধের সঙ্গিনী এই মুক্তাকণাকে হঠাৎ ব্যাকুলভাবে বুকে জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন করে অবনীশ, "সত্যি করে বলো মুক্তা।"

এই প্রশ্ন শোনবার জন্য মনে মনে তৈরি ছিল মুক্তা। এই প্রশ্নের কি উত্তর দিতে হবে, তাও জানে মুক্তা, এবং মনে মনে সেই উত্তর তৈরি রেখেছে। তাই প্রশ্ন শোনবার সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল করে হেসে বলতে থাকে : "সত্যি করে বলছি, তুমি আমার ভালবাসার দেবতা গো। আমার স্বামী তোমার চেয়ে ঢের বড়লোক ছিল, কিন্তু সে মানুষটা তো তোমার মত ভালবাসতে পারেনি কোন দিন। তাই তো ভাবি....ভাবলে আমার পরাণটাই যে হেসে ওঠে গো, কী ভাগ্যির জোরেই না তোমাকে পেয়েছি!"

আর বেশি কিছু বলবার দরকার হয় না। অবনীশের ক্লান্ত নেশার সব উদ্বেগ দূর হয়ে যায়। ওই নারী, মুক্তাকণা যার নাম, যার দুই চোখের কোলে সরু কাজলের টান এখন আরও মায়াময় হয়ে অবনীশের বুকের নিঃশ্বাসে টান ধরিয়ে দিচ্ছে, সেই নারী হলো বিচিত্র এক কাহিনীর নারী। ওই কাহিনীটা না থাকলে মুক্তাকণা আজ মজিলনগরের ছোট কুমারসাহেব রায়জাদা অবনীশ রায়ের শৌখিন জীবনের সর্বক্ষণের আমোদের কাছে এত বড় আদরের জিনিস হয়ে উঠতে পারত না নিশ্চয়। বেশ উঁচু বংশের অতি বনেদী এক পরিবারের মেয়ে হলো মুক্তাকণা। দিনাজপুরের মস্ত এক জমিদার বাড়ির বধূ হলো এই মুক্তাকণা। যেমন বড়লোক, তেমনিই শিক্ষিত সেই জমিদার। কিন্তু মুক্তাকণার দুর্ভাগ্য, স্বামী তাকে ভালবাসতে পারেনি। লেখাপড়া জানে না মুক্তাকণা, এই তার অপরাধ। একদিন শ্রাবণের এক ভয়ানক ঝড়ের রাতে স্বামী হঠাৎ হিংস্রমূর্তি ধারণ করে ঘুমন্ত মুক্তাকণাকে হাত ধরে টেনে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে ঘরের বাইরে ঠেলে দিয়েছিল, আর মুক্তার হাতে তুলে দিয়েছিল বিষের শিশি : "যাও আত্মহত্যা করে আমাকে নিশ্চিন্ত করে দাও।" শুধু এই কথা বলে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল সেই জমিদার স্বামী।

তারপর? সে-কাহিনীও শুনেছে অবনীশ। তারপর স্বামীর বিতাড়িতা ওই মুক্তাকণা সন্ন্যাসিনী হবার জন্য কাশী রওনা হয়ে গেল। কিন্তু টাকা-পয়সার অভাবে কাশী পর্যন্তও পৌঁছতে পারেনি। গয়া পর্যন্ত এসে এবং এক সরাইখানার কুঠুরির ভিতরে আশ্রয় নিয়ে, আর ঘরের কপাট বন্ধ করে দু'দিন ও দু'রাত শুধু কেঁদেছিল।

তারপর? তারপর এক অদ্ভুত ঘটনার অনুগ্রহে অবনীশের সঙ্গে মুক্তাকণার দেখা হয়ে গেল। ভাগ্য ভাল, সেই সময়ে গয়া শহরের কাছে ফল্গুর ধারে অবনীশ রায় তার সেই নতুন বাংলোবাড়িতে ছিল। ভাগ্যিস সরাইখানার দারোয়ান সেই বাবুলালকে আগে থেকেই জানত অবনীশ। আরও ভাগ্যের কথা, বাবুলাল নামে সেই লোকটাও অনেকদিন থেকেই জানত, কি চান, কি খুঁজছেন এবং কোনটি পেলে খুশি হবেন ছোট কুমারসাহেব।

বাবুলাল এসে প্রথম খবরটা দিয়েছিল, "আপনি যেমনটি চান ঠিক তেমনটি জিনিস পাওয়া গেছে হুজুর।"

"কোথায়? কে সে?" হুইস্কির ঢেঁকুর তুলে প্রশ্ন করে অবনীশ।

"সরাইখানার ঘরে দরজা বন্ধ করে কাঁদছে সে। মস্ত বড় এক জমিদারের বউ। দেখতে যেমন সুন্দর, শরীরটিও তেমনি ডাগর, আর চলন-বলন বড়ই শরিফ, বহুত বহুত মিঠা।"

"কেন? কিসের দুঃখে কাঁদছে?"

"স্বামী তাড়িয়ে দিয়েছে। তাই কাশী চলে গিয়ে সন্ন্যাসিনী হতে চায়।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অবনীশ। চোখ জুড়ে তীব্র একটা পিপাসার উল্লাস জ্বলজ্বল করে। বাবুলালের হাতে এক শো টাকার নোট তুলে দিয়ে অনুরোধ করে অবনীশ : "চেষ্টা কর মুন্সী; যেন কোনমতেই হাতছাড়া না হয়।"

না, হাতছাড়া হয়নি। তাই তো আজ সেই নারী ছোট কুমারসাহেব অবনীশ রায়ের ফূর্তিময় জীবনের সঙ্গিনী হয়ে এই হীরাপুরের বাড়িতে সোফার উপর বসে আছে, আজ তার গা-ভরা গহনা আলোর আভায় ঝলমল করছে।

মুক্তাকণার মুখের হাসিও ঝলমল করে ওঠে। মুক্তা বলে, "যাও, এইবার ভাল করে একটা ঘুম দিয়ে মেজাজ ভাল করে নাও।"

হ্যাঁ, হীরাপুরের কালো অন্ধকারের রাত বোধহয় এইবার শেষ হয়ে যাবে। তালগাছের পাতায় মাথা ঠুকে কোন রুগ্ন শকুন আর কাঁদে না। দূরের শালবনের দিক থেকে কাকের ডাকের সাড়া শোনা যায়।

বিছানার দিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যায় অবনীশ, আর মুক্তাকণা, তেমনি সারা মুখের ঝলমল হাসি নিয়ে পান জরদার ডিবে খোঁজবার জন্য অন্য ঘরে চলে যায়।

হাঁফ ছেড়ে হেসে ফেলে মুক্তাকণা। বোধহয় সরাইখানার দারোয়ান সেই বাবুলালের ধূর্ত চোখ দুটোকে মনে পড়ে যায়। বুদ্ধি আছে লোকটার। কী চমৎকার পরামর্শই না দিয়েছিল, আর কেমন সুন্দর একটা গল্পও তৈরি করেছিল লোকটা! মুক্তাকণার কাছ থেকেও একশো টাকা দস্তুরি আদায় করেছে বাবুলাল। করুক, ভালই করেছে। বাবুলালের পরামর্শ না শুনলে এতদিনে বোধহয় আবার তারকেশ্বরের সেই গলির ভিতরে ফিরে যেতে হত; কিংবা বেনারসের দালকামণ্ডি; নয়তো কয়লাখনির দেশ ঝরিয়ার বাজার। যত কিপটে ইয়ার আর লুচ্চার সঙ্গে দুটো টাকার জন্য দরাদরি করে হয়রান হবার জীবন! যত ভ্যানতাড়া মাতালের খিস্তি সহ্য করা আর টাইমের বাবুর হাতে মার খাওয়ার জীবন! বাড়িউলির ফাইন দিতে দিতে, দালালের দস্তুরি আর পুলিসের বখরা যোগাতে যোগাতে ফতুর হয়ে যাবার সেই জীবন কল্পনা করলে এখনও বুকের ভিতরটা ভয়ে শিউরে ওঠে।

জরদার সুগন্ধে নিঃশ্বাসের বাতাস মেতে উঠলেও মুক্তার মনের ভিতরটা যেন আবার হঠাৎ মিইয়ে যায়। কাজল-আঁকা চোখ আর পান-চিবানো রাঙা ঠোঁট থেকে সব হাসির শিহর ঝরে পড়ে যায়। দুরদুর করে বুক। যদি কোন মুহূর্তে কোন কথার ভুলে ধরা পড়ে যায় মুক্তা! যদি একবার বুঝে ফেলতে পারে অবনীশ যে, এই মুক্তা হলো তারকেশ্বরের মুকতো, আর ঝরিয়া বাজারের মুকতাবাঈ? তবে? থরথর করে কাঁপতে থাকে মুক্তার গায়ের ঝকঝকে সোনার গয়নাগুলি। কখনই ক্ষমা করবে না, এক মুহূর্তও বোধহয় আর দ্বিধা করবে না ওই শৌখিন কুমারসাহেব; পিস্তল তুলে নিয়ে এসে এক মুহূর্তের মধ্যে মুক্তার এই ভয়ানক ছলনার হিসেব-নিকেশ করে দেবে।

খুব সাবধান! যেন কখনই ধরে না ফেলতে পারে অবনীশ! মুক্তা তার ভীরু মনটাকে সাবধান করে দিয়ে, আবার চোখের চাহনিটাকে চতুর করে তুলতে থাকে। জানুক অবনীশ, চিরকাল জানুক, পৃথিবীর একটা বাজে-গলির বাজে-মেয়েমানুষ নয়, মস্তবড় এক জমিদারবাড়ির ঘরছাড়া বধূ তার ফূর্তিময় জীবনের একটা অদ্ভুত শখের ক্ষুধা মেটাবার জন্য তারই সঙ্গিনী হয়েছে।

নিজেকে আরও ভাল করে বুঝিয়ে আরও সাবধান করে রাখে মুক্তাকণা। যদি কোনদিন অবনীশের মনের কোন চালাক সন্দেহের কাছে এই ছলনা ধরা পড়ার মত হয়, তবে সেদিন আরও ভাল করে হেসে ঢলে লোকটাকে ভুলিয়ে, আরও মদ গিলিয়ে এবং আরও আদর করে ঘুম পাড়িয়ে শুধু গয়নার বাক্স আর টাকাগুলি নিয়ে সরে পড়তেই হবে। বড়লোকের পিস্তলের গুলি খেয়ে মরতে হবে কেন? কী আমার সোহাগের পিস্তল রে!

আর কিছুক্ষণ পরে, যখন সকালের ঘুমের পালা শেষ করে আবার উঠে বসবে অবনীশ, তখন আতর-জলে স্নান করে আর ভিজে চুল এলিয়ে দিয়ে অবনীশের চোখের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবে অবনীশের চোখ। জয়ীর মতো মস্ত বড় ঘরের এক নারীর দেহ আর মন কিনে ফেলা গর্বের আবেগে বিহুল হয়ে মুক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে অবনীশ।

ঠিকই ভেবেছে মুক্তা। সকাল হতেই আবার সেই গল্প গান আর হাসির পালা; সেই হুইস্কি, কবুতরের মাংস, ডিটেকটিভ গল্প আর তাসের রঙ-মিল। শৌখিন ফূর্তিবাজের জীবনে সব আমোদের মেজাজ রঙ-ঢঙে মাতিয়ে তুলতে একটু ভুল করে না মুক্তা।

অবনীশ বলে, "তুমি কিন্তু আজ আবার মাঝরাতে ও রকম ভূতে-পাওয়া মানুষের মতো চেহারা নিয়ে খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে হাসবে না।"

ভ্রূকুটি করে মুক্তা : "এ রকম একটা মিথ্যে কথা কেন বলছ গো?"

অবনীশ বলে, "মিথ্যে কথা নয়। খুব সত্যি কথা বলছি।"

মুক্তা জানে, মিথ্যা বলেছে অবনীশ। সন্দেহের মানুষ নেশার চোখে ওই রকমই দেখে থাকে। মুক্তাও তার ভ্রূকুটিতে একটু অভিমানের ভান করে দিয়ে অভিযোগ করে : "তুমিও মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে ও-রকম চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমাকে সন্দেহ করতে পারবে না।"

অবনীশ হাসে। কিন্তু মুক্তা আরও গভীর অভিমানে যেন ভেঙে পড়তে চায় : "উঃ, তুমি যখন 'কে তুমি' বলে চেঁচিয়ে ওঠ, তখন আমার যে কী ভয় করে, কী আর বলব!"

অবনীশ বলে, "না, আর কখনও ওকথা বলব না মুক্তা।"

কিন্তু সন্ধ্যা পার হলেই এই দুই জীবনের সব আমোদের মেজাজ ধীরে ধীরে থিতিয়ে আসে। তারপর আরও কিছুক্ষণ, এবং তারপর আরও কিছুক্ষণ, এবং তারপরেই যখন স্তব্ধ পৃথিবীর বুক জুড়ে ঘন অন্ধকার থম থম করে, তখন মাঝরাতের প্রহরটা আবার ঠিক সেই রহস্যময় অভিশাপ নিয়ে দেখা দেয়। দিনের বেলার এত শক্ত প্রতিজ্ঞাটা যেন অলস অবসাদে ঝিমিয়ে পড়ে। খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মুক্তার চোখ দুটো দপদপ করে হাসে। হঠাৎ ঘুম-ভাঙা চোখে চমকে ওঠে অবনীশ। তারপর, সেই সব প্রশ্ন। সেই সন্দেহ আর ভয়, সেই অভিযোগ, শেষে সেই খিলখিল হাসি এবং আবার নিশ্চিন্ত মনে সোফার উপরে বসে দু'জনের সেই রকমের গল্প।

অবনীশ বিরক্ত হয়ে বলে—"নাঃ, এই বাড়িটাও একটা অপয়া বাড়ি। ভাবছি এইবার কোন একটা গেঁয়ো বাগানবাড়িতে গিয়ে থাকব।"

ছোট কুমারসাহেবের এস্টেটের অনেক বাগানবাড়ি আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে ভাল বাগানবাড়ি হলো এই বাড়ি। চারবিঘা জুড়ে বাতাবীলেবুর বাগান। দুটো বড় পুকুর, একটা পুকুরে মাঝখানে জলটুঙ্গি আছে, ছোট একটা পানসিও সে পুকুরের এককোণে জলের উপরে ভাসে।

মুক্তাকণার হাত ধরে মোটরগাড়ি থেকে অবনীশ যখন বাগানবাড়ি ফটকের মাটিতে দাঁড়ায় তখন সন্ধ্যা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দূরে কানা-দামোদরের কিনারায় কাশবনের সাদার ভিড় তখনও একটু একটু চেনা যায়। বাতাবীফুলের গন্ধে শুধু সন্ধ্যার বাতাস নয়, সন্ধ্যার অন্ধকারটাও যেন ভরে গিয়েছে। অবনীশের মনে হয়—ভালই হলো, এ রকম সুগন্ধভরা অন্ধকারকে বোধহয় মাঝরাতের কোন প্রহরের অভিশাপ সহ্য করতে হবে না। মুক্তাকণার মাথার রোগ সেরে যাবে।

মুক্তা বলে, "এটা আবার কেমন জায়গায় এলাম গো!"

"এটা আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দের বাগানবাড়ি, নাম প্রিয়নিকুঞ্জ।"

"গাঁয়ের নাম কি?"

"ভুবনপুর।"

চমকে ওঠে মুক্তা : "সে কি গো!"

অবনীশ হাসে : "হ্যাঁ গো, আর ওর যে একটু দূরে নদীটাকে এখন খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, ওটা হলো কানা-দামোদর।"

ভয় পেয়ে ফিসফিস করে মুক্তা : "সে কি গো!"

ছোট কুমারসাহেবের প্রিয়নিকুঞ্জে ফূর্তিময় জীবনের কোন উপাদানের অভাব ছিল না। ছিল স্কচ-হুইস্কি, ছিল কবুতরের মাংস, ডিটেকটিভ গল্প আর তাস। তার উপর ছিল শালুক-ছড়ানো বড় পুকুরের জলের উপর ভেসে বেড়াবার পানসি, আর বাতাবীলেবুর ফুলের গন্ধে আকুল হওয়া অন্ধকার।

প্রিয়নিকুঞ্জের একটি ঘরে ফরাশের উপর বসে অবনীশের সঙ্গে যখন তাসের রঙ-মিল খেলে মুক্তা, তখন তার গা-ভরা সোনার গয়না তেমনি ফূর্তির উল্লাসে ঝলমল করে। তারপর অবনীশের হাতে হুইস্কি-ভরা গেলাস শিথিলভাবে যখন কাঁপতে থাকে, তখন নীরব হয়ে যায় রাত্রিটা। এবং তারপরেই, কে জানে কতক্ষণ পরে, মাঝরাতের প্রহরে ঘুম-ভাঙা চোখ তুলে তাকাতে গিয়ে দেখতে পায় অবনীশ, কাছে নেই মুক্তা।

আজ আর চেঁচিয়ে ওঠে না অবনীশ, মায়া বোধ করে। চেঁচিয়ে ধমক দিতে ইচ্ছা করে না। মুক্তার মাথার রোগটা বড় নিষ্ঠুর। বড় বেশি কষ্ট পাচ্ছে বেচারা।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় অবনীশ। পা টিপে-টিপে চলতে থাকে। ঘরের পর ঘর পার হয়ে খুঁজতে খুঁজতে শেষে দেখতে পায় অবনীশ—হ্যাঁ, ঠিকই, দক্ষিণের খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে মুক্তা।

সত্যিই বড় সুগন্ধ-ভরা অন্ধকার। মুক্তাকণার মুখটাকে দেখতে একটুও আশ্চর্য লাগে না, ভয় তো দূরের কথা; বড় বেশি করুণ দেখাচ্ছে মুক্তাকে। চোখ দুটি হাসি-হাসি, কিন্তু চোখের কাজল ভিজে গিয়েছে মনে হয়। বেচারা! কে জানে কেমন একটা মনের রোগে রোজ এই কাণ্ড করে কিন্তু নিজে কিছুই বুঝতে পারে না। এটাও বোধহয় নিশির ডাক শোনার মতো একটা রোগ।

পা টিপে-টিপে মুক্তার ঠিক পিছনে এসে দাঁড়ায় অবনীশ। আরও ভাল করে মুক্তার মুখটাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দেখতে থাকে অবনীশ। কিন্তু কী আশ্চর্য, মুক্তা যেন জাগা চোখে ঘুমোচ্ছে। দেখতে পাচ্ছে না মুক্তা, কত কাছে দাঁড়িয়ে আছে অবনীশ।

কি দেখছে মুক্তা? কিই-বা বুঝতে পারছে মুক্তা? এই যে কানা-দামোদরের কিনারায় কাশবনের হাওয়ায় শ্বাসটানা শব্দের মতো একটা স্বর ছুটে ছুটে বেড়ায়, তারই পাশে শ্মশান। দশ গাঁয়ের মড়া ওখানে এসে পুড়ে ছাই হয়। আরও একটু দূরে, ওই যে একটা বাতি মিটমিট করছে, ওটা হলো লক্ষ্মীহাটি কলুবাড়ির বাতি। গাঁয়ের আর-সব ঘরের চেহারা এখন আর দেখা যায় না। আর, আরও দূরে ওই যে মাঠের জায়গায় অন্ধকার লাল হয়ে রয়েছে, ওটা হলো নায়েবডাঙ্গা, চাষীরা আখের রস জ্বাল দিচ্ছে। এই সবই, কানা-দামোদরের এপার আর ওপারের বিশটা গ্রাম হলো অবনীশ রায়ের জমিদারী।

কানা-দামোদরের কিনারায় কাশের বনে একটা ঝড় উথলে উঠছে বলে মনে হয়। শ্মশানের আশেপাশে দপ-দপ করে নেচে নেচে একটা আলেয়া দৌড়োদৌড়ি করতে থাকে। দেখতে পায় অবনীশ, দু'চোখ অপলক করে তাকিয়ে আছে মুক্তা।

"মুক্তা!"

ডাক শুনে মুখ ফেরায় মুক্তা, তারপরেই চমকে উঠে উত্তর দেয়, "কি বলছ?"

অবনীশ হাসে, "ওই যে দপদপ করে একটা আলো নেচে নেচে দৌড়চ্ছে, ওটা কি?"

"জানি না।"

"ওটা একটা আলেয়া।"

"আলেয়া!" ভয়ে শিউরে উঠে অবনীশের বুক ঘেঁষে দাঁড়ায় মুক্তা।

অবনীশ হাসে : "গাঁয়ের লোক বলে, ওটা হলো জঞ্জালীর হাসি।"

"কি বললে? চেঁচিয়ে ওঠে মুক্তা। থরথর করে কাঁপতে থাকে মুক্তার গলার স্বর।

অবনীশ বলে, "জঞ্জালীর হাসি।"

অবনীশের হাত ধরে কাঁপতে কাঁপতে কেঁদে ফেলে মুক্তা, "সত্যি করে বলো, আমাকে একটু বুঝিয়ে বলো গো, আলেয়াটা জঞ্জালীর হাসি কেন হবে?"

মুক্তার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয় অবনীশ : "এটা একটা গল্প, তুমি মিথ্যে ভয় পেয়ো না মুক্তা।"

চোখ টান করে তাকায় মুক্তা : "গল্প?"

"হ্যাঁ। লক্ষ্মীহাটি নামে ওই গাঁয়ে একটা লোক থাকত, কে জানে কোন্ একটা বুনো কিংবা বেদে জাতের লোক। লোকটার বউটা কিন্তু দেখতে বড় সুন্দর ছিল।"

"কি করত লোকটা?"

"লোকটা যত শিকড়বাকড় আর সাপের কামড়ের ওষুধ হাটে হাটে বিক্রি করে বেড়াত। কিন্তু লোকটাকে রোগে ধরল। আর খাটতে পারত না লোকটা। তখন বউটাই খেটে বেড়াতে শুরু করল।"

মুক্তা যেন স্বপ্নের মধ্যে বিড় বিড় করে, "তা, কী আর করবে বলো। দুটো পেটে খেয়ে বাঁচতে হবে, আর সোয়ামিটাকেও বাঁচাতে হবে তো?"

"হাঁ, তাই তো। কিন্তু শাক বেচে, পরের বাড়িতে ঢেঁকি কুটেও কিছু হলো না। তখন বউটা..."

"বউটার নামটা কি?..."

"হ্যাঁ, ওই বউটার নাম জঞ্জালী। শেষে বউটা প্রায়ই গাঁ ছেড়ে গঞ্জের দিকে চলে যেত। মাঝে মাঝে বাইরে রাত কাটিয়ে ঘরে ফিরত।"

"মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাবার দুর্ভাগ্যি হলে, আর কোন উপায় না থাকলে, ও-পথে না গিয়ে কোন্ পথে যাবে বলো?"

"তাই তো বলছি। টাকাপয়সা নিয়ে ঘরে ফিরত জঞ্জালী। স্বামীর জন্য কবরেজী ওষুধ আর ভাল ভাল ধুতি-গামছাও নিয়ে আসত। কিন্তু স্বামীটা কত বার জঞ্জালীর হাত ধরে বলেছে, 'আমাকে সুখে মরতে দে জঞ্জালী, তুই আর বাইরে যাসনে।' কিন্তু কে শোনে কার কথা? তারপর একদিন..."

কানা-দামোদরের কিনারায় কাশবনের ধারে শ্মশানের আশেপাশে তখনও সেই আলেয়া দৌড়োদৌড়ি করছে। সেই দিকে তাকিয়ে অবনীশ বলে, "গাঁয়ের লোকেরা বলে, পুরো সাতটা দিন আর রাত বাইরে কাটিয়ে একদিন ঠিক মাঝ রাতের সময় গা-ভরা গয়না বাজিয়ে ঘরে ফিরে এলো জঞ্জালী।"

মুক্তাকণার দু'চোখের তারা দুটো দপ করে জ্বলে ওঠে : "মিথ্যে কথা, ভয়ানক মিথ্যুক গাঁয়ের লোকগুলো। গা-ভরা গয়না অত সস্তা নয়।"

"যাই হোক। জঞ্জালী ঘরে ফিরে আসতেই গাঁয়ের লোকে লাঠি হাতে নিয়ে তেড়ে এসে বলে— ঘরে নয় ঘরে নয়, হোই শ্মশানের দিকে চলে যা জঞ্জালী।"

দু'চোখের দৃষ্টি উদাস করে তাকিয়ে, আর যেন দম বন্ধ করে অবনীশের গল্প শুনতে থাকে মুক্তা। অবনীশ বলে, "স্বামীটা সেদিনই দুপুরে মরে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে শ্মশানের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল জঞ্জালী। ওর স্বামীর চিতার আগুন তখনও ধিকিধিকি জ্বলছিল।"

"তারপর কি করল জঞ্জালী?" মুক্তাকণা যেন দাঁতে দাঁত ঘষে প্রশ্ন করে।

অবনীশ বলে, "গাঁয়ের লোক বলে, অনেকক্ষণ ধরে বেশ শান্তভাবে দাঁড়িয়ে তারপর একগাল হাসি হেসে গাঁয়ের এতগুলি লোকের চোখের সামনেই হঠাৎ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল জঞ্জালী।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, সিগারেট ধরায় অবনীশ। তারপর হো হো করে হেসে উঠে বলে, "কিন্তু গাঁয়ের লোকগুলো বলে কি জান? পালিয়ে যায়নি জঞ্জালী। এখনও মাঝরাতে ওই শ্মশানের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায় জঞ্জালী। ওই যে আলেয়া, ওটা আলেয়া নয়, ওটা হলো জঞ্জালীর হাসি।"

গল্প শেষ করেই চমকে ওঠে অবনীশ। এ কি করছে মুক্তা? মাথা হেঁট করে আঁচলে মুখ লুকিয়ে, এমন করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কেন মুক্তা?

"কী হলো মুক্তা?" মুক্তার মাথাটা তোলে অবনীশ।

মুক্তা বলে, "গাঁয়ের লোক বড় মিথ্যে কথা বলতে পারে গো? কী সব্বনেশে মিথ্যে কথা!"

অবনীশের চোখের চাহনি হঠাৎ এক ভয়ানক দুঃসহ ও তীব্র সন্দেহের জ্বালায় যন্ত্রণাক্ত হয়ে ছটফট করে। চিৎকার করে অবনীশ, "কি বললে মুক্তা?"

মুক্তা বলে, "ওটা জঞ্জালীর হাসি নয় গো, ওটা জঞ্জালীর জ্বালা।"

"কি বললে? তুমি এ-কথা বলছ কেন? কে তুমি?" বলতে বলতে, হিংস্র পাগলের মতো মূর্তি ধরে ভিতরের দিকে ছুটে যায় আর পিস্তল হাতে নিয়ে ফিরে এসে মুক্তার চোখের সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় অবনীশ।

"কে তুমি?" অবনীশের গর্জনের মধ্যে যে আগুনের জ্বালা ঝলক দিয়ে ওঠে।

"আমিই তো সেই, আমি জঞ্জালী।" শান্ত ও অবিচল স্বরে উত্তর দেয় মুক্তা। একটুও ভয় পায় না, একটুও কাঁপে না, অদ্ভুত একটা গর্বের আবেগে মাথা তুলে তাকিয়ে থাকে।

ছোট কুমারসাহেবের সেই প্রিয়নিকুঞ্জে মাঝরাতের বাতাসে পিস্তলের শব্দ বেজে উঠবার পর বারুদের ধোঁয়ার ক্ষীণ গন্ধও অল্পক্ষণ পরে মিলিয়ে গেল। কী আশ্চর্য, একটা আর্তনাদও করেনি মুক্তাকণা। রক্তমাখা বুকে হাত রেখে, চোখ বন্ধ করে, খুব জোরে একটা হাঁপ ছেড়ে, সেই সুগন্ধভরা অন্ধকারের দিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়ল মুক্তাকণা। বাগানবাড়ির চাকরেরা সেই রাতেই মুক্তাকণার লাশটাকে খালের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিল। থানাতে পুলিসের রিপোর্টে লেখা হলো, আত্মহত্যা।

কানা-দামোদরের কিনারাতে কাশবন আজও আছে। তার পাশেই সেই শ্মশানে আজও মাঝরাতের আলেয়া ছুটাছুটি করে। কিন্তু প্রিয়নিকুঞ্জ আর নেই, সেখানে শুধু কয়েকটা পুরনো ইঁটের দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। ছোট কুমারসাহেব রায়জাদা অবনীশ রায় প্রায় পঞ্চাশ বছর হলো বাতাবীলেবুর ফুলের সুগন্ধে আকুল এক সন্ধ্যায় ছটফট করে মারা গিয়েছেন।

কিন্তু কেমন করে আর কবে, গাঁয়ের লোকের মুখে গল্পটা ভাষা বদল করে ফেলেছে। হাসিটা জ্বালা হয়ে গিয়েছে। লক্ষ্মীহাটির শ্মশানে মাঝরাতে আলেয়াকে দৌড়তে দেখলে আজকের গাঁয়ের লোক গম্ভীরভাবে বলে, "হোই দেখ, জঞ্জালীর জ্বালা আবার ছটফটিয়ে ছুটতে নেগেছে।"

রামগিরি

—ঐ যে রামটেক পাহাড়, ওর আসল নামটা বলতে পার?

—না।

প্রশ্ন করে ফরসা ছিপছিপে ছোকরা বয়সের যে মানুষটি, সে হলো এই স্টেশনের তার-বাবু। আর উত্তর দেয়, দেখতে বেশ সুন্দর যে মেয়েটি, সে হলো স্টেশনমাস্টারের মেয়ে।

নাগপুর থেকে কিছু দূর উত্তরে সুলতানপুর নামে এই স্টেশনে প্রথম চাকরি নিয়ে এসেছে অনুপম। এই তো মাত্র মাস চারেক হলো এসেছে এখানে, টেলিগ্রাফি পাস করে বছর খানেক ঘরে বসে থাকার পর।

স্টেশনমাস্টার পরেশবাবু সপরিবারে এখানে আছেন এক বছরেরও বেশি সময়। বদলি হবার চেষ্টা করেন, কিন্তু চেষ্টার কোন ফল হয় না। বাংলা দেশের কাছাকাছি অঞ্চলের দিকেই বদলি হবার ইচ্ছা। কারণ, মেয়ের বিয়ে দেবার দরকার দেখা দিয়েছে, বয়স হয়েছে মেয়ের।

বাংলাদেশের কাছাকাছি থাকলে, ঝট করে একটা দিন কলকাতায় গিয়ে দু'একটা সম্বন্ধের খোঁজ-খবর আনা যায়। এমন কি, দরকার হলে মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে ধীরেনের বাড়িতে একটা দিন থাকাও যায়, আর পাত্রপক্ষ এসে মেয়ে দেখেও যেতে পারে।

পরেশবাবু আর একটু দুশ্চিন্তিত হয়েছেন, ঐ ছোকরা তারবাবু অনুপম এখানে আসার পর থেকে। ছেলেটা দেখতে শুনতে মন্দ নয়, কিন্তু...কিন্তু প্রশ্ন হলো এত অল্প মাইনের একটা মানুষের সঙ্গে তাঁর প্রথম মেয়ে রেণুর বিয়ে? না, সম্ভব নয়।

অনুপমের সঙ্গে রেণুর বিয়ের কথাই বা তাঁর মনে আসে কেন?

মনে না এসে পারে না। কারণ, দুজনের মধ্যে বেশ একটা ভাব হয়েছে বলে মনে হয়।

পরেশবাবু জানেন, এ রকম ভাবের ব্যাপার ঐ বয়সে আপনা হতেই এসে যায়। শুধু একটু চোখে চোখে রাখতে হয়, যেন মাত্রার বাইরে না চলে যায়। রূঢ়ভাবে বাধা দিতে গেলে ফল ভাল হয় না। সবচেয়ে ভাল হলো, ভালয় ভালয় এবং যত শীঘ্র সম্ভব অন্য কোথাও সরে যাওয়া। কিছুদিন অ-দেখার পর এই ধরনের ভাব আপনা হতেই আবার অ-ভাব হয়ে যায়।

অফিস ঘর থেকে বাইরে এসে পরেশবাবু দেখতে পান, হ্যাঁ, ঠিক তাই। প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রামটেক পাহাড়ের গম্ভীর চেহারার দিকে তাকিয়ে কি জানি কি দেখছে।

সন্ধ্যা হবার ঠিক আগে রেণু বেড়াতে বের হয়ে যাবার আগে একবার এখানে এসে এই প্ল্যাটফর্মের উপর কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করত। একটু পরেই পার্সেল-ক্লার্ক যোশির চারটে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে কোথা থেকে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসত রেণুর কাছে। রেল-ডাক্তার নাইডুর কোয়ার্টারের জানালায় দাঁড়িয়ে নাইডুর স্ত্রী ও বোনেরা হাততালি দিয়ে রেণুকে ডাকত। রেণু তার দল নিয়ে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে যেত। তারপরেই নাইডুর কোয়ার্টারে মেয়েদের আড্ডা জমে উঠত। এমন কি গুভারসিয়ার যশোবন্তর মা'ও এক জোড়া তাস হাতে নিয়ে চলে আসতেন, এবং আড্ডার গল্প নষ্ট করে দিয়ে খেলা জমিয়ে তুলতেন।

এই তো ছিল রেণুর প্রতি সন্ধ্যার নিয়মিত অভ্যাস। কিন্তু এ নিয়ম ভেঙে গিয়েছে এবং অভ্যাসও বদলে গিয়েছে ঐ ছোকরা তারবাবু আসবার পর থেকে। নাইডুর কোয়ার্টারের জানালায় দাঁড়িয়ে নাইডুর স্ত্রী ও বোনেরা শুধু তাকিয়ে থাকে। হাততালি দিয়ে রেণুকে আর ডাকে না।

পরেশবাবু চুপ করে রামটেক পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ, তারপর অফিসঘরের ভিতর থেকে একটা চেয়ার তুলে আনতে বললেন হেডকুলিকে। অডিটরের জরুরি চিঠির ফাইলটাকেও অফিসঘরের টেবিল থেকে আনিয়ে নিয়ে চেয়ারের উপর বসেন পরেশবাবু।

ফাইলটা কোলের উপরেই পড়ে থাকে। পরেশবাবুর চোখের দৃষ্টি থাকে প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে দাঁড়ানো দুটি মূর্তির দিকে। সূর্য ডুবে আসছে। রামটেকের মাথাটা দেখায় জমাট মেঘের মতো, আর দু'পাশে লাল আলোকের ছটা দিয়ে তৈরি দুটো ডানা। কি দেখছে ওরা? এত মুগ্ধ হয়ে কি দেখছে? আর মুগ্ধ হলেও এতক্ষণ ধরে এত কথাই বা কি আছে বলবার মতো আর শুনবার মতো?

শুধু অনুমানই করতে পারেন পরেশবাবু, কিন্তু শুনতে পান না নিশ্চয়ই, কি কথা বলছে অনুপম আর রেণু।

অনুপম বলে—ঐ রামটেক পাহাড়ই হলো রামগিরি। সেই কালিদাসের সময়ের রামগিরি; ভাবতে সত্যিই আশ্চর্য লাগে।

রেণু—রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের কালিদাস?

অনুপম—হ্যাঁ, কালিদাস। মেঘদূত পড়েছ?

রেণু—না।

অনুপম—ঐ রামগিরিতে থাকত এক যক্ষ। মেঘের কাছে তার মনের ব্যথার কথা বলত।

রেণু—যক্ষের মনে ব্যথা ছিল কেন?

অনুপম হাসে—প্রিয়াকে দেখতে না পেয়ে।

হঠাৎ অন্য দিকে কথার মোড় ঘুরিয়ে কালিদাসের যুগ থেকে একেবারে রেলের যুগে এসে পড়ে অনুপম। কথাগুলি অবশ্য রেলের যুগেরই কথা, কিন্তু চোখের মধ্যে কালিদাসের যুগের বা তারও আগের কালের সেই মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকা দুটি চক্ষুর ব্যথাই যেন দেখতে পাওয়া যায়।

অনুপম প্রশ্ন করে—পরেশবাবু কি সত্যিই দূরের কোন স্টেশনে বদলি হয়ে যাবার চেষ্টা করছেন?

রেণু বলে—হ্যাঁ।

অনুপম—তাহলে?

কোন উত্তর দেয় না রেণু। আনমনার মতো রামটেক পাহাড়ের গম্ভীর চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকে। জমাট মেঘের মতো দেখতে রামটেকের মাথার উপর দিয়ে যেন শ্বেতহংসের পালক দিয়ে তৈরি একটা মেঘ আস্তে আস্তে ভেসে চলেছে। ডুবন্ত সূর্যের গায়ের রঙের গুঁড়ো গুঁড়ো আভা এসে পড়েছে সাদা মেঘের উপর।

অনুপম বলে—তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হওয়াই ভাল ছিল রেণু।

উত্তর না দিয়ে রেণু আসন্ন সন্ধ্যার ছায়ায় ঢাকা পুবের পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে থাকে। পাহাড়ের পায়ের কাছে যেন অদৃশ্য একটা রুষ্ট মেঘ গর্-গর্ শব্দ করছে। ছুটে আসছে ডাউন এক্সপ্রেস। ইঞ্জিনের ধোঁয়া একটা ক্রুদ্ধ লালরঙা আলেয়ার মতো দপ দপ করে নাচতে নাচতে ছুটে আসছে।

অনুপম বলে—দেখা হয়েছিল, কিন্তু কথা না হলেই বোধহয় ভাল ছিল।

রেণু হঠাৎ বলে—আপনি আমার উপর রাগ করেন কেন? বাবাকে বললেই তো পারেন।

অনুপম—বলতে পারি, তুমি যদি সাহস দাও।

রেণু—বলুন, কি সাহস দেব?

অনুপম—বলো, তোমার একটুও আপত্তি নেই।

রেণু—আপনার কি মনে হয় যে, আমার আপত্তি আছে?

অনুপম—আমার এই পঁচাশি টাকা মাইনের চাকরি, তার ওপর এখনো পার্মানেন্ট হইনি।

রেণু—ওসব কথা আমার মনেই আসে না।

অনুপম—বলো, সত্যিই আমাকে তোমার ভাল লাগে?

রেণু—বলবো না। যদি এখনো না বুঝে থাকেন, তবে বললেও কোনদিনই বুঝতে পারবেন না।

রেণুর একটা হাত ধরবার জন্য অনুপমের হাতটা হঠাৎ চঞ্চল হয়েই আবার শান্ত হয়ে যায়। চোখে পড়ে, অফিসঘরের বাইরে প্ল্যাটফর্মের উপরেই চেয়ারে বসে আর ফাইল হাতে নিয়ে পরেশবাবুও যেন রামটেক পাহাড়ের শোভা দেখবার জন্য এইদিকে তাকিয়ে রয়েছেন। অনুপমের ডিউটির সময়ও হয়ে এসেছে, বড়জোর আর পাঁচ মিনিট বাকি।

বিব্রতভাবে অফিসঘরের দিকে ফিরে আসতে থাকে অনুপম। ওদিকে নাইডুর কোয়ার্টারের জানালায় দাঁড়িয়ে নাইডুর স্ত্রী অনেকক্ষণ থেকে রেণুকে ঘুসি দেখিয়ে ঠাট্টা করছিল। ছোট

ওভারব্রিজের উপর দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে, বেড়াতে নাইডুর কোয়ার্টারের দিকে চলে যায় রেণু।

এসেছেন ডিভিসনাল ডেপুটি, সুলতানপুর স্টেশনের জীবন ব্যস্ত হয়ে উঠল। ঝাড়ুদার থেকে শুরু করে স্টেশনমাস্টার পরেশবাবু পর্যন্ত সকলেই উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠ, পরিচ্ছন্ন পোশাক, সময়-নিষ্ঠ ও কর্মব্যস্ত।

ডিভিসনাল ডেপুটি সাহেব হলেন মিস্টার মিটার অর্থাৎ শ্রীযুক্ত মিত্র। বয়স পঁয়তাল্লিশ হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। দেখতে সত্যিই বেশ সদাশয়। বেশ হেসে হেসেই কথা বলেন, চোখে অফিসারী-ভ্রূকুটি কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত মিত্রকে উদারচেতাও বলা যায়। নিজের থেকেই ব্যবস্থা করে নাইডু, যশোবন্ত আর যোশিকে নিয়ে সন্ধ্যার সময় ব্যাডমিন্টন খেললেন। এবং নিজের থেকেই যেচে নেমন্তন্ন নিয়ে পরেশবাবুর বাড়িতে রাত্রিবেলা ভাত খেলেন। ডিভিশনাল ডেপুটি মিস্টার মিটারের আচরণে উপরওয়ালা অহমিকা একেবারে নেই বললেই চলে।

সুতরাং পরেশবাবু তাঁর দাবি একটু মন খুলে বলতে সাহস পেয়ে গেলেন—বড়ই অসুবিধায় পড়া, যদি আমাকে তাড়াতাড়ি অন্তত খড়্গপুরের কাছাকাছি কোথাও বদলি না করে দেন।

—বদলি হবার জন্য এত ব্যস্ততা কেন আপনার? খড়্গপুরের কাছাকাছিই বা যেতে চাইছেন কেন?

—বড় মেয়েটি অনেক বড় হয়ে উঠেছে, এইবার বিয়েটা আর না দিলেই নয়। পাত্রের খোঁজখবর নেওয়া অথবা মেয়ে-দেখানো, এই সব ঝঞ্ঝাটগুলো একটু সহজেই সেরে ফেলতে পারতাম, যদি বাংলাদেশের একটু কাছাকাছি জায়গায় থাকতে পেতাম।

হেসে ফেললেন শ্রীযুক্ত মিত্র—তাই বলুন।

ট্রের উপর চায়ের কাপ আর খাবারের প্লেট সাজানো, দু'হাতে ট্রে ধরে আস্তে আস্তে ঘরের ভিতরে ঢুকে শ্রীযুক্ত মিত্রের সামনে ট্রে নামায় রেণু। তারপরেই হাত তুলে শ্রীযুক্ত মিত্রকে নমস্কার জানিয়ে পরেশবাবুর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

পরেশবাবু বলেন—এই হলো আমার বড়মেয়ে রেণু।

শ্রীযুক্ত মিত্র বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গেই হাত তুলে রেণুকেও একটা ছোট নমস্কারে পাল্টা অভিবাদন জানান।

চা খেতে খেতে কেমন যেন হয়ে গেলেন শ্রীযুক্ত মিত্র। কখনো মনে হয়, একেবারে আনমনা হয়ে রয়েছেন, কখনো চিন্তাকুল। পরেশবাবু একটা প্রসঙ্গ তুলতেই কথার মাঝখানে দু'একবার হাসলেন শ্রীযুক্ত মিত্র, কিন্তু হাসিটাও যেন নিতান্ত খামকা একটা লজ্জায় এলোমেলো হয়ে গেল।

রেণু অন্য ঘরে চলে যাবার পরেও শ্রীযুক্ত মিত্র অনেকক্ষণ বসে রইলেন, পরেশবাবুর সঙ্গে আলাপ উপভোগ করার জন্যই নিশ্চয়। কিন্তু আলাপটাই বাদ পড়ল সবচেয়ে বেশি। দু'বার জল চাইলেন শ্রীযুক্ত মিত্র। চাকরে এসে জল দিয়ে গেল। আর একবার সামান্য একটু মশলা চাইলেন শ্রীযুক্ত মিত্র—এই একটা এলাচ আর দুটো লবঙ্গ হলেই হবে। পরেশবাবুর ছোটমেয়ে বুলি এসে মশলার কৌটা শ্রীযুক্ত মিত্রের সামনে রেখে দিয়ে চলে গেল।

ঘরের দরজার দিকে শ্রীযুক্ত মিত্রের চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ এক একবার যেন তৃষ্ণার্তের মতো ছুটে যায়। কখনো বা একেবারেই আনমনা হয়ে যেন নিজের মুগ্ধ মনের একটা কল্পনার দিকেই

তাকিয়ে থাকেন! দুটি বড় বেণী, বেণীর প্রান্তে নার্গিসের কুঁড়ি, একটা সুন্দর মুখ আর চোখের বড় বড় পাতা, আসমানী নীল একটা শাড়ি, আর অদ্ভুত ভঙ্গিতে রেশমী জালির একটা ওড়না জড়ানো গায়ে। কল্পনাকেও মুগ্ধ করে দেবার মতো একটি মূর্তি বটে।

ওঠবার সময় শ্রীযুক্ত মিত্র বললেন—মনে রইল আপনার অনুরোধের কথা।

তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললেন—আমারও একটা অনুরোধ আছে আপনার কাছে। কিন্তু আজ আর কিছু বলতে চাই না। আমাকে এখনি রওনা হতে হবে, এই প্যাসেঞ্জারেই নাগপুর পৌঁছে দুপুরের আগেই একটা কাজ সেরে ফেলতে হবে।

এক সপ্তাহ পরেই আবার সুলতানপুরে দেখা দিলেন ডিভিসনাল ডেপুটি শ্রীযুক্ত মিত্র। এবার এসে ব্যাডমিন্টন খেললেন না, এবং একটা ফাইলও স্পর্শ করলেন না। সারাটা দিন ইনস্পেকশন বাংলোর ভিতরে বসে আর শুয়েই কাটিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যা হবার আগেই বেড়াতে এলেন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। ডাক দিলেন পরেশবাবুকে এবং কিছুক্ষণ বেড়াবার পর প্ল্যাটফর্মের উপরেই দু'জনে দুটি চেয়ারে বসলেন গল্প করবার জন্য।

শ্রীযুক্ত মিত্র বললেন—সেই অনুরোধের কথাটাই বলতে চাইছি।

—বলুন।

—আপনাকে এখান থেকে বদলি না করেও যদি আপনার মেয়ের বিয়ের একটা সুযোগ এনে দিই, তাহলে কি আপনার আপত্তি আছে?

—কিছুই না।

—আপনি কি জানেন যে, পাঁচ বছর হলো আমার স্ত্রী বিগতা হয়েছেন।

—না, তা তো জানতুম না।

—আমার কোন ছেলেপিলেও নেই।

—তাহলে দেখছি আপনি নিতান্তই...একেবারে নিতান্তই একটা বেদনার মধ্যে রয়েছেন।

—ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আর এভাবে থাকতে চাই না।

—থাকা উচিত নয় বলেই মনে করি।

—তাই অনুরোধ, আমার সঙ্গে যদি আপনার মেয়ের বিয়ে দিতেন, তাহলে আমি সুখী হতাম।

পরেশবাবু বিচলিত হয়ে ওঠেন—আপনি অনুরোধ বলছেন কেন, এ আপনার অনুগ্রহ। আমি সত্যিই এতটা আশা করতে পারিনি। আমার কোনই আপত্তি নেই, থাকতেও পারে না।

শ্রীযুক্ত মিত্র—আপনার মেয়ের কি কোন আপত্তি থাকতে পারে?

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়েন পরেশবাবু। কুণ্ঠিতভাবে বলেন—আমার তো মনে হয় না যে, রেণুর মনে কোন আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু...।

হঠাৎ যেন ভাষা হারিয়ে চুপ করে রইলেন পরেশবাবু। প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে, পাওয়ার হাউসটাও ছাড়িয়ে মস্ত বড় দেওদারের ছায়ার মধ্যে যে কালো পাথরটা পড়ে রয়েছে, সেই দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে পরেশবাবুর।

কালো পাথরটার উপর দাঁড়িয়ে আছে দুটি মূর্তি, ঠিক সেই রকমই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রামটেক পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে দুজনে। ছোকরা তারবাবু অনুপম, আর স্টেশনমাস্টারের বড়মেয়ে রেণু।

শ্রীযুক্ত মিত্র প্রশ্ন করেন—চুপ করে গেলেন কেন?

পরেশবাবু বলেন— না না, রেণুর মনে কোন আপত্তিই থাকতে পারে না। আমার মেয়ে সে রকমের মেয়ে নয়। তবে...।

শ্রীযুক্ত মিত্র —আবার চুপ করলেন যে?

পরেশবাবু—তবে, এইমাত্র কিছুদিন হলো একটি ছেলের সঙ্গে রেণুর আলাপ-পরিচয় হওয়ায় মাঝে মাঝে আমি দুশ্চিন্তা বোধ করেছি। যদিও ব্যাপারটা কিছুই নয়, সামান্য আলাপ-পরিচয় মাত্র, মনের ব্যাপার কিছু ঘটেনি।

শ্রীযুক্ত মিত্রের মুখটা হঠাৎ বড় বেশি বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—সে সব তো আপনারই হাত, আপনি ইচ্ছে করলেই তো আলাপ-পরিচয়ের সুযোগটা বন্ধ করে দিতে পারেন।

পরেশবাবু—পারতাম, কিন্তু পারিনি এই ভেবে যে, মিছিমিছি বাধা দিলে, যেটা চাইছি না সেটাই হয়ে দাঁড়াতে পারে।

শ্রীযুক্ত মিত্র—এটাও ঠিক বলেছেন।

পরেশবাবু—আর আলাপ-পরিচয়ের যে সুযোগ বন্ধ ক'র দেবার কথাটা বললেন, সেটার উপর আমার চেয়ে আপনারই বেশি হাত।

বিস্মিত হন শ্রীযুক্ত মিত্র—কি রকম?

পরেশবাবু—ছেলেটি হলো, সুলতানপুর স্টেশনেরই সিগন্যালার ক্লার্ক।

শ্রীযুক্ত মিত্র—নামটা কি?

পরেশবাবু—অনুপম বসু।

শক্ত একটি অফিসার-সুলভ ভ্রূকুটি নির্মম ভঙ্গিতে ফুটে ওঠে শ্রীযুক্ত মিত্রের কপালের চামড়া কুঞ্চিত করে দিয়ে। তারপরেই বলেন—তিনদিনের মধ্যেই সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

তিন দিন পরেই ডিভিসনাল অফিস থেকে অর্ডার এল, সিগন্যালার ক্লার্ক অনুপম বসুকে বদলি করা হয়েছে মথুরাগঞ্জ। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মথুরাগঞ্জে এসে কাজে যোগ দিতে হবে। জরুরী অর্ডার। মথুরাগঞ্জ হলো সুলতানপুর থেকে প্রায় দুশো মাইল দুরের এক স্টেশন।

রওনা হবার আগে, এবং এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠবার আগে প্ল্যাটফর্মের উপর অনেকক্ষণ ছটফট করেছিল অনুপম। একটা কথা বলে যাবারও সুযোগ পাওয়া গেল না। কাল রাতেই রেণুকে সঙ্গে নিয়ে নাগপুর চলে গিয়েছেন পরেশবাবু, ডাক্তারের কাছে রেণুর চোখ পরীক্ষা করাতে হবে। কিন্তু চোখ পরীক্ষা করিয়েও আজ সন্ধ্যার মধ্যেই তো অনায়াসে ফিরে আসতে পারতেন। যা কল্পনা করতেও পারছে না রেণু, এসে দেখবে তাই সত্য হয়ে গিয়েছে। না বলে-কয়ে বিশ্বাসঘাতকের মতো লোকটা চলে গিয়েছে। জরুরি অর্ডার এসে গিয়েছে। কি হিংস্র অর্ডার।

এক্সপ্রেস ট্রেনের ভিতরে বসেও নিজেকে শান্ত করতে অনেকক্ষণ সময় লাগে অনুপমের। নাগপুরের দিক থেকে আগন্তুক প্যাসেঞ্জার ট্রেনটাও হু হু শব্দে এক্সপ্রেসের পাশ কাটিয়ে সুলতানপুরের দিকে চলে গেল। একবার শুধু চমকে উঠেছিল অনুপম। রেশমী জালির ওড়না গায়ে জড়ানো একটা মূর্তি কি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের একটা কামরার আলোর সঙ্গে চকিত বিদ্যুতের মতো দেখা দিয়ে উধাও হয়ে গেল? চোখ পরীক্ষা করিয়ে নাগপুর থেকে ফিরে যাচ্ছে রেণু? তাই তো মনে হলো। ইস, যদি আর তিনটে ঘন্টা আগে ট্রেনটা সুলতানপুরে ফিরত!

যাই হোক, মথুরাগঞ্জ থেকে অনুপমকে সুলতানপুরে ফিরে আসতে হয়নি। সপ্তাহ পরে নয়, এক মাসের মধ্যেও নয়। এসেছিল প্রতি সপ্তাহে একটা করে চিঠি, সে চিঠির সদ্‌গতিও করে দিয়েছেন পরেশবাবু, ছিঁড়ে কুচি কুচি করে আর পায়ের পাশে বাজে কাগজের ঝুড়ির মধ্যে নিক্ষেপ করে।

অপরাহ্ণ-বেলায় প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে দাঁড়িয়ে রামটেক পাহাড়ের মাথার উপরে আকাশের বুকে আস্তে আস্তে ভেসে-যাওয়া সাদা মেঘ আর কালো মেঘগুলিকে আরও দেখছে রেণু। একদিন দুদিন তিনদিন। তারপর আর নয়। মেঘগুলিও আর নাগাল পাবে না, বোধহয় এমনই একটা দূরের জগতে গিয়ে বসে আছে মানুষটা? সহ্য করছেই বা কি করে? কালিদাসের যক্ষও তো মেঘের কাছে মনের কথা না বলে থাকতে পারেনি। কিন্তু এই মানুষটা নিজেকে এত নীরব করে রাখতে পারছে কেমন করে? এত সহজে আর এত শিগগির সবই ভুলে গেল, একটা চিঠিও যে লিখতে পারল না, সে মানুষ মেঘদূতের গল্প বলে কি আনন্দ পেত, এ রহস্য এখন আর বুঝে উঠতে পারে না রেণু।

জরুরি অর্ডার এল, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চলে যেতে হবে, —এটাই বা কোন্ রহস্য? চিন্তা করে রেণু।

এক মাস, দু'মাস, তিন মাস। এরই মধ্যে ঘটনাগুলি একে একে বদলে যেতে শুরু করে। শ্রীযুক্ত মিত্র প্রতি মাসেই অন্তত দু'বার করে এসেছেন। পরেশবাবুর সঙ্গে অনেক আলোচনা আর অনেকবার আলোচনা হয়েছে তাঁর। এর মধ্যে বেশির ভাগই রেলের কাজের বাইরের বিষয় নিয়েই আলোচনা।

রামটেক পাহাড়ের মাথার উপরেও আর মেঘ দেখা যায় না। নাইডুর কোয়ার্টারে মেয়েদের তাস খেলার আসর আবার জমে ওঠে। রেণুকে দেখা যায় সেই আসরে। সুলতানপুরের সন্ধ্যাগুলি সেই অনেকদিন আগের মতোই এদিক-ওদিক বেড়িয়ে ঘোরার আনন্দে কেটে যেতে থাকে। এবং পরেশবাবু দেখে খুশি হন, রেণুর মনের ভিতরে কোন মেঘ যদি আগে দেখা দিয়েও থাকে, তবুও সে মেঘ এখন আর নেই। রামটেক পাহাড়ের উপর প্রকাণ্ড আকাশ ক'দিন থেকে একেবারে ঝকঝকে ও পরিষ্কার।

•

আর বেশিদিন দেরি হয়নি। এই আশ্বিনটা ফুরিয়ে যাবার আগেই, সুলতানপুরের স্টেশনমাস্টারের কোয়ার্টার ফুল আর পাতা দিয়ে একদিন সাজানো হলো। সারারাত আলো জ্বলল। ভাড়াটে বাঁশিওয়ালা দিনরাত বাঁশি বাজিয়ে সুলতানপুর স্টেশনের হৃদয়ে উৎসব জাগিয়ে তুলল। তারই মধ্যে বরবেশে দেখা দিলেন শ্রীযুক্ত মিত্র, এবং বধূবেশে তাঁর পাশে বসল পরেশবাবুর বড়মেয়ে রেণু।

বিয়ের রাত ভোর হতেই শ্রীযুক্ত মিত্র প্রসন্ন মনে তাঁর নবপরিণীতা রেণুর মুখের দিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে বলেন—চলো, আজ এই সকালেই রামটেক পাহাড়ে বেড়িয়ে আসি।

রেণু বলে—চলো, কিন্তু বাবাকে একবার জিজ্ঞাসা করে নাও।

শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—জিজ্ঞাসা করেছি।

রেণু —কি বললেন বাবা?

শ্রীযুক্ত মিত্র—বললেন, হ্যাঁ, রেণুও রামটেক পাহাড়ের শোভা দেখতে খুব ভালবাসে।

রেণু হাসে—আশ্চর্য, বাবা দেখছি এখনো মনে করে রেখেছেন। কিন্তু তবে কেন...।

কি বলতে গিয়ে আর কি-যেন ভেবে চুপ করে গেল রেণু। মুখের হাসিটাও অন্য রকমের হয়ে যায়।

শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—কি বললে রেণু?

রেণু—তবে কেন বাবা বদলি হতে চেয়েছিলেন?

শ্রীযুক্ত মিত্র হাসেন—ভাগ্যিস আমি ওঁর বদলি বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

রেণু—বদলি করা বা না-করার কর্তা কি তুমিই?

শ্রীযুক্ত মিত্র—হ্যাঁ।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে রেণু।

শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—চলো রেণু, আর দেরি না করে...

আরও কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকে রেণু। শ্রীযুক্ত মিত্রের হাতের আঙ্গুলে হীরে-বসানো দুটো আংটির দিকে দুটো নিষ্পলক চক্ষুর দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ চোখের তারা দুটো চমকে ওঠে, যেন অদ্ভুত একটা কিছু এতক্ষণে দেখতে পেয়েছে রেণু।

আর কোন সন্দেহ নেই, বোঝা গেল এতদিনে, জরুরি অর্ডারের রহস্য লুকিয়ে রয়েছে ঐ হীরার আংটি পরানো আঙুলগুলির মধ্যে। ঐ হাতেই সই করেছে সেই ভয়ানক জরুরি অর্ডার, যে অর্ডারে রামটেক পাহাড়ের মাথার উপরে আকাশের সব রঙিন মেঘ শুকিয়ে উবে গেল। যাক্...। ব্যস্তভাবেই রেণু বলে—না, আর দেরি করেই বা লাভ কি?

রামটেক পাহাড়ে পৌঁছতে খুব বেশি দেরি হয়নি, আর উপরে উঠতে পা ব্যথা করলেও চারদিকের চোখ-ভোলানো শোভায় সে ব্যথাও ভুলে যেতে পারল রেণু।

শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—এই রামটেক পাহাড়ই হলো রামগিরি।

চমকে মুখ ফিরিয়ে নেয় রেণু।

শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—এই রামগিরিতেই তপস্যা করতো শম্বুক। সে গল্প জান তো রেণু?

রেণু—একটু জানি।

শ্রীযুক্ত মিত্র উৎসাহের সঙ্গে বর্ণনা করতে থাকেন।—বেচারা শম্বুক এখানেই তপস্যা করতো। এই মাত্র তার অপরাধ যে, সে শুধু তপস্যা করতো। মাত্র এই অপরাধেই রামচন্দ্র শম্বুককে একদিন হত্যা করলেন।

চুপ করে শুনতে থাকে রেণু। শ্রীযুক্ত মিত্রও কিছুক্ষণ যেন ভাবাভিভূত অবস্থায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর আবার নিজের মনের উৎসাহেই বলতে থাকেন।—উঃ, ছেলেবেলায় দেখা সেই যাত্রা-গানের কথাই মনে পড়ছে, কি করুণ সেই কথাগুলি!

রেণু—কার কথা?

শ্রীযুক্ত মিত্র—শম্বুকের কথা। রামের বাণে আহত হয়ে মরে যাবার আগে শম্বুক বলেছে—দোষী নাহি জানিল কি দোষ তাহার!

রেণু বলে—চলো, এবার নেমে যাই।

শ্রীযুক্ত মিত্র আরও উৎসাহিত হয়ে বলেন—কিন্তু রামগিরি আজও শম্বুকের সেই ব্যথার চিহ্ন লুকিয়ে রেখেছে।

হাতের স্টিক দিয়ে পাহাড়ের গায়ের মাটি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তুলতে থাকেন শ্রীযুক্ত মিত্র। মাটির একটা বড় ঢেলা উপড়ে আসতেই দেখা যায়, কাঁচা আলতার মতো লাল রঙে মাখা রয়েছে রামটেক পাহাড়ের ভেজা-ভেজা মাটি।

শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—লোকে বলে, শম্বুকের রক্ত এখনো রামটেক পাহাড়ের মাটিতে লেগে রয়েছে, এখনো শুকিয়ে যায়নি।

শ্রীযুক্ত মিত্রের মুখের দিকে গভীর কৌতূহলের একটি দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে রেণু। তার মধ্যে শাণিত একটা প্রশ্নের তীক্ষ্ণ মুখ যেন চিকচিক করে জ্বলছে।

হঠাৎ প্রশ্ন করে রেণু—তুমি কি এই গল্পটা বিশ্বাস কর?

অপ্রস্তুতভাবে শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—গল্প হলো গল্প, এর মধ্যে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের কি আছে?

রেণু—গল্পটা ভাল না মন্দ?

শ্রীযুক্ত মিত্র—বড় করুণ।

রেণু—বলতে বেশ কষ্ট হয়?

শ্রীযুক্ত মিত্র—হ্যাঁ।

রেণু—তবে বলতে পারলে কি করে?

বিব্রতভাবে প্রশ্ন করেন শ্রীযুক্ত মিত্র—অ্যাঁ? কি বললে?

রেণু বলে—চলো, নেমে যাই।

কুসুমেষু

এখানে নীহার আর ওখানে হেমা।

এখানে ব্যারাকপুরের ট্রাঙ্ক রোড আর ওখানে দার্জিলিং-এর কার্ট রোড।

এখানে সিঁড়িতে বিকানীরের পাথর আর বারান্দায় পদ্ম-কাটা ইঁটের বড় বড় থাম, ব্যারাকপুরের 'ভবধাম'। আর ওখানে বাতাসের মতো পাতলা মারবেলের ছোট ছোট টালি দিয়ে ছাওয়া আটকোণা বাংলো, দার্জিলিং-এর 'স্নিগ্ধা'।

এখানে ভবধামের অভিভাবিকা এক খুড়িমা দিনে চারবার লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করেন। আর ওখানে স্নিগ্ধার অভিভাবক এক জেঠামণি দিনে দশবার পাঠ করেন আর্ট এণ্ড সায়েন্স অব এটিকেট।

এই ভবধামের ছেলে নীহারের সঙ্গে বিয়েও হয়ে গেল ঐ স্নিগ্ধার মেয়ে হেমার। এই বিয়ে হবারই ছিল। অনেকেই জানত আর বলতও, এই বিয়ে হবে। হওয়া উচিতও ছিল।

সুন্দর ছবি এঁকে এঁকে দিন কেটে যাচ্ছিল যে নীহারের, সেই নীহার বিয়ে করল হেমাকে, কলেজ ছাড়ার পর চার বছর ধরে শুধু এক সুন্দর ছবি হয়ে থেকে থেকে দিন কাটিয়ে দিচ্ছিল যে হেমা।

যা খুবই স্বাভাবিক, যা না হলে বরং খুবই খারাপ হতো, তাই হলো। কারণ, নীহার ভালবেসেছিল হেমাকে, আর হেমা ভালবেসেছিল নীহারকে।

ঘরভরা লোক, মাঝখানে গালিচা-পাতা ছোট একটি আসর। তার উপর বসেছিলেন বিয়ের রেজিস্ট্রার মিস্টার তালুকদার আর নীহার। পাশের ঘর থেকে এই উৎসবের ঘর, কতটুকুই বা ব্যবধান। কিন্তু এইটুকু পথও নিজের চেষ্টায় হেঁটে আসতে পারল না হেমা। শেষপর্যন্ত জেঠিমা হেমার কাছে এগিয়ে যান আর হেমাকে কোনরকমে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে এসে গালিচা-পাতা আসরের উপরে তুলে দিয়ে যান।

মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। বরং খুব স্বাভাবিক। জেঠামণি জানেন, জেঠিমাও জানেন, এইরকমই করবে হেমা। দেখে খুশি হয়েছেন জেঠামণি আর জেঠিমা। দার্জিলিং-এর কার্ট রোডের ধারে স্নিগ্ধা নামে এই অতিশান্ত এক বাংলোবাড়ির ইচ্ছা আর রীতির স্নেহে গড়ে উঠেছে যে-হেমার পঁচিশ বছরের শীলশান্ত জীবন, সূক্ষ্ম এটিকেটে মর‍্যালে আর কালচারে লালিত জীবন, সে-মেয়ে তার জীবনের একটা ঘটনার সম্মুখে এগিয়ে যাবার সময়ও হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠবে কেমন করে? ব্যস্ত হওয়াই তো একটা রূঢ়তা।

স্নিগ্ধার ভিতর ও বাহির দুই-ই বড় বেশি স্নিগ্ধ। এখানে খাবার জল তিন বার ডিস্টিল করা হয়, আর স্নানের জল একবার। চা খাবার আগে চায়ের টেম্পারেচার একবার পরীক্ষা করে দেখাও এ-বাড়ির নিয়ম। সকাল ঠিক ন'টার সময় উপনিষদ নিয়ে পড়তে বসেন জেঠামণি, আর ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ন'টা পনর মিনিটের সময় জেঠামণির দু'চোখ জলে ভরে ওঠে।

সুন্দর নিয়মে আর সুন্দর শিক্ষায় অত্যন্ত শান্ত হয়ে আছে স্নিগ্ধার মেয়ে হেমারও মুখের হাসি, চোখের চাহনি ও নিঃশ্বাসের ছন্দ। এখানে মুখের ভাষা যেমন মার্জিত, ভাষার ধ্বনিও তেমনি মৃদু। কোন শব্দ এখানে দাপাদাপি করে না। স্নিগ্ধা নামে এই ভবনের অনেক দিনের নিয়মে বাঁধা চির-মৃদুতার জীবনকে ভ্রূকুটি ও উচ্চহাসির উচ্ছ্বাস কখনো বিড়ম্বিত করে না। এই বাড়ির মনের কোন সাধ ইচ্ছা ও কল্পনা কখনো ব্যস্ততায় রূঢ় হয়ে ওঠে না। ব্যস্ত হলেই মনের আগ্রহ ধরা পড়ে যায়, আর এইভাবে নিজেকে ধরা পড়িয়ে দিলে নিজের মধ্যে আর থাকে কি? যে মন ধরা পড়ে না, সেই মনই তো সংসারের মন ভুলিয়ে দেয়।

নিয়মের শাসন নয়, নিয়মের স্নেহে সুন্দর হয়ে কার্ট রোডের পাশে যেমন ফুটে রয়েছে স্নিগ্ধা নামে এই সুন্দর বাংলোবাড়ি, তেমনি স্নিগ্ধার কোলে ফুটে রয়েছে হেমা। জেঠামণির বড় আদরের ভাইঝি হেমা। সুশিক্ষার গুণে যেমন এ-বাড়ির ভদ্রতা সৌজন্য আর শালীনতা, তেমনি হেমার মনের গভীরের সব ভাবনার লজ্জাও শান্ত হয়ে ফুটে থাকে। কথা মনে আসলেই কথা বলে ফেলা এখানে রীতি নয়। রাগ আর অভিমানও কখনো চীৎকার হয়ে বেজে ওঠে না। আগ্রহ আছে, আবেগ আছে, উদ্বেগ আছে স্নিগ্ধার জীবনে কিন্তু যেন এক সুন্দর হিমের প্রলেপ দিয়ে সব কিছুরই উত্তাপ শান্ত করে দিয়েছে এক সুশিক্ষা।

শুধু শান্ত নয়, সুন্দরও। বিয়ের উৎসবের সন্ধ্যাদীপ জ্বলে ওঠবার অনেক আগেই নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে ভোলেনি হেমা। সব সময় নিজেকে সুন্দর রাখাই এ-বাড়ির নিয়ম, এ বাড়ির শিক্ষা। বড় সুন্দর এই শিক্ষার বন্ধন, মাত্রা আছে কিন্তু গ্রন্থি নেই। আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রতি সন্ধ্যার আগে যেমন দু'ঘণ্টা ধরে প্রসাধনের সাধনা করে হেমা, আজও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। কম নয়, বেশিও নয়। আজ চার বছর ধরে জীবনের প্রতি সন্ধ্যার আগে ঠিক যেমন করে

তার সুগৌর দুটি বাহুতে যতখানি গোলাপি পাউডার ছিটিয়েছে হেমা. আজও ঠিক ততখানি ছিটিয়েছে। মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া এ-বাড়ির নিয়ম নয়, হেমার মনের জগতেরও নিয়ম নয়।

দার্জিলিং-এ কার্ট রোডের ধারে স্নিগ্ধা নামে এই ভবনের এই রকম একটি অতিশান্ত ও সুন্দর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলো ব্যারাকপুরের ট্রাঙ্ক রোডের ধারের ভবধাম নামে এক বাড়ির ছেলে নীহারের, যে নীহার আজ চার বছর ধরে শুধু বিচলিত উদ্বিগ্ন আর ব্যস্ত হয়েছে। একেবারেই ব্যস্ত হতে পারে না, আর এগিয়ে যেতে পারে না যে মেয়ে, তারই কাছে এগিয়ে আসবার জন্য আজ চার বছর ধরে ব্যস্ততার সাধনা করে এসেছে নীহার। শিল্পী নীহার টাইগার-হিলের সূর্যোদয়ের ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে আজ চার বছর ধরে শুধু হেমার ছবি এঁকেছে।

শোনা যায়, বাঞ্ছিতার প্রেম লাভের জন্য আজকাল আর কেউ সত্যিই তপস্যা করে না। কিন্তু নীহার যা করেছে, সেটা তপস্যার চেয়ে কম কোন ব্যাপার নয়। বছরের মধ্যে ছয়মাস দার্জিলিং-এ এসে থেকেছে নীহার, সেই ছয়মাসের একটি দিনও কার্ট রোডের ধারে স্নিগ্ধা নামে এই ভবনের অভিভাবক রিটায়ার্ড পি-এম-জি মিস্টার বসুরায়ের সঙ্গে আলাপ করে যেতে ভোলেনি। কিসের জন্য আর কার জন্য নীহারের এই আসা-যাওয়ার ব্যস্ততা আর আগ্রহের সাধনা, সেটা অনুমান করতে দেরি হয়নি কারও। জেঠামণি আর জেঠিমা যতখানি বুঝেছিলেন, তার চেয়ে বেশি বুঝেছিল আর সবচেয়ে আগে বুঝেছিল স্বয়ং হেমা।

স্নিগ্ধা নামে এই বাড়ির বারান্দা আর সামনে আর্কিডের বাহার, নীহারের জীবনে সকল আগ্রহের তীর্থনিকেতনের মতো হয়ে উঠেছিল। জেঠামণির আর জেঠিমার দুই চেয়ারের মাঝখানে আর এক চেয়ারে হাসি-ভরা মুখ আর শান্ত দুটি চোখ নিয়ে বসে থাকত হেমা। হেমারই মুখশোভার কাছে এসে প্রতিদিন যেন নীরবে অভ্যর্থনা জানিয়ে যেত নীহার।

বিস্মিত হয়েছে হেমা, ভালও লেগেছে হেমার। ঠিক এইরকমই চেয়েছিল হেমা। স্নিগ্ধা নামে এই ভবনের জেঠামণি আর জেঠিমাও এইরকম চেয়েছিলেন। ভালবাসার রীতি ঠিক এইরকম শান্ত হওয়া উচিত। মেলামেশার নিয়মে এই রকম সুরুচি থাকা ভাল।

নীহারকে খুবই পছন্দ হয়েছিল জেঠামণির ও জেঠিমার।

খুবই স্বাভাবিক, নীহারকে ভাল লাগবে হেমার। হেমা তার জীবনের সব শোভা নিয়ে সুন্দর ও শান্ত হয়ে ফুটে থাকে, আর নীহার তার দু'চোখের পিপাসা নিয়ে ছুটে আসে প্রতিদিন। হেমার মনের গভীরে একটা শান্ত ও সুন্দর অহংকার যেন ঝক করে হেসে ওঠে। একদিন নয়, দু'দিন নয়, চার বছর ধরে যে-মানুষটি হেমাকেই জীবনের স্বপ্ন করে রেখেছে, তার ভালবাসার নিষ্ঠা দেখে আশ্চর্য হতে হয় বৈকি। অথচ, হেমা একদিনের জন্য একটা সুন্দর কথাও নীহারকে বলেনি।

সুন্দর একটা কথা কেন, নীহারের লেখা একশতের উপর চিঠির কোন একটারও উত্তর দেয়নি হেমা। জানে হেমা, উত্তর না দিলেও কিছু আসে যায় না। উত্তর দেবার দরকারও পড়ে না। উত্তর দিতে ইচ্ছাও করেনি বোধ হয়। ইচ্ছা করলেও ওভাবে হাতটাকে বেহায়া করে দিতে ভাল লাগে না হেমার।

টাইগার-হিলের সূর্যোদয়ের চেয়েও বেশি সুন্দর মনে হয়েছে যে-মেয়ের মুখের ছবিকে, নীহারের চিঠির লেখাতে সেই ছবিই দেবী হয়ে উঠল একদিন। —মনে হয়, তুমি দেবতার মেয়ে এক দেবিকার

মতোই। কথাগুলি পড়তে আরও ভাল লাগে হেমার। নীহারের প্রেমের ভাষা পূজারীর মুখের ভাষার মতো হয়ে উঠেছে। মুগ্ধ হয় হেমার মনের কল্পনা। এমন করে ভালবাসতে পারে যে মানুষ, সে সত্যই ভালবাসার মানুষ। তাই একদিন হঠাৎ ব্যারাকপুরের এক খুড়িমার চিঠি পড়ে আশ্চর্য হয়নি হেমা। কোন আপত্তি মনের মধ্যে দেখা দেয়নি।

জেঠিমা তো হেমাকে কোনমতে হাঁটিয়ে বিয়ের আসরে নিয়ে এলেন কিন্তু আবার একটা সমস্যা দেখা দিল।

বিয়ের রেজিস্ট্রার মিস্টার তালুকদারের সামনে, ঘরভরা মেয়ে-পুরুষের হাসিভরা মুখ আর খুশিভরা চোখের সম্মুখে, ফর্মের উপর সই করবার সময় কলম ধরবার জন্য হাত তুলতে পারল না হেমা। শেষে স্বয়ং জেঠিমা এগিয়ে এসে হেমার হাতে কলম ধরিয়ে দিলেন, আর হেমার সেই কলমধরা হাত ধরে কোনরকমে ফর্মের উপর বুলিয়ে হেমার নামটা লিখিয়ে নিলেন।

এ আবার কিরকম কাণ্ড? হেমার মনের কোন প্রতিবাদের ইঙ্গিত? অনিচ্ছার আভাস?

মোটেই নয়। রেজিস্ট্রার হাসলেন, ঘরভরা মানুষ হেসে ফেললো। সকলে না হোক, অনেকেই জানতেন, এইরকম একটা কাণ্ড করে বসবে হেমা। বড় বেশি শান্ত, বড় বেশি অচঞ্চল আর বড় বেশি লাজুক হেমা।

আবার অনেকেই জানে, বিশেষ করে কার্ট রোডের সুমিতা, চিত্রা আর আইভি জানে, মোটেই লাজুক নয় হেমা। কিন্তু একটু কেমন যেন হেমা। ওরা বোধহয় জানে না যে, সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা অহমিকাই হলো এটিকেট, ভাষা হাসি আর চোখের জল একটু অস্পষ্ট করে রাখাই সবচেয়ে বড় স্টাইল। ওরা বিশ্বাস করতে পারে না যে, যে-হেমা প্রাণ দিয়ে এটিকেট আর স্টাইলকে ভালবেসেছে, তার কাছে স্টাইল আর এটিকেটও প্রাণ হয়ে গিয়েছে।

হেমার হাত দুটো যে নিজের শোভার ভারে সর্বক্ষণ ভারি হয়ে রয়েছে, পৃথিবীর কারও অনুরোধের কাছে সাড়া দেয় না ওর হাত। বার্চহিলের পার্কে বেড়াতে গিয়ে ভুলেও কোনদিন একটা ফুল তুলতে পারেনি হেমা। আরও আশ্চর্য, সুমিতা ফুল তুলে নিয়ে হাতের কাছে এগিয়ে দিয়েছে, তবু সে ফুল হাতে তুলে নিতে পারেনি হেমা। কারণ, হাতের পোজ ভাঙতে পারে না হেমা। নীলরঙের উলের জামপার দু'ভাঁজ করে বুকের উপর জড়িয়ে ধরে রেখেছে হেমার দুটি সুন্দর হাতের যে সুন্দর ভঙ্গীটি, অনেক ভেবে-চিন্তে আর চেষ্টা করে গড়া ভঙ্গী, সেই ভঙ্গীটিকে বার্চহিল পার্কের শোভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ এলোমেলো করে দিতে মন চায় না হেমার, পারেও না হেমা। ভুল বুঝবে আইভি, বুঝুক, কিন্তু ওদের একটা খামকা অনুরোধের জন্য নিজেকে ভেঙে দিতে পারে না হেমা।

এরকম কাণ্ড যে করতে পারে, সে তার বিয়ের দিনে ঐরকম একটা কাণ্ড যে করবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? একঘর লোকের চোখের সামনে এতদিনের শান্ত পোজ ভঙ্গী আর নিয়মের যত্ন দিয়ে তৈরি হাতটাকে হঠাৎ বেহায়া করে দিতে পারবে কেন হেমা?

মিস্টার তালুকদারের সম্মুখে আর ঘরভরা লোকের চোখের সামনে বসে ফর্মের উপর জীবনের সবচেয়ে বড় ইচ্ছার স্বীকৃতি নিজের হাতে এঁকে দেবার জন্য নিজের চেষ্টায় কলম হাতে তুলে

নেওয়া হেমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সাহায্য করলেন জেঠিমা। জীবনের এতদিনের একটা শান্ত ও সুন্দর পোজ ভেঙে দিতে পারে না হেমা। এইমাত্র ব্যাপার, এর চেয়ে বেশি কোন রহস্য এর মধ্যে নেই।

নানা সুরুচি সুশিক্ষা আর নিয়মে লালিত স্নিগ্ধা নামে এই বাংলোবাড়ির জীবনে এই সন্ধ্যাটাই আবার হঠাৎ একটা সমস্যা সৃষ্টি করল, বিয়ের উৎসব শেষ হলো যখন, আর কালিম্পং-এর ছোটদাদুর বাড়ির রমা হেনা আর লিলিও চলে গেল। ওরা থাকলে বোধহয় সমস্যাটা এত কঠিন হয়ে উঠতে পারত না।

অভ্যাগতেরা সবাই বিদায় নিয়েছেন, সব কলরব শান্ত হয়ে গিয়েছে, রাতও হয়েছে, হিমেল কুয়াশা এসে ঘরে ঢুকেছে, আর নীহার বসে আছে একটি ঘরের নিভৃতে একা-একা একটি সোফার উপর, সম্মুখে টেবিলের উপর একজোড়া ফুলদানির দিকে তাকিয়ে। সমস্যা, সত্যই সমস্যা, এখন এই ঘরের ভিতরে হেমাকে আসতে হবে।

যে জেঠিমা হেমাকে বিয়ের আসরঘরের ভিতরে হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনিও দূরে সরে রইলেন। বাসর-ঘরের দিকে হেমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে আসতে পারে না স্নিগ্ধা নামে এই ভবনের কোন গুরুজনের আগ্রহ। কারণ, এই কাজটা বড় বেশি বাস্তব ও স্পষ্ট একটা কাজ।

আর হেমা? হেমার পক্ষে তো একেবারে অসম্ভব। বিয়ে হয়ে গিয়েছে বলেই হঠাৎ হাত পা দুটোকে এত বেহায়া করে তুলতে পারবে না হেমা। তাহলে যে হেমার এতদিনের যত্নে গড়া জীবনের সুন্দর ভঙ্গী ভেঙে যায়।

চুপ করে বসে থাকে হেমা। জেঠিমার দুধে-গরদ শাড়ির ফুলকাটা আঁচল আর এখানে ওখানে কোথাও দেখা যায় না। ঘরের ভিতরে গিয়ে বোধহয় শ্রান্ত হয়ে হাঁপাচ্ছেন জেঠিমা। অনেক ব্যস্ত হয়েছে, অনেক খেটেছেন, অনেক কথা বলেছেন, আজকের উৎসবকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু আর না, তাঁর আর এর চেয়ে বেশি কিছু করবার নেই।

—এখনো ওখানে বসে আছিস কেন হেমি?

ধমকের মতো এবং চিৎকারের মতো মাত্রাছাড়া আর ছন্নছাড়া এক সম্ভাষণের ধ্বনি হঠাৎ চমকে উঠল শান্ত ও শ্রান্ত স্নিগ্ধার ঘরের বাতাসে। উৎসবশ্রান্ত স্নিগ্ধার এই রাতটার সমস্যাটাকে এতক্ষণ ধরে আর-এক ঘরের জানালা দিয়ে লক্ষ করছিল আর সহ্য করছিল যাঁর দু'চোখের দৃষ্টি, তারই গলার স্বর জেগে উঠেছে। কথা বলেছেন কালিম্প-এর দাদু, জেঠিমার ছোটকাকা, লেফটেন্যান্ট-কর্ণেল দত্ত চৌধুরী, আই-এম-এস, তিব্বতী কুকুর কোলে নিয়ে যিনি মাঝে মাঝে স্নিগ্ধার শান্ত নিয়মের জীবনের মধ্যে অনিয়মের উৎপাত সৃষ্টি করে চলে যান।

কালিম্পং-এর দাদু যে-বাড়ি করেছেন, সে বাড়ির কোন নাম নেই। কিন্তু নাম দিলে নাম দেওয়া উচিত 'রূঢ়া', কারণ স্নিগ্ধার জীবন যে নিয়মে চলে, ঠিক তার বিপরীত নিয়মে চলে কালিম্পং-এর দাদুর বাড়ির জীবন। জেঠামণি ও জেঠিমা যেমন কালিম্পং-এর বাড়িকে দু'দিনের বেশী সহ্য করতে পারেন না, ছোটদাদু আর ছোটদিদাও তেমনি কার্ট-রোডের পাশে বাতাসার মতো পাতলা মারবেলের টুকরো দিয়ে গড়া স্নিগ্ধাকে দু'দিনের বেশি সহ্য করতে পারেন না।

কালিম্পং-এর দাদুর বাড়ির খাবার টেবিলে যেন ভূমিকম্পের মতো ব্যাপার চলে, ঝন্-ঝন্ ঠুং-ঠাং ডিস-চামচ-কাঁটার শব্দের আছাড়ি-পিছাড়ি। ছোটদাদুর মেয়েরা মেয়ে হয়েও যেভাবে শব্দ করে বাইরের লোকের সামনেও মুর্গির হাড় চিবোয়, দেখে আতঙ্কিত আর শিউরে ওঠে হেমার চোখ। পিয়ানোর বুকের উপরে কফির পেয়ালা রাখতে ছোটদাদুর হাতে একটুও বাধে না। যেমন তিব্বতী কুকুরের চিৎকারে তেমনি ছোটদাদু ছোটদিদা আর রমা সোমা ও লিলির উচ্চহাসির শব্দে কালিম্পং-এর বাড়ির বাতাস মত্ত হয়ে থাকে। শুনে কতবার চমকে উঠেছে হেমা, যা মনে আসে তাই বলে ফেলতে একটুও বাধে না সোমার মুখে। আর, রমার সাজসজ্জার রীতিটা তো রীতিই নয়। একটা জর্জেটকে যেন কোনমতে এলোমেলো করে গায়ে জড়িয়ে রাখে রমা; একবার বেড়িয়ে এলেই দেখা যায়, নতুন শাড়ির তিন জায়গায় ছিঁড়ে কিংবা ফেঁসে গিয়েছে। লিলি-যে সব গান ছোটদাদু আর ছোটদিদার সামনেই গলা খুলে গাইতে থাকে, শুনে কান ফিরিয়ে নিয়েছে হেমা, চলে গেছে অন্য ঘরে। দু'দিনের জন্য বেড়াতে গিয়ে কালিম্পং-এর বাড়ির অনিয়মকে সহ্য করতে পারেনি হেমাও।

কালিম্পং-এর বাড়ির অনিয়মের মানুষগুলিও এসেছিল সবাই, চলে গিয়েছে সবাই, শুধু যায়নি ছোটদাদু, কারণ তিনি আগামীকাল সকালে এক মানুষখেকো লেপার্ডের সন্ধানে নেমে যাবেন শিলিগুড়ির দিকে। তিব্বতী কুকুর আর রাইফেল নিয়ে ছোটদাদু যে ঘরের ভিতরে এখনো ঘুমিয়ে পড়েননি, বুঝতে পারেনি হেমা।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে, ভারি ভারি দুটি শক্ত চামড়ার চটির কর্কশ শব্দ তুলে ব্যস্তভাবে এগিয়ে এলেন ছোটদাদু, লেফটেন্যান্ট-কর্ণেল দত্ত চৌধুরী, আই-এম-এস।

আবার কথা বললেন ছোটদাদু, এবং এমনি করে বললেন যে, সারা কার্ট রোড যেন শুনতে পেয়ে চমকে উঠল। চমকে উঠল হেমা, একেবারে উল্টো কথা বলে ধমক দিচ্ছেন ছোটদাদু—কি রে, তুই এখনো এরকম বেহায়ার মতো এখানে চুপ করে বসে করছিস কি?

শুনে চুপ করে থাকে হেমা। ছোটদাদুর কাছে এইরকমই কথা আশা করা যায়। স্নিগ্ধার জীবন যে নিয়মে আর যে রুচিতে ও শিক্ষায় সুন্দর হয়ে উঠেছে, ঠিক তার উল্টো নিয়মের মানুষ এইরকম কথাই তো বলবেন। ফোটা ফুল তার সকল রঙের মায়া মুছে ফেলে হঠাৎ বিশ্রী হয়ে যেতে পারছে না, কিন্তু ছোটদাদুর মতে তাই হলো বেহায়ার মতো বসে থাকা। ছোটদাদু জানেন না, কল্পনাও করতে পারবেন না, স্নিগ্ধার মেয়ে হেমার এটিকেট-লালিত প্রাণ যে সুন্দর ও শান্ত একটি গর্বে প্রসন্ন হয়ে আছে, সে গর্ব হঠাৎ ভেঙে ফেলতে গেলে সে মেয়ের প্রাণটাই অসুন্দর হয়ে যাবে। চার বছর ধরে যে-নীহার হেমাকে উপাসনা করেছে আর হেমার কাছে এসেছে, আজ হঠাৎ হেমা তার কাছে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যাবে কেন? তাহলে হেমার জীবনের সেই মায়ার আবরণই যে হঠাৎ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, যে মায়ার আবরণের দিকে চার বছর ধরে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে এসেছে এক শিল্পী মানুষ আর টাইগার-হিলের সূর্যোদয়ের ছবি আঁকাও ছেড়ে দিয়েছে।

লজ্জা নয়, ঐ ঘরের নিভৃতে বসে যে মানুষ তার মন-প্রাণের সব চাঞ্চল্য নীরব ও ধীর প্রতীক্ষায় সহ্য করছে, তার কাছে যেতেই চায় হেমা। কিন্তু এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। হেমার অন্তরের এই সহজ ও সুন্দর একটা অহংকারকে কেউ বুঝতে পারছে না, ভাবতে গিয়ে সংসারের

উপর না হোক, নিজের অদৃষ্টের উপর একটা অভিমান জাগে হেমার মনে, এবং হেমার ছোট ছোট মৃদু নিঃশ্বাসের মধ্যে বেদনাও ছড়ায়।

ছোটদাদুর মুখের দিকে তাকায় হেমা। আশ্চর্য হয় হেমা, কি অদ্ভুত স্নেহকোমল দৃষ্টি ফুটে রয়েছে ঐ প্রকাণ্ড শরীর ছোটদাদুর দুই চোখে।

ছোটদাদু বলেন—ভয় কিসের? লজ্জা কেন রে?

ছোটদাদুর চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে উঠেছে, দেখতে পায় হেমা। প্রার্থনা করার সময় জেঠামণির দু'চোখেও জল দেখা যায়। সে দৃশ্য প্রায় প্রতিদিন দেখেছে হেমা। চমৎকার দেখায় জেঠামণির জলভরা চোখ। কিন্তু কি সুন্দর কালিম্পং-এর ছোটদাদুর চোখে এই একটুখানি জলের আভাস চিকচিক করছে!

হেমার কাঁধে হাত রেখে ডাক দেন ছোটদাদু—আয়, চল আমার সঙ্গে।

উঠে দাঁড়ায় হেমা। স্নিগ্ধার নিয়মের স্নেহে আর শিক্ষায় সুন্দর একটি জীবনের রঙ্গীন ভঙ্গী শান্ত ও আশ্বস্ত হয়ে ছোটদাদুর পাশে পাশে চলতে থাকে।

—হেমা এসেছে নীহার। ছোটদাদুর আস্তে বলা সেই কথা আর কণ্ঠস্বর শুনতে পায় সারা কার্টরোডের স্তব্ধতা। ঘরের ভিতরে এক সোফার উপর হেমাকে বসিয়ে রেখে ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন তাঁর ভারি চটি আর ফ্ল্যানেলের প্যান্টালুন নিয়ে প্রকাণ্ড শরীরের ছোটদাদু। নিজের হাতে ঘরের দরজার কপাট ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

রূপকথার দেশের মতো, কুয়াশায় ঢাকা এক অবাস্তব রাজ্যের মধ্যে শুধু একটি আলোভরা নিভৃত জেগে রয়েছে, কার্টরোডের পাশে এক ভবনের নিভৃতে। নীহার ও হেমা, চার বছর ধরে যারা দুজন শুধু দুজনের কাছে পরম আপন হয়ে যাবার জন্য দিনের প্রতীক্ষায় ছিল, তাদের প্রতীক্ষা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। যেখানে আসবার ছিল, আসা উচিত ছিল, সেখানেই আজ তারা এসে গিয়েছে। জীবনে এই প্রথম, হেমার সুন্দর মুখের শোভাকে চোখের অতি নিকটে দেখতে পেয়েছে নীহার। জীবনে এই প্রথম, নীহারের সেই ভাসা-ভাসা বড় বড় স্বপ্নভরা সুন্দর আর সর্বদা মুগ্ধ চোখ দুটিকে চোখের বড় কাছে দেখতে পেয়েছে হেমা। টেবিলের উপর ঐ জোড়া ফুলদানির মতো ওদের জীবন আজ বড় কাছাকাছি আর পাশাপাশি ঠাঁই পেয়ে গিয়েছে। একটি জীবনের সুন্দর করে সেজে থাকা আর রঙীন হয়ে ফুটে থাকা এক ভঙ্গী এবং একটি জীবনের চার বছর ধরে ব্যস্ত হয়ে থাকা আর আশায় ও স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকা একটি আগ্রহ। সংসার স্বীকার করে নিয়েছে, আজ ওরা দুজন হলো এই বাসরনিভৃতের বর আর বধূ।

সোফার উপর বসে আছে হেমা, সেই পরিপাটি মায়ামূর্তি। একটি ভুরুতে সেই ছোট একটি ভঙ্গীর ঢেউ সামান্য উদ্ধত হয়ে রয়েছে। দুই ঠোঁটে সেই মৃদুহাসির একটি রেখা সেইভাবে সুন্দর একটি ছন্দ ধরে রেখেছে। একটা হাত ঠিক সেইরকম অলসভাবে কোলের উপর লতিয়ে দিয়েছে হেমা। হেমার ভঙ্গীমনোহর যে-মূর্তি চার বছর ধরে মুগ্ধ করেছে নীহারকে, সেই মূর্তিই আজ নীহারের জীবনের কাছে সমর্পিত উপহারের মতো বসে আছে।

এত সুস্থির আর এত পরিপাটি করে সাজানো যার জীবনের ভঙ্গী, মনের ভাষাকেও মুখের

এক অমুখর হাস্যভঙ্গীর ছায়ায় অস্পষ্ট করে রাখা যার রীতি, এক শীলশান্ত নিয়মের স্নেহে লালিত হয়ে এসেছে যার প্রাণ, সেই হেমাই চমকে ওঠে তার মনের দিকে তাকিয়ে। যেন অস্থির একটা নিশ্বাস অলঙ্ঘ পিপাসার মতো দুরন্ত হয়ে তার শান্ত হৃৎপিণ্ডটাকে অশান্ত করে দিতে চাইছে। চার বছর ধরে ভাল লেগেছিল যে মানুষকে, সে-মানুষকে এমন করে ভাল লাগবে, কল্পনাও করতে পারেনি হেমা, এমন ভাবনা বরণ করার জন্য প্রস্তুতও ছিল না হেমা। মনে হয়, এই আলোকিত নিভৃত এই মুহূর্তে এক বিপুল অনুরোধ হয়ে বেজে উঠবে। লজ্জা? হ্যাঁ, এই লজ্জাকে ভয় করে হেমা, কিন্তু সহ্য করতে চায় না। জীবনের এতদিনের যত্নে গড়া সুন্দর ভঙ্গীর অন্তরালে অন্য একটা প্রাণ জেগে উঠে ছটফট করছে। এই নতুন হেমাকে দেখতে পাচ্ছে না কি নীহার, এমন করে অপলক চোখ নিয়ে যে নীহার কাছে বসে তাকিয়ে আছে হেমারই মুখের দিকে?

হ্যাঁ, অপলক চোখ তুলে নীহার হেমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু দেখছিল বোধহয় তার নিজের মনেরই ভিতর এক শীতল উদাস ও থমকে-থাকা ছায়ার দিকে। কল্পনাও করতে পারেনি নীহার, তার চার বছরের অস্থির মন আজ হঠাৎ এই নিভৃতের স্পর্শ পেয়ে এমন শান্ত হয়ে যাবে। নীহারের প্রেমের আহ্বানকে আজকের উৎসবের মধ্যে সবার চোখের সামনে স্বীকার করে নিয়েছে যে-নারী, যার মুখ প্রথম দেখবার পর টাইগার-হিলের সূর্যোদয়ের শোভা আর কতদিন দেখতে যায়নি নীহার, সেই নারী তার সেই পরিপাটি মায়ামূর্তি নিয়ে এত কাছে বসে রয়েছে এই নিভৃতের একটি অনুরোধ শুনবার জন্য প্রস্তুত হয়ে; কিন্তু যেন অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছে নীহারের অন্তরাত্মা।

শুধু অনুভব করে নীহার, তার কাছে বসে আছে দেবতার মেয়ের মতো দেবিকা। ধীর স্থির ও শান্ত এক মহিমা। পূজারীর মতো সুন্দর কথার মন্ত্র দিয়ে যে মূর্তিকে চার বছর ধরে আরাধনা করে এসেছে নীহার, সেই মূর্তিকে তারই জীবনে এই নিভৃতের সঙ্গিনী বলে মনে করতে গিয়ে মনটাই যেন হঠাৎ ভীরু হয়ে গিয়েছে। নীহারের অপলক চোখ এক অসহায়তার বেদনায় যেন ধীরে ধীরে পাথরের চোখের মতো সব চাঞ্চল্য হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে। তার বিশ্বাসের সব উত্তাপ যেন এক সমাধির গভীরে অন্তর্হিত হয়েছে। একটা হিমাক্তর বিদ্রূপ গ্রাস করে ফেলেছে নীহারের ধমনীর সব শোনিতকণিকার আবেগ। হেমা, সেই হেমা যেন এক সাদা পাথরের অন্তরের অহংকার, সুন্দর এক ভঙ্গীর মধ্যে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। মানুষের বাসরঘরের প্রয়োজন ঐ দেহ স্পর্শ করতে সাহস করে না, শক্তিও পায় না।

নীহার ও হেমা, চার বছরের নিরন্তর এক মনের টানের উৎসব আজ সকল উদ্বেগ আর আকুলতার সমাপ্তির পর একটি পরিণামের কাছে এসে পৌঁছেছে। আশ্চর্যই বলতে হবে, কার্টরোডের পাশে স্নিগ্ধা নামে এই ভবনের একটি কক্ষের সুন্দর করে সাজানো সেই নিভৃতও কি-যেন আর কেমন-যেন একটা সমস্যার বেদনা সহ্য করতে গিয়ে উদাস হয়ে গেল।

কথা বলে নীহার। অনেক কথা। গত চার বছর ধরে প্রতি চিঠির প্রতি ছত্রে যে-সব কথা লিখেছে নীহার, সেই সব কথা। পৃথিবীর যেকোন শোভার চেয়ে বেশি সুন্দর বলে মনে হয়েছে তোমাকেই, দেবতার মেয়ে এক দেবিকার মতো মনে হয়েছে তোমাকেই; ভোরবেলায় আলোকের শিশিরের চেয়েও উজ্জ্বল, চৈত্রের পলাশের চেয়েও রঙীন, আর বর্ষার ঝরনার চেয়েও পরিপূর্ণ বলে মনে হয়েছে তোমাকে।

কোন কথা না বলে শুধু শুনতে থাকে হেমা। সত্যই যেন একটা নিখুঁত সাদা পাথরের কানের কাছে বৃথাই চলেছে নীহারের আরাধনার ভাষা। ধীর স্থির ও শান্ত হেমার সুন্দর ও পরিপাটি ভঙ্গীটা যেন পাথরের মত কঠিন হয়ে রয়েছে, একটুও উতলা হয় না, বিস্মিত হয় না, বিচলিত হয় না।

যেন কতগুলি প্রলাপ বকে বকে নিজেকে কোনরকমে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করছে নীহার। কিন্তু বুঝতে পারে, তার বুকের ভিতরে একটা শূন্যতার মধ্যে নীরব এক হাহাকার ছুটোছুটি করছে। কোথায় ভুল হলো, কেন এমন হলো, বুঝতে পারে না নীহার। কী ভয়ংকর এক ব্যবধানের অভিশাপ লুকিয়েছিল এই নিভৃতেরই সান্নিধ্যের মধ্যে! কত দূরে সরে রয়েছে হেমা! কী নিষ্ঠুর এক কুণ্ঠায় নিথর হয়ে গিয়েছে নীহারের বুকের সব আকুলতার স্পন্দন!

চুপ করে নীহার। অনেকক্ষণ। তারপর বলে—কিছু মনে করো না হেমা, আজ আর কোন নতুন কথা তোমার কাছে বলতে পারলাম না।

হেমা বলে—কেন?

উত্তর দিতে পারে না নীহার।

দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকায় হেমা। হ্যাঁ, কুয়াশায় ঢাকা রাত্রি অনেকক্ষণ হলো ভোর হয়ে গিয়েছে। সোফা থেকে উঠে ঘরের দরজা পার হয়ে চলে যায় হেমা।

আর-এক ঘর থেকে বের হয়ে এসে বারান্দার উপর দাঁড়ালেন ভোরের প্রার্থনার খাতা নিয়ে জেঠামণি, আর সামনের লনের উপর এক ফুলের-টবের আড়াল থেকে ফুল হাতে নিয়ে জেঠিমা।

বারান্দা পার হয়ে অন্য ঘরে গিয়ে লুকিয়ে পড়ার আগে একবার থমকে দাঁড়াতে হলো হেমাকে। ডাক দিয়েছেন কালিম্পং-এর ছোটদাদু। —এদিকে একবার আয় দেখি হেমি।

থমকে দাঁড়িয়েই থাকে হেমা। তারপর অবসন্নভাবে কাছের এক চেয়ারে শান্ত হয়ে বসে পড়ে। অগত্যা ছোটদাদু তাঁর তিব্বতী কুকুর কোলে নিয়ে আর শক্ত চামড়ার চটির কর্কশ শব্দ বাজিয়ে হেমার কাছে এগিয়ে এলেন। —আঁ্যা, এত গম্ভীর মুখ কেন রে? এ তো ভাল কথা নয়।

একটি ভুরুর উপর ছোট একটা ঢেউ সামান্য একটু উদ্ধত হয়ে ওঠে, দুই ঠোঁটের উপর মৃদুহাসির রেখায় সেই ছন্দ শিউরে ওঠে, অলসভাবে একটি হাত কোলের উপর লতিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে আর অতি শান্তস্বরে হেমা বলে—কে বললে গম্ভীর হয়েছি?

ব্যারাকপুরের ট্রাঙ্ক রোডের ধারে ভবধাম নামে পদ্মকাটা ইঁটের তৈরি এক ভবনের এক কক্ষের নিভৃতে জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে ভিতরে ছড়িয়ে পড়লো একদিন। নীহার তার জীবনের চার বছর ধরে আরাধনা করা আর স্বপ্নে দেখা সেই মুখের দিকে তেমনি অপলক চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। কে জানে, হয়তো এই আশা ছিল নীহারের মনে, ব্যারাকপুরের আকাশের চাঁদের আলো আর নারকেলের ছায়ার স্পর্শ পেয়ে নীহার ফিরে পাবে তার জীবনের সেই নিঃশ্বাসের উত্তাপ, দার্জিলিং-এর কার্টরোডের একটি রাত্রির হিমাক্ত কুয়াশার বিদ্রূপে যে নিঃশ্বাস শীতল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই আশাই আবার নিজের লজ্জায় থরথর কেঁপে উঠল নীহারের বুকের ভিতর। চাঁদেরই আলো ছড়িয়ে পড়েছে হেমার মুখে, কিন্তু অতি শান্ত ধীর ও স্থির, এবং নিখুঁত সুন্দর ও

পরিপাটি এক ভঙ্গীর উপর পড়ে সেই চাঁদের আলোও যেন হিম হয়ে গিয়েছে। অনেক সুশিক্ষা দিয়ে তৈরি অচঞ্চল এক ভঙ্গিমা। সুন্দর হয়ে সেজে থাকা আর রঙীন হয়ে ফুটে থাকা একটা প্রাণ! ব্যাকুল হতে পারে না, অস্থির হতে পারে না, ব্যস্ত হতে জানে না, মুহূর্তের ভুলেও নিজেকে একটুও এলোমেলো ও ছন্দছাড়া করতে পারে না হেমার এই শান্তমূর্তি।

আজও অনুভব করতে পারে না, উপলব্ধিও করতে পারে না, শুধু বিস্মিত হয় নীহার, কেন এমন হলো? দেবীর মতোই বটে ঐ মেয়ে। চার বছরের আরাধনায় কার্টরোডের এক ভবনের যে মেয়েকে নীহার নিজেই দেবী করে দিয়েছে, তার কাছে নিজেকে আজ একটি ক্ষুদ্র ছায়া বলে মনে হয়। তবে কি কোন ভুল হয়েছে? চার বছর ধরে কি শুধু আত্মহত্যার সাধনা করে এসেছে নীহার? মানুষকে মানুষের চেয়ে বেশি মনে করে ভালবাসলে ভুল করা হবে, এ আবার কোন শাস্তির নিয়ম?

হেমা জানে না, বিশ্বাসও করে না, সে কোন ভুল করেছে তার মনে আর আচরণে। বিয়ের আগের চারটি বছরের কত মুহূর্তে কতবার মনে হয়েছে হেমার, মানুষটি সত্যই দেবতার মতো ভালবাসতে জানে। আর আজও ব্যারাকপুরের ট্রাঙ্করোডের পাশে জ্যোৎস্নামাখা এক নিভৃতের মধ্যে নিঃশব্দে বসে থাকে, আর হাজার হাজার দুঃসহ মুহূর্ত সহ্য করতে গিয়ে আরও বেশি করে ও মর্মে মর্মে বিশ্বাস করে হেমা, ঠিকই—দেবতার মতো এই মানুষটির ভালবাসার রীতি।

কিন্তু হঠাৎ চমকে ওঠে হেমা। ঘরের ভিতর ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছে নীহার। দেবতা যেন তার দেবত্বকে সহ্য করতে পারছে না। যেন জীবনের এক দুঃসহ যন্ত্রণার বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে বিদ্রোহ করতে চাইছে নীহার। তুফান খুঁজছে দেবদারুর অন্তরের বাসনা। সত্যই, যেন এক মত্ত ঝড়ের নেশা গায়ে মাখবার জন্য ঘরের ভিতর অস্থির হয়ে পায়চারি করে বেড়ায় নীহার, মাঝে মাঝে খোলা জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়।

চুপ করে দেখতে থাকে হেমা, দেখতে ভাল লাগে হেমার। আকাশচারী দেবতার মন বোধহয় হঠাৎ মাটির সৌরভের জন্য উন্মাদ হয়ে উঠতে চাইছে।

চমকে উঠেছিল হেমা, তার পরেই দুর্বোধ্য এক বিস্ময়ের মধ্যে যেন সমাহিত হয়ে যায় হেমার জীবনের সব কৌতূহল। ঝড়ের মতো নয়, যেন এক শ্রান্ত ও ক্লান্ত পাখির ভাঙা ডানার ঝটপটানির মতো কতগুলি ক্ষীণ ও কাতর নিঃশ্বাস হেমাকে জড়িয়ে ধরেছে। হেমার মাথাটাকে বুকের কাছে টেনে উদ্‌ভ্রান্তের মতো যেন খেলা করছে অদ্ভুত একটা আকুলতা, পাগল যেমন ফুল নিয়ে খেলা করে। ভিজে গিয়েছে আবার জ্বলেও গিয়েছে হেমার দুই ঠোঁটের হাসি-শিউরানো রেখা। অনেক আশা নিয়ে সহ্য করে হেমা, কিন্তু কয়েকটি মুহূর্তের মোহ মাত্র, মিথ্যা ও বৃথা। তারপরেই যেন স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় দীর্ণ হয়ে যায় হেমার সব কৌতূহলের আত্মা। এই মানুষটির মত্ততার নিঃশ্বাস যেন ঘাসবনের ঝড়ের নিঃশ্বাস, বৃথা ও অকারণ উদ্দামতার অভিনয় মাত্র।

আস্তে আস্তে এক হাতের শুধু মৃদু একটি ঠেলা দিয়ে নীহারের হাত সরিয়ে দেয় হেমা। নীহার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে শুধু তাকিয়ে থাকে। কী নিষ্ঠুর আর কী কঠোর হেমার এই সুন্দর হাতের মৃদু একটি আপত্তির নির্দেশ! যেন নীহারের প্রাণের সব স্নায়ুতন্তু চিরকালের মতো চূর্ণ করে দিচ্ছে ভয়ানক এক বিদ্রূপের বজ্র।

স্থির শান্ত রঙীন হয়ে ফুটে থাকা হেমা তেমনি ধীর ও অবিকার ভঙ্গী-মনোহর মূর্তি নিয়ে চুপ করে বসে থাকে। নীহার বলে—আমার একটি অনুরোধ আছে হেমা।

হেমা—বলো।

নীহার—আমাকে ভুল বুঝবে না।

হেমা—কে বললে ভুল বুঝেছি?

যেন সুন্দর এক ক্ষমার ভাষা, দেবতার মেয়ের মতো এক দেবিকার করুণার ভাষা। বিকার নেই, বেদনা নেই, অভিমান নেই, রাগ নেই—সুস্থির ও অচঞ্চল এই রঙীন ভঙ্গীর করুণাও কী ভয়ানক হিমশীতল। হেমার দু'চোখের নিশ্চল তারা দুটোর দিকে চোখ পড়তেই যেন স্তব্ধ হয়ে যায় নীহারের সব প্রশ্ন আর অনুরোধের প্রাণ। এইভাবেই কি চিরকাল শুধু ক্ষমা করবে আর করুণা করবে হেমা, আর নীহারের জীবন চিরকালের এক অপমানের ধুলোয় পড়ে থাকবে?

হেমা কথা বলে আবার। —আমি কালই দার্জিলিং চলে যাব।

আর্তনাদ চাপতে চেষ্টা করতে গিয়ে নীহারের গলার স্বর কেঁপে ওঠে—কেন হেমা?

হেমা—আশ্চর্য হচ্ছ কেন?

নীহার—যেতে চাইছ যাও, কিন্তু আবার...?

হেমা—আবার আসব বৈকি।

মিথ্যা বলেনি হেমা। স্নিগ্ধার মেয়ে কার্টরোডের কুয়াশার কাছ থেকে আবার ব্যারাকপুরের নারকেলের ছায়ার কাছে এসেছে। আবার ফিরে গিয়েছে। মাসের পর মাস পার হয়েছে।

কালিম্পং-এর ছোটদাদুই একদিন চিৎকার করলেন—কি রে হেমি, তোর হাবভাব যেন ভাল মনে হচ্ছে না। এত গম্ভীর কেন?

হেসে হেসে উত্তর দিতে চেষ্টা করল হেমা, কিন্তু পারল না। কালিম্পং-এর দাদুর দুই চোখের দৃষ্টি আর প্রশ্নের সম্মুখে হেমার জীবনের হাসি-ভরা ভঙ্গী এই প্রথম ভেঙ্গে গেল।

ছোটদাদু চেঁচিয়ে বলতে থাকেন, আর রমা সোমা ও লিলি হেসে গড়িয়ে পড়তে থাকে। —দিব্যি তাজা চেহারার মানুষ তুই, শরীরে কোন বাজে ফ্যাট নেই, তবে কেন এতদিনের মধ্যে...কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না...কেন রে?

ঘরভরা হাসির ঝড়ের মধ্যে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে হেমা, আর বুঝতে পারে, ছোটদাদুর কথাগুলি তার চোখে যে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে, সে জ্বালা সহ্য করা যায় না।

আবার চিৎকার করে উপদেশ দেন ছোটদাদু—ডোন্ট প্রিভেন্ট।

—মিথ্যে কথা। চেঁচিয়ে ওঠে হেমা, যেন চেঁচিয়ে উঠেছে হেমার অন্তরাত্মা। সুন্দর হয়ে সেজে থাকা আর রঙীন হয়ে ফুটে থাকা মেয়ের চিরকেলে সুন্দর ভঙ্গীর কঠিন সংযমকে এই প্রথম আঘাতে শিউরে দিয়ে যেন একটা রুদ্ধ অপমানের বেদনা চেঁচিয়ে উঠেছে। এভাবে জীবনে এই প্রথম কথা বললো হেমা।

ঘরভরা হাসির শোর হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। ছোটদাদুও হেমার মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হন।

ধীরে ধীরে প্রখর একটা জিজ্ঞাসা যেন জেগে উঠতে থাকে প্রকাণ্ড শরীর ছোটদাদুর সন্দেহ-বিচলিত দুই চোখে। ছোটদাদু বলেন—আমি নীহারকে একবার জিজ্ঞাসা করতে চাই। বলিস তো ব্যারাকপুরে গিয়েই জিজ্ঞাসা করে আসি।

—না—ভয় পেয়ে আর বিচলিত হয়ে কান্নাচাপা আপত্তি জানায় হেমা।

কালিম্পং-এর ছোটদাদুর বাড়িতে আর একটা দিনও থাকতে পারল না হেমা। ছোটদাদু অনেক অনুরোধ করলেন—আর কটা দিন থেকে যা হেমি, গ্যাংটক রোডের দিকে একদিন বেড়িয়ে আয়, কমলালেবুর বনের হাওয়া খেয়ে আর রডোডেনড্রনের রঙ দেখে খুশি হবি।

কালিম্পং-এর বাড়িতে নয়, দার্জিলিং-এর কার্ট রোডের বাড়িতেও নয়; কোথাও আর দুটো দিন সহ্য করতে না পেরে ব্যারাকপুরের নারকেলের ছায়ার বাড়িতে চলে এল হেমা। আর দিনের পর দিন, জ্যোৎস্নার ও অন্ধকারের অনেক রাত্রির পর রাত্রি, পদ্মকাটা ইঁটের ভবধামের এক নিভৃতে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারে হেমা, হিমের দেশের কমলালেবুর বনের হাওয়া আর রডোডেনড্রনের রঙের কাছ থেকে পথ ভুল করে সে আজ এই নারকেলের ছায়ার দেশে এক গ্রেসিয়ারের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে। ছি ছি!

আর নীহার! দেবতার মেয়ের মতো দেবিকার ঐ মূর্তির উপর নয়, নিজেরই মূর্তিটার উপর ঘৃণা সহ্য করতে গিয়ে যেন আরও পাথর হয়ে গিয়েছে নীহার। নিভৃতে, সামনে, বুকের এত কাছে হেমা, তবু নীহার শুধু অলস উদাস ও ব্যথা-কুণ্ঠিত এক অদ্ভুত দৃষ্টি তুলে হেমাকে দেখছে, অতি দূরের আকাশের এক তারকার দিকে যেভাবে মানুষ তাকিয়ে থাকে।

আশ্চর্য হয়, আর বিরক্তও হয় হেমা, তবু কেন বার বার সেই একই কথা আজও ধ্বনিত হয় তার কানের কাছে—আমাকে ভুল বুঝবে না হেমা।

কিন্তু বুঝবার আর কি বাকি আছে যে ভুল বুঝতে হবে? বেশ তো, একটি স্পষ্ট ও চরম প্রশ্নের কাছে স্পষ্ট উত্তর দিয়ে এই ভুল বোঝাবুঝির পালা চুকিয়ে দিলেই তো হয়।

মনের ভুলে নয়; ইচ্ছা করেই চিঠি লিখে ফেললো হেমা—আপনি একবার আসবেন ছোটদাদু। কল্পনা করতে পারে হেমা, ব্যারাকপুরের এই চিঠি পড়ে কালিম্পং-এর প্রকাণ্ড শরীর ছোটদাদুর হাস্যচঞ্চল চোখ দুটো কেমন বিষণ্ণ আর কত বিচলিত হয়ে উঠেছে।

সত্য-মিথ্যার হিসাব-নিকাশ করার জন্যই প্রস্তুত হয়েছে হেমা। যেন এক স্বপ্নের ঘোরে হঠাৎ দুঃসাহসী হয়ে একটা সুস্পষ্ট প্রশ্ন আহ্বান করে ফেলেছে হেমা। চিঠি পেয়ে গিয়েছেন ছোটদাদু, ব্যারাকপুরের ভবধামের আত্মাকে একটা কঠোর প্রশ্নের আঘাত থেকে রক্ষা করবার আর উপায় নেই।

ছোটদাদু কবে আসবেন, কোন ঠিক নেই, কোন উত্তর দেননি। কিন্তু আসবেন নিশ্চয়। হেমা যে মীমাংসা চেয়েছে, সেই মীমাংসা পেয়ে যাবে হেমা। কয়েকটা দিন শুধু ধৈর্য ধরে পার করে দেওয়া। তবে আবার এত ছটফট করে কেন হেমা!

ব্যারাকপুরের বাড়ির আনাচে-কানাচে নিজেকে আড়াল করে রাখছে হেমা। যেন নিজেরই হঠাৎ নিষ্ঠুরতার চেহারা দেখে ভয়ে চমকে উঠেছে হেমার বুক। চার বার লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা সেরে নিয়ে খুড়িমা যখন খোঁজ করেন, আর বার বার ডাকাডাকি করেন, তখন শুধু হেমা একবার

এসে দাঁড়ায়। খুড়িমা প্রশ্ন করেন—জ্বর-টর হয়নি তো বউমা?

—না। খুড়িমাকে আশ্বস্ত করে পরমুহূর্তে তেমনি ছটফট করে পালিয়ে যায় হেমা। বোধহয় বুঝতেও পারে না হেমা, এরকম ছটফট করতে গিয়ে তার একদিনের জীবনের সুন্দর ও শান্ত ভঙ্গীটা কত বিশ্রী হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু বেশী দিন নয়; একা ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বৈকালী বাতাসে চঞ্চল নারকেলের ছায়ার দিকে তাকাতে গিয়ে দেখতে পায় হেমা, তিব্বতী কুকুর কোলে নিয়ে ভবধামের গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকছেন কালিম্পং-এর ছোটদাদু। দু'হাতে দু'চোখ ঢাকা দেয় হেমা, বুকরে ভিতর থেকে যেন একটা ধিক্কার ছুটে বের হতে চায়, এ কি কাণ্ড করে বসে আছে হেমা! জীবনের এক নিভৃতে লুকিয়েছিল যে অপমান, সেই অপমানকে পৃথিবীর চোখের সামনে টেনে এনে কি লাভ হলো?

ব্যস্তভাবে ঘরে ঢোকে নীহার। সুসংবাদ জানিয়ে দিতে এসেছে নীহার—ছোটদাদু এসেছেন।

হেমা—তাতে তোমার কি?

একথা বলতে চায়নি হেমা, কিন্তু বলে ফেলার পর হেমা নিজেই আশ্চর্য হয়ে নিজের উপর রাগ করে। একথা বলেই বা কি লাভ হলো? কাকে সাবধান করে দিতে চাইছে হেমা?

বিস্মিত হয় নীহারও। মনে হয়, সত্যই বিচলিত হয়েছে হেমা। এতদিনের নির্বিকার শান্ত ও সুন্দর হাসিভরা ভঙ্গীকে হঠাৎ বিরক্ত করে দিয়েছে কোন বেদনা কিংবা কোন অভিযোগ।

নীহার বলে—আমারই ভুল হয়েছে, এখানে একবার আসবার জন্য ছোটদাদুকে একটা চিঠি দেবে বলে মনে করেও ভুলে গিয়েছি। যাই হোক, নিজের থেকেই যখন এসে গিয়েছেন—

হেমা—তাতে কি হয়েছে?

নীহার—তুমি ওঁকে বুঝিয়ে বলো, যেন কিছু মনে না করেন।

হেমা—আমি বলব, তুমি কিছু বলতে যেও না।

চলে যাচ্ছিল নীহার। হেমা ডাকে—আর একটা কথা।

নীহার—বলো।

হেমা—তুমি ছোটদাদুর সঙ্গে কোন কথাই বলতে যেও না।

নীহার—তার মানে?

হেমা—তুমি ছোটদাদুর কাছেই যেও না।

নীহার—সে কি!

নীহারের বিস্ময় সহ্য করতে না পেরে দপ করে জ্বলে ওঠে হেমার চোখ। এক অর্থহীন জীবনের এক অর্থহীন বিস্ময় হেমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছে এখনও। জানে না, কল্পনা করতে পারে না, এই ভদ্রলোকের ধারণা করবারও শক্তি নেই যে, ভয়ঙ্কর মানুষী জিজ্ঞাসার আঘাত থেকে বাঁচবার পথ তাকে আজ বলে দিচ্ছে হেমা।

হেমার দপ করে জ্বলে ওঠা চোখ উদাস হয়। অদ্ভুত এক বেদনায় মন্থর হয়ে ভাসতে থাকে হেমার চোখের দুটি তারা। কিন্তু কিসের জন্য, আর কার জন্য এই বেদনা? মনে হয় হেমার, নীহারের সামনে আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকলে জলে ভেসে যাবে তার চোখ।—যাই প্রণাম করে

আসি ছোটদাদুকে। বলতে বলতে চলে যায় হেমা।

আর, নীহার তার এই নতুন বিস্ময়ের আস্বাদে যেন মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই হেমা একেবারে অন্য রকমের হেমা। যেন ঘরোয়া প্রাণের মতো ঘরের একটা দুঃখের উপর রাগ করে, বিচলিত হয়ে, উদাস হয়ে আর মুখ ভার করে ছুটে চলে গেল। হেমা তার ঘরেরই আপনজনের জীবনকে কি-যেন এক আঘাতের ছোঁয়া থেকে বাঁচাতে চায়, তাই তার এত উদ্বেগ।

চঞ্চল হয়ে ওঠে নীহারের নিঃশ্বাস, উষ্ণ ও উন্মুখ এক স্পৃহার প্রাণ যেন সব পিপাসা নিয়ে জেগে উঠেছে সেই নিঃশ্বাসে। ভুল হয়েছে। অমন করে হেমাকে চলে যেতে না দিলেই ভাল ছিল। বুকে জড়িয়ে ধরা উচিত ছিল হেমাকে। এই হেমাকে কত সহজে বুকে জড়িয়ে ধরা যায়। জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল হেমাকে, তুমি উদ্বিগ্ন হলে কেন? কেন এসেছেন ছোটদাদু?

কেন এসেছেন ছোটদাদু প্রশ্নটা আসতেই হঠাৎ সংশয়ে চমকে ওঠে নীহারের মন। যেন এক ভয়ংকর হেঁয়ালির ভিতরটা এতক্ষণে দেখতে পেয়েছে নীহার।

বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভবধামের একটি কক্ষে ছোটদাদুর চোখেব সম্মুখে বসে থাকে হেমা। তিব্বতী কুকুর কোলে নিয়ে প্রকাণ্ড শরীর ছোটদাদু তাঁর দুই চোখে প্রখর এক জিজ্ঞাসা আর প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসে থাকেন। কিন্তু হেমা যেন সারাক্ষণ সতর্ক হয়ে বসে আছে। কালিম্পং-এর দাদুকে চোখের সামনে আটক করে রাখতে চাইছে হেমা, যেন ঐ জিজ্ঞাসা এই ভবধামের অদ্ভুত এক ঠাণ্ডা রক্তের করুণ ভাগ্যটাকে আক্রমণ আর অপমান করবার কোন সুযোগ না পায়।

চা খেয়ে বেড়াতে বের হয়ে গেলেন ছোটাদাদু, হাঁপ ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় হেমা।

এতক্ষণে একটু নিশ্চিন্ত হয়েছে হেমা। কিন্তু জীবনে এই প্রথম যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে হেমা। জীবনে কোনদিন এভাবে এমন দুরূহ দুঃসহ ও অদ্ভুত একটা চেষ্টা করতে হবে, ভবধাম নামে এক বাড়ির একটা মানুষকে অপমান থেকে বাঁচাবার জন্য, কোনদিন কল্পনাও করেনি হেমা।

কিন্তু তারপর?

তারপর ছবিঘরের মতো রঙীন করে সাজানো এক ঘরের নিভৃতে চুপ করে একটা দেবত্বের শীতল নিঃশ্বাসের কাছে বসে থাকতে হবে। এই তো হেমার জীবনের পরিণাম।

হঠাৎ ঘরে ঢুকল নীহার। হেমা একটু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে। মনে হয়, যেন একটা ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠে চলে এসেছে নীহার। কিন্তু নীহারের হাতে টাটকা ফুলের গুচ্ছ। নীহারের মুখটাও যেন রঙীন হয়ে উঠেছে। দুই চোখ দীপ্ত ও চঞ্চল। কে জানে, আজ কি দেখতে পেয়ে আর কিসের আশ্বাসে প্রসন্ন হয়ে উঠেছে নীহারের বুকের বাতাস।

নারকেলের পাতার ঝালর ঝিরঝির করে, সেই সঙ্গে ঝিরঝির করে ঘরের ভিতর ঝরে পড়ে সন্ধ্যার চাঁদের আলোক। নীহার ডাকে—হেমা!

ধীর স্থির ও শান্ত, সেই সুন্দর হয়ে ফুটে থাকা এক জীবনের ভঙ্গী, সেই হেমা চুপ করে বসে এই আহ্বানের অর্থ বুঝতে চেষ্টা করে।

পূজারীর নিষ্ঠার মতো একটা আগ্রহ ডাকছে সুন্দর সুশিক্ষা ও নিয়মের স্নেহে লালিত একটা ভঙ্গীকে। এই নিভৃত যেন একটা মন্দিরের নিভৃত। ধূলো নেই, আবর্জনা নেই। শব্দ এখানে নিরুদ্দাম,

ভাষা এখানে মন্ত্রের মতো, নিঃশ্বাস এখানে ধূপসুরভির মতো।

রিক্ত উদাস ও শূন্য এক নীরবতার মধ্যে একে একে ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে মুহূর্তগুলি। সুন্দর ও পরিপাটি এক পবিত্রতার অভিশাপে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে দুই পাথরের ফুল, নীহার ও হেমা।

নারকেলের পাতার ঝালর ঝিরঝির করে। নীহার ধীরে ধীরে হেমার আরও কাছে এগিয়ে আসে।—এখনি চলে যেও না, হেমা।

চলে যায় না হেমা। আর, নীহার যেন তার প্রাণের শেষ সামর্থ্য উৎসর্গ করে তার বুকের গভীরে সমাহিত একটি বিহ্বল নিঃশ্বাসকে উদ্ধার করবার জন্য অপলক চোখে হেমার শান্ত পরিপাটি ও মৃদু হাসি নিয়ে ফুটে থাকা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু বৃথা।

ছলছল করে নীহারের কণ্ঠস্বর।—আরও কিছুক্ষণ থাকো, হেমা।

থাকে হেমা, নারকেলের পাতার ঝালরের ফাঁকে ফাঁকে ঝিরঝির করে ঝরে পড়া জ্যোৎস্নার ছোঁয়া বরণ করে নিয়ে বসে থাকে। মনের গভীরে শেষ আশার যে প্রাণটুকু এখনও ধুকপুক করছে, সেই আশাকে এখনি বিদায় করে দিতে চায় না হেমা।

কিন্তু বৃথা। আরও কিছুক্ষণের পর অনেকক্ষণ পার হয়ে যায়। দেখতে পায় হেমা, শুধু বিষণ্ণ ও বেদনাপন্ন একটা অদ্ভুত দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে আছে নীহার। কী ভয়ানক হতাশ অসহায় দৃষ্টি!

আগুনের জ্বালার চেয়েও জ্বালাময় ঘৃণার জ্বালা হেমার বুকের পাঁজর যেন পুড়িয়ে দিতে থাকে। পুড়ে যায় হেমার সুন্দর হয়ে সেজে থাকা জীবনের ভঙ্গী, দুই ভুরু ও দুই অধরের পোজ।

—ছিঃ। শুধু একটি কথার জ্বালা রেখে দিয়ে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে যায় হেমা।

কিন্তু হেমার উতলা ছন্নছাড়া আর এলোমেলো মূর্তিটাই হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়, দরজার কপাটে শাড়ির আঁচল আটকে গিয়েছে। হয়তো আর পিছনে না তাকিয়ে কপাটের বাধা থেকে এক টানে আঁচল ছাড়িয়ে আর ছেঁড়া আঁচল নিয়েই চলে যেত হেমা, কিন্তু যেতে পারল না, কারণ অতি করুণ আর্তনাদের মত একটা শব্দ শুনে চমকে উঠেছে হেমা।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে পেছনে ফিরে তাকায়, তারপর হঠাৎ বিস্ময়ে যেন উতলা হয়ে ফিরে এসে ঘরের ভিতর ঢোকে।

নারকেলের পাতার ঝালরের ফাঁক দিয়ে ঝিরঝির করে ঝরে পড়া জ্যোৎস্না নীহারের বড় বড় সুন্দর চোখের উপর চিকচিক করছে।

—একি? চমকে ওঠে হেমার গলার স্বর। দেখতে পায় হেমা, ভেজা চোখ নিয়ে একেবারে শান্ত সুস্থির হয়ে বসে আছে নীহার।

হেমার শাড়ির আঁচলটা গা থেকে খসে মেজের উপর লুটিয়ে পড়েছে। খোঁপার ছাদ ভেঙ্গে গিয়ে চুলের স্তবক এলিয়ে পড়েছে। নেকলেসের লকেটটাও যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আটকে গিয়েছে ব্লাউজের কাঁধের সঙ্গে। যেন বন্য বাতাসের ঝড়ে এলোমেলো হয়ে গিয়েছে হেমার ছন্দে-বাঁধা জীবনের সাজ। নীহারের মুখের দিকে তাকিয়ে হেমার দু'চোখেও জল একটা বন্য স্নেহ উতলা হয়ে উঠতে চায়।

ছুটে এসে নীহারের কাছে দাঁড়ায় হেমা। বদলে গিয়েছে হেমার মূর্তিটাই। যেন বাইরের জগতের যত সভ্যভব্য ও সুরুচিকঠিন ভঙ্গীর শাসন চূর্ণ করা, সব সাজানো লজ্জার নিয়ম ছিন্ন করা,

মাত্রাছাড়া একটা মত্ততা ছুটে এসে নীহারের কাছে দাঁড়িয়েছে। বিহ্বল বুকের সব উত্তাপ আর কোমলতা মুক্ত করে দিয়ে নিবিড় এক সান্ত্বনার উৎসব নীহারের চোখ আর মুখের উপর চেপে চেপে লুটিয়ে দিতে থাকে হেমা।

ঝিরঝির করে জ্যোৎস্না ঝরে নারকেলের পাতার ঝালরের ফাঁকে ফাঁকে। আর একবার চমকে উঠল হেমার উতলা মনের বিস্ময়। এ কি? দুরন্ত আগ্রহের দুই বাহু আর উত্তাপে বিহ্বল একটা নিঃশ্বাসের টানে হঠাৎ বিব্রত হয়েও পরক্ষণেই বুঝতে পারে, আর বুঝতে পেরে ধন্য হয়ে যায় হেমার মন, সত্যিই তো, স্বামীর বুকেই বন্দী হয়ে গিয়েছে হেমা।

ঘরের দরজা খোলা; দরজার পর্দা বাতাসে ফুরপুর করে উড়ছে। নারকেলের পাতার ঝালর থেকে চাঁদের আলো সরে গিয়েছে। রাত হয়েছে।

হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে যায় হেমার। ঘরের খোলা দরজার দিকে চোখ পড়তেই লজ্জা পেয়ে শিউরে ওঠে। ব্যস্তভাবে কোনমতে আলুথালু চেহারাটাকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতেই চমকে উঠল হেমা। যা ভয় করেছিল হেমা, তাই হয়েছে।

তিব্বতী কুকুর কোলে নিয়ে বারান্দার উপর একটা চেয়ারে বসে আছেন ছোটদাদু।

—হেমি, কাছে আয় দেখি। ডাক দিলেন ছোটদাদু।

ছোটদাদুর কাছে এসে দাঁড়ায় হেমা। ছোটদাদু তাঁর বড় বড় চোখ আরও বড় বড় করে আর হাসতে হাসতে হেমার মুখের দিকে তাকাতেই হেমা তাঁর মুখ চেপে ধরে। —পায়ে পড়ি তোমার, চেঁচিয়ে কোন কথা বলো না, ছোটদাদু।

বসুরাজ ও গিরিকা

শক্রোৎসব সমাপনের পর মৃগয়াভিলাষে কাননে প্রবেশ করলেন চেদিপতি বসুরাজ।

সুরপতি ইন্দ্রের অনুগ্রহে সমৃদ্ধিসমাকুল চেদিরাজ্যের প্রভুত্ব লাভ করেছেন বসুরাজ। তাঁর কণ্ঠে সুরপতির সৌহার্দ্যের উপহার অম্লানপঙ্কজকুসুমের বৈজয়ন্তী মাল্য শোভা পায়। ইন্দ্রেরই প্রদত্ত স্ফটিকনির্মিত বিমানরথে আরূঢ় বসুরাজ গগন অঙ্গনে বিগ্রহবান দেবতার মত সঞ্চরণ করেন। সুরপতি ইন্দ্র প্রদান করেছেন শিষ্টপ্রতিপালনী বেণু-যষ্টি। এই বেণু-যষ্টির মর্যাদা রক্ষা করতে কোন ভুল করেন না বসুরাজ। বিপন্ন ও প্রপন্নের রক্ষার জন্য সর্বদা ব্যাকুল হয়ে থাকে চেদিপতি বসুরাজের বিপুলবলে স্পর্ধিত দুই বাহু।

কুটজ সৌগন্ধ্যে অভিভূত কাননবায়ু তখন সদ্যোজাগ্রত বিহগের কাকলীতে শিহরিত হয়ে নবারুণপ্রভার বন্দনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কিঞ্জল্করাগে রঞ্জিত হয়ে রয়েছে বনসরসীর নীর। জেগেছে গন্ধাকৃষ্ট মধুব্রত, পরিপতিত পরাগে পাটলীকৃত হয়ে রয়েছে বনভূভাগ। বসুরাজ মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, এবং তাঁর দুই চক্ষু যেন শিশিরস্নাত এই পুষ্পলতা ও বনস্পতির অন্তরচরী মাধুরীর অভিষের লাভের জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে।

আলোকে আপ্লুত হয়ে উঠেছে পূর্ব গগনের ললাট। সূক্ষ্ম অংশুক নীশারের মত ধীরে ধীরে অপসৃত হয় খিন্ন কুহেলিকা। আর, বিগলিতদুকূলা কামিনীর মত শরীরশোভা প্রকট করে ফুটে ওঠে কুলকামিনী এক তটিনীর রূপ। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় বসুরাজের, ঐ তটিনীরই নিকটে এক শৈলকন্দরের অন্ধকারময় নিভৃত হতে হঠাৎ উত্থিত এক আর্তনাদ শুনে একদিন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তাঁর করধৃত এই শিষ্টপ্রতিপালনী বেণু-যষ্টি।

শুক্তিমতী নামে এক পরিণতযৌবনা কুমারী স্নানাভিলাষে ঐ তটিনীর নিকটে এসে দাঁড়িয়েছিল, আর কোলাহল নামে এক লালাসামূঢ় কামান্ধ শুক্তিমতীর সকল অনুনয় ও প্রতিবাদ রূঢ় আক্রমণে স্তব্ধ করে দিয়ে সেই কুমারী-তনুর যৌবন ক্ষুধার্ত শ্বাপদের মত উপভোগ করেছিল।

কিন্তু কর্তব্য পালন করেছিলেন তরুণ চেদিপতি বসুরাজ। সেই বিপন্নাকে রক্ষা করেছিলেন এবং তাঁর বিপুল বলকুশল এই বাহুর একটি আঘাতে সেই অত্যাচারীর প্রাণ চিরকালের মত স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। ধর্ষকের উন্মাদ আগ্রহের গ্রাস হতে যে নারীকে সেদিন মুক্ত করতে পেরেছিলেন বসুরাজ, সেই নারী প্রণতশিরে তাঁরই চরণ স্পর্শ করে তাঁকেই পিতৃসম্বোধনে সম্মানিত করেছিল। তারপর একে একে কত শত কুহূরাকা ও সিনীবালী রজনী এই তটিনীরই সিকতায় শিশিরস্নেহভার সঁপে দিয়ে ফুরিয়ে গিয়েছে! একে একে বিগত হয়েছে অষ্টাদশ বৎসর। কোথায় গেল সেই নারী? সেই শুক্তিমতী?

মনে পড়ে বসুরাজের, সেদিন কি-যেন বলতে গিয়েও বলতে পারেনি শুক্তিমতী। ক্রূর কিরাতের কার্মুকে আহত মৃগবধূর মত ধূলিলুণ্ঠিত দেহ নিয়ে, বসুরাজের চরণ স্পর্শ করে, আর ভয়বিহ্বল ও করুণ দুই চক্ষুর দৃষ্টি প্রসারিত করে তাকিয়েছিল শুক্তিমতী। বসুরাজ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—আর ভয় কেন নারী? চেয়ে দেখ, তোমার কুমারী-জীবনের শুচিতার ঘাতক ঐ কামান্ধ আমার এই

ভীমবাহু-প্রহরণের একটি আঘাতে নিষ্প্রাণ রুধিরাক্ত শ্বাপদের মত ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়ে আছে।

হ্যাঁ, সেদিন সেই ধর্ষকের দেহ ঐ শৈলকন্দরের নিকটে নিষ্প্রাণ আর রুধিরাক্ত শ্বাপদের দেহের মত পড়েছিল। শুক্তিমতী নামে এক বনবাসিনী কুমারী-নারীর যৌবনলুণ্ঠক কোলাহল নামে সেই কামান্ধ দস্যুর শোণিতপ্রবাহে সিক্ত হয়ে গিয়েছিল শৈলকন্দরের কঠিন শিলাতল। তবুও বলাৎকারমত্ত মূঢ়ের সেই নিষ্প্রাণ দেহপিণ্ডের দিকে তাকিয়ে যেন নিশ্চিন্ত হতে পারেনি শুক্তিমতী। অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন চক্ষু নিয়ে তরুণ বসুরাজের দিকে তাকিয়ে আবেদন করেছিল। —পিতা!

বসুরাজ—তুমি তো এখন মুক্ত, তবুও তুমি শান্ত ও নির্ভয় হতে পারছ না কেন নারী?

শুক্তিমতী বলে—অত্যাচারীর হিংস্র ভুজঙ্গমের বন্ধন হতে আপনি আমাকে মুক্ত করেছেন পিতা, কিন্তু মনে হয় তার লালসার বিষ আমার এই কুমারীদেহকে মুক্তি দেবে না।

চমকে ওঠেন বসুরাজ—এ কথার অর্থ?

শুক্তিমতী—ভয় হয় পিতা, অনুভব করছি পিতা, আমার এই দেহের শোণিতে যেন এক প্রাণের বীজ সন্তরণ করছে।

বিমর্ষ ও বিষণ্ণ বসুরাজ বলেন—বুঝেছি, এবং আমারও ভয় হয় নারী, তোমার এই ভয় বোধহয় মিথ্যা ভয় নয়।

ক্রন্দন করে শুক্তিমতী—তবে বলুন নৃপতি বসুরাজ, ধর্ষকের লালসা যে প্রাণের অঙ্কুর আমার যৌবনোর্বর শোণিতে নিক্ষেপ করেছে, সেই প্রাণ এই বনকুসুমের পরাগের মত কলুষবিহীন শুচিরুচির ও সুন্দর।

উত্তর দেন না বসুরাজ।

শুক্তিমতী বলে—বলুন প্রজাপালক বসুরাজ। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আমার অন্তরাত্মাকে যন্ত্রণাক্ত করে, আমার জীবনকে অপমানিত করে, হত্যার উৎসবের মত এক প্রমত্ততার আঘাতে আমার দেহের সকল স্নায়ু তন্তু ও নিঃশ্বাস পীড়িত করে, প্রণয়হীন আনন্দহীন ও আর্তনাদপীড়িত কতগুলি মুহূর্তের অভিশাপ-লীলার পরিণাম হয়ে যে প্রাণ আমার দেহে সঞ্চারিত হয়েছে, সেই প্রাণ আপনার বিচারে কোন অপরাধী-প্রাণ নয়।

উত্তর দেন না বসুরাজ।

শুক্তিমতী বলে—আপনি প্রতিশ্রুতি দান করুন বসুরাজ, আমার এই প্রণয়হীন আনন্দহীন ও অবমাননাময় কয়েকটি দিবসের আর্তনাদজাত সন্তান আপনার রাজ্যের সকল প্রণয়জাত সন্তানের মত মানবোচিত সম্মান লাভ করবে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে বিস্মিতভাবে শুধু শুক্তিমতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন বসুরাজ।

শুক্তিমতী বলে—আমাকে প্রতিশ্রুতি দান করুন শিষ্টপ্রতিপালক বসুরাজ, তাহলেই আপনাকে আমার পরিত্রাতা পিতা বলে আমি বিশ্বাস করতে ও শ্রদ্ধা করতে পারব।

বসুরাজ বলেন—প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না।

শুক্তিমতী—কেন পারেন না বসুরাজ?

বসুরাজ—তোমার সন্তান এক অভ্যাদ্ভুত জন্ম-পরিচয় নিয়ে ভূমিষ্ঠ হবে। ধর্ষকের লালসার সৃষ্টি তোমার সেই সন্তান পৃথিবীর একটি প্রাণীরূপে গণ্য হবে, এই মাত্র, এর অধিক কোন মর্যাদা তার হতে পারে না।

শিউরে ওঠে শুক্তিমতী—কেন বসুরাজ?

বসুরাজ কঠোরভাবে বলেন—শ্বাপদের সৃষ্টি শ্বাপদই হয়ে থাকে।

ধর্ষক কোলাহলের নিষ্প্রাণ দেহপিণ্ডের দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করে শুক্তিমতী বলে—কিন্তু মানুষের প্রণয়জাত সন্তানও তো শ্বাপদ হয়ে উঠতে পারে বসুরাজ।

বাধা দিয়ে কঠোরস্বরে বলেন বসুরাজ—কুতর্ক করো না নারী।

শুক্তিমতী—ঐ শ্বাপদপ্রায় লালসান্ধ কোলাহল আপনারই রাজ্যের এক মানব-দম্পতির প্রণয়জাত সন্তান। এক নারী ও এক পুরুষের দেহ-মনের মিলন ও আনন্দেরই সৃষ্টি ঐ কোলাহল।

বিব্রতভাবে বসুরাজ বলেন—বিচিত্র তোমার মন! সন্দেহ হয় আমার, তোমার যে আর্তনাদ শুনে বিচলিত হয়েছিলাম, সে আর্তনাদ নিতান্তই কপট এক দুঃখের প্রতিধ্বনি।

শুক্তিমতী করুণস্বরে বলে—এমন ভয়ানক সন্দেহ করবেন না বসুরাজ।

বসুরাজ—তবে কেন তুমি তোমার সেই দুঃসহ অপমানের সৃষ্টিকে পালন করবার জন্য এবং তার ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে এত আকুল হয়ে উঠেছ দস্যুস্পর্শদূষিতা কুমারী?

আরও আকুল হয়ে কেঁদে ওঠে শুক্তিমতী—সত্যই বুঝতে পারি না পিতা, এ আমার কোন্ মনোবিকার? অত্যাচারী কোলাহলের সেই লালসাক্ষুব্ধ মুখাবয়ব কল্পনা করতেও ঘৃণা বোধ করি, কিন্তু আমার শোণিতে সঞ্চারিত একটি প্রাণকে কিছুতেই যে ঘৃণা করতে পারছি না।

বসুরাজ—কিন্তু আমি যে তোমার শোণিতে সম্ভাবিত অদ্ভুত আবিলতার অঙ্কুর ঐ প্রাণকে কল্পনা করতেও ঘৃণা করি।

শুক্তিমতী বলে—আপনার এই ভয় ও ঘৃণার হেতু বুঝতে পারছি না বসুরাজ। আপনার এই রাজ্যে কি কোন কুমারীর গূঢ়োৎপন্ন সন্তান নেই?

বসুরাজ—আছে।

শুক্তমতী—আপনার রাজ্যে কি কোন বহুবল্লভা নারী নেই, আর তার সন্তান নেই?

বসুরাজ—আছে।

শুক্তিমতী—আপনার রাজ্যে কি কোন প্রোষিতভর্তৃকা নারীর ক্রোড়ে সন্তান আবির্ভূত হয়নি?

বসুরাজ—হয়েছে।

শুক্তিমতী—আপনার রাজ্যে কি কোন কৌলটেয় নেই?

বসুরাজ—আছে।

শুক্তিমতী—আপনার রাজ্যে কি কোন বিবাহিতা নারী পরপুরযাসঙ্গে প্রজায়িনী হয়ে ক্ষেত্রজ সন্তান ক্রোড়ে ধারণ করেনি?

বসুরাজ—করেছে।

শুক্তিমতী—অদ্ভুত বিধি আর অবিধির বশীভূত এই সব মিলনের সন্তান যারা, তাদের কি আপনি আপনারই প্রজা বলে মনে করেন না?

বসুরাজ—করি।

শুক্তিমতী—আপনার ধারণায় এরা সকলেই মানুষ নিশ্চয়?

বসুরাজ—মানুষ বৈ কি।

শুক্তিমতী—এদের মনুষ্যত্ব কি আপনার কাছে সম্মানীয় নয়?

বসুরাজ—অবশ্যই সম্মাননীয়।

শুক্তিমতী—তবে আমার সন্তান কেন শিষ্টপ্রতিপালক চেদিপতি বসুরাজের বিচারে ঘৃণ্য বলে বিবেচিত হবে?

বসুরাজ—তুমি ভুল বুঝেছ নারী। আমার রাজ্যের প্রত্যেক গূঢ়োৎপন্ন ও কৌলটেয় হলো এক মানব ও এক মানবীর স্মরাবেশপ্রগল্‌ভ মিলনের আনন্দের ও আগ্রহের সৃষ্টি, আর্তনাদের সৃষ্টি নয়। কল্পনা করতেও আতঙ্ক হয়, কি ভয়ংকর কর্কশ সংস্কার নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে তোমার সন্তান! অনুমান করতেও ঘৃণা হয়, কি ভয়ংকর অপচিত্ততা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হবে তোমার সন্তান! ধারণা করলে শিহর দিয়ে কন্টকিত হয়ে ওঠে সকল চিন্তা, কে জানে কোন্ বীভৎসতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে তোমার সন্তানের অবয়ব! তোমার সন্তান কখনও সমাজের মানুষ হতে পারবে না, সে হবে এই বনেরই এক প্রাণী। আমি মনে করি, বলাৎকৃতা নারীর দেহজাত সন্তানই হলো এই সংসারের অন্ত্যজাধম।

শুক্তিমতী বিস্মিত হয়ে বলে—এই কি শিষ্টপ্রতিপালকের ন্যায়বিধি?

বসুরাজ—হ্যাঁ।

শুক্তিমতী—নিতান্তই অন্যায়বিধি বসুরাজ। আপনি বলাৎকৃতা নারীর মাতৃত্বকে শাস্তি দান করছেন।

বসুরাজ—আমি বিস্মিত হচ্ছি, এক নারী তার ধর্মাপহারক দস্যুর হঠলালসার সৃষ্টিকে ঘৃণা করতে পারছে না কেন? কিসের এই মোহ?

শুক্তিমতী—আমার শোণিতের স্নেহের উত্তাপে দশ মাস দশ দিন লালিত হবে যে প্রাণ, তাকে আমি কেমন করে ঘৃণা করব বসুরাজ?

বসুরাজ—অপজাত এক প্রাণকে, তোমার যৌবনের সকল শুচিতার হন্তা এক দস্যুর মত্ততার সৃষ্টিকে যদি তুমি ঘৃণা করতে না পার, তবে সে অপরাধ তোমার। ঘৃণ্যকে ঘৃণা করতে যদি না পার, তবে সেই ভুলের শাস্তি তুমিই জীবনে সহ্য করবে। আমি অপ্রজা পালন করি না নারী।

শুক্তিমতী বলে—আর একটি কথা শুধু বলবার ছিল, কিন্তু বলতে পারলাম না বসুরাজ।

কুটজগন্ধে অভিভূত বন্যবায়ুর স্পর্শে সেদিনের মত আজও বসুরাজের চিন্তা শিহরিত হয়। কোথায় গেল সেই নারী, শুক্তিমতী নামে সেই কুমারী? কল্পনা করেন বসুরাজ এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু বিষণ্ণতার ছায়াও যেন তাঁর দুই চক্ষুর দৃষ্টিতে সঞ্চারিত হয়। বোধ হয় এই তটিনীসলিলে সেদিন দেহ বিসর্জিত করে সকল শাস্তি সন্তাপ ও মোহের অবসান করে দিয়েছে সেই নারী। ভালই হয়েছে, ধর্ষকের লালসাজাত সন্তানের মাতা হবার দুর্ভাগ্য সেই অদ্ভুত নারীকে সহ্য করতে হয়নি। কি আশ্চর্য, কি অদ্ভুত ছিল সেই নারীর মন! বসুরাজের প্রহরণাঘাতে নিহত এক ধর্ষকের রক্তাক্ত দেহপিণ্ডের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠেছিল নারীর যে চক্ষু, সেই চক্ষুই আবার ধর্ষকেরই ঔরসের পরিণাম চিন্তা করে সজল হয়ে উঠেছিল। একে একে বিগত হয়েছে অষ্টাদশ বৎসর, ঐ শৈলকন্দরের এক নিভৃত হতে উত্থিত নারীকণ্ঠের সেই আর্তনাদ কোন স্মৃতিচিহ্ন না রেখে কালস্রোতে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে চিরকালের মত।

কাননভূমির অভ্যন্তরে আবার হৃষ্টচিত্তে পরিভ্রমণ করতে থাকেন বসুরাজ। শান্ত বনবীথিকার

ধূলিকে ছায়ায় আকীর্ণ করে দাঁড়িয়ে আছে অনেক শ্যাম অনোকহ। কিন্তু ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে সূর্যকরনিকর। তৃষ্ণার্তি অনুভব করেন বসুরাজ। এগিয়ে এসে প্রচ্ছায়াশান্ত তরুতলে দাঁড়িয়ে শ্রমক্লম অপনোদন করেন। তারপরেই শুনতে পান, যেন নিকটেই কোথাও তৃপ্ত সারসের কলরব ধ্বনিত হতে চলেছে। শুনতে পান বসুরাজ, জলোৎপলের সৌরভে অভিভূত রোলম্ব নিকুরম্বের গুঞ্জন। আরও কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখতে পান বসুরাজ, মিথ্যা নয় তাঁর অনুমান। অজস্র বিকচ তামরসের শোভা বক্ষে ধারণ করে রয়েছে স্নিগ্ধসলিলা এক সরসী। জলপানে তৃষ্ণার্তি দূর করেন বসুরাজ।

কিন্তু সেই মুহূর্তে বিপুল তৃষ্ণায় বিচলিত হয়ে উঠল বসুরাজের দুই চক্ষু।

সরসীতটের এক নিভৃতে স্ফুটকুসুমে আচ্ছন্ন এক প্রিয়ক তরুর ছায়ায় নবীন শাদ্বলের উপর কাঞ্চনলতিকার মত শয়ান এক নারীর অলসলুলিত দেহ, নিবিড় নিদ্রায় অভিভূত। মনে হয়, ঐ নারীর হাস্যজ্যোতির্লিপ্ত অধরে ইন্দুকর কন্দল ঘুমিয়ে আছে। মনে হয়, ঊর্ধ্বাকাশের মেঘ নবীন শাদ্বলের হরিৎ বক্ষ চুম্বনের জন্য এই নারীর চিকুরের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। নীবিচ্যুত হয়ে রুক্ষ বল্কল যেন সেই রূপাভিরামা রমণীর নাভিকুহরিণী আর ত্রিবলিরেখার দিকে তৃষ্ণাভিমানিত নয়নে তাকিয়ে আছে। বিস্মিত হন বসুরাজ, যেন রূপময় নিখিল নিসর্গের সকল মৃদুল স্পন্দন, সকল সুচারু গঠন, সকল মঞ্জুল শোভা, আর সকল মদিরকোমল বিহ্বলতা দিয়ে রচিত হয়েছে এই বরযৌবনা নারীর তনু। মনে হয়, এই তো কবিকল্পনার সেই নারী, যার মুখমদস্পর্শে প্রস্ফুটিত হয় বকুলকোরক, যার আলিঙ্গনে জাগ্রত হয় কুরুবক কুন্তল, যার চরণধ্বনিতে মঞ্জরিত হয় রক্তাশোক আর কটাক্ষে পুষ্পিত হয় তিলক।

যেন বসুরাজের সেই চঞ্চল নিঃশ্বাসের আঘাতে নারীর নিদ্রা ভেঙে যায়। স্বপ্নোত্থিতার মত হঠাৎ উন্মীলিত দুই চক্ষুর বিস্ময় নিয়ে বসুরাজের দিকে তাকায়, আর বিপুললজ্জাবিকম্পিত হস্তে ব্যস্তভাবে বল্কল ও উৎপলমেখলা আকর্ষণ করে বরাঙ্গের বিকচ শোভা আবৃত করে নারী।

বিস্মিত বসুরাজ প্রশ্ন করেন—কে তুমি ভদ্রে?

দরদলিত উৎপলকলিকার মত ঈষৎ হাস্যে অধর স্ফুরিত করে উত্তর দান করে তরুণী—আমার পরিচয় আমি জানি না। আপনি কে?

বসুরাজ—আমি চেদিপতি বসুরাজ।

নারীর ভ্রূরেখা বিস্ময়ে শিহরিত হয়।—আপনি এই রাজ্যের অধীশ্বর, সুরপতি ইন্দ্রের অনুগৃহীত শিষ্টপ্রতিপালক বসুরাজ?

বসুরাজ—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কে?

নারী—আমি এক বনেচর প্রাণী মাত্র।

ব্যথিত হন বসুরাজ।—লোকললামা নারী, কি হেতু নিজেকে এই মিথ্যা রূঢ়ভাষণে নিন্দিত করছ তুমি?

নারী—সত্যই আমার পরিচয় জানি না বসুরাজ।

বসুরাজ—আমি অনুমান করতে পারি।

নারী—তবে অনুমান করুন।

বসুরাজ—তুমি কোন দেবতনয়া। নইলে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রদত্ত এই বৈজয়ন্তী মালোর

অম্লানপঙ্কজকুসুমের চেয়েও ফুল্ল ও সুন্দর ঐ মুখরুচি কি কোন মর্ত্যনারীর হতে পারে? কখনই না।

নারী বলে—না বসুরাজ। বড়ই ভুল অনুমান করেছেন।

বসুরাজ—তোমার কি কোন নাম নেই?

নারী—আছে, আপনার এই কাননভূমির সকল প্রাণী লতা ও পুষ্পের যখন নাম আছে, তখন আমারও একটি নাম আছে।

বসুরাজ—কি নাম?

নারী—গিরিকা।

বসুরাজ—বুঝেছি গিরিকা, তুমি এই কাননেরই উপান্তবাসী কোন ঋষির তনয়া।

গিরিকা বলে—কি দেখে বুঝলেন বসুরাজ?

বসুরাজ—তোমার এই স্নিগ্ধহাস্য বচনমাধুরী আর শান্ত সম্ভাষণ তোমারই পরিচয় প্রকট করে দিয়েছে। ঋষি পিতার আশ্রমচ্ছায়ে লালিতা পুষ্পলতার মত তোমার তনুসুষমা আমাকে মুগ্ধ করেছে গিরিকা।

গিরিকা—ভুল বুঝেছেন বসুরাজ, আমার কোন পিতা নেই।

চমকে ওঠেন বসুরাজ—পিতা নেই? তোমার পিতৃপরিচয় জান না?

গিরিকা—না।

কিছুক্ষণ চিন্তান্বিতের মত দাঁড়িয়ে থাকেন বসুরাজ, তারপরেই স্মিতহাস্যে ও পুলকিত স্বরে বলেন—বুঝেছি গিরিকা, তুমি এক অপ্সরীর সন্তান।

গিরিকা—এমন ধারণা কেন করছেন বসুরাজ?

বসুরাজ—হ্যাঁ, তোমার ঐ বিহ্বল দুটি অক্ষিতারকার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছি তোমার জন্মপরিচয়। তুমি এক অপ্সরীর প্রণয়জাত সন্তান। তোমার নয়নে সেই প্রণয়ের উল্লাস, তোমার ওষ্ঠমুদ্রায় সেই মিলনবিহ্বল আনন্দেরই স্মৃতি সুন্দর রেখায় জন্মলাভ করেছে।

গিরিকা—না বসুরাজ, আমি অপ্সরীর তনয়া নই।

বিব্রতভাবে তাকিয়ে থাকেন বসুরাজ—তবে কে তুমি?

গিরিকা—অনুমান করুন বসুরাজ।

বসুরাজ—তুমি কি কোন নির্বাসিতা রাজতনয়া?

গিরিকা হেসে ওঠে—না বসুরাজ।

বসুরাজ—তবে তুমি কি কোন কুমারী নারীর গোপন প্রণয়ের সৃষ্টি?

গিরিকা—না বসুরাজ।

বসুরাজ বিষণ্ণভাবে বলেন—মনে হয়, তুমি এক পরানুরাগিণী জনপদবধূর সন্তান, লোকাপবাদের ভয়ে তোমার সদ্যোভূমিষ্ঠ শিশুদেহকে এই বনভূমির তরুচ্ছায়াতলে বিসর্জন দিয়ে চলে গিয়েছিল সেই নিষ্ঠুরা।

গিরিকা—না বসুরাজ।

বসুরাজ—আর অনুমান করবার শক্তি নেই আমার। তুমিই বল তোমার জন্মপরিচয়।

গিরিকা—কিন্তু আমার জন্মপরিচয় জেনে আপনার কি লাভ হবে বসুরাজ?

বসুরাজ—কোন লাভ নেই, কৌতূহল মাত্র।

গিরিকা—কৌতূহল কেন বসুরাজ?

বসুরাজ—আমি এই রাজ্যের অধীশ্বর, আমার রাজ্যের বনময় প্রদেশে কে তুমি সকল বনশোভা আরও দীপ্ত ও সুন্দর করে দিয়ে এই তরুচ্ছায়াতলে দাঁড়িয়ে আছ, সেকথা জানবার ও শুনবার অধিকার আমার আছে। আমারও কর্তব্য আছে, তাই এই কৌতূহল।

গিরিকা—আপনি কি আমার কোন উপকার করতে চান বসুরাজ?

গিরিকার নিকটে এগিয়ে এসে ব্যাকুল বিহ্বল ও মুগ্ধ দুই চক্ষুর দৃষ্টি তুলে স্তবসঙ্গীতের মত সাকাঙ্ক্ষস্বরে বলতে থাকেন বসুরাজ—আমার নিজেরই জীবনের উপকার করতে চাই গিরিকা। যে-ই হও তুমি, তুমি চেদিপতি বসুরাজের আকাঙ্ক্ষিতা। তুমি আমার স্পৃহনীয়া বরণীয়া ও স্তবনীয়া। আমি তোমার ঐ ওষ্ঠপুটের সঞ্চিত মকরন্দের পিপাসী। তুমিই আমার জীবনের তৃষ্ণার্তি দূর করতে পার গিরিকা। ধন্য হবে আমার জীবন, যদি তোমার ঐ চিকুরতিমিরের ছায়া এইক্ষণে আমার এই বক্ষে লুটিয়ে পড়ে। তুমি বসুরাজের জীবনসঙ্গিনী হও গিরিকা।

হঠাৎ বাষ্পার্দ্র হয়ে ওঠে গিরিকার দুই চক্ষু। কম্পিতকণ্ঠে বলে—কিন্তু...।

বসুরাজ—মিথ্যা দ্বিধা কেন গিরিকা?

গিরিকা—মিথ্যা নয় বসুরাজ।

বসুরাজ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন—আমার জীবনসঙ্গিনী হতে তোমার মনে কি কোন আপত্তি আছে গিরিকা?

গিরিকা—আপনি বলুন বসুরাজ, এই পরিচয়হীনা নারী সংসারের কোন মানুষের প্রেমিকা হতে পারবে কি? আপনার কি সন্দেহ হয় না বসুরাজ, গিরিকার এই পুষ্পস্রগাসক্ত বক্ষের অভ্যন্তরে কোন প্রেমহীন হৃৎপিণ্ড লুকিয়ে থাকতে পারে? আপনার কি ভুলেও এই ভয় হয় না বসুরাজ, গিরিকা নামে এই বনচারিণী নারীর দেহশোণিতে ভয়ংকর এক বিষাক্ত সংস্কার লুকিয়ে থাকতে পারে?

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে বসুরাজের বক্ষের নিঃশ্বাস। অপলক নেত্রে গিরিকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। যেন অষ্টাদশ বৎসর পূর্বের এক ঘটনার স্মৃতি বসুরাজের কল্পনায় হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠেছে। চিৎকার ধ্বনির মত বিচলিত স্বরে জিজ্ঞাসা করেন বসুরাজ। —তোমার জন্মপরিচয় বল অপরিচিতা। বল, কে তোমার মাতা?

গিরিকা—আমার মাতা শুক্তিমতী।

দুই চক্ষু মুদ্রিত করে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন বসুরাজ। গিরিকার একটি কথার আঘাতে বসুরাজের সকল জিজ্ঞাসা হঠাৎ অন্ধ হয়ে গিয়েছে। শিষ্ট প্রতিপালক বসুরাজের হাতের বেণু-যষ্টি থর থর করে কেঁপে ওঠে। যেন এক বিদ্রূপের অট্টহাস্যে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে বসুরাজের কঠোর ন্যায়বিধির প্রাচীর, তারই শব্দ শুনছেন বসুরাজ। যেন অষ্টাদশ বৎসর পূর্বের এক প্রভাতের ক্রন্দনরতা এক নারীর অশ্রুসমাচ্ছন্ন চক্ষুর আবেদন এতদিন পরে বসুরাজের সম্মুখে এসে প্রশ্ন করছে—এইবার বল শিষ্টপ্রতিপালক বসুরাজ, সেই প্রাণ কি সত্যই অন্ত্যজাধম প্রাণ?

বসুরাজের ভাবনাভিভূত ও ব্যথিত দুই চক্ষু হতে ছিন্ন মনিসরের মত অশ্রুর ধারা ভূতলে লুটিয়ে পড়ে।

কিন্তু দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে গিরিকা; আর বিচলিত ভাবে যেন সেই অশ্রুমুক্তা ধারণ করবার জন্য হস্ত প্রসারিত করে বসুরাজের কাছে এসে দাঁড়ায়। ব্যথিত স্বরে বলে —এ কি বসুরাজ?

সিক্ত ও মুদ্রিত চক্ষুর পক্ষ্ম বিকশিত করে গিরিকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন বসুরাজ। পর মুহূর্তে কাঞ্চনলতার মত ললিততনু গিরিকাকে দুই বাহুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বক্ষোলগ্ন করেন, যেন তাঁর মিথ্যা ন্যায়বিধির অন্ধকার চূর্ণ করে দিয়ে এক অদ্ভুত সত্যের সুস্বপ্ন শরীরিণী হয়ে তাঁর কাছে এতদিনে দেখা দিয়েছে।

গিরিকা বলে—ভুল করবেন না বসুরাজ। আমি যে এক নিগৃহীতার নিরানন্দ জীবনের আর্তনাদ হতে উদ্ভূতা, আপনার ন্যায়বিধির ঘৃণিতা ও নিন্দিতা।

বসুরাজ—তুমি সকলশমলা, অকশ্মলা; তুমি অনবরীণা, অনবগীতা।

গিরিকা—আমি এই জগতের দুর্ঘটনা; আমি বিনা অভিলায়ের সৃষ্টি। আপনি আমার জন্মপরিচয় জানেন বসুরাজ।

গিরিকার প্রতিবাদ চকিত চুম্বনের আঘাতে স্তব্ধ করে দিয়ে বসুরাজ বলেন—তুমি জান না, তোমার মাতা শুক্তিমতীও জানে না তোমার জন্মপরিচয়। আমিও জানতাম না গিরিকা, কিন্তু আমি আজ জেনেছি।

বুঝতে না পেরে প্রশ্নাকুল নয়নে প্রণয়বিবশ বসুরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে গিরিকা।

বসুরাজ বলেন—এই নিখিলের সকল প্রাণের পিতা যিনি, তাঁরই অভিলায়ের সৃষ্টি তুমি।

অগ্নি ও স্বাহা

সপ্তর্ষির আলয় থেকে যজ্ঞের নিমন্ত্রণ এসেছে, আশ্রমকুটিরের দ্বার বন্ধ করে অগ্নি যাত্রা করলেন।

নবোষার আলোক মাত্র স্ফুরিত হয়েছে, রক্তাধরা পূর্বদিগ্‌বধূর রাগময় চুম্বনে গগনকপোল রঞ্জিত হয়েছে। সেই প্রথমজাগ্রত প্রহরের স্নিগ্ধতার মধ্যে মনের আনন্দে একাকী পথ ধরে চলেছিলেন অগ্নি। শ্যাম বনভূমির উপান্ত পার হয়ে এক স্রোতস্বতীর কাছে এসে থামলেন। গন্ধপাষাণের উপর দিয়ে ক্ষুদ্র জলধারা সলজ্জকলহর্ষে পুন্নাগকেশরের পুঞ্জ পুঞ্জ উপহার ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। এই জলধারার ওপারেই চৈত্ররথ কানন, তারপর শিলাজতু ও স্ফটিকে আকীর্ণ এক কৃষ্ণশৈলস্থলী, তারই শীর্ষে নভঃপুরীর মত সপ্তর্ষির আলয়।

স্রোতস্বতীর কাছে দাঁড়িয়ে দূর সপ্তর্ষিভবনের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন অগ্নি। কিন্তু নিকটেই বনচ্ছায়ার সঙ্গে যে মেঘবর্ণ প্রস্তরে রচিত একটি ভবনের শান্ত প্রতিচ্ছবি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার কথা একবারও মনে পড়ে না।

কিন্তু সবই জানেন অগ্নি। এই মেঘবর্ণ ভবনের অভ্যন্তরে মণিময় দীপিকার মত রূপরম্যা কুমারী তরুণীর হৃদয় অনুরাগের আলোকে ভরে রয়েছে, কিসের জন্য এবং কার জন্য? এই পথেই তো কতবার এসে দেখা দিয়ে গিয়েছে সেই নারী। পদ্মপত্রে লেখা তার লিপিকা এই পথেই কতবার কুড়িয়ে পেয়েছেন অগ্নি। মুঞ্জ তৃণে আস্তীর্ণ এই সুকোমল পথতলে কতবার এসে অগ্নির পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে সে, তার আবেদন অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে কতবার। অগ্নিকে ভালবেসেছে

ঐ মেঘবর্ণ দক্ষভবনের মেয়ে স্বাহা।

কিন্তু ভালবাসতে পারেননি অগ্নি। স্বাহা যেন অগ্নির অবাধ আগ্রহের জীবনকে স্তব্ধ করে দিতে চায়। অগ্নির জীবনকে এই বৃহৎ জগতের সহস্র আনন্দের বৈচিত্র্য থেকে বঞ্চিত ক'রে যেন ঊর্ণতন্তু দিয়ে পরিবৃত একটি ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে বন্দী করে রাখতে চায় স্বাহা, অগ্নি তাই মনে করেন। স্বাহার আহ্বানকে শুধু পিছনের আহ্বানের মত একটা বাধা বলেই মনে হয়েছে অগ্নির। তাই আজ এত নিকটে দাঁড়িয়েও মেঘবর্ণ ভবনের দিকে একবার চোখ তুলে তাকাতেও ভুলে যান অগ্নি।

সেই প্রভাতী নীরবতার মধ্যে গন্ধপাষাণের উপর প্রবাহিত ক্ষুদ্র জলধারা পার হবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিলেন অগ্নি, কিন্তু হঠাৎ চমকে ওঠেন আর উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। কা'র মৃদুসঞ্চারিত পদধ্বনির ছন্দে তৃণময় পথতল যেন স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। তারপরেই দেখলেন অগ্নি, চৈত্ররথ কাননের মৃগ নয়, মেঘবর্ণ ভবনের অন্তর্লোক থেকে সেই মৃগনয়নী যেন এক দুঃস্বপ্ন দেখে হঠাৎ জাগ্রত হয়ে এই পথে ছুটে চলে এসেছে। অপ্রসন্ন হয়ে তাকিয়ে থাকেন অগ্নি। দক্ষের কন্যা স্বাহা এসে অগ্নির পথরোধ করে দাঁড়ায়।

কুমারী স্বাহার কপালের উপর একটি কস্তুরীতিলক, শেষরাত্রির তারকার মত শয়নঘোরে যেন অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, কিন্তু একেবারে মুছে যায়নি। এছাড়া আর কোন প্রসাধন ও আভরণ নেই স্বাহার। যেন বলতে চায় স্বাহা, ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসা পেল না যে, তার আর প্রসাধনের প্রয়োজন কি? তারও অন্তর যে বৈধব্যেরই মত এক আঘাতের বেদনায় ভরে আছে। মিথ্যা তার কনককেয়ূর, বৃথা তার মঞ্জুমঞ্জীর আর ক্বণৎকাঞ্চীদাম।

এই পথেরই এক পত্রচ্ছদ তরুতলে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ প্রতীক্ষার কতগুলি ব্যাকুল মুহূর্তের মধ্যে একদিন এই সত্য বুঝেছিল স্বাহা, অগ্নিকে সে ভালবেসে ফেলেছে। সেই অনুরাগের প্রতীক এই কস্তুরীতিলক। জীবনের প্রথম প্রেমবিচলিত কামনার স্মৃতিচিহ্ন এই কস্তুরীতিলক। আশ্রমচারী ঐ সুন্দর পাবকের কাছে সেই দিন দক্ষদুহিতা স্বাহা তার জীবন ও যৌবনের আশা নিজমুখেই নিবেদন করেছিল।

তারপর এক সায়াহ্নে এই পথ থেকেই ব্যর্থ আবেদনের বেদনা নিয়ে ফিরে গিয়েছিল স্বাহা। জেনে গিয়েছিল স্বাহা, অগ্নি তাকে ভালবাসে না। বুঝেছিল স্বাহা, তার সীমন্তের শূন্য সরণি কোনদিন সিন্দূর-বিন্দুর রক্তিমায় শোভিত হবে না। তবে আর কাজ কি এই কেয়ূরে মঞ্জীরে ও কাঞ্চীদামে?

তবু আজও আবার ছুটে এসেছে স্বাহা। বৈধব্যের চেয়ে বোধহয় ভালবাসার অপমানে বেশি জ্বালা আছে। প্রেমিকের মৃত্যুর চেয়ে বুঝি বেশি দুঃসহ প্রেমের মৃত্যু, প্রেমিকার কাছে!

স্বাহা বলে—এমন করেই কি চলে যেতে হয়?

স্বাহার প্রশ্নের উত্তর দেন না অগ্নি। শুধু বিস্মিত হয়ে স্বাহার এই নিরাভরণ মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকেন, যেন স্বেচ্ছায় বনবাসব্রত গ্রহণ ক'রে প্রাসাদবাসিনী এই রূপমতী কুমারী অকারণে তপস্বিনীর মূর্তি ধরেছে।

অগ্নি প্রশ্ন করেন—এ তোমার কি বেশ স্বাহা?

স্বাহা—এই তো আমার যোগ্য বেশ।

অগ্নি—কেন?

স্বাহা—বুঝতে পারেন না?

অগ্নি—না। রাজপ্রাসাদের কুমারী কেন এত প্রসাধনবিহীনা ও এত নিরাভরণা হয়ে রয়েছে, বুঝতে পারি না।

স্বাহা—ব্যর্থ অনুরাগের জ্বালা অঙ্গরাগের প্রলেপে শান্ত হয় না অগ্নি। যার জীবনের নয়নানন্দ এমন ক'রে চক্ষুর নিকটপথ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, তার নয়নে কৃষ্ণাঞ্জন শোভা পায় না। যার কণ্ঠে প্রিয়তমজনের বরমাল্য শোভা পেল না, মণিহার তার গলায় সাজে না।

অগ্নি বিচলিত হন না। বরং প্রতিবাদ করেই বলেন—এ তোমারই ভুল স্বাহা।

স্বাহা—কিসের ভুল?

অগ্নি—আমাকে ভালবাস কেন? যে রাজকুমারী ইচ্ছা করলেই ত্রিভুবনের যে-কোন রত্নবান ও রূপবানের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করতে পারে...।

হেসে ফেলে স্বাহা—সে ইচ্ছাই যে হয় না অগ্নি।

অগ্নি—কেন?

স্বাহা—মনে হয়, ভালবাসা মধুপের ফুলবিলাস নয়। এক হতে অন্য জন, নিত্য নব অভিসার আর বল্লভসন্ধান নারীর প্রেমের রীতি নয়, নারীর ধর্মও নয়।

ঈষৎ ভ্রূকুটি করেন অগ্নি—নারীর ধর্ম কি?

স্বাহা—একপুরুষপ্রীতি।

অপ্রসন্ন হয়ে ওঠেন অগ্নি। কি হিংস্র এক ধর্মতত্ত্বের কথা এত শান্তভাবে বলে চলেছে স্বাহা! এক পুরুষের জীবনকে চিরকাল কারাগারের পাষাণপ্রাচীরের মত চারিদিক থেকে শুধু রুদ্ধ করে রাখতে চায় যে ক্ষুদ্র সংকল্প, তারই নাম নারীর প্রেম আর নারীর ধর্ম।

অগ্নি বলেন—অতি অর্থহীন ও অতি অসুন্দর এই নারীর ধর্ম।

স্বাহা বলে—শুধু নারীর ধর্ম কেন, পুরুষের ধর্মও যে তাই অগ্নি।

অগ্নি বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করেন—কি?

স্বাহা—একনারীপ্রীতি।

অগ্নি—এই ধর্মতত্ত্ব তুমিই স্মরণ করে রাখ স্বাহা। আমাকে বুঝতে বলো না।

স্বাহা—কেন অগ্নি?

অগ্নি—জীবনে কোন নারীকে ভালবাসবার প্রয়োজন আমার নেই।

স্বাহা—তা'ও যে পুরুষধর্ম নয় অগ্নি।

অগ্নি উষ্মা বোধ করেন—আমার ধর্ম আমি জানি।

স্বাহা—আপনার ধর্ম কি স্বতন্ত্র?

অগ্নি—হ্যাঁ।

চুপ করে থাকে স্বাহা, হয়তো তাই সত্য। ভাস্বরতনু এই পাবকের ক্ষুধা তৃষ্ণা ও আনন্দ হয়তো সাধারণের মত নয়। তাই ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে স্বাহার আহ্বান। অন্তরে যার অনলশিখার আকুলতা, মণিময় দীপিকার প্রেম তার কাছে ক্ষীণদ্যুতি বলে মনে হবে বৈকি। দাহিকার জ্বালা পান করবার জন্য যার নয়নে খরতৃষ্ণা স্ফূরিত হয়, প্রেমিকা স্বাহার কম্রনয়নশ্রী তার কাছে মূল্যহীন বলেই তো মনে হবে। বক্ষে যার বেদনা নেই, তার কাছে আবেদনের কি কোন অর্থ আছে?

অগ্নি বলেন—আমি যাই।

স্বাহা—কোথায়?

অগ্নি—সপ্তর্ষিভবনে যজ্ঞের নিমন্ত্রণ আছে।

স্বাহা যেন চমকে ওঠে, বেদনার্তস্বরে অনুরোধ করে—যাবেন না অগ্নি।

অগ্নি—কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না স্বাহা, কারণ স্বাহা নিজেই বুঝতে পারে না, কেন চমকে উঠেছে তার মন, কেন শঙ্কিত হয়েছে তার কল্পনা। মনে হয়, অনলশিখার আকুলতা অন্তরে বহন করে অগ্নি যেন চিরকালের মত স্বাহার প্রেমের জগৎ হতে দূরে চলে যাচ্ছেন, আর ফিরবেন না। কিন্তু এই শঙ্কার অর্থও স্পষ্ট করে বুঝতে পারে না স্বাহা।

যুক্তিবুদ্ধিহীনা বিমূঢ়ার মত শুধু অসহায় অশ্রু আরও সজল এবং শঙ্কাকুল স্বর আরও ব্যাকুল ক'রে স্বাহা বলে—যাবেন না অগ্নি। জানি না কেন শুধু মনে হয়, বিপন্ন হবে আপনার...।

ক্ষুব্ধ হয় অগ্নির কণ্ঠস্বর—কি বিপন্ন হবে? আমার প্রাণ?

স্বাহা—না।

অগ্নি—তবে কি?

বলতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বলতে পারে না স্বাহা।

কিন্তু স্বাহার উত্তর শুনবার জন্য আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করেন না অগ্নি। চতুরা দক্ষদুহিতা স্বাহা যেন এক কপট ভয় নয়নে চমকিত ক'রে অগ্নির এই শুভযাত্রার আনন্দকে শঙ্কিত করতে চায়। অপাঙ্গে স্বাহার মুখের দিকে তাকিয়ে এবং নীরব ধিক্কার নিক্ষেপ করে চলে যান অগ্নি। ক্ষুদ্র জলধারা পার হয়ে চৈত্ররথ কাননের পথে অদৃশ্য হয়ে যান।

সপ্তঋষির সমাদরে, সপ্ত ঋষিপত্নীর অভ্যর্থনায় এবং যজ্ঞে ও উৎসবে অগ্নির জীবনের কয়েকটি দিন হর্ষায়িত হয়েই যেন হঠাৎ শেষ হয়ে যায়। এইবার তাঁকে চলে যেতে হবে। কিন্তু বুঝতে পারেন অগ্নি, চলে যেতে মন চাইছে না।

সপ্তর্ষিভবনের যজ্ঞশালায় ধূমসৌরভ আর ছিল না, উৎসবের প্রদীপও নিভে গিয়েছে। কোন কাজ নেই, উদ্দেশ্য নেই, তবু সপ্তর্ষিভবনেই কালযাপন করেন অগ্নি।

জীবনে এই প্রথম বেদনা বোধ করেছেন অগ্নি। এই প্রথম অনুভব করেছেন, সপ্তর্ষিভবনের কিসের এক মায়া তাঁকে যেন পিছন থেকে ডাকছে আর ধ'রে রাখছে। তাই চলে যেতে পারছেন না অগ্নি। চিরজীবন এই ভবনের অন্তর্লোক সন্ধান করে সেই মায়ার রহস্যকে উদ্ধার করতে ইচ্ছা করেন অগ্নি।

কিন্তু সে যে নিতান্ত অনধিকার, অতিথি অগ্নির পক্ষে আর এক মুহূর্তও সপ্তর্ষিভবনে থাকবার কোন প্রয়োজন নেই। বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে গিয়েছেন সপ্তঋষি—মরীচি ও অত্রি, অঙ্গিরা ও পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু এবং বশিষ্ঠ। বিদায়-প্রণাম নিবেদন করে গিয়েছে সপ্ত ঋষিপত্নী—সম্ভূতি ও অনসূয়া, শ্রদ্ধা ও প্রীতি, গতি ও সন্নীতি, এবং অরুন্ধতী। তবে সপ্তসহচরীসেবিত সপ্তঋষির এই নভঃপুরীর অভ্যন্তরে, চন্দ্রতারায় অবকীর্ণ স্নিগ্ধ আলোকের এই সংসারে কিসের আশায় পড়ে থাকতে চান অগ্নি?

নিজেকে প্রশ্ন ক'রেও কোন উত্তর পেলেন না অগ্নি। অশান্ত মনের তাড়না থেকে যেন পালিয়ে যাবার জন্য দ্রুতপদে সপ্তর্ষিভবনের আঙ্গিনা পার হয়ে চলে যান। নিস্তব্ধ যজ্ঞশালার দ্বারপ্রান্তে এসে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। পরমুহূর্তে যেন এক স্বপ্নলোক থেকে উৎসারিত কলহাস্যের শব্দ শুনে চমকে ওঠেন।

যজ্ঞশালার পার্শ্বে লতাগৃহের অভ্যন্তরে বসে মাল্য রচনা করছিল সপ্ত ঋষিপত্নী। নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে থাকেন অগ্নি, এবং এতক্ষণে বুঝতে পারেন, এই স্বপ্নলোকেরই রূপামৃত পান করবার জন্য অন্তরের অনল তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছে। যৌবনবতী সাতটি লীলায়িত অঙ্গশোভা। সাতটি শিথিল নিচোল, সাতটি বিগলিত বেণী ও চঞ্চল সমীরকৌতুকে উদ্বেলিত সাতটি অংশুক বসন। সপ্ততন্বীর হাস্যশিহরিত দেহ যেন সাতটি শিখা, যার বিচ্ছুরিত প্রভা প্রবল দাহিকা হয়ে অগ্নির ধমনীধারায় সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে। সেই বেদনায় অস্থির হয়ে যজ্ঞশালার দ্বারপ্রান্ত হতে ছুটে চলে যান অগ্নি।

চৈত্ররথ কাননের অভ্যন্তরে এক অনলের তৃষ্ণা ঘুরে বেড়ায়। আশ্রমে ফিরে যেতে পারেননি অগ্নি। ফিরে যেতে ইচ্ছা করে না।

কল্পনায় দেখতে পান অগ্নি, দূর নভঃপুরীর অঙ্গনে এক লতাগৃহের নিভৃতে সাতটি রূপশিখাময়ী দাহিকা। যেন সপ্ত ঋষিপত্নীর তনুচ্ছবি ধ্যান করার জন্য চৈত্ররথ কাননের নিভৃতে নিজেকে নির্বাসিত করে রেখেছেন অগ্নি। এক অসম্ভবের আশায়, অপ্রাপ্যের তপস্যায়, অনন্ত প্রতীক্ষার সংকল্প নিয়ে বসে থাকবেন অগ্নি। এই প্রতীক্ষায় যদি জীবন ফুরিয়ে যায়, ক্ষতি কি?

কি ক্ষতি, কেমন ক'রে বুঝবেন অগ্নি? কি ক্ষতি, সে বুঝবে কি করে, স্নিগ্ধদ্যুতি স্বাহার আহ্বানকে জীবনের বাধা বলে মনে করেছে যে? বুঝবার মত হৃদয় কোথায় তার, সপ্তঋষিবধূকে অভিসারিকারূপে দেখবার আশায় চৈত্ররথ কাননের নিভৃতে যার আকাঙ্ক্ষা এক ভয়ংকর প্রতীক্ষার তপস্যায় বসে আছে? নারীকে প্রেমিকারূপে নয়, শুধু দাহিকারূপে লাভ করবার জন্য যে পুরুষের তৃষ্ণা আকুল হয়ে রয়েছে, সে বুঝবে কি করে, ক্ষতি কোথায়?

জীবনে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়ে গিয়েছে যার, দক্ষদুহিতা সেই স্বাহাই একদিন শুনতে পায় সংবাদ, চৈত্ররথ কাননের নিভৃতে নিজেকে নির্বাসিত ক'রে রেখেছেন অগ্নি। দূর নভঃপুরীর দিকে তাকিয়ে এক ভয়ংকর প্রতীক্ষার তপস্যায় সেই সুন্দর পাবকের দিনযামিনীর মুহূর্তগুলি দুঃসহ এক দহনলালসার জ্বালা সহ্য ক'রে শেষ হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারে স্বাহা তার সেই আশঙ্কাই এতদিনে সত্য হয়েছে। দক্ষের মেঘবর্ণ ভবনের নিভৃতে কুমারী স্বাহার মন বেদনায় ভেঙে পড়ে।

পুরুষধর্ম বোঝে না, নারীর প্রেমের রীতিও বোঝে না, এমন মানুষের জীবনে বনবাসের অভিশাপ লাগবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? মমতায় অসাধারণ নয়, প্রীতিতে অসাধারণ নয়, শুধু অনলভরা ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও কামনায় অসাধারণ, এমন মানুষকে সাধারণের সংসার সহ্য করতে পারে না, কোনদিন পারবেও না। এই সত্য উপলব্ধি করবার মত হৃদয় নেই অগ্নির।

অনুরাগিণী স্বাহার কস্তুরীতিলক যার কাছে কোন সম্মান পেল না, একনিষ্ঠার সুন্দর আবেদনকে লাঞ্ছিত ক'রে যে চলে গিয়েছে, তার জীবনের মূঢ়তা আজ বহুলিপ্সার অভিশাপরূপে চরম হয়েই দেখা দিয়েছে। এই পৌরুষ পৌরুষ নয়, এই পরদারকামনা কামনা নয়, এই প্রতীক্ষা প্রণয়ীর

প্রতীক্ষা নয়, এ শুধু নিজের অনলে নিজেকে ভস্মীভূত করা। আত্মহত্যারই মত ভয়ানক এই আয়োজন থেকে অগ্নিকে কে নিবৃত্ত করতে পারে?

কেউ নয়, অগ্নিকে এই অভিশপ্ত নির্বাসন থেকে উদ্ধার করবার জন্য এই পৃথিবীর কোন হৃদয়ে কোন উদ্বেগ কৌতূহল ও আগ্রহ নেই, শুধু একটি হৃদয় ছাড়া। সেই হৃদয় আজ থেকে থেকে এক মেঘবর্ণ ভবনের নিভৃতে বেদনায় ভেঙে পড়ে, অসিতনয়নশোভা অশ্রুসজল মেদুরতায় ভরে ওঠে। এই ক্ষতি শুধু স্বাহারই ক্ষতি, আর কারও নয়। এতদিনে যেন প্রেমিকা স্বাহার জীবনে সত্যই এক বৈধব্যের রিক্ততা চরম হতে চলেছে।

কে উদ্ধার করবে অগ্নিকে? সুন্দর পাবকের জীবনের শুচিতাকে এই ভয়ানক কলুষের আক্রমণ থেকে কেমন ক'রে রক্ষা করা যায়? এই প্রশ্ন যেন স্বাহার ভাবনার অন্ধকারে রুদ্ধ স্বপ্নের মত সারাক্ষণ বেদনা সহ্য করতে থাকে।

শক্তি নেই স্বাহার। নিজেরই এই দুর্বলতাকে ক্ষমা করতে পারে না স্বাহা। প্রার্থনা করে স্বাহা—ক্ষমা কর অদৃষ্টের দেবতা, শক্তি দাও হে সকল কালপুরুষ। হরণ কর সকল ভয়, হে ভয়হরণ! কর নিঃসঙ্কোচ, কর নির্লজ্জ, প্রেমিকা স্বাহার জীবনে পরম দুঃসাহসের অভিসার এনে দাও। চৈত্ররথ কাননের কারাগার থেকে সকল অভিশাপের প্রাচীর চূর্ণ করে স্বাহার জীবনবাঞ্ছিতকে উদ্ধার ক'রে আনতে চাই, সেই উদ্ধারের মন্ত্রটুকু বলে দাও এই প্রণয়ভীরু কুমারী স্বাহার কানে কানে, হে পরম দেব!

প্রতি মুহূর্ত স্বাহার অন্তরে এই আকুল প্রার্থনা যেন নীরবে ধ্বনিত হতে থাকে। সেই অসহায় ভ্রান্তকে উদ্ধার করতে হবে, সংকল্পে অটল হয়ে ওঠে স্বাহার মন। কিন্তু মনের নিকটে কোন উপায় খুঁজে পায় না। মেঘবর্ণ ভবনের চূড়ায় সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনতর হয়ে দেখা দেয়।

নিজেরই মনের পথহীন অন্ধকারের মত বাহিরের ঐ চরাচরব্যাপ্ত অন্ধকারের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে স্বাহা। তার জীবনের স্নিগ্ধজ্যোতি প্রেম যেন এই বিরাট অন্ধকারের করাল নিঃশ্বাসের আঘাতে চিরকালের মত নিভে যেতে চলেছে। প্রেমিকা হয়ে যে সুন্দর পাবককে ভালবেসেছে স্বাহা, পতিরূপে যাকে পেয়ে জীবন ধন্য করতে চেয়েছ স্বাহা, তাকে উদ্ধার ক'রে আনবার মত শক্তি নেই স্বাহার। এই ভীরু প্রেমের দুর্বলতাকে ধিক্কার দেয় স্বাহা।

হঠাৎ জ্বালাময় আলোকের মত অদ্ভুত এক রক্তিম আভায় ভরে ওঠে স্বাহার মুখ। ঐ অন্ধকারের সমুদ্রে বহুদূরে যেন এক বড়বানলের দ্যুতি জ্বলছে, স্বাহার মুখের উপর তারই প্রতিচ্ছায়া পড়েছে।

নিষ্পলক নয়নে দেখতে থাকে স্বাহা, দূর বনগিরিশিরে এক দাবানলের জ্বালালীলা জেগেছে। কোন্ এক প্রেমিকার ব্যর্থ আবেদনের বেদনা যেন দাহিকা হয়ে আর সকল লজ্জা ভয় ও বাধা পুড়িয়ে দিয়ে প্রেমিকের বক্ষের কাছে যাবার জন্য জগতের এই অন্ধকারে পথ সন্ধান ক'রে ফিরছে।

দক্ষতনয়ার দ্যুতিময় দুটি চক্ষু আরও প্রখর হয়ে জ্বলতে থাকে। যেন উপায় দেখতে পেয়েছে স্বাহা। ব্যস্ত হয় স্বাহা। প্রস্তুত হয় স্বাহা।

·

সফল হয়েছে অনলের জ্বালাময় তৃষ্ণার প্রতীক্ষা। চৈত্ররথ কাননের পথে দাহিকার অভিসার শুরু হয়েছে। যেন সত্যই অগ্নির কামনাময় স্বপ্নের কথা শুনতে পেয়ে সপ্তর্ষিভবনের হৃদয় থেকে এক একটি রূপের শিখা এসে অগ্নির আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করেছে।

অনলশিখ অগ্নির ভয়ংকর প্রতীক্ষা বনপথচারিণী অভিসারিকার মৃদু মঞ্জীরের নিক্বণে নিত্য চমকিত হয়। স্নিগ্ধবেণী, কজ্জলিত আঁখি, রঞ্জিত অধর, কেয়ূর-কিঙ্কিনী-কাঞ্চীভূষিতা মনোহরা এক একটি মূর্তি আসে। স্বচ্ছ অংশুকবসনে আবরিত মদালসমন্থর এক একটি অঙ্গশোভা ঋষিবধূর মূর্তি ধরে চৈত্ররথ কাননের নিভৃতে প্রতি রজনীতে আসে আর রভসাকুল উৎসব সৃষ্টি করে চলে যায়। অন্ধ ভৃঙ্গের মত সেই নারীদেহ পুষ্পের মধু পান করেন অগ্নি। শুধু দেখতে পান না, সে মূর্তির সকল ছদ্মসজ্জার মধ্যেই কপালের উপর একটি কস্তুরীতিলক স্পষ্ট ফুটে রয়েছে।

পরদারকামনার অশুচিতা হতে প্রেমাস্পদের জীবনকে রক্ষা করবার জন্য প্রেমিকা স্বাহার জীবনে বিচিত্র এক কপট অভিসার শুরু হয়েছে। ঋষিবধূর ছদ্মমূর্তি ধ'রে প্রতি রজনীতে চৈত্ররথ কাননের নিভৃতে অনলের কামনা তৃপ্ত করবার জন্য যেন দাহিকার উপঢৌকন নিয়ে যায় স্বাহা।

কোথায় ভুল হলো, ভাবতে পারে না স্বাহা। সকল লজ্জা কুণ্ঠা ও ভয় মন থেকে মুছে ফেলে এক কপট অভিসারের নায়িকা হয়ে ওঠে। হোক কপট আর কৃত্রিম অভিসার! জীবনে যার বক্ষের স্পর্শ চিরন্তন ক'রে রাখতে চেয়েছে স্বাহা, ছদ্মবেশে চৈত্ররথ বনের এক মোহকুহেলিকার আড়ালে মুখ ঢেকে তারই আলিঙ্গন বরণ করে স্বাহা। কোন অশুচিতা বোধ করে না।

ব্যর্থপ্রেমের বেদনায় ভরা জীবনের এক রঙ্গস্থলীতে যেন নাটকের নায়িকার মত অভিনয় ক'রে চলেছে স্বাহা। এই রঙ্গস্থলীর পথে পথে যে অকৃত্রিম অন্ধকার ছড়িয়ে রয়েছে, তার চেয়ে বাস্তব সত্য আর কিছু নেই; কিন্তু তারই মধ্যে যে ঋষিবধূর মূর্তি অভিসারে আসে, তার চেয়ে মিথ্যা আর কিছু নেই। এইভাবেই এই রঙ্গস্থলীতে অভিসারিকার বেশে একে একে দেখা দিয়েছে ঋষিবধূ অনসূয়া ও সম্ভূতি, শ্রদ্ধা ও প্রীতি, গতি ও সন্নীতি। কিন্তু সব মিথ্যা, সব অলীক, সব কপট। এই ঋষিবধূর মূর্তির মধ্যে লুকিয়ে থাকে শুধু স্বাহা নামে এক প্রেমিকার তনু।

সম্ভূতি, অনসূয়া, শ্রদ্ধা, প্রীতি গতি ও সন্নীতি—ছয় ঋষিবধূর মূর্তি ধারণ করে চৈত্ররথ কাননের নিশীথের অন্ধকার চলমঞ্জীরে চঞ্চলিত ক'রে ছদ্মবেশিনী অভিসারিকা স্বাহা অনলের কাছে এসেছে আর চলে গিয়েছে। তৃপ্ত হয়েছে অনলের জীবনের ছয়টি তৃষ্ণার্ত নিশীথ। হৃষ্টমানস অনল তবুও প্রতীক্ষায় রয়েছেন। কারণ, আজও আসেনি ঋষিবধূ অরুন্ধতী। বাকি আছে শুধু একজন, ঋষিবধূ অরুন্ধতী। সপ্তম নিশীথের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হলেই সমাপ্ত হবে চৈত্ররথ কাননের নিভৃতে অগ্নির এই প্রতীক্ষার জীবন, সফলকাম ব্রতীর মত আনন্দ নিয়ে চলে যেতে পারবেন অগ্নি।

দূরে চৈত্ররথ কাননের রাত্রি শিশিরবাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। স্বাহার যাত্রালগ্ন এগিয়ে এসেছে, বশিষ্ঠপ্রিয়া অরুন্ধতীর রূপানুরূপিণী হয়ে ছদ্মসজ্জা ধারণ করে স্বাহা।

যাত্রা করে অভিসারিকা স্বাহা। যাত্রা করে এক মিথ্যা অরুন্ধতী। কিন্তু চলতে গিয়েই যেন বাধা পায় স্বাহা।

যা কোনদিন হয়নি, তাই হয়। মনের গভীরে কে যেন প্রতিবাদ ক'রে ওঠে—ভুল করছ স্বাহা।

তবু এগিয়ে যায় স্বাহা। কিন্তু পদমঞ্জীরে সুন্দর ধ্বনি আর বাজে না, গতি ছন্দ হারায়। চকিত বিস্ময়ে পথের উপর থমকে থাকে স্বাহা। মনে হয়, কানে কানে কে যেন হঠাৎ বলে দিয়ে চলে গেল—অন্যায় করছ স্বাহা।

তবু এগিয়ে চলে আর চৈত্ররথ কাননে প্রবেশ করে স্বাহা। পথের কণ্টকগুল্ম যেন পিছন থেকে স্বাহার চেলাঞ্চল টেনে ধরে—অপমান করো না স্বাহা।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে স্বাহা। কার অপমান? কিসের অন্যায়? কোথায় ভুল? স্বাহার সমস্ত মন দুঃসহ এক শঙ্কায় শিহরিত হতে থাকে।

ভুল ক'রে এক ভয়ানক নির্লজ্জতা দিয়ে জগতের নারীধর্মকেই কি অপমানিত করছে না স্বাহা? তারই দেহমন কি এক অশুচি স্পর্শে কলুষিত হয়ে উঠছে না? বুঝতে পারে না স্বাহা, কেন আজ এই সন্দেহ বার বার প্রশ্ন করে তার অভিসারের দুঃসাহস ছিন্ন করে দিচ্ছে। বনপথের উপরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে স্বাহা।

নিজের ছদ্মসজ্জার দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ চমকে ওঠে স্বাহা। এ যে পতিপ্রিয়া অরুন্ধতীর রূপানুরূপিণী এক মূর্তি! এ যে এক শুদ্ধানুরাগিণী পতিব্রতার মূর্তি!

বনপথের উপরে অসহায়ের মত বসে পড়ে স্বাহা। না, আর পারবে না স্বাহা। আর শক্তি নেই স্বাহার, পতিপ্রাণা বশিষ্ঠপ্রিয়া অরুন্ধতীকে অপমান করতে পারবে না স্বাহা। লোকপূজ্যা সেই সতী নারীর কৃত্রিম মূর্তিকে অভিনয়ের ছলেও পরপুরুষের কামনার কাছে সঁপে দিতে পারবে না।

যেন এই ছদ্মবেশের নিবিড় বন্ধনের মধ্যে বন্দিনী হয়ে বসে থাকে স্বাহা। অনুভব করে, এই ছদ্মবেশের স্পর্শ যেন ধীরে ধীরে তার অন্তরের গভীরে বিপুল এক মোহ সঞ্চারিত করছে। এই রীতি প্রেমিকার রীতি নয় স্বাহা! যেন কা'র এক স্নিগ্ধ ধিক্কার শুনে লজ্জিত হয় অভিসারিকার অলজ্জ দুঃসাহস।

কেঁদে ফেলে স্বাহা। এমন করে কোনদিন কাঁদেনি স্বাহা। এত স্পষ্ট করে নিজের ভুল আর ক্ষতিকে কোনদিন বুঝতে পারেনি। তার প্রেমাস্পদ সুন্দর পাবকের জীবনকে শুচিতাময় এক প্রেমের দীক্ষা দিতে পারেনি স্বাহা, বরং ভুল ক'রে বহু ছদ্মরূপে সঙ্গ দান ক'রে প্রেমিকেরই পৌরুষ কলুষিত ক'রে এসেছে। এই রীতি নারীপ্রেমের রীতি নয়, প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমিকার কর্তব্য নয়।

চৈত্ররথ কাননের বনপথের একান্তে এক কৃত্রিম অরুন্ধতীর অন্তর যেন অনুতাপে পুড়তে থাকে। একনিষ্ঠ প্রেমের নারী বশিষ্ঠপ্রিয়া অরুন্ধতীর মত এই রূপসজ্জা, আননের এই চন্দনরোচনা ও হস্তের এই শঙ্খবলয়, থালিকার এই অর্ঘ্যপুষ্প আর ভৃঙ্গারকের এই সলিল যেন আঘাত দিয়ে স্বাহার অন্তরের রূপ বদলে দিয়েছে। ভেঙ্গে দিয়েছে ভুল, স্মরণ করিয়ে দিয়েছে নারীধর্মের রীতি। অভিনয়ের কাছেই আজ হেরে গিয়েছে স্বাহা।

চুপ ক'রে বসে থাকে স্বাহা। চৈত্ররথ কাননের এই অন্ধকার যেন তার সারাজীবনের পথ ভুল ক'রে দিয়েছে। মেঘবর্ণ দক্ষভবনের স্নেহনীড়ে আর ফিরে যাবারও পথ নেই। কারণ, এক শিশুপ্রাণের যে সঞ্চার স্বাহার অন্তর্লোকে এসে গিয়েছে, এই নিভৃতে বক্ষোবেদনার প্রতি স্পন্দনে তারই সাড়া আজ স্পষ্ট করে শুনতে পায় কুমারী স্বাহা। সকল দিক দিয়ে ক্ষতি ও অখ্যাতি এসে আজ পূর্ণ ক'রে তুলেছে কুমারী স্বাহার জীবন।

মধ্যরজনীর ক্ষীণ চন্দ্রলেখা চৈত্ররথ বনের পুষ্প গুল্ম ও লতায় চূর্ণ জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আলোছায়ার মায়া সৃষ্টি করে। মুখ তুলে তাকায়, যেন পালিয়ে যাবার পথ খুঁজছে স্বাহা। রক্ষা করতে পারেনি অগ্নিকে, রক্ষা করতে পারেনি নিজেকে, কিন্তু সব ক্ষতি ও অপমানের অভিশাপ থেকে একটি শিশুজীবনকে মাতার স্নেহ দিয়ে রক্ষা করবার জন্য আজ আরও দূরান্তে সবাকার অগোচর এক নিবিড়তম বনবাসের অন্ধকারে স্বাহাকে চলে যেতে হবে। তারই জন্য যেন পথ খুঁজছে স্বাহার সিক্ত চক্ষুর দৃষ্টি।

হঠাৎ চমকে ওঠে স্বাহা। কা'র পদশব্দ? বনেচর মৃগ নয়, মৃগয়াজীব ব্যাধ নয়, তবে কে ঐ অশান্ত? স্বপ্নোদ্‌ভ্রান্তের মত পথ ভুল ক'রে এই দিকে এগিয়ে আসছে?

চিনতে পারে স্বাহা, এবং বনপথের উপর শ্রান্তালস দেহ স্তব্ধ ক'রে নিয়ে অপলক দৃষ্টি তুলে দেখতে থাকে, হ্যাঁ, সে-ই আসছে। মঞ্জীরধ্বনি শুনতে না পেয়ে এক উৎকর্ণ আকুলতা যেন বনপথ ধরে কাউকে সন্ধান করবার জন্য এগিয়ে আসছে।

আরও নিকটে এগিয়ে আসে সেই অস্থির পদশব্দ, স্বাহার সম্মুখে এসে ক্ষণিকের মত শান্ত হয়ে দাঁড়ায়। তারপর আগ্রহস্বরে প্রশ্ন করে—কে তুমি?

স্বাহা—আমি অরুন্ধতী।

অগ্নির কণ্ঠস্বরে ব্যাকুল উল্লাস ধ্বনিত হয়—তুমি অরুন্ধতী।

স্বাহা—হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কে?

অগ্নি—আমি অগ্নি।

স্বাহা—তুমি অভিশাপ। তুমি অশুচি। হীনপৌরুষ প্রেমহীন পারদারিক তুমি। আমার সম্মুখ হতে দূরে সরে যাও।

প্রখর দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন অগ্নি। বুঝতে চেষ্টা করেন চৈত্ররথ কাননের আলোছায়ার রহস্যের মধ্যে এ কোন্ নূতন ছলনা এসে প্রবেশ করেছে?

অরুন্ধতীরূপিণী স্বাহার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন অগ্নি। দুর্বোধ্য এক বিস্ময়ে আহত হয়ে তাঁর দুই চক্ষুর কৌতূহল কাঁপতে থাকে। হঠাৎ চমকে ওঠেন, আর চিৎকার করেন অগ্নি।

—স্বাহা!

এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন অগ্নি, কপট অভিসারে ছলিত হয়েছে চৈত্ররথ কানন, ছলিত হয়েছে তাঁর প্রতীক্ষার তপস্যা। মিথ্যা উপহারে ছলিত হয়েছে তাঁর অনলশিখ বক্ষের আগ্রহ। চন্দনরোচনায় ও শঙ্খবলয়ে ভূষিতা এই নারীর কপালে অঙ্কিত ঐ কস্তুরীতিলক স্পষ্ট ক'রেই দেখতে পেয়েছেন অগ্নি। কঠোর স্বরে আবার আহ্বান করেন—স্বাহা।

অগ্নির চক্ষু আহ্বান শুনে উঠে দাঁড়ায় স্বাহা।

অগ্নি বলেন—এত বড় ছলনা দিয়ে কেন আমাকে অপমানিত করলে স্বাহা?

স্বাহা—জানি না কেন করেছি। ভুল করেছি! ক্ষমা কর।

অগ্নি—ক্ষমা হয় না স্বাহা।

স্বাহা—দাও অভিশাপ। শুধু একটি আশীর্বাদ করো...।

বিস্মিত হয়ে থাকেন অগ্নি। অগ্নিকে প্রণাম করে স্বাহা বলে—শুধু একটি আশীর্বাদ করো, তোমার সন্তানকে যেন সকল ক্ষতি ও অখ্যাতি থেকে রক্ষা করতে পারি।

চৈত্ররথ কাননের আলোছায়া যেন দুর্বোধ্য এক স্বপ্নালোকের রূপ নিয়ে আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে। তারই মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন অগ্নি, যেন তাঁর জীবনের সকল অনলশিখ তৃষ্ণা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। তাঁর পথভ্রান্ত পৌরুষের জীবনকে শুচিতাহীনতার পাপ হতে রক্ষা করবার জন্য কুমারী হয়েও নিজ দেহ হতে দাহিকার উপহার দিয়ে সকল জ্বালা সহ্য করেছে যে, তাঁরই সন্তানের মাতা হতে চলেছে যে, তারই কপালে চিরন্তন হয়ে ফুটে আছে একটি প্রেমের কস্তুরীতিলক।

অগ্নি ডাকেন—স্বাহা।

কিন্তু কোথায় স্বাহা? অগ্নিকে প্রণাম ক'রে এই আলোছায়ার রহস্যের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, চলে গিয়েছে অগ্নির প্রেমাভিলাষিণী স্বাহা। অসহায়ভাবে বেদনাপীড়িত কণ্ঠস্বরে বনময় প্রতিধ্বনি তুলে অগ্নি ডাকেন—স্বাহা! স্বাহা!

চৈত্ররথ কাননে বৎসরের পর বৎসর শীত-গ্রীষ্ম আর বর্ষা-বসন্তের খেলা শেষ হয়। তারই মধ্যে অহরহ একটি আকুল প্রতিধ্বনি শুধু আলো অন্ধকার ও বাতাস বেদনার্ত ক'রে ছুটাছুটি করে বেড়ায়—স্বাহা! স্বাহা!

সত্যই এক অনন্ত প্রতীক্ষার তপস্যা শুরু করেছেন অগ্নি। কপালে কস্তুরীতিলক স্নিগ্ধদ্যুতিরূপিনী এক নারী এই পথে ফিরে এসে দেখা দেবে কবে? স্বাহা! স্বাহা! আগ্নেয়জননী স্বাহ ' পিতৃহৃদয়ের শূন্যতা, শুদ্ধপৌরুষ পতিহৃদয়ের শূন্যতা দূর করবার জন্য যেন এক বাঞ্ছিতার উদ্দেশ্যে সাগ্রহ আহ্বান-মন্ত্র চৈত্ররথ কাননের সমীরে নিরন্তর মন্দ্রিত হয়। স্বাহা! স্বাহা! আমার আশ্রম গেহিনী রূপে এস। আমার গার্হপত্যের একমাত্র শিখারূপে এস। এস প্রিয়া স্বাহা।

সেই এক প্রেমিকা নারীর কামনার পুণ্য স্পর্শকেই অনন্তকাল আহ্বান করবেন অগ্নি—স্বাহা! স্বাহা!

কিম্বদন্তীর দেশে

মূর্ছা পাহাড়ের কথা

সত্যিই পাহাড় নয়, তবু এর নাম মূর্ছা পাহাড়। অনেক শতাব্দীর আনন্দ আশা ও উচ্ছ্বাস এবং অনেক অশ্রু ও অনেক আর্তনাদ মূর্ছিত হয়ে আছে এখানে। আর, সেই মূর্ছার স্তূপ পাহাড়েরই মত এক বিশাল রূপ ধারণ করেছে, যদিও চোখে দেখা যায় না। তারই নাম কি মূর্ছা পাহাড়?

হয়তো তাই। কোন মধ্যাহ্নে এখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে তাকালে যে অদ্ভুত একটা বিষণ্নতা এসে হঠাৎ সকল চিন্তা অভিভূত ক'রে ফেলে মেদুর হয়ে ওঠে চোখের দৃষ্টি, আর কল্পনাও ব্যথিত হয়ে একটা মূক আক্ষেপের তাড়নায় ছটফট ক'রে তারপর স্তব্ধ হয়ে যায়, তারই জন্য কি এর নাম মূর্ছা পাহাড়?

অথবা, বহুদিন আগে নবাগন্তুক এক সন্ন্যাসী রাত্রি যাপন করবার জন্য এখানে এসে এক সন্ধ্যায় কে-জানে কি দেখতে পেয়ে আর বিচিত্র এক অনুভবের চাঞ্চল্যে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন, তারই জন্য কি এর নাম মূর্ছা পাহাড়?

সত্যই পাহাড় নয়, প্রাচীন এক দুর্গপ্রাচীরের জীর্ণ এক দেহখণ্ড মাত্র। বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের বলিষ্ঠ বাহুর বহু কীর্তি স্মৃতি ধারণ ক'রে আজও দাঁড়িয়ে আছে তাঁর দুর্গের দুয়ার। তার নাম পাথর-দরজা। পাষাণে গঠিত এই দৃঢ়কায় দুর্গদ্বারের উত্তরে যে উচ্চ প্রাচীরাংশ আজও দাঁড়িয়ে আছে, তারই নাম হলো মূর্ছা পাহাড়।

এই তো সেই বিষ্ণুপুর, যার মাটির প্রতি কণিকায় ইতিহাসের শত কাহিনীর স্মৃতি মিশে আছে। মল্ল রাজবংশের হাজার বছরের শৌর্য ও শ্রদ্ধার, ভক্তি ও নিষ্ঠার এবং সেই সঙ্গে মূঢ়তা ও নিষ্ঠুরতারও এক বিরাট ইতিবৃত্তের অবশেষ এই বিষ্ণুপুরের প্রান্তরেও দীর্ঘিকায় এবং মন্দিরের নিস্তব্ধ আঙিনার অঙ্গে লুটিয়ে পড়ে আছে।

মূর্ছা পাহাড়ে আজ আর কোন প্রহরী তার নিদ্রাহীন চক্ষুর দৃষ্টি দিক্‌প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত ক'রে বিষ্ণুপুরের জীবনকে পাহারা দেয় না। স্বয়ং মূর্ছা পাহাড়ই যেন কালের প্রহরীর মত এক সূর্যাস্ত থেকে আর এক সূর্যাস্ত পর্যন্ত অনিমিখ চোখে বিষ্ণুপুরের দশ শতাব্দীর উত্থান-পতন ও অদৃষ্ট বিপ্লবের এক অশরীরী ইতিহাসকে লক্ষ্য করছে।

মধ্যাহ্নের রোদে মূর্ছা পাহাড়ের দেহে যখন জ্বালা ধরে, চারদিকের শাল তাল তেঁতুল ও নিমের বনে তখন প্রাচীন বিষ্ণুপুরের অভিমান যেন মৃদু ঝড়ের মত শব্দ করে। সামান্য একটু কাঁপন লাগে শ্যামবাঁধ আর কালিন্দীবাঁধের বিষণ্ন জলে।

সন্ধ্যা হয়। মূর্ছা পাহাড় উৎকণ্ঠ হয়ে দেখতে থাকে, বিষ্ণুপুরের দশ শতাব্দীর শ্মশানে অন্ধকার নামছে ধীরে ধীরে। যেন উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে মূর্ছা পাহাড়, বিষ্ণুপুরের মাটি ও বাতাসের শব্দগুলি এক একটি যুগের সমাধিতে মিলিয়ে যাচ্ছে। রাত্রির বক্ষ থেকে যেন স্খলিত হয়ে পড়ছে স্তরান্বিত এক একটি যুগের অন্ধকার। অতীতের বিবর থেকে বের হয়ে আসছে শুধু যত আক্ষেপ আর্তনাদ ও দীর্ঘশ্বাস। সন্ধ্যা থেকে শুরু ক'রে শেষরাত্রি পর্যন্ত, গভীরতর অন্ধকারের সঙ্গে বিষ্ণুপুর যেন ফিরে চলেছে তার দূরতর অতীতের আশ্রয়ে।

ভোঁসলার সেনাপতি ভাস্কর রাও-এর দর্পহরণ দলমাদলের ওষ্ঠপ্রান্তে বারুদের শেষ চিহ্নও আর নেই, এইবার শীতল হয়ে গেল তার লৌহময় দেহের সেই উত্তাপ আর সেই অগ্নিবর্ষী গর্জন। ঐ তো সেই 'লাল বাঁধের'ই জল, আজ আবার অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে ফেলছে। মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর সুন্দরী লাল বাঈ-এর আর্তনাদ লাল বাঁধের জলে শেষ বুদ্বুদ সৃষ্টি ক'রে চিরকালের মত স্তব্ধ হয়ে গেল। অন্ধকারে মূর্ছিত হয়ে প'ড়ে রইল 'মহারাষ্ট্র ডাঙা'—বর্গী শিবিরে শেষ মশালও আর জেগে নেই। বীর হাম্বীরের তরবারির আঘাতে দায়ুদ খাঁর ফৌজ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লো যেখানে, সেই 'মুণ্ডমালাঘাট'ও যে আর শব্দ করে না। মৃন্ময়ী মন্দিরের আঙিনা একেবারে শান্ত হয়ে গেল এতক্ষণে। শুকিয়ে ধুলো হয়ে গেল নর বলিশিহরিত এই মন্দিরপ্রাঙ্গণের শেষ রুধিরচিহ্ন। প্রচণ্ড ধর্মশীলের সুশানিত খড়্গের দিকে তাকিয়ে বলির নর আর আর্তনাদে বাতাস করুণ ক'রে তোলে না। ঐ যে, নিভে গেল সেই চিতার শিখা, যে চিতায় মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমরণ বরণ করলেন এক পতিঘাতিনী সতী। বোঝা যায় না, কোথায় কোন্ ইষ্টকস্তূপের আড়ালে বীরসিংহের নির্মমতায় জীবন্ত-প্রোথিত ভ্রাতা ও পুত্রের ভগ্ন কঙ্কাল কাঁদছে। লোভ আর চক্রান্তের আঘাতে জর্জরিত বিষ্ণুপুরের বাতাস সেদিন যে আর্তনাদ করেছিল, তার শেষ রেশও মিলিয়ে যায়। মূর্ছা পাহাড় শুধু তাকিয়ে দেখে আর উৎকর্ণ হয়ে শোনে। বিষ্ণুপুরের এই রাত্রির অন্ধকার বড় ভয়াবহ, বড় করুণ। পেচকের ঘুৎকার সে অন্ধকারকে যেন আরও ক্ষুব্ধ ক'রে তোলে।

হঠাৎ চমকে ওঠে মূর্ছা পাহাড়। পাথর-দরজার কপাট যেন বিকট শব্দ ক'রে খুলে গেল এবং দূর প্রান্তরের দিক থেকে যেন কতগুলি ছায়া শরীর ক্ষিপ্ত শ্বাপদের মত ছুটে এসে দুর্গের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। বর্মে ও অস্ত্রে সজ্জিত একদল সৈনিকের মূর্তি। সকলের আগে অশ্বারোহী এক যোদ্ধা, হাতে উন্মুক্ত তরবারি।

লোকে বলে, পাথর-দরজার কাছে এইরকমই একটি আবছায়াময় ঘটনা স্বচক্ষে দেখতে পেয়ে একদিন চমকে উঠেছিলেন সেই সন্ন্যাসী। কে জানে, হয়তো দূর রামসাগরের দিক থেকে একদল রাতের পাখি হঠাৎ পাখার ঝাপটে রাতের বাতাস অদ্ভুত শব্দে আলোড়িত ক'রে উড়ে চলে গিয়েছিল পাথর-দরজা পার হয়ে, পুরনো গড়ের ঘাসবনের দিকে। কিংবা, নিতান্তই কতগুলি শুকনো পাতার ছুটাছুটি; নৈশ বাতাসের উচ্ছ্বাসে শুকনো পাতার রাশি পাথর-দরজার উপর একবার আছাড় খেয়ে পড়েছিল বিচিত্র শব্দের শিহর জাগিয়ে। সে যা-ই হোক, সন্ন্যাসী চমকে উঠেছিলেন পাথর-দরজার কপাট খোলার শব্দে। ভয় পেয়েছিলেন, কতগুলি দুরন্ত ছায়ামূর্তিকে ছুটে আসতে দেখে। আর তার পরেই মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন।

মূর্ছা পাহাড় কিন্তু জানে, একদিন সত্যই এইভাবে গভীর রাত্রির নীরবতা হঠাৎ চমকে উঠেছিল দুর্গদ্বারের কপাট খোলার শব্দে। আর, এক দল সশস্ত্র অনুচর সঙ্গে নিয়ে রাজা বীর হাম্বীর দুর্বার এক লোভের অভিযান সমাপ্ত ক'রে, আর দুর্লভ রত্নে পরিপূর্ণ একটি পেটিকা লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে এসে এইভাবেই তাঁর দুর্গভবনে প্রবেশ করেছিলেন।

সেই রাত্রির অন্ধকারও বোধ হয় এইরকমই শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল বিষ্ণুপুরের অদৃষ্টের কথা চিন্তা ক'রে। জানেন না বীর হাম্বীর, কল্পনাও করতে পারেন না, কোন্ রত্ন লুঠ করবার জন্য রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে তস্করের মত ছুটে গিয়েছিলেন তিনি। ও রত্ন যে লুঠ করা যায় না। ও রত্ন লুঠ করতে নেই। বীর হাম্বীরের একটি মূঢ়তার ভুলে সেই রত্ন আজ বিনষ্ট হবে বলে

আশঙ্কা করছে মূর্ছা পাহাড়, অথচ সে রত্ন হীরা নয়, মরকত নয়, মাণিক্য নয়, প্রবাল অথবা পুষ্পরাগও নয়।

রাজমহিমার সব কিছু থাকতেও একটি অভাবের বেদনা ছিল বীর হাম্বিরের মনে। রত্নের অভাব। এই রাজ-উষ্ণীষকে একশত হীরকখণ্ডের নালিকা দিয়ে জড়িয়ে আরও উজ্জ্বল ক'রে কি তোলা যায় না? এই শানিত তরবারি কি আরও গর্বের হাসি হাসবে না, যদি এই তরবারির গ্রীবা দশটি মরকতখণ্ডের দীপ্তিতে খচিত ক'রে তোলা যায়? রাজাসনের পাদপীঠের মর্মর-শিলার দিকে তাকিয়ে এক এক সময় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন বীর হাম্বীর। কল্পনা করেন, এই পাদপীঠে যদি একটি প্রবালবেদিকা থাকতো, তবে নিশ্চয়ই তৃপ্ত হ'তে পারতো তাঁর মন। রত্নলাভের আকাঙ্ক্ষায় কখনও বিষণ্ণ এবং কখনও বিচলিত হয়ে ওঠেন বীর হাম্বীর।

রাজজ্যোতিষীই একদিন বীর হাম্বীরের কোষ্ঠী বিচার ক'রে আর গণনা ক'রে এমন এক কথা বললেন, যে-কথা শুনে চমকে উঠলেন বীর হাম্বীর। ভরসায় ভরে উঠলো তাঁর মন। বুঝলেন, বৃথা হয়নি তাঁর এতদিনের স্বপ্ন দেখা, এইবার অবশ্যই রত্নময় হয়ে উঠবে তাঁর জীবন।

রাজজ্যোতিষী বলেছেন, আর সাতদিন পরে কৃষ্ণপক্ষের নবমীর চাঁদ যখন শেষরাত্রির অন্ধকার দূর করার জন্য ফুটে উঠবে আকাশে, ঠিক সেই সময় এই রাজ্যেরই কোন পথ দিয়ে দুর্লভ রত্নে পরিপূর্ণ একটি পেটিকা পার হয়ে যাবে।

সাতদিন পরেই গভীর রাত্রিতে চমকিত ক'রে পাথর-দরজার কপাট খুলে গেল, হাম্বীর তাঁর সশস্ত্র অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে গেলেন। রামসাগরের জলে তখন ক্ষীণ চাঁদের আলো পড়েছে। দেখলেন রাজা বীর হাম্বীর, ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে একটি গো-শকট চলেছে রামসাগরের কিনারা ধ'রে সুদূর গৌড় যাবার পথের উপর দিয়ে।

কিন্তু হতাশ হয়ে পড়লেন বীর হাম্বীর। এই শকটের সঙ্গে কোন অস্ত্রসজ্জিত প্রহরী নেই। পাঁচজন মাত্র আরোহী, মাত্র কটিবস্ত্রসম্বল কতগুলি অতি দীন মানুষ। কোন রত্নপেটিকার প্রহরী হ'তে পারে না এই ভিখারীসদৃশ তুচ্ছ দীন ও দুর্বল মানুষগুলি।

পরমুহূর্তেই বীর হাম্বীরের চোখের দৃষ্টি তাঁর তরবারির তীক্ষ্ণমুখের মত ঝক ক'রে জ্বলে উঠলো। দেখতে পেয়েছেন বীর হাম্বীর, একটি পেটিকা রয়েছে গো-শকটের ভিতরে।

গো-শকটের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো বীর হাম্বীরের অনুচরদল এবং সেই পেটিকা তুলে নিয়ে চলে এল। রামসাগরের কিনারায় নবমীর চাঁদের জ্যোৎস্নায় যেন কতগুলি ছায়াশরীর এসে নিমেষের মধ্যেই এক নিঃশব্দ উৎপাত সমাপন ক'রে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। গো-শকটের যাত্রী নীরবে তাকিয়ে থাকেন জ্যোৎস্নালোকিত এক প্রহেলিকার মত সেই জনশূন্য প্রান্তরের দিকে শেষ প্রান্তে এক দুর্গপ্রাচীরের অস্পষ্ট রেখার দিকে।

সেই রাত্রেই দুর্গভবনের অভ্যন্তরে প্রজ্জ্বলন্ত প্রদীপের সম্মুখে সেই লুণ্ঠিত রত্নপেটিকার ডালা যখন খোলা হলো, তখন যে আক্ষেপ গর্জিত হয়ে উঠেছিল রাজা বীর হাম্বীরের কণ্ঠে, সে আক্ষেপও হয়তো শুনতে পেয়েছিল মূর্ছা পাহাড় এবং বিষ্ণুপুরের অদৃষ্টের কথা ভেবে আর একবার শংকাতুর হয়ে উঠেছিল। রত্ন নয়, কতগুলি পুঁথি মাত্র। ভূর্জপত্রে অংকিত কতগুলি মসিলিপির আবর্জনা। যেন ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপকেই চূর্ণ করবার জন্য ভয়ংকর এক আক্রোশে থর থর ক'রে কাঁপতে থাকে বীর হাম্বীরের হাতের তরবারি। প্রতিজ্ঞা করলেন বীর হাম্বীর, সূর্যোদয়ের সঙ্গে

সঙ্গেই এ-রাজ্যের যত জ্যোতিষী মিথ্যার পুঁথি আর এই ভূর্জপত্রের স্তূপ এই সঙ্গে পুড়িয়ে ভস্মসাৎ করবেন।

কিন্তু সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজভবনের দুয়ারে দেখা দিলো এক ভক্ত বৈষ্ণবের মূর্তি—পুঁথি প্রত্যর্পণ করুন রাজা।

বিস্মিত বীর হাম্বীর প্রশ্ন করেন—কে আপনি?

—আমি বৈষ্ণব শ্রীনিবাস।

বীর হাম্বীর গর্জন করেন—কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, এই আবর্জনা আপনার সম্মুখেই ভস্মসাৎ করছি।

শ্রীনিবাস বলেন—ভুল করবেন না রাজা। রত্নাধিক এই পুঁথির অসম্মান করবেন না।

ভ্রূকুটি করেন বীর হাম্বীর—রত্নাধিক? কি আছে এই পুঁথির মধ্যে?

শ্রীনিবাস—ভক্তিসুধাকর শ্রীচৈতন্যের চরিতামৃত আছে।

কেঁপে উঠলো বীর হাম্বীরের চোখের দৃষ্টি। হঠাৎ, যেন মাত্র এই কয়েকটি অদ্ভুত কথার শব্দে চূর্ণ হয়ে গেল তাঁর কঠিন ভ্রূকুটি। নীরবে পুঁথির দিকে তাকিয়ে থাকেন রাজা বীর হাম্বীর।

দূর বৃন্দাবনে তখন কবি কৃষ্ণদাস শ্যামকুণ্ডের জলে স্নান সমাপন ক'রে এই পুঁথির কথাই ভাবছেন। কিন্তু কল্পনাও করতে পারছেন না, তাঁরই চিত্তসুধানিধির দিকে এক রত্নলুণ্ঠক এখন বিস্ময়বিচলিত চক্ষে তাকিয়ে রয়েছে। ধীরে ধীরে অশ্রুসজল হয়ে উঠছে সেই লুণ্ঠকের চক্ষু। রত্ন নয়, রত্নাধিক সেই অমৃতের ভাণ্ড রয়েছে তাঁর সম্মুখে, যে অমৃতের স্বাদের কাছে পৃথিবীর সব মণি-মাণিক্যের স্বাদ তুচ্ছ হয়ে যায়।

—আচার্য! শ্রীনিবাসের ধূলিমাখা দুই পা স্পর্শ ক'রে প্রণাম করলেন বীর হাম্বীর।

তারপর আর দেরি হয়নি। রাজভবনের প্রকোষ্ঠে জ্বলে উঠলো গন্ধধূপ, সুরভিত হলো বাতাস। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করলেন আচার্য শ্রীনিবাস। বীর হাম্বীরের কপালে আচার্য নিজের হাতে এঁকে দিলেন দীক্ষার তিলক। রত্ন লুঠ করতে গিয়ে অমৃত পেয়ে গেলেন রাজা বীর হাম্বীর। তৃপ্ত হলো জীবন। মিটে গেল রত্ন-তৃষ্ণার জ্বালা।

কয়েকদিন পরেই আর একদিন, সেদিন ভোর হতেই যখন রাজ্য জুড়ে ইন্দ্রোৎসবের হর্ষ জেগে উঠছে, তখন বিদায় চাইলেন আচার্য শ্রীনিবাস। বিদায় দেবার জন্য প্রস্তুতও হলেন বীর হাম্বীর! লুণ্ঠিত যে পুঁথি তাঁর জীবনে অমিয় সিঞ্চন করেছে, বিদায় দিতে হবে সেই পুঁথিকে, সেই পুঁথির দিকে তাকিয়ে হাসিমুখেই চোখের জল ফেললেন বীর হাম্বীর।

মূর্ছা পাহাড়ই অকস্মাৎ সেই প্রথম ঊষার আলোকে চোখ মেলে দেখেছিল, ইন্দ্রোৎসবের সব হর্ষ-কলরব পিছনে ফেলে রেখে বীর হাম্বীর দু'হাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পুঁথি বুকের কাছে তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে এই পাথর-দরজা দিয়েই বের হয়ে যাচ্ছেন। আগে আগে চলেছেন আচার্য শ্রীনিবাস। তখন রামসাগরের কিনারায় গৌড়ে যাবার পথের উপর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এক গো-শকট।

সত্যই ভোর হতেই মূর্ছা ভেঙে গিয়েছিল সেই সন্ন্যাসীর। বিস্মিত হয়ে সবার আগে এই পাথর-দরজার দিকেই তাকিয়েছিলেন তিনি। যদিও কিছু দেখতে পাননি, কিন্তু শুনতে পেয়েছিলেন একটি মৃদুমধুর ধ্বনি, যেন কতগুলি সুন্দর শব্দের মায়া। এই নির্জন ও নীরব পাথর-দরজার

কাছেই কোথাও যেন বাতাসে আত্মগোপন ক'রে রয়েছে কতগুলি মৃদঙ্গের ভক্তিসুধাপ্রাবিত ধ্বনি।

বিষ্ণুপুরের ইতিহাসেই যেন এইবার ভোরের আভাস লাগলো। আর ভয় পান না, দুশ্চিন্তাও করেন না সন্ন্যাসী। শুধু মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকেন, ধীরে ধীরে জেগে উঠছে সত্যিকারের বিষ্ণুপুর। ঐ তো শ্যামরায়ের পঞ্চরত্ন, জোড় বাংলা আর রাসমঞ্চ। ঐ যে রয়েছেন শৈবের মল্লেশ্বর আর শাক্তের মৃন্ময়ী। কেলি-কদম্বের ছায়া পড়েছে মৃন্ময়ী-মন্দিরের আঙিনায়। সকল যুগের মাধুরী মিশিয়ে রচিত বিষ্ণুপুরের উদার হৃদয়ের রূপ ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে। এখান থেকে কতদূরেই বা সেই ময়নাপুর যেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শূন্য পুরাণের পণ্ডিত রামাই, বৌদ্ধমতের এক নূতন ভাবনা যিনি এই মল্লভূমির ঘরে ঘরে প্রচারিত করেছিলেন। বহু শতাব্দীর মিলনতীর্থ সুসংস্কৃতির বিষ্ণুপুর জেগে উঠেছে এই প্রভাতের স্পর্শ পেয়ে। মূর্ছা পাহাড় যেন খুশি হয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে সেই দৃশ্য।

পুণ্ড্রবর্ধনের নর্তকী

শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম ধারণ করেছিলেন, 'আমিই ভগবান' ব'লে নিজেকে প্রচারও করেছিলেন এবং বাসুদেব নামটিও গ্রহণ করেছিলেন, পুরাণে বর্ণিত পুণ্ড্রদেশের সেই অধিপতি মহাশয়কে শেষ পর্যন্ত দ্বারকাধিপতি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের হাতেই নিধন লাভ করতে হয়েছিল। সে পুণ্ড্রদেশের কথা আছে হরিবংশে, মহাভারতে, বিষ্ণুপুরাণে, শ্রীমদ্ভাগবতে ও স্কন্দপুরাণে।

পৌরাণিকের সেই পুণ্ড্রদেশের সঙ্গে ঐতিহাসিকের পুণ্ড্রবর্ধনের কোন সম্পর্ক আছে কিনা বলা যায় না। কৃষ্ণ-প্রতিদ্বন্দ্বী সেই কৃত্রিম বাসুদেব তাঁর কৃত্রিম শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম নিয়ে দ্বারকাপুরীর দ্বারে হানা দিতে গিয়ে যেমন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছেন, তেমনি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে পৌরাণিকের সেই পুণ্ড্রদেশ।

কিন্তু শত স্মৃতির চিহ্ন ধারণ ক'রে আজও রয়েছে সেই ঐতিহাসিক পুণ্ড্রবর্ধনের সমাধিভূমি, চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সান যে পুণ্ড্রবর্ধনের গৌরবগরিমা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। সেই পুণ্ড্রবর্ধন আজও করতোয়ার তটে তার কালজীর্ণ দেহের অবশেষ নিয়ে জড়িয়ে প'ড়ে রয়েছে। সে করতোয়া আজও তার ভাষা হারায়নি। হাজার বছর আগে করতোয়ার যে কলস্বরে পুণ্ড্রবর্ধনের দিবস ও রাত্রি সাড়া দিয়ে উঠতো, উৎসবের হর্ষে মুখর হয়ে উঠতো জনপদ, সেই কলস্বরে আজও আবেদন জানায় করতোয়া। কিন্তু প্রাণহীন পুণ্ড্রবর্ধন আর সাড়া দেয় না।

বগুড়া হতে মাত্র তিন ক্রোশ দূরে করতোয়ার তটে ধ্বংসস্তূপে আচ্ছন্ন হয়ে ঐ মহাস্থানগড় হলো সেই পুণ্ড্রবর্ধন, সপ্তম শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজক যেখানে একদিন বিশটি বৌদ্ধ সংঘারাম এবং এক শত মন্দির দেখতে পেয়েছিলেন। মাত্র দু'ক্রোশ পশ্চিমে আজও সেই ভাসুবিহারের ধ্বংসাবশেষ বক্ষে ধারণ ক'রে রয়েছে ভাসুবিহার নামে একটি গ্রাম। সেই অবলোকিতেশ্বরের নিকেতন আজ ইঁট পাথরের একটি ঢিপি মাত্র। সত্যিই কি ভগবান তথাগত তাঁর বাণী প্রচারের জন্য তিন মাস কাল এখানে অবস্থান করেছিলেন এবং ভাসুবিহার গ্রামে ত্রিশ ফুট উচ্চ ঐ ইষ্টকস্তূপই কি প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোকের রচিত স্তূপ, করতোয়া-তটে বুদ্ধ-আগমনের স্মৃতি চিরস্থায়ী ক'রে রাখবার জন্য যে স্তূপ তিনি নির্মাণ করেছিলেন?

নীরব হয়ে আছে মহাস্থানগড়। প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের ইতিহাস ধুলো হয়ে গিয়েছে। কে জানে, কেন আজও পৌষ নারায়ণী যোগে মহাস্থানের নিকটে এই করতোয়ার ঘাটে পুণ্যস্নানের জন্য যাত্রীর ভিড় হয়। স্নানার্থী যাত্রীর কলরবের মধ্যে পুণ্ড্রবর্ধনের অতীতের কোন্ ঘটনার মহিমা নিজেকে প্রকাশ করতে চায়, তা'ও আজ অনুমান করা যায় না।

রাজতরঙ্গিনীর রচয়িতা কাশ্মীরী কহ্লন অষ্টম শতাব্দীর যে পুণ্ড্রবর্ধনের সমৃদ্ধি কল্পনা ক'রে বিস্মিত হয়েছিলেন, ধ্বংসীভূত সে পুণ্ড্রবর্ধনের অভিমানও যেন মুখ লুকিয়ে রয়েছে এই মহাস্থানগড়ের মাটির অন্তরালে, টুকরো টুকরো পাথরের আড়ালে আর বিক্ষিপ্ত ইষ্টকরাশির মধ্যে। কোথায় গেল সেই সুন্দর স্কন্দমন্দির, যে মন্দিরের প্রাঙ্গণে একদিন কাশ্মীররাজ বিনয়াদিত্য জয়াপীড় নৃত্যোৎসব দেখতে এসে নর্তকীশ্রেষ্ঠা কমলার প্রেমাস্পদে পরিণত হয়েছিলেন?

গোপনে ও ছদ্মবেশে পুণ্ড্রবর্ধনে প্রবেশ করেছিলেন দিগ্বিজয়প্রয়াসী কাশ্মীররাজ জয়াপীড়। বাহুবলে পুণ্ড্রবর্ধন জয় করাই ছিল তাঁর মনের অভিলাষ। সেই অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য পুণ্ড্রবর্ধনের রাজশক্তির সকল পরিচয় সংগ্রহের উদ্দেশে সাধারণ এক বৈদেশিকের বেশে পুণ্ড্রবর্ধনের জনপদে অবস্থান করেছিলেন জয়াপীড়। মুগ্ধ হয়েছিলেন উৎসবমুখর পুণ্ড্রবর্ধনের রূপ দেখে। লুব্ধ হয়েছিলেন সমৃদ্ধ পুণ্ড্রবর্ধনের বৈভব দেখে। দুশ্চিন্তিত হয়েছিলেন পুণ্ড্রবর্ধনের সেনাবলের অস্ত্র-সজ্জা দেখে। খুঁজছিলেন, পুণ্ড্রবর্ধনের এই প্রতাপান্বিত রাজশক্তির দুর্গপ্রাচীরে কোন ফাটল আছে কিনা। সন্ধান করছিলেন, পুণ্ড্রবর্ধনরাজ জয়ন্তের আধিপত্যের বিধি-বিধানে কোন অসতর্কতা আছে কিনা। দিগ্বিজয়প্রয়াসী জয়াপীড় যেন গোপন ঘাতকের মত পুণ্ড্রবর্ধনের হৃৎপিণ্ড সন্ধানের চেষ্টায় সাধারণ আগন্তুকের ছদ্মবেশে জনপদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন।

স্কন্দ মন্দিরের প্রাঙ্গণে নৃত্যসভা। সপারিষদ রাজা জয়ন্ত নৃত্যপটীয়সী কামিনীর নূপুরনাদ শুনছেন এবং দেহহিল্লোল দেখছেন। সভাজনতার এক পার্শ্বে বসে আছেন ছদ্মবেশী জয়াপীড়। কেউ তাঁকে সন্দেহ করে না। সন্দেহ করার মত কিছু দেখতে পাওয়া যায় না এই আগন্তুকের চোখের দৃষ্টিতে। নবীন বনস্পতির মত যৌবনান্বিত দেহ, সুদর্শন জয়াপীড়ের দুই চক্ষুর সেই দৃষ্টিতে কেউ সন্দেহ করতে পারে না যে, সে দৃষ্টি হলো লুব্ধ সর্পের দৃষ্টি। নর্তকীশ্রেষ্ঠা কমলাও কল্পনা করতে পারে না, রূপমান এই তরুণের চক্ষের গভীরে এক অভিসন্ধির ছায়া লুকিয়ে রয়েছে।

কিন্তু কৌতূহলে চঞ্চল হয়ে ওঠে নর্তকী কমলার হৃদয়। কে এই আগন্তুক? সভ্যাজনতার এক পার্শ্বে নীরবে উববিষ্ট সাধারণবেশী এই ভদ্রের মুখের দিকে বার বার মুগ্ধের মতই দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কমলা। মনে হয়, যেন ভাঙা মেঘের আসরের এক পাশে উপেক্ষিত এক চন্দ্রমা। রাজা নয়, সামন্ত নয়, মণ্ডলেশ নয়, ভুক্তিপতি নয়, অতি সাধারণ এই ব্যক্তিকে রাজজনোচিত সমাদরে আপ্যায়িত করছে না কেউ। নৃত্য ক্ষান্ত করে কমলা, নীরব হয় ক্লান্ত পায়ের নূপুর। কমলাও নীরবে তাকিয়ে থাকে জয়াপীড়ের মুখের দিকে।

দেখতে পায় কমলা, রহস্যময় সেই যুবক যেন অভ্যাসের বশে বার বার তাঁর হাতেরই পাশে কোন আধার কাছে মনে ক'রে সামগ্রী গ্রহণের চেষ্টায় হাত তুলছেন এবং পরক্ষণেই বিব্রতভাবে হাত সরিয়ে নিয়ে আবার নীরবে এবং সুস্থির হয়ে নৃত্যোৎসব দেখতে থাকেন। নর্তকীশ্রেষ্ঠা কমলার চক্ষুও যেন অকস্মাৎ হেসে ওঠে।

নিষ্পলক চক্ষে নৃত্যোৎসব দেখছেন জয়াপীড়। নর্তকীশ্রেষ্ঠা কমলা ধীরে ধীরে কখন তাম্বুলপাত্র

হাতে নিয়ে তাঁরই পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, জানতে পারেননি জয়াপীড়। রাজোচিত অভ্যাসের বশে তাম্বুল গ্রহণের জন্য আবার হাত তুলতেই চমকে উঠেন জয়াপীড়। সত্য সত্যই তাম্বুলপাত্রের উপর পড়েছে তাঁর হাত। পুণ্ড্রবর্ধনের রূপসী নর্তকীপ্রধানা কমলা তাম্বুলপাত্র দুই হাতে ধারণ ক'রে দাঁড়িয়েছে তাঁর পাশে।

বিব্রতভাবে বলেন জয়াপীড়—সাধারণের প্রতি রাজজনোচিত এই অসাধারণ সমাদরের কোন প্রয়োজন ছিল না।

মৃদু হাস্যে ভ্রূভঙ্গী মধুরতর ক'রে কমলা বলে—কিন্তু রাজজনোচিত অভ্যাস তো ভুলতে পারেনি আপনার এই হাত।

সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে অপ্রস্তুত জয়াপীড়ের চোখের দৃষ্টি। কি ভয়ানক দৃষ্টিবিচক্ষণা এই নারী! যে ছদ্মবেশী জয়াপীড়কে আজ পর্যন্ত সন্দেহ করতে পারেনি পুণ্ড্রবর্ধনের কোন নগররক্ষী, সে জয়াপীড়ের একটি হস্তভঙ্গীর রহস্য কত সহজে ধরে ফেলেছে নগরপ্রমোদিনী এই নারী!

জয়াপীড় আর্তস্বরে বলেন—আমাকে বিপন্ন করো না নারী।

বিস্মিত হয় কমলা—আপনি বিপন্ন হবেন কেন?

জয়াপীড়—আমার প্রাণ বিপন্ন হবে যদি আমার পরিচয় জানতে চাও।

বেদনার্তভাবে কমলা বলে—আমার প্রাণ থাকতে আপনার প্রাণের বিপদ ঘটতে দেবো না ভদ্র, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করতে হবে।

জয়াপীড় বলেন—বল।

কমলা—নর্তকী কমলার আতিথ্য আর সমাদর গ্রহণ করবেন বলুন?

নর্তকীপ্রধানা কমলার মুখের দিকে তাকিয়ে আরও বিস্মিত হন জয়াপীড়। পুণ্ড্রবর্ধনের নগরপ্রমোদিনীর চোখে কোন সন্দেহের ছায়া নেই। আত্মদানাভিলাষিণী প্রণয়াকুলা নারীর হৃদয়ের আবেদন ফুটে উঠেছে সন্ধ্যাতারার মত ছলছল সেই দুই কজ্জ্বনয়নের তারকায়।

জয়াপীড় মৃদুস্বরে বলেন—কমলা।

কমলা বলে—হ্যাঁ, আমি আপনারই কমলা। কথা দিন, এই সম্বোধন জীবনে কখনো নীরব হয়ে যাবে না?

জয়াপীড় বলেন—কথা দিলাম।

স্কন্দ মন্দিরের নৃত্যসভার প্রাঙ্গণ যখন নীরব হয়ে গিয়েছে, তখন নিজেরই গৃহের এক আলোকিত কক্ষের অভ্যন্তরে প্রণয়াস্পদ আগন্তুকের মুখের একটি কথা শুনে আর্তনাদ ক'রে ওঠে নর্তকী-প্রধানা কমলা। মিথ্যা হয়নি কমলার মনের সন্দেহ। সাধারণ মানুষ নয় এই আগন্তুক। কাশ্মীররাজ বিনয়াদিত্য জয়াপীড়কেই জীবনের প্রথম প্রেমে অভিনন্দিত ক'রে তাম্বুল দান ক'রে ফেলেছে কমলা। কিন্তু কি ভয়ংকর এক সংকল্পের কথা বলেছেন জয়াপীড়! পুণ্ড্রবর্ধনের স্বাধীনতা হরণ ক'রে দিগ্বিজয়ের অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য রাজা জয়ন্তের রাজশক্তির হৃৎপিণ্ড সন্ধান করতে এসেছেন জয়াপীড়। পুণ্ড্রবর্ধনের শত্রুকে ভালোবেসে ফেলেছে পুণ্ড্রবর্ধনের নর্তকীপ্রধানা কমলা।

পুণ্ড্রবর্ধনের গভীর রাত্রির আকাশে শুধু জেগে থাকে তারকার দল। আর জেগে থাকে কলস্বরা করতোয়া, নগররক্ষীদের ক্লান্ত চক্ষে ঘুমের আবেশ নেমে এসেছে। জয়াপীড় বলেন—বিদায় দাও কমলা।

কমলা—কেন?

জয়াপীড়—আবার ফিরে আসবো আমার রণদুর্মদ বাহিনী নিয়ে। এই পুণ্ড্রবর্ধনের দুর্গে স্থাপিত হবে জয়াপীড়ের জয়পতাকা। আর তুমি হবে দিগ্বিজয়ী জয়াপীড়ের পরিণয়প্রীতা মহিষী।

চলে যাচ্ছিলেন জয়াপীড়। কমলা বাধা দিয়ে বলে—না।

চমকে ওঠেন জয়াপীড়। পুণ্ড্রবর্ধনের শত্রুকে অবাধে চলে যেতে দিতে চায় না এই নারী। কি এক উদ্দেশ্য যেন লুকিয়ে রয়েছে নিবিড়পক্ষ ঐ চক্ষুর দৃষ্টিতে?

জয়াপীড় বলেন—যদি বাধা দাও, যদি যেতে না পারি, যদি ধরা পড়ে যাই কমলা, তবে পুণ্ড্রবর্ধনের আহ্লাদের খড়্গো তোমারই প্রেমের এই জয়াপীড়ের শির ছিন্ন হবে।

অশ্রুপ্লাবিত চক্ষু তুলে কমলা বলে—জানি, বুঝতে পারি সবই, কিন্তু তোমার খড়্গোর আঘাতে পুণ্ড্রবর্ধনের গর্ব লুটিয়ে পড়বে মাটিতে, সে বেদনা যে কল্পনাতেও সহ্য করতে পারি না।

সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে জয়াপীড়ের চক্ষু। —তবে কি আমার প্রাণ....।

জয়াপীড়ের পায়ে মাথা লুটিয়ে দিয়ে কমলা বলে —কখনই না। আমার প্রাণ থাকতে তোমার প্রাণকে বিপন্ন হতে দেবো না।

কমলার অশ্রু প্লুত চোখের দৃষ্টি আর এই আবেদনের বন্ধনে যেন বন্দী হয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন রাজা জয়াপীড়। অকস্মাৎ করতোয়া-তটের নৈশ বাতাস প্রকম্পিত ক'রে এক সিংহের গর্জন ধ্বনিত হয়। কমলার অশ্রুসিক্ত চক্ষু অকস্মাৎ হেসে ওঠে। পুণ্ড্রবর্ধনের স্বাধনীতা রক্ষা পাবে, অথচ প্রণয়াস্পদ জয়াপীড়েরও প্রাণ বিপন্ন হবে না, এমনই একটি উপায়ের কথা যেন ঐ সিংহের গর্জনের মধ্যেই ধ্বনিত হয়েছে।

ঐ সেই সিংহ, যে সিংহের আক্রমণে জনপদের বহু নরনারী প্রাণ হারিয়েছে। ঐ সিংহেরই ভয়ে জনপদের বহু উৎসবের দীপ সন্ধ্যা হতে না হতেই নিভে গিয়েছে। রাজা জয়ন্ত ঘোষণা করেছেন, যে সাহসিক পুরুষ ঐ সিংহকে হত্যা করতে পারবে, তারই হাতে তিনি তাঁর একমাত্র কন্যা কল্যাণদেবীর পাণি সমর্পণ করবেন। নর্তকী কমলা জানে সেই ঘোষণার কথা, কিন্তু জয়াপীড় এই ঘোষণার কিছুই জানেন না, শোনেনওনি।

কমলা বলে—একটি অনুরোধ আছে রাজা।

—বল।

—জনপদবাসীর প্রাণের আতঙ্ক ঐ সিংহকে হত্যা করুন আপনি। .....এই নিন অস্ত্র।

কমলার হাত থেকে শাণিত অস্ত্র নিজের হাতে তুলে নিয়ে জয়াপীড় হেসে ওঠেন—বুঝলাম কমলা, তুমিই পুণ্ড্রবর্ধনের শত্রুকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাও, তাই তাকে সিংহের মুখের কাছে ঠেলে দিতে চাও।

কমলা হাসে—কিন্তু আমিও যে আপনার সহযাত্রিণী। আপনাকে একাকী যেতে দেবো না রাজা জয়াপীড়।

আবার বিস্মিত হ'ন জয়াপীড়।—তুমি যাবে আমার সঙ্গে, এই মৃত্যুর মুখে?

কমলা বলে—হ্যাঁ।

করতোয়া-তটের সেই হিংস্র সিংহগর্জন সেই রাত্রেই স্তব্ধ হয়ে গেল। জয়াপীড়ের অস্ত্রাঘাতে রুধিরলিপ্ত মুখে মাটি দংশন ক'রে নিষ্প্রাণ হয়ে গেল সিংহ।

কমলা বলে—আপনার হাতের ঐ স্বর্ণকেয়ুর আমাকে উপহার দিন রাজা জয়াপীড়।

আবার বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ হয়ে দেখতে থাকেন জয়াপীড়, তাঁর নামাঙ্কিত স্বর্ণকেয়ুর নিয়ে কমলা সেই নিহত সিংহের মুখবিবরে নিক্ষেপ করছে।

হেসে ওঠে কমলা।—বুঝি সন্দেহ করছেন রাজা জয়াপীড়?

ক্ষোভকাতর স্বরে জয়াপীড় বলেন—তোমার ছলনা বুঝতে পারলাম নারী।

কমলা—কি?

জয়াপীড় — রটনা ক'রে দিলে যে, ছদ্মবেশী জয়াপীড় এই পুণ্ড্রবর্ধনে লুকিয়ে আছে। আমার নামাঙ্কিত ঐ কেয়ুর দেখে রাজা জয়ন্ত ও এই জনপদবাসীর আর কিছু বুঝতে বাকি থাকবে না। নগরের প্রতিগৃহের গোপন অন্ধকারে অনুসন্ধান ক'রে রাজা জয়ন্তের অনুচর আবিষ্কার করবে এই জয়াপীড়ের জীবন্ত দেহ। কাল প্রভাতে আমার মৃত্যুদণ্ড স্বচক্ষে দেখে তুমি আর একবার এমনি করেই হেসে উঠবে।

পূর্ব গগনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন জয়াপীড়, উষার আভাস দেখা দিয়েছে। ক্ষীণতর অন্ধকারের সাথে ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে শুকতারা। অকস্মাৎ রোষায়িত কেশরীর মত চক্ষের দৃষ্টি ক্ষুব্ধ ক'রে আর কমলার মুখের দিকে তাকিয়ে ধিক্কার দিয়ে ওঠেন জয়াপীড়—কিন্তু তোমার নিষ্ঠুর অভিসন্ধি সফল হবে না নর্তকী। এখনো অন্ধকার আছে, নগরদ্বারের রক্ষীকে তোমারই দেওয়া উপহার এই তরবারির আঘাতে ঐ হতভাগা সিংহের মতই নিষ্প্রাণ ক'রে দিয়ে চলে যেতে পারবে জয়াপীড়।

চলে যাচ্ছিলেন জয়াপীড়। কমলা বলে—বিশ্বাস করুন, রাজা জয়াপীড়।

জয়াপীড়—কি?

কমলা বলে—বিশ্বাস করুন, আমি নিজেকেই মৃত্যুদণ্ড দিয়ে গেলাম, আপনাকে [illegible]পন্ন করবার কোন অভিসন্ধি আমার নেই।

কমলার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পান জয়াপীড়, কঠোরহাসিনী কমলার চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। না, অবিশ্বাস করা উচিত নয় এই সুন্দর অশ্রুকে। নর্তকীর সঙ্গে আবার নর্তকীর আলয়ে ফিরে এলেন জয়াপীড়।

রাত্রি প্রভাত হলেও বুঝতে পারেননি রাজা জয়াপীড়, ছলনানিপুণা নর্তকীর ঐ হাসি আর অশ্রুর রহস্য। কিন্তু অকস্মাৎ চমকে উঠলেন জয়াপীড়। রাজানুচর ও নগররক্ষীর দল উল্লাসে মত্ত হয়ে সারা জনপদ যেন মথিত ক'রে ফিরছে। চিৎকার শোনা যায়—জয়াপীড়, কাশ্মীররাজ জয়াপীড় কোথায়? জেনে ফেলেছে পুণ্ড্রবর্ধন, কাশ্মীররাজ জয়াপীড় আছেন এই জনপদের অভ্যন্তরে। নিহত সিংহের মুখবিবর হতে প্রাপ্ত কেয়ুর তাঁর পরিচয় প্রকাশ ক'রে দিয়েছে।

কল্পনা করছিলেন জয়াপীড়, এতক্ষণে বধ্যভূমির নিকটে পুণ্ড্রবর্ধনের জহ্লাদ প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছদ্মবেশে পুণ্ড্রবর্ধনের জনপদে লুকিয়ে রয়েছে যে অভিসন্ধির জয়াপীড়, তাঁকে কঠিন প্রশ্নে বিচার করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন রাজা জয়ন্ত। সবই অনুমান করতে পারেন জয়াপীড়। শুধু বুঝতে পারেন না, এই নর্তকী নারীর হাসি-অশ্রুর রহস্য।

নর্তকী কমলাই পথের দিকে তাকিয়ে, সহাস্যে যেন এক নিষ্ঠুর কৌতুকে আকুল হয়ে রাজানুচর ও নগররক্ষীদের উদ্দেশে ডাক দেয়—এইখানে আছেন রাজা বিনয়াদিত্য জয়াপীড়।

রাজানুচর ও নগররক্ষীর দল তেমনি উল্লাসে মত্ত হয়ে শিবিকা নিয়ে উপস্থিত হয় নগরনর্তকী কমলার গৃহদ্বারে। নীরবে, শুধু একবার বিশ্বাসঘাতিকা নারীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন জয়াপীড়। দেখতে পান, সেই রকমই চোখে জল আর মুখে হাসি নিয়ে বিদায় দিচ্ছে পুণ্ড্রবর্ধনের সর্পী।

আবার সন্ধ্যা দেখা দেয় পুণ্ড্রবর্ধনের আকাশে। করতোয়ার কলস্বর ব্যাকুল হয়ে ওঠে। দীপ জ্বলে স্কন্দমন্দিরের প্রাঙ্গণে। কিন্তু আজ আর কোন উৎসবমুখব হয়ে ওঠে না এই মন্দিরপ্রাঙ্গণের নৃত্য-সভাতল। সমস্ত জনপদবাসীর চিত্ত উৎসুক হয়ে রাজভবনের উদ্যানে সম্মিলিত হয়েছে। উৎসবের আলোকমালায় সজ্জিত রাজপ্রাসাদের প্রতিচ্ছায়া করতোয়ার তরঙ্গে আন্দোলিত হয়। রাজা জয়ন্তের কন্যা কল্যানীদেবী ও কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের শুভ বিবাহোৎসব।

স্কন্দমন্দিরের নিস্তব্ধ প্রাঙ্গণে একাকিনী দাঁড়িয়ে থাকে কমলা। মূর্ছাহত হয়ে রয়েছে তার পায়ের নুপূর। যেন দেবতাকে শুধু তার মনের বেদনা উপহার দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে কমলা। কারণ, একমাত্র দেবতাই জানেন, জীবনের প্রেমাস্পদকে নিজের হাতে অন্য নারীর প্রণয়ের দ্বারে পাঠিয়ে দেবার বেদনা কত দুঃসহ। সহ্য করতে পারে না, সিক্ত চোখের ধারা মুছে ফেলতেও পারে না পুণ্ড্রবর্ধনের নর্তকীপ্রধানা কমলা।

কিন্তু পর মুহূর্তে হেসে ওঠে কমলার সুরঞ্জিত দুই অধর। কারণ, এই বেদনার বিনিময়ে পুণ্ড্রবর্ধনের গর্বকে এক দিগ্বিজয়ীর অস্ত্রাঘাতের অপমান থেকে রক্ষা করতে পেরেছে কমলা।

রাত্রি গভীর হয়। স্কন্দমন্দিরের নীরব প্রাঙ্গণের দীপশিখা মৃদুতর হয়। নূপুর খুলে ফেলে কমলা।

বিদায় দাও হে সুন্দরেশ্বর দেবতা।

প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ায় কমলা। এই গভীর রাত্রির অন্ধকারে সবার অলক্ষ্যে পুণ্ড্রবর্ধন ত্যাগ ক'রে চলে যাবার জন্যই প্রস্তুত হয় পুণ্ড্রবর্ধনের নর্তকী।

করতোয়ার কলস্বর শুনে নয়, মানুষের পদশব্দ শুনে চমকে ওঠে কমলা। মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখতে পায়, জয়াপীড় এসে দাঁড়িয়েছেন কাছে।

কমলা হাসে—বিশ্বাসঘাতিকা নর্তকীকে ক্ষমা করতে পেরেছেন তো রাজ-জামাতা?

জয়াপীড়—ক্ষমা চাইতে এসেছি।

কমলা—কেন?

—তোমাকে আগে চিনতে পারিনি ব'লে।

—এখন চিনতে পেরেছেন?

—হ্যাঁ।

—কি চিনেছেন?

—তুমি পুণ্ড্রবর্ধনের রত্ন।

—ক্ষুদ্রা নারীকে লজ্জা দেবেন না দিগ্বিজয়ী।

কমলার হাত ধরেন জয়াপীড়। কমলার চক্ষু বেদনার্ত হয়ে ওঠে। জয়াপীড় ডাকেন—কমলা।

কমলা—বলুন।

জয়াপীড়—জয়াপীড়ের জীবনসঙ্গিনী হও তুমি।

স্কন্দমন্দিরের প্রাঙ্গণে সুন্দরেশ্বর দেবতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে পুণ্ড্রবর্ধনের নর্তকীপ্রধানা কমলা সেই শুভক্ষণে মাল্যদান করেছিল জয়াপীড়ের কণ্ঠে। করতোয়ার কলস্বরে অভিনন্দিত হয়েছিল সেই মিলন।

আজও ডাকে করতোয়া, ইতিহাসের শ্মশানভূমির মত বহু ধ্বংসস্তূপে আচ্ছন্ন মহাস্থানগড়ের বুকে আজও পড়ে রয়েছে স্কন্দমন্দিরের সেই প্রাঙ্গণের অবশেষ। এই জনহীন স্থানের স্তব্ধতা শিউরে দিয়ে কত নৃত্যচঞ্চল ধ্বনি আজও ঘুরে বেড়ায়। শিলাময় জীর্ণ এক চত্বরের কাছে বনের গায়ে যখন চৈত্ররাতের দমকা বাতাস হঠাৎ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন ঝুমঝুম ক'রে বেজে ওঠে যে ধ্বনি, সে ধ্বনি হলো শিরীষের শুকনো শুঁটির কাঁপুনির ধ্বনি, নর্তকী কমলার নূপুরের ধ্বনি নয়। জীর্ণ শিলার উপর জ্যোৎস্নারাতে চঞ্চল হয়ে যে ছায়া কাঁপে, সে ছায়া হলো নিকটের আম্রতরুর শাখার ছায়া, লীলাভঙ্গে চঞ্চলিত নর্তকী কমলার দেহচ্ছায়া নয়। সেই মন্দির-প্রাঙ্গণের অস্থিচূর্ণের মত শুধু কতগুলি খণ্ড খণ্ড শিলার কাছে, মহাস্থানগড়ের এই নির্জনতার মধ্যে আজও দাঁড়িয়ে শোনা যায়, ডাকছে প্রাচীন করতোয়া তার পুরাতন পুণ্ড্রবর্ধনকে। কিন্তু করতোয়ার সে কলস্বর শুনতে কলক্রন্দনের মত মনে হয়।

গুরুদক্ষিণা

গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী, তিন পুণ্যসলিলার যুক্তবেণী যেখানে এসে আবার ত্রিধারায় মুক্ত হয়ে গিয়েছে, সে স্থানের নাম ত্রিবেণী। বাংলা দেশের 'ত্রিবেণী', কবিরা যাকে বলেন মুক্তবেণী। ত্রিস্রো বেণ্যঃ বারিপ্রবাহা বিযুক্তা বা যত্র—বহু ঐতিহাসিক মহিমার আস্পদ সেই ত্রিবেণীর ঘাটে আজও পুণ্যকাম সহস্র স্নানার্থীর কোলাহল জাগে প্রতিদিন। পুরাণ কাব্য ও ইতিহাসের বহু প্রশংসায় অভিনন্দিত সেই ত্রিবেণীর প্রাচীন বৈভব আজ আর নেই, কিন্তু আছে তার স্মৃতিচিহ্নগুলি।

এই সেই ত্রিবেণী, পবনদূতম্-এর কবি ধোয়ী যে ত্রিবেণীর কথা ভুলে থাকতে পারেননি। দ্বিজ বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের নায়ক চাঁদ রাজা একদিন হরষিত মনে এই ত্রিবেণীরই গঙ্গাতটে তাঁর মধুকর ভিড়িয়ে মহেশ্বরের পূজা করেছিলেন। কবিকঙ্কন চক্রবর্তীও বিস্মিত হয়েছিলেন, এই ত্রিবেণীর ঘাটে 'লক্ষ লক্ষ লোক এককালে করে স্নান'। ছেলে-ভুলানো ছড়াতে আজও বেঁচে রয়েছে রূপকথার দেশের মত অতি অতীতের সেই ত্রিবেণীর স্মৃতি।

'ত্রিপুর্নির ঘাটে রে ভাই বালি ঝকঝক করে
চাঁদ মুখে রোদ লেগেছে কিরণ ফেটে পড়ে।'

যে বালুকাসৈকত লক্ষ বছর ধরে মুক্তবেণীর কলরোল শুনেছে, সেই বালুকাসৈকতেই একদিন বিরাট এক ঘাট নির্মাণ করেছিলেন উড়িষ্যারাজ হরিচন্দন মুকুন্দদেব। আজও আছে সেই ঘাট। চারিটি শতাব্দীর পদধ্বনিতে অভিভূত সেই ঘাটের জীর্ণ সোপান শ্রেণীতে ঘটনামুখর বিরাট এক অতীতের স্মৃতি যেন জীর্ণ হয়ে পড়ে রয়েছে। মন্দির নাশকের মূঢ়তার আঘাতে প্রাচীন ত্রিবেণীর অনেক গৌরব ধূলিসাৎ হয়েছে। জেগে আছে শুধু বেণীমাধবের চূড়া। সপ্তগ্রাম-বিজেতা যে জাফর খাঁ ত্রিবেণীর বহু মন্দিরের শিখর ভূপাতিত ক'রে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, সেই বিজেতার

সমাধিও আজ শতজীর্ণ হয়ে এক প্রাচীন মন্দিরেরই প্রাঙ্গণে নিস্তব্ধ ভগ্নস্তূপের মত প'ড়ে রয়েছে। বিস্ময়ের বিষয়, মন্দিরধ্বংসক এই জাফর খাঁ-ই শেষে একদিন গঙ্গার বন্দনা করেছিলেন। জাফর খাঁ'র গঙ্গাস্তব নামে পরিচিত সেই বন্দনাবাণী আজও গঙ্গার তরঙ্গধ্বনির মতই ভক্তের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হয়।

বহু ঐতিহাসিক বিস্ময়ের আশ্রয় ত্রিবেণীর আর একটি বিস্ময়ের নিদর্শন হলো তার মহাশ্মশান। মুকুন্দদেবের ঘাটের কিঞ্চিৎ উত্তরে এই মহাশ্মশানভূমির ধূলিকণিকাও তীর্থরেণুর গৌরব লাভ করেছে। ত্রিবেণীর ঘাট এবং ত্রিবেণীর মহাশ্মশান, যেন মানব জীবনেরই দুই পরিণামের তত্ত্ব পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে। একদিকে জীবনের কলরব, আর একদিকে মৃত্যুর স্তব্ধতা। একদিকে স্নানস্নিগ্ধ জীবনের পূজা, মন্ত্র ও স্তব, পুষ্প ও প্রদীপ, আর একদিকে শুধু তপ্ত চিতার অগ্নিশিখা—সেই জীবনেরই ভস্মময় অন্তিম। যেমন ত্রিবেণীর ঘাটের গঙ্গাসলিলে, তেমনি ত্রিবেণীর মহাশ্মশানের ধূলিতেও নিগূঢ় এক আবেদন আছে। সাধক ও পুণ্যার্থী যুগ যুগ ধ'রে ভালোবেসে এসেছে এই ত্রিবেণীর স্বচ্ছ রৌদ্রালোক ও গঙ্গাবারিকে। ত্রিবেণীর মহাশ্মশানেরও ধূলি আর গভীর অন্ধকার যুগ যুগ ধ'রে শত ভক্ত ও সাধকের হৃদয়ের অভ্যর্থনা লাভ করেছে। এই মহাশ্মশানও যেন এক তীর্থভূমি এবং সত্য সত্যই দূর দূরান্তর হতে মৃতের দেহ এই শ্মশানে আজও সৎকারের জন্য নীত হয়। মৃতেরাও যেন তীর্থযাত্রিকের মতই আসে এখানে, জীবনের নশ্বরতার সকল বেদনা এই শ্মশানের ধূলিতে সঁপে দিয়ে মুক্ত হয়ে যায়।

ত্রিবেণীর মহাশ্মশান, কে জানে কত যুগের চিতাভস্ম এই শ্মশানভূমির স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। কখনো করুণ, কখনো বীভৎস এই মহাশ্মশানের মাটি ও অন্ধকারে বহু ঘটনার কাহিনী লুকিয়ে আছে। অমারজনীর গভীর তমিস্রায় অভিভূত শ্মশানভূমির বুকে পরিত্যক্ত শবের গলিতাবশেষ গিলে গিলে তৃপ্তোদর শৃগালের দল চিৎকার করে, যেন সহস্র প্রেতের হৃৎপিণ্ডের উল্লাস। শুষ্ক ও ভগ্ন নরকরোটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিঃশ্বাস হেনে ছুটে চলে যায় নিশীথের বাতাস। সেই মুহূর্তে জেগে ওঠে এক অশরীরী বেদনার বিষাদকরুণ আর্তনাদ। মনে হয়, শ্মশানের মাটি হতে যেন এক শোকরাগিণী গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে। কে জানে কা'র নৃত্যপর চরণের পীড়নে বেজে ওঠে বিচূর্ণিত মহাশঙ্খের রাশি! আকস্মিক অট্টহাসির শব্দে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় মহাগম্ভীর শ্মশানের স্তব্ধতা। কখনো বা ঝড় জাগে, দিক্‌প্রান্ত হতে যেন ধেয়ে আসে অযুত হাহাকার; যেন এক বিরাট উদ্দামের জটাভার ছুটে এসে অমাবৃত শ্মশানভূমির উপর লুটিয়ে পড়ে। শিউরে উঠে শ্মশান প্রান্তরের আলেয়া। সে আলেয়াকে আর জ্বলন্ত বাষ্পের পুঞ্জ বলে মনে হয় না। মনে হয়, যেন পুঞ্জীভূত রুধিরের আভায় লিপ্ত হয়ে রয়েছে প্রান্তরের অন্ধকার। বিদ্যুৎ যদি স্ফুরিত হয় আকাশে, তবে সে বিদ্যুৎকেও এক কৃষ্ণবরণী করালিনীর স্ফুরিত হাস্যের শিখা বলেই মনে হবে। কেউ দেখে ভয় পায় এবং কারো বা ভালো লাগে মহাশ্মশানের এই অন্ধকারের রূপ।

সাধক ভালোবাসেন মহাশ্মশানের এই অন্ধকারকে। বহু সাধকের সাধনা ও সিদ্ধির পুণ্য মিশে আছে ত্রিবেণীর মহাশ্মশানের ধূলিতে। সাধক রামপ্রসাদও ত্রিবেণীতে এসে এই মহাশ্মশানের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে শ্যামামায়ের কালোচরণে ভালোবাসা নিবেদন করেছিলেন। 'আর কাজ কি আমার কাশী'—ত্রিবেণী হতেই এই গান গেয়ে ফিরে গিয়েছিলেন সাধক রামপ্রসাদ।

শত সাধকের জীবনের কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে একটি অত্যাশ্চর্য আত্মোৎসর্গের কাহিনীও মিশে

আছে ত্রিবেণীর এই মহাশ্মশানের মাটিতে। আজও অমারাত্রির যে অন্ধকারে অভিভূত হয় ত্রিবেণীর মহাশ্মশান, সেই অন্ধকারেই একদিন রামদাস নামে এক প্রভুভক্ত ভৃত্য তার অঙ্গীকারের সত্যতা রক্ষার জন্য এসে দাঁড়িয়েছিল। ত্রিবেণীর পণ্ডিত জগন্নাথের ভৃত্য রামদাস।

পাণ্ডিত্যের খ্যাতি, সাধ্বী পত্নীর অনুরাগ এবং প্রভুভক্ত ভৃত্য রামদাসের সেবায় সুখীই ছিলেন পণ্ডিত জগন্নাথ। সিদ্ধিদাতা গণেশ ছিল তাঁর উপাস্য দেবতা। লোকে তাঁকে বলতো সাধক জগন্নাথ। লোকমুখের এই প্রশংসায় আনন্দিত হতো তাঁর মন। একটি দুঃখ ছিল তাঁর মনে, অপুত্রক ছিলেন তিনি। কিন্তু এই দুঃখও দূর হয়ে গেল একদিন। পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর পণ্ডিত জগন্নাথের সুখের জীবনের আনন্দে আর কোন অপূর্ণতা রইল না।

ভোলানাথ কণ্ঠাভরণ নামে এক পাণ্ডিতের আগমন হলো ত্রিবেণীতে, মহাবিদ্যা তারা যাঁর উপাস্য। পণ্ডিত জগন্নাথকে শাস্ত্রবিচারে ও তর্কে আহ্বান করলেন পণ্ডিত ভোলানাথ কণ্ঠাভরণ। আরম্ভ হলো বিচার। ঐ মুকুন্দদেবের ঘাটের উপর এক স্থানে আহূত হলো তর্কসভা। পর পর সাতদিন ধ'রে দুই পণ্ডিতের তর্ক ও বিচারের পর পরাভূত হলেন পণ্ডিত জগন্নাথ।

জয়গৌরবের আনন্দ নিয়ে ফিরে চলে গেলেন পণ্ডিত ভোলানাথ কণ্ঠাভরণ, কিন্তু পরাভবের গ্লানি নিয়ে আর ঘরে ফিরতে পারলেন না পণ্ডিত জগন্নাথ। এতদিন ধ'রে যে মিথ্যা এক অহংকারে নিজেকে মুগ্ধ করে রেখেছিলেন তিনি, চূর্ণ হয়েছে সে অহংকার। পরাভূত হয়েছে তাঁর পাণ্ডিত্য। তাঁর সাধক নামের গৌরবও কত তুচ্ছ প্রমাণিত হয়েছে তারাসিদ্ধ সাধক কণ্ঠাভরণের শক্তির কাছে। ভালোই হয়েছে। কিন্তু এই পরাভূত ও হৃতগৌরব জীবনকে আর সহ্য করবারই বা প্রয়োজন কি? প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করার সংকল্প গ্রহণ করলেন পণ্ডিত জগন্নাথ।

মুকুন্দদেবের ঘাটে সন্ধ্যা নামে। জনহীন হয়ে গিয়েছে তর্কসভা। চুপ ক'রে বসে রইলেন পণ্ডিত জগন্নাথ।

ঘনিয়ে আসে রাত্রি। অখ্যাতি ও অগৌরবের দুঃসহ পীড়ন হতে এই জীবনকে চিরকালের মত দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবার এক কঠোর প্রতিজ্ঞায় অনড় হয়ে বসে থাকেন পণ্ডিত জগন্নাথ। হঠাৎ একটি ব্যাকুল কণ্ঠের আহ্বান শুনে চমকে ওঠেন। দেখতে পেলেন, ভৃত্য রামদাস এসে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়েছে।

—ঘরে চলুন প্রভু। আবেদন জানায় ভৃত্য রামদাস।

পণ্ডিত জগন্নাথ বলেন—এমন অনুরোধ আর করো না রামদাস।

—কেন প্রভু?

—এই পরাজিত জীবনের গ্লানি নিয়ে আর লোকসমাজে বা গৃহে ফিরে যাবার অধিকার আমার নেই।

কেঁদে ফেলে ভৃত্য রামদাস। অনুরোধ করে—চিত্ত শান্ত করুন প্রভু।

পণ্ডিত জগন্নাথ—আমার দুঃখ তুমি বুঝতে পারবে না রামদাস, তাই শান্ত হবার জন্য এত সহজে অনুরোধ করতে পারছো।

রামদাস বলে—মূর্খ এই দাসের অপরাধ মার্জনা করুন প্রভু। আমার দুঃখ, আপনার এই দুঃখ দূর করবার শক্তি আমার নেই।

কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকেন পণ্ডিত জগন্নাথ। তারপর বলেন—প্রায়োপবেশনে আমি আমার

এই জীবন বর্জন করবো নিশ্চয়, কিন্তু মনে শান্তি নিয়ে মৃত্যু বরণ করতে পারবো, যদি একটি প্রতিশ্রুতি পাই। পারবে কি সেই প্রতিশ্রুতি দিতে?

রামদাস—আজ্ঞা করুন প্রভু।

পণ্ডিত জগন্নাথ—আমার পুত্র একদিন ভোলানাথ কণ্ঠাভরণকে বিচারে পরাভূত করবে, এমন প্রতিশ্রুতি দিতে পারো রামদাস?

রামদাস—আপনার পদসেবা ক'রে এই মূর্খের জীবন কেটেছে, আপনার শিশুপুত্রকেও এই দুই হাতের সেবার ও যত্নে বড় ক'রে তুলবো, এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। এর অধিক প্রতিশ্রুতি দেবার শক্তি কই আমার?

পণ্ডিত জগন্নাথ—অঙ্গীকার কর, আমার পুত্র একদিন উপযুক্ত সাধনার বলে মহাকালীর প্রসন্নতা ও করুণার অধিকারী হবে। আমি বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতে আমার সেই সিদ্ধসাধক পুত্র অনায়াসে পণ্ডিত কণ্ঠাভরণকে বিচারে পরাস্ত করতে সক্ষম হবে।

রামদাস—প্রভু, এমন প্রতিশ্রুতিই বা কি ক'রে দিতে পারবে এই অজ্ঞ ও অধম? আমি যে আপনার এক মন্ত্রতন্ত্রহীন ও সাধনপূজনশূন্য দীন ভৃত্য মাত্র।

নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তা করেন পণ্ডিত জগন্নাথ। তারপর বলেন—এখনি গঙ্গাজলে স্নান ক'রে আমার কাছে এসে দাঁড়াও রামদাস। আজ মহামন্ত্রে দীক্ষা দেবো তোমাকে। আজ আমি তোমার গুরু, তুমি হবে আমার শিষ্য।

স্নান সমাপন ক'রে পণ্ডিত জগন্নাথের সম্মুখে এসে দাঁড়ায় রামদাস। রামদাসের কর্ণে মহামন্ত্র প্রদান ক'রে পণ্ডিত জগন্নাথ বলেন—গুরুদক্ষিণা দাও শিষ্য রামদাস।

দুই চক্ষু সজল ক'রে তাকিয়ে থাকে রামদাস—দক্ষিণা? আজ্ঞা করুন গুরু, এ দরিদ্রের কাছ থেকে কি দক্ষিণা পেলে সুখী হবেন আপনি?

পণ্ডিত জগন্নাথ—প্রতিশ্রুতি দাও, আমার পুত্রের উপনয়নের পর তাকে এই মহামন্ত্র উপদেশ করবে তুমি। তারপর যথাকালে আমার পুত্রকে ঐ মহাশ্মশানে নিয়ে এসে তার জন্য শবসাধনার সকল আয়োজন করে দেবে। এই কর্তব্যের ভার রইল তোমার উপর। তুমি প্রতিশ্রুতি দাও, এই কর্তব্য পালন করবে তুমি। তোমার এই প্রতিশ্রুতিই হবে গুরুদক্ষিণার প্রতিশ্রুতি এবং যেদিন এই প্রতিশ্রুতি পালন করবে, সেদিন তুমি গুরুদক্ষিণার দায় হতেও মুক্ত হয়ে যাবে।

গুরুর চরণে প্রণিপাত ক'রে রামদাস বলে—প্রতিশ্রুতি দিলাম গুরু।

প্রায়োপবেশনেই প্রাণত্যাগ করলেন পণ্ডিত জগন্নাথ। এবং শিষ্য রামদাসও নতুন ক'রে শুরু করলো তার প্রতিশ্রুতির জীবন। গুরুর শিশুপুত্রকে অগাধ স্নেহে লালন করে রামদাস। বড় হয়ে উঠতে থাকে শিশু। ভবিষ্যতের কালীসাধক শিশুকে মহাশ্মশানের প্রান্তরে নিয়ে গিয়ে খেলা করে রামদাস। যেন শ্মশানের অন্ধকারের ভয়কে খেলা ক'রে ক'রে শিশুর মন থেকে দূর ক'রে দেয়। অমারজনীতে শ্মশানভূমির নিভৃতে এসে ভৃত্য রামদাস উপুড় হয়ে শয়ন করে। রামদাসের পিঠের উপর উপবেশন ক'রে এবং রামদাসেরই উপদেশে কালীনাম জপ করতে শেখে শিশু।

এক মুহূর্তের জন্যও তার প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে থাকতে পারে না রামদাস। বড় হয়ে উঠেছেন গুরুপুত্র। যথাকালে উপনয়নের পর গুরুপুত্রকে গুরুপ্রদত্ত মহামন্ত্রও প্রদান করে রামদাস। তারপর আর একটি উপযুক্ত ও ঈপ্সিত লগ্নের প্রতীক্ষায় যেন ব্যাকুলভাবে দিনাতিপাত করতে থাকে।

মনে আছে, একদিন এক অমাবস্যার রজনীতে ঐ মহাশ্মশানের গভীর অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। গুরুপুত্রের জন্য শবসাধনার সকল আয়োজন ক'রে দিতে হবে। তবেই গুরুদক্ষিণার দায় হতে মুক্ত হবে রামদাস।

—আর দেরি করছো কেন রামদাস? রাত্রিশেষের স্বপ্নে এই প্রশ্ন শুনে একদিন ঘুম থেকে চমকে জেগে ওঠে রামদাস। না, আর দেরি করার কোন হেতু নেই।

অমাবস্যার রাত্রি। ঘন মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ। অশনি সম্পাতে থেকে থেকে কেঁপে উঠছে দিগন্ত। প্রবল বারিধারার শব্দে ভয় পেয়ে চুপ হয়ে গিয়েছে রাত্রির ঝিল্লী। মত্ত ঝঞ্ঝাবায়ুর আঘাতে আলুলায়িত হয় অমারাত্রির স্তবকিত তমিস্রা।

কিশোর গুরুপুত্রের হাত ধ'রে মহাশ্মশানের প্রান্তে এসে দাঁড়ালো রামদাস। বিস্মিত হয়ে দেখতে থাকে রামদাস, যেন এক বিরাট ভয়ালের ভ্রূকুটির আঘাতে শিহরিত হয়ে কাঁপছে শ্মশানের মাটি। সকল সৃষ্টি যেন অন্ধ হয়ে ছটফট করছে এই নীরন্ধ্র অন্ধকারে। লুপ্ত হয়ে গিয়েছে আকাশের তারকানিকর। কী অদ্ভুত শব্দ! যেন শত প্রেতের দন্তসংঘট্টের ধ্বনি ছুটাছুটি করছে চারদিকে।

তবে কি ফিরে যেতে হবে? মুহূর্তের মত ভাবনায় বিহ্বল হয় রামদাসের মন। স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে থাকেন গুরুপুত্রের হাত ধ'রে।

অকস্মাৎ বিদ্যুৎ চমকায় আকাশে। দেখে আরও বিস্মিত হয় রামদাস, অগ্নিবরণ বিদ্যুৎ নয়, নীলবরণ স্নিগ্ধ জ্যোতির্লেখার মত ঐ বিদ্যুতের চকিত স্পর্শে বিচিত্র এক প্রভায় দীপ্ত হয়ে উঠেছে মেঘমণ্ডল। যেন কোটি-চন্দ্র-সুশীতল ও কোটি-সূর্য-সমুজ্জ্বল এক জ্যোতির্ময়ী শ্যামার আভা আভাস দিয়ে ফুটে উঠছে মহামেঘের অন্তরাল হতে। এই তো শুভ লগ্ন।

গুরুপুত্রের হাত ধ'রে শ্মশানের অভ্যন্তরে এসে দাঁড়ালো রামদাস। —প্রস্তুত হও ভাই, তোমার সাধনা আরম্ভের পবিত্র মুহূর্ত এসে গিয়েছে।

—আমি প্রস্তুত রামদাদা। উত্তর দেয় বালক।

গুরুপুত্রের জন্য শবসাধনার সকল আয়োজন ক'রে দিতে হবে। শবের সন্ধানের শ্মশান প্রান্তরের চতুর্দিকে ব্যগ্রভাবে ছুটাছুটি করতে থাকে রামদাস। কিন্তু কোথায় শব? বারিবর্ষণে নির্বাপিত চিতার অঙ্গারস্তূপের মধ্যে প'ড়ে রয়েছে শুধু যত অর্ধদগ্ধ শব। কোথাও বা শৃগালের ভক্ষিতাবশেষ ছিন্নাঙ্গ বিকৃত ও গলিত শব। শ্মশানের সর্বত্র সন্ধান ক'রেও অচ্ছিন্নশরীর শব সংগ্রহ করতে পারে না রামদাস। অশনিপাতে আর একবার কেঁপে ওঠে দিগন্ত। নীল বিদ্যুৎ আর একবার ঝলক দিয়ে ওঠে। ছুটে এসে গুরুপুত্রের হাত ধরে রামদাস।

বালক প্রশ্ন করে—শব কই রামদাদা?

থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে রামদাসের দুই হাত। গুরুপুত্রের সাধনার জন্য শব সংগ্রহ ক'রে দিতে হবে। গুরুর নিকটে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে আছে রামদাস। সেই প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে। গুরুদক্ষিণার দায় হতে মুক্ত হবার মুহূর্ত এসেছে এতদিনে।

শ্মশানভূমির উপর উপুড় হয়ে শয়ন করে রামদাস। বিস্মিত হয় বালক, আজও কি কালীসাধনার খেলা খেলেই ঘরে ফিরে যাবার ইচ্ছা করছেন রামদাদা?

প্রশ্ন করে বালক—শব কই রামদাদা?

রামদাস বলে—চিন্তা করো না ভাই, আমিই হবো শব। আমার পিঠের উপর বসে কালীনাম

জপ করো।

—তুমি কি ক'রে শব হবে রামদাদা?

—হ্যাঁ, আমিই হবো।

অকস্মাৎ রামদাসের দুই বলিষ্ঠ বাহু ক্ষিপ্ত ভুজঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে রামদাসের কণ্ঠের উপর। বজ্রশিলায় গঠিত যূপকাষ্ঠের মত দুই মূঢ় মুষ্টি দিয়ে চেপে ধরে রামদাস তার নিজেরই কণ্ঠনালী। অশনিপাতে কেঁপে ওঠে দিগন্ত। নিষ্প্রাণ হয়ে প'ড়ে থাকে রামদাস। আকাশে মেঘের ঘোর ধীরে ধীরে মুছে যেতে থাকে। ফুটে ওঠে শুকতারা।

রামদাসের শবের উপর বীরাসনে বসে, আর সকল বিভীষিকা জয় করে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন পণ্ডিত জগন্নাথের পুত্র এবং পণ্ডিত কণ্ঠাভরণও পুনরায় একদিন এই সিদ্ধসাধকের কাছে নতিস্বীকার ক'রে পাণ্ডিত্যের অভিমান বর্জন করেছিলেন।

ত্রিবেণীর মহাশ্মশানে অমারাত্রির তৃতীয় প্রহরে আজও সেদিনের মত আকাশে জেগে ওঠে শুকতারা। বিচলিত হয় মহাশ্মশানের অন্ধকার। মনে হয়, এক শিষ্যের ভয়ংকর আত্মোৎসর্গের কাহিনী স্মরণ ক'রে শ্মশানভূমির দিকেই বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছে শুকতারা।

লও ফিরে তব পুরস্কার

সাড়ে চারশত বছর আগে, ক্ষুদ্র এক তুলসীমঞ্চের প্রদীপ নিভিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল বিরাট এক রাজপ্রাসাদের হিংসুক অভিসন্ধি। কিন্তু কি ফল হলো সেই চেষ্টার? অতি সুবিনীত এক তুলসীমঞ্চ আর অতি উদ্ধত এক রাজপ্রাসাদ, এই দু'য়ের মধ্যে শেষ পর্যন্ত কে রইল আর কে গেল, তার প্রমাণ যদি স্বচক্ষে দেখতে হয়, তবে যেতে হবে কলকাতা থেকে মাত্র পঁচিশ ক্রোশ দূরে, প্রশস্ত যশোর রোড যেখানে দু'পাশের গাছের ছায়ায় শীতল হয়ে আর দু'পাশের ক্ষেত ও মাঠের খোলা হাওয়া পেয়ে খুশি হয়ে উঠেছে। এ জায়গার নাম বেনাপোল।

মনের শান্তি হারিয়েছিলেন ভূস্বামী রামচন্দ্র খান। ভোর হলেই শয্যা হতে গাত্রোত্থান ক'রে যখন তিনি তাঁর বিরাট ভবনের বাতায়নের কাছে এসে দাঁড়াতেন, তখন দেখতে পেতেন, শিশিরভেজা ধানক্ষেতের আলিপথ ধ'রে চলেছে শত শত মানুষ। কি আগ্রহ, কি ভক্তি আর কি নিষ্ঠা ফুটে উঠেছে সেই মানুষগুলির চোখেমুখে আর চলার ভঙ্গীতে। যেন কোথাও নতুন এক মন্দিরের দ্বার খুলে গিয়েছে, আর নতুন এক দেবমূর্তি স্বচক্ষে দেখে ধন্য হবার জন্য ব্যস্তভাবে পথ হেঁটে চলেছে নরনারীর দল।

কিছুক্ষণ পরেই, যখন পূবের আকাশ আরও আলোকিত হয়ে ওঠে, তখন আরও বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে গড়বেষ্টিত এই বিরাট রাজবাড়ির রূপ। উদ্যানে আলো ঝলমল করে, আর জল টলমল করে রাজবাড়ির দু'পাশের দুটি পুষ্করিণীতে। সানাই বেজে ওঠে দেউড়িতে। পাইক পেয়াদা আর গোমস্তার ভিড় দেখা দেয় রাজবাড়ির প্রবেশপথে। প্রজার দল আসে। আভূমি প্রণত হয়ে অভিবাদন জানায় প্রজার দল। কর দান ক'রে আর নানা সামগ্রী উপঢৌকন দিয়ে রামচন্দ্র খানের ভূস্বামীত্বের সম্মান রক্ষা ক'রে একে একে সকলে চলে যায়। মহামহিমার ভূস্বামী রামচন্দ্র খান সন্তুষ্ট হন।

কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনের সকল সন্তোষই যেন একটি আঘাতে তিক্ত হয়ে ওঠে। স্বচক্ষেই

দেখতে পান, প্রজার দল আগ্রহে চঞ্চল হয়ে, যেন ব্যাকুল ভক্তের মত কি-এক বস্তু দেখে দুই চোখ তৃপ্ত করবার জন্য তাঁরই উদ্যানের পথ আর তারই পুষ্করিণীর তটপথ ধ'রে ব্যগ্রভাবে ছুটে চলে যাচ্ছে। ভূস্বামী রামচন্দ্র খান, এত বড় ভূমিময় সংসারের সেই প্রভুকে যেন তুচ্ছ ও কৃত্রিম কতগুলি সামগ্রীর উপহারে ছলিত ক'রে প্রজার দল চলেছে কোন্ এক উৎসবের প্রভুর মুখ দেখে মুগ্ধ হবার জন্য, আর তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নেবার জন্য।

সন্ধ্যা হয়। এই বিরাট রাজবাড়ির বাতায়নপথে দাঁড়িয়ে দেখতে পান ভূস্বামী রামচন্দ্র খান, ঐ যে, সেই ক্ষুদ্র তুলসীমঞ্চের সেই ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বলছে। স্পষ্ট ক'রে দেখতে না পেলেও, বুঝতে পারেন রামচন্দ্র খান, বহু মানুষের প্রণামে তৃপ্ত হয়ে হাসছে ঐ প্রদীপ। তাঁরই প্রজার দল গিয়ে ভিড় করেছে ঐ তুলসীমঞ্চের নিকটে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক কুটিরের দুয়ারের কাছে।

এই দৃশ্য আর এই কল্পনা সহ্য করতে পারেন না ভূস্বামী রামচন্দ্র খান। এই তো, সেদিনও ঠিক ঐ স্থানেই ছিল বিষাক্ত বন্যলতা আর কাঁটাগাছের বন। কোথা থেকে এল এক অতিদরিদ্র, আর তাঁরই প্রজা হয়ে ঐ বনের মাঝখানে ক্ষুদ্র একটি কুটির তৈরি ক'রে নিলো। শুনেছেন রামচন্দ্র খান, লোকটা ঐ বনের একটা তৃণ, লতা ও কাঁটাকেও ব্যথিত করেনি। পরিত্যক্ত এক বল্মীকস্তূপের উপর কাদামাটি দিয়ে ক্ষুদ্র একটি কুটির রচনা করেছে অদ্ভুত এক জীবপ্রেমের ভণ্ডামি। আর, স্থাপন করেছে ঐ তুলসীমঞ্চ। জ্বলে উঠেছে একটা ক্ষুদ্র প্রদীপ। শৃগালের আবাসভূমিতে এসে ঠাঁই নিয়ে দীনতম একটা মানুষ দিনকয়েকের মধ্যে যেন রাজ্যেশ্বর হয়ে উঠলো! তুলসীমঞ্চের প্রদীপের দিকে তাকিয়ে ভূস্বামী রামচন্দ্র খানের চোখের দৃষ্টি জ্বলতে থাকে। ঐ ক্ষুদ্র প্রদীপের আলোক যেন তাঁর এই ভবনের চতুর্দশ দ্বারের সব আলোকের গৌরব নিষ্প্রভ ক'রে দিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসছে।

কবে নিভে যাবে ঐ প্রদীপ? চিন্তা করতে গিয়ে আরও হতাশ হয়ে পড়ে ভূস্বামী রামচন্দ্র খান। কারণ, এরই মধ্যে অনুচর পাঠিয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছেন রামচন্দ্র খান, ঐ প্রদীপ সত্যই এক ভক্তের হৃদয়ের প্রদীপ। লোকটা সত্য সত্যই 'রাত্রি-দিন-তিন লক্ষ হরি নাম সংকীর্তন' করে। বিষয়বাসনার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না এই নিঃস্বের আচরণে, মুখের ভাষায় বা চোখের দৃষ্টিতে। ওর নাম হরিদাস ঠাকুর। লোকের শ্রদ্ধায় লোকটা সত্যই যে ঠাকুর হয়ে উঠেছে। সবই সত্য বটে, কিন্তু কি দুঃসহ এই সত্য! ঐ ক্ষুদ্র কুটির আর তুলসীমঞ্চ যে এই ভূস্বামী ভবনের সব বৈভব আর প্রতাপের গৌরবকে বল্মীকস্তূপের চেয়েও অধম এক ধূলিস্তূপে পরিণত ক'রে ফেলেছে। তাঁরই সকল প্রজার সব প্রণাম লুণ্ঠন করছে ঐ তুলসীমঞ্চ। এই পরাভব মেনে নিতে পারবেন না রামচন্দ্র খান।

উপায় চিন্তা করতে থাকেন ভূস্বামী রামচন্দ্র খান। ছল বল ও কৌশল, তিন উপায় আছে; কিন্তু বলের কথা ভাবতে গিয়ে বিমর্ষ হয়ে পড়েন রামচন্দ্র খান। জোর ক'রে তুলসীমঞ্চের ঐ প্রদীপ অপসারিত করা যাবে না। তিন লক্ষ নাম সংকীর্তন করে, এমন মানুষকে অনুচর পাঠিয়ে সন্ত্রস্ত করাও সম্ভবপর নয়। এ'হেন মানুষকে জোর ক'রে বিতাড়িত করতে গেলে প্রজার দলই হয়তো বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। প্রজার কাছে যে ঠাকুর হয়ে উঠেছে কোথাকার এই নিঃস্ব ও রিক্ত জপমালাজীবী বৈরাগী, নাম যার হরিদাস।

কৌশলের সাহায্যে গ্রহণ করলেন ভূস্বামী রামচন্দ্র খান। রাজপুষ্করিণীর নিকটে সুন্দর একটি

কুটির নির্মাণ করলেন এবং তাঁরই উৎকোচে বশীভূত এক ব্যক্তি সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে এই কুটিরের অভ্যন্তরে এসে আশ্রয় গ্রহণ করলো। রামচন্দ্র খানের অনুচরের দল গ্রামে গ্রামে ঘুরে রটনা ক'রে দিল, রাজপুষ্করিণীর কিনারায় এক কুটীরে এসে আশ্রয় নিয়েছেন এক সন্ন্যাসী মহাপুরুষ। 'রাত্রিদিন চার লক্ষ শিব নাম জপ করেন এই সন্ন্যাসী।

উৎসুক প্রজার দল এসে ভিড় করে পুষ্করিণী-তটের এই নতুন কুটিরের কাছে। জপনিবিষ্ট সন্ন্যাসীর মূর্তির দিকে শ্রদ্ধাভিভূত চক্ষে সকলে তাকিয়ে থাকে। কুটিরের দুয়ারে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করে প্রজার দল। দেখে তৃপ্ত হয় আর শান্ত হয় রামচন্দ্র খানের মনের জ্বালা। হাঁ, মূর্খ ভক্ত-জনতার শ্রদ্ধাকে রাজবাড়ির উদ্যানের মধ্যে সরিয়ে আনতে পেরেছেন তিনি। এইবার তুলসী মঞ্চের প্রদীপ বৃথাই একা-একা পুড়ে ক্ষয় হয়ে যাবে। চার লক্ষ নাম-জপের মহাপুরুষকে ছেড়ে দিয়ে কে যাবে ঐ তিন লক্ষ নাম-জপের এক বৈরাগীর কাছে?

কিন্তু প্রতি সন্ধ্যার মত সেদিনও সন্ধ্যায় তুলসীমঞ্চের প্রদীপ ঠিক জ্বলে ওঠে। বুঝতে পারেন আর বিস্মিত হয়ে দূর হতেই তাকিয়ে দেখতে থাকেন রামচন্দ্র খান, প্রতি সন্ধ্যার মত আজও এই সন্ধ্যায় হরিদাস ঠাকুরের কুটিরের সম্মুখে ভক্ত-জনতার সমাগম হয়েছে। হাসছে তুলসীমঞ্চের প্রদীপ।

আক্রোশে চঞ্চল হয়ে পুষ্করিণী-তটে তাঁরই রচিত সেই কপট ভজনস্থলীর সম্মুখে এসে দাঁড়ান রামচন্দ্র খান এবং দেখতে পান, তাঁরই উৎকোচের মহাপুরুষ সেই কপট সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হয়েছে। যেন দূরের ঐ তুলসীমঞ্চের প্রদীপের ক্ষীণদ্যুতি, কিংবা জটা ও রুদ্রাক্ষমালায় রচিত এক ছদ্মবেশের দংশন, অথবা বিশ্বাসী জনতার প্রণাম সহ্য করতে না পেরে আর ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছে লোকটা। পুষ্করিণী-তটের দীপহীন অন্ধকারের মধ্যেই নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর এই ব্যর্থতার জ্বালা সহ্য করবার চেষ্টা করেন কৌশলপরায়ণ ভূস্বামী, কিন্তু সহ্য করতে পারেন না।

কৌশলের সাহায্যে নয়, এইবার ছলের সাহায্যে ঐ হরিদাসের সাধকজীবনে সব মহিমা চূর্ণ করতে হবে, ভূস্বামী রামচন্দ্র খানের মনের বিবর হতে এক নতুন প্রতিজ্ঞা কুটিল সরীসৃপের মত জেগে ওঠে। রাজপ্রাসাদে ফিরে এসে সেই মুহূর্তেই অনুচর পাঠিয়ে ডেকে আনলেন অতি চটুল ও সুন্দর, অথচ ভয়ানক এক ছলনাকে।

বারবিলাসিনী এক পতিতা, ভূস্বামী রামচন্দ্র খানের প্রস্তাব শুনে তখনি প্রতিশ্রুতি জানায়—আমি পারি, আমি প্রস্তরমূর্তির হৃদয়ও বিচলিত ক'রে তুলতে পারি ভূস্বামী মহারাজ, ভগবান আমাকে সেই রূপ ও যৌবনের গর্ব দিয়ে গড়েছেন।

মদিরাসিক্ত ওষ্ঠ, কজ্জললিপ্ত চক্ষু, লাস্যহাস্যবিধুরা সেই রূপসী পতিতার মুখের দিকে তাকিয়ে রামচন্দ্র খান বিশ্বাস করতে পারেন, হাঁ, ঐ কটাক্ষ আর ভ্রূভঙ্গীর আঘাতে লৌহতন্তু দিয়ে গাঁথা জপমালাও আপনা হতেই ছিঁড়ে যাবে মুহূর্তের মধ্যে।

এক মুষ্টি সোনার টাকা সেই পতিতা নারীর হাতে তুলে দিলেন রামচন্দ্র খান। পারিতোষিকের প্রতিশ্রুতি দিলেন—আর এক মুষ্টি সোনার টাকা কার্যসিদ্ধির পরে।

জনপদের দীপ নিভেছে। ঘরে ঘরে মানুষ ঘুমিয়ে পড়েছে। নির্জন তুলসীমঞ্চের বাতাস অকস্মাৎ বারবিলাসিনীর নূপুরের শব্দে চমকে ওঠে।

একটি প্রদীপ জ্বলছে হরিদাস ঠাকুরের কুটিরের অভ্যন্তরে। নিদ্রিত পুষ্প কোরকের মত দুই

চক্ষু নিমীলিত, নাম জপছেন হরিদাস। শান্ত কুটিরের নীরবতা আহত ক'রে, কলহাস্যে বিহ্বল হয়ে, কটাক্ষ শিহরিত ক'রে রূপাজীবা নারী বলে—আজ এ রাতের মত আপনারই এই কুটিরে আশ্রয় নিলাম সন্ন্যাসী ঠাকুর।

চোখ মেলে তাকালেন হরিদাস। অসংবৃতবসনা বারাঙ্গনা বঙ্কিমভঙ্গে দেহ আন্দোলিত ক'রে কুটিরের দ্বারপ্রান্তে উপবেশন করে। প্রশ্ন করে—আশ্রয় দিলেন তো সন্ন্যাসী?

হরিদাস বললেন—হ্যাঁ।

পতিতা অনুরোধ করে—আর একটি অনুরোধ আছে সন্ন্যাসী।

হরিদাস—বল।

ভ্রূভঙ্গী ক'রে দুই চোখের কজ্জলকলঙ্ক যেন আরও নিবিড় ক'রে নিয়ে বারাঙ্গনা বলে—জপমালা রেখে দিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করবেন, এই অনুরোধ।

হরিদাস বলেন—একটু অপেক্ষা করতে হবে।

পতিতা—কতক্ষণ?

হরিদাস—জপ শেষ হলেই জপমালা রেখে দেবো।

হেসে ওঠেন বারাঙ্গনা— তাই হোক, জপ শেষ করুন সন্ন্যাসী।

নাম জপেন হরিদাস। কুটিরের প্রদীপ জেগে থাকে। জেগে থাকে বারাঙ্গনা। তুলসীমঞ্চের প্রদীপ হাসে।

গভীর হ'তে গভীরতর হয় রাত্রি। ঘুমন্ত বনবিটপীর পাতার নীড়ে পাখির শাবকও আর শব্দ করে না। শব্দহীন এক বিরাট শান্তিতে মৌনী হয়ে রয়েছে এই পৃথিবীর মাটি আর আকাশ। বারাঙ্গনা নারী নামজপরত হরিদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কি অদ্ভুত এক আনন্দ ফুটে রয়েছে ঐ মুখের উপর।

প্রহরের পর প্রহর ক্ষয় হয়ে চলেছে। কিন্তু হরিদাসের জপ শেষ হয় না। বারাঙ্গনা নারী হরিদাসের জপমালার দিকে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে থাকে। যেন কোটি সঙ্গীতের মধুরতার মধ্যে ডুব দিয়ে রয়েছে ঐ নীরব জপমালা।

বসন সংবৃত করে বারাঙ্গনা। ধীরে ধীরে পায়ের নূপুর খুলে ফেলে; এই মৌন আর এই শান্তিকে যেন ভুল ক'রে কোন চটুল শব্দের আঘাত দিয়ে ক্ষুণ্ণ না করতে পারে বহু বিলাসরাত্রির নৃত্যামোদে উন্মাদ এই নূপুর।

হরিদাসের পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে বারাঙ্গনা। জানে না বারাঙ্গনা, তার অধরের মদিরা সব শুকিয়ে গিয়েছে কখন, অশ্রুর প্লাবনে ধুয়ে গিয়েছে চক্ষুর কজ্জলকলঙ্ক। নামশুচি এক জীবনের মহিমা ও প্রসন্নতার কাছে প্রার্থিনীর মত মাথা লুটিয়ে প্রণাম করে বারাঙ্গনা। বনবিটপীর পাতার আড়ালে ঘুমভাঙ্গা পাখি ডেকে ওঠে। ভোর হয়।

জপ শেষ ক'রে হরিদাস প্রশ্ন করেন—বল, কি কথা শুনতে চাও?

বারাঙ্গনা বলে—শুচিতা ও শান্তি চাই ঠাকুর, আর কিছু চাই না।

হরিদাস স্নিগ্ধহাস্যে আশ্বাস দান করেন—হরিনাম সম্বল কর নারী। তাহলেই জীবনের সব পাওয়া পেয়ে যাবে।

হরিদাসের কুটিরদ্বারের মাটি কপালে মেখে চলে গেল বারাঙ্গনা নারী।

ভূস্বামী রামচন্দ্র খান তখন তাঁর বুকভরা হিংস্র কৌতূহল নিয়ে পুষ্করিণী-তটের উদ্যানে সেই শূন্য কপটমন্দিরের নিভৃতে বসেছিলেন। সফল হয়েছে তাঁর অভিসন্ধি, জয়ী হয়েছে বারাঙ্গনার কটাক্ষ, কলঙ্কিত হয়েছে হরিদাসের বৈরাগ্য, প্রদীপ জ্বলবে না আর ঐ তুলসীমঞ্চে, এই বার্তা শোনার জন্য প্রতীক্ষার ধৈর্য সহ্য করতে গিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠছিলেন রামচন্দ্র খান।

ঐ যে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে সেই বারাঙ্গনা। রামচন্দ্র খানের দুই চোখে উল্লাস আর মুখের হাসি যেন সাফল্যের গর্বে আত্মহারা হয়ে ওঠে। হরিদাসের জপমালাকে সত্যই বন্দী ক'রে নিয়ে আসছে নারী; ঐ তো দেখতে পাওয়া যায়, ছলনাকুশলা ঐ রূপসীর হাতে রয়েছে একটি থলি। কিন্তু পরক্ষণেই ভূস্বামীর এই হাস্যময় উল্লাস যেন হঠাৎ আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। মাটিমাখা কপাল, রিক্তা নিরাভরণা ও দীনবেশা এক নারীর মত মূর্তি নিয়ে সেই পতিতা এসে ভূস্বামী রামচন্দ্র খানের সম্মুখে একটি থলি রেখে দিয়ে নিবেদন করে—আপনার পুরস্কার ফিরিয়ে নিন ভূস্বামী মহারাজ, আর এই অধমাকে ক্ষমা করুন।

গর্জন করেন রামচন্দ্র খান—কেন?

বারাঙ্গনা বলে—প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি এই পাপীয়সী।

ক্রোধে উন্মত্তের মত হুংকার দেন রামচন্দ্র খান—মিথ্যাচারিণী নারী, কল্পনা করতে পারো, তোমাকে কি শাস্তি দেবো?

বারাঙ্গনা বলে—কল্পনা করতে পারি না মহারাজ।

রামচন্দ্র খান—তোমার এই জীবনের পাপার্জিত সব স্বর্ণ অর্থ ও অলংকার কেড়ে নিয়ে তোমাকে ভিখারিনী করে দেবো। তাই হবে তোমার উপযুক্ত শাস্তি।

বারাঙ্গনা বলে—ও শাস্তি আমি নিজেই গ্রহণ করেছি মহারাজ। আপনার সম্মুখে এই থলির মধ্যে শুধু আপনার পুরস্কারের অর্থ নয়, এই পাপজীবনের অর্জিত সব সোনা আর রূপার আবর্জনা রয়েছে।

—দূর হও, আমার রাজ্যে তোমার ঠাঁই নেই। গর্জন করেন রামচন্দ্র খান।

বারাঙ্গনা বলে—দূর হ'লাম মহারাজ।

বোধ হয় শুনতে পাননি রামচন্দ্র খান, মৃদুস্বরে হরিনাম ধ্বনিত ক'রে চলে যাচ্ছে সেই নারী; এই রাজবাড়ির উদ্যানের ছায়া পার হয়ে, এই জনপদের পথ অতিক্রম ক'রে কে জানে কোন্ রাজ্যের দিকে।

সেদিনও বোধহয় উপলব্ধি করতে পারেননি ভূস্বামী রামচন্দ্র খান তাঁর এই উদ্ধত রাজবাড়ির গর্বই একদিন পরিত্যক্ত বল্মীকস্তূপের চেয়েও দুর্বল হয়ে আর ধুলো হয়ে ঝরে পড়বে, কিন্তু বেঁচে থাকবে ঐ তুলসীমঞ্চ। বেনাপোলের সাধনপীঠে হরিদাসের রচিত তুলসীমঞ্চে আজও প্রদীপ জ্বলে। আর ছলবলকৌশলের সেই ভূস্বামী-ভবন আজ অরণ্যে আবৃত এক ধ্বংসের পিণ্ড মাত্র। আজও জীর্ণ ইঁটের এক স্তূপের দিকে, সর্প ও শৃগালের আবাসভূমিতে পরিণত এক ঝোপজঙ্গলের দিকে আঙুল তুলে লোকে বলে—ঐ যে, ঐখানে ছিল ভূস্বামী রামচন্দ্র খানের রাজবাড়ি।

এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে, বন্যপাদপের গা ঘেঁষে প্রেতের মত যে ছায়া আজও লুকিয়ে আছে, সে-ছায়া সব চেয়ে বেশি শিউরে ওঠে দোলপূর্ণিমার রাত্রে, হরিদাসের সাধনপীঠে যখন মহোৎসব জাগে, আর জ্যোৎস্নার স্পর্শ পেয়ে জেগে ওঠে বেনাপোলের সাড়ে চার শত বছর আগের এক বিজয়ী প্রদীপের কাহিনী।

সখিসোনার পাঠশালা

সখী সখিসোনা? আজ আর কেউ ডাকে না। এখানে বাতাসের বুকে লুকিয়ে থেকে কোন প্রতিধ্বনিও এই নাম ধ'রে আর ডাকে না সেই রাজার কুমারীকে, কালোকেশের কবরী কানাড়া ছান্দে সাজিয়ে, আর 'কষিয়া কাঁকলি বান্ধি কমলের ফুলে' যে-মেয়ে একদিন ঠিক এখানেই এক বকুলের সুরভিত ছায়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

কোটালের কুণ্ডার অহিমানিক, নবীন তরুর মত যৌবনে আকুল হয়ে উঠেছিল যার রূপ আর মন, মালতী লতার আড়ালে দাঁড়িয়ে হঠাৎ নাম ধ'রে ডেকে রাজকুমারী সখিসোনাকে চমকে দিয়েছিল যে-ছেলে, সে-ই বা আজ কোথায়?

নেই, তারা নেই। সেই বকুল আর মালতীও নেই। কিন্তু নতুন লতায় ও পাতায় এবং ঘাসে ও কাঁটায় ঢাকা পড়ে আজও রয়েছে সেই ঠাঁই, যেখানে অনুরাগের এক রূপকথা একদিন জন্মলাভ করেছিল। কবি ফকিররামের কল্পনা আর কাব্য জানে, কি আবেগ ছিল সেই অনুরাগে। কত কঠিন পরীক্ষা আর বেদনা, কত হতাশা উৎকণ্ঠা আর আক্ষেপ বার বার দেখা দিয়ে সেই অনুরাগের জীবনকে অশ্রুসিক্ত ক'রে তুলেছিল।

রাজা বিক্রমজিতের মেয়ে সখিসোনা! কে জানে কোন্ বিক্রমজিৎ, আর কোন যুগের রাজা! সে রাজার রাজত্ব ধূলো হয়ে গিয়েছে কবে কোন্ অতীতে, তারও কোন হিসাব নেই। সে রাজার প্রাসাদের একটি ইষ্টকখণ্ডও আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু, কি আশ্চর্য, রাজার মেয়ের সেই প্রেমের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইষ্টকের একটি স্তূপ আজও পড়ে রয়েছে এই বাংলা দেশেরই এক পল্লীর ভূমির উপর। মেদিনীপুর জেলার এক গ্রামের সেই ইষ্টক স্তূপের দিকে তাকালে পথিক দর্শকের অনুমার আর কল্পনাও যেন একটু ফাঁপরে পড়ে। মনে হয়, হয়তো সত্যি সত্যিই এক রাজার মেয়ের প্রেমের ইতিহাস ছিল এখানে, কালক্রমে আর কবির কল্পনায় সে ইতিহাস রূপকথা হয়ে গিয়েছে। কিংবা, এমনও হতে পারে যে, কোন কবিমনের কল্পনা দিয়ে তৈরি এক রূপকথা অতি প্রাচীন এক ইতিহাসের পরিত্যক্ত ও পরিচয়হীন ভগ্নস্তূপে এসে আশ্রয় নিয়েছে। হয় সত্যিকারের ইতিহাস এক রূপকথার মধ্যে মুখ লুকিয়ে রয়েছে, নয় এক রূপকথাই ইতিহাসের মত রূপ ধ'রে বসে রয়েছে এখানে।

নানা ঐতিহাসিক ঘটনা আজ শুধু স্মৃতি হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। একদিন মোগল বাদশাহ আকবরের ফৌজ নিয়ে এখানেই এসেছিলেন রাজা তোডরমল্ল, এবং বিদ্রোহী পাঠান দাউদ শা' মোগল শক্তির কাছে পরাজিত হলেও সেই রক্তাক্ত সংগ্রামে মোগলসৈন্যের প্রাণ ভয়ানকভাবেই ছিন্নভিন্ন হয়েছিল। তাই তো এই জায়গার নাম মোগলমারি।

আরও অতীতের সাক্ষী হয়ে নিকটেই রয়েছে দাঁতনের শ্যামলেশ্বর শিবের মন্দির, প্যাগোডার মত যার গঠন, যার নিকটেই পথ দিয়ে নীলাচলে গিয়েছিলেন নবদ্বীপের দীপ শ্রীচৈতন্য। ঐ তো সেই দুটি প্রাচীন দীর্ঘিকা, শরশঙ্ক ও বিদ্যাধর, পাশাপাশি দুই সুহৃদের মত বসে আজও গ্রীষ্মের তৃষ্ণা মেটাবার চেষ্টা করে। এই দাঁতনই কি সেই দন্তপুর, বুদ্ধশিষ্য ক্ষেমের কাছ থেকে বুদ্ধদন্ত উপহার লাভ ক'রে কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্ত যেখানে এক দন্তমন্দির নির্মাণ করেছিলেন?

চারদিকের সবই হলো ইতিহাস, শুধু এখানে একটি রূপকথা, মোগলমারি নামে এই গ্রামের যেখানে পুরনো ইঁটের একটি স্তূপ নীরবে হয়ে রয়েছে।—সখী সখিসোনা। এ নাম ধ'রে আজ আর কেউ ডাকে না।

রাজা বিক্রমজিতের মেয়ে সখিসোনা আর বিক্রমজিতের কোটালের ছেলে অহিমানিক একই গুরুর কাছে একই পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাসের জন্য আসতেন। লিখতে লিখতে রাজকুমারী সখিসোনার লেখনী যেদিন হঠাৎ ভূতলে পড়ে গিয়েছিল, সেদিন সখিসোনাও নিশ্চয় কল্পনা করতে পারেননি যে, গুরুর চোখে ধরা না পড়লেও ফকিররাম নামে হাজার হাজার বছর পরের এক কবির চোখে এই লেখনীপতনের দৃশ্য ধরা পড়ে যাবে।

সখিসোনার সুন্দর মুখের লজ্জারাগ সখিসোনার চোখে ধরা সেদিন পড়েনি। পড়েছিল যার চোখে, সেই কোটালপুত্র অহিমানিকই ভূতল হতে লেখনী তুলে নিয়ে কুমারী সখিসোনার হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

বলেছিলেন অহিমানিক—যদি একটি প্রতিশ্রুতি দাও রাজার মেয়ে তবে তোমার লেখনী তোমার হাতে তুলে দিতে পারি।

সখিসোনা—বলুন, কি প্রতিশ্রুতি চাই?

অহিমানিক—প্রতিশ্রুতি দাও, আমার অনুরোধ রক্ষা করবে।

সখিসোনা—রক্ষা করবো।

ভূতল হতে রাজকুমারীর লেখনী তুলে নিয়ে রাজকুমারীর হাতে দিয়ে অহিমানিক বলেন—তোমাকে নাম ধ'রে ডাকবার অধিকার চাই রাজকুমারী।

সখিসোনা বলেন—দিলাম অধিকার।

রাজকুমারী হয়ে কোটালপুত্রকে সেদিন ক্ষণিক মনের-ভুলে যে অধিকার দিয়ে ফেলেছিলেন সখিসোনা, সেই অধিকারের পরিণাম বোধ হয় তিনি তখন কল্পনা করতে পারেননি। কিন্তু কল্পনা করবারও আর প্রয়োজন হয়নি। ক'দিন পরেই পাঠশালা হতে ঘরে যাবার সময় পথের এক বকুলের ছায়ার কাছে এসে চমকে উঠলো সখিসোনা। নীরব বাতাস যেন হঠাৎ মুখর হয়ে ডেকে উঠলো—সখী, সখিসোনা!

এক লতাকুঞ্জের অন্তরাল হতে বের হয়ে এলেন অহিমানিক। বিব্রত ও বিচলিত সখিসোনার কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন—আর তোমাকে নাম ধ'রে ডাকবার সুযোগ পাবো না।

সখিসোনা—কেন?

অহিমানিক—কোটালের পুত্র অহিমানিক আজ চলে যাবে রাজ্য ছেড়ে।

সখিসোনা বেদনার্তভাবে বলেন—তবে কি প্রয়োজন ছিল এই কৌতুকের? কেন নাম ধ'রে ডাকবার অধিকার নিলে আর ডাকলে?

অহিমানিক—রাজা বিক্রমজিতের ক্রোধ হতে আত্মরক্ষা করতে চাই রাজকুমারী। কোটালপুত্রের দুঃসাহস তিনি ক্ষমা করবেন না।

সখিসোনা—কিসের দুঃসাহস?

অহিমানিক—কোটালের ছেলে হয়ে রাজার মেয়েকে ভালোবেসেছি, এই দুঃসাহস।

সখিসোনার চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। বকুলের সুরভিত ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই সিক্ত

চোখের দৃষ্টি দিয়ে যেন তাঁর নিজেরই অন্তরের কামনার ছায়াটিকে দেখতে পান। বুঝতে পারেন, অহিমানিকের মুখের ঐ ডাক শুনতে না পেলে তাঁর এই জীবনই বধির হয়ে যাবে।

সখিসোনা বলেন—যেখানে যাবে যাও, কিন্তু তোমার সখিসোনাকে সঙ্গিনী ক'রে নিয়ে যেতে ভুলো না।

ভুলেননি অহিমানিক এবং সখিসোনাও পিতা ও মাতার সর্বক্ষণের সতর্কতাকে ফাঁকি দিয়ে গোপনে ঘন আঁধারে অন্ধ এক রাত্রিতে সেই মায়াবকুলের নিকটে মনের মানুষের বুকের কাছে এসে দাঁড়ালেন। কোটালপুত্রের সঙ্গিনী হয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন রাজকুমারী সখিসোনা। ঝড় উঠেছিল সেদিন, ভয়াল হয়ে উঠেছিল রাত্রির অন্ধকার, ক্রুদ্ধ মেঘের ভ্রূকুটি দেখে মুখ লুকিয়েছিল আকাশের তারা। অহিমানিকের হাত ধ'রে বনপথে যেতে যেতে পিছনের মায়ার টানে একবার থমকে দাঁড়িয়েছিলেন রাজকুমারী।—ফিরে আয় মেয়ে! শুনতে পেয়েছিলেন সখিসোনা, এই ঝঞ্ঝার সব শব্দ ছাপিয়ে দূর রাজপ্রাসাদের ভিতর থেকে যেন অতিকরুণ এক আহ্বানের স্বর ভেসে আসছে, ঝড়ের রাতে স্নেহের শাবক নীড়হারা হয়ে গেলে কপোতদম্পতি যে সুরে কাঁদতে থাকে।

বিজলী চমকায়, খর বরষার ধারা লুটিয়ে পড়ে। অহিমানিক ডাকেন—সখী সখিসোনা।

আর দ্বিধা করেন না সখিসোনা। অহিমানিকের হাত ধ'রে পথ চলতে থাকেন।

আর একদিন আর এক পরীক্ষা দেখা দিলো সখিসোনার জীবনে। অতর্কিতে দস্যুর দল এসে অহিমানিককে বন্দী করে। উপাস্যা দেবীর তুষ্টির জন্য বলির মানুষ খুঁজছিল দস্যুর দল। বন্দী অহিমানিককে নিয়ে চলে গেল দস্যুরা। নির্জন বনভূমির নিভৃতে একাকিনী পড়ে রইলনে সখিসোনা। ফিরবে না আর অহিমানিক। এ জীবনে আর বাজবে না কোন শুভ উৎসবের শঙ্খধ্বনি। প্রণয়ী অহিমানিকের অনুরাগের সিন্দুরবিন্দু আর রঞ্জিত করবে না সখিসোনার এই সীমন্তরেখা। এতক্ষণে দস্যুর আরাধনার উপচার হয়ে এক দেবীর মন্দিরপ্রাঙ্গণ আপন শোণিতে রঞ্জিত ক'রে পড়ে আছেন অহিমানিক।

—হে মহামাতা চণ্ডিকা, মূর্খা সখিসোনাকে কি এমন ক'রেই শাস্তি দিতে হয়! মধুর সুরে ডাকা একটা নাম শোনার লোভে যে ভুল করেছে সখিসোনা, তার কি কোন ক্ষমা হয় না দেবী? তবে রাজকুমারী সখিসোনাকেও তোমার কাছে ডেকে নাও।

আকুল হয়ে দেবী চণ্ডিকার কাছে মনের বেদনা নিবেদন করেছিলেন রাজকুমারী সখিসোনা। নীরব হয়ে সারা অরণ্য শুনেছিল সেই আর্তনাদ।

—সখী সখিসোনা! অকস্মাৎ যেন একটি ডাকেই মধুর হয়ে বেজে উঠলো সারা অরণ্যের কৌতূহল। চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখেন সখিসোনা, অহিমানিক ফিরে এসেছেন।

আরও বড় সংকট দেখা দিয়েছিল অহিমানিক ও সখিসোনার প্রেমের জীবনে। বনের নিভৃতের কুটীর হতে একদিন বের হলেন অহিমানিক খাদ্যের অন্বেষণে। একাকিনী কুটীরে রইলেন সখিসোনা। কিন্তু রাত্রি অবসান হয়ে গেলেও কুটীরে আর ফিরলেন না অহিমানিক। বনপথেব দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আর প্রতি শব্দে শুধু চমকে উঠে রাজকুমারী সখিসোনার সব উৎকণ্ঠা প্রহরের পর প্রহর বৃথাই ফুরিয়ে যায়। অহিমানিক আর ফিরে আসেন না। জানেন না, কল্পনাও করতে পারেন না সখিসোনা, অহিমানিক তখন হীরা মায়াবিনী নামে এক নারীর ঘরে বন্দী হয়ে রয়েছেন।

সেই দিনই মৃগয়া করতে বনের ভিতরে এলেন রাজা নরধ্বজ। বনবাসিনী সখিসোনাকে দেখে

মুগ্ধ হলেন এবং বন্দিনী হয়ে রাজা নরধ্বজের প্রাসাদে এসে ঠাঁই নিতে হলো সখিসোনাকে।

ওদিকে মায়াবিনীর যাদুজাল থেকে মুক্ত হয়ে আসতে পারেন না অহিমানিক। আর এদিকে মুগ্ধ রাজা নরধ্বজ প্রণয় নিবেদন ক'রে সখিসোনাকে জীবনের সম্মুখে আর এক মোহজাল বিস্তারিত করতে থাকেন। —তুমি আমার প্রেম গ্রহণ ক'রে রাণী হও আর সুখী হও সখিসোনা।

সময় প্রার্থনা করেন সখিসোনা—আর কিছুদিন প্রতীক্ষা করতে দিন রাজা।

নরধ্বজ বলেন—সময় দিলাম রাজার মেয়ে। কিন্তু তোমার এই প্রতীক্ষা কবে শেষ হবে বল?

শুনে বুক কেঁপে ওঠে সখিসোনার। রাজা নরধ্বজের প্রশ্ন শুনে নয়, যেন নিজেরই মুখের কথাগুলি শুনতে পেয়ে একটা ধিক্কারে কেঁপে উঠেছে সখিসোনার মন। কেন শেষ হবে এই প্রতীক্ষা? কোনদিন ফুরিয়ে যেতে দেবেন না সখিসোনা তাঁর এই প্রতীক্ষার জীবনকে। সেই পদশব্দের জন্য ধ্যান করতে করতে, সেই মধুর সুরের সম্বোধন শুনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থেকে থেকেই কেটে যাক রাজকুমারী সখিসোনার জীবন।

সখিসোনা বলেন—আমার প্রতীক্ষা কোনদিনই শেষ হবে না রাজা।

সখী সখিসোনা! রাজা নরধ্বজের ভবনসরোবরের জল আর লতাকুঞ্জের পল্লব যেন অকস্মাৎ এক মধুর সম্বোধনের সঙ্গীতে শিউরে উঠলো।

সখিসোনার অনেক প্রতীক্ষার বেদনার মত অনেক অন্বেষণের বেদনা ও বাধা সহ্য ক'রে আর হীরা মায়াবিনীর যাদুজাল হ'তে মুক্ত হয়ে এতদিনে ফিরে এসেছেন অহিমানিক। বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন রাজা নরধ্বজ—কে এই আগন্তুক?

বন্দিনী সখিসোনা বলেন—আমার অহিমানিক।

কিছুক্ষণ বিষণ্ণ বদনে দাঁড়িয়ে থাকেন রাজা নরধ্বজ। তার পরেই সেই বিষণ্ণতা নিজেরই মনের এক উৎসাহের চাঞ্চল্যে দূরে সরিয়ে দিয়ে স্মিতমুখে ব'লে ওঠেন—দেখে সুখী হলাম।

রাজা নরধ্বজের সম্মুখেই সখিসোনার হাত ধ'রে আবার যাত্রা শুরু করলেন অহিমানিক। অনুভব করেছিলেন দু'জনেই, এ জগতের সব ছায়া এতদিন পরে সেই বকুলের ছায়ার মতই স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। পথ চলতে চলতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েন সখিসোনা, অহিমানিক তখন মৃদুস্বরে ডাকেন—সখী সখিসোনা।

ক্লান্তি ভুলে যান রাজকুমারী সখিসোনা।

কে জানে, আবার সেই প্রথম বকুলের ছায়ার কাছে কোনদিন ফিরে এসেছিলেন কিনা সখিসোনা আর অহিমানিক। সেই পাঠশালা কবে নীরব হয়ে গেল কে জানে? মেদিনীপুর জেলার ক্ষুদ্র পল্লীর মাটির উপর শুধু প'ড়ে রয়েছে সেই মুখর পাঠশালার নীরব এক ভগ্নস্তূপ। যেন এক রূপকথারই ভগ্নস্তূপ।

ইতিহাসের অনেক ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, কিন্তু রূপকথার এক ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় একমাত্র মেদিনীপুর জেলার এই মোগলমারি গ্রামে। প্রাচীন ও জীর্ণ একটি ইষ্টকস্তূপ, যার নাম 'সখিসোনার পাঠশালা।'

সে পাঠশালা আজ স্তব্ধ ও নীরব ভগ্নস্তূপ মাত্র। সখী সখিসোনা, আজ আর কেউ ডাকে না।

ক্যাকটাস

বসুধৈব কুটুম্ বকম্

একটা বক এসেছে।

কবে এসেছে?

নন্দু আর রামুয়া জবাব দিল—এই তো দিন-পাঁচেক আগে।

একটা বকের আবির্ভাবের ঘটনা যে এত বড় একটা বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারে, সেটা আগে কখনও কল্পনা করেনি রামতনু, তসীলদার রামতনু। কিন্তু নন্দু আর রামুয়ার চোখ মুখের চেহারা দেখে বেশ স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে যে ওদের মনের ভিতরে বেশ জোরে একটা আশ্চর্যের বাতাস বইছে। কিন্তু এই আশ্চর্যের সবটাই একটা খুশির কাণ্ড বলে সবারই বোধ হয়েছে কি? না, তা নয়। কারও ধারণা, এটা ভেলাডিহির এই নিরালা জঙ্গলের জীবনে একটা ভাল ঘটনার আগাম ইঙ্গিত। কিন্তু কী ধরনের ভাল ঘটনা? এ বছরে ভেলাডিহির মকাই আর বজরার দুগুণ ফলন হবে, এরকম কোন সৌভাগ্যের ঘটনা কি? না, তাও নয়। তবে কি খারাপ ঘটনার ইঙ্গিত? বৃষ্টি হবে না, আর চষা ক্ষেতের মাটি জো হারিয়ে একেবারে শুকনো ছাইয়ের মতো একটা বস্তু হয়ে যাবে? না, তাও নয়।

ভাণ্ডারজীর চাকর নন্দু, কাঠকাটা কানা লালজিয়া ও শালের ধুনো যোগাড় করে প্রতি মঙ্গলবারে পাঁচ ক্রোশ দূরের ধনপুরের হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে অন্তত দশটা পয়সা রোজগার করে যে লোকটা, চাকর নন্দুরই শ্বশুরাল গাঁ সম্পর্কে শালা হয় যে রামুয়া, তাদের সবারই মনের ভিতরে যেন একটা চিন্তা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, এ কেমন লক্ষণ? কিসের লক্ষণ? হঠাৎ কেন এবং কোথা থেকে একটা বক এসে ভেলাডিহির একটা বুড়ো শালগাছের কাঁধের ওপর মস্তবড় একটা ফাটলের মধ্যে ঠাঁই নিল? শাল গাছটা দাঁড়িয়ে আছে তসীলদার রামতনুর কাছারিঘরের ঠিক পিছনের উইটিবিগুলির মাঝখানে। বক কি উই খেতে ভালবাসে? না, বকের এরকম অদ্ভুত অভ্যাসের কথা তো কখনও ওরা শোনেনি। শুধু জানা আছে যে, বকেরা মাছ ভালবাসে।

এই তো ক' দিন আগে, হোলির দিনে এই তিনজনেই কাছারি ঘরের বারান্দার ওপর হাততালি দিয়ে নেচেছিল আর গান গেয়েছিল—নদী কিনারে বগুলা বৈঠে, মছলি চুনি চুনি খায়। গানটাকে শুনতে রামতনুর একটুও ভাল লাগেনি।

সেই গানের শেষ দিকের ভাষাটা শুনতে যতই খারাপ লাগুক, আগন্তুক এই বকটাকে দেখতে রামতনুর একটুও খারাপ লাগা দূরে থাকুক, খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু নন্দু, রামুয়া ও লালজিয়ার মতো আশ্চর্য হয়ে চিন্তা করতে শুরু করেনি যে, এই বকের আগমন হয় একটা খুব ভাল নয়তো খুব একটা মন্দ সঙ্কেত। রামতনুর মনের মধ্যে ছেলেবেলার একটা প্রিয় ছড়ার ভাষা গুনগুন্ করে :—

বক মামা বক মামা
মাছ দিয়ে যা।
বউ দেবে আলো চাল।
ঘরে নিয়ে খা।।

বক মামা মাছ দিয়ে যাবেন, এবং মানুষের ঘরের বউ খুশি হয়ে বক মামাকে কিছু আলোচাল দিয়ে দেবে। ঘরে ফিরে গিয়ে আলো চাল খাবেন বকমামা।

সেই ছেলে-বেলার জীবনে মনের ও প্রাণের মধ্যে এমন কোন সন্দেহের কথা ছিল না যে, আলো চাল খাওয়ার জন্যে বকের পেটে ও মুখে কোন লোভ নেই, বকেরা চাল খায় না। প্রফেসর চারুবাবু কাব্য পড়াতে গিয়ে আকাশের উড়ন্ত বলাকা-পংক্তির নানা ভাবভঙ্গীর কথা বলতেন। আজও স্মরণ করতে পারে রামতনু, চারুবাবুর মুখ থেকে বলাকা-পংক্তির নানা ভাবভঙ্গীর কথা শুনে সেদিন বক নামক সাধারণ পাখি প্রাণীটাকে সত্যিই কাব্যের একটা চমৎকার বিহঙ্গম বলে মনে হতো। ভুলে যেতে হতো যে, বকেরা খাল বিল ও ডোবার কিনারাতে ঘুরে ফিরে ও ছোঁ মেরে-মেরে পুঁটি মাছ ধরে আর খায়।

ভেলাডিহি থেকে মাত্র এক ক্রোশ দূরে চুটুপালুর বাঁশ-জঙ্গলের দক্ষিণে যে ঝিল আছে, তার জল পানি-ফলের লতা-পাতায় ঢাকা, তবু নানা ফাঁক দিয়ে স্বচ্ছ জলের চেহারাটা দেখতে পাওয়া যায়, মাগুর লেঠা আর পুঁটিমাছের একটা জ্যান্ত সংসার কিলবিল করছে। অনেক বক রোজই এখানে আসে আর সারাদিন ধরে ঝিলের কিনারাতে ঘুরে ঘুরে চকচকে সাদা-সাদা পুঁটি পেট ভরে খেয়ে নিয়ে সন্ধ্যা হবার আগেই আবার কোথায় যেন চলে যায়। যারা পানিফল তোলবার জন্যে ঝিলের কিনারাতে ভিড় করে তারা দেখে একটু ভয় পায় যে, শত-শত বক উড়ে এসে ঝিলের কিনারাতে ঠাঁই নিয়েছে। পানিফল তোলবার হিড়িকে ঝিলের জল নড়ে উঠবে আর পুঁটি মাছের ঝাঁক ছটফট করে লাফাবে, এই সম্ভাবনার বার্তাটা কে এদের কেমন করে পৌঁছে দেয়, কে জানে। রামতনু একবার নিজের চোখে ওই ঝিলের পানিফল তোলবার দৃশ্য দেখেছিল। গিরিডির বাজারের এক সব্জীবেচা কুঁজরা মহাজন তার দশ-বারো জন লোক সঙ্গে নিয়ে ঝিলের পানিফল তুলছে। কুঁজরা মহাজন হলো ঝিলটার ইজারাদার, সব পানিফল তারই প্রাপ্য। পানিফল তোলবার সেই দৃশ্যের সঙ্গে মিলে-মিশে আরও একটা দৃশ্য ছিল। শত শত বকের মাছ ধরে খাওয়ার বিপুল এক ব্যস্ততার দৃশ্য। সত্যিই তো, ভেবে দেখবার মতো এবং একটু বিস্ময়েরই প্রশ্ন বটে, কী করে বকেরা খবর পেল যে, আজ এই সকালেই ঝিলের পানিফল তুলে নেওয়া হবে?

এই ভেলাডিহিতেও যে ছোট্ট একটা জংলী পুকুর আছে, সেটা পুঁটি আর শামুক-গুগলির পুকুর নয়। এই সত্যটা এক ক্রোশ দূরের ওই ঝিলের সব বকেরই নিশ্চয় জানা ছিল। প্রমাণ এই যে, ভেলাডিহির এই জংলী পুকুরে পুঁটি মাছ খাওয়ার আশায় কোন বক কোনদিন এখানে আসেনি। এই প্রথম একটা বক এসেছে। তাই অনেকে আশ্চর্য হয়েছে। সেইজন্যে আজ সকাল হতেই ভাণ্ডারীজীর চাকর নন্দু এসে রামতনুকে খবরটা দিয়েছে—এক বগুলা আয়া, একটা বক এসেছে।

রামায়ণে আছে রামচন্দ্রের উক্তি : পশ্য লক্ষ্মণ পম্পায়াং বকঃ পরম ধার্মিকঃ। প্রফেসর চারুবাবু বলতেন : রামচন্দ্রের এই উক্তি বকের সম্পর্কে একটা খাঁটি প্রশস্তির বাণী, বকের চরিত্রের সম্পর্কে কোন ঠাট্টার বাণী নয়। অনেক পণ্ডিত এই উক্তিটির ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। হে জলদ, বলাকার পংক্তি আকাশে উড়ে উড়ে তোমাকে অভিনন্দিত করছে, কালিদাসের এই উক্তিটাও বলতে গেলে বকের সম্পর্কে একটি প্রশস্তির বাণী। উড়ন্ত বকের সারির রূপ কবির চোখে খুব সুন্দর বলে মনে হয়েছিল। উড়ন্ত বকের সারিবাঁধা দল যেন কালো মেঘের বুকে সাদা ফুলের মালার মত শোভা ধারণ করে।

ছেলেবেলায় কেষ্টনগরে মামাবাড়িতে থাকবার সময় যে ছড়াটা পাড়ার ভানুদা আর রত্নাদির মুখে শুনেছিল রামতনু, সেটার ভাষা বেশ-একটু অন্য রকমের। সে ছড়াতে বকমামার কাছে মাছ চাওয়া হয়নি। চাওয়া হয়েছে, ফুল। সে ছড়ার সঙ্গে কালিদাসের কল্পনার কোন সম্পর্ক নেই, তবু বকের কথার সঙ্গে ফুলের কথা এসে পড়েছে।

বক মামা বক মামা
ফুল দিয়ে যা।
নারকেল গাছে কড়ি আছে
গুণে নিয়ে যা।।

যা-ই হোক, এখানে এই নিতান্ত একলা একটা সাদা বকের আগমন সত্যিই যে একটু রহস্যের ব্যাপারের মতো মনে হয়। ভেলাডিহির জংলী পুকুরে তো মাছ-টাছ নেই। পুকুরের জলে সামান্য কিছু শেওলা আর পানিফলের কয়েকটা লতাপাতা ভাসছে। তবে একটা বক এখানে এসে বুড়ো শালগাছের ডালপালার মধ্যে ঠাঁই নিল কেন? বকটা কি বোকা? বকের বুদ্ধির অভাব আছে, এমন গল্প তো কোনদিনও শোনেনি রামতনু।

নন্দু আর রামুয়া এসে হাসতে থাকে।—আপনি তো বকটাকে বোকা মনে করেছিলেন।

রামতনু—হ্যাঁ, সন্দেহ হয়েছিল।

—কিন্তু দেখে আসুন গিয়ে, বকটা পুকুরের কিনারাতে ঘুরে-ঘুরে টুপ টুপ করে ঠোঁটের ঠোকর দিয়ে মাছ মারছে আর খাচ্ছে। ছোট্ট ছোট্ট পুঁটি আর এই এক আঙুলের চেহারার মতো ছোট্ট ছোট্ট বেলে।

রামতনু—ওই পুকুরে মাছ এল কবে, কোথা থেকে এল?

লালজিয়া এক হাতে কপাল ছুঁয়ে কথা বলে।—পরামাত্মা জানে, আর ওই বক জানে।

যে পুকুরে মাছ ছিল না, সে পুকুরে এখন ছোট-ছোট পুঁটি আর বেলে কিলবিল করছে, এটা যেমন একটা রহস্যের আশ্চর্য, ঠিক তেমনই একটা আশ্চর্য হলো, বকটা কেমন করে টের পেল যে, ভেলাডিহির জংলী পুকুরে এখন মাছ এসেছে?

নন্দু বলে—এ আর কী এমন আশ্চর্যের ব্যাপার বাবু? আমি দেখছি, চুটুপালুর ঝিলটার পানিফল তোলবার ইজারা নিয়েছে গিরিডির যে ইদ্রিস মিঁয়া, তাকে ঝিলের এক ক্রোশ দূরের সড়কে হাঁটতে দেখে বকের দল উড়ে এসে ঝিলের কিনারায় বসেছে। বকেরা সব বুঝতে পারে। মানুষের বুদ্ধির চেয়ে বকের বুদ্ধি অনেক বেশী।

আজ সকালবেলার দ্বিতীয় খবর—এক বাবু আয়া! নন্দু খবর দিল, বেশ মোটাসোটা চেহারার একজন বাবু এসেছেন।

তসীলদার রামতনুর আগেই জানা ছিল যে, ঠাকুর সাহেবের বেয়াই বলে যাঁর নামডাক আছে, সেই রঘুবাবু জঙ্গলের সব হরতকী তুলে নিয়ে যাবার হুকুমনামা পেয়েছেন। এটা একটা খাতিরী ব্যাপার, মেহেরবানির ব্যাপারও বলা চলে। রঘুবাবুকে কৃপা করবার জন্যেই তাঁকে এবছরের মধ্যে জঙ্গলের সব হরতকী তুলে নিয়ে যাবার অনুমতি দিয়েছেন ঠাকুরসাহেব। ভাণ্ডারীজী বলেছেন, রঘুবাবু সত্যি করে ঠাকুর সাহেবের একজন কুটুম বেয়াই নন, ঠাকুর সাহেবের এক বন্ধুর মেয়ের

শ্বশুর। ঠাকুর সাহেবের চিঠিতে নির্দেশ পেয়ে ভাণ্ডারীজী একমাস আগেই রঘুবাবুর থাকবার জন্যে একটা ঘর তুলে রেখেছেন। খড়ের চালা, মাটির দেয়াল, কাঁচা শালকাঠের একটা দরজা। ওই তো সেই ঘরটা, দরজা খোলা, তাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ঘরের ভিতরে কাঁচা বাঁশের একটা খাটিয়ার ওপর বসে রয়েছেন আগন্তুক রঘুবাবু।

বুড়ো শালগাছের একটা মগডালের পাতা কাঁপিয়ে দিয়ে বকটা যেন হঠাৎ খুশির আবেগে উড়তে শুরু করেছে। ধবধবে সাদা বকের পাখনা দুটো ঝাপট দিয়ে সকালবেলার বাতাসের সঙ্গে খেলা করছে। বকটা উড়ে এসে প্রথমে রামতনুর ঘরের খাপরার চালার ওপর বসলো। তারপর আবার তেমনই একটা হঠাৎ-খুশির আবেগে যেন দুই ডানাতে কাঁচা রোদের ছোঁয়া নেবার আনন্দে উড়তে উড়তে কোথায় যেন চলে গেল, বোধহয় ভেলাডিহির সেই জংলী পুকুরটার দিকে।

হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এলেন রঘুবাবু।—কী মশাই? একটা সাদা বক উড়ে গেল বোধ হচ্ছে।

রামতনু—আজ্ঞে হ্যাঁ।

রঘুবাবু—আমার কোমরে যে ষোল বছর ধরে একটা অদ্ভুত রকমের বাতের ব্যথা লেগেই রয়েছে, তার সবচেয়ে ভালো ওষুধ হলো ওই সাদা বক।

রামতনু—কী বললেন ঠিক বুঝলাম না।

রঘুবাবু—সাদা বকের মাংস। একদিন খেলে অন্তত একটা মাস সে ব্যথা আর থাকে না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন রঘুবাবু—যাক্ মশাই, দেখে একটু নিশ্চিন্ত হলাম। তিনটে মাস এখানে থাকতে হবে আর হরতকীর সঙ্গে মারামারি ফাটাফাটি করতে হবে, শরীরটাকে তো একটু পোক্ত করে বানিয়ে রাখতেই হবে।

রামতনু—তা তো বটে, কিন্তু কী দেখে নিশ্চিন্ত হলেন?

রঘুবাবু—অন্তত একটা সাদা বক তো পাওয়া যাবে। একটা সাদা বকের মাংস খেলে একটা মাস, এমন কি দেড়-দু'মাসও এই কোমরটাতে বাতের ব্যথাটা আর জোর করতে পারবে না।

চমকে ওঠে রামতনু।—বকটক এখানে পাবেন বলে মনে হচ্ছে না।

—কেন? এই তো, নিজের চোখে দেখতেই পেলাম, একটা সাদা বক উড়ে গেল।

—ওটা মাত্র দিন চার-পাঁচ হলো, কে জানে কোথা থেকে উড়ে এসেছে। এখানকার বক নয় ওটা। ওটা আজই না হোক, দু-চার দিনের মধ্যে চলে যাবে।

—তাহলে তো দু'চার দিনের মধ্যেই একটা ব্যবস্থা করতে হয়।

—কিসের ব্যবস্থা?

—বকটাকে মারবার ব্যবস্থা।

রামতনুর দুই চোখে একটা কটমটে ভাব ফুটে উঠলেও রঘুবাবুর চোখে একটা উল্লাসের ভাব চকচকিয়ে ওঠে। চেঁচিয়ে ওঠেন রঘুবাবু—হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ব্যস্ ব্যস্ ব্যস্। আর ভাবতে হবে না। আমার এতক্ষণ মনেই পড়ছিল না যে, তীর মেরে কিংবা গুলেল ছুঁড়ে বকটাকে ঘায়েল করবার লোক আমার সঙ্গেই আছে। জট্টু, জট্টু, এ জট্টু, চেঁচিয়ে ডাকতে থাকেন রঘুবাবু।

নন্দু বলে, রঘুবাবুর সঙ্গে যে চাকরটা এসেছে, তারই নাম জট্টু।

রামুয়া বলে—চাকর তো বটেই, কিন্তু ঠিক চাকর নয় জট্টু। জট্টু হলো একটা কামিয়া।

রঘুবাবু—ঠিক কথা। কামিয়া।

চমকে ওঠে রামতনু। কামিয়া! কামিয়া! কলেজের প্রিন্সিপাল রেভারেণ্ড কেনেডি একদিন প্রফেসর চারুবাবুকে বেশ শক্ত করে কয়েকটা কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন—আপনাদের জাতির ভয়ানক ডিসগ্রেস ছিল যে সাটি (সতীদাহ), সেটা তো এখন নেই। কিন্তু আর-একটা ডিসগ্রেস আছে; কামিয়াটি (কামিয়ৌতি), স্লেভ কেনাবেচা, স্লেভ রাখা।

দুই চোখ অপলক করে দেখতে থাকে, বছর চোদ্দ-পনের বয়স হবে, একটা রোগা-পটকা চেহারার ছেলে রঘুবাবুর ঘরের দাওয়া থেকে নেমে আর দৌড়ে এসে দাঁড়ালো। রামতনুর পায়ের কাছে মাটির ওপর মাথা ঠেকিয়ে আর রামতনুরই পায়ে মাড়ানো মাটি থেকে এক টিপ ধুলো তুলে নিয়ে নিজের কপালের ওপর ঘষে নিল ছেলেটা, যার নাম জট্টু।

রঘুবাবু বললেন—এ ব্যাটা একটা জংলী জাতের ছেলে। ওর বাপ-মা দু'জনেই আমাদের কেনা কামিয়া। নগদ একশো বিরাশি টাকা দিয়ে ওদের দুজনকে কেনা হয়েছিল, তখন ওরা দুজনে ছিল নিতান্ত একটা ছোঁড়া আর ছুঁড়ি। ক্ষেত খামারের খাটুনির কাজ করতেই জানতো না, পারতোও না। এখন অবশ্য পুরো খাটুনি খাটতে পারে।

আর চমকে ওঠে না রামতনু। চোখ দুটো যেন স্তব্ধ হয়ে শুধু জট্টু নামের ছেলেটাকে দেখতে থাকে। কামিয়া কথাটা অনেকদিন আগেই শুনেছিল রামতনু। 'টমকাকার কুটির' বইটাতে যে ক্রীতদাসের কথা আছে, কামিয়া তো প্রায় সেইরকমের কেনা চাকর, সারাজীবন ধরে খাটবার চাকর। কামিয়া কখনো ধারের টাকা শোধ করতে পারে না। শুনেছে রামতনু, কেউ-কেউ কামিয়া হতে গিয়ে নিজেকে একেবারে বিক্রি করেই ফেলে। তার মানে কিছু বেশী টাকা ধার পায়। ধার তো শোধ হয় না, তিন পুরুষ খাটলেও না।

ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করে রামতনু—তোমার নাম জট্টু?

হেসে ফেলেন রঘুবাবু—ওর সঙ্গে এত মিহি করে কথা বলবেন না মশাই। ও হলো কামিয়ার ছেলে কামিয়া। একটু ধমক দিয়ে কথা বলুন। ধমক না খেলে ওরা বাঁচে না।

—আপনার নাম?

—রামতনু।

—বাঃ খাসা নাম। ভালই হলো। আপনাকে নাম ধরে ডাকলে ভূত পালিয়ে যাবে। যাক্‌গে, এসব বাজে কথা বলাবলি করে কোন লাভ নেই। আসল কথা হলো, বকটাকে আজ-কালের মধ্যে ঘায়েল করতে হবে।

—কী করে ঘায়েল করবেন?

—দেখবেন দেখবেন, এই কামিয়া ছোঁড়াই দেখিয়ে দেবে! জংলী জাতের ছেলে, হাতের টিপ সাংঘাতিক। গুলেল ছুঁড়ে একটা কাঠবিড়ালীকে মারতে ওর এক মিনিট সময় লাগে, বকটাকে মারতে বড়জোড় দু'মিনিট সময় লাগবে। বক! আহা, সাদা বক!...আচ্ছা মোশাই...।

—বলুন।

—আপনি তো লেখাপড়া শিখেছেন।

—হ্যাঁ।

তবে চাণক্য শ্লোক নিশ্চয় পড়েছেন?

—পড়েছি।

—তাহলে আমাকে বুঝিয়ে বলুন তো, বসুধৈব কুটুম্ বকম্ কথাটার মানে কি? বক কেন দুনিয়ার সবারই কুটুম হবে?

—আপনি যে-কথা বলছেন, চাণক্য শ্লোকে সে-কথা নেই।

—আছে, আছে, আছে। আপনি জানেন না। আপনি চাণক্য শ্লোক পড়েননি।

—তাই যদি মনে করেন, তবে মনে করুন!

—সাদা বক সত্যিই চমৎকার প্রাণী। সাদা বকের মাংস যেমন সুস্বাদু, তেমনই কোমরের বাত বিনাশ করবার অব্যর্থ ওষুধ। আপনি জানেন না।

দুই

ভাণ্ডারীজীর চাকর নন্দুর কাছ থেকে সব খবর পায় রামতনু। কামিয়া ছেলে জট্টুর খবর, আর সাদা বকের খবর। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত গুলেল হাতে নিয়ে জংলী পুকুরটার চারিদিকে ছুটোছুটি করে জট্টু। কিন্তু সাদা বকটাকে ঘায়েল করতে পারে না। বলতে গিয়ে হেসে ফেলে নন্দু—বাজে কথা, রঘুবাবুর যত সব বাজে কথা। এই দশ-দিনের মধ্যেও বকটাকে মারতে কামিয়া ছোঁড়া জট্টুর সাধ্যিই হলো না।

রামু—কিন্তু কেন সাধ্যি হলো না বুঝতে পারছি না। সেদিন আমার কথা শুনে গুলেল তুলে এক টিপেই গাছের ওপর-ডালের একটা পাকা বেলকে মেরে নামিয়ে দিল ছোঁড়া। সাংঘাতিক হাতের টিপ। কিন্তু...।

লালজিয়া বলে—কিন্তু, তাই তো, তবে বকটাকে মারতে পারছে না কেন?

নন্দু—আমার মনে হয়, এই বক সত্যিই বক নয়। বকের মতো চেহারা নিয়ে অন্য কোন আত্মা হঠাৎ ভেলাডিহিতে চলে এসেছে।

নন্দুর ধারণার কথাগুলি কানে আসতে শিউরে ওঠে রামতনু। হতে পারে, হতে পারে, অসম্ভব নয়। মহাভারতে ধর্ম বকের রূপ ধরে যুধিষ্ঠিরের কাছে দেখা দিয়েছিল। নিতান্ত একটা গল্পের ঘটনা। খুব আশ্চর্যের ঘটনা, কিন্তু ততটা আশ্চর্যের ঘটনা না হয়েও ভেলাডিহিতে আগত এই সাদা বক অন্য কোন একটা আশ্চর্যের আত্মা হতে পারে তো!

রঘুবাবু হঠাৎ এসে বেশ চড়া রকমে রাগের সুরে চেঁচিয়ে উঠলেন—আপনি আপনার চাকর নন্দুকে একটু সাবধান করে দিবেন, মোশাই। নন্দু খুব খারাপ কাজ করেছে।

—অ্যাঁ, খারাপ কাজ?

—হ্যাঁ। জট্টুকে, কামিয়া ছোঁড়াটাকে দু'দিন দুটো রুটি খেতে দিয়েছে।

—সেটা কি খারাপ কাজ?

—হ্যাঁ, ওটা নিয়ম নয়। মকাই কিংবা বজ্‌রা ছাড়া কামিয়াকে অন্য কিছু খেতে দিতে নেই। জট্টু ব্যাটার বাপ-মা চোদ্দপুরুষ কখনও রুটি খায়নি।

বাড়িয়ে বলেননি রঘুবাবু। নন্দু আর রামুয়া দেখেছে, রঘুবাবুর ঘরের দাওয়াতে একধামা

মকাই আছে। এবেলা চারটে আর ওবেলা চারটে মকাই পায় জট্টু, পুড়িয়ে নিয়ে খায়। রঘুবাবুর ভাত-ডাল রান্না হয়ে যাবার পর উনানে যেটুকু আগুন থাকে, তাতেই মকাই পুড়িয়ে নিতে হয়। আগুনের তাত না থাকলে মকাইয়ের কাঁচা দানা খেতে হয়।

খেজুর পাতার তৈরি একটা ছেঁড়া চাটাই আছে, সেটাকে কম্বলের মতো গায়ে জড়িয়ে রঘুবাবুর ঘরের উনানের এক পাশে শুয়ে থাকে কামিয়া ছেলেটা। ভোরে উঠেই উনান ধরিয়ে রঘুবাবুর ভাত চড়ায়; তারপর রঘুবাবুর কাপড় ফতুয়া ও গামছা ক্ষারের জলে ডুবিয়ে নিয়ে কাচাকাচি করে। তারপর চমকে উঠে হাত ধুয়ে ফেলে। ধমক দিয়ে হাঁক ছেড়েছেন রঘুবাবু। ...যা যা, বকটাকে এখনি মেরে নিয়ে, এখনই চলে আয়। আজ বকটাকে তুই যদি না মারিস, তবে আমি আজ তোকে মেরে ফেলবো।

গুলেল হাতে নিয়ে দৌড় দেয় জট্টু। এ দৃশ্য মাঝে মাঝে রামতনুর চোখেও পড়েছে। একদিন দুপুরবেলা আর-একটা দৃশ্য দেখে শিউরে ওঠে রামতনু। ছালা ভর্তি হরতকী মাথায় বয়ে নিয়ে আসছে জট্টু। কামিয়া ছেলেটাই তাহ'লে রোজ দুপুরে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে হরতকী তুলছে। বাঃ চমৎকার এক ভয়ানক দৃশ্য, চোদ্দ-পনের বছর বয়সের রোগা পটকা চেহারার একটা বাচ্চা মানুষের ওপর এক মণ ওজনের বোঝা! জট্টুর শরীরটার ওজন তিরিশ সের হবে কিনা সন্দেহ। এরপর রঘুবাবুর সঙ্গে রোজই রামতনুর বেশ জাঁকালো রকমের একটা তর্কাতর্কির ব্যাপার বেধে ওঠে। আজ সকালে, কাল দুপুরে, পরশু সন্ধ্যায় আর তরশু রাতের বেলাতে নন্দু লালজিয়া আর রামুয়া বেশ-একটু ভয় পেয়ে ছটফট করে। ভয় এই যে, তসীলদারবাবু বোধহয় এখনই রঘুবাবুকে মুখের ওপর একটা ঘুসি বসিয়ে দেবে। হে ভগবান, কৃপা করে হয় বকটাকে, নয় কামিয়া ছোঁড়াটাকে সরিয়ে দাও। নইলে...।

নন্দুয়াদের ভীরু স্বরের প্রার্থনার কথা শুনে রামতনুর প্রাণটাও যেন ভয় পেয়ে শিউরে ওঠে। ছেলেটা আর ক' দিন বাঁচবে? চেহারার দশা যা হয়েছে তাতে তো আর একটা মাসও বেঁচে থাকবে বলে ভরসা করা যায় না।

কিন্তু কী আশ্চর্য, পুরো দুটো মাস বেঁচে রইল জট্টু, হরতকীর বোঝা টেনে-টুনে দুটো মাস পার করে দিল। ঠিকই তো, দেখে বোঝা যায় জট্টুর রোগা চেহারাটা আর বেশী রোগা হয়নি। বরং মনে হয়, জট্টুর রোগা হাড্ডির ওপর যেন নতুন একটা শাঁস লেগেছে।

নন্দু আর রামুয়াকে ডাক দিয়ে রামতনু একটা কাজের কথা বলে। গোপন কাজের কথা। রঘুবাবু যেন জানতে শুনতে কিংবা দেখতে না পান। দশটা টাকা জট্টুর হাতে তুলে দিয়ে বলতে হবে—এখনি পালিয়ে যা জট্টু, ট্রেনে উঠে আসানসোল চলে যা। সেখানে বাবুদের বাড়িতে বাসন মাজবি আর কাপড় কাচবি। খুব ভাল থাকবি। ভাল খাওয়া, ভাল কাপড়।

পরামর্শের কথা শুনে প্রথমে হেসে ফেললো আর মুখ ফিরিয়ে নিল জট্টু। তারপর চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো—এমন কথা আমাকে বলবেন না। আমাকে প্রাণে মেরে ফেললেও আমি বাবার ঘর ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যেতে পারবো না।

বাবা, খুব চমৎকার বাবা। রঘুবাবু তাঁর কামিয়া ছেলেটাকে একদিন কিল-চড় মারতে মারতে প্রায় বেহুঁশ করে দিলেন।—তুই রোজ ফাঁকি দিচ্ছিস, তুই ইচ্ছে করে বকটাকে মারছিস না।

বাতের ব্যথায় বেঁকে যাওয়া কোমরের ওপর একটা হাত রেখে আর-এক হাতে জটুকে পিটতে থাকেন রঘুবাবু। জটুর নাক থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। চিৎকার করে কথা বলেন রঘুবাবু : বকটার সঙ্গে কি তোর কুটুম্বিতা হয়েছে রে ছুঁচো, কামিয়ার বাচ্চা কামিয়া?

জংলী পুকুরটার কিনারাতে, নরম মাটির নরম ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে কী যেন খাচ্ছে জটু। জটুর হাতে কচুপাতার একটা ঠোঙা। একদিন রামতনুর চোখে পড়েছে এই অদ্ভুত দৃশ্যটা।

ও জটু। রামতনুর ডাক শুনে চমকে ওঠে আর উঠে বসে জটু। কচুপাতার ঠোঙাটাকে লুকোবার চেষ্টা করে। রামতনু আরও জোরে হাসতে থাকে। —বেশ করেছো জটু। খাও, খাও।

ফিরে আসবার সময় পথের মাঝেই থমকে দাঁড়ায় রামতনু।—কী ব্যাপার? তাই তো, কী খাচ্ছে জটু? পানিফল? এই পুকুরে পানিফল আছে কি? হয় তো আছে।

দুই চাকর, নন্দু ও রামুয়া, এবং ধনপুরের হাটে শালের ধুনো বিক্রী করে দশ পয়সা রোজগার করে যে অতি গরীব লোকটা, যার নাম লালজিয়া, সবাই প্রায় রোজই রামতনুর কাছে এসে যে-সব ঘটনার খবর শুনিয়ে যায়, সে-সব ঘটনা যেন ভেলাডিহির জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য কোন জাদুকরের খেলার মতো অদ্ভুত এবং চমৎকার।

কামিয়া ছেলেটা রোজই সকালে গুলেল হাতে নিয়ে সাদা বকটাকে মারবার জন্য পুকুরটার কাছে ছুটে আসে বটে, কিন্তু রঘুবাবু কিছুই জানতে কিংবা বুঝতে পারে না যে, কামিয়া ছেলে এই জটু পুকুরের কাছে এসে মিটিমিটি হাসতে থাকে। হাতের গুলেল ঘাসের ওপর ফেলে রেখে ঘুরে বেড়ায়, কখনও বা পুকুরের কিনারাতে চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকে। বকটাকে গুলেল ছুঁড়ে ঘায়েল করবার কোন চেষ্টা তো করেই না জটু, বরং এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে, বকটা কোথায় গেল, কী করছে? বকটা এক-একবার জটুর মাথার এত কাছাকাছি হয়ে উড়তে থাকে যে, বকের দুই পাখার ঝাপটানির বাতাস লেগে জটুর মাথার রুক্ষ চুল ফুরফুর করে উড়তে থাকে।

না, না দেখলে বিশ্বাস করবেন না তসীলদারবাবু, তাই একদিন জটুকে পুকুর কিনারার নিরালা থেকে ধরে নিয়ে এল নন্দু আর রামুয়া।

দৃশ্যটা দেখেছে নন্দু আর রামুয়া, বকেরা যেমন করে গরু-মহিষের পিঠের ওপর বসে ও ঠুক-ঠুক করে ঠোকর দিয়ে গরু-মহিষের গায়ের পোকা বাছে আর খায়, ঠিক তেমনই করে জটুর মাথার ওপর বসে আর ঠোঁটের ঠোকর দিয়ে কী যেন খাচ্ছে। কাছে পৌঁছবার আগেই উড়ে চলে গেল বকটা। দেখতে পায় নন্দু আর রামুয়া, সত্যিই তো পোকা, কুচি কুচি গুবরে পোকার মতো চেহারা অজস্র পোকাতে জটুর মাথাটাকে যেন ছেয়ে ফেলেছে।

রামুয়া—এই দেখুন বাবু, চোখ মেলে একবার দেখুন, জটুর মাথার এই পোকা মেরে খাচ্ছিল জটুর মাথার ওপর বসে সেই সাদা বকটা।

রামতনু—তোমার মাথাতে এত পোকা এল কেমন করে, কোথা থেকে?

জটু বলে—জঙ্গলের হরতকী গাছের পোকা।

না, খুব বেশী আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। বক একটু সাহসী হয়ে একটা ছেলে-মানুষের মাথার চুলের পোকা খাবে, সেটা কী আর এমন অদ্ভুত ব্যাপার? কিন্তু খুব বুঝতে পারা যাচ্ছে, জটু আর সাদা বকটার মধ্যে বেশ ভালরকমের একটা ভাব-সাবের ব্যাপার ঘটে গিয়েছে।

রঘুবাবু রাগ করে জট্টুর খোরাক অর্ধেক করে দিয়েছেন। ভাল কাজ করতে পারে না, হরতকীর বোঝা ভাল মত টানতে পারে না। আর সাদা বকটাকে মারতেই পারলো না। এসব তো কামিয়া ছোঁড়াটার ধূর্ত মতলবের কাণ্ড! ফাঁকিবাজি! না, জট্টুকে রোজ এবেলা আর ওবেলা চারটে করে মকাই খেতে দেওয়া হবে না। জট্টুর ফাঁকিবাজির শাস্তি, ওকে দুটো করে মকাই খেতে দেওয়া হবে।

এরপর একটি ঘটনা চোখে দেখতে পেয়ে নন্দু আর রামুয়ার দুই চোখ নয়, দুই প্রাণও ভক্তিতে ভরে গিয়েছে। সাদা বকটা সত্যিই তো একটা আত্মা, নইলে জট্টুকে মাছ খাওয়াবে কেন?

তাই ঘটনা দেখে মনে করেছে নন্দু আর রামুয়া, ভুখ্‌খা জট্টুর দুঃখটাকে বুঝে ফেলে এই সাদা বক। বকটা আজকাল জট্টুকে মাছ খাওয়ায়। এখন বুঝুন, ছেলেটার ঝিরকুটে শরীরে কেন শাঁস ধরেছে।

রামতনু হাসে।—কেমন করে বুঝলে? নিজের চোখে দেখেছো কি, সত্যিই বকটা জট্টুকে মাছ খাওয়াচ্ছে?

নন্দু—মাছ খাওয়াতে দেখিনি। তবে দেখেছি, জট্টুর হাতে শালুকপাতার ছোট্ট একটা ঠোঙা, চিৎপাত হয়ে শুয়ে কী যেন খাচ্ছে জট্টু। আর বকটা পুকুরের ধারে নিমগাছের ডালের ওপর বসে উসখুস করছে আর জট্টুকে দেখছে।

রামতনু—কিন্তু এটা কি নিজের চোখে দেখেছো যে শালুকপাতার ঠোঙা থেকে মাছ তুলে নিয়ে খাচ্ছে জট্টু?

নন্দু—না, তা দেখিনি, কিন্তু...।

রামতনু—কিন্তু মাছ নয়, জট্টু বোধহয় পুকুর থেকে দু'চারটে পানিফল তুলে নিয়ে...।

রামুয়া—না, পানিফল নয়, বাবু। পানিফল খেতে হলে শালুক পাতার ঠোঙা দরকার হয় না।

রামতনু—যদি সত্যিই মাছ খেয়ে থাকে জট্টু, তবে বুঝতে হবে যে, নিজের হাতে মাছ ধরে নিয়ে সেই মাছ কাঁচা-কাঁচাই খেয়ে ফেলে বেচারা।

নন্দু আর রামুয়া একসঙ্গে কথা বলে প্রতিবাদ করে।—না বাবু, না। প্রায় রোজই তো দেখছি, কোনদিনও চোখে পড়েনি যে, জট্টু হাত দিয়ে পুকুরের মাছ জল থেকে ছেঁকে নিয়ে তুলছে। তাছাড়া, হাত দিয়ে ওই ছটফটে পুঁচকে মাছ ছেঁকে তোলা সম্ভবই নয়।

প্রশ্নটা আরও জোর নিয়ে রামতনুর সারা মনটাকে যেন ছেয়ে ফেলছে। সত্যিই কি তাই? সত্যিই কি বকটা মাছ ধরে, ধরে জন্মদুঃখী কামিয়া ছেলেটাকে খাওয়ায়? তবে তো নন্দু আর রামুয়াই ঠিক কথা বলেছে। ওটা বক নয়, ওটা অন্য কোন আত্মা, বকের চেহারা ধরে ভেলাডিহির জংলী পুকুরের চারদিকে ঘুরোঘুরি করছে।

কামিয়া ছেলে এই জট্টুর শীতকালের পোষাক দেখে বাঁশ-বাদাড়ের শজারুও বোধহয় হেসে ফেলবে। একটা ছেঁড়া কম্বলের আসনের মাঝখানে একটা বড় ফুটো করা হয়েছে, তারই ভিতর দিয়ে মাথা গলিয়ে শীতের সাজ পরেছে জট্টু। শীতের কোন পৌষ-মাঘ এখনও আসেনি বটে, কিন্তু খুব হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। নন্দু আর রামুয়া জট্টুর এই বিচিত্র জামাটার দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করে।—যাক্, রঘুবাবুর মতো একটা ইয়ের মনেও দয়া আছে তাহলে।

জট্টুর মেহনতের কিন্তু শীত-গ্রীষ্ম নেই। রোজই দেখা যায়, হরতকীর বোঝা মাথায় নিয়ে,

টলতে টলতে, কখনও বা খোঁড়াতে খোঁড়াতে, কখনও বা হোঁচট খেয়ে-খেয়ে জঙ্গলের পথ ধরে ঘরের দিকে ফিরে আসছে জট্টু।

নন্দু ও রামুয়াকে একদিন জট্টুর গায়ের কদর্য চেহারার কম্বল-টুকরোটার দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করতে দেখে খুব রাগ করলেন রঘুবাবু। কাছে এসে বললেন—কিসের এত হাসহাসি? কামিয়া ছেলেটার গায়ের জামা দেখে?

নন্দু—হ্যাঁ বাবু।

রঘুবাবু—জেনে রাখ, আমি তোমাদের তসীলদারবাবুর মতো বাজে রকমের দয়াবাজি করি না। যা করি, খাঁটি দয়ার কাজ করি। কোন এই বয়সের কামিয়া ছেলে জামা গায়ে দেয় না। ওটা নিয়ম নয়। তবু আমি, নিতান্ত নরম মনের মানুষ বলে কামিয়া ছেলেটাকে একটা গরম জামা দিয়েছি।

কদিন পরে অনেকেরই চোখে পড়ে, কামিয়া ছেলে জট্টু যেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে হাঁটছে।—কী ব্যাপার, অসুখ-টসুখ হলো না কি? এ জট্টু? লালজিয়ার ডাক শুনে থমকে দাঁড়ায় জট্টু। হাসতে চেষ্টা করে জট্টু। জবাব দেয়—বাবা বলেছে, আমার কোন বিমারী হয়নি।

বিমারী হয়নি, ভাল কথা। কিন্তু ছেলেটা দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে কেন? পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই আবার ডিগডিগে হয়ে গেল জট্টু। আগের মতো নয়, আগের চেয়েও বেশি ডিগডিগে।

যারা কামিয়া ছেলেটার খোঁজ রাখতে চেষ্টা করে, তারাই জানতে পেরেছে, এরই মধ্যে একদিন খুব বমি করেছে জট্টু, বমির মধ্যে রক্তও আছে।

দেখতে পায় নন্দু, জট্টুর গলাটা বিশ্রী রকমের একটা ঘড়ঘড় শব্দ করছে। জট্টু বলেও ফেলেছে—বুকে ব্যথা।

একে একে জট্টুর শারীরিক অবস্থাটার নানা রকমের খবর রামতনুর কাছে পৌঁছে দিয়ে আর চিন্তিত হয়ে বেশ বিষণ্ণ হয় নন্দু, রামুয়া আর লালজিয়া। না, আর চুপ করে থাকা উচিত নয়। বেশ একটু উত্তেজিত মন নিয়ে রঘুবাবুকে প্রশ্ন করে রামতনু।—ছেলেটার অসুখ করেছে। তবু আপনি ওকে খাটাচ্ছেন?

রঘুবাবু—হ্যাঁ, তা তো বটে। কামিয়া যদি না খাটে, তবে কে খাটবে?

রামতনু—ছেলেটার তো অসুখ হয়েছে, ভুলে যাচ্ছেন কেন?

রঘুবাবু—কামিয়ার অসুখ হয় কেন? হবে কেন?

রামতনু—বাজে কথা বলবেন না। ছেলেটার জন্য একটু ওষুধের ব্যবস্থা না করলে চলবে কেন?

হেসে ফেলেন রঘুবাবু।—ওষুধ? কামিয়া কি বিলিতী কুকুর যে অসুখ হলে ওষুধ খাওয়াতে হবে? কামিয়ারা ওষুধ খায় না। ওদের ওষুধ খাওয়ার দরকার হয় না। আপনি কিছুই বোঝেন না, জানেনও না। তাই মিথ্যে দয়াবাজি করছেন।

ওরে জট্টু, এ জট্টু এখানে আয়।

জট্টু আসতেই জিজ্ঞাসা করেন রঘুবাবু। —কী রে, ওষুধ খাবি?

ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে জট্টু। — না না, কভি না।

রঘুবাবু—শুনলেন তো। এখন বুঝুন, কেমন করে কী দয়াবাজি করবেন।

এরপর একদিন যে ঘটনার আওয়াজ শুনতে পেল নন্দু আর রামুয়া, সেটা হলো রঘুবাবুর প্রমত্ত গালাগালি আর ধমকের আওয়াজ। দাওয়ার ওপর কিংবা বাইরে, কোথায় যে বসে আছে জট্টু, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। রঘুবাবুর রাগ ফেটে পড়ছে আর বলছে।—অসুখ হয়েছে; কাজ করতে পারছিস না। তবে তুই তো প্লেগের ইঁদুর হয়ে গিয়েছিস। মরে যা, মরে যা। চলে যা, চলে যা।

কদিন পরেই একদিন অমাবস্যার রাত্রিতে খুব জোর বৃষ্টি হয়ে গেল। ভেলাডিহির জঙ্গলে যেন হাজার হাজার ঝর্ণার প্রাণ কলকল করে জেগে উঠেছে। বৃষ্টি থামলো মাঝ রাতে, নতুন ঝর্নার কলরব থামলো শেষরাতে।

ওয়াক্ ওয়াক্ ওয়াক্!

উড়ে উড়ে শেষ রাতের অন্ধকার আর ভিজে বাতাসে একটা করুণ আতঙ্কের ডাক ছাড়ছে বকটা। ওই সাদা বকটা তো নিশাচর জাতের বক নয়, তবে কেন শেষ রাতের অন্ধকার ফিকে না হতেই উড়তে শুরু করছে। কী হলো? সন্দেহ হয়, কোন না কোন একটা খারাপ রকমের ব্যাপার ঘটেছে।

সকালবেলার প্রথম রোদ ফুটে উঠতেই রঘুবাবু এসে হাঁকডাক শুরু করেন।—এ তসীলদারবাবু, এ রামতনুবাবু। তাড়াতাড়ি একবার বাইরে আসুন। হতভাগা কামিয়া ছোঁড়াটাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। কাল দুপুরে দেখতে পাইনি, বিকেলেও না, রাত্রিতেও না। আজও দেখতে পাচ্ছি না, যদিও সকাল হয়ে গিয়েছে। রাত্রির বৃষ্টির জলের নতুন ঝর্ণাতে ছোঁড়া সত্যিই ভেসে গিয়েছে নাকি? নইলে এখনও দেখা দিচ্ছে না কেন?

ঠিক এই দুশ্চিন্তায় এই দুটো দিন সব সময় ছটফট করেছে নন্দু রামুয়া আর লালজিয়া। জট্টুকে কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। দু'দিন আগে হরতকীর জঙ্গলে যাবার সময় জট্টুকে দেখতে পেয়েছিল নন্দু, জট্টুর গলার ভিতরে যেন দম বন্ধ হয়ে একটা ব্যথা ঘড়ঘড় করছে। বুকটা ধুঁকছে। কিন্তু...খুব মিনতি করে একটা কথা বলেছে জট্টু—কিন্তু বাবাকে কখনও আমার অসুখের কথা বলবেন না, নন্দুজী।

রঘুবাবু এখন বলছেন—দুদিন ধরে খুঁজছি, কোথাও ছোঁড়াকে দেখতে পাচ্ছি না। এদিকে আমার কষ্ট, আমার ক্ষতি দুইই যে আর সহ্য হচ্ছে না। দুদিন হাত পুড়িয়ে ভাত রেঁধেছি। হরতকী তোলবার কাজ বন্ধ হয়েই রয়েছে কামিয়া বাচ্চা কামিয়া আমাকে কী যন্ত্রণাই না দিচ্ছে।

ভেলাডিহির কাছারিবাড়ি এলাকার প্রায় সব ঠাঁই খোঁজাখুঁজি করা হলো। না, কামিয়া জট্টু কোথাও নেই। দেখা গেল, রঘুবাবুর ঘরের ভিতরেও কেউ নেই, কাঁচা বাঁশের খাটিয়ার নীচে একটা কম্বলের টুকরোর ওপর একটা বিড়াল ঘুমিয়ে রয়েছে। ঘরের দাওয়ার ওপরেও কেউ নেই। জট্টুর মকাইয়ের ঝুড়ির মধ্যে খুব শুকনো তিন-চারটে সিড়িঙ্গে মকাই পড়ে রয়েছে। চেঁচিয়ে ওঠে নন্দু—কী আশ্চর্যের কথা, খেজুর পাতার সেই ছেঁড়া চাটাইও নেই, যেটা গায়ে জড়িয়ে দাওয়ার ওপর শুয়ে ও ঘুমিয়ে পড়ে থাকতো, বেচারা জট্টু।

চেঁচিয়ে ওঠে লালজিয়া। আরে, এই তো এখানে শুয়ে রয়েছে জট্টু। ছেঁড়া চাটাই গায়ে জড়িয়ে একেবারে নিরেট ঘুম ঘুমিয়ে নিচ্ছে ছেলেটা।

নিরেট ঘুম। কথাটার মানে কি? সবাই এগিয়ে যেয়ে দেখতে পায়, হরতকীর গাদার একপাশে শুয়ে রয়েছে, ঘুমিয়ে আছে কামিয়া ছেলে জট্টু। আর, কয়েকটা ছোট-ছোট-মরা বেলেমাছ জট্টুর মুখের কাছে মাটির ওপর পড়ে আছে। জট্টুর মুখ থেকে লালা গড়িয়ে মাটি ভিজিয়ে দিয়েছে।

মরে রয়েছে জট্টু। রঘুবাবুর মুখের দিকে কটমট করে তাকায় আর চেঁচিয়ে ওঠে রামতনু। —স্পষ্ট করে সত্যি করে বলুন, জট্টু মরলো কেন?

হেসে ফেলেন রঘুবাবু।—এত দুঃখের মধ্যেও আপনার কথা শুনে হেসে ফেলতে হচ্ছে। আমাকে নয়, ভগবানকে জিজ্ঞেসা করুন, কেন মরলো।

আবার হেসে ফেলেন রঘুবাবু।—মরা জট্টুর মুখের কাছে এই সব মাছ এল কোথা থেকে, কে পাঠালো? আমার তো ভাবতে বেশ ভয় করছে আবার মজাও লাগছে।

নন্দু বলে—আমি জানি, এই মাছ কোথা থেকে এসেছে, কে দিয়ে গিয়েছে?

রঘুবাবু—কে?

নন্দুর দুই চোখ ছলছল করে—যে আত্মা জট্টুকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল, সে।

—কে সে?

রামতনু বলে—সে আপনার মতো একটা মানুষ নয়, সে হলো একটা অমানুষ প্রাণী, একটা সাদা বক, যার মাংস খাওয়ার জন্য আপনার পেটে রাক্ষুসে ক্ষুধা জ্বলছে।

হো হো করে হাসতে থাকেন রঘুবাবু।—আপনারা কেউই তো এখন গাঁজা খাননি, তবে এরকমের কথা বলছেন কেন? বক বাঁচিয়ে রাখতে চাইবে মানুষকে? বক কি মানুষের কুটুম? বক কি দ্বারভাঙ্গার শিশিরবাবুর মতো পাকা ডাক্তার? বক কি বুঝে ফেলেছিল যে, জট্টুর বুকের সর্দি বসে গিয়েছে?

রামতনু—কী বললেন? ছেলেটার বুকে সর্দি বসে গিয়েছিল?

—হতে পারে।

—আমার সন্দেহ, ছেলেটার নিউমোনিয়া হয়েছিল।

রামতনু—হতে পারে। ভগবান জানেন।

টুপ করে একটা শব্দ হয়। কী অদ্ভুত কাণ্ড। মরা জট্টুর বুকের ওপর একটা জ্যান্ত লেঠা মাছ টুপ করে পড়েছে আর ছটফট করছে।

এ কী? এ কী? গাছ থেকে মাছ ঝরে পড়লো কেন?

সবাই যেন একসঙ্গে আশ্চর্য হয়ে আর চোখ তুলে গাছের মাথার দিকে তাকায়। সেই মুহূর্তে একটা ধবধবে সাদা মায়ার ছবির মতো, একটা সাদা বক গাছের ডাল ছেড়ে দিয়ে উড়ে যায়। সকাল বেলার সোনালী রোদের আভা সাদা বকের পাখনা দুটোর ওপর কী চমৎকারই না একটা রূপের জলুস ঢেলে দিয়েছে।

রামতনু বলে—এইবার দেখলেন তো, বুঝলেন তো, জট্টুকে কে মাছ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল।

মুখের চেহারা যতদূর সাধ্যি বিশ্রী ও বিকৃত করে জবাব দেন রঘুবাবু—হ্যাঁ বুঝেছি, বসুধৈব কুটুম্ বকম্, চাণক্য যা বলেছেন তাই সত্যি। থামুন, এবার আর মিথ্যে তর্ক করবেন না।

রামতনু—না, আর তর্ক করবো না। কিন্তু থানাতে ডায়রী করাবো, আপনি জন্তুকে না খাইয়ে খাইয়ে আর মারধর করে মেরে ফেলেছেন।

রঘুবাবুর মাথাটা থরথর করে কেঁপে ওঠে। —এরকম একটা মিথ্যে নালিশ করলে আমার তো সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। আমার কালাপানি শাস্তি হলে আপনার মতো দয়ালু মানুষ কি খুশি হবে?

রামতনু—হবে, সবচেয়ে বেশি খুশি হবে কে জানেন?

—কে?

—ওই সাদা বকটা।

মিঠুয়া জঙ্গলের সবই মিষ্টি

এই জঙ্গলটার নাম, মিঠুয়া। যেমন নামে, তেমনই রূপেও মিষ্টি।

আরও বলতে হয়, জঙ্গলটাকে শুনতেও মিষ্টি। তার মানে, এত বেশি পাখি এবং তাদের কলরবের এত মিষ্টি স্বর অন্য কোন জঙ্গলের বাতাসে বাজে না। মিঠুয়া জঙ্গলের ভিতরে যেমন পিয়াল গাছের ভিড়, তেমনই শিমূল পলাশ আকাশনিম আর অর্জুনের ভিড়। গাছে ফুল ধরলে মিঠুয়া জঙ্গলের রূপ খুলে যায়, বড়ই মিষ্টি রূপ। ঠাকুরসাহেবদের সম্পত্তি এই মিঠুয়া জঙ্গলের ভিতরে তসীল কাছারির দাওয়ার ওপর বসে জঙ্গলের মিষ্টি চেহারা দেখে দেখে আর হরেক রকমের পাখির মিষ্টি কাকলি শুনে শুনে রামতনুর মনে সত্যিই একটা মিষ্টি স্বাদের আবেশ থম্‌থম্‌ করে। মনে মনে স্বীকার করে রামতনু, তসীলের কাজে মিঠুয়াতে বদলি হয়ে এসে ভালই হয়েছে। আগে বেশ সন্দেহ হয়েছিল, রামগড়ের মত একটা শহুরে জায়গার খুব কাছের এই মিঠুয়া জঙ্গলে শহুরে হৈ-হুল্লোড়ের আনাগোনার দৌরাত্ম্যে ছায়াময় শান্তি ও স্বস্তির প্রাণ নিশ্চয়ই সর্বক্ষণ ত্যক্ত-বিরক্ত হয়। কিন্তু না, তা নয়। মিঠুয়া জঙ্গলের শান্তি আর জঙ্গলের ভিতরে মিঠুয়া নামের ছোট্ট বস্তিটার শান্তি বিঘ্নিত করবার মত কোন দুরন্ত চঞ্চলতা চিৎকার করে কিংবা ধুলো উড়িয়ে রামগড় থেকে ছুটে আসে না।

দেখে জেনে আর শুনে খুশি হয় রামতনু। কাছারির ভাণ্ডারী যুগলবাবু সপরিবারে এই জঙ্গলের ভিতরে মিঠুয়া বস্তির একটি মাটির বাড়িতে বিশ বছর ধরে রয়েছেন। আর, ওই অর্জুন গাছের ভিড়ের ফাঁক দিয়ে যে মেটে দেয়ালের বাড়িটাকে দেখা যায়, যার মাথার ওপর খাপ্‌রার চাল, সে বাড়িতেও আজ ত্রিশ বছর ধরে সপরিবারে বাস করছেন ভরতবাবু। তাঁর ছেলে সাইকেলে চড়ে রোজই রামগড়ে যায়। কন্ট্রাক্টর গুপ্ত অ্যাণ্ড কোং, অর্থাৎ গুপ্ত কোম্পানী রামগড় এলাকায় সরকারী ঘর-বাড়ি কালভার্ট আর সড়ক তৈরি করবার যে-কাজ আজ প্রায় দশ বছর ধরে চলছে, সেই কাজেরই একজন তদারক মুহুরীবাবু, ভরতবাবুর ছেলে মনোহরকুমারের পঁচিশ বছর বয়সের চেহারাটাও বেশ মিষ্টি, অর্জুনের কাঁচা মঞ্জরির মত। ভরতবাবু অনেকদিন আগে এই জঙ্গলেরই একটা গাছের শিকড় যোগাড় করে নিয়ে গিয়ে ছোট ঠাকুরসাহেবের দশ বছরের হাঁপানি সারিয়ে

দিয়েছিলেন। উপকৃত ছোট ঠাকুরসাহেব ভরতবাবুকে এই মিঠুয়া জঙ্গলের তিন বিঘে জমি দান করে দিয়েছিলেন। তিন বিঘে জমিতে ভুট্টার ফলন যা হয়, তাই বেচে ভরতবাবুর পারিবারিক জীবনের খাওয়া-পরার দায় মোটামুটি মিটেই যায়। তার ওপর এই তিন বছর ধরে আরও একটা আয়ের সৌভাগ্য এসেছে। ছেলে মনোহরকুমারের চাকরি। ঠিকেদার গুপ্ত কোম্পানীর কাছে তদারকী মুহুরীর কাজ, মাইনে পঁচিশ টাকা।

মিঠুয়া জঙ্গলের বাইরের জগতের মানুষ হলেও এঁদের জীবন এই বিশ বছরের মধ্যে যেন জঙ্গলের ছায়ার স্নেহ পান করে করে মিষ্টি হয়ে গিয়েছে। পিয়ালের হাওয়া একটু উতলা হতেই দেখা যায়, ভাণ্ডারী যুগলবাবুর মেয়ের মিষ্টি মুখের হাসি আর এলোচুল দুই উতলা হয়ে উঠেছে। তসীলদার রামতনুর কাছে মন খুলে যুগলবাবু তাঁর দুশ্চিন্তার একটা কথা এরই মধ্যে বলে ফেলেছেন—আমার এই মেয়ের বিয়ে হবে কেমন করে?

রামতনু—কেন, বিয়ের খরচ যোগাবার মত টাকা-পয়সা কি...

যুগলবাবু—না, রামতনুবাবু। টাকার অভাব আছে বটে, তবু সেটা খুব বড় একটা সমস্যা নয়। সমস্যা হল, আমার মেয়ে এই বিমলার স্বভাবটা। ওর বয়স এখন বিশ বছর, তবু বেশি বয়সটাও কোন সমস্যা নয়। সমস্যা হল, মেয়েটা এই জঙ্গলের বাইরের কোন আলো-ছায়া আর জল-বাতাসকে সহ্যই করতে পারে না। গিরিডিতে ওর মামার বাড়িতে গিয়ে একটা সপ্তাহও টিকে থাকতে পারে না বিমলা। সর্বদা ভয়-ভয় ভাব, সামান্য একটা আওয়াজ শুনলেই চমকে ওঠে। ক্ষিদে হয় না, খেতে পারে না। মামী আশ্চর্য হয়ে কোন কথা জিজ্ঞেসা করলে কেঁদে ফেলে। এই এক মিঠুয়া জঙ্গল ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোথাও কোনও সুখ-শান্তি নেই, কোন মায়া-মমতা নেই, এই রকম একটা বিশ্বাস যেন ওর প্রাণেরই ভিতরে শক্ত হয়ে বসে আছে। আমারও সত্যি বড় ভয় করে, রামতনুবাবু। যদি পাটনা, গয়া, রাঁচির কোন পাত্রের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দিই, তবে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে দশটা দিনও বোধ হয় বেঁচে থাকবে না আমার মেয়ে, মরেই যাবে।

যুগলবাবু চোখ মুছে নিয়ে একটা হাঁফ ছাড়লেন, আর, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন, চেঁচিয়ে উঠলেন—ওকী, ওকী, ওকী!

দেখতে পায় রামতনু, যুগলবাবু তাঁর মাটির বাড়ির একটা একচালা ঘরের মাথাটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে কী যেন দেখছেন।

রামতনু—কী ব্যাপার, ভাণ্ডারীজী?

যুগলবাবুর গলার স্বরে যেন একটা উতলা বিস্ময়ে আবেগে কাঁপতে থাকে। যুগলবাবু বলেন—আমি যে চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না, রামতনুবাবু।

রামতনুবাবু—কী দেখছেন?

যুগলবাবু—ওই যে দেখছেন, আমার বাড়ির ওই একচালা ঘরটার মাথার উপর আমগাছের একটা ডাল এলিয়ে পড়ে রয়েছে, সেখানে যত হাবিজাবি কাঠ কাঠি কঞ্চি আর ছেঁড়া চটের টুকরো ও ছেঁড়া ঝাঁটার জঞ্জাল দিয়ে তৈরি একটা পাখির বাসা দেখতে পাচ্ছেন কি?

রামতনু—হ্যাঁ।

যুগলবাবু—ওটা নীলকণ্ঠ পাখির বাসা। বিশ বছরের মধ্যে আমি এই বাসাটাকে কখনও শূন্য

হয়ে থাকতে দেখিনি। এক নীলকণ্ঠ গিয়েছে তো অন্য নীলকণ্ঠ এসেছে। শুনলেন তো কী বিশ্রী কর্কশ স্বরে ডাক দিয়ে নীলকণ্ঠটা উড়ে গেল।

রামতনু—না, শুনতে পাইনি।

যুগলবাবুর দুই চোখের বিস্ময় এবারে জ্বলজ্বল করে। গলার স্বর কর্কশ হলে হবে কি? নীলকণ্ঠ হল মহাদেবের ইচ্ছার দূত। বেশ বড় রকমের একটা সৌভাগ্যের শুভযোগ আসন্ন হলে তবেই নীলকণ্ঠ উড়ে গিয়ে অনেক উঁচু আকাশে চক্কর দিয়ে ঘুরতে আর ভাসতে থাকে। ওটা একটা লক্ষণ, জানিয়ে দেয় নীলকণ্ঠ, আসছে, আসছে শীগগিরই একটা শুভ ঘটনা ঘটবে।

যুগলবাবুর দুই বিস্ময়ভরা চোখ আবার ভিজে গিয়ে চিকচিক করে—আমি তো আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলাম রামতনুবাবু। কখনও ভাবিনি যে, আমাদের ওই নীলকণ্ঠ কখনও উড়ে গিয়ে উঁচু আকাশে ভাসবে।...ওই ওই দেখুন রামতনুবাবু, নীলকণ্ঠ কত উঁচু আকাশে উঠে আমাদের এই মিঠুয়া জঙ্গলের মাথার ওপর ভাসছে আর পাক দিয়ে উড়ছে।

রামতনু—হ্যাঁ, তাই তো দেখছি।

যুগলবাবু—না, এইবার একটা শুভ সৌভাগ্যের ব্যাপার না হয়ে যায় না।

দুই

শুভ সৌভাগ্য বলতে কী বলছেন ও কী বোঝাতে চাইছেন যুগলবাবু, সেটা খুব স্পষ্ট না করে হোক, একটু অস্পষ্ট করেই বুঝতে পারে রামতনু। এইবার ও এতদিনে তাঁর মেয়ে বিমলার বিয়ে ভালয়-ভালয় হয়ে যাবে, এই তাঁর বিশ্বাস। উঁচু আকাশে উড়ে উড়ে নীলকণ্ঠটা এই বিশ্বাসেরই বিলক্ষণ সংকেত যুগলবাবুকে জানিয়ে দিয়েছে।

মিঠুয়া জঙ্গলের পাখির জীবনের চমৎকার এক সমারোহের দৃশ্য দেখে আর মুগ্ধ হয়ে রামতনুর মনের চিন্তাতেও যেন মিষ্টি রকমের কলরব মাঝে মাঝে বেজে ওঠে। তার মধ্যে বাংলার প্রফেসর সেই চারুবাবুর গলার স্বর শুনতে পায় রামতনু। পাখিরা আমাদের এই পার্থিব জীবনের রূপ ও প্রকৃতির মধ্যে যেন একটি পুণ্যময় বিস্ময়। কোটি বছর আগে গম্ভীর পৃথিবীর গম্ভীর বাতাসে প্রথম মিষ্টি শব্দ সঞ্চারিত করেছিল, যে তারই নাম পাখি। এটা বোধ হয় মহা-মহা প্রকৃতিবিজ্ঞানী মহাশয়েরাও স্বীকার করবেন। কিন্তু আমি যদি বলি, পাখিরাই ডেকে-ডেকে সূর্যোদয় ঘটায় তবে কি খুব ভুল কথা বলা হবে?

সেদিন রামতনুই চারুবাবুকে পাল্টা প্রশ্ন করেছিল—কিন্তু একথা বললে কি খুব একটা সত্যি কথা বলা হবে?

চারুবাবু হেসেছিলেন—তোমাদের বিচারবুদ্ধিতে যা বলে তাই তোমরা বিশ্বাস কর। কিন্তু আমিও হোরাশিওদের কাছে এই কথা জোর গলায় বলব যে, স্বর্গে-মর্ত্যে এমন অনেক সত্য কাজ করছে, যার পরিচয় তোমাদের দার্শনিক বিজ্ঞতার পক্ষে স্বপ্নেও দেখা সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিকের পক্ষেও সম্ভব নয়।

আজ এখন মিঠুয়া জঙ্গলের ভিতরে কাছারিবাড়ির দাওয়ার ওপর বসে প্রফেসর চারুবাবুকে আর ওইরকম প্রশ্ন করতে রামতনুর মনটা একটুও উৎসাহ বোধ করে না। রামতনুর মনে বরং

অন্য একটা প্রশ্ন মুখর হয়ে বাজতে থাকে। বাইবেলের এ যুগে কি সলোমোনের মত দ্বিতীয় কোন জ্ঞানীর আবির্ভাব সম্ভব নয়, যিনি পাখির ভাষা বুঝতে পারেন? এই যে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জঙ্গলের বাতাসে নানা রূপের নানা পাখির কলরবের গীতালি বাজতে থাকে, তার মধ্যে কি কোন ভাষা নেই? তার মধ্যেও কি সুখ-দুঃখ ও আনন্দের কোন বার্তা নেই? থাকতে পারে। রামতনুর মুগ্ধ মনের গভীরে এই বিশ্বাসের গুঞ্জন চলতে থাকে। প্রফেসর চারুবাবুর দার্শনিক ধারণা যদি সত্য হয়, তবে এটাও সত্য যে পাখিদের ভাষা আছে। আর ভাণ্ডারী যুগলবাবু নীলকণ্ঠ পাখির যে গল্প শোনালেন, তার মধ্যে কিছু সত্য যদি থেকে থাকে, তবে তো বিশ্বাস করতেই হয় যে, পাখিরা তাদের নিজেদের ইচ্ছার গুণে ঘটনা তৈরি করতে পারে। চারুবাবু যেমন বলতেন, পাখিরা জেগে উঠে আর ডাক দিয়ে ভোরের আকাশে আলো জাগিয়ে তোলে। ভোরের আকাশে আলো জাগে বলে পাখিরা জেগে ওঠে, এটা প্রাকৃতিক নিয়মের আসল সত্য না হতেও পারে।

কিন্তু কই, নীলকণ্ঠ উড়ে গিয়ে উঁচু আকাশে ভেসে বেড়াবার পর তো অনেকগুলি দিন পার হয়ে গেল। আগন্তুক শুভ ঘটনার কোন মূর্তি তো দেখতে পাওয়া গেল না।

রামতনুর চিন্তাগুলিকে চমকে দিয়ে সত্যিই এক আগন্তুকের মূর্তি কাছারিবাড়ির বারান্দাতে উঠে হেসে ফেলে আর কথা বলে—আমি মিঠুয়া জঙ্গলের সব বাঁশের ঝাড় কিনে নিয়েছি। আপনাদের মালিক ঠাকুরসাহেবদের দপ্তরে টাকা জমা দিয়েছি, মোট দেড় হাজার টাকা। খবরটা পেয়েছেন নিশ্চয়?

রামতনু—হ্যাঁ পেয়েছি। বড় কম টাকায় অনেক বেশি দামের জিনিস আপনি বাগিয়ে ফেলেছেন।

আগন্তুক বেশ বিরক্ত হয়ে কথা বলে—সেটা তো আপনার বিচারের বিষয় নয়।

রামতনু—যা-ই হোক। আমার এখন কর্তব্য, আপনার থাকবার মতো একটা ঘরের ব্যবস্থা করা।

আগন্তুক—একটা বড় ঘরের ব্যবস্থা করবেন। আমি আছি, আমার সঙ্গে একজন চাকরও আছে। তাছাড়া আমার বাঁশের হিসেব রাখবার জন্য একজন সরকারবাবুও আছে।

আগন্তুক এই ব্যক্তির নাম, পরেশনাথ। বেশ ফর্সা ও বেশ তেজী চেহারার মানুষ। বয়সও ত্রিশের বেশি নয় বলে মনে হয়। কাছারিবাড়ির লাগোয়া একটা বেশ বড় ঘরে আগন্তুক পরেশনাথের থাকবার ব্যবস্থা করে দেবার পর দুটি দিনও পার হয়নি, দেখে আশ্চর্য হয় রামতনু ভাণ্ডারী যুগলবাবুর বাড়ির কাছের পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে পরেশনাথ। আর, ওদিকে যুগলবাবুর বাড়ির একটি ঘরের জানালার কছে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছে বিমলা। বিমলা যেন মুখ টিপে অদ্ভুত রকমের একটা মিষ্টি নরম হাসিকে দুই ঠোঁটের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে।

রামতনুর দুই চোখ থেকে সন্দেহের ছায়াটা হঠাৎ সরে গেল। কারণ বিমলার মুখের হাসির সত্যিকারের কারণটা বুঝতে পারা গেল। শুনতে পেয়েছে রামতনু, যুগলবাবুর স্ত্রী এসে ডাক দিয়েছেন—কীরে মেয়ে, হাসছিস কেন?

বিমলা—কোকিলগুলো কী সুন্দর ডাকছে মা।

ঠিকই, কী সুন্দর ডাকছে কোকিলগুলো। একটা দুটো নয়, মিঠুয়া জঙ্গলের অনেক কোকিল। কুহু! কুহু! কুহু! কী চমৎকার মিষ্টি স্বরের ডাক। জীবনে কত বার কত কোকিলেরই তো ডাক

শুনেছে রামতনু। কিন্তু সে ডাক আজকের এই মিঠুয়া জঙ্গলের কোকিলের ডাকের মতো বিহ্বল এক আবেগের বুক থেকে ঝরে-পড়া নিবিড় মধুরতার উৎসার নয়। কিন্তু জানালার দিকে দুই চোখের অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখে ওই যে পরেশনাথ হাঁটাহাঁটি করছে সে কী শুনতে পেয়েছে বিমলার দুঃখের কথাগুলি? শুনতে পেলেও সে-কথার অর্থ কি বুঝতে পেরেছে?

না, কিছুই বুঝতে পারেনি। কারণ মিঠুয়া জঙ্গলের বিশ বছর বয়সের ওই মেয়ের প্রাণের স্বভাবটার কোন খবর রাখে না পরেশনাথ।

দেখতে পেয়ে বেশ বিরক্ত হয় রামতনু। এইবার একেবারে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আর হাসছে পরেশনাথ। কিন্তু খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা বিমলার দুই চোখে যেমন কোন বিস্ময়ের জ্বলজ্বলে উদ্ভাস নেই, তেমনই কোন ভ্রূকুটিও নেই। বিমলা কি তবে এতদিন পরে একজন অচেনা আগন্তুককে...

নীলকণ্ঠ কি তবে এইরকম একটা ঘটনার সঙ্কেত জানাবার ইচ্ছায় উঁচু আকাশে উড়ে উড়ে ঘুরেছিল? এটা কি তবে একটা শুভযোগের ঘটনা? ভগবান জানেন।

হঠাৎ নিজের মনে হেসে ফেলে রামতনু। সরোজিনী নাইডুর একটা কবিতার কথা শোনাতে গিয়ে প্রফেসর চারুবাবু হেসে ফেলতেন। সেই হাসির ছবিটাকে যেন চোখে দেখতে পাচ্ছে রামতনু। সরোজিনী নাইডুর সেই ইংরেজী কবিতাটা বলছে : নদীর সবুজ চরের একটি নিরালাতে চাঁপা গাছের ডালে ডালে কুঁড়ি ধরেছে। আর, সেই চাঁপা গাছেরই একটি ডালে বসে কোয়েল ডাকছে—লিরা লিরি! লিরা লিরি!

ফুঁপিয়ে হেসে উঠেছিলেন প্রফেসর চারুবাবু—কোকিলের গলাতে লিরা লিরি ডাক শুনতে হলে আমি মরেই যাব। এত চমৎকার ও মধুর কুহুরব যদি ইংরেজী স্টাইল ধরে লিরা-লিরি হয়ে যায়, তবে ও তাই শুনে একজন ভারতীয় মানুষের পক্ষে হেসে কেঁদে মরে যাওয়াই ভাল।

একটা সাইকেলের শব্দ বেজে ওঠে। ভরতবাবুর ছেলে মনোহরের সাইকেলের শব্দ। ভাণ্ডারী যুগলবাবু বলেছেন, প্রায়ই রামগড়ের একটা ওষুধের দোকান থেকে তাঁর জন্যে মাথাধরা সারাবার ট্যাবলেট কিনে এনে দেয় মনোহর। মনোহর আজ বোধহয় সেই ট্যাবলেট কিনে নিয়ে এসেছে।

মনোহরের সাইকেলের শব্দটাও কি মিঠুয়া জঙ্গলের কোকিলের ডাকের মতো মিষ্টি? তা না হলে দুই কান পেতে সাইকেলের শব্দটাকে শুনবে কেন বিমলা? সরে যায়নি, চলেও যায়নি পরেশনাথ। দেখে মনে হয়, সাইকেলের শব্দ শুনে পরেশনাথের দুই চোখে যেন একটা রুক্ষ বিরক্ত ভাব চমকে উঠেছে।

যুগলবাবু বাড়ির খাস দরজার দিকে এগিয়ে যায় পরেশনাথ। আর, বেশ রুক্ষ রকমের দৃষ্টি তুলে যার মুখের দিকে তাকায় সে হল ভরতবাবুর ছেলে মনোহর। ঠিকই, ওষুধ নিয়ে এসেছে মনোহর। এগিয়ে যেয়ে বাড়ির যে ঘরের ভিতরে ঢুকে কথা বলে মনোহর, সেই ঘরে বসে আছেন যুগলবাবু। দেখতে পায় পরেশনাথ, অন্য ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে এই যুগলবাবুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল বিমলা। দুই চোখ অপলক করে মনোহরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বিমলা। যুগলবাবুর স্ত্রী এসে যেন চাপা ধমকের সুরে কথা বলেন।

—তোর এখানে এসে দাঁড়াবার তো কোন দরকার নেই। যা, ভিতরে যা।

এই কদিনের মধ্যেই যুগলবাবুর বাড়ির অনেক কথা স্বয়ং যুগলবাবুই রামতনুকে শুনিয়ে দিয়েছেন—মেয়েটার বিশ বছর বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু এই সামান্য কাণ্ডজ্ঞানও হয়নি যে, একজন অনাত্মীয় বাইরের ছেলে আমার কাছে যখন দাঁড়িয়ে থাকে, তখন ওর এসে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। তবু কিছুটা উচিত হত যদি মনোহরের সঙ্গে বিমলার বিয়ে দেওয়া সম্ভব হত। মনোহরের মতো ছেলেকে আমাদের পক্ষে তো অপছন্দ করবার কিছু নেই। মনোহরকে আমাদের সবারই খুব পছন্দ হয়। মনে হয়, আমাদের বিমলাও মনোহরকে বেশ পছন্দ করে।

রামতনু হাসে। হতে পারে। দুজনেই তো এই মিঠুয়া জঙ্গলের মতো মিষ্টি স্বভাব ও মিষ্টি চেহারার মানুষ।

যুগলবাবু—কিন্তু ভরতবাবুর মত উঁচু কায়েত তো আমার মত নীচু কায়েতের সঙ্গে কুটুম্বিতা করবেন না। কখ্খনো না। তাই আমার সব সময়ের চিন্তার মধ্যে এই উদ্বেগের জ্বালাটা লেগেই আছে। মেয়ের বিয়ে দেব কী করে? কোথায়? কার সঙ্গে?

রামতনু—কিন্তু এই পরেশনাথের সঙ্গে হতে পারে কি?

যুগলবাবু—হতে পারে বৈকি। পরেশনাথ ও আমরা একই জাতের মানুষ। কিন্তু হলে কি ভাল হবে? আপনি শুনেছেন কিনা, জানি না, আমি এরই মধ্যে শুনতে পেয়েছি। পরেশনাথের হিসেব সরকার বংশীলাল বলেছে যে, পরেশনাথ বিয়ে করেছিল। সেই বউ একদিন পরেশনাথের গালাগালি সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে বসলো।

আতঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে ওঠেন যুগলবাবু—তবে কি পরেশনাথের মত পাত্রের সঙ্গে আমার বিমলার বিয়ের চেষ্টা করতে হবে? হায় কপাল! নীলকণ্ঠ কি বিমলার জন্য এইরকম একটা শুভ পরিণাম ডেকে আনলো?

তিন

ঝাঁকে ঝাঁকে বাঁশতিতিরের দল উড়ে চলে যাচ্ছে। দেখে মনে হয়, টিয়ার ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারে রামতনু পরেশনাথের কারবারের কাজ খুব জোরে শুরু হয়ে গিয়েছে। রামগড় থেকে লোকজন নিয়ে এসে মিঠুয়া জঙ্গলের সব বাঁশঝাড় উজাড় করতে লেগে গিয়েছে পরেশনাথ। বাঁশতিতিরের ঝাঁক যেন মিঠুয়া জঙ্গলের বাতাসটাকেই সন্দেহ করে আর ভয় পেয়ে নীল আকাশের সুদূরের সবুজ বলয়ের দিকে উড়ে চলে যাচ্ছে।

পরেশনাথই এসে দাঁড়াল—বলুন কেমন আছেন রামতনুবাবু।

রামতনু—ভাল নই।

পরেশনাথ—কেন?

রামতনু—ওই যে বাঁশতিতিরের ঝাঁক ভয় পেয়ে আর জঙ্গলের মায়া ছেড়ে দিয়ে দূরের কোথাও উড়ে চলে যাচ্ছে, সেটা কারও চোখে ভাল লাগবার মত দৃশ্য নয়।

হেসে ওঠে পরেশনাথ—ওঃ হো..তাই বলুন। বাঁশঝাড় উজাড় করে কেটে নিলে বাঁশতিতিরই যে উড়ে চলে যাবে রামতনুবাবু। গর্তের সজারু তো উড়ে যাবে না।

রামতনু—আপনার এই কথাটা শুনতে আরও খারাপ লাগছে।

পরেশনাথ—ব্যস্ ব্যস্ রামতনুবাবু, বাঁশতিতিরের জন্য মায়া করে কেঁদে ফেলবেন না। যেতে দিন, যেতে দিন।

রামতনু—কী যেতে দেব?

পরেশনাথ—এই সব পাখি-টাখি দূর হয়ে গেলেই ভাল। শুনুন তবে, আজ দশদিন হল এই মিঠুয়াতে এসেছি। এই দশ দিনের মধ্যে অন্তত পঞ্চাশবার পাখির দল আমার ঘরে ঢুকে উৎপাত করেছে। আটা ছাতু ভুট্টা, সবই কিছু-না-কিছু নিয়ে পালিয়েছে। কী আশ্চর্য, দু'তিন রকমের পাখি নয়। কত রকমের চেহারার কত জাতেরই না পাখি। আমি ভাবছি, জন্মেজয় যেমন সাপ ধ্বংস করবার জন্য যজ্ঞ করেছিলেন, তেমনই তিনি যদি পাখি ধ্বংস করাবার যজ্ঞ করতেন, তবে—

রামতনু—থামুন মশাই। বাজে কথা আর বাড়াবেন না।

পরেশনাথ—বেশ তো, তবে একটা কাজের কথা শুনুন।

রামতনু—বলুন।

পরেশনাথ—আপনাদের ভাণ্ডারী যুগলবাবুর মেয়ে তো দেখতে বেশ ভালই। তা ছাড়া...

হঠাৎ যুগলবাবু এসে খুব খুশির স্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন—শুনতে পাচ্ছেন তো?

রামতনু—হ্যাঁ, একটা পাখি। যেন কী একটা কথা বলে ডাকছে।

যুগলবাবু—কী আশ্চর্য, আজ সেই কোন্ সকালে পাখিটা এসে ডাকাডাকি শুরু করেছে। আমার ঘরের আঙিনার চারদিকের যত আম চালতে আর কদম গাছের এ-ডাল থেকে সে-ডালে উড়ে উড়ে বসছে আর ডাক ছাড়ছে, কুটুম আয়! কুটুম আয়! শুনতে পাচ্ছেন তো তসীলদারজী?

রামতনু—হ্যাঁ, শুনছি।

পরেশনাথ কোন কথা না বললেও তার চোখমুখের ভঙ্গী দেখে বোঝা যায়, সে-ও শুনতে পেয়েছে। ডেকেই চলেছে পাখিটা—কুটুম আয়, কুটুম আয়।

যুগলবাবু যেন শুভ আশার একটা সংকেত দেখতে পেয়েছেন, তাই অমন উৎফুল্ল হয়ে হাসছেন—ওটার নাম কুটুম পাখি।

পরেশনাথ যেন তার দুই বিরক্ত চোখের ভ্রূকুটিকে সামলে দেবার চেষ্টায় হাসতে থাকে। জিজ্ঞাসা করে—কুটুম পাখি ডেকেছে তো কী হয়েছে? মিঠুয়া জঙ্গলের মাথার ওপর রসগোল্লার বৃষ্টি ঝরে পড়বে?

রামতনু হাসে—না; কুটুম পাখি ডাকছে বলে যুগলবাবুর বাড়িতে সত্যিই কোন কুটুমের আগমন হবেই হবে। কিংবা কুটুমের আগমন হবে বলে বুঝতে পেরে পাখিটা ডাকছে।

পরেশনাথ—বাঃ, আপনাকে মস্ত বড় এক জ্ঞানী মানুষ বলে মনে হচ্ছে।

উৎফুল্ল যুগলবাবু চলে গেলেন। বিষণ্ণ পরেশনাথও চলে গেল। আর, যুগলবাবুর জন্যে একটা মায়ার ভাব ব্যাকুল হয়ে রামতনুর মনের কামনায় বাজতে থাকে—আসুক আসুক, বেচারা যুগলবাবুর বাড়িতে কুটুমের আগমন হোক। কুটুম পাখির বিচারবুদ্ধির গল্পটা সত্যি হোক বা মিথ্যে হোক।

বিকালে সূর্য যখন বেশ লাল হয়ে মিঠুয়া জঙ্গলের পিয়াল শিমূল আর অর্জুনের মাথায় রঙীন আলোর আভা মাখিয়ে দিয়েছে, ঠিক তখন পরেশনাথ এসে ডাকতে থাকে— রামতনুবাবু, দেখুন তো ওরা কারা যুগলবাবুর বাড়িতে ঢুকছে।

দেখতে পায় রামতনু, সত্যি তো, যুগলবাবুর কুটুম হতে পারেন কিংবা হবেন এমনতর কয়েকজন আগন্তুক যুগলবাবুর বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। তার মধ্যে একজনকে চিনতে পারা যায়। তিনি হলেন মনোহরের বাবা ভরতবাবু।

পরেশনাথ—ওদের কাউকে আপনি চেনেন কি?

রামতনু—একজনকে চিনি। ওই যে বুড়ো ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন আর হাসলেন উনি এখানকারই লোক মনোহরের বাবা ভরতবাবু।

পরেশনাথ—মনোহর আবার কে?

রামতনু—ওই যে সাইকেল চড়ে রোজই রামগড়ে যায়, সেই হলো মনোহর।

পরেশনাথের শক্তপোক্ত চেহারাটা যেন হঠাৎ একটা জ্বালার ছোঁয়া লেগে ছটফটিয়ে ওঠে। দাঁতে দাঁত ঘষে কথা বলে পরেশনাথ—ওই যে লোকটা মাঝে মাঝে এসে যুগলবাবুর বাড়ির একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়ে, মুখটা যার মেয়েছেলের মুখের মত দেখতে, যে ব্যাটা রামগড়ে গিয়ে ঠিকাদার গুপ্ত কোম্পানীর তদারক মুহুরীর কাজ করে পঁচিশ টাকা মাইনে পায় সে ব্যাটারই নাম বুঝি মনোহর?

রামতনু—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি এত বেশি রাগ করে কথা বলছেন কেন?

কোন কথা না বলে, দুঃসহ একটা আক্রোশের মূর্তি ধরে তখনই চলে গেল পরেশনাথ।

আর সন্ধ্যা হতেই উৎফুল্ল যুগলবাবু একেবারে বুকভরা খুশির উল্লাস নিয়ে ছুটে আসেন—কুটুম পাখির ডাক খুব সার্থক হয়েছে রামতনুবাবু। ভরতবাবু নিজেই প্রস্তাব করেছেন, আমার বিমলার সঙ্গে তিনি তাঁর ছেলে মনোহরের বিয়ে দিতে চান। তিনি একেবারে স্পষ্ট করে বললেন, তিনি জাতের বাধা আর মানবেন না। তাঁর মতে, তিনি উঁচু কায়েত নন আর আমরাও নীচু কায়েত নই। আমি ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি রামতনুবাবু, কী করে ভরতবাবুর মত একরোখা জাতগর্বুটে মানুষ একেবারে বদলে গেলেন।

শুভ সংবাদটা জানিয়ে দিয়েই চলে গেলেন যুগলবাবু। রামতনুর মনে একটা বিস্ময়ের প্রশ্ন পাখির মিষ্টি স্বরের মত শব্দ করে বাজতে থাকে—মিঠুয়া জঙ্গলের সেই কোকিলডাকা বিকালের আলো ও বাতাসের বিহুল প্রাণের ইচ্ছেটাই কি জয়ী হয়েছে? ভরতবাবুর মনের এতদিনের জাতমার্কা গর্বের তেতো বাধাটা কোকিলডাকা সেই বৈকালী বাতাসের মিষ্টি আবেশের ছোঁয়া লেগে সত্যিই কি একেবারে মিষ্টি হয়ে গলে গিয়েছে?

কিন্তু সাতটা দিন পার না হতেই বুঝতে পারে রামতনু, পাখির ডাকের সব সঙ্কেত মিথ্যে হয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে। যুগলবাবু খুব বিষণ্ণ ও খুব হতাশ হয়েছেন। একটা বেনামী চিঠিকে হাতে করে নিয়ে এসে রামতনুর চোখের সামনে রেখে দিলেন। বেনামী চিঠিটা বলছে, খুব সাবধান যুগলবাবু, ভরতবাবুর ছেলে মনোহরের সঙ্গে বিয়ে দেবার আগে একবার খোঁজ করে দেখবেন, মনোহরের শরীরে টিবি রোগের মত কোন ক্ষয়রোগ আছে কিনা।

যুগলবাবু চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে ভরতবাবু এসে বেশ করুণ স্বরে কথা বলে—আপনার কাছ থেকে একটা পরামর্শ পেতে চাই রামতনুবাবু। এই যে, এই দেখুন এই বেনামী চিঠির সব কথা বিশ্বাস করব কি করব না?

ভরতবাবুর কাছে লেখা বেনামী চিঠিটা বলছে ঃ আপনি কোন্ দুঃখে আপনার জাতের মান খোয়াবেন? জাতের মান ও ধর্মের মান, দুই একই বস্তু। আশা করি, যুগলবাবুর মেয়ের সঙ্গে আপনার ছেলের বিয়ে দিয়ে আপনি ধর্মের মান খোয়াবেন না। তাছাড়া আরও একটা সন্দেহ করবার কথা আছে। যুগলবাবুর মেয়ে বোধহয় এই বয়সেই ডাইন-বিদ্যার সব তুকতাক শিখে ফেলেছে। তা না হলে মনোহরের মত চমৎকার ছেলে যুগলবাবুর মেয়ের মুখের দিকে অমন করে তাকিয়ে থাকবে কেন? দেখে মনে হয়, মনোহর যেন যুগলবাবুর মেয়ের চেহারাটাকে পূজো করছে।

যুগলবাবু যে-কথা বলেছেন, ভরতবাবু সেই কথা বলে চলে গেলেন—সন্দেহ করতে পারছি না, কে এই রকম বেনামী চিঠি লিখতে পারে। চিঠিটা সত্য কথা বলছে, না মিথ্যে কথা বলছে, তাও যে বুঝে উঠতে পারছি না।

কয়েক দিনের মধ্যে ঘটনার লক্ষণ দেখে বুঝতে পারে রামতনু, বেনামী চিঠিরই জয় হয়েছে। যেমন যুগলবাবুর বাড়িতে, তেমনই ভরতবাবুর বাড়িতে বিয়ের কথা নিয়ে সামান্য কোন আলোচনার সাড়াও নেই। এই উদাস ও বিষণ্ণ পরিবেশের মধ্যে শুধু পরেশনাথের উৎফুল্ল হাসির শব্দটা যেন বিরাট এক পরিতৃপ্তির চিৎকার।

চার

পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা বলে ডাক দিয়ে এই ক'দিন ধরে উড়ে বেড়াচ্ছে যে পাখিটা, সেটা কী রকমের কোন্ জাতের পাখি? সেটা কি চাতক জাতের কোন পাখি? একটা পাপিয়া?

যুগলবাবু বলেন, একটা বেনামী চিঠিকে এত ভয় করবার কোন মানে হয় না, রামতনু। বিশ্বাস কর রামতনু, পাপিয়াটাই ডেকে ডেকে আমাদের ভয় ভেঙে দিয়েছে। শুনলে আশ্চর্য হবে, আমাদের বিমলা নিজেই মুখ খুলে কথাটা বলে দিয়েছে, না, ভরতবাবুর ছেলে মনোহরের ভয়ানক রকমের কোন রোগ আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া রোগ থাকলেই বা কী?

শুনে চমকে ওঠে রামতনু—এরকম একটা অদ্ভুত কথা বলেছে আপনার মেয়ে?

যুগলবাবু—হ্যাঁ। বিমলা এরকম কথা বলেছে বলে শুনতে পেয়ে ভরতবাবুও বলে ফেলেছেন—জাত না ছাই। আমি জাতের মানের কোন ধার ধারি না...আরও সুখবর শুনুন, ভরতবাবুরা আজ আবার আসছেন। বিয়ের কথা একেবারে পাকাপাকি করে তাঁরা আজ বিয়ের দিনও ঠিক করে দিয়ে যাবেন।

কিন্তু আবার কে জানে কেন, বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে যাবার পর আর কোন কথার সাড়া আর শোনা যায় না। আবার নীরব আর অলস হয়ে গিয়েছে দুই বাড়ির প্রাণের সব উৎসাহ।

জানতে দেরি হয় না রামতনুর আবার এরকম একটা অবসাদের কারণ কী। হ্যাঁ, আবার দুই বেনামী চিঠির অভিযোগ এসে দুই বাড়ির উৎসাহ একেবারে স্তব্ধ করে দিয়েছে। দুই বেনামী চিঠির প্রায় একই রকমের অভিযোগ। ভরতবাবুকে বলছে বেনামী চিঠিটা—যুগলবাবুর মেয়ের চরিত্র বেশ গোলমেলে। খুব সাবধান, যুগলবাবুকে বলছে বেনামী চিঠিটা—ভরতবাবুর ছেলে মনোহরের একটি বে-আইনী স্ত্রী আছে, রামগড়ের বাজারের কাছে একটি বাসাঘরে সেই বে-আইনী স্ত্রীকে পুষে রেখেছে মনোহর।

বেশ কঠোর রকমের একটা উত্থান-পতনের নাটক বলে মনে হয়। বেনামী চিঠির আঘাত এসে বিমলা ও মনোহরের দুই ভাগ্যের মিলনের আশা ছিন্ন করে দিয়েছে। আবার মিঠুয়া জঙ্গলের এক-একটা পাখির ডাকের মিষ্টি শব্দ যেন ভয়ানক এক ঠাট্টার আঘাত দিয়ে বেনামী চিঠির অভিযোগ গুঁড়ো করে দিচ্ছে।

বিয়ের দিন ঠিক হয়ে যাবার খবরটা পেয়ে ভাংচি দেবার সেই অদৃশ্য আত্মাটা আবার বেনামী চিঠি ছাড়ে। এবার বেনামী চিঠির অভিযোগ শুধু ভরতবাবুর কাছে এসেছে। অভিযোগের কথা ঃ একবার খোঁজ নিয়ে দেখবেন ভরতবাবু যুগলবাবুর মেয়ে বিমলার সঙ্গে পরেশনাথবাবুর কোন গুপ্ত প্রেমের সম্পর্ক আছে কি নেই। ভয়ানক এই বেনামী চিঠিটা হাতে নিয়ে আর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন ভরতবাবু। ভরতবাবুর স্ত্রী বারবার চোখ মোছেন, আর দেখে ভীরু ও করুণ স্বরে কথা বলেন—এ চিঠি পড়ে কি মনোহরের মন একেবারে ভেঙে পড়বে না? মনোহর কি বিমলার এই বদনামের কথাটাকে একেবারে তুচ্ছ করতে পারবে?

ডেকে উঠেছে একটা পাখি, বউ কথা কও! ভরতবাবুর বাড়ির কাছে মস্ত বড় শিমূলের ডালের ওপর বসে পাখিটা ডাক ছাড়ছে। শুনতে পেয়েছে যুগলবাবুর বাড়ির সব মানুষ। শুনতে পেয়েছে রামতনু। শুনতে পেয়েছে পরেশনাথ।

রামগড় থেকে ফিরে বাড়িতে ঢুকতেই শুনতে পায় মনোহর, পাখিটা যে সত্যিই একবার স্পষ্ট করে আসন্ন এক শুভাগমনের কথা বলছে, বউ কথা কও। ঘরে ঢুকে ভরতবাবুর হাত থেকে বেনামী চিঠিটা তুলে নিয়েই পড়ে ফেলে মনোহর। চেঁচিয়ে হেসে ওঠে মনোহর। বেনামী চিঠিটাকে কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

সন্ধ্যা হতেই যখন ঝুরু ঝুরু বৃষ্টি শুরু হয়েছে আর গর গর করে মেঘ ডাকছে, তখন প্রায় উন্মত্তের মত ছুটে রামতনুর কাছে এসে চিৎকার করে পরেশনাথ—শুনলাম, এই কিছুক্ষণ আগে যুগলবাবুকে খবর পাঠিয়েছেন ভরতবাবু এই সোমবারেই তাঁরা যুগলবাবুর মেয়েকে আশীর্বাদ করতে আসবেন।

হেসে ফেলে রামতনু—তাই নাকি? এ তো খুবই চমৎকার সুখবর। পাখি যখন ডাক দিয়ে বলছে, বউ কথা কও তখন'তো বিয়ের কোন বাধাই আর থাকতে পারে না। যুগলবাবুর মেয়ে এইবার বউ মানুষ হয়ে যাবেই যাবে।

পরেশনাথ—আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে, বউ-কথা কও পাখিটাই ডাক দিয়ে যুগলবাবুর মেয়েকে একেবারে...

রামতনু—হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই, মনোহরের সঙ্গে যুগলবাবুর মেয়ে বিমলার এইবার বিয়ে হয়ে যাবেই যাবে। তাই বউ-কথা-কও পাখিটা ডাকছে।

যেমন আশীর্বাদের দিনে, তেমনই বিয়ের দিনেও সারা সন্ধ্যা বউ-কথা-কও পাখিটা ডাক দিয়ে উড়ে বেড়ায়। শাঁখের শব্দ ঢাকের শব্দ থামলেই শোনা যায়, পাখিটা ডেকে ডেকে যেন শুভলগ্নের আনন্দটাকে বিহ্বল করে দিচ্ছে। পরের দিন সকালবেলা শুভবিবাহিত বিমলা তার সুন্দর মুখ আর রঙীন সিঁথির শোভা সঙ্গে নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে চলে যেতেই পাখিটাও কোথায় যেন চলে গেল। দেখে মনে হয়, সত্যিই যেন আর একটা সাধ পূর্ণ করে দিয়েই চলে গিয়েছে।

কিন্তু আবার কী আশ্চর্য, বিমলার ফুলশয্যার দিনে একটা বেনামী চিঠি এসে ভরতবাবুর বাড়িতে সবাইকে ভাবিয়ে তুলল। চিঠিটা বলছে, আপনি খুব ভুল করলেন ভরতবাবু। যে মেয়েকে ছেলের-বউ করে ঘরে নিয়ে এলেন, সে মেয়ের শরীরে অদ্ভুত একটা রোগ আছে। সে মেয়ে কোনদিন কখনও সন্তানবতী হবে না। বুঝে দেখুন, বিমলা ঠিক আপনার পুত্রবধূ নয়, একটা মিথ্যে মেয়েমানুষের চেহারা মাত্র। এখনও উপায় হতে পারে, এমন মেয়েকে আপনার ঘরে ঠাঁই না দিয়ে বিদায় করে দিন।

ডেকে ওঠে একটা পাখি। ভরতবাবু বেনামী চিঠিটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েই হেসে ওঠেন। সেই হাসির ছোঁয়াচ লেগে ভরতবাবুর বাড়ির সব মানুষের প্রাণ হেসে ওঠে। ফুলশয্যার নেমন্তন্ন রক্ষা করতে কুটুম্বমানুষ যাঁরা এসেছেন, তাঁরাও হেসে ওঠেন।

· পাখির ডাকের শব্দ যুগলবাবুর বাড়ির কানেও পৌঁছে যায়। যুগলবাবুর বাড়িতে হাসির হল্লা জাগে। পাখিটা ডাকছে, গৃহস্থের খোকা হোক্।

এই পাখির নাম হলদে পাখি। কেউ কেউ বলেন, বেনে-বউ। কী মিষ্টি এই হলদে পাখির স্বর। গৃহস্থের খোকা হবে, ভাগ্যের এই চমৎকার একটা অঙ্গীকার যেন হলদে পাখির রূপ ধরে নিয়ে ডাকাডাকি করছে। বেনামী চিঠির জঘন্য দংশন একেবারে ব্যর্থ করে দিয়েছে এই হলদে পাখির ডাক।

পরেশনাথও কি এই হাসির হল্লাটাকে শুনতে পাচ্ছে না? পাচ্ছে বৈকি। দেখতে পায় রামতনু, ঘরের বাইরে বারান্দার ওপর একেবারে নিথর-নিঝুম একটা মূর্তি হয়ে বসে আছে পরেশনাথ। পরেশনাথের চোখ মুখের চেহারাটা বার বার যেন একটা বীভৎস আক্রোশের যন্ত্রণায় বীভৎস হয়ে উঠছে। চোখের দুরন্ত দৃষ্টিটা যেন তাকেই খুঁজছে আর হাতের কাছে একবার পেতে চাইছে, যে তার ইচ্ছা আর আশার দাবিটাকে এক রাত্রে একটুকুও সাড়া দিয়ে সম্মানিত করল না।

অনেক রাত্রে, যখন মিঠুয়া জঙ্গলের শেয়ালও যেন রাতের স্তব্ধতার মত নীরব হয়ে গিয়েছে, ঠিক তখন এমন এক পাখির গম্ভীর গলার স্বরে ভয়াল ভর্ৎসনার বুলি বেজে উঠল, যে-পাখিকে এর আগে এই মিঠুয়া জঙ্গলের কোন রাত্রে কোন অন্ধকারের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে ডাক ছাড়তে শোনেনি রামতনু। ডাকছে একটা পেঁচা, তুই থুলি কি মুই থুলি? এটা যেন ভয়ানক এক অন্ধকারের বুক থেকে উৎসারিত একটা প্রশ্নের ডাক। শুনলে ভয় না করে পারা যায় না। বেচারা নিরীহ নিষ্পাপ মানুষগুলিও যখন এত ভয় পায়, তখন পাপকর্মের মানুষগুলির ভয় কত ভয়াবহই না হবে!

চিৎকারের শব্দ শুনে রামতনুর এত জমাট ঘুমও হঠাৎ ভেঙে গেল। কে এইরকম ভীরু আর্তনাদের মত শব্দ করে চিৎকার ছাড়ছে?

বুঝতে পেরে আশ্চর্য হয় আর চমকে ওঠে রামতনু, চিৎকার করে ডাকছে পরেশনাথের ভয়ে-ভরাট বুকের যত থরথরে শিহর—শিগগির একবার আসুন রামতনুবাবু। দেরি করবেন না, এখনই আসুন। নইলে ওরা আমাকে মেরেই ফেলবে।

দৌড়ে গিয়ে দেখতে পায় রামতনু, পরেশনাথের ভয়ানক শরীরটা কেঁপে কেঁপে মাটির ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছে। রামতনুকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন— বাঁচান আমাকে বাঁচান, রামতনুবাবু।

—কিন্তু কী হয়েছে, কিসের ভয়ে এসব কথা বলছেন?

কোন জবাব দেয় না পরেশনাথ। এইবার একটু স্পষ্ট করে দেখতে পেয়ে রামতনুর দুই চোখে একটা সন্দেহের আগুন যেন দপ্ করে জ্বলে ওঠে। পরেশনাথের সাজটা অদ্ভুত, একটা গেঞ্জি আর ছোট একটা হাফ-প্যান্ট। পাটনাতে ধরা-পড়ে একটা সিঁদেল চোরের গায়ে এই রকমের সাজ দেখেছিল রামতনু।

পরেশনাথের ভীতশিহরিত শরীরের একটা হাত খুব শক্ত কেরোসিন তেলে ভরা একটা টিনকে ধরে রেখেছে। একি এটা আবার কোন্ মতলবের বস্তু!

রামতনু গর্জন করে—কেরোসিনের ভরা টিন কেন?

পরেশনাথের দুই চোয়াল ঠক ঠক করে কাঁপে। পরেশনাথের জিভটাও তোতলা হয়ে যায়—ভরতবাবুর ঘরে আগুন লাগাবার জন্য।

রামতনু—কেন?

পরেশনাথ—বিমলাকে পুড়িয়ে মারবার জন্য।

রামতনু—কেন?

পরেশনাথ—বিমলা আমাকে অনেক অপমান করেছে। কতবার ডেকেছি, তবু কাছে আসেনি। মুখ ঘুরিয়ে সরে গিয়েছে।

পরেশনাথের চুলের ঝুঁটিকে শক্ত হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে রামতনু।

—তারপর কী হল?

পরেশনাথ—বের হবার জন্য যে-ই এক পা বাড়িয়েছি অমনি যমের ডাকের মত এই পাখিটার ডাক অন্ধকারের বুক কাঁপিয়ে সেই সঙ্গে আমারও বুকের সব পাঁজর কাঁপিয়ে দিল। আপনি না এসে পড়লে এতক্ষণে আমি বোধ হয় মরেই যেতাম।

রামতনু—আপনার ঘরে অন্য যারা থাকত, তারা কোথায়?

পরেশনাথ—তাদের আমি সাত দিনের ছুটি দিয়ে সরিয়ে দিয়েছি।

চেঁচিয়ে কাঁদতে থাকে পরেশনাথ—আমি জানতাম না যে, পাখি এত ভয়ানক হয়। হ্যাঁ, কী বলছে পাখিটা?

পরেশনাথের চুলের ঝুঁটি আরও শক্ত করে ধরে নিয়ে কথা বলে রামতনু—বলছে তুই থুলি কি মুই থুলি!

পরেশনাথ—এ কথার মানেটা কি?

পরেশনাথের মাথাটাকে মেঝের খুঁটির গায়ে ঠুকে দিয়ে কথা বলে রামতনু—মানে হল, তুই জিতলি কি মুই জিতলি?

মেঝের মাটিতে মুখ ঘষে-ঘষে কাঁদতে থাকে পরেশনাথ। রামতনু বলে—কেঁদে আর কি হবে মশাই—আমি এখনই আমার কাছারির চাকরদের ডাক দিয়ে দড়ি আনতে বলবো।

উতলা হয়ে কাঁদতে থাকে পরেশনাথ—কেন স্যার?

রামতনু—দড়ি দিয়ে তোমাকে এখনই শক্ত করে বেঁধে রেখে দেব, যতক্ষণ না সকাল হয় আর পুলিস এসে পড়ে।

জগনপুরের দীপালি রায়

ছোটনাগপুরের সাদা কাঁকরের একটা ডাঙ্গা আর সাঁওতাল পরগণার লালচে মাটির একটা ডাঙ্গা যেখানে এসে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে, সেখানে দাঁড়ালে মহেশমুণ্ডা পাহাড়ের চেহারাটা স্পষ্ট দেখা যায়। মধুপুর-গিরিডি লাইনের ট্রেন যখন যায় কিংবা আসে, শুধু তখন পাহাড়ের চেহারাটা ট্রেনের ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়ার আড়ালে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। জায়গাটার নাম জগনপুর। এই জগনপুর থেকে মোটরবাসে রওনা হয়ে ও শহর গিরিডিকে ছাড়িয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপর ডুমরি বস্তিতে পৌঁছতে সময় লাগে আড়াই ঘন্টা। এরপর দক্ষিণে শালমহুয়ার যে জঙ্গলটা পুরো ত্রিশ মাইল পর্যন্ত এগিয়ে যেখানে গিয়ে ফুরিয়েছে, সেখান থেকে শুরু হয়েছে ভেলাডিহির সেই সেগুন খেজুর আর বাঁশের বিরাট জঙ্গল।

বাঙালীরা যাঁরা প্রথম জগনপুরে এসে বাস করতে শুরু করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শুধু দুজনের জীবনে ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হয়েছেন। মুরলীবাবু এখন গিরিডির কাছের জঙ্গলের দুটি বড় অভ্রখনির মালিক। ভুবনবাবু একটি বড় অভ্রখনির মালিক। সনাতনবাবু কিন্তু কোন কিছুরই মালিক হতে পারেননি, যদিও তিনি এখানে ভুবনবাবু ও মুরলীবাবুর আগমনের অনেক আগেই এসে রোজগারের রাস্তা খুঁজেছিলেন। মোক্তারী করেন সনাতনবাবু। সপ্তাহের দুটি কিংবা তিনটি দিনে গিরিডিতে গিয়ে ছোট আদালতের বারান্দায় ঘোরাঘুরি করে মক্কেল ধরতে চেষ্টা করেন। মাঝে-মাঝে দুটি-একটি মক্কেল পেয়েও যান। সম্পত্তি বলতে তাঁর শুধু একটি নার্সারি আছে। অনেক দিনের অবহেলায় ও অযত্নে সেই নার্সারির সব গোলাপের গাছ এখন মর-মর অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। আর দুই-এক বছরের মধ্যে শুকিয়ে মরেই যাবে বলে সন্দেহ হয়।

তবু এই মুমূর্ষু নার্সারির চমৎকার সৌগন্ধের আমোদ এক-একদিন সন্ধ্যায় বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে জগনপুরের অনেক বেরসিক বাড়ির প্রাণেও আবেশ ধরিয়ে দেয়। মুরলীবাবু বলে ওঠেন—বা, সনাতনের নার্সারিটার এখনও প্রাণ আছে বলে মনে হচ্ছে। ভুবনবাবু বলেন—মোক্তারী ফোক্তারী ছেড়ে দিয়ে সনাতন এখন যদি নার্সারিটাকেই একটু ভাল করে তুলতে পারে, তবে অন্তত মাসে পঞ্চাশটা টাকা রোজগার সহজেই সম্ভব হবে।

যাঁর নার্সারী, যাঁর বাড়িটা নার্সারির বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে প্রায় সব সময়েই বাসি গোলাপের ঝরা পাপড়ির সুবাস উপভোগ করে, সেই বাড়ির প্রাণে অহরহ একটা উদ্বেগ ছটফট করে। মেয়ের বিয়ে হবে কী করে? নার্সারির ঝরা ফুল কুড়িয়ে কুড়িয়েই কি মেয়েটার জীবন ফুরিয়ে যাবে? সন্ধ্যার চাঁদের আলোতে নার্সারির এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে মেয়েটা, বাড়ির বারান্দার ওপর দাঁড়িয়ে অনেকবার এই দৃশ্য দেখেছেন বাড়ির বাপ ও মা, অর্থাৎ সনাতনবাবু ও তাঁর স্ত্রী শুভময়ী।

মেয়ে দীপালিকে সুন্দরই বলা চলে। কিন্তু বয়সটা আর-একটু বেড়ে গেলে মেয়ের এই সুন্দর চেহারায় কোন সুন্দরতা কি আর থাকবে? মেয়ের বয়সের সত্যি হিসেব কারও কাছে বলতে পারেন না শুভময়ী। বলেন, এই তো কুড়িতে পড়েছে। কিন্তু মেয়ের চেহারা তো শেষ পর্যন্ত এরকম একটা বানানো হিসাবের ধার ধারবে না। বয়সের বাড় আর বেশী বেড়ে গেলে মেয়ের

চেহারাতে এখনও যেটুকু লাবণ্য আছে সেটুকুও ক্রমেই ফিকে হয়ে যেতে থাকবে, শরীরে স্বাস্থ্যের আঁটুনি থাকুক বা না থাকুক।

মুরলীবাবুর ছেলে কলকাতাতে আইন পড়ছে। ছেলে সোমনাথের বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হবে। এইরকম বয়সের ছেলের সঙ্গে ত্রিশ-বত্রিশ বয়সের দীপালির বিয়ে হতে পারে, হলে ভালই হবে। কিন্তু এরকম আশা করবার কোন মানেই হয় না। জগনপুরের সবচেয়ে মান্যবর বড়লোক মুরলীবাবু তাঁর ছেলের সঙ্গে মোক্তার সনাতনের মেয়ের বিয়ে কল্পনাই করতে পারবেন না। তিনটে তালি দেওয়া একটা ময়লা চেহারার কোট গায়ে দিয়ে আদালতে যায় যে মোক্তারটা, তার সঙ্গে কি মুরলীবাবুর কুটুম্বিতা হতে পারে?

আর কে আছে ভাল পাত্র? জগনপুরের দ্বিতীয় মান্যবর বড়লোক ভুবনবাবুরও একটি ছেলে আছে, কিন্তু...।

শুভময়ীর কাছে কথাটা বলতে গিয়ে হেসে ফেলেন সনাতনবাবু।—ভুবনবাবুর ছেলের বয়সটা তো জান, উনিশ-কুড়ির বেশী হবে না।

শুভময়ী—কিন্তু ছেলেটা দেখতে কী চমৎকার। বয়সের কথা না থাকলে বলতে হবে, আমাদের দীপালিকে ভুবনবাবুর ছেলে অনিমেষেরই সঙ্গে মানাবে।

সনাতনবাবু—হতে পারে। কিন্তু সেটা তো কোন কাজের কথা নয়। ভুবনবাবু তাঁর উনিশ-কুড়ি বছর বয়সের ছেলেকে তোমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে কখনই দিতে চাইতেন না।

শুভময়ী—তোমার এসব কথারও কোন মানে হয় না। আসল কথা হল, তোমার মত গরীবের মেয়ের সঙ্গে খাদওয়ালা বড়লোক দুই বাবুর কোন বাবুই তাঁর ছেলের বিয়ে দিতে রাজী হবে না।

সনাতনবাবু—কিন্তু আমার পক্ষে তো হঠাৎ একটা বড়লোক হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

শুভময়ী—চেষ্টা করলে হওয়া যায় বৈকি।

ভুবনবাবু উনিশ-কুড়ি বছর বয়সের ছেলে অনিমেষ রূপে যতটা সুন্দর, গুণে ততটা সুন্দর নয়। মধুপুরের স্কুলে পড়ে এই বছরে ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠেছে। কিন্তু পাস করতে পারবে কিনা সন্দেহ। সকালের ট্রেনে মধুপুরে যায় ছাত্র অনিমেষ, ফিরে আসে সন্ধ্যার ট্রেনে। কিন্তু লেখাপড়ার কোন দরকারের কিংবা কর্তব্যের বোধ ওর প্রাণে আছে কিনা, সন্দেহ। ভুবনবাবু জানেন, স্কুলে যাবার নাম করে মধুপুরে গিয়েই রেলওয়ের অফিসারদের ক্লাবে টেনিস খেলতে চলে যায় অনিমেষ। জগনপুরে ফিরে এসে বাড়ির ঘোড়াটার পিঠে চেপে সড়কের অন্ধকারের মধ্যে প্রচণ্ড বেগে ছুটোছুটি করে। অনিমেষকে সেজন্য বকাবকি করবার কোন উৎসাহ বোধ করেন না ভুবনবাবু। ছেলেটার পাঁচ বছর বয়সে ওর মা মারা গিয়েছে। ঝিয়ের যত্নে ও আদরে বড় হয়ে উঠেছে। এখন আর ওকে সামলে রাখবার সাধ্যি কোন দুর্দান্ত ঝিয়েরও নেই। হার্টের অসুখে কষ্ট পাচ্ছেন, তার ওপর কারবারের দেখা-শোনা করবার ঝঞ্ঝাট লেগেই আছে, সময় নেই ভুবনবাবুর, ছেলেকে সামলে রাখবার জন্য একটুও ব্যস্ত হয়ে ওঠবার মতো সময় তাঁর নেই।

মাঝে মাঝে খুব বুঝতে পারেন ভুবনবাবু, তাঁর নিজেরও সময় ফুরিয়ে এসেছে। যাক্ সেজন্য খুব বেশী দুশ্চিন্তা করবার কারণ নেই। একটা মাত্র ছেলে, তার পক্ষে একটা অভ্রখনির আয় সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে খেয়ে-পরে থাকবার যথেষ্ট একটা সম্বল।

একদিন উকিলবাবুর কাছে ভালমন্দ এই চিন্তার কথাগুলি বলতে গিয়ে চেয়ারেরই ওপর ঢলে পড়লেন, দুই চোখ বন্ধ করলেন ভুবনবাবু। হার্ট স্ট্রোক, নিতান্ত আকস্মিক রকমের একটা ভাগ্যের আঘাতে মরেই গেলেন ভুবনবাবু।

তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা। মৃত্যুর সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে ডাক্তার মজুমদার যে মুহূর্তে চলে গেলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে জগনপুর তরুণ ক্লাবের একটা মিছিল ভুবনবাবুর বাড়ির ফটকের কাছে এসে থামে আর জয়ধ্বনি ছাড়তে থাকে। একজনের হাতে জ্বলন্ত মশাল, একজন তার মাথার ওপর ছোট একটা রূপোর শিল্ড ধরে রেখেছে। আর, অনিমেষের গায়ের স্যাণ্ডো গেঞ্জির বুকে ঝকঝকে একটা মেডেল দুলছে। ডুমরি বস্তি থেকে ভেলাডিহি, জঙ্গলের ত্রিশ মাইল সরু রাস্তায় সাইকেল ছুটিয়ে যাওয়া-আসা করবার বাহাদুরী প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়েছে অনিমেষ।

দুই

অনেক দিন পরে অনেক ঘুরে-ফিরে আর বদলি হয়ে, রামতনু আবার সেই ভেলাডিহিতে এসেছে। ভেলাডিহির জঙ্গলের চেহারাতে খুব নতুন রকমের কোন পরিবর্তন দেখতে পায় না রামতনু। পরিবর্তন বলতে শুধু দেখা গেল যে, ফুলি সাহেবের সেই ছাড়াভিটার যত ইঁটের স্তূপের ওপর একটা নতুন গাছের চেহারা লম্বা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা উইপিং উইলো। আরও একটা সাধারণ পরিবর্তন সেই ভাণ্ডারীজী নেই; নতুন এক ভাণ্ডারী এখন ভেলাডিহির ওই তসীল কাছারিতে কাজ করছেন।

বনবাসী জীবনের অভিজ্ঞতায় রামতনু এই প্রথম দেখতে পেল, ভাণ্ডারী হলেন একজন বাঙালী, প্রৌঢ় বয়সের পুষ্করবাবু। ভাণ্ডারী পুষ্করবাবু বলেন—শুনেছেন তো দুঃখের খবর?

রামতনু—কিসের দুঃখের খবর?

পুষ্করবাবু—জগনপুরের ভুবনবাবু মারা গিয়েছেন।

রামতনু—জগনপুরের কোন্ ভুবনবাবু? ভেলাডিহির ওদিকে বাঁশের জঙ্গলের মধ্যে হাজার বিঘা একটা বিবাদী ডাঙ্গাজমির দখল নেবার জন্য প্রতি বছর লাঠিয়াল নিয়ে যিনি লড়তেন?

পুষ্করবাবু—হ্যাঁ। তিনি আমার এক জ্ঞাতিভাই। জগনপুরের মুরলীবাবু আর সনাতনবাবু আমার জ্ঞাতি না হলেও আমার জাতভাই। আমরা সবাই এখন বাঙালী হয়ে গিয়েছি বটে, কিন্তু জাত হিসেবে আমরা হলাম রাজপুত বাঙালী কিংবা বাঙালী রাজপুতও বলতে পারেন। আমাদের কুলপঞ্জীতে লেখা আছে ঃ তিনশো বছর আগে রাজপুতনা থেকে চৌহানেরা যারা চলে এসে বাংলার বর্ধমানের মানকরে ঠাঁই নিয়েছিল, তারাই হলো আমাদের পূর্বপুরুষ। এটা শুধু একটা পুরনো স্মৃতির কথা। আমরা এখন চালে-চলনে ও হাবে-ভাবে একেবারে বাঙালী। আপনার চেয়েও কিছু কম বাঙালী নই।

রামতনু হাসে— তা তো নিশ্চয়। আমার পূর্বপুরুষ আপনার পূর্বপুরুষদের বাংলাতে আসবার অনেক আগে কনৌজ থেকে বাংলাতে এসেছিল। কিন্তু আপনি কি আমাকে একজন কনৌজিয়া কায়স্থ বলে মনে করতে পারবেন?

হেসে ফেলেন ভাণ্ডারী পুষ্করবাবু।—অসম্ভব। খাঁটি সত্যি কথাটা কি জানেন? জাত-পাতের কোন অর্থ হয় না।

রামতনু—জাতপাত হলো আপনাদের জগনপুরের মতো যত কুচুটে শহরের জীবনের সমস্যা। আমাদের এই জঙ্গলের জীবনের কোন সমস্যা নয়।

পুষ্করবাবু—জাতের মিল থাকলেও কিছু হয় না রামতনু। তোমাকে তুমি করে বললাম বলে কিছু মনে করো না, তুমি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট। যা-ই হোক, জগনপুরের মোক্তার সনাতনবাবু তাঁর সুন্দরী মেয়েটিকে মুরলীবাবুর ছেলে সোমনাথের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে অন্তত পঞ্চাশ বার মুরলীবাবুর কাছে গিয়েছেন, কত সাধাসাধি করেছেন। কিন্তু আপত্তি করে মুরলীবাবু বারবার ওই একই কথা বলেছেন—না, মানাবে না! এটা তো ঠিক জাতের দাবির কথা হলো না রামতনু। এই মস্ত একটা বড়লোকী অহংকারের দাবির কথা। নয় কি?

রামতনু—তাই তো মনে হয়। কিন্তু এটাও শহুরে জীবনের সমস্যা। আমাদের এই জঙ্গলের জীবনের কোন সমস্যা নয়।

পুষ্করবাবু—সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, মুরলীবাবুর ছেলে সোমনাথের সঙ্গে সনাতনবাবুর মেয়ে দীপালিকে একটুও মানাবে না। ছেলেটা আইনি পড়ছে, লেখাপড়াতে ভাল বটে। কিন্তু কী বিদ্‌ঘুটে চেহারা। রাজপুত চেহারার ছিটে-ফোঁটাও ওর মধ্যে নেই। কালো ঢ্যাঙা ও রোগা একটা জীবন্ত খড়কে। সোমনাথকে ছেলেটা না বলে লোকটা বলাই ভাল। বয়সটা খুব বেশী পেকেছে। ত্রিশ-বত্রিশের বরং কিছু বেশীই হবে। কিন্তু সংসারের নিয়মে রূপের আর গুণেরই বা কী মূল্য আছে। সবাই টাকার জোরকেই সবচেয়ে বেশী মর্যাদা দেয়। সবাই বিষয়-সম্পত্তি আর আয়-উপার্জনের অবস্থা বিচার করে সমান অবস্থার কুটুম্ব পেতে চায়। কাজেই সনাতনের মেয়ের বিয়ে যে কবে আর কী করে সম্ভব হবে, বুঝতেই পারি না।

কোন এক জগনপুরের ছেলে-মেয়ের বিয়ের সমস্যার কথা এই ভেলাডিহির জঙ্গলের ভিতরে বসে আলোচনা করা একটুও মানায় না। ভাণ্ডারী পুষ্করবাবুর আক্ষেপের এই সব কথার মধ্যে যুক্তি আছে বটে, কিন্তু ভেলাডিহির জঙ্গলের জীবনে ওরকম আক্ষেপের কোন দরকার হয় না। শুনতে আর ভাল লাগে না রামতনুর, কান দুটো যেন বাজে কথা শুনে-শুনে এরই মধ্যে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে।

সাইকেলের ঘন্টি বাজিয়ে বাইরে থেকে কে যেন ডাক দিল—কাকা।

চমকে উঠলেন ভাণ্ডারী পুষ্করবাবু। হ্যাঁ, ভুবনবাবুর সেই ছেলেটা, সেই অনিমেষই এসেছে। বাইরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে ডাক দিলেন পুষ্করবাবু—কে, অনিমেষ নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কাকা।

—ভিতরে চলে এসো।

আগন্তুক অনিমেষকে দেখে রামতনুর চোখে সত্যিই একটা বিস্ময় চমকে ওঠে। বা, কী সুন্দর চেহারা। কী সুঠাম স্বাস্থ্যে বাঁধানো একটা শরীর। কিন্তু বেশ কচি রকমের একটা মুখ, মিষ্টি হাসিতে যেন ভরাট হয়ে রয়েছে। ওর বয়স যদি উনিশ-কুড়ি হয়, তবে চেহারাটার বয়স সতেরো-আঠারোর একটুও বেশী নয়। কপালের ওপর ছোট্ট একটা ত্রিশূলের মতো আকারের কাটা দাগ। নিশ্চয় ছেলেবেলার ভয়ানক এক দুরন্তপনার স্মৃতিচিহ্ন। কী আশ্চর্য, কপালের কাটা দাগটাকেও বেশ সুন্দর বলে মনে হয়।

ভুবনবাবুর শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন করতে এসেছে অনিমেষ। যাবেন—কাকা। নিশ্চয় যাবেন। এখন তো আমার আপনজন বলতে শুধ্ এক আপনিই আছেন?

সত্যিই কি জগনপুর থেকে বের হয়ে আর এই জঙ্গলের ত্রিশ মাইল পথে একটানা সাইকেল চালিয়ে ভেলাডিহিতে এসে পৌঁছেছে অনিমেষ।

অনিমেষ হাসে —হ্যাঁ কাকা। জগনপুর থেকে মোটরবাসে ডুমরিতে এসেছি, তারপর সাইকেলে ভেলাডিহি। সাইকেলে জঙ্গলের একটানা ত্রিশ মাইল পথ পার হওয়া আপনার কাছে ভয়ানক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে কিছুই নয়, কাকা। আমার কাছে এ তো একটা তামাশা। কিন্তু হ্যাঁ, আপনার ঠিকানা খুঁজে পেতে আমাকে খুবই হয়রান হতে হয়েছে। আমি তো ভাবতেই পারিনি যে, আপনি এরকম একটা জংলী জায়গায় পড়ে থাকতে পারেন? বুঝতে পারি না, কেমন করে এখানে দিন কাটাচ্ছেন। মধুপুরে আপনার সেই প্রকাণ্ড বাড়ি, আর এখানে মাটির তৈরি এই কুঠুরি, ভাগ্যের এতটা পতন আপনি কী করে সহ্য করলেন কাকা?

পুষ্করবাবু—দেনার দায়ে যার সর্বস্ব বিকিয়ে যায়, তাকে এইরকমই একটা গরীব দশা মেনে নিতে হয় বাবা।

রামতনুর দিকে তাকিয়ে কথা বলে অনিমেষ।—আপনিও কি দেনার দায়ে সব বিকিয়ে দিয়ে তারপর এই জঙ্গলে এসে ঠাঁই নিয়েছেন?

রামতনু একটু বিরক্ত স্বরে জবাব দেয়।—না, আমি জঙ্গলকে শহরের চেয়ে অনেক বেশি ভাল মনে করি বলেই এখানে এসে ঠাঁই নিয়েছি।

অনিমেষ—কিন্তু কাজটা কি ভাল হয়েছে?

রামতনু—তর্ক করবার শখ আমার নেই। তাই আমি আপনার কথার জবাব দেব না।

অনিমেষ নামে এই ছেলেটির চেহারা বিশেষ করে ডাগর চোখের আর মুখের চেহারাটা নরম, স্বভাবটা তেমন নরম বলে মনে হয় না। বরং বেশ উদ্ধত রকমের বলে মনে হয়। তর্কের রকমটাও বেশ উদ্ধত। যাবার আগে বেশ উদ্ধত ভঙ্গীতে অনেক হাসি হেসে নিল অনিমেষ। জঙ্গলের নামে যত নিন্দার কথা আউড়ে নিল।—যা-ই বলুন দাদা, জঙ্গলের ভিতরে জীবন কাটিয়ে দেওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

অনিমেষ চলে যাবার পর পুষ্করবাবুকে জিজ্ঞাসা করে রামতনু। —আপনার এই জ্ঞাতিপুত্রটি কি আবার এখানে আসবে।

পুষ্করবাবু—সেটা আমি কী করে বলি? কিন্তু ওর আর এখানে আসবার কোন দরকার হবে বলে মনে হয় না।

তিন

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই শুনতে পায় রামতনু, কাছারি-বাড়ির গা ঘেঁষা জঙ্গলের ভিতরে অদ্ভুত রকমের অনেক শব্দ যেন হুল্লোড় করে চলে যাচ্ছে। এরকম শব্দের হুল্লোড় এই ভেলাডিহির জঙ্গলে কিংবা অন্য কোন জঙ্গলে কোনদিনও শুনতে পেয়েছে বলে রামতনুর মনে পড়ে না। খোলা জানলার কাছে এগিয়ে যেয়ে ডাক দেয় রাতমনু।—পুষ্করবাবু জেগে আছেন নাকি?

—হ্যাঁ।

জঙ্গলের ভিতরে অদ্ভুত রকমের অনেক শব্দের হুল্লোড় চলে যাচ্ছে শুনছেন তো?

—হ্যাঁ।

—কিসের শব্দ?

—বাইসনের একটা দল চলে যাচ্ছে।

—বাইসন? বাইসন কোথা থেকে আসবে? আমাদের দেশে বাইসন নেই।

—ওই হলো। যাদের ইণ্ডিয়ান বাইসন বলা হয়, যাদের দেশী নাম গাউর, তাদেরই একটা দল চলে যাচ্ছে।

—আগে তো ওরা ভেলাডিহির এই জঙ্গলে ছিল না।

—না, বছর দুই হলো পালামউ-এর জঙ্গল থেকে চারটে গাউর দল চলে এসে এই জঙ্গলে ঢুকেছে। এক-একটা দলে বিশ-ত্রিশটা গাউর। পুরুষ গাউর বলতে শুধু দলের কর্তাটি আর কয়েকজন বাচ্চা পুরুষ, বাকি সবই হলো মেয়ে-গাউর অর্থাৎ গাউর গাই।

শুনতে থাকে রামতনু, ছোট-ছোট গাছকে গুঁতিয়ে মটমট করে ভেঙে দিচ্ছে আর মাড়িয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে গাউরদের নিশাচর একটা দল। কী উদ্দেশ্যে কোন্ দিকের কোথায় ওরা চলে যাচ্ছে, সেটা ওরাই জানে। মাঝে-মাঝে গাঁ-গাঁ করে ডাক ছাড়ছে গাউরদের দলটা, কতকটা মোষের ডাকের মতো শব্দ।

পুষ্করবাবু—শুনেছিলাম, শীত পড়লেই ওরা আবার ওদের পুরনো জঙ্গলে ফিরে যাবে। শীত তো পড়ছে। কিন্তু কই ওরা তো চলে যাচ্ছে না?

হেসে ফেলে রামতনু। —মনে হয়, ওরা ভেলাডিহির জঙ্গলকে ভালবেসে ফেলেছে।

পুষ্করবাবু—তা না হয় বিশ্বাস করলাম। কিন্তু ভেলাডিহির জঙ্গলও কি ওদের ভালবেসে ফেলেছে?

রামতনু—সেটা একটু খোঁজ খবর নিয়ে বুঝতে হবে, কাকা।

পুষ্করবাবু—তা হলেই খোঁজ-খবর কর।

পরদিন সকালেই খোঁজ-খবর করে ঘটনার যেটুকু জানতে পারে রামতনু সেটুকুই যে মস্ত বিস্ময়ের তথ্য। ওই যে ভেলাডিহির পাশের জঙ্গলের ভিতরে হাজার বিঘা বিবাদী ডাঙ্গাজমি পড়ে আছে, সে ডাঙ্গাজমি এখন একটা যুদ্ধক্ষেত্র। জঙ্গলের একচেটে দখল পেতে চায়, এরকম দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী গাউর-দলের লড়াই চলছে তিন দিন ধরে। ডাঙ্গাজমির ওপর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রচণ্ড মারামারির শব্দ রোজই কয়েক ঘন্টার মতো ভয়াল হয়ে বাজতে থাকে। তারপর সাময়িক বিরতি। দুই দলই আবার দুই দিকে সরে গিয়ে বাঁশের জঙ্গলগুলোকে চিবিয়ে চিবিয়ে তছনছ করতে থাকে। পরের দিন আবার যুদ্ধ।

মনে পড়তেই আবার হেসে ফেলে রামতনু। পুরনো কথা। জঙ্গলের ভিতরে ওই হাজার বিঘা ডাঙ্গাজমির দখল নেবার জন্য লাঠালাঠি আর মারামারি করা জগনপুরের ওই দুই বড়লোকের, মুরলীবাবুর আর ভুবনবাবুর জীবনের যেন হার্ডি অ্যানুয়াল ছিল। প্রতিবছর ডাঙ্গাজমির ওপর দখল কায়েম করবার জন্য দুজনেই লাঠিয়ালের দল পাঠাতেন। কোন পক্ষই কিন্তু দখল নিতে পারতো না। মারামারির পর দুই লাঠিয়াল দল আবার ভালোমানুষের দলের মতো শান্ত হয়ে জঙ্গলের বাইরে চলে যেত। সেই বিবাদী ডাঙ্গাজমিটাকে কোন পক্ষই বাগিয়ে নিতে পারেনি।

রামতনু বলে—জঙ্গলের দখল নিয়ে দুই গাউর দলের মারামারি। ব্যাপার দেখে আপনি কত আর নিন্দে করতে পারবেন কাকা? হাজার বিঘা একটা বিবাদী ডাঙ্গাজমির দখল নেবার জন্য আপনার জ্ঞাতি ভাই ভুবনবাবুর সঙ্গে মুরলীবাবুর বাৎসরিক মারামারির কাণ্ডটা জানোয়ার গাউরদের মারামারির কাণ্ডের তুলনায় অনেক কদর্য। জঙ্গলবাসী দেশী বাইসন ওই গাউরদের স্বভাবের চেয়ে ওঁদের দু-জনের স্বভাব বরং বেশি খারাপ বলে মনে হয়। যাক্ গে, একজন তো হার্ট স্ট্রোক হয়ে মরেই গিয়েছেন, জীবনের সব ল্যাঠা চুকিয়ে দিয়েছেন। ভুবনবাবুর নিন্দে আর করতে চাই না। কিন্তু এটাও ভাবতে খারাপ লাগছে যে, এইবার একেবারে বিনা বাধায় বিবাদী ডাঙ্গাজমিটার দখল নিয়ে ফেলবেন মুরলীবাবু।

পুষ্করবাবু—আমারও তাই মনে হয়। অনিমেষকে একটা কাঁচা বুদ্ধির বাচ্চা ছেলে বলে মনে করা চলে। সে কী আর মুরলীবাবুর মতো পাকা সম্পত্তিবাজ মানুষের সঙ্গে লড়তে পারবে?

চার

জগনপুরের জীবনে মস্ত রকমের একটা নাটকীয় কাণ্ড শুরু হয়েছে। ঘটনার সব কথা যদিও শুনতে পান না পুষ্করবাবু, তবু মাঝে-মাঝে জগনপুর থেকে দু-চারটে বেনামী চিঠি তাঁর কাছে আসে। তা থেকেই আশ্চর্য হবার মতো একটা ঘটনার আঁচ তিনি করে ফেলেছেন। চিঠি পড়ে বেশ গম্ভীর হয়ে যান পুষ্করবাবু। তাঁর জ্ঞাতিভাইয়ের পুত্র ওই অনিমেষ কি সত্যিই ডাইনের মায়ার ফাঁদে পড়েছে? সত্যি সত্যি কী হয়েছে, সেটা ঠিকমতো জানবার জন্য একদিন জগনপুর ঘুরে এলেন পুষ্করবাবু।

অনিমেষের সঙ্গে মোক্তার সনাতনবাবুর সুন্দরী মেয়েটার ভালবাসাবাসির ব্যাপারটা বড়ই প্রবল হয়ে উঠেছে। নিকুঞ্জ মোক্তার আদ্যোপান্ত ঘটনার সব কথা পুষ্করবাবুকে শুনিয়ে দিয়েছেন। সনাতনবাবু একদিন অনিমেষকে সত্যনারায়ণের পূজো দেখতে আর প্রসাদ খেয়ে যেতে নেমন্তন্ন করেছিলেন। সেই যে সেই প্রথম দিনেই দীপালির কাছে বসে আর অনেক গল্প করে চলে গেল অনিমেষ, নিকুঞ্জবাবু বললেন, সেদিনই বোকা ছেলেটার প্রাণের ওপর ডাইনের মায়া ছড়িয়ে পড়েছিল। কলকাতা থেকে খুব দামী একটা ক্যামেরা কিনে আনিয়ে দীপালির প্রায় তিনশো ফটো তুলে এনেছে অনিমেষ। ডাইনের মায়া যে কী ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে সেটা আরও কটা দিনের মধ্যে সবারই চোখে ধরা পড়ে গেল। সনাতনবাবুর নোংরা চেহারার বাড়িটা নতুন রঙে রঙীন হয়ে উঠেছে। শিশু কাঠের নানারকমের আসবাবে সনাতনবাবুর ঘর ভরে গিয়েছে। দীপালিকে দেখা যায় বেনারসী শাড়ি গায়ে জড়িয়ে নার্সারির ভিতরে ঘুরে ফিরে ফুল তুলছে।

দীপালিকে একদিন একটা কথা বেশ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে অনিমেষ। —তোমাকে আমি যখন সত্যিই ভালবেসেছি, দীপালি, তখন তোমাকে আমার সর্বস্ব দিয়ে দিতে পারি। সেজন্য আমার মনে এতটুকুও আপত্তি দেখা দেবে না।

নিতান্ত গোপনের এই ভাষাটাকে কে কেমন করে শুনতে কিংবা জানতে পেল?

নিকুঞ্জবাবু হেসে ফেলেন।—বাতাসেরও কান আছে, সবচেয়ে গোপন কথাও শুনে ফেলে বাতাস। তাছাড়া, সনাতনবাবুর বাড়ির ঝি রামদুলারী আছে, যে তার নিজের কানে শোনা এই

ভালবাসার কথাগুলিকে জগনপুরের প্রায় সব বাঙালী-বাড়ির গিন্নী আর মাসি-পিসির কানে পৌঁছে দিয়েছে। কাজেই কারও কিছু জানতে বাকি নেই।

দীপালির চোখ দুটো এত কালো যে, চোখে কাজল বোলানো হয়েছে বলে মনে হয়। অনিমেষের মুখের ওই কথা শুনে দীপালির কালো চোখে বড়-বড় জলের ফোঁটা টলমল করেছে আর ঝরে পড়েছে। সেই মুহূর্তে দীপালিকে দুই হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করেছে অনিমেষ—বল তোমার মনে কিসের দুঃখ।

হেসে ফেলে দীপালি।—আমার মনে কোন দুঃখ নেই, অনিমেষ। বরং আনন্দে ভরে আছে মনটা, কারণ তুমি আমাকে ভালবেসেছো। দুঃখ নয়, আনন্দে আমার চোখ জলে ভরে গিয়েছে।

ঝি রামদুলারীর চোখে এই দৃশ্যটাও ধরা না পড়ে পারেনি। রটিয়ে দিয়েছে রামদুলারী,—তারপর কি হলো শুনবেন? দিদিমণি এক হাতে অনিমেষের একটা হাত চেপে ধরে অন্য হাতে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। ছি ছি ভদ্রলোকের মেয়ের এ কী রকমের চরিত্র?

নিকুঞ্জবাবু বললেন—শুনতে পাচ্ছি, সনাতনবাবু এবার অনিমেষের অভ্রখনিটাকে কিনে নেবার জন্য তৈরি হয়েছেন।

ভ্রূকুটি করেন পুষ্করবাবু—কিনে নেবেন সনাতনবাবু? সনাতনের এত টাকার জোর কবে হলো?

নিকুঞ্জবাবু—আরে মশাই, সত্যি কি টাকা দিয়ে অনিমেষের অভ্রখনিটাকে কিনবেন সনাতন, আমার চেয়ে অনেক বেশী পোড়াকপালে একটা মোক্তার? পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়ে সনাতনবাবুকে খানিকটা বিক্রী করা হলো বলে দলিল তৈরি হবে। সে দলিল যথারীতি রেজিস্টারী করা হবে। অথচ একটি পয়সাও পাবে না অনিমেষ। অনিমেষ একটি পয়সা চাইবেও না। খুশি হয়ে দলিলে সই করে দেবে। ডাইনের মায়ার কাছে বাঁধা পড়েছে যার প্রাণ, সে কী করে বুঝবে যে, সনাতন মোক্তার তার সর্বস্ব লুটে নিচ্ছে।

কবে দীপালির সঙ্গে অনিমেষের বিয়ের উৎসব জেগে উঠবে? অনিমেষকে কথা দিয়েছেন সনাতন, বিয়ে তো হবেই, একটু দেরী হলে ক্ষতি কি?

হ্যাঁ অনিমেষের বাপ ভুবনবাবুর নামে যে টাকা ব্যাংকের ঘরে জমা ছিল সে টাকার সবই তুলে নিয়েছে অনিমেষ। সব টাকা মোক্তার সনাতনের ঘরে চলে গিয়েছে।

—কত টাকা?

—চল্লিশ হাজার টাকা।

—বাড়িটাও কি বেচে দিয়েছে অনিমেষ?

—না, এখনও বেচে দেয়নি। কিন্তু বেচে দেবে।

পুষ্করবাবু—কিন্তু আপনারা এতজন বিচক্ষণ মানুষ এখানে থাকতে, ছেলেটাকে সনাতন মোক্তারের খপ্পর থেকে রক্ষা করতে পারলেন না।

নিকুঞ্জবাবু—আরে, মশাই ছেলেটাকে সনাতনের খপ্পর থেকে রক্ষা করতে গেলে আমার কী দশা হবে, জানেন?

পুষ্করবাবু—না।

নিকুঞ্জবাবু—আমাকে তবে ওই দুর্দান্ত ছেলের ছুরির মার খেয়ে মরে যেতে হবে।

পুষ্করবাবু—তাহলে বলুন কারও কিছু চিন্তা করবার কিংবা চেষ্টা করবার কর্তব্য নেই।...আমি চলি।

ভেলাডিহিতে ফিরে এসে পুরো একটা দিন একেবারে স্তব্ধ হয়ে খাটের ওপর পড়ে রইলেন পুষ্করবাবু, অনিমেষের জ্ঞাতি-কাকা। অনিমেষের ভাগ্যটার এত শিগগির এত বেশি অধঃপতন হয়ে গেল, ভাবতে গিয়ে পুষ্করবাবু বার বার শিউরে ওঠেন। শয়তান সনাতন মোক্তার অনিমেষের নিরেট একটা বোকা বিশ্বাসের আত্মাকে ঠকিয়ে ঠকিয়ে সব সম্পত্তি একে-একে বাগিয়ে ফেলছে। কিন্তু সব শেষে সনাতনের মেয়েটাও কি অনিমেষের সব চেয়ে বড় আশার স্বপ্নটাকে ঠকাবে? না, সেটা হবে না বলে মনে হয়। অনিমেষের মতো চমৎকার ফুটফুটে চেহারার একটা ছেলেকে ভাল না বেসে পারবে কেন দীপালি? নিকুঞ্জবাবুও বলেছেন, ডাইনের মায়াটা দীপালির কোন শয়তানী মতলবের মায়া নয়। ডাইনের মায়া হলো সনাতন ও তার স্ত্রী শুভময়ীর যুগ্ম মতলবের মত ছলনাময় লীলা-কলা। শোনা যায় অনিমেষ যতক্ষণ না সনাতনের বাড়িতে এসে ভাত খায়, ততক্ষণ শুভময়ী তাঁর মুখের কাছে ছোট্ট একটা বাতাসাকেও তুলতে পারেন না। এবং ভাত খাওয়ার ব্যাপারটা কি শুধু ডাল-ভাত তরকারী খাওয়ার একটা সাধারণ ব্যাপার? মোটেই তা নয়। দু'রকমের রান্না মাংস, তিন রকমের রান্না মাছ আর থালার চারদিকে সাতরকম স্বাদের ডালনা ঘন্ট চাটনি ও পায়েসের সাতটা বাটি সাজিয়ে দিয়ে অনিমেষকে না খাওয়াতে পারলে শুভময়ীর প্রাণের তৃপ্তি পুরো হয় না। ডাইনের মায়াটা বড়ই স্নেহময়। নিকুঞ্জবাবুর ধারণা, যতদিন না অনিমেষের বাড়িটাকে বাগিয়ে নিতে পারছেন সনাতনবাবু, ততদিন ডাইনের মায়া এইরকম স্নেহময় হয়েই থাকবে।

দশদিন পরে নিকুঞ্জবাবুর লেখা চিঠি পেয়ে বুঝতে পারলেন পুষ্করবাবু বাড়িটাকে বাগিয়ে নিতে খুব বেশি দেরি করেননি সনাতন মোক্তার। অনিমেষের বাড়িটাকে বাইশ হাজার টাকায় কিনে নেবার দলিল চটপট তৈরি করে চটপট রেজিস্ট্রি করিয়ে নিয়েছেন সনাতনবাবু।

তাই আবার একটি বৈশাখী সন্ধ্যার চাঁদের আলোতে নার্সারির গোলাপ কুঞ্জের যত ফোটা ফুলের হাসি-হাসি চেহারার দিকে তাকিয়ে গল্প করেন সনাতন ও শুভময়ী। নার্সারির ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে দীপালি। আর বারান্দার ওদিকে থামের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে উৎকর্ণা রামদুলারী। দু চোখ বন্ধ করে হাই তুলছে।

সনাতন বলেন—এদিকে এতদিন ধরে যা করবার ছিল তার তো সবই করা হয়ে গেল। এখন ভাবতে হবে...।

শুভময়ী—হ্যাঁ, যা করা হয়েছে তা ভালই হয়েছে। লোকে নিন্দে রটাচ্ছে যে, তঞ্চক সনাতন মোক্তার অনিমেষকে তুক করে সব বিষয়-আশয় বাগিয়ে ফেলেছে। করুক নিন্দে। কিন্তু এখন একটা কথা খুব ভাল করে ভেবে দেখা দরকার।

সনাতনবাবু হাসেন—আমার নামে ওই নিন্দেটা রটাবার কি কোন মানে হয়? অনিমেষের সম্পত্তি আমার হাতে না এসে মুরলীবাবুর হাতে চলে গেলে বুঝি খুব ভালো হতো?

শুভময়ী—নিকুঞ্জবাবুর স্ত্রী আমার মুখের ওপর একটা কথা শুনিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। বলেছেন—অনিমেষকে এরকম করে একটা বেহাল গরীব করে দেওয়া তোমাদের একটুও উচিত হয়নি গো,

মোক্তার গিন্নি। তোমরা ভয়ানক পাপ কাজ করেছ।

সনাতন আবার হাসেন—এসব তো হিংসের কথা। যাক্-গে আমাকে এখন একটা কথা ভেবে দেখতে হবে। অনিমেষের সঙ্গে দীপালির বিয়ে কি না হলেই নয়?

শুভময়ী—আমি তো মনে করি, না হলেই ভাল। কিন্তু মেয়ে কি সেটা মানবে? অনিমেষের সঙ্গে এতদিনের মেলামেশা, আমার তো মনে হয়, অনিমেষের ওপর দীপালির মনের টান আরও বেড়েছে।

সনাতন—একটা উনিশ-কুড়ি বছর বয়সের ছেলের ওপর বত্রিশ বছর বয়সের একটা মেয়ের টান-ফান না থাকাই ভাল।

শুভময়ী—কিন্তু কথাটা বলতে বেশ লজ্জা বোধ করছি। তোমার মেয়ে তো অনিমেষের বয়সটাকেই ভালবাসে। তার ওপর এই সেদিন নিজেরই মুখে অনিমেষকে বিয়ের জন্য তৈরী হতে বলে দিয়েছে দীপালি। আমি নিজের কানেই সব শুনেছি।

সনাতন—কিন্তু অনিমেষ কী বলেছে?

শুভময়ী—অনিমেষ বলছে যে, ওর পুষ্করকাকাকে ডেকে নিয়ে এসে তারই ওপর বিয়ের সব ব্যবস্থা করবার ভার ছেড়ে দেবে। দীপালি বলেছে—ব্যস্, আর দেরি করবে না অনিমেষ।

সনাতন জোরে একটা হাঁপ ছেড়ে দিয়ে কথা বলেন—তবে আর ভেবে দেখবার কিছু নেই। আপত্তি করে লাভ নেই! আমার কিন্তু খুব বিশ্বাস ছিল যে, শেষটা এরকম হবে না।

পাঁচ

—কাকা।

আবার এসেছে অনিমেষ। ভেলাডিহির তসীল কাছারির সামনে পথের উপর দাঁড়িয়ে ডাক দিয়েছে।

পুষ্করবাবু ঘরের বাইরে এসে সাড়া দিলেন—কী ব্যাপার অনিমেষ?

অনিমেষ—আপনাকে একবার জগনপুর যেতেই হবে কাকা। না গেলেই নয়।

—কেন?

—আমার বিয়ে।

—কার সঙ্গে?

—সনাতনবাবুর মেয়ের সঙ্গে।

—তাই নাকি! কিন্তু সেজন্য আমাকে একবার জগনপুর যেতে হবে কেন?

—আপনি না গেলে কে যাবে? আমার আপনজন বলতে আপনি ছাড়া আর কে আছেন? আপনি আমার গার্জেন হয়ে আর সামনে থেকে বিয়ের সব কাজ চুকিয়ে দেবেন। টাকা খরচ করবার সব দায় আমার। আপনাকে সেজন্য একটুও ভাবতে হবে না।

পুষ্করবাবু হাসেন। —তা তো তোমার এই গরীব কাকার জানাই আছে বাবা, তোমার বিয়ের কাজের সব খাটুনি খেটে দিতে পারবো আমি, সেজন্য চিন্তা করো না। কিন্তু বিয়েটা কবে?

অনিমেষ—দিন ঠিক হয়নি।

পুষ্করবাবু—দিন ঠিক হোক, তারপর আমি যাব।

অনিমেষ—আচ্ছা, তবে তাই হোক, কাকা। দিন ঠিক হবার পর আমি আপনাকে চিঠি দিয়ে জানাবো।

রামতনুর দিকে তাকিয়ে আর হেসে-হেসে কথা বলে অনিমেষ। —আপনাকে এখনই নেমন্তন্ন করে যাচ্ছি, রামতনুদা। আমার বিয়েতে আপনি যাবেন, অবশ্যই যাবেন।

অনিমেষের ওপর একটুও প্রসন্ন নয় রামতনু। তবু বুঝতে পারে, অনিমেষের উজ্জ্বল মুখের হাসিটা যেন চমৎকার একটা মায়ার হাসি। দেখলে কঠিন রকমের অপ্রসন্নতাও গলে যায়। হেসে হেসে কথা বলে রামতনু—বেশ তো, কোন অসুবিধে না থাকলে নিশ্চয় যাব।

সেই মুহূর্তে মুখর হয়ে যে-সব আক্ষেপের কথা শোনাতে থাকে অনিমেষ, সেটা সহ্য করতে গিয়ে একেবারে নীরব হয়ে যায় রামতনু। শক্ত রকমের একটা ভ্রূকুটি তুলে অনিমেষের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

অনিমেষ বলে—আমি ভেবে পাই না, আপনারা এই বিশ্রী একটা জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছেন কেন? যেমন আমার এই কাকা, তেমনই আপনি, দুজনে কেন যে জানোয়ারের জগতে বাস করছেন, বুঝতে পারছি না। না না না, আমার অনুরোধ, আপনারা আর এখানে থাকবেন না। জগনপুরে চলে আসুন। আমাদের অভ্রখনিতে আপনাদের ভাল চাকরির ব্যবস্থা করে দেব।

রামতনু—তুমি এত বেশি কথা বলছো কেন? অনেক বলেছো, এবার থাম।

পুষ্করবাবু—তোমাদের কোন্ অভ্রখনির কথা বলছো, অনিমেষ? যে খনিটা কিনে নিয়েছেন সনাতনবাবু?

আবার সেই মায়াময় মিষ্টি হাসি অনিমেষের সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে।—কিনে নিয়েছেন বটে, কিন্তু সেটা তো সত্যি করে কিনে নেবার কোন ব্যাপারই নয়।

পুষ্করবাবু—কেন নয়?

অনিমেষ—একটি পয়সা না দিয়েও কি একটা অভ্রখনিকে কেউ সত্যি করে কিনে নিতে পারেন?

পুষ্করবাবু—তবে তুমিই বল না, তোমাদের অভ্রখনিটাকে সনাতন যদি না কিনে থাকেন, তবে পঞ্চাশ হাজার টাকায় কিসের বিক্রী কোবালা তুমি লিখে দিলে?

অনিমেষ আবার হাসে। শুনুন কাকা, আমার সম্পত্তি সেই খনিটাকে সনাতনবাবু নিজের দখলে এই জন্যে নিয়ে রাখলেন যে, আমি যেন টাকার দরকারে পড়ে কিংবা ভুলটুল করে খনিটাকে কখনও মুরলীবাবুর মত লোভী মানুষের কাছে বিক্রী না করে দিতে পারি। এই সম্পত্তি তো আবার একদিন আমার হাতে চলে আসবে। আমার সব সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্যেই তো তিনি এইরকমের একটা মিথ্যে কেনাকেনির ব্যাপার করিয়েছেন।

পুষ্করবাবু—তোমার নামে কি কোন সম্পত্তিই আর নেই?

অনিমেষ—আছে বৈকি।

পুষ্করবাবু—কী আছে? কোথায় আছে?

অনিমেষ—ওই যে, আপনাদের এই জঙ্গলের পাশের ভিতরে হাজার বিঘে ডাঙ্গাজমি।

পুষ্করবাবু—ওটা তো বিবাদী জমি। মুরলীবাবু দাবি করেন যে, ওটা তাঁরই জমি।

অনিমেষ—আমিও তো দাবি করি যে, ওটা আমার জমি।

পুষ্করবাবু—তবে তুমিও কি ঠিক করেছো যে, এই জমির দখল নেবার জন্য প্রতি বছর লাঠালাঠি করবে?

অনিমেষ—নিশ্চয় করবো? কেন করবো না?

পুষ্করবাবু—সনাতন মোক্তার কি তোমাকে এই পরামর্শ দিয়েছেন।

অনিমেষ—হ্যাঁ, তিনি বলেছেন যে, মুরলীবাবুকে জঙ্গলের ভিতরে ওই হাজার বিঘে ডাঙ্গাজমির দখল নিতে কিছুতেই দেবে না। ও জমিতে মকাই বুনলে বছরে কত টাকা লাভ হতে পারে, ভেবে দেখ।

পুষ্করবাবু—বাঃ, সনাতনকে সত্যিই তোমার একজন দয়াময় উপকারী বলে মনে হচ্ছে।

অনিমেষ—আমাকে আজই কথা দিন কাকা, আপনিও কথা দিন রামতনুদা, গিরিডিতে আমাদের অভ্র কোম্পানীর অফিসে চাকরি করবেন।

পুষ্করবাবু ওদিকে মুখ ঘুরিয়ে আর চুপ করে বসে থাকেন। অনিমেষের কথার কোন জবাব দেন না। বয়েসের হিসাবে অনিমেষ এখন সাবালক হয়েছে বটে, কিন্তু না বুঝে-সুঝে যে-সব কথা বলছে, সে-সব তো একটা নাবালকের মুখরতা। কিন্তু স্বীকার করতে হয়, ওসব কী অদ্ভুত একটা সরল বিশ্বাসের কথা। ভগবান কবে যে এই ছেলের মাথায় কিছু খাঁটি বুদ্ধিসুদ্ধি দেবেন, কে জানে?

রামতনু বলে—আমি তোমাকে একটা উপদেশ দিতে পারি, অনিমেষ।

অনিমেষ—বলুন।

রামতনু—তুমি জগনপুর নামে ওই বদখত একটা নোংরামির খপ্পর থেকে পালিয়ে এই ভেলাডিহির জঙ্গলের ছায়াতে চলে এস।

অনিমেষ—তারপর?

রামতনু—তারপর ঠাকুর সাহেবদের এই তসীল কাছারিতে আমাদেরই মত একটা ছোটখাটো চাকরি নিয়ে ফেলবে?

অনিমেষ—তারপর?

রামতনু—তারপর আর কি? নিশ্চিন্ত হয়ে নিরাপদে বেঁচে থাকবে।

অনিমেষ—জানোয়ারের মতো?

রামতনু—তা যদি বলো তবে তাই।

অনিমেষ হেসে ফেলে—না, আপনি খুব রেগেছেন বলেই এত বাজে কথা বলেছেন, রামতনুদা। তবে আমি আপনাদের দুজনের কাউকেই ছাড়বো না। জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে গিরিডিতে আমাদের অভ্র কোম্পানীর কাজের দুটো চেয়ারে বসিয়ে দেব। মাইনে পাবেন, মাসিক পঞ্চাশ টাকা। এখানে জংলী চাকরি করে যে মাইনে পাচ্ছেন, তার প্রায় তিন গুণ বেশি।

চলে গেল অনিমেষ। এখান থেকে সাইকেলে একটানা ত্রিশ মাইলের বেশি এবড়ো-খেবড়ো জংলী পথে। ছুটে চলে যাবে অনিমেষ। পুষ্করবাবু বলেন—ছেলেটার তো এরকম গুণ অনেক আছে, কিন্তু দুঃখের কথা, নিজেকে রক্ষা করবার কোন গুণ নেই। সনাতনের মেয়ের কালো

চোখের ইশারার কাছে এই ছেলের মনপ্রাণ যেন পাগল হয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। বয়সটা আর একটু বেশি হলে প্রেম-ট্রেমের জন্যে এতটা বাড়াবাড়ি করতো না অনিমেষ, নিজেকে একেবারে বিকিয়ে দিয়ে ফতুর হয়ে যেত না। যা-ই হোক, রক্ষে এই যে, বিয়েটা এইবার হয়ে যাবে।

পুষ্করবাবু যেন একটা কল্পনার সঙ্গে বিড়-বিড় করে কথা বলে চলেছেন। শুনতে পেয়ে লজ্জা পায় রামতনু, শুনতে ভাল লাগে না।

পুষ্করবাবু বলে চলেছেন, নিদারুণ এক শারীরিক সত্যের বিবরণ। সনাতনের মেয়ে দীপালি বয়সের হিসাবে অনিমেষের চেয়ে অন্তত আট-দশ বছর বেশি, কিংবা আরও বেশি। একথা নিকুঞ্জবাবু বলেছেন। নিকুঞ্জবাবুর মেয়ে সুনীতা এখন তিনটি ছেলে-মেয়ের মা, বয়স ছাব্বিশ বছর। সনাতনের মেয়ে দীপালির জন্মের ছ'বছর পরে সুনীতার জন্ম হয়েছিল। কাজেই বুঝতে পারছো রামতনু। আমি তো বেশ বুঝতে পারছি, সনাতনের ওই ধাড়ি খেলোয়াড় মেয়ে দীপালি মতলব করে অনিমেষের মতো প্রায় নাবালক একটা ছেলেকে বুকের ওপর শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে আর ছেলেটার রক্তে পাগলামি ধরিয়ে দিয়েছে।

রামতনু হাসে—আপনি এসব অ্যানাটমির আলোচনা ছেড়ে দিয়ে এবার শেষ খাজনা আদায়ের হিসেবটা লিখে ফেলুন।

ছয়

কী ব্যাপার? কী হলো? দশটা দিন পার হয়ে গেল, তবু এখনও চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে না কেন অনিমেষ, কবে বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে?

দশটা দিনের পর আরও দশটা দিন পার হয়ে গেল। তারপর পুরো দুটো মাস। কী আশ্চর্য, নিকুঞ্জবাবুর কোন চিঠি আর এল না কেন? দু-চারটে বেনামী চিঠিই বা আসে না কেন?

দুশ্চিন্তা সহ্য করতে না পেরে একদিন জগনপুরে চলে গেলেন পুষ্করবাবু। মা নেই, বাপ নেই ওই দুর্দান্ত ছেলেটার জন্য তিনি কিছুদিন ধরে বড় বেশি মায়া বোধ করছেন। ছেলেটার যেন আরও ভয়ানক রকমের কোন ক্ষতি না হয়ে যায়।

দুদিন পরে জগনপুরে থেকে ফিরে এসেই পুষ্করবাবু বলেন—শুনেছো রামতনু অনিমেষের এখন কী দশা হয়েছে?

রামতনু—না, শুনিনি।

পুষ্করবাবু—অনিমেষ পুরো দেড়মাস হাসপাতালে থেকে তারপর এই কদিন আগে বাড়িতে ফিরেছে।

কেশে কেশে গলাটাকে যেন একটু পরিষ্কার করে নিলেন পুষ্করবাবু। তবু কথা বলতে গিয়ে তাঁর গলার স্বরটা বারবার ফুঁপিয়ে উঠছে। থিয়েটারের সীন এখন পালটে গিয়েছে, রামতনু। তবে একটা আশ্চর্যের কথা শোন। নিকুঞ্জবাবু বললেন, যে মুরলীবাবু কখনও সনাতনবাবুর দিকে একবার চোখ তুলে তাকাতেনও না, সনাতন মোক্তারকে একটা মানুষই বলে মনে করতেন না, তিনি গিরিডিতে ব্যাঙ্কের বারান্দাতে একদিন সনাতনবাবুকে দেখতে পেয়েই সহাস্যে একটা কথা বলেই ফেললেন—কেমন আছেন? আপনি তো এখন জগনপুরের একজন বেশ ভাল রকমের বড়লোক।

ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ। আপনি কত তাড়াতাড়ি আপনার অবস্থার এত বড় একটা উন্নতি করে ফেললেন।

থিয়েটারের এই নতুন সীনের চেয়ে আরও বড় আশ্চর্যের সীন হলো, সনাতনের মেয়ে দীপালির নতুন ভালবাসার যত নতুন চিঠির লেখালেখির সীন। মুরলীবাবুর আইন পড়া ছেলে সোমনাথকে চিঠি লিখে ফেলেছে দীপালি, তুমি কি জান, তুমি কি বিশ্বাস করবে যে, আমি তোমার আশায় বসে আছি, দিন গুণছি?

সোমনাথর কছে দীপালির চিঠি পৌঁছে দেবার আগে ঝি রামদুলারী সনাতন আর শুভময়ীকে চিঠিগুলি দেখিয়ে দিয়েছে। মেয়ের মনের কথা জানতে পেরে বাবা মা দু'জনেরই দু'জোড়া চোখে নতুন আশা হেসে উঠেছে।

সনাতনবাবু আর শুভময়ী, সুখী দম্পতির দুজনেই একদিন দেখতে পেয়েছেন, সন্ধ্যার ফিকে জ্যোৎস্নার মধ্যে নার্সারির গোলাপকুঞ্জের কাছে দাঁড়িয়ে গল্প করছে দীপালি আর সোমনাথ, একটা গোলাপফুল তুলে নিয়ে দীপালির খোঁপাতে গুঁজে দিল সোমনাথ।

সোমনাথকে সঙ্গে নিয়ে, আর সেই ফুল গোঁজা খোঁপার শোভাকেও সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল দীপালি। দুজনে টেবিলের একদিকে পাশাপাশি দুটি চেয়ারে বসে চা খেল। শুভময়ী নিজের হাতে চা পরিবেশন করলেন। চা খেয়ে চলে গেল সোমনাথ। দীপালি ভিতরের ঘরে ঢুকে আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়ে দুই চোখ বড় করে যেন নিজেরই দুই কালো চোখের রূপ দেখতে থাকে। বোধ হয় বুঝতে চেষ্টা করেছে দীপালি, এই কালো চোখের চাউনি আগে কোনওদিনও কি এত বিহ্বল হয়ে যেতে পেরেছিল?

রামদুলারী কাছে এসে দাঁড়ায়। —দিদিমণি, তোমার বড়-বড় কালো চোখ দুটো আগে এত চমৎকার কালো ছিল না।

বাইরের বারান্দায় দুই চেয়ারে বসে যে-কথা বলাবলি করেন সনাতন আর শুভময়ী সে কথা শুনে ফেলেছে দাই রামদুলারী। নিকুঞ্জবাবুকে চিঠি দিয়ে পুষ্করবাবুকে জানিয়েছেন, সনাতন খুব খুশি হয়ে বলেছে, দীপালির বুদ্ধি আছে।

তারপর আর বেশী নয়। থিয়েটারের ড্রপ সীন পড়ে গেল। খুব ঘটা করে মেয়ের বিয়ে দিলেন সনাতনবাবু। বিয়েতে জগনপুরের সব বাঙালী বাড়ির ছেলে-মেয়ে-পুরুষ সবাই এসেছিলেন। শুধু এক নিকুঞ্জবাবু আসেননি। সবাই বলেছেন—বা, যেমন কনে তেমনই বর। সুন্দর মানিয়েছে।

পুষ্করবাবু—শুনলে তো রামতনু, মুরলীবাবুর ছেলে সোমনাথের সেই সিড়িঙ্গে কেলে চেহারাটা কত সহজে ও কত তাড়াতাড়ি সবার চোখের কাছে সুন্দর হয়ে গেল।

রামতনু—ওরকম হয়েই থাকে।

পুষ্করবাবু—এখন আমি বুঝতে পারছি রামতনু, যেটা আগে ঠিক বুঝতে পারিনি। সনাতনের ওই মেয়েটাই হলো ডাইনের মায়া খেলাবার সব চেয়ে বড় খেলোয়াড় মায়াবিনী।

রামতনু—থাক্‌গে, যেতে দিন।

পুষ্করবাবু—ওদিকে অনিমেষের কী দশা হয়েছে শুনবে?

রামতনু—বলুন।

পুষ্করবাবু—সনাতন মোক্তার অনিমেষকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছে, আপাতত দু-চারটে মাস তুমি এই বাড়িতে থাকতে পারবে, তারপর কিন্তু আর নয়। তুমি অন্য কোথাও থাকবার ব্যবস্থা করে নেবে। হ্যাঁ, বাড়ির সব ঘরের সব তালার চাবি দারোয়ানের কাছে থাকবে, তোমার কাছে নয়।

ওদিকে থিয়েটারের ড্রপ সীন পড়ে গেলেও এদিকে, তার মানে অনিমেষের ভাগ্যের থিয়েটারে একটা নতুন সীন দেখতে পেয়েছেন পুষ্করবাবু। তাঁকে দেখেতে পেয়েই কেঁদে ফেলেছে দুর্দান্ত স্বভাবের সেই অনিমেষ। —বিয়ে হলো না বলে আমার মনে কোন দুঃখ নেই, কাকা। শুধু দুঃখ এই যে, দীপালি একদিনের জন্যেও আমাকে টাইফয়েডের জ্বর-জ্বালা আর দুরবস্থার মধ্যে একটিবারও দেখতে এল না। এখনও যদি একবার আসতো, তবে...।

—সেটা এখন আর হয় না অনিমেষ। দীপালি এখন অন্য একজনের বউ। তার পক্ষে তোমাকে দেখতে আসা সম্ভব নয়। সেটা মানুষের সংসারের নিয়ম নয়।

অনিমেষ—অন্তত একটিবার লুকিয়ে আসতে তো পারে। আমি সনাতনবাবুকে দশটা চিঠি লিখেছি, দীপালি যেন অন্তত একটিবার লুকিয়ে এসে আমাকে দেখে যায়। কিন্তু কই, অপেক্ষা করে করে হাঁপিয়ে উঠেছি, দীপালি তবু এল না।

জগনপুরের নিদারুণ থিয়েটারী ঘটনার কথা হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে চমকে ওঠেন পুষ্করবাবু—সর্বনাশ।

রামতনু—কিসের শব্দ?

পুষ্করবাবু—শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না, বাইসনের দলটা যে আমাদের ক্ষেতের সব মকাই খেয়ে সাবাড় করছে।

হেসে ফেলে রামতনু।—না, আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, দুর্দান্ত স্বভাবের যত গাউর-দল রোজই ক্ষিপ্ত হয়ে সেই বিবাদী ডাঙ্গা জমিটার দিকে ছুটে যায়। রোজই ছুটে যায়। রোজই লড়াই হচ্ছে। জমি জরীপের সার্কেল অফিসার এরই মধ্যে ডাঙ্গা জমিটার কাছে মস্ত বড় আর শক্ত একটা তেঁতুল গাছের ওপর চমৎকার মাচান বেঁধে ফেলেছেন। আমাদের দুজনকেই নেমন্তন্ন করেছেন সার্কেল অফিসার—মাচানে বসে চা খাবেন আর বাইসনের জঙ্গল দখলের যুদ্ধ দেখবেন তো চলে আসুন।

কিন্তু বাইরের রাস্তার ওপর ঝপাং করে যে শব্দটা আছড়ে পড়লো, সেটা তো একটা সাইকেলের আছাড় খাওয়ার আওয়াজ। হ্যাঁ, অনিমেষই এসেছে। টাইফয়েডে ভুগে বেশ দুর্বল ও রোগা হয়ে গিয়েছে শরীর, তবু তাই নিয়েই জঙ্গলের এই দীর্ঘ পথ সাইকেল চালিয়ে ছুটে এসেছে অনিমেষ। কিন্তু এ কী!

অনিমেষের চেহারাটা যেন আগুনের জ্বালা লেগে জ্বলছে। হাতে একটা চকচকে খোলা তরবারি, সেটাও যেন আগুনের জ্বালা সহ্য করতে গিয়ে থরথর করে কাঁপছে।

চেঁচিয়ে ওঠে অনিমেষ।—আমার এখনই একটা ঘোড়া চাই রামতনুদা। শীগগির দিন। একটুও দেরি করবেন না।

পুষ্করবাবু এগিয়ে যেয়ে অনিমেষের তরবারি ধরা হাতের মুঠোটাকে দুই হাতে শক্ত করে চেপে ধরে।—একী, অনিমেষ এ-সব আবার কী ব্যাপার?

চেঁচিয়ে ওঠে অনিমেষ।— আমার এই তরবারির এক কোপে শত্রুর মাথাটাকে ঘাড় থেকে নামিয়ে দেব। তারপর সেই মাথাটাকে লাথি মেরে চলে যাব। তারপর যা হবার তাই হবে, ফাঁসি কিংবা কালাপানি।

পুষ্করবাবু—কে তোমার শত্রু?

অনিমেষ—জগনপুরের মুরলী রায়ের ছেলে সোমনাথ রায়।

পুষ্করবাবু—কোথায় সোমনাথ?

অনিমেষ—খবর পেয়েছি, লাঠিয়াল দলের সঙ্গে সোমনাথও আজ ওদিকের জঙ্গলে ঢুকছে। আজ হল্লা করে ডাঙ্গা জমিটাকে দখল করবে সোমনাথ। কাজেই...না, আপনার পায়ে পড়ি কাকা, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি কথা দিচ্ছি, আমি এক ঘন্টার মধ্যেই আমার কাজ সেরে নিয়ে ফিরে আসবো, আপনাদেরই পায়ের কাছে এই তরবারিটাকে জমা করে দেব।

রামতনু—তুমি শান্ত হয়ে এখানেই বসে থাক, অনিমেষ। সেখানে গেলে তোমার শত্রুকে আজ আর দেখতে পাবে না। লাঠিয়াল নিয়ে সোমনাথ যদিও এসে থাকে, তবে এতক্ষণে ফিরে চলে গিয়েছে। না ফিরে গিয়ে উপায় নেই। সেখানে এখন বাইসনের দুটো দলের মধ্যে মারামারি চলছে।

এইবার অনিমেষের পিঠে হাত বুলিয়ে কথা বলে রামতনু।—সোমনাথ তোমার ঠিক শত্রু নয়, অনিমেষ। তোমার আসল শত্রু হলে তুমি।

জোরে একটা নিশ্বাস ছাড়ে অনিমেষ।—আপনি এ আবার কী রকমের অদ্ভুত কথা বলছেন, রামতনুদা।

তসীল কাছারির তিন চাকার তিন টাট্টু ঘোড়াকে হাঁকিয়ে নিয়ে এসে কাছাড়ির বড় দরজার কাছে দাঁড় করিয়ে দেয়। পুষ্করবাবু বলেন, ওরে—তিনটে ঘোড়া নিয়ে এলি কেন? ভুল করেছিস।

বেশ খুশি হয়ে হাসতে থাকে রামতনু।—ভুল করে ওরা ভালই করেছে। অনিমেষও চলুক আমাদের সঙ্গে। মাচানে বসে বাইসনের মারামারির দৃশ্যটা দেখুক।

অনিমেষ এইবার খুব শান্তস্বরে, যেন একটা দম্‌কা নিশ্বাসকে চেপে দিয়ে কথা বলে—আমাকেও যেতে বলছেন?

পুষ্করবাবু—হ্যাঁ, যেতে বলছি বৈকি।

তিন ঘোড়াতে তিন সওয়ার, পুষ্করবাবু, রামতনু আর অনিমেষ। দুপুরের রোদ বেশ তেতে উঠেছে। আর বেশি সময় নেই, বিকেলের রোদ একটু লালচে হয়ে উঠলেই ঝগড়াটে দুই গাউর বাইসনের দল মারামারি থামিয়ে দেবে। তারপর, সন্ধ্যা হবার আগেই জঙ্গলের ভিতরে দুই দিকে চলে যাবে। অবশ্য কাল সকালে ওরা আবার এসে...।

বাঃ, খুব চমৎকার পজিশনে মাচান বাঁধিয়েছেন সার্কেল অফিসার। তেঁতুল গাছের অনেক উঁচুতে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের একেবারে প্রান্তিক স্থানে—গাউরদের মারামারির দৃশ্যটা খুব স্পষ্ট দেখা যায়। সব কিছুই স্পষ্ট করে দেখা যায় আর শোনা যায়। সার্কেল অফিসারের নিমন্ত্রিত আরও পাঁচজন দর্শক অতিথি মাচানের ওপর বসে আছেন। সার্কেল অফিসার রামতনুকে দেখে খুশি হন। —আপনাদের দুজনকে তো চিনি, কিন্তু ইনি কে? সুন্দর এই ছেলেটি?

রামতনু—এ হলো আমাদের অতিথি। ভাণ্ডারী পুষ্করবাবুর এক জ্ঞাতি ভাইয়ের ছেলে।

দুই গাউর দলের দুই মত্ত আক্রোশের সংঘর্ষ, কী ভয়ানক একটা উদ্দাম দৃশ্য। গুঁতোগুঁতির শব্দ পাথর ফাটাবার শব্দের মত ফটফট করে বেজে উঠছে। এর শিং-এর উন্মত্ত আঘাতে ওর শিং ভেঙে পড়ছে। ঘায়েল গাউরের কপালের পাশে ঝুলছে ভাঙা শিং। ডাঙ্গাজমির শুকনো ধুলো রাগী গাউরের ক্ষুরের ঘষা খেয়ে ছোট-ছোট ঘূর্ণির মতো উড়ছে আর ঘুরছে। গাঁ গাঁ গাঁ, রাগী গাউরের ডাক কী ভয়ানক আক্রোশের শব্দ ছাড়ছে। কাদামাখা শরীর, একটা গাউর মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ছে, উঠে আর দাঁড়াতেই পারছে না। বিপক্ষ দলের একটা গাউর ছুটে এসে পতিত গাউরের বুকটাকে এক প্রচণ্ড গুঁতো মেরে যেন ফাটিয়ে দিয়ে সরে গেল। পতিত গাউরের মুখ থেকে রক্তের ধারা উথলে ওঠে, গলগল করে গড়িয়ে পড়ে। ধুলোতে আর রক্তেতে মিশে গিয়ে কাদা হয়ে যায়।

সার্কেল অফিসার হঠাৎ বলে ওঠেন—এইবার এদিকের একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখুন।

কোন্ দিকের?

সার্কেল অফিসার—এই যে আমাদের মাচানের ছায়ার কাছে, আমলকী ঝোপের পাশে যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে একবার দেখে নিন।

একটা পা খোঁড়া, বোধহয় পায়ের ক্ষুর পচে গিয়েছে, তাই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না মস্ত বড় এক মদ্দা গাউর। একটা চোখও গলে গিয়েছে। নড়বড় করছে মাথার দুটো শিং, পিঠের ওপর একটা দগদগে ঘা, তার ওপর বসে মাছির দল ঘেয়ো মাংস খুটে খুঁটে খাচ্ছে। যন্ত্রণায় এক-একবার কেঁপে উঠছে মদ্দা গাউরের দুর্বল দেহটা।

সার্কেল অফিসার—ইনি হলেন বিতাড়িত দলপতি। নতুন দলপতি এনাকে মেরে গুঁতিয়ে দলছাড়া করে দিয়েছেন। পুরনো দলপতির আজ কী অবস্থা হয়েছে দেখুন। দলের সঙ্গে আর নয়, ইনি লুকিয়ে-লুকিয়ে দলের পিছনে থেকে জঙ্গলের ভিতরে চলে বেড়ান।...হ্যাঁ এইবার দেখুন, দলের ভিতর থেকে লুকিয়ে বের হয়ে গোপন অভিসারিকার মতো একটি মাদি গাউর আস্তে-আস্তে হেঁটে দলছাড়া এই মদ্দাটারই দিকে চলে আসছে।

রামতনু—কে উনি?

সার্কেল অফিসার—অনুমান করছি, উনি হলেন এই মদ্দা গাউরের একজন পুরনো সঙ্গিনী।

মাদি গাউর, তার মানে বিতাড়িত দলপতির পুরনো সঙ্গিনী, তার মানে পূর্বতন প্রেমিকা, তার মানে যে ছিল এই মদ্দা গাউরের জীবন-যৌবনের প্রধান সহচরী, যে আজ অন্য এক দলপতি মদ্দা গাউরের সঙ্গিনী, সে আজ কেমন চুপি-চুপি একটা অনিয়মের টানে এখানে হাজির হয়েছে।

আগন্তুক মাদি গাউরটা খুব মায়া করে মদ্দা গাউরের গলা থেকে কাদার দাগগুলিকে চেটে চেটে মুছে দিল! বিশ্বাস করলে বোধ হয় ভুল হবে না, পুরনো সঙ্গিনী যেন পুরনো সঙ্গীর অসহায় একলা ও দুঃখী জীবনটাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

সার্কেল অফিসার—সবাই ভাল করে দেখে নিন। জুলজির কোন বইয়ের ছবিতে এই দৃশ্য দেখতে পাবেন না। আমি তো জুলজির ছাত্র। কিন্তু চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না দেশী বাইসনের মত কড়া মেজাজের প্রাণীর জীবনেও পুরনো ভালবাসার স্মৃতি আর মায়ার এরকম একটা ক্রিয়া আছে।

গাঁ গাঁ গাঁ, ডাক ছাড়ছে নতুন দলপতি। চমকে উঠলো গোপনচারী মাদি গাউর, তারপর দুরন্ত বেগে দৌড় দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফিরে আসবার পথে চোখে পড়ে রামতনুর, অনিমেষ ঘোড়ার পিঠের ওপর যেন ধ্যানীর মত নীরব হয়ে বসে রয়েছে। অনিমেষকে কয়েকবার নাম ধরে ডাকও দেয় রামতনু। কিন্তু সাড়া দেয় না অনিমেষ। কী এত ভাবছে ছেলেটা? এত আস্তে আস্তে চালালে ঘোড়া যে কাছারিতে পৌঁছতে রাত করে ফেলবে।

বাঃ, অনিমেষের ধ্যান ভাঙল কখন? চমৎকার এক খুশির মূর্তি ধরে, ঘোড়াটার চলবার চালে দুরন্ত একটা বেগ ধরিয়ে দিয়েছে অনিমেষ। রামতনু আর পুষ্করবাবুর দুই ঘোড়াকে অনেক পিছনে রেখে এগিয়ে ছুটে গেল অনিমেষের ঘোড়া।

কাছারিবাড়িতে ফিরে এসে আর ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়তেই দেখতে পায় রামতনু, বারান্দার ওপর একটা চারপায়ার ওপর বসে গান গাইছে অনিমেষ।

চেঁচিয়ে ওঠে অনিমেষ—আজ আমি খুব শিক্ষা পেয়ে গেলাম, রামতনুদা।

রামতনু—কিসের শিক্ষা?

অনিমেষ হাসে—আমার অসুখের খবর শুনে, আমার অনুরোধের দশটা চিঠি পেয়েও তো আমাকে একটি বারও দেখতে আসেনি, দীপালি নামে আমার সেই...।

রামতনু—তোমার সেই অনুরাগিনী মেয়েটি।

অনিমেষ—হ্যাঁ, কিন্তু এখানে দেখছি, একলা অসহায় একটা বাইসনের পুরনো সঙ্গিনী একটা বাইসনী তার পুরনো সঙ্গীকে কী চমৎকার সান্ত্বনা দিয়ে চলে গেল।

রামতনু—তাই তো।

অনিমেষ—তবে বলুন না রামতনুদা, মানুষ-প্রাণীর চেয়ে বনের প্রাণীর প্রাণ অনেক মহৎ কি না?

রামতনু—তাই তো বলছি।

অনিমেষ—তবে আমি আর জগনপুরে ফিরে যাব না, রামতনুদা। আমাকে এখানেই থাকতে দিন, আমাকে এখানেই একটা চাকরি জুটিয়ে দিন।

পুষ্করবাবু ব্যস্তভাবে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেন—আঁা, কী বলছে অনিমেষ?

রামতনু—অনিমেষ আর জগনপুরে ফিরে যেতে চাইছে না, এই জঙ্গলের জগতে থাকতে চাইছে।

পুষ্করবাবু—থাকুক, থাকুক।